পরিচয়

বিশেষ রচনা : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সাধারণতন্ত্র দিবসের শপথ

দেশকে টুকরো করার বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে, বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য রক্ষার শপথ।

ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৩৭৩/৮৮

সংসদের সাহিত্য সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

* ঠাকুরবাড়ীর কথা (২৫·০০)
* উপনিষদের দর্শন (২০·০০)
* The Challenge to India (৪৫·০০)

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

* তে হি নো দিবসা (৪০·০০)
* India Wrests Freedom (৭০·০০)
* Swami Vivekananda and Indian Nationalism (৪৫·০০)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

* বৈষ্ণব পদাবলী (৭৫·০০)
* রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত (৩০·০০)

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

* ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য (৩৭·৫০)

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

* তন্ত্রের কথা (১০·০০)
* উপনিষদের কথা (১০·০০)

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

ফোন—৩৫-৭৬৬৯, ৩৫-৩১৯৫

পরিচয়

৫৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮৮ মাঘ ১৩৯৪

প্রবন্ধ

আলোচনা

কবিতাগুচ্ছ

গল্প

সংস্কৃতি সংবাদ

প্রচ্ছদ

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রতিকৃতি

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

গণশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস

বীণা মজুমদার

'ভাইসাবও এবার কারেতে বুঝি বাঁচতাম না
চাউলের সের টেকা টেকা,
ডাইলের সের আটআনা
এবার কারেতে বুঝি বাঁচতাম না'

অবশ্যই উদ্ধৃতিটি কোন একজন শিল্পীর রচনা, কিন্তু একটি মন্বন্তরের এক দেশের মানসিক হতাশাকে এ সঙ্গীত রূপ দিয়েছে।

অসংখ্য মানুষের একমুখী চিন্তা এমনি করেই ধরা পড়ে কোন এক শিল্পীর চেতনায়, সুর ও কথায় তা আত্মপ্রকাশ করে, অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত হয়, বহুজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়, কালে কালে এর অবয়বে অলঙ্করণের ছাপ পড়তে পারে, কিন্তু সে অলঙ্করণ শাশ্বত কাঠামোর অপরিবর্তিত রূপের মধ্যেই থাকে। লোকসঙ্গীতের চরিত্রটি কখনও বিনষ্ট হয় না। এই অবিনশ্বরতার মধ্যেই দেশ কালের মর্মকথাটি দেশের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে আবার দেশের মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে, উৎস থেকে উৎসে প্রবাহিত হয় বিচিত্র বিভঙ্গে।

লোকের কাছে পৌছাতে এ সুর এ বাণী অমোঘ, একে চিনে নিতে জনগণের কোন রকম প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না. লোকসঙ্গীতের মহিমা এখানেই। বহতা নদীর মত তার স্রোত, ক্ষণে ক্ষণে সে বিচিত্ররূপে বইতে থাকে যখন যেমন প্রয়োজন, সে প্রয়োজনের পলি মেখে দেশের গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে এক প্রয়োজন থেকে শিল্পিত হয়ে অন্য প্রয়োজনকে সৃষ্টি করে, অনুপ্রেরণায় উৎসাহে মানুষকে উদ্দীপিত ক'রে রসসঞ্চারে মানুষের উপভোগের যোগান দেয়।

লোকসঙ্গীতের শিল্পীও তাই অবিনশ্বর, নামে নয় নামহীনতায় বহুজনের মানসে পরমাত্মীয়রূপে সে বাঁচে।

এ-সুরের মধ্যে ধরা থাকে পল্লীপ্রকৃতির অসংখ্য ছবি, এ-ছবির কোনটিই লোকবিরহিত নয়, প্রতিটি ছবির পটভূমিকায় আছে মানুষ তার আনন্দে বেদনায়, জীবনের নিঃসীম যন্ত্রণায়, অপ্রাপনীয়কে কাছে পাওয়ার অপূর্ণ

অভিলাষে। প্রতিটি মানুষের বিচিত্র ভাষা অভিজ্ঞতায় জারিত বাক্যাংশ, প্রতিদিনের শাণিত উচ্চারণভঙ্গী, সুরে সুরে আত্মপ্রকাশ করে।

পথ চলতে চলতে নানা সংগ্রহে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরে রাখা সুরে সুরে প্রাণবন্ত এমনি অসংখ্য ছবি হেমাঙ্গ বিশ্বাস তুলে এনেছেন তাঁর সংগ্রহশালায়। এর প্রাচুর্য এবং বিপুলতা এর গভীরতা দেশ তথা বিশ্বের মানুষকে আমাদের আত্মীয় করেছে। তিনি মানুষের কাছে যেতে চেয়েছেন, কঠিন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে লোক জীবনে পৌঁছাতে চেয়েছেন।

যখন তিনি শহরে বাস করেছেন তখনও লোকায়ত জীবনের মধ্যে তিনি বেঁচেছিলেন। লোককথা, লোকমানস, তার উচ্চারণভঙ্গী, ভাবনা, চিন্তা, অনাদিকাল থেকে জাত ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের অসচেতন ঘনিষ্ঠতার মধ্যে তিনি বহুবিস্তৃত দেশকে স্পর্শ করেন, এমনি করেই বাংলাদেশের একটি জেলার একটি গ্রাম থেকে তিনি আবির্ভূত হন সমগ্রদেশের বিপুল মঞ্চে—

'সুরমা উপত্যকার জালালি কইতর সুনামগঞ্জের কুড়া
হবিগঞ্জের গাঙচিল শূন্যে দিলাম ওড়া।

সংগ্রাম কঠিন থেকে কঠিনতর হয়, আর এ সংগ্রাম চলে অবিরাম, লোক-সঙ্গীতের উৎসও এই সংগ্রাম। পল্লীর মাঠে ঘাটে নদী-নালায় হাটে-বাজারে, ইমারতে আর খড়ের চালায় অনবরত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পল্লীবাসী একচক্ষু হরিণার মত দুর্লক্ষ্য মুক্তির নক্ষত্রটির দিকে তাকিয়ে আছেন, সেই প্রতীক্ষা থেকে আকাশ, নদী, মাটি, ফুল, ফসলের লাবণ্য মেখে জাত হয় সুর ও বাণী।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে করতেন তিনি তাদেরই প্রতিনিধি। "দারিদ্র্যে, অনাহারে ও অনাদরে দিনপাত করে যাঁরা সুরলোক সৃষ্টি করে গেছেন, এবং আজও করছেন, তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার আমার কতটুকু জানি না, তবে তাঁদের হয়েই এখানে দু'কথা বলার চেষ্টা করেছি।" (লোকসঙ্গীত সমীক্ষা ভূমিকা) মনে মনে তিনি তাঁদেরই একজন হয়ে অখ্যাত পল্লীর অদৃষ্ট কোণ থেকে অফুরন্ত সম্পদ দেশের মানুষের গোচরে নিয়ে আসার সাধনায় ছিলেন আত্মমগ্ন।

এসম্পর্কে দেশবিদেশের লোকসঙ্গীত শিল্পীর জীবন এবং গবেষণালব্ধ ফল তিনি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। লোকসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি, দেখেছেন অন্যান্য বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের উপলব্ধির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা। এ উপলব্ধি প্রকাশের বেদনায় আর্ত অথচ ভাষার রয়ে যায় দৈন্য, সে ভাষা তিনি পেয়ে গেলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আত্মপরিচয়ের

ভাষায়। দেখলেন লোকসঙ্গীতকে সকলের গোচরে আনতে হলে প্রথমেই চাই সেই কণ্ঠ যা আত্মপ্রকাশে সক্ষম, চাই সেই শিল্পবোধ যা শহরের মানুষকেও চিন্তা করতে শেখাবে, কৃত্রিম দৈনন্দিনতা থেকে মানুষকে নিয়ে যাবে স্বভাবের বিপুল বৈচিত্র্যে, এ বৈচিত্র্য দেশেরই আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে, দেশেরই অজ্ঞান। শিল্পীর কণ্ঠে তা রূপ পেয়েও ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। অন্য আরও সাধকদের মতই, অনুসন্ধান, আবিষ্কার আর সংগ্রহের সাধনায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এই বহুমুখী কর্মে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পল রবসনের কথায় 'I would sing nothing but the music of my people. Later when it was established as a fine folk music, I began to learn the folk music of other peoples. This has been one of the bonds that have drawn me so close to the people of the world.'

মানুষের নিকট পৌছাবার জন্য হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাধনাও ছিল একইরকম।

পল রবসন লোকসঙ্গীত গেয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আর তারপরই এ সঙ্গীত উৎকৃষ্ট লোকসঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছিল। উল্লেখযোগ্য, লোক-সঙ্গীত এমন একজন বিদগ্ধব্যক্তির করায়ত্ত হয়েও বিকৃত হলনা।

গ্রামে গোষ্ঠীজীবনের ভাবনা চিন্তা কোন একজন শিল্পীই সুরে এবং কথায় আশ্রয় দেন। শিল্পী এক্ষেত্রে তাঁর নির্মাণকুশলতার জন্যই অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক, তাকে বহুজনের মধ্যে পরিবেশন করার উপযুক্ত করে তুলতে সুরারোপ করেন, তারপর তাকে পরিবেশন করেন, এখানে প্রয়োজন হয় শিল্পীর কণ্ঠ এবং সৌন্দর্য্যচেতনা, যা বাস্তবচেতনা অথবা সত্য থেকেই উদ্ভূত। এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি একক, কিন্তু সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তাই ব্যক্তি-স্বরূপে থেকেও গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি এক। গোষ্ঠীর সকলের শিল্প চেতনা থাকা সম্ভব নয়, যে ব্যক্তির থাকে, তিনিই গোষ্ঠীর বক্তব্যকে লোকদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ে আসতে পারেন।

একক হয়েও তিনি সকলের—কারণ ভাবনা চিন্তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে বাগভঙ্গী, শব্দ ও যে উচ্চারণভঙ্গী তিনি ব্যবহার করেন তা সকলের। যা ছিল খণ্ড খণ্ড অসম্পূর্ণ সকলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত, লোকসঙ্গীত শিল্পী তাকে একসূত্রে বাঁধেন, আর এ পূর্ণতা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুজনের বিক্ষিপ্ত চিন্তা,

টুকরো কথা এক অভিনব সৃষ্টিরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সেজন্যেই গ্রামজীবনে শিল্পীর সহযোগী সবাই কিন্তু স্রষ্টা অবশ্যই একজন। রসোত্তীর্ণ হয়ে তা আর অপরিণতরূপে থাকে না, সর্বজনসমক্ষে পরিবেশনের উপযুক্ত করে শিল্পী তাকে অন্য জগতের বস্তু করে তুলেন। এই পূর্ণায়ত রূপটিকে আবার সকলের গোচর করে দেওয়াও শিল্পীরই কাজ, তিনি তখন হয়ে উঠেন সঙ্গীতশিল্পী। গায়ক এবং গানরচয়িতা এক্ষেত্রে একজনও হতে পারে আবার দুইজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিও হতে পারে।

It is the people who creates music, we only arrange it.

সঙ্গীতরচনায়, সঙ্গীতসংগ্রহে এবং সঙ্গীতপরিবেশনে এই ত্রিধারায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জীবন সমর্পিত ছিল।

পল্লীজীবন থেকে দূরে এসে শহরজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও কোন শিল্পী লোকসঙ্গীত রচনায় সক্ষম হন কি না এপ্রসঙ্গ নিয়ে ১৯৬৯ সালে পরলোকগত জসীমউদ্দীনের সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিস্তারিত আলোচনা হয়।

তাঁরা এবিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে ব্যক্তিরচিত পল্লীসঙ্গীত, পল্লীর বাগ্‌ধারা, প্রকাশভঙ্গী এবং পল্লীবাসীর সঙ্গে রচয়িতার একাত্মতা থাকলে, বিশেষ ব্যক্তি-রচিত গান হয়েও তা ব্যক্তিচেতনা থেকে মুক্ত হয়ে লোকসঙ্গীতের ধারার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে সক্ষম হয়। একসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পল্লী-সঙ্গীত তার পরিণত শিল্পরূপ লাভ করে বিশেষ ব্যক্তির হাতেই। যে ব্যক্তি আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা ভাষা আয়ত্তে থাকলেও লোকজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি তিনি শহরবাসী হয়েও দেশের মর্মস্থলকে জানেন বলে তাঁর পক্ষে লোকসঙ্গীত রচনা অবশ্যই সম্ভব। জসীমউদ্দীন রচিত অনেক গানই লোকসঙ্গীতের মূলধারার সঙ্গে মিশে গেছে।

জসীমউদ্দীনের একটি গানের কথা 'আবছা মেঘে হাতছানি দেয় কে জানি কোন সয়া।' হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন এই 'আবছা মেঘ' শব্দটি পল্লী মনের শব্দ নয়। গানের শব্দ সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচয় ছিল নিবিড়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা 'নিধুয়া পাথার' 'লিলুয়া বাতাস' প্রভৃতি শব্দ জানে কিনা।

"আঞ্চলিক ভাষায় যে শব্দ সম্ভার আছে যা শ্রমপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, তার প্রকাশভঙ্গী এবং ব্যঞ্জনায় যৌথজীবনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা বিদগ্ধ ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না।" (লোকসঙ্গীত সমীক্ষা পৃঃ ৯৫)

লোকসঙ্গীত যুগ-প্রয়োজনে যখন রূপান্তরিত হয়, তখনও তার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয় না।

এমন কয়েকটি দেহতত্ত্বের গান জসীমউদ্দীন প্রেমের গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। রেকর্ডের প্রয়োজনে এর মধ্যে বিখ্যাত 'নিশীথে যাইও ফুল বনে' এবং 'ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি', 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি'। মূলে ছিল'—

'ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি / তুমি এই ঘাটে লাগাইয়ারে নাও / নিগম কথা কইয়া যাও শুনি।

কাওয়াতো কাণ্ডারী নায়ের শগুন ভাণ্ডারী / বনের শৃগাল বলে আমি এই নৌকার বেপারী / মাঝি পাগল মাল্লা পাগল / পাগল না'র বেপারী / চাইর পাগলে যুক্তি কইরা ডুবায় সাধের তরী।'

গানের কথা চমৎকার সন্দেহ নেই কিন্তু সন্ধ্যা ভাষায় দেহতত্ত্বের এই গান সহজবোধ্য নয়। এভাবে রেকর্ড হলে হয়ত কেউ এ গান নিত না, তাই রূপান্তরিত করতে হয়েছিল। রূপান্তরিত গান পল্লীসঙ্গীত রূপে পরিচিত হয়ে যেমন শহরে গৃহীত হয়েছিল, গ্রামবাসীও এ গান অনাদর করেনি। গানগুলি পল্লীসঙ্গীতের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ব্যক্তি-রচিত পল্লীসঙ্গীতের উদাহরণ প্রচুর আছে। যেমন—

'ডেইবে রাধারমণ বলে' 'মনমোহন বলে' অথবা 'পাগল জালালে কয়'। এরা সবাই অবশ্য পল্লীবাসী। পল্লীর ধ্যানধারণা বহুযুগ সঞ্চিত বিশ্বাস ইত্যাদি এদের ধমনীতে নিত্য প্রবহমান।

কেবল প্রাচীন সংস্কার, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতাই লোকসঙ্গীতের বিষয় নয়। যদি তাই হত লোকসঙ্গীত চিরায়ত হত না।

জনজীবনের কঠোর জীবিকার সংগ্রাম, শোষণ নিপীড়নের জ্বলন্ত ইতিহাস লোকসঙ্গীতের প্রবাহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এক্ষেত্রে লোকসঙ্গীত আর গণসঙ্গীত বলে দুইশ্রেণীতে এদের ভাগ করা দুষ্কর। এ প্রশ্নটি নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ভাবনা চিন্তা করেছেন গভীরভাবে।

নিরক্ষর চাষী প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নাও থাকতে পারে, হয়ত তারা আউল বাউল নামেই খ্যাত কিন্তু তারাও জনজীবনের ঢেউএ ক্ষতবিক্ষত হয়ে অজ্ঞাতসারেই সংগ্রামের সামিল হয়ে যান, তখনই জনগণের অন্তরের কথা তাঁদের গানে রূপ পায়।

এমনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর—'লোকসঙ্গীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা' প্রবন্ধে। কৃষক আন্দোলনে 'নেত্রকোনায়' লক্ষ

কৃষকের সমাবেশে আমাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবাহুত রসিদউদ্দীন জামসেদউদ্দীন প্রমুখ আউলিয়া গায়করা আমাদের সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ময়মনসিংহের 'ব্যালাড' গাইবার বিশেষ ঢঙে যখন গান ধরলেন—

"আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কাহারে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলোরে
চুরাই বাজারে।
ভাইরে ভাই তেরশ পঞ্চাশের কথা মনে কি কেউর পড়েগো
মনে কি কেউর পড়ে
ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল
মায়ে বিক্রী করেরে
চুরাই বাজারে।"

তখন বুঝতে পারি আউলিয়াদের 'আবহায়াতের' ত্রিবেণী সঙ্গমের সাধনা থেকে বিক্ষুব্ধ গণসমুদ্রসঙ্গমে টেনে এনেছে চোরাইবাজার ও দুর্ভিক্ষ।"

যুদ্ধকালে তেমনি গান—

'সজনী গুয়া গাছে ট্যাকসো লাগিলনি
বাটার উপর পইল ঠাডা
গালভরি পান খাইতানি।
... ...
ট্যাকসো দিও বিয়া বইলে ট্যাকসো দিয়া পুয়া অইলে
মইলে পরে ট্যাকসো দিয়া চিতার আগুনে জলবায়নি।"

এসকল প্রয়াস সবই অসংগঠিত, লোকসংস্কৃতি থেকে সংগীত নিয়ে ভাবনা চিন্তার যে বিপুল ক্ষেত্র পড়ে আছে তাকে গোচরে এনে গণসমাজে এক গভীর আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মর্মমূলে পৌছাতে গেলে লোকসঙ্গীতের পথই রাজপথ—হেমাঙ্গ বিশ্বাস একথা বিশ্বাস করতেন। সেজন্যেই পল রবসনের মতো তিনিও কেবল নিজের জেলা নিজের রাজ্য নয়, প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের লোকসঙ্গীতের গভীরেও তিনি প্রবেশ করেছিলেন। দেশের আনাচে কানাচে এমনকি বিভিন্ন উপজাতির গান সংগ্রহে আর পরিবেশনে তাঁর গভীর অধ্যবসায়ের মূলে এই গণচেতনাই কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিরিশ-এর যুগে জসীমউদ্দীন গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা লোকসাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীত নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও অনুধ্যানে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাসও তারই সঙ্গে সমতা রেখে লোকসংস্কৃতি নিয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে শহরবাসী আর অসংখ্য পল্লীবাসীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কেটে গিয়ে মিলনের সেতু গড়ে উঠবে, গান সংগ্রহ আর গাওয়ার মধ্যে এ চিন্তাকেই তিনি রূপ দিতে চাইতেন। এজন্যেই তিনি যেমন দেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন, গেয়েছেন, তেমনি পৃথিবীর বিখ্যাত লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত অনুবাদ করে গেয়ে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

অনূদিত গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন হেনরীর গান—তাঁর সেই কণ্ঠে অনেকেই শুনেছেন।

তাঁর দীর্ঘ জীবনে জনজীবনে অনেক ধ্বস নামার তিনি সাক্ষী ছিলেন। সেসকল ভাঙ্গাগড়ার ছবি তাঁর রচিত লোকসঙ্গীতে রচিত আছে। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক দিকটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তার মর্মস্থলে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছিলেন পুরোধা। অসমীয়া ভাষায়ও তিনি ছিলেন দক্ষ। নিরলস সাধনায় অসমীয়া লোকসঙ্গীতও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। অসমীয়া লোকসঙ্গীতের বিচার বিশ্লেষণ এবং মর্ম স্পর্শ করে তিনি লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলার সীমা উত্তীর্ণ হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পৌঁছেছিলেন, আর তারও পরে, পৌঁছেছিলেন বিশ্বের লোকসঙ্গীতের মর্মমূলে।

এই ধ্যান চিন্তা ভাবনা এবং অবশেষে সক্রিয় শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে কোন উৎস অবিরল ক্রিয়াশীল ছিল? শিল্পীকে জানতে হলে তার উৎসমূলে পৌঁছাতে হবে, তার ইতিহাসকে জানতে হবে। উৎস থেকে আমরা অনবরত দূরে সরে যাই বলেই আপন আপন সীমাবদ্ধ জগতে আমরা বাঁচি, বিচ্ছিন্নতা আমাদের পীড়িত করে। আমাদের সৃষ্টি ও মননে সার্বজনীন স্পর্শ থাকে না, বিচ্ছিন্নতা জাত নিঃসঙ্গতা আমাদের ভীত করে, প্রতিরোধ সৃষ্টি করে আর সে শিল্প ও সৃষ্টি মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে না।

লোকসঙ্গীত সম্পর্কে গভীর ভালবাসা এবং পরে তাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্র বাল্যকাল থেকেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মনে তৈরী হচ্ছিল।

এবং শিল্পীর অজ্ঞাতসারেই তার সংগ্রহকর্ম চলছিল। তাঁরই কথায় এর স্বীকৃতি মেলে—

"আমাদের বাড়ির পাশে ছেলেহারা এক কিষাণী মাকে তাঁর ছেলে উপেনের জন্য কাঁদতে শুনতাম।...তিনি যখন কাঁদতেন তা থেকে একটা সুর বেরোত—অর্থাৎ সুর ধরেই যেন তিনি কাঁদতেন..."ও আমার বাবা ধনরে ডাকিয়া"—...আজ যখন সেই কান্নার সুরটি মনে আসে তখন মনে হয় ভাটিয়ালীর একটি ক্ষীণ ভ্রূণের কান্না আমার কানে ভেসে আসছে আজও।" ..."নবজাত শিশুর মঙ্গলকামনায় রূপসী ঠাকুরাণীর কাছে গান গেয়ে গেয়ে মেয়েরা আসত :— "রূপসীর দরশনে যাইবারনিগো সই"। অনেকদিন পর আসামের বিয়নামে মেয়েরা যখন গাইছেন—

"প্রথম প্রহর রাত্রি ফুলি আছে চম্পা
উঠা রাধা গুণবতী তুলিবন্ধা খোঁপা।"

এই গানের সঙ্গে সিলেটের গ্রামাঞ্চলের রূপসী গানের সাদৃশ্যে তাঁর কাছে উপলব্ধির এক নূতন জগত আবিষ্কৃত হয়।

বিশেষ অঞ্চলের গায়কী আর বিশেষ বিশেষ আবেগের প্রকাশে লোক-সঙ্গীত সুরের কাঠামোর দিক থেকে প্রায় সর্বত্রই এক। সেজন্যই শোকের গান, আনন্দের গান, এবং সর্বোপরি ঘুমপাড়ানি গানের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা প্রায় বিশ্বের লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এক। সেদিক থেকে লোকসঙ্গীত দেশ-কালের সীমা অতি সহজে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

বাল্যকালে শোনা এসকল সুর তাঁর মনে অক্ষয় হয়েছিল। অপরিশীলিত এসকল গানের মধ্যেই পরে তিনি ভাটিয়ালির উক্তিটি আবিষ্কার করেন।

ভাওয়ালী পাহাড়ে তিনি যখন স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলেন গাড়োয়ালী মেয়েরা গান গেয়ে ঘাস কাটত। একই সুরে তারা দিনের পর দিন গান গেয়ে যেত, অথচ পুরনো একঘেয়ে মনে হত না।

সেখানেই পরে এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুর কাছে জানতে পারলেন এই উপেক্ষিত মেয়েলী গান দুর্গা রাগের ঘাটে বাঁধা। 'people creates music' এই চিরায়ত বাক্যটির তাৎপর্য তাঁর কাছে নূতন করে ধরা পড়ল।

লোকসঙ্গীতের এই বিশেষ স্টাইল আঞ্চলিক জীবনধারা থেকে উদ্ভূত। এমনি করেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিচিত্র রাগরাগিণীর সৃষ্টি হচ্ছে—সুশিক্ষিত পরিশীলিত শিল্পী তাকে পরিণত রূপ দেন।

এজন্যই আসাম, বাংলা, বিহার-সহ ভারতের প্রায় সমগ্র অঞ্চলের

সহস্রমুখী জীবনধারা থেকে নিত্য উৎসারিত অসংখ্য গান সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস. দেখেছেন সুর আর কথার কি আশ্চর্য শক্তি।

ত্রিশের দশকে এই উপেক্ষিত অবহেলিত ঝর্ণাধারার মতো দুর্নিবার গতিতে উৎসারিত মেয়েলি গানের সুরকে আশ্রয় করে জ্যোতিপ্রসাদ আসামের আধুনিক গানে যুগান্তর এনেছিলেন।

লোকসঙ্গীতের এই সীমাহীন শক্তিকে সর্বজনগম্য করাই ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাধনা। অজস্র গান সংগ্রহ আর পরিবেশনের মাধ্যমে এসকল গানের বাগ্‌ধারা, বাক্যাংশ, সিদ্ধউক্তি, শব্দ এবং সুরে তার যে সীমাহীন অধিকার জন্মে তা থেকেই তিনি রচনা করেন অজস্র গান—কোন কোনটি খাঁটি লোকসঙ্গীত হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে আর কোনটি গণসঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

তাঁর 'মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা' গানটিতে তিনি তিনরকম ভাটিয়ালীর সুর সংযোজন করেছেন। তিনি নিজেই জসীমউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনায় বলেছেন, "আমি এটাতে তিনরকম ভাটিয়ালীর সুর লাগিয়েছি।" এই তিনরকম ভাটিয়ালীর উদাহরণ তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা'তে দিয়েছেন। এগানের ভাষাও পল্লীমনের ভাষা।

"পানিত্‌ কান্দে পানিখাউরী
শুকনাত্‌ কান্দে টিয়া
আমার আভাগ্যা অন্তর কান্দে
পোড়া দেশের লাগিয়ারে।"

'পদ্মা কও কও আমারে' গানটির মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মিলিত জীবনের চিত্র আছে।

'পদ্মারে…হোসেন মাঝি গুন টানিত
পরান মাঝি হাল ধরিত
ভাটিয়ালী সুর নাচিত ঢেউএর নুপূরে
ও আজ ভেলায় ভাসে বেহুলা বাংলারে।'

পল্লীসুরকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে তিনি যে গণসঙ্গীত রচনা করেছেন, তন্মধ্যে 'ঢাকার ডাক' 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য' অবিস্মরণীয়। 'ঢাকার ডাক' গানটিকে তিনি লোকসঙ্গীতই মনে করতেন। জসীমউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনায় বলেছিলেন "এটা শুনলে আপনার একে লোকসঙ্গীত বলতে

আপত্তি হবে না।…লৌকিক সুরে লৌকিক ঢঙে ব্যালাড…আমার মনে হয় আমিই শুধু এটা লিখেছি।"

(জসীমউদ্দীন সাক্ষাৎকার—৯।৭।৬৯)।

সমসাময়িক কাহিনী নিয়ে লৌকিক সুরে ব্যালাড অবশ্যই এসময়ে আর কেউ রচনা করেননি—কিন্তু সমসাময়িক কাহিনী নিয়ে লোকসঙ্গীত পল্লী-শিল্পীরা অবশ্যই রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।"

'মাউণ্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্যে' তিনি বাংলার লোকসঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য প্রায় সবকটা সুরই লাগিয়েছিলেন।

কেবল লোককথা এবং লোকশব্দ নয়, ভাষা ও শব্দের উপর হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যে অতুলনীয় দখল ছিল 'শঙ্খচিলের গান' তার উদাহরণ। একদিকে যেমন তাঁর চেতনা সুদূরপ্রসারী, তেমনি তাকে প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্য গানরচয়িতার মর্যাদা দিয়েছিল এর মূলে তাঁর কবিত্বশক্তিও সক্রিয় ছিল। তিনি যে কবিতা রচনা কালেও উল্লেখযোগ্য কবি হতে পারতেন, তার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্ত প্রহরী' তার উদাহরণ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিণত শিল্পজীবন গণ আন্দোলনেরই ফসল। এবিষয়ে তিনি নিজেই বলেন, "চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই একজন সংগঠক হিসাবে তখন এই শ্রমজীবী মানুষ ও তার সৃষ্ট সুর সম্পদকে আরও গভীরভাবে জানবার সুযোগ ঘটল। সুরমা উপত্যকায় পার্টির নেতৃত্বে ও আমার পরিচালনায় নির্মলেন্দু চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী, গোপাল নন্দী, হেমন্ত দাস প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে যে স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে আনতেন। গ্রামের লোকশিল্পীদের অনুসরণ করে নিজেও গীতিকার হওয়ার চেষ্টা করলাম।" এসময় ঐ অঞ্চলে পার্টিনেতৃত্বে ছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এই আন্দোলন এবং সংগঠনের কাজে তাঁর সবরকম সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতার বিষয় অনেকসময়ই হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে বলতে শুনেছি।

পরবর্তীকালে এই গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং বিজন ভট্টাচার্যকে দেখেছি, মানুষকে ভালবেসে, মানুষের ভালবাসা লাভই তাদের প্রধান সম্পদ, রাজনীতি তাঁদের মানুষের সন্নিহিত করেছে, দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়নি।

আর মানুষের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে দিয়ে তাঁরা দেশকে

জেনেছেন, দেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই তাঁদের শিল্পসংস্কৃতি এবং গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরও সম্পদের উৎস ছিল এই মানুষের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রথম গানের বই 'বিষাণ'। এ গ্রন্থের অনেক গানই তখন লোকমুখে শোনা যেত। শ্রীহট্টের রাগপ্রধান সঙ্গীতের পথিকৃৎ কবিয়াল ফণী দাস তাঁর নিজস্ব মুদ্রনালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন, এই গ্রন্থ বিক্রয় করে তখন একশত টাকা পেয়েছিলেন।

১৯৬১ সালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্ত প্রহরী' প্রকাশিত হয়। এর আগে 'জনযুদ্ধের গান'ও প্রকাশিত হয়। গানের বই 'শঙ্খচিলের গান' স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হয়। এছাড়া আছে 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান' চীন থেকে প্রথমবার ফিরে এসে রচনা করেন 'চীন দেখে এলাম', দ্বিতীয়বার চীনে গিয়ে লেখেন 'চীন থেকে ফিরে'।

অসমীয়া ভাষায় লিখেছেন 'আকৌ চীন চাহি আঁহিলো', কাব্যগ্রন্থ 'কুলকুরার চোতাল' এবং ১৯৮৩তে 'জীয়নশিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ'। ইংরেজীতে লিখেছেন "Witnessing China with my own eyes." মোহন মুর্মু ছদ্মনামে লিখেছেন 'অনীক' পত্রিকায়, অনষ্টুপে লিখেছেন আত্মজীবনী।

'এক্ষণ', 'পরিচয়' 'প্রস্তুতিপর্ব' 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় তাঁর নানা রচনা ছড়িয়ে আছে। 'কল্লোল, 'তীর' এবং 'লাল লণ্ঠন' নাটকে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

বাল্যকাল থেকেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস কবিতা ও গান রচনা করতেন। প্রথম বয়সে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে ২০ বৎসর বয়সে কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ সালে তিনি টি.বিতে আক্রান্ত হন এবং তাঁর একটি লাংস বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। একটিমাত্র লাংস নিয়ে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, এসময়ই তিনি মার্কসবাদে অনুরক্ত হন। পরে শ্রীহট্ট অঞ্চলে I. P. T. A. আন্দোলনে পার্টির সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিচালনা করেন। ১৯৫১ সালে পুনরায় কারারুদ্ধ হয়ে অসুস্থতার জন্য মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি চীনে যান, চীন থেকে ফিরে এসে ১৯৬০ সালে রুশ কনসুলেটে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে চীনের সরকারি আতিথ্য গ্রহণ করে কনসুলেটের চাকরী পরিত্যাগ করেন।

১৯৮৫ সালে পুনরায় I. P. T. A.-এ সর্বভারতীয় কনফারেন্সে যোগদান

করেন। একই সঙ্গে চলেছে তাঁর সঙ্গীত সাধনা, আর সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণা। বাড়ীতে গান শেখাতেন—নিজের গানের দল 'মাস সিঙ্গার্স' নিয়ে শহরে ও গ্রামে গ্রামান্তরে গান গেয়েছেন অজস্র। মাত্র তিন বৎসর আগে সলিল চৌধুরী তাঁর গানের ক্যাসেট প্রকাশ করেন। পরে আর একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়।

লোকসঙ্গীত অনুশীলনে এবং গবেষণায় সাম্প্রতিককালে তিনিই পুরোধা, এবং স্বক্ষেত্রে অনন্য।

'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম' গ্রন্থে ষোলটি অধ্যায়ে তিনি লোকসঙ্গীতের আধুনিক সমস্যা, লোকসঙ্গীতের সংকটের স্বরূপ, সঙ্গীত ও সংঘাত, লোকসঙ্গীতের উপমা, উপভাষা ও উচ্চারণ, তার রাগরূপ, গীতরীতি, গণনাট্য আন্দোলন এবং লোকসঙ্গীত, শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের সুর বিচার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

লোকসঙ্গীতকে স্বরূপে অধিষ্ঠিত রাখার সাধনায় তিনি ছিলেন অতন্দ্র-প্রহরী। তাঁর এই গ্রন্থে তাঁর গবেষণার যে পরিচয় আছে, আগামী দিনে লোকসঙ্গীত অনুসন্ধিৎসু মানুষের নিকট এ গ্রন্থটি নূতন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক দিকটি নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মত আর কেউ এখনও গবেষণা করেননি। গবেষণার এই বিশেষক্ষেত্রে তিনি একক, অনন্য।

'লোকসঙ্গীত' একটি দেশের কতবড় সম্পদের উৎস এ বিষয়টি নিজে উপলব্ধি করে সকলের মধ্যে সে উপলব্ধি প্রসারিত করে দেবার প্রচেষ্টা আর কেউ করেননি। এ জন্যই তিনি সঙ্গীত রচয়িতা, সংগ্রাহক গবেষক, এবং অতুলনীয় সঙ্গীতশিল্পী রূপে জনগণের মধ্যে চিরদিন বেঁচে থাকেন।

রাজনৈতিক মঞ্চে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ে কঠিন, আপন বিশ্বাসে অবিচল। এ জন্য অনেক সময় তাঁকে নিঃসঙ্গ থাকতে হয়েছে তবুও নিজের বিশ্বাসের ভূমি থেকে তিনি সরে যাননি।

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও চিন্তা ভাবনা এবং গবেষণায় তিনি আপন প্রত্যয়ে দৃঢ় থেকে লোকসঙ্গীতের বাজারি অপব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় সোচ্চার ছিলেন। [illegible] লোকসঙ্গীতের মধ্যেই জনজীবনের তরঙ্গ আছড়ে পড়ে, সুতরাং এ সঙ্গীতকে তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করলে দেশের আত্মাকে চেনা যায় না। দে[illegible]কেও স্বরূপে চিনতে হলে এই লোকসঙ্গীতই যথার্থই দর্পণ, সুতরাং এর যথার্থ রূ[illegible]টিকে অবিকৃত রাখাই একটি দেশের আদর্শ হওয়া উচিত।

"আদিম ফসলকামনা, সৃষ্টিকামনা থেকে এককগীতে বঞ্চনা বা বেদনা বা আনন্দবোধ—এসব সমাজচেতনা-বিচ্ছিন্ন নয়। যখন তা 'তদগতভাবে ভাবিত' তখনি সে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং লোকসঙ্গীত হিসাবে স্বধর্মভ্রষ্ট। সমাজ-চেতনা যেখানে শ্রেণীচেতনায় উন্নীত সেখানেই লোকসঙ্গীতের নতুন ধারা প্রভাবিত।" ('গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসঙ্গীত'-লোকসঙ্গীত সমীক্ষা পৃঃ ১৩৭)

এই নতুন ধারাকে লালন করাই ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাধনা। এ সাধনায় যেখানেই কায়েমী স্বার্থে আঘাত লেগেছে, প্রতিরোধ তীব্র হয়েছে। এই প্রতিরোধের মুখোমুখি থেকে একক সংগ্রামী জীবনযাপন করে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন আর এই ক্ষত চিহ্নই তাঁর অলঙ্কার।

গণ সংস্কৃতি আন্দোলন ঃ অতীত ও বর্তমান

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

[প্রয়াত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এই সাক্ষাৎকারটি ১৬.৫.৮১ তারিখে নেওয়া। ঐ সময়ে ৪০-এর দশকে যাঁরা প্রগতি লেখক সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলনের শুরু থেকে জড়িত তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে সৌরি ঘটক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, ৪০-এর দশকে গণনাট্য ও প্রগতি লেখক আন্দোলন যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিল তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল কেন? কেন দিন দিন তরুণ প্রজন্মের কাছে এর আবেদন গ্রাহ্যতা কমে যাচ্ছে?

আলোচনায় হেমাঙ্গদা মন খুলে অনেক কথা বলেছেন। তাঁর সব বক্তব্য সম্পর্কে সকলকেই যে একমত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সেকালের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক, একালের অনেক পাঠক-পাঠিকা এই বক্তব্যের অনেক কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। প্রয়াত শিল্পী খোলা মনে অনেক কিছু বলেছেন যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শিল্পভাবনা, ক্ষোভ, ব্যথা, আশা, আনন্দ সব কিছু। সেই দিক থেকে এই বক্তব্য হল গণসংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কে হেমাঙ্গদার একটি সার্বিক মূল্যায়ণ।

একালে যাঁরা এই ধারার সাধক তাঁদের এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। তাই এটি প্রকাশ করা হচ্ছে। সম্পাদক, পরিচয়]

আমার মতে এই আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার কারণ সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক (Total political cause)।

তাছাড়া এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল পাতিবুর্জোয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে।

এই ভাঙার কারণ সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে আলোচনা করা হয়। যেমন কেউ বলেন পি, সি, যোশির সংস্কারবাদ আই, পি, টি, এ আন্দোলন শেষ করল।

আবার কেউ বলেন রণদিভের সংকীর্ণতাবাদ একে শেষ করল।

এর কোনটাই ঠিক নয় বা এভাবে বলা উচিত নয়।

মুলুকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জাহির, হীরেন মুখার্জি প্রমুখেরা বিলাতে বসে প্ল্যান করলেন বলে গণনাট্য আন্দোলন হল, অথবা Y. C. I. হল বলে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠল এভাবে বলা হল ইতিহাসকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এটা ঠিক, কিন্তু তার প্রভাবে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠল এটাই একমাত্র সত্য নয়। আসলে তখন সমাজে বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এ ধরণের গান লেখার। আমি ১৯৪০-৪১ সালে গান লিখেছি কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে।

আমার বাবা জমিদার ছিলেন। জমিদারের বাড়ি থেকে জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা চলবে না বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

সেই সময় আমায় বাঁচালেন সিলেটের কিছু পার্টি সভ্য। তাঁরা অনুভব করছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনও কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য গড়ে তোলা দরকার। তাঁরা এই কাজে আমাকে নিয়োগ করলেন।

আমাদের ওখানে তখন 'বলাকা' বলে একটা পত্রিকা বের হত। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখদের সঙ্গে এই পত্রিকার যোগাযোগ ছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, চিত্ত দাস প্রমুখের সংযোগ ছিল। এই পত্রিকা চালিয়ে যাওয়ার পেছনে অবদান ছিল মফঃস্বলের কমরেডদের।

সে-সময় 'অরণি' পত্রিকায় স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'অনামী' ছদ্মনামে লিখতেন। সে লেখাও আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সে-সময় গারোদি-আঁরাগ বিতর্ক নিয়ে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। এর একদিকে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল দত্ত প্রমুখেরা। তাঁদের বক্তব্য—সাহিত্যে পার্টি লাইন থাকা উচিত নয়।

অন্যদিকে 'অগ্রণী' গ্রুপ। অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত প্রমুখরা এর বিরোধিতা করতেন।

চীনের ভাষায় প্রত্যেক দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে Two line struggle থাকা দরকার। তবে এটা অবশ্যই হবে non-antagonistic contradiction. আমরা ডায়লেকটিকস্‌কে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গ্রহণ করিনি। আমরা বলতাম এরা reformist, ওরা secterian, এসব শব্দ অচল। আমাদের কাজ হল সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গণতান্ত্রিক আর্ট ও লিটারেচার হিশেবে গড়ে তোলা।

আরও ভেঙে বললে, আমাদের প্রধান কাজ হল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে উত্তরণ। আমাদের সমাজে ও জনমানসে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব যে কত গভীর-তার প্রমাণ হল, এখনও চলছে জাত-

পাতের লড়াই, ধর্মীয় সংঘাত, হরিজনকে পুড়িয়ে মারা প্রভৃতি ঘটনা। এই সমস্ত সামন্তবাদী চিন্তা এবং ধ্যানধারণা আমাদের ভেতর লুকিয়ে থাকে।

আমরা Political Economics-এর চেয়ে class srruggle ভাল বুঝি। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বটা খুব কম বুঝি। এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তখনও আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না, এখনও নেই।

ম্যাক্সিম গোর্কি ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত রাইটার্স কংগ্রেসে যে ভাষণ দেন সেখানে তিনি সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম ও রেভলিউশনারি রোমান্টি-লিজমের কথা বলেন। সে যুগে আমাদের মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল, আমাদের মত এই পশ্চাৎপদ দেশে সোশ্যালিজম না হলে সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম কি করে হবে?

এইখানে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে গোর্কি 'মাদার' লিখলেন কি করে? তখন তো রাশিয়ায় বিপ্লব হয় নি। সাহিত্যে সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজমের এটাই তো বড় প্রমাণ। আমরা এদেশে শুধু গণতান্ত্রিক রিয়ালিজমের কথা বলব না। গোর্কির ভাষায় বলব বেশির ভাগ লেখা হল critical realisim. অনাচার, দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে সব গল্প সেগুলি হল critical realism।

কোন আন্দোলনকে সামনে রেখে লিখলে সে লেখা হয় সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম। সে লেখা কি আমরা লিখেছি? আমরা কেন ক্ষেতমজুরদের হিরো করে নাটক করলাম না? তেভাগার লড়াই করে যারা প্রাণ দিল তাদের আদর্শ ও স্বপ্ন আমরা কিভাবে ফুটিয়ে তুলব সে নিয়ে ভেবেছি?

কেন এ কাজ হয় নি? কারণ বরাবর সংস্কৃতি আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব রয়ে গেল মধ্যবিত্তের হাতে।

।

অতীতের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় আমাদের প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে পি, সি, যোশির অবদান অসামান্য। পার্টির সেক্রেটারি হয়ে তিনি সাংস্কৃতিক সমাবেশ গড়ার দিকে নজর দিলেন। আর যে কাজটা তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এবং সুন্দরভাবে করেছিলেন। পার্টিতে এ রকম সেক্রেটারি আর কখনও আসেন নি। তিনি যোগাযোগ করলেন উদয়শঙ্কর, শান্তি বর্ধন, রবিশঙ্করের সঙ্গে। বোম্বের আঁধেরিতে বাগানবাড়ি ভাড়া করলেন। পার্টি সার্কুলার দিয়ে আর্টিষ্ট জোগাড় করলেন।

কাদের তিনি একত্রিত করলেন? একদিকে রবিশঙ্করের মত শিল্পী, প্রীতির মত গায়িকা, যাঁর ছিল golden voice, আবার দশরথলালের মত ট্রাম শ্রমিক। আমি যে সে সময় সিলেটে গান করি সেটা যোশি খবর রাখতেন। তিনি ওখানকার পার্টি সেক্রেটারিকে আমায় বোম্বে পাঠাতে খবর দেন। আমি একটু ভীতু ও অসুস্থ বলে তখন যাই নি। কিন্তু যোশির এই ডাকে আমি যে কতখানি inspired হয়েছিলাম কি বলব? তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক আর্টিস্টের খবর রাখতেন। এ গুণটা মুজফ্ফর আহমেদেরও ছিল।

আমি বোম্বে হেড কোয়ার্টার্সে গেছি ১৯৪৬ সালে। তখন ওখানে ছিলেন নিরঞ্জন সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, সুনীল জানা প্রমুখ। আমি গেছি শুনে যোশি ডেকে পাঠালেন। বললেন—'কি গান গাও একটা গেয়ে শোনাও।'

আমি প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে বাজে গেয়েছিলাম।

১৯৪৭ সালে আমি অসুস্থ হই। খবর পেয়ে যোশি সে সময় আমাদের পার্টির সেক্রেটারি বারীন দত্তকে (পরে আব্দুল সামাদ ছদ্মনামে বাংলাদেশ পার্টির সম্পাদক হন) টেলিগ্রাম করলেন—'Sent C. C. will take care of him'.

আমি গেলে যোশি বললেন—"ও ভরদ্বাজের সঙ্গে থাকবে।" এই যে concern for the culturist, এটাই হল সব কথার বড় কথা।

তখন আমাদের গোঁড়ামি ছিল—ফিল্মে যাব না। যোশি এটা ভাঙলেন। এর প্রথম লগ্নি প্রায় এক লাখ টাকায় পার্টি ফাণ্ড থেকে খাজা আহমেদ আব্বাসকে দিয়ে তৈরি করালেন 'ধরতি কে লাল' অর্থাৎ 'Children of the soil'। এতে বলরাজ সাহানির বোধ হয় দশহাজার টাকা ছিল। এতে এখান থেকে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, আসামের উষা দত্ত এবং বলরাজ ও দময়ন্তী সাহানি অভিনয় করলেন। গণনাট্য কর্মীদের এটাই প্রথম ফিল্ম। যোশি না থাকলে এটা হতো না।

মণিপুরের কমিউনিস্ট নেতা ইরাবত সিং ছিলেন একজন ভাল শিল্পী। যোশি তাঁকেও টেলিগ্রাম করে বোম্বে সেন্ট্রাল স্কোয়াডে নিয়ে যান।

প্রথম পার্টি কংগ্রেসে যে 'গণনাট্য সংঘের' জন্ম হয় তারও ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছিলেন যোশি।

পরে আমরা তাঁকে শোধনবাদী বলি। তাঁর অবদানকে নস্যাৎ করে দিই।

আবার যোশির ভুলও ছিল। যেমন তিনি রবিশঙ্কর প্রভৃতি গুরুস্থানীয় লোকদের ডেকে এনে দরবারী সুরকে টানতে চাইলেন। এটা একটা দিক। কিন্তু তিনি এদের re-moulding-এর ব্যবস্থা করলেন না। চীনে বিপ্লবের সময় চিয়াং-কাই-শেকের এলাকা থেকে দলে দলে বুদ্ধিজীবীরা ইয়েনেন গিয়ে হাজির হতেন। মাও-সে-তুং তাঁদের re-moulding-এর ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমাদের লেখক শিল্পীরা সব জায়গায় শ্রেণী সংগ্রাম দেখে, শুধু কালচারে দেখে না। এদের জন্যই মাও-সে-তুং লিখেছিলেন 'For whom'—কাদের জন্য লিখছি ?'

শ্রমিক-কৃষক নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে তাদের কাছে যেতেই হবে। কিন্তু যোশির নেতৃত্বে এ কাজটা হল না। আঁধেরী হয়ে উঠল যেন একটা আশ্রম। রবিশঙ্কর, শান্তি বর্ধনরা কিছুদিন পরেই চলে গেলেন। শুধু পড়ে রইল তাঁর বড় তানপুরাটা।

বিনয় রায় একদিন আমায় বলেছিল, আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে রবিশঙ্করদের একটা অনীহা রয়েছে। এদের Ideologically remoulding করা দরকার। বিনয়ের স্পর্ধা!

সে একদিন আমায় যোশির কাছে নিয়ে গেল। যোশিকে বলল—"আমাদের এইসব সমস্যা নিয়ে পি বি-তে আলোচনা হোক।"

যোশি তার জবাবে বললেন—"learn at their feat. They are your P. B." পি·বি কি করবে ?

কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো কি সেণ্ট্রাল কমিটি কোনদিন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিকদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করেছে ?

কালচারাল ফ্রন্টে আমরা বরাবর আদর্শগত বিরোধ ধামাচাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। তারাশঙ্করবাবু প্রভৃতি লেখকদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহনশীলতার প্রশ্রয় দিয়েছি। এ সব নিয়ে কোনদিন আলোচনা হয় নি।

কালচারাল ফ্রন্টে বরাবর class colaboration-এর লাইন dominate করেছে।

আবার যাঁরা একে class outlook বলে দেখতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা সংকীর্ণতাবাদের দোষে দুষ্ট। তার প্রমাণ, ভবানীবাবুর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য। তখন ভবানীবাবুর মাথায় ছিল সব কিছুই Telengana way. 'রবীন্দ্র গুপ্ত' ছদ্মনামের এই প্রবন্ধ শুধু একটা সমালোচনা নয়, এটা একটা outlook-এর প্রতিফলন।

লেনিন যেখানে টলস্টয়কে এত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে একজন কমিউনিস্টের কলমে এ প্রবন্ধ এলো কি করে?

আজও রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর প্রমুখদের সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে?

যোশি শুরুতে জোর ধাক্কা দিয়েছিলেন। কিন্তু পার্টির রাজনৈতিক লাইনের দৈন্য তাঁকে ভেঙে দিল। যেমন আমাদের peoples war-এর লাইন। সুভাষ বসু তখন বার্লিন বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ঠিক ছিল। কিন্তু তাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেশ, স্থান, কাল-পাত্র, মানুষ বিবেচনা করি নি। Dogmatisim সব সময় dominate করেছে। আমরা শুধু ঘটনার tailism করেছি।

সে সময় আমরা প্রচুর ফ্যাসিবিরোধী গান লিখি। সেগুলো কতটা গান হল ভাবি নি। শুধু ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা করতে গিয়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রে বৃটিশ বিরোধী লড়াই ভুলে গেছি।

যুদ্ধোত্তর যুগে তেভাগা আন্দোলন এক বিরাট গণজাগরণের ইতিহাস। তখন আমরা কৃষকদের সংগ্রামের ওপর অনেক গান লিখেছি। তেমনি তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ নিয়েও আমরা অনেক গান লিখেছি।

এর ফলে কৃষকরা যখন জঙ্গী আন্দোলন করেছেন তখন আমাদের সৃষ্টিতে জোয়ার এসেছে। আন্দোলন ভুল কি ঠিক এটা কোন বড় কথা নয়। আসলে জঙ্গী শ্রেণীসংগ্রাম হলে মন সৃষ্টির জন্য মাতাল হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে সলিল চৌধুরীর 'শপথ' অসাধারণ কবিতা।

আমি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। যুদ্ধের সময়। একজন কৃষক এসে বললেন 'সরষের তেলের ওপর একটা গান লিখুন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম—'তেলের গান?'

কৃষকটি বলল—'হ্যাঁ।'

আসলে যুদ্ধের সময় সরষের তেল অমিল হয়ে গিয়েছিল।

কৃষকটি আমায় সেই সমস্যা নিয়ে একটি গান লিখতে অনুরোধ করেছিল।

অশিক্ষিতের দেশে Written Word-এর একটা দাম আছে।

সে যুগে শ্রমিক কৃষকের সভায় যোশি মালিয়াবাদী, আলি জাফরি, কায়ফি আজমি প্রমুখেরা শায়রী করতেন।

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কবিরা এমন ego-centric হয়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন যে সাধারণ মানুষের কাছে তা ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। এর সবচেয়ে ভাল উপমা কবি বিষ্ণু দে। এঁর কবিতা মানুষে বোঝে না। অথচ ইনি একজন বড় কমিউনিস্ট কবি। তখন পার্টি নেতাদের যুক্তি ছিল—'বুর্জোয়ারা তো এদের স্বীকার করে?'

যেমন সলিলের তখনকার দিনের একখানা সিনেমার গান:

'রিমঝিম রিমঝিম বরষায়
হায় কি গো ভরসায়।'

অত্যন্ত চটুল প্রেমের গান। পার্টি নেতাদের কাছে যখন বলতে গেলাম যে একজন কমিউনিস্ট শিল্পীর পক্ষে এ ধরনের গান লেখা উচিত কিনা, জবাব পেলাম—'বুর্জোয়ারা স্বীকার করেছে এটাই বড় কথা।'

কিন্তু uncritical হয়ে কি কাউকে আটকান যায়? রবিশঙ্করকে আটকান গেল?

শম্ভু মিত্র তখন আবৃত্তিতে একটা নতুন ঢং এনেছেন 'মধু বংশীর গলি' আবৃত্তি করে। এর আগে আমাদের আবৃত্তি ছিল টেনে টেনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করা। পরে শম্ভু মিত্রের styly গৃহীত হল। আমি এই সময়ে 'মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গল কাব্য' লিখি। এটাও সমাদৃত হল।

কিন্তু কেন?

কারণ আমাদের তখনকার এইসব সৃষ্টির একটা positive দিক আছে। নইলে স্বীকৃতি পেলাম কেন?

সংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কে দেখাশুনার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যোশীর পর আর গুরুত্ব দিত না। প্রাদেশিক কমিটির কালচারাল টিমে একজনও পি. সি. এম থাকত না।

আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি আমাকে পার্টিতে নিয়ে আসেন

জ্যোতির্ময় নন্দী, বারীন দত্ত, বিষ্ণু বরা প্রমুখ। আবার আমার প্রভাবে আসেন নির্মল, খালেদ ও অন্যান্যরা।

পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে তখন বিশ্বনাথ মুখার্জি ছিলেন আসামের দায়িত্বে। তাঁর কথামত আসাম কালচারাল এসোসিয়েশন গড়া হয়।

আসামে তখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ছিলেন গুরু। তিনি I. P. T. A.-র সভাপতি হলেন।

কিন্তু সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ওপর পার্টির day to day leadership ছিল না।

পার্টি সংস্কৃতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে কতটা তাচ্ছিল্য দেখাত তা বোঝা যায় এই ফ্রন্টের চার্জে কখনও থাকতেন নিরঞ্জন সেন, কখনও খাঁ সাহেব (আবদুর রেজ্জাক খাঁ)।

আর্ট বা লিটারেচার কখনও ডাণ্ডা মেরে বা ফরমান জারি করে হয় না।

রাশিয়াতে 'আওয়ারা' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নাম হয়ে গিয়েছিল কমরেড 'আওয়ারা'। প্রফুল্ল রায় এর খুব প্রশংসা করে এক রিভিউ করেন। অথচ ছবিটার মর্মবস্তু হল Vandalism. বড়লোকের গাড়ি চুরি করে প্রগতিশীল। সরোজ মুখার্জিকে এ কথা বলতে গেলাম। তিনি বললেন এ সব দেখা তাঁর দায়িত্ব নয়।

ধরা যাক সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজংঘা' ছবি। বিষয় হল দার্জিলিং-এ বড়লোকের ছেলেমেয়ের প্রেম। অথচ সেখানকার স্থানীয় নেপালি অধিবাসী কি চা বাগানের শ্রমিক ছবিতে এল না।

যে কথা আগে বলেছি অর্থাৎ আমাদের মত শিল্পীদের সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে বড় বড় class struggle-এর ধাক্কা। যেমন ব্রেথওয়েটে ধর্মঘটের সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গান—'ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই'—এর সুর দিয়েছিলেন জর্জদা। এসব গান সৃষ্টি হয়েছে militant class struggle-এর ধাক্কায়।

আমাদের দেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন ধীরে ধীরে অর্থনীতিবাদে ঢুকে গেল। ফলে কালচারাল মুভমেন্ট শুখিয়ে গেল। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করার কাজ বাদ পড়ে গেল। আগে এই ফ্রন্টে ছিল শ্রেণী সমন্বয়বাদ, পরে revolutionary culture করতে গিয়ে Secterian হয়ে গেল।

এই secterianisim-এর কথা বলতে গিয়ে মনে পড়েছে ১৯৪৯ সালের

একটা মিটিং-এর কথা। সেখানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত। সজল বলল এই বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সবাইকে পোস্টার লাগাতে হবে। মনোরঞ্জনবাবু বললেন—"এই বুড়ো বয়সে আমি তো তা পারব না। তবে কি আমি থাকব না I. P. T. A-তে?"

আবার বিষয়টি একতরফা নয়। পার্টির ত্রুটি বিচ্যুতি একটা দিক। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিকদের দায়িত্বেরও তো একটা দিক থাকে। কজন শিল্পী সাহিত্যিক সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে এদেশের কোটি কোটি মানুষের বেদনা দুঃখকে গানে ভাষায় রূপ দেওয়ার সাধনা করেছেন। অনেকে তো স্বেচ্ছায় বুর্জোয়াদের ফাঁদে পা দিতে এগিয়ে গেছেন।

আসলে নিষ্ঠার অভাব হল বড় অভাব। একটা ঘটনা বলি। ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর তাঁর নামে একটা লাইব্রেরি হয়। তারপর হঠাৎ দেখি তাতে অনেক বই নেই। পরে যে দেখাশুনা করত সেও নেই। শেষে একদিন আলমারিটাও বিক্রি হয়ে গেল। ওটা চালাবার মত একটা ডিভোটেড লোক পাওয়া গেল না।

আমরা কোনদিন আমাদের সৃষ্টির ইতিহাস রাখার চেষ্টা করিনি। বিনয় রায়ের কোন গানের রেকর্ড নেই কেন? কেন নেই বটুকদার? We are without any history.

এছাড়া আর একটা বড় কথা হল শিল্পীদের আর্থিক দিকটা কোনদিন দেখা হয়নি। আমি জানি গোড়ার দিকে শম্ভু মিত্রেরাও প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে দিন কাটিয়েছেন।

একটা উদাহরণ দিই। দশরথ লাল ছিলেন ট্রাম শ্রমিক। যোশি তাঁকে কেন্দ্রীয় কালচারাল টিমে নিয়ে যান। রণদিভের যুগ শেষ হলে দশরথের খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম সে বউবাজারে গোপালের দোকানে মাংস কাটে। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল জানি না।

কলকাতার কালচারাল গ্রুপটা বরাবরই খুব উন্নাসিক। ওরা একবার নিবারণ পণ্ডিতকে গান গাইতে দেয় নি। সনাতন মণ্ডলকে মেম্বারশিপ দিতে আপত্তি করেছিল।

এদের এই উন্নাসিকতার সবচেয়ে বড় জবাব হল আন্নাভাই শাঠে, ওমর সেখ। অভিনয়ে সুধর্মা সুলোচনা। এরা ক্ষেতমজুর, শ্রমিক ও নিরক্ষর। এরা প্রমাণ করেছে আর্ট শুধু শিক্ষিত লোকদের জন্য নয়।

এছাড়া কলকাতার লেখক শিল্পীদের মধ্যে বড্ড দলাদলি। আসামে এ

রকম ছিল না। কলকাতার শিল্পীরা মনে করে তারা বেশি talented. তারা তাদের মত করে শিল্পের ব্যাখ্যা করে। ইংরাজিতে সেই প্রবাদের মত man made God after his own image. এঁদের অনেকে আবার 'জনগণের জন্য শিল্প করছি'—এ কথাটাও বলতে চান না। এই নগরকেন্দ্রিক মনোভাব গণসংস্কৃতির পক্ষে সহায়ক নয়।

একটা ঘটনা বলি। একদিন শান্তিগোপাল আমায় বলল—"আমি আপনাদের চেয়ে ভাল গণনাট্য করি। কোচবিহারে যখন লেনিন করছি তখন একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'একটু শোধনবাদের বিরুদ্ধে বলুন।' সে ভুলে গেল এটা অভিনয়।"

সবশেষে একটা কথা বলি। সেই আগের যুগের চিন্তাভাবনা নিয়ে আজ আর চলবে না। আজকাল বাড়ির ছোট মেয়েটা পর্যন্ত সকালে উঠে যান্না দে, লতা মঙ্গেশকারের finished গান শোনে। গান ও জীবন সম্পর্কে এতে তার একটা attitude তৈরি হয়। অথচ এগুলো নিকৃষ্ট প্রেমের গান। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান নয়।

আজ অপসংস্কৃতিকে আঘাত করতে হবে ভাল সংস্কৃতি দিয়ে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : সৌরি ঘটক

সতীনাথের জাগরী

(একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখুন)

গুণময় মান্না

১

কোনো কোনো শিল্প-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ে। হোমরের ইলিয়াড অডিসির গুণাগুণ প্রকাশ পেতে তিনশো বছর লেগেছিল। বিহারীলালের রচনার প্রতি পাঠক সাধারণের কোনো আগ্রহই ছিল না; রবীন্দ্রনাথ যখন দেখালেন কীভাবে তাঁর কবিতা পড়তে হবে, তখন কবির সম্বন্ধে পাঠক মহলে ঔৎসুক্যের সঞ্চার হল। মেঘনাদবধ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মোহিতলাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল, সেটিকে ঠিক আলোকে সমগ্ররূপে দেখবার জন্য।

সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের ভালো লেগেছিল, সে জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু জাগরী সম্বন্ধে এযাবৎ প্রকাশিত সমালোচনাগুলি পড়ে একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যাটি লেখকের দিক থেকে নয়, পাঠকের, অর্থাৎ সমালোচকের দিক থেকেই (এবং সমালোচককে আমি বিদগ্ধ পাঠক বলে ধরে নিচ্ছি) ভাবিয়ে তোলে। এ পর্যন্ত সব সমালোচকই জাগরী-কে ভালো বলেছেন, কিন্তু কোন দিক থেকে ভালো তা বোঝাতে গিয়ে তাঁরা এমন সব জিনিসের অবতারণা করেছেন, যা জাগরী সম্বন্ধে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়। তাঁদের কথা ভুল বলা যাবে না, বলব যে আংশিকভাবে সত্য বা ওপরে-ওপরে সত্য। কিন্তু যে বিচারে কোনো সার্থক উপন্যাসের মূল প্রেরণা বীজ থেকে শুরু করে অখণ্ড বাণীরূপটিকে দেখিয়ে না দেওয়া হয়, তাকে অন্তত অর্থবহ সমালোচনা বলা যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে দেখেছি, জাগরী-কে পারিবারিক না সামাজিক উপন্যাস বলা যাবে কিনা বিচার কর। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওসব ব্যাপার হয়েই থাকে : যেমন, মুক্তধারা যদি ট্র্যাজেডি হয়, তাহলে দেখাও সেটি কোন্ শ্রেণীর ট্র্যাজেডি। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা—মুক্তধারা আদৌ ট্র্যাজেডি নয়। সে কথা যাক, জাগরী-র প্রথম দিককার প্রসিদ্ধ সমালোচকেরা এটিকে

রাজনৈতিক উপন্যাস বলে ভাবতে চেয়েছেন। তারপর যখনই সতীনাথের আলোচনা হয়েছে, ডক্টরেটের থিসিসে বা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে, তখন জাগরী-কে মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস বলেই ধরা হয়েছে। এরকম ধরে নিয়ে এগোতে গেলে বিচার বিভ্রাটও হয়—আগস্ট আন্দোলনে কোনো সোস্যালিস্ট কর্মীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল কিনা, নীলু প্রকৃত কম্যুনিস্ট চরিত্র কিনা, এই সব। জনৈক সমালোচক লেখককে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি দ্বিতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার আগে তাঁর রাজনীতি-বোধকে যেন আরো সমৃদ্ধ করেন। বিড়ম্বনা আর কি!

লেখকেরা কি নিজেদের লেখার প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন? মনে হয় না। সতীনাথ নিজে তাঁর রচনার পরিচারিকায় লিখেছেন, এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী', 'গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে।' এর থেকে বোঝা যায় পিতা-মাতাই সন্তানের শ্রেষ্ঠ বিচারক নয়।

প্রকৃতপক্ষে জাগরী-তে উপাদান হিসেবে রাজনীতি আছে, কিন্তু ওটা বাহ্য, তাই পাঠককে উপন্যাসটির প্রাণ-কেন্দ্রের জন্য অন্যত্র সন্ধান করতে হবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের এক সমালোচক ঠিকই ধরেছেন, 'রাজনীতি এ উপন্যাসে বাহন মাত্র। আর, তার উপরে ভর করে চলেছে আমাদের খুবই চেনাজানা এক ঘরোয়া জীবন।' কিন্তু ঘরোয়া জীবনের বা পারিবারিক উপন্যাস বললেও (লেখক তাই বলেছেন) জাগরী-কে ঠিক ধরা যাবে না। কেননা, জাগরী-তে রাজনীতি আছে, ঘরোয়া জীবন আছে, আছে সামাজিক জীবনও, কিন্তু সেগুলির কোনোটাই একক বা একযোগে জাগরী-র নির্ণায়ক লক্ষণ হতে পারে না। তাহলে জাগরী-র চারিত্র্য-নির্ণায়ক কী সেই লক্ষণ? সদ্য-উল্লেখিত সমালোচক আবার মন্তব্য করছেন, 'তিরিশ থেকে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত পুরো একটা যুগের প্রত্যক্ষকে বর্জন করেন নি এই লেখক। কিন্তু তিনি বাঁধা থাকেন নি এর বাইরের ঘটনাবলীতে, তিনি দেখতে চেয়েছেন এর ভিতরকার সত্য।'

এই মন্তব্যটি পড়ে খুশি হয়েছি—'ভিতরকার সত্য' কথাটি পেয়ে। কিন্তু দারুণ আক্ষেপ থেকে গেল, সেই 'ভিতরকার সত্য' কী—তার কোনো পরিচয় না দেওয়াতে। বরঞ্চ তিনি তারপরই পূর্ব যুগের সমালোচকদের লেখাগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। তাঁর কৃত্য ছিল, আমার মনে হয়, জাগরী-র সেই অন্তরতত্ত্ব সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করে দেখানো। বর্তমান লেখকের প্রয়াস তদভিমুখেই।

কোনো একটি উপন্যাসের, এবং তাবৎ সার্থক শিল্প-সৃষ্টির, অনন্যতার পরিচয় নিতে গিয়ে দুটি দিকে লক্ষ রাখতে হয়। একটি হচ্ছে তার নেতির দিক, সেটি কী নয় তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, এবং তারই সূত্র ধরে ইতির দিক অর্থাৎ সেটি কোন রূপ-রসে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তারই আস্বাদন গ্রহণ করা।

উপন্যাসের যে ক্লাসিক্যাল গঠনরীতির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, তা, জাগরী পড়তে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায়, এখানে অনুপস্থিত। জাগরী-তে কোনো গল্প নেই—'গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে'—লেখকের এই মন্তব্য সত্ত্বেও নয়। কালানুক্রমে সজ্জিত ঘটনার মালা হচ্ছে গল্প! জাগরী-তে ঘটনা আছে, অসংখ্য ঘটনাই আছে, কিন্তু সেগুলি পারম্পর্য অনুসারে আসছে না। এর পাত্র-পাত্রীরা স্মৃতিসূত্রে চয়ন করছে ঘটনাগুলি, কোনটি সময়কালে ঘটছে, অধিকাংশ অতীত থেকে আনা, তাদের মধ্যে কালক্রম অনুপস্থিত। এই যে এটা নেই সেটাই উপন্যাসের বিশিষ্ট মূর্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে—একটু পরেই তা দেখব।

জাগরী-র প্লট আছে কি? পরিচিত রূপে নেই, কিন্তু আর এক রূপে নিশ্চয়ই আছে। পরিচিত রূপ—প্লটের পরিচ্ছিন্ন একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ফস্টার, A plot is also a narrative of incidents, the emphasis falling on causality। এই নিরিখে, অর্থাৎ কার্যকারণ-পরম্পরাতেও সতীনাথ তাঁর উপন্যাসের প্লট গড়ে তোলেন নি। একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বিলুর সম্বন্ধে লিখেছেন, 'কেন সে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট হইয়া উঠিল তাহা গ্রন্থ পড়িয়া ঠিক বোঝা যায় না'। শুধু তাই নয়, বিলুর মতো এমন স্থিতধী মার্কসবাদ-জানা মানুষ কেন কম্যুনিস্ট হলনা সেটাও সমালোচকের বিস্ময়ের বিষয়। আবার নীলুর মতো ব্যক্তিও—'জেলে থাকিয়া যখন সে সাবালকত্ব অর্জন করিল, দাদার পক্ষপুট হইতে বাহিরে আসিয়া সি. এস, পি ছাড়িয়া দিল, তখনও এই আবাল্যস্পষ্টবক্তার সাহস হইল না দাদার সহিত আলোচনা করিবার। সে দাদার নিকট হইতে চোরের মতো পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল।'—কেন এই রকম হেতুহীন আচরণ করেছিল, তা সমালোচক বুঝতে পারেন নি। এবং এইসব কারণে তিনি জাগরী-কে ভালো উপন্যাস বলেও সিদ্ধান্ত করেছেন, 'উপন্যাসটির উৎকর্ষ শেষ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে ম্লান হইয়াছে।' এইটেই আশ্চর্য—জাগরী পড়ে ভালো লেগেছে সবারই, কেবল

তার লক্ষণ নির্ণয়ে কোন জায়গায় দৃষ্টিপাত করতে হবে, কেন জানি না ঘটনাক্রমে সেটা সবাইকে এড়িয়ে গেছে। ফলে যেখানে উপন্যাসটিকে তাঁদের ভালো বলে মনে হয়েছে সেখানেই ভালোটা ঐকান্তিকভাবে সীমাবদ্ধ নয়, আবার—যদিও যে কোনো উপন্যাসের ত্রুটি থাকতেই পারে—যেটাকে ত্রুটি বলে মনে হয়েছে, সেটা আদৌ ত্রুটি নয়।

যে কথা বলছিলাম, সতীনাথ প্রচলিত রীতি অনুসারে কার্যকারণসূত্রে (causality) জাগরী উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেননি। এই ঘটনা আছে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত এই চরিত্র আর তার মানসিকতা এই রকম, অতএব তার পরের ঘটনাটি এইভাবে আসবে, চরিত্রটিও সম্ভবত এইভাবে বদলাবে, লেখক এভাবে ঘটনা ও চরিত্রের টানা-পড়েনের বিন্যাস করছেন না। কেননা, ওগুলো মানুষের মন-বুদ্ধি-চিত্তের সক্রিয়তার, জ্ঞানগম্যতা ও ইচ্ছাশক্তির নিদর্শন। কিন্তু মানব-চৈতন্যের আর একটা দিক আছে, সেটা তার গভীর উৎসগত দিক, তার সক্রিয়তা একটু ভিন্ন ধরণের। মানুষের সেই অন্তশ্চৈতন্য একান্তই ব্যক্তিক, বাইরের কার্যকারণশৃঙ্খলা তা সর্বদাই মেনে চলে না, সেখানে অনেক আকস্মিক উৎসারণ আছে, কখনো তা বিস্ফোরণের আকৃতিও নেয়। সেই অন্তশ্চৈতন্যের প্রেরণাতেই মানুষ তার ব্যক্তিক মূল্যবোধ বেছে নেয়। একালে সমাজে, রাজনৈতিক সংগঠনে এবং বিপুল রাষ্ট্রিক কাঠামোয় যখন ঐকান্তিক বিভিন্নতা ও বিরোধ, তখন ব্যক্তির সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ও তার আচরণে যদৃচ্ছতা (arbitrariness) থাকবেই, এটা অনুমেয়। বিপরীত-ক্রমেও কথাটা সত্য: ব্যক্তির আচরণের যদৃচ্ছতা—এবং যেহেতু ব্যক্তি সামাজিক জীবও, আর সেই জন্য সে সামাজিক রাষ্ট্রিক সংগঠনও গড়ে তোলে তখন, তাতেও যদৃচ্ছতা প্রতিফলিত হবে, তাতে আশ্চর্য কী।

মানুষকে সতীনাথ সারত (in essence) অস্তিত্ব-স্বরূপেই দেখেছেন। আর যেভাবে এই মাত্র বলা হল, অস্তিত্বের সংস্থিতি যদি সেরকমই হয়, তাহলে উপন্যাসের প্রচলিত ও প্রত্যাশিত চরিত্ররূপও (character) জাগরী-তে থাকার কথা নয়, নেই। সাধারণত যদিও আমরা বিলুর চরিত্র, মা-র চরিত্র এই রকম বলে থাকি, এবং উপযুক্ত শব্দের অভাবে চরিত্র কথাটা ব্যবহার করতেই হয়, তবু ভিন্নতর অর্থেই অভিধাটিকে গ্রহণ করতে হবে। ক্লাসিক্যাল উপন্যাসের চরিত্র একটা ঐকমুখিন সত্তা, ঘটনা এবং আন্তর-প্রেরণার টানা-পড়েনে চরিত্র বিবর্তিত হয়, পৌঁছে যায় সুষম পরিণতিতে। এই প্যাটার্ন থেকে আলোচ্য উপন্যাসের তথাকথিত চরিত্র-

গুলোর দারুণ পার্থক্য আছে। জাগরী-র চরিত্র চতুষ্টয় কোনো সূচনাবিন্দু (initial incident) থেকে এগিয়ে অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কোনো পরিণামে পৌঁছচ্ছেনা, কেবল তাদের চৈতন্য-প্রবাহ প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে এক তীব্র শীর্ষতায় শেষ হচ্ছে। সবাই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। উপন্যাসের চরিত্রের যে কুললক্ষণ doing and suffering—জাগরীতে যদিও বা suffering আছে, doing নেই। ঘটনা আছে, অসংখ্য ঘটনা, কিন্তু লক্ষণীয় যে চরিত্রগুলো কোনো ঘটনাই ঘটাচ্ছে না; তারা এখন স্থির নিষ্ক্রিয় এবং, অথবা সেই জন্যেই, তারা পূর্বতন ঘটনার স্মৃতি বহন করছে মাত্র। তাদের সমস্ত চৈতন্য জাগর (জাগরী নাম স্মর্তব্য), যেন একটি অভিজ্ঞানহীন পর্দায় বিচিত্র ও বিভিন্ন স্মৃতিনির্ভর ঘটনা-চিত্র ছায়াবাজির মতো আসছে আর সরে যাচ্ছে। স্মৃতিবাহিত ঘটনাই বেশি, কিন্তু যদিও জেলের ভেতর বিভিন্ন সেলে, ওয়ার্ডে, কিতায় আর জেলগেটে চরিত্রগুলোকে ঘিরে বর্তমানে কিছু ঘটনা ঘটছে, তথাপি চরিত্রগুলি, যাকে বলে more acted upon than acting।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, জাগরী-র প্লট ও চরিত্র-নির্মাণ এক নতুন রীতির অনুসারী। এখানে ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে অত্যন্ত শিথিলভাবে, স্মৃতিচারণায়, আত্মমগ্ন চৈতন্যের মৃদু সক্রিয়তায়, অনুষঙ্গসূত্রে। সতীনাথ অন্তত একবার নিজের রচনার এই বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারেন, যখন তিনি লেখেন, "চারজন চার জায়গায় বসে সারারাত কত কী ভেবে যাচ্ছে। গল্পের মতো ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে তো লোকে ভাবতে পারে না। ভাবনাগুলো মনে আসে খাপছাড়া অসংলগ্ন ভাবে।"

কী রকম—সামান্য একটুখানি তুলে নিয়ে ভেবে দেখছি। প্রথম পরিচ্ছেদ, ফাঁসি সেল, কাল গোধূলি। বিলুর দেখার এবং ভাবনার বিন্যাস এই রকম: এখন অন্ধকার হতে আর বেশি দেরি নেই, জেলের ভেতরকার গাছে নানা রকমের পাখি ডাকাডাকি করছে, তাদের উড়োউড়ির শেষ নেই, খুব ডানা-ঝটপটানি। সেই সূত্রে বিলুর মনে পড়ে গেল, 'সেই একবার বকড়ীকোলে মিটিং করিয়া ফিরিবার সময়' কামাখ্যা থানের বিরাট বটগাছের নিচে রাত কাটাতে হয়েছিল। সমস্ত রাত অন্ধকারে গাছের ডালে পাখিদের পাখা ঝটপটানি চলছিল। সঙ্গে ছিল নীলু, তার সঙ্গে কথাও হয়েছিল কিছু। স্মৃতি-নির্ভর এই চিত্রটিকে সম্পূর্ণরূপেই আঁকলেন সতীনাথ।

বিলু স্মৃতির জগতে ডুব দিয়েছিল, সেখান থেকে মাথা তুলে তার চারপাশে

জেলের যতটুকু দেখা যায় সেটা দেখল, মনে হল যে জেলটা বেশ বড়, ছোটখাট শহরের মতো। শহরসূত্রে তার মনে পড়ল লেনিনগ্রাদের কথা। তারপর এই জেলের পরিচালন ব্যবস্থা, এবং জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মনে পড়ল, 'সেদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কোনো জিনিসপত্রের দরকার আছে কিনা'—এই সূত্রটি নিয়ে বিলু কিছুক্ষণ নানা ধরণের সম্ভাব্য পরিস্থিতির চিন্তা-ভাবনা করল। একবার মনে হল, সুপারকে সে যে উত্তর দিয়েছিল, সেই কথাটা নিশ্চয়ই বাবার কানে উঠবে। তখন বাবাকে নিয়ে বিলু কিছু স্মৃতিচিত্র আঁকল মনে মনে।

ভাবনা, কেবলই ভাবনা—মাকড়সা যেমন করে একটি সুতো থেকে আর একটি সুতোয় চলে গিয়ে সেখানে একটি গ্রন্থি রচনা করে, বিলুও তেমনিভাবে একটির পর একটি ঘটনা-বিন্দু বা স্মৃতি-চিত্র রচনা করে চলেছে। এবং ঠিক সেই রাত্রিতেই অন্যত্র বাবা মা নীলু একই রকম ভাবনার জাল বুনছে। অনেক সময় একই ঘটনা—বিভিন্ন অস্তিত্ব-কণার নিজের রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সরস্বতী নামের একটি বিহারী তরুণীর সঙ্গে বিলুর একবার বিয়ের কথা হয়েছিল: যে যার নিজের মতো করে ঘটনাটি গড়ে তুলছে—বিলু, নীলু, বাবা এবং মা। সমস্ত উপন্যাস ব্যেপে ঘটনার এই রকম আনাগোনা, আকাশে সঞ্চরমান মেঘের মতো; সে সবের বড়ই রমণীয় রূপ, আকার আয়তন রঙ ভার সবই বদলে বদলে যাচ্ছে।

তবু এইভাবে আনা ঘটনাগুলোয় যে সব মানুষকে আনা হয়েছে, সমালোচকের পর সমালোচক সেসবের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন।—'খুব অল্প পরিসরের মধ্যে দুচার টানে এসব চরিত্র আঁকা। ফটোগ্রাফ নয়, নিপুণ শিল্পীর হাতের ছবি। দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাহিত্যের অক্ষয় কল্পলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।' অর্থাৎ সামান্য-মহৎ তুচ্ছ-সমুন্নত সৎ-অসৎ পুরুষ-নারী যে কোনো মানুষকেই লেখক তাঁর (মানে, চরিত্র চারটির) চেতনা-প্রবাহের ফোকাসে এনেছেন, তারা অতিশয় জীবন্ত, একেবারে মাটির ওপর পা দিয়ে দাঁড়ানো বাস্তব, রঙে রেখায় রমণীয়তায় আস্বাদ্য (এসব যে কোনো ঔপন্যাসিকের ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকে) মানবরূপেই এসেছে।

সুতরাং এখানে তাই এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, জাগরী-তে প্লট রচনার পরিচিত মূর্তি নাই থাক, এও আর এক ধরণের উৎকৃষ্ট প্লট রচনা। কেননা, যে কোনো প্লট রচনার চরম সার্থকতা তার মানবিক তাৎপর্যে—তা

সে কার্য-কারণের প্যাটার্ণে, বা চৈতন্য-প্রবাহের খুব সূক্ষ্ম সুতোর বুনুনিতে, যে ভাবেই আসুক না কেন।

২

আধুনিক কালের জীবন-চর্যায় নানা বিপরীত কোটির সমাবেশ আছে। বিপরীত, এমন কি বিরোধীও। তবু সে দুইএর সমপাতেই জীবনের সমগ্রতা। শুধু তাই নয়, ও দুটি বিপরীত একে অপরের সংস্পর্শেই উজ্জ্বল হয়। সতীনাথ জীবনের ছবিকে অতিশয় উজ্জ্বল করে এঁকেছেন, কিন্তু সেই জীবনের অঙ্গে অঙ্গে মৃত্যুকেও অনুপ্রবিষ্ট রূপে উপলব্ধি করেছেন।

মানুষ যন্ত্রণায় খিন্ন, আনন্দে উৎফুল্ল; আত্মকাম চেতনায় সে ক্রমাগত অপরকে আঘাত করে চলেছে, আঘাত সহ্য করছে অপরের থেকেও; অমিত ভালোবাসায় সে অপরকে বেষ্টন করতে চায়, পরস্পরের প্রতি হাত বাড়ানো আছে, স্পর্শ হচ্ছে না; বিচ্ছিন্ন অসম্পৃক্ত মানুষ নিজের অন্তরিত সত্তার উৎক্ষেপে একটি স্বতন্ত্র মূল্যবোধ গড়ে তুলছে নিজেরই মনে; একই পরিবার কিন্তু বড় ছেলে আছে ফাঁসি সেলে, বাবা আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে, মা আওরত কিতায় এবং ছোট ছেলে রয়েছে জেল গেটে—একই রাত্রি, কিন্তু চার জায়গার অবস্থানে চার জনই আত্ম-চৈতন্যের রোমন্থন করছে; এই সব জীবনের আলোড়ন, মৃদু নিশ্চিত অন্তহীন তরঙ্গবিক্ষেপ চলতেই থাকে; —আর সতীনাথ তাঁর জাগরী উপন্যাস এই সব কিছুর পিছনে একটি কালো পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে ফাঁসির মৃত্যুর।

মৃত্যুর কালো অন্ধকার, কিন্তু জীবনের আলোর ফুটকি দেওয়া। জাগরী-র পাতায় পাতায় এই বিপরীতের অন্যোন্য স্পর্শ—মাঝে মাঝে সতীনাথ তাকে প্রতীক চিহ্নে ধরবার চেষ্টা করছেন। দুটি মাত্র উদাহরণ সামনে আনছি উপন্যাসের প্রথমে সেলে বসে বিলু আকাশের দিকে তাকাচ্ছে—জাপানি বিমানের আক্রমণের ভয়ে ব্ল্যাকআউটের কালো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কিন্তু 'গুমটির উপরে আলোটা নিশ্চয়ই পাঁচশ ক্যাণ্ডল পাওয়ারের। ব্ল্যাক আউটের জন্য উহার কালো ঢাকনা। কিন্তু ঠিক তাহার নিচেই বাঁশের চাটাইএর বোনা প্রকাণ্ড একটি ছাতা···ঐ ছাতাটির ওপর আলো পড়িয়া এত আলো চারিদিকে প্রতিফলিত হইতেছে, একটানা বেশিক্ষণ উহার দিকে তাকানো যায় না।' আর উপন্যাসের শেষে নীলু দাদার মৃতদেহ নেবার জন্য জেল গেটে প্রতীক্ষমাণ, সে দেখছে, যদিও 'এলাকার নিবিড় অন্ধকার', তবু

'একটি কোয়ার্টারের দরজা খুলিয়াছে। একটি রশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে সরল রেখায়; একটি আলোকময় ট্রাপিজিয়াম, চৌকাঠের দিকের বাহুটি ছোট।' এ হচ্ছে' মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত, রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—ওটাই অস্তিত্বের যন্ত্রণা।

বিলু জীবনকে ভালোবাসে, সারা রাত্রি ধরে সে নানারকম ঘটনা ও মানুষের চিন্তা করছে—স্কুলের সহপাঠী, রাজনীতির সহকর্মী, সরস্বতী যার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, নীলু বাবা মা—মায়ের চিন্তাই বেশি। কিন্তু বিলু মৃত্যুকেও ভালোবাসে। শেষ রাত্রির সেই চরম ঘটনাটি তার চৈতন্যে ঝুলে তো আছেই, যখন সে ঘটনাটি ঘটেনি, তখনও সেটিকে সে নানা রকম নেড়ে-চেড়ে দেখছে, আস্বাদন করছে।—

'ওয়ার্ডাররাই আসিয়া খবর দেয়—আজ ফাঁসিকাঠে কালো রঙ দিয়াছে আজ দড়ির সহিত আমার ওজনের একটি বালির বস্তা বাঁধিয়া দড়িটি ঠিক মজবুত কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে, আরও কত এই রকম খবর।

'আশ্চর্য আমার মনের গতি! কালো রঙ-এর কথা শুনিয়াই ভাবি, ব্লাক-জাপান না আলকাতরা? ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করি, আলকাতরা না কি? দড়িটি কিসের? শনের না কি?'

জীবনের ঘটনা যখনই তার মনকে ছুঁয়ে যায়, তখন মৃত্যুর ভাবনাও তার মনে অত্যন্ত অব্যবহিত হয়ে ওঠে। আর তাঁর সব স্মৃতি-রোমন্থন পরিণামে একটি দেয়ালে এসে ঠোক্কর খায়, মানুষ মাত্রেরই সব চিন্তা সব ভাবনা শীর্ষতা পেয়ে যায় মৃত্যু-চৈতন্যে—

'লণ্ঠনগুলি এই দিকে আগাইয়া আসিতেছে—সহস্র গ্রহ-উপগ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রতি লোমকূপে প্রত্যাশিত আতঙ্কের সাড়া—প্রতি স্নায়ুতে টাইফুনের বিক্ষোভ—এই আলোড়ন অক্ষি-গোলকের মধ্যদিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চায়।—তুমুল বাত্যাবিক্ষোভে আর বুঝি দাঁড়াইতে পারা যায় না।···দৃঢ় মুষ্টিতে গরাদ চাপিয়া ধরিয়াছি।'

শুধু বিলু নয়, বাবা এবং মায়েরও চিন্তাপ্রবাহের শীর্ষতা এসেছে মৃত্যু-চৈতন্যে। বাবার উপলব্ধিতে—

'অ্যাঁ।' চমকিয়া উঠিয়াছি। হাত হইতে পাঁজ পড়িয়া গেল। চরকার ঘর্ঘর আর গীতা পাঠের সুর ভেদ করিয়া, অন্য সকল শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, শোনা গেল মোটর লরির হর্ণ···আমার হৃৎস্পন্দনের সহিত সুর মিলাইয়া মোটর ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে—ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তুর নির্ঘোষের মতো

আমার হৃৎস্পন্দনের সহিত সুর মিলাইয়া—প্রতিমানুষের প্রতি হৃৎস্পন্দনের মধ্যে একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যু কাম্পিত। মা অনুভব করছেন, 'ঐ! ঐ! মোটরের হর্ণের শব্দ হল—অ্যাঁ!—তাহলে আমার বিলু···সেই সবুজ ঝাঁঝ-ওয়ালা শিশিটা ধরেছে বুঝি নাকে।'

কেবল চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে একটু অন্যরকম আছে। নীলু শেষ রাত্রিতে যখন জেল গেটের দরজার ফাঁক দিয়ে ওআর্ডার সিপাহী, ডাক্তার, সুপার প্রভৃতির এগিয়ে আসা দেখছে, যেন মৃত্যুদূতদের পদক্ষেপের মতো, যখন তার চৈতন্যে সর্বোচ্চ টান, তখনই অঘোরবাবু তাকে বললেন, 'কেন, আপনারা শোনেন নি?—গভর্ণমেণ্টের চিঠি এসেছে যে, ফাঁসির অর্ডার তো মুলতুবি থাকবে।'

মুলতুবি—ওই কথাটাই ঠিক। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেই তো সব চুকেবুকে গেল। পক্ষান্তরে মৃত্যুকে উদ্যত করে রাখলেই জীবনের নানা প্যাটার্ন বুনে তোলা যায়। তাই ওটাকে আবার জীইয়ে রাখা হল। তুলনীয় যে জাঁ পোল সার্ত্র এই অস্তিত্ব চেতনার কথাকার হিসেবে লিখেছিলেন The Reprieve।

যে কথাটা মনে রেখে জাগরী সম্বন্ধে আমি এই সব কথা তুললাম তা এখন উপস্থিত করছি। যাকে death-anguish বা মরণোৎকণ্ঠা বলে, জীবনের প্রেক্ষাপটে তারই চিত্র এঁকেছেন সতীনাথ এবং কথাটা বিপরীত ক্রমেও সত্য। তাই, বিলুর ফাঁসির হুকুম হয়েছে, মৃত্যু আসন্ন—এটিকে সহজ সীমিত ঘটনারূপে তিনি আদৌ দেখছেন না। আরো সমগ্রতায় বলছেন যে ফাঁসির হুকুম দেওয়া যেমন সত্য, ফাঁসি গলায় পরবার জন্য মানুষের উৎকণ্ঠাও তেমনি সত্য। জিঘাংসা ও আত্মহননেচ্ছা বিপরীত বলে মনে হলেও একই মরণোৎ-কণ্ঠার বৃন্তে বিধৃত, এবং সে দুটো পিঠেপিঠি লেগেই রয়েছে, কেবল মূল্যবোধের পার্থক্য। বিলুর কথাই ধরা যাক। ইংরেজ সরকার বিলুকে রেললাইন তুলে ফেলার জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে—ওটা জিঘাংসা। কিন্তু সেই বিলু নিজেই আত্মহননের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এসেছে আগে থেকেই—

'রাজনৈতিক কর্মীর পথ বড় কঠিন···আশা রাখিবে ফাঁসির রজ্জুর, হয়তো গৌরবের রাজমুকুট পাইতে পারো।'

'এ জীবন হইতে জেলে আসিতে পারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা—মৃত্যুদণ্ডও শাপে বর।'

'কেবলই মনে হইতে লাগিল, বাঁচিয়া থাকিয়া কী হইবে, যে হীন অবস্থায়

আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা মরণ অনেক ভালো। সব ঠিক—সেদিন রাত্রেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইব।...পরে ঠিক চরম মুহূর্তে মনে হইয়াছিল যে আজ থাক।'

লক্ষণীয় যে বিলু কেবল আত্মহননেচ্ছা নিজের অন্তরে পোষণ করে নি, তা মুলতুবিও রেখেছিল।

আধুনিক জীবনচর্যার মধ্যেই বিধৃত হয়ে রয়েছে আত্মহননেচ্ছা, এই আশ্চর্য সত্যটি বঙ্কিমের উপলব্ধিতেই প্রথম ধরা পড়েছিল। অগ্নি পতঙ্গকে পোড়াবার জন্য লেলিহান শিখা বিস্তার করে শুধু তাই নয়, পতঙ্গও তাতে আত্মাহুতি দেবার জন্য মেতে ওঠে। মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ, তার জ্ঞান প্রেম ধর্ম মান প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিদ্‌বৃত্তিগুলি তাকে আত্মাহুতি দেবার পথেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। (পতঙ্গ, কমলাকান্তের দপ্তর)

জাগরী উপন্যাসের পাতায় পাতায় আত্মহননের উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এ শুধু আর বিলুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাবা ভাবছেন, 'নেপালে শুনিয়াছি, একজনের বদলে আর একজন রাজদণ্ড ভোগ করিতে পারে।... এখানে যদি এমন একটি নিয়ম থাকিত যাহাতে বিলুর বদলে আমার গেলেও তো...কত গল্প শুনিয়াছি যে একজন আর একজনের রোগ নিজের উপর লইয়াছে। হুমায়ুনের মৃত্যুশয্যায় বাবর এইরূপ করিয়াছিলেন।' মা-ও চিন্তা করেছেন, 'কত পাপই না আমি করেছি! ভগবান, আমার পাপের জন্য আমাকে যে কোনো শাস্তি দিতে পারতে কিন্তু আমার পাপের জন্য তাকে শাস্তি দিলে কেন?'

মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গবৃত্ত। কেবল বিলু বাবা মা প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যেই নয়, সর্ব মানবের মনেই আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা প্রবল। জেলের ভেতর কোনো সেলে কেরোসিনের লণ্ঠন দেবার নিয়ম নেই। বিলু লক্ষ করছে, 'অনেকক্ষণ হইল বাহিরে আলো দিয়া গিয়াছে।...আলোটি সেলের ভিতর দিলে ইহাদের কী ক্ষতি হইত বুঝিতে পারি না। কেরোসিন তেল লাগাইয়া আত্মহত্যা করা খুব আরামের জিনিস নয়।' সেই একই কারণে জেল কর্তৃপক্ষ আমাশার প্রতিষেধক হিসেবেও এক বোতল ইলেকট্রোলিটিক ক্লোরিন বন্দীদের হাতে দেয় না, যদি সেটাকেই বিষরূপে ব্যবহার করে কেউ আত্মহত্যা করে। বাবার অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ছে, 'সকলেই যেন আত্মহত্যা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে!...জেলের যত পুরাতন ইঁদারা আছে সবগুলি কাঠের তক্তা দিয়া মজবুত করিয়া ছাওয়া রহিয়াছে।' নজিরের অভাব নাই,

করে কোন আসামী ইঁদারার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।'…একবার একজন এক শিশি মালিশের ঔষধ খেয়েছিল। আর একজন ফিনাইল খেয়েছিল। আওরং কিতায় একটি মেয়ে কয়েদী ছিল, তার নাম গলকটি—স্বামীর সঙ্গে কলহের পর নিজের গলা ক্ষুর দিয়ে কেটেছিল। মরেনি—গলার কাটা জায়গায় ফুটো নিয়ে বেঁচেছিল: reprieve-এর আর একরকম উদাহরণ।

মরণোৎকণ্ঠার একদিকে আত্মহননেচ্ছা এবং সেই একই প্রবর্তনার ঠিক উল্টো পিঠে জুড়ে রয়েছে জিঘাংসা—অনেকবার একথার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। জাগরী উপন্যাসের পাতায় পাতায় এই জিঘাংসার উদাহরণও ছড়িয়ে রয়েছে। বড়ো সংগঠন থেকে ব্যক্তি পর্যন্ত—মূল্যবোধ আলাদা হতে পারে, কিন্তু মূলে সেই জিঘাংসাই। নীলুর চিন্তায় ধরা পড়েছে, 'রাষ্ট্রের সঞ্চালনচক্র চলিয়াছে।…উহার নায়ককে নিশ্চিহ্ন করিয়াই রাষ্ট্রের শান্তি বা স্বস্তি নাই। যে স্বপ্নবিলাস কতকগুলি অর্বাচীন হৃদয়কে উদ্‌বেলিত করিয়াছিল ভবিষ্যতে তাহা যেন ভয়ে আড়ষ্ট ও পঙ্গু হইয়া যায়—ইহাই তাহার কাম্য।… কেবল ঘাতককেই দায়ী করিলেই চলিবে কেন? এই বর্বরতার নৈতিক দায়িত্ব জজ হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ার্ডার পর্যন্ত সকলেরই সমান।'—এটা গেল ইংরেজ সরকারের দিক থেকে জিঘাংসা, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন-কারীরা? মূল্যবোধের পার্থক্য সত্ত্বেও (মূল্যবোধের প্রসঙ্গ একটু পরেই আলোচিত হবে)—তাদের কৃতিও রূপান্তরে জিঘাংসাই। 'বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা…মাইলের পর মাইল রেললাইন তুলিয়া ফেলিয়াছে· টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোস্ট অফিস ও মদের দোকান জ্বালানোর ভার গ্রামের বালকদের ওপর।' (নীলুর চিন্তা) বিলু রেল লাইন উপড়ে ছিল সেটাও যেমন, তেমনি তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে, সেটাও জিঘাংসা। জেলে বিশৃঙ্খল বিদ্রোহী বন্দীদের ওপর যখন লাঠিচার্জ হয়, তখন তার আঘাতগুলি খুনী হয়েই পড়ে।

আপাত-নিরীহ ব্যক্তিদের মধ্যেও সেই জিঘাংসা লুকোন, এমন কি শিশুদের ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যেও। বিলু-নীলুরা বালিকা টেঁপীকে নিয়ে গিয়ে রবার গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিলু গাছের ওপর উঠে গাছের ডাল কাটে, আর নীলু শাসিয়ে বলে, 'উপরে তাকাস না, খবরদার! তোর মাথার উপর ইরেজার তৈরি করে দিচ্ছি।'—টেঁপীর চুলে জট ধরে শুধু তাই নয়, সম্ভবত এই ঘটনার ফলেই ডিপথিরিয়ায় টেঁপীর মৃত্যু হয়। দুর্গাবুর একটি পাতিহাঁস চুরি করে কেটেছিল নীলুরা, পিকনিকের জন্য।

কাটার পদ্ধতি অদ্ভুত, নীলু কাটবে আর সবাই তাকে ছুঁয়ে থাকবে। অর্থাৎ সবার হৃদয়েই আছে জিঘাংসা, এব্যাপারে আমরা সকলেই ছুঁয়ে আছি। এমন কি, অমন যে মাতৃত্ব, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সেখানেও কোথায় যে জিঘাংসা লুকিয়ে থাকে কেউ বলতে পারে না। আওরৎ কিতার কয়েদী মনচনিয়া অবৈধ মাতৃত্বের জন্য তার সদ্যোজাত শিশুকে গলা টিপে হত্যা করেছিল, 'সে গলাটা যখন টিপে ধরেছিল, তখন কচি ছেলেটার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল না কি ?' (মা-র চিন্তা)

এ ব্যাপারে সতীনাথ এক আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—নীলুকে দিয়ে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার ঘটনা বিন্যাস করে। এ সভ্যতায় এক মানুষ অপরের শত্রু তো বটেই, পরমাত্মীয়ও শত্রু হয়ে দেখা দিচ্ছে, মানুষ নিজেই নিজের ভিত্তিভূমিকে ভেঙে ফেলছে। চমইন জমাদারনী মাকে খবর দিয়ে বলেছে, 'তোমার ছেলের সাজা নাকি সরকার বাহাদুর নিজে ইচ্ছে করে দেয় নি। তোমারই আর এক ছেলে নাকি সাক্ষী দিয়ে এই সাজা করিয়েছে।' একান্ত আপন জনকে বিনাশ করবার উৎকণ্ঠা কি কেবল নীলুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? —তা নয়। আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে বাবা চিন্তা করছেন, তাঁরই তথাকথিত উদারতা, উদাসীনতা এবং আদর্শের জন্য বিলুর এই পরিণাম—'অনেক জানোয়ার নিজের সন্তান খাইয়া ফেলে। আমি কি তাহাদেরই দলে ?' মা ওই কথাটাই অন্যভাবে অনুভব করছেন, 'তেমন বরাত করে কি আর পৃথিবীতে এসেছি, যে সবাইকে ফেলে থুয়ে ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং করতে করতে স্বর্গে চলে যাব। তাহলে তো হয়েই ছিল। গুষ্টিসুদ্ধ না খেয়ে তো আর আমি পৃথিবী থেকে নড়ছি না।'

জীবনের এই হচ্ছে ট্র্যাজিক গঠন। আমাদের সমস্ত নিরীহতা, এমন কি শুভকামনার মধ্যেও কোথায় যে বিনাশ ফলশ্রুতি রূপে দেখা দেয়, কে বলতে পারে।

যে কথা বলছিলাম, এই জিঘাংসা বৃত্তিটিকে আরো অনেক সূক্ষ্ম তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন সতীনাথ। জেলের ভেতরের কথা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডিউটি বদল হয়ে ওয়ার্ডার বা সিপাহীরা বিলুর সেলের কাছে আসে, তার সঙ্গে দু'একটি কথা বলে। সকলেই শিষ্টাচার দেখায়—'দহি হ্যায়; থোড়া ভোজন কর লিয়া যায়।' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানতে চায় বিলুর কিছু দরকার আছে কিনা। বিলুর কাছে অনেকেই ঘুরে-ফিরে ফাঁসির কথা তোলে, ফাঁসির আগের রাত্রে কোন বন্দী কীরূপ আচরণ করেছিল, তার কথা

শোনায়। বিলুকে যাতে মশা না কামড়ায় সে জন্য উপযাচক হয়ে কেরোসিন দেয়। যাদের ছেলের মৃত্যু আসন্ন সেই বাবা ও মার চারধারে সহবন্দীরা সমবেত হয়, রাত জাগে। কসাই যখন জবাই করে, তখন আঁতকে উঠলেও মানুষ যেমন দেখে, দেখতেই থাকে—এও তেমনি। মা ঠিকই অনুভব করেছেন, 'রাগে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যায়। আমার জন্য তোমরা যা ব্যস্ত তা তো বুঝি—তবে আবার ঢং কেন?'—ঢং কি আর সাধে, ওটাই মানব-চৈতন্যের প্রকৃতি: ভেতরে রয়েছে হত্যা বা মৃত্যুর জন্য অসীম আগ্রহ, প্রচ্ছন্ন উল্লাস। বাইরে তা সমবেদনার আকারে প্রকাশ পাচ্ছে—অবশ্য সেটাও কৃত্রিম নয়।

শুধু মৃত্যু সম্বন্ধে আগ্রহই নয়, মৃত্যুকে ভালোও বাসে মানুষ, শ্রদ্ধা করে। —'ছাই লইয়া কী কাড়াকাড়ি। মহিলারা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইতেছেন—কেহ কেহ ছেলেদের কপালে লাগাইয়া দিতেছেন।' (নীলুর চিন্তা) অন্যত্র সতীনাথ জানাচ্ছেন, ফাঁসির পর ফাঁসির দড়িটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সবাই, কাছে রাখলে নাকি শুভ হয়।

৩

সতীনাথ অস্তিত্ব-সচেতন শিল্পী, তাঁর সমস্ত রচনাতেই নিগূঢ় ধারারূপে এ চেতনা প্রবাহিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সর্বত্র তাঁর সিদ্ধি সমান নয়, প্রধান উপন্যাসগুলিতেই তার পরিচ্ছন্ন রূপ পাওয়া যায়। ঢোঁড়াইচরিত-পরিক্রমায় অন্যত্র লিখেছিলাম—অনেক উদাহরণের মধ্যে একটা তুলে নিচ্ছি—'এ উপন্যাসের দৃশ্যপট বিহার, কিন্তু উপন্যাসে বারবার আলোকপাত করা হয়েছে যে, এর একদিকে রয়েছে দূর 'পচ্ছিম' মুলুক, যার প্রতি এখানকার লোকদের রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা, যেখানে রয়েছে অযোধ্যাজী; অপরদিকে রয়েছে পুরুবের 'বংগাল' মুলুক, যেখানকার পানি নরম, বহুৎ বিমার, যাকে ওরা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে অভ্যস্ত, যদিও বাবুভাইদের বুদ্ধিমত্তা স্বীকার না করে পারা যায় না। তার মানে এ দেশটা না ঘাটকা না ঘরকা—সেপারেটিজম্ বা বিচ্ছিন্নতাবাদের একটি সুন্দর ভঙ্গিমা।'

সতীনাথের প্রথম উপন্যাস জাগরীতে এই ভঙ্গিমার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত উপন্যাসটির পটভূমি একটি জেল, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, যেমন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দিয়ে, তেমনি কয়েদীদের অসামাজিকতাতেও। কেউ রাষ্ট্রের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে (মূল্যবোধের প্রসঙ্গ পরে বিচার্য), কেউ বা

নিজের সন্তানকে নিজেই হত্যা করেছে। Condemned cell—প্রত্যেকেই নিজের নিজের কুঠরিতে আবদ্ধ, কন্‌ডেম্‌ড টু ইটারন্যাল মিজারি—কেবলই নিজের চৈতন্যজাত যন্ত্রণা ও স্মৃতিচারণায় ঘূর্ণ্যমান। সতীনাথ বাবার উপলব্ধিতে অস্কার ওআইল্ডের বচন উদ্ধৃত করেছেন—

But there is no sleep, when men must weep
Who never yet have wept;
So we the fool, the fraud, the knave—
That endless vijil kept,

একটিই রাত্রি, সকলেই জাগর, নিজের যন্ত্রণায় এবং গ্লানি হতাশ প্রেম স্নেহ প্রভৃতি হৃদয়ধার্য—তবু এরা লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যে দূরস্থিত দ্বীপের মতো (আর্নল্ড) বিচ্ছিন্ন—বিলু ফাঁসি সেলে, বাবা আপার ডিভিশন·ওয়ার্ডে, মা আওরৎ কিতায় এবং নীলু জেলগেটে। ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র, ব্যক্তি মিলে যে দল-উপদল গড়ে তোলে, তাও স্বতন্ত্র। বাবা বলেছেন, 'আমার সিট ওয়ার্ডের মধ্যখানটিতে। ঘরে ঢুকিতে বাঁ দিকে থাকে মহাত্মাজীর ভক্তের দল অর্থাৎ কংগ্রেসের মেজরিটিপন্থীরা। ইহাদের ছাড়া সেদিকে আছে একজন কম্যুনিস্ট, একজন কিষাণসভার সদস্য।···ঘরের ডান দিকটিতে থাকে সোস্যালিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা। মধ্যে আমি বাফার—(buffer)।। জেল হইতে এইরূপ ভাবে সিটের বন্দোবস্ত করিয়া দেয় নাই। নিজের সুবিধমতো অনেক দিনের সিট অদলবদলের ফলে, এইরূপ স্থিতি দাঁড়াইয়াছে।'—'নিজের সুবিধা-মতো': প্রত্যেকেই নিজের অন্তর প্রবর্তনায় এই রকম বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসে 'সেল' কথাটা বারবার আসছে, তার অর্থ এই যে সকলেই তার নিজের কুঠরিতে বদ্ধ। অর্থাৎ একই ঘরে থেকেও এরা আলাদা, নিজের নিজের মতাদর্শের পাকে বন্দী—এ ওর নয় ও এর নয়। আবার একই দলে থেকেও কি এক হতে পেরেছে এরা?—'ভলিবল খেলার সময় সেদিন দেখি কমরেড মাধোরাম কমরেড মুরলী মিশিরের বুকের ওপর বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। খাবার লইয়া এখনও তাহারা কিচেন ম্যানেজারের সহিত ঝগড়া করে। আজ এর সঙ্গে ওর কথা বন্ধ, কাল ওর সঙ্গে ঝগড়া, এসব তো নিত্য লাগিয়াই আছে।' ঢোঁড়াইচরিতে এ কথা সতীনাথ আরো তীব্রতার সঙ্গে লিখেছিলেন, 'ভিন দেশের রঙবেরঙের পাখি লালমুখো কাকাতুয়া দেখে দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছিল। সাঁঝ পড়াতে একগাছে রাত কাটাচ্ছে। তার নাম 'আজাদ দস্তা'। বুলিমুখস্থ তোতা

আছে, নাচনদার ফিঙে আছে, পাঁকের পাখি কাদাখোঁচা আছে, সবজান্তা ভুষণ্ডী কাক আছে।'

মানুষের অস্তিত্বের চারধারে এই অলঙ্ঘনীয় দেয়াল, এই compartmentalisation—তার নিয়তিই শুধু নয়, তার প্রীতির বিষয়ও। নিজের চারধারে ঘুরপাক খেতেই সে ভালোবাসে—'হাজারীবাগ জেলের সেই ফিরিঙ্গি উইলিয়মস্ সাহেবের ছাড়া পাইবার দিন কী কান্না! চৌদ্দ বৎসর সে জেলে কাটাইয়াছে। তাহার পোঁতা পেয়ারা গাছটি কত বড় হইয়াছে।...বাড়ি যাইবার ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখিবার আনন্দ অপেক্ষা এই সকল গাছপালা ও জেলের বন্ধুবান্ধবকে ছাড়িয়া যাওয়ার দুঃখ তাহার অনেক বেশি হইয়াছিল।'

যাদেরকে আমরা নিকটাত্মীয় বলে জানি, মিলনের শত প্রয়াস ও উন্মুখতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একই রাষ্ট্রীয় পরিবারের বিভিন্ন সদস্য—বাবা অনুভব করছেন, 'আমার ও আমার পরিবারের মধ্যের ব্যবধান এক স্থানে এত গভীর, যাহা আমি পূর্বে ভাবিতেও পারি নাই।'—কেননা, 'আমার দৃষ্টিকোণ দিয়া কেহই দেখি জিনিসটিকে দেখে না।' বিলু অনুভব করছে, 'কথা বলিবার লোক নাই।' কিন্তু যদিও সেটা জেলের ভেতর, যেখানে মানুষ একান্ত কাছাকাছি সেখানেও না। মায়ের উক্তিতে—'তুমি হলে ওদের বাবা। ওদের ভুলভ্রান্তি হয়, ওদের একটু বুঝিয়ে দিলেই পারো।...কিন্তু উনি মুখ খুলে কিছু বলবেন না।'

ফাঁসি সেলে দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেছে বিলু। কেন নীলু দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, এটা সে বলি-বলি করেও দাদাকে কিছুতেই বলে উঠতে পারল না, শেষে ভাবল, 'দাদার সহিত যদি এ বিষয়ে প্রাণখোলা আলোচনা করিতে পারিতাম! না, উহা নিরর্থক হইত।' পক্ষান্তরে, একই সাক্ষাৎকারে বিলু ভাবছে, 'কী ভাগ্য যে সেদিন তাহার সম্মুখে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস ফুটিয়া উঠে নাই।' যেমন অন্যের হৃদয়-সংবাদ সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, তেমনি অন্যকেও নিজের হৃদয়ের অংশ দিতে চায় না—মাঝে মাঝে তা ঘটনাবলীকে ট্র্যাজিক পরিণতিতেও নিয়ে যায়—'সেই যে গল্প আছে না—একজন ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিয়া ঠিক করিয়াছিল যে তাহার মার সঙ্গে ইংরাজি ছাড়া আর কিছুতে কথা বলিবে না। তারপর বেচারা অসুখে পড়িয়া জলতেষ্টায় মারা যায়—'ওয়াটার' কথাটি তাহার মা বুঝিতে পারেন নাই।'

মানুষে মানুষে দারুণ পার্থক্য, তাদের মুখে এক অন্তরে আর; বাঙলা-

বিহারে পার্থক্য। সরস্বতীকে একরকম ছেলেবেলা থেকেই স্নেহে নাড়া-চাড়া করে এসেছেন মা, মেয়েটিও সুন্দরী, মিষ্টি স্বভাবের। কিন্তু যেইমাত্র বিলুর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব এল, মা সেটা নাকচ করে দিলেন, 'এক গাছের বাকল আর একগাছে এঁটে দিলে তা কি কখনও জোড়া লাগে। আমি বলব সরস্বতী, তো ওরা বলবে সরসোয়াতী। সরস্বতী কি শুকতো রাঁধতে জানে? গোকুলপিঠের নাম শুনেছে?'

এই সব আত্মানুবর্তনের অমোঘ প্রক্রিয়াটিকে সতীনাথ একটি সুন্দর প্রতীক চিত্রে ধরবার চেষ্টা করেছেন, 'আমার রান্নাঘরের বারান্দায় শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়ে রাঙানো খদ্দরের বৃন্দাবনী শাড়ি পরে দুষ্ট মেয়েটি, বাঁশ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথায় চুল, কোথায় খোঁপা, কোথায় আঁচল, —বাঁই-বাঁই করে ঘুরেই চলেছে।' ঢোঁড়াইচরিতে এটাকেই তিনি অন্য রূপকে ধরেছেন, 'কুর্বাঘাটের মেলায় জুয়োর দোকানের শাদা ছকটার উপর কাঁটাটা বনবন করে ঘুরছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে…,।

মানুষের অস্তিত্ব বা আত্মপরতা, সতীনাথ মনে করেন, এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত যে ব্যক্তিকে ছেড়ে তা পরিবার, রাজনীতিক সংগঠন, এবং রাষ্ট্রের মধ্যেও নিজের নখরদন্ত প্রোথিত করেছে। মানুষের আদর্শ যত বড়ই হোক, গান্ধীবাদ কম্যুনিস্ট বা সোস্যালিস্ট যে আদর্শই হোক, মানুষে মানুষে তা দুস্তর ব্যবধান রচনা করছে। মা তীব্র বেদনায় অনুভব করছেন, 'গান্ধীজি, তুমি আমার এ কী করলে?…তোমার দেখানো রাস্তায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না। বাপ-ছেলেতে ভালবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়।'

বিলুর উপলব্ধির পরিধি আরো বিস্তৃত—'দলের বাহিরে পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ। কত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহিত সংঘর্ষ। তাহার জন্য তো সকল রাজনৈতিক কর্মী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ভিতরে?—ভিতরের সংঘর্ষ, আরো ভয়ানক। উপদলে উপদলে সংঘর্ষ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, প্রদেশে প্রদেশে সংঘর্ষ;—প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।'

৪

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখলাম, মানুষ কণাকল্প, তার নিয়তি যেন উল্কার মতো—ক্ষণকালের জন্য জ্বলে উঠে জীবনপথ কিছুটা পরিক্রমা করেই নিবে

যায়। কিন্তু তথাপি সেই মানব-কথার অস্তিত্ব আছে, তার প্রেম-ঈর্ষা আদর্শবোধ ত্যাগ লোভ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি আছে, এবং সেক্ষেত্রে তার অনন্ত সম্ভাবনা। তার পরিণাম যান্ত্রিক অমোঘতায় চলেছে মৃত্যুর দিকে, কিন্তু সে যন্ত্রমাত্র নয়, আছে তার ইচ্ছা শক্তি, সে নিজেকে এবং সেই সঙ্গে জগতকে পরিবর্তিত করার দুরূহ কর্মে ব্রতী—সেই উদ্দেশে সে সংগঠিতও হয়, যদিও তার প্রেরণা মূলত ব্যক্তিক বলে নানা সংগঠনের নানামুখিন গতি। দার্শনিক হাইডেগারের মতে, যদিও মানুষের অদৃষ্ট বিনাশ, তবু সে বিনাশের ওপর জয়লাভ করতে চায়, সৃষ্টি করতে চায় জৈবনিক মূল্যবোধ, 'by inventing "Purposes," "Projects," which will themselves confer meaning both upon himself and upon the world of objects"

মূল্যবোধ যে মূলত ব্যক্তিক, তার কিছু উদাহরণ সামনে আনছি। বিলুর মাসিমা বৃন্দাবনে যাবেন। বিলু নৈহাটি স্টেশনে তাঁকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে এসেছে। জিনিসপত্র কামরায় উঠিয়ে দিল। মাসিমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বিলু জানাল, 'হ্যাঁ, মোট বাইশটি মাল উঠিয়াছে।' নিমেষে মাসিমার চোখে জল এল। কেননা তাঁর গুরুদেবের তৈলচিত্রটিকেও বিলু 'মাল'-এর মধ্যে গণনা করেছে। সেই রকম, ফাঁসি সেলে বদ্ধ বিলু এবং একটি সিপাহী—তাদের কথাবার্তার সূত্র ধরে বিলু ভাবছে, 'ওয়ার্ডার যে আমাকে 'আসামী' বলিল, কথাটি আমার পছন্দ হইল না।'—'বোমার মামলার আসামী' কথাটি বিলুর কাছে শ্রদ্ধেয়, নিজেকে সে রাজনৈতিক বন্দী ভাবতেই ভালবাসে। মা গিয়েছেন বাভনসামায় মহিলাদের থেকে রামগড় কংগ্রেসের জন্য স্বেচ্ছা-সেবিকা সংগ্রহ করতে। সকলেই খুব আগ্রহী, কিন্তু ঘটনাক্রমে সবাই হিন্দু মহিলা। তাই, প্রতিজ্ঞাপত্রে যেই কুর্বানি কথা আছে শুনেছে, অমনি আঁতকে উঠেছে। সর্বনাশ, তারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কিন্তু 'কুর্বানি' নয়।

এই রকম কত লঘু এবং গুরু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে উপন্যাসে। বাবা যে তাঁর আশ্রমের জন্য গান্ধী-সেবাসংঘের থেকে পঁচাত্তর টাকা মাসোহারা পান, সেটা তাঁর কাছে বহুমানিত, কিন্তু নীলু উদ্ধতভাবে সেটাই প্রত্যাখ্যান করেছে, গান্ধীসেবাসংঘের টাকায় সে কলেজে পড়বে না। দাদার কাছ থেকে টাকা নিতে তার বাধে নি। বাবার গর্ব যে বিলুকে চলতি প্রথামতো ইংরেজি না শিখিয়ে কাশী বিদ্যাপীঠে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন। বিলু কৃতিত্বের সঙ্গে শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। স্ত্রীকে আহ্লাদ করে খবরটা দিলেন, "কিন্তু দেখিলাম আমার কথার একটুও উত্তর দিল না, মাথা নিচু করিয়া

একমনে বড়ি দিতে লাগিল।' বিলু একবার উপলব্ধি করেছিল, 'ইহারা নীলুর মনের ভাব জানে না। তাহার ব্যবহারের একটি মনগড়া অর্থ করিয়া লইয়াছে। এই অর্থটি তাহাদের বেশ মনের মতো হইয়াছে।' এসব হচ্ছে সেই একটা কথাই—আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

এখন একটি প্রশ্ন ওঠে, এই যে মানুষের ঐকান্তিক ব্যক্তিক মূল্যবোধ, যা সে নিজেই নির্বাচন করে নিয়েছে, সেটা কতখানি স্থায়ী, কতখানি দৃঢ়? এর উত্তর হচ্ছে, একই সঙ্গে দৃঢ় এবং ঠুনকো।

বাবা কংগ্রেসী জীবনাদর্শ বেছে নিলেন, এ নিয়ে কারো কথা তিনি শোনেন নি, 'পৃথিবীসুদ্ধ লোক বারণ করিয়াছিল।…আমি কাহারও মত লইয়া চলি নাই। যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি।' বিলুর সম্বন্ধে বাবা ভাবছেন, 'জোর করিয়া বিলুকে দিয়া কেহ কিছু করাইয়া লইবে তাহা হইতে পারে না।' নীলুর সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা—'তাহার কঠোর কর্তব্যজ্ঞানের সম্মুখে স্নেহ, ভালবাসা, আত্মীয়তার দাবি, জনমত, অত আদরের দাদা—সব তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।' বিলুও ভাইয়ের সম্বন্ধে একই কথা ভেবেছে, সারা পৃথিবী নীলুর বিরুদ্ধে যাক—নীলু কখনও নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।'

কিন্তু হলে কী হবে, এরা ক্রমাগত একে অপরের থেকে সরে তো যাচ্ছেই, কোনো কার্যকারণ সূত্র মানছে না—উপরন্তু নিজের আদর্শেও দৃঢ় থাকতে পারছে না, নিজের পায়ের তলার মাটি নিজেই সরিয়ে নিচ্ছে। আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে বাবা অনুভব করছেন, তাঁর চারদিকে বিশ্বাসের বাঁধন স্খলিত হয়ে পড়ছে, গান্ধীবাদীরাও হিংসাত্মক কর্মে নিরত হচ্ছে। নিজের সম্বন্ধে সংশয় জাগছে, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন কিনা। সিদ্ধার্থ কি গৃহত্যাগ করে স্ত্রীপুত্রের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছিলেন? শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে ভাবতে হয়, 'ভগবান! গান্ধীজী! তোমাদের নাম লইয়াও তো মনে বল পাইতেছি না।' বিলুর অভিজ্ঞতাতে ধরা পড়ছে, 'যাহা কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এ নিষ্ফল প্রয়াসের কোনোই মূল্য নাই।' এমন কি, নীলুর মতো অমন একরোখা; দৃঢ়, আদর্শবাদী যুবকও জেল গেটে এসে অনুভব করছে, 'সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচখচ করিয়া কী একটা বিঁধিতেছে। বোধ হয় যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতার অহেতুক অনুতাপ। আমার নিজের পার্টির স্থানীয় শাখার মেম্বরদেরও মত যে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

দেওয়া আমার ঠিক হয় নাই।' আর মা? এতদিন তিনি স্বামী ও তাঁর মারফৎ গান্ধীকে অকুণ্ঠ আনুগত্য জানিয়ে এসেছেন, নিজ জীবনের মূল্যবোধ তিনি এইভাবেই গড়ে তুলেছিলেন—কিন্তু যে খুঁটিতে তাঁর বিশ্বাসের লতা উঠিয়েছিলেন, সেটাই ভেঙে ফেলছেন, বিদ্রোহিণী হয়ে। স্বামীর সম্বন্ধে ভাবছেন, 'আমার নিজের যা হয়েছে তা হয়েছে। তার জন্য একটুও ভাবি না। কিন্তু তোমার জন্যে আমার ছেলের এই হল। আমার সংসার ছারখার হয়ে গেল।' আর নিজের গান্ধীনিষ্ঠার সম্বন্ধে তাঁর মর্মান্তিক উপলব্ধি—'উঃ, কী করেছি এতদিন! পৃথিবীসুদ্ধ লোক মিলে আমার কী করেছে! গায়ের জ্বালায় নিজের মাংস ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে, মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে। আর না—দেব চরখাটাকে এখনি টান মেরে ফেলে—আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলব ওটাকে।'

৫

কিন্তু তবু মানুষের এই মর্যাদাবোধে ও দীনতায়, তার দৃঢ়তা ও দুর্বলতায়, মানবিক ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ সম্ভার থরেথরে সাজানো রয়েছে জাগরী উপন্যাসে। এইখানে অন্যান্য অস্তিত্ববাদী লেখকের সঙ্গে সতীনাথের পার্থক্য। অন্যান্যদের রচনায় আমরা দেখছি জীবনের অবমূল্যায়ণ। অথচ জীবনের গভীর-শায়িত মৃত্যুর মধ্যে ডুব দিয়েও সতীনাথ মাথা তুলতে পারেন জীবন-প্রেমিকের প্রসন্ন মুখখানি নিয়ে।

জীবনের একটি চিত্র, একটি ভাসমান ঘটনা মানবিক মূল্যবোধে উজ্জ্বল হলে নিশ্চয়ই পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে; কিন্তু যদি সেটি মৃত্যুর সমুদ্রে ভাসমান কমলের মতো হয়, তাহলে সেটি কেবল সুন্দর নয়, তা গম্ভীর এবং মহৎ হয়ে ওঠে। ট্র্যাজডি-বিধৃত জীবনের রহস্য-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিড্‌লটন মারে মন্তব্য করেছিলেন, 'The purest reality, the purest beauty, the purest love cannot by its own nature, manifest itself on earth without disaster, but in disaster it can'।

জাগরী-তেও আমরা দেখছি, বিনাশ-বিধৃত বলেই জীবনের চিত্র এমন হার্দ্য, মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে বলেই তা এমন ট্র্যাজিক সৌন্দর্যে মহীয়ান। নীহারিকার মধ্যে যেমন নক্ষত্র, তেমনি জাগরী-তে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা ভেসে বেড়াচ্ছে। এখানে আমরা মাত্র দু'টি উদাহরণ তুলে বুঝবার চেষ্টা করছি:

সেবার মহাত্মাজীর টুরের সময়, ঠিক মানশাহী পুলের উপর যেই আমাদের মোটরখানা উঠেছে, সম্মুখেই দেখি ধুলো কাদা মাখা দুটি ল্যাংটা ছেলে। হঠাৎ মোটরকার দেখে ভয় পেয়েছে। কী করবে ঠিক করতে না পেরে, এদিক-ওদিক একটু দৌড়বার চেষ্টা করল। তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে রাস্তার মধ্যিখানে শুয়ে পড়ল। ভগবানের দয়ায় তারা রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু যখন মোটর থেকে নেমে তাদের ওঠাতে গেলাম, দেখি তারা ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই চোখ খুলে চাইবে না। বিলু নীলু দুই ভাইয়ের কথা মনে করে, তখন আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মনটা একটু শান্ত হল। কী কাণ্ডই আর একটু হলে হয়ে যেত। এরপর যখনই বিলু নীলুর কথা একসঙ্গে মনে পড়েছে, তখনই চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে, ঐ অসহায় ধুলোমাখা ছেলেদুটোর সেই রূপ। (মা)

বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তবানুগ। ল্যাংটো ছেলে দুটি, ধুলো-কাদা মাখা; কিন্তু স্থির ছবি নয়, ছেলে দুটোকে কিছু কাজ করিয়েছেন সতীনাথ—বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ানো, কিছুতেই চোখ খুলবে না, ভয়ে নীল হয়ে গেছে। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়েছে, দু'জনের জড়াজড়ি করে রাস্তার মধ্যিখানে শুয়ে পড়া। আমি জানি না, সতীনাথ এরকম ঘটনা দেখেছিলেন কিনা, যদি দেখে থাকেনও, তাহলে এখানে আনবার কৃতিত্ব কম নয়, এতে শিল্পীর নির্বাচনী শক্তির (selective faculty) অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়; আর যদি এটি তাঁর উদ্ভাবন হয়, তাহলে তো কথাই নেই, তুলনাহীন। আর মায়ের ছবি—সেটিও অনবদ্য, কেবল তাঁর কাজের আর ভাবনার মধ্য দিয়েই ছবিটা এঁকেছেন। গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসা, তুলবার চেষ্টা করা, বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, বিলু নীলুর কথা মনে করে চোখ ফেটে জল আসা—সব কেমন চেনা, স্বাভাবিক, একটুও প্রয়াসের চিহ্ন নেই।

বর্ণনা বাস্তবানুগ, কিন্তু ছত্রে-ছত্রে আর এক ব্যঞ্জনা। ধুলো-কাদা মাখা দুটো ল্যাংটা ছেলে, মানব অস্তিত্বের তুচ্ছতার দিক, রেচেডনেস। আমরা সকলেই রয়েছি মৃত্যুর মুখবিধৃত, হঠাৎ গাড়িটা এসে পড়েছে। মানুষ উদভ্রান্ত, দিশাহারা—কী করতে হবে ঠিক করতে না পেরে লক্ষহীনভাবে ছুটোছুটি করল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতেও মানুষের দ্বিধা নেই—রাস্তার মধ্যিখানে শুয়ে পড়ল। কিন্তু, কিন্তু—সেই

মৃত্যুর বিরুদ্ধে দারুণ মানবিক প্রতিবাদও আছে: কীভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে? না, দু'জনে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ল। সতীনাথ এখানে আশ্চর্য। মৃত্যুর মুখেই মানবের অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন। আর, সর্বোপরি আছে সমস্ত ঘটনাটা মায়ের চোখে দেখা—এ সেই মা, যিনি অন্য লক্ষ মায়ের মতো অন্যত্র ভেবেছেন, 'মনে হয় বিলুকেই যেন আমি বুকের মধ্যে পেয়েছি,…কিছুতেই ছাড়ব না, কার সাধ্যি মার বুক থেকে ছেলেকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।' তাঁরই স্নেহ এখানেও যেন ছেলে দুটোকে জড়িয়ে ধরছে, আর পাঠকের মনে ছেলে দুটি সত্যতর হয়ে ফুটে উঠছে।

পাঠক এবার সমস্ত উপন্যাসটির প্লট-কল্পনার কথা ভেবে দেখুন—পটভূমিতে মৃত্যু, বিরোধ আর বিচ্ছিন্নতা, মূল্যবোধের বিভিন্নমুখিন নৈরাজ্য, আর তারই ওপর সতীনাথ ছড়িয়ে দিচ্ছেন মুঠিমুঠি পারিবারিক সম্বন্ধের মাধুর্য, ভাইএর মনে ভাই সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, স্বামীর প্রতি প্রেম আনুগতা, স্ত্রীর প্রতি নীরব গভীর অনুরাগ, এই সব। শুধু কি তাই, সহকর্মী সহবন্দী, জেলের সি-কেলাসী কয়েদী সবার সঙ্গে সবার মানবিক সম্পর্ক, সমবেদনা, শিষ্টাচার। সেই কাল রাত্রিতে বাবার চারপাশে সবাই জেগে থেকে প্রার্থনা করে, মা-র চারপাশে বন্দী মেয়েরা ভিড় জমায়। জাগর উন্মুখর মানব-চৈতন্যের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা।

আর একটি ছবি:

> হউক প্রোসেশন। দাদার মৃতদেহ, বিলুবাবুর মৃতদেহ, শহীদের মৃতদেহ, 'মাস্টার সাহেবের বেটার' মৃতদেহ, ইহাতেও লোকে প্রোসেশন করিবে না 'তো কিসে করিবে?…গাড়ি, মোটর, বিপুল জনতা ফুলের মালা দেবদারুপাতা—বাড়ি বাড়ি হইতে গঙ্গাজল বর্ষিত হইতেছে—দোতলা হইতে কয়েকখানি তালপাতার পাখা পড়িল, তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি-ভিড়-ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি—তারপর অন্তহীন নরপ্রবাহের সর্পিল গতি।…নীরব—'গান্ধীজীকা জয়' নাই—'বিলুবাবুকা জয়' নাই—শোকের 'মর্সিয়া' গীত নাই—বিশৃঙ্খল জনসমুদ্রের উদ্দণ্ডতা নাই। আছে মুহ্যমান শোকের নিষ্ক্রিয়তা—আছে একটি 'রাষ্ট্রীয় পরিবারের' একজন ছাড়া অপর সকলের প্রতি সহানুভূতি, আছে সুপ্ত দেশাত্মবোধের ধিক্কার—আছে ভস্মের দৃশ্যমান শীতলতার মধ্যে ব্যর্থ আক্রোশের জাগরূক বহ্নি। এক ইশারায় এই অসহায় শান্ত জনতা

হিংস্র ও উন্মাদ হইয়া আমাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে। (নীলু)

এই অংশটি একটু অন্যরকম—নীলুর ভাবনায় এটি পূর্বতন ঘটনার স্মৃতিচারণা নয়, ভাবীকালের সম্ভাব্য ঘটনা সম্বন্ধে কল্পনা। দাদার মৃত্যুর পর তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য গুণমুগ্ধ জনতা কী করবে, নীলু মনে মনে তারই চিত্র রচনা করছে।

একটি শোক-মিছিলের যথাযথ বর্ণনা। মিছিলের দেহ এবং তার প্রাণ সমেত—ক্রিয়া আছে, যেমন গঙ্গাজল ছিটোন, পাখা পড়া এবং তা নিয়ে কাড়াকাড়ি, কিন্তু সবই নীরবে। ভেতরে আক্রোশ কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই, বা সেই আক্রোশই শোকস্তব্ধতায় এবং শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে। নাই—'মর্সিয়া' গীত ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগে অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধ; ভস্মের দৃশ্যমান শীতলতা আসন্ন দাহকর্মের আভাস। তবে, এ অংশের দু'একটি শব্দ প্রয়োগ নিয়ে মনে খটকা লাগে। প্রোসেশন—তখনও বোধহয় শোকমিছিল চালু হয় নি। শোকযাত্রা, শবযাত্রা না, অনেক পোশাকি হত। তবে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন, প্রোসেশন করা চলবেনা, আর ওটা তাঁর মুখের স্বাভাবিক কথা, বোধহয় সেই সূত্রে সতীনাথ এখানেও শব্দটা এনেছেন। নরপ্রবাহের সর্পিল গতি—নরপ্রবাহ অনুপযুক্ত, জনপ্রবাহ অনেক ভালো হত। সর্পিল একথার অনুষঙ্গ বর্তমান ক্ষেত্রে ঠিক খাপ খায় না। শুধু গতি, বা সম্মুখ গতি ঠিক মানাত।

সে যাই হোক, এখানে নীলুর চরিত্রের প্রতিই দৃষ্টিপাত করতে চাই। একটু মূলের দিকে পিছিয়ে চিত্রটিকে অনুসরণ করুন। খুব ছোটবেলায় দাদা যা করবে নীলুর তাই করা চাই। বাবা রাজনীতি করেন সে জন্য নয়, দাদার দেখাদেখি সে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। তারপর একই সঙ্গে সোস্যালিস্ট পার্টিতে। কিন্তু তারপরই আত্মচৈতন্যের অমোঘ প্রবর্তনায় নীলু কম্যুনিস্ট হয়ে গেল, হতে সে বাধ্য। শুধু তাই নয়, তার পথান্তর গমন কতখানি দৃঢ়, তা দেখাবার জন্যে দৃঢ়তার আদর্শ সে দাদার কাছ থেকেই পেয়েছে—দাদার বিরুদ্ধেই আদর্শের জন্য সে মৃত্যু-মর্মী সাক্ষ্য দিয়ে বসল। অপূর্ব ট্র্যাজিক পরিকল্পনা—এ্যারিস্টটল একেই বলেছিলেন, transformation of an action into its opposite—সব ভাল ভেবেই আমরা কাজ করি না কেন, বিনাশকেই টেনে আনি।

কিন্তু এখন?—তারই কৃত কর্মের ফলে দাদার বিনাশ, আর দাদার মৃত

দেহ নিতে সে-ই এসেছে! এ হচ্ছে অস্তিত্ব-চেতনার জিঘাংসা, হয় সে মরে নয়তো মারে, মৃত্যু দেখবার জন্য মানুষের অসীম আগ্রহ। সেই মুহূর্তে শোক-মিছিল কল্পনায় দেখতে দেখতে, নীলুর আত্মহননেচ্ছাও জেগেছে— আমাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু এহ বাহ্য, সব মৃত্যুকে পেরিয়ে নীলুর অন্তরে শ্রদ্ধা ভালবাসা জাগ্রত হয়েছে। ভাইকে সে বীরের মূর্তিতে দেখছে, জনতার সব শ্রদ্ধার্ঘ তারই অন্তরের থেকে প্রতিফলিত। নীলু নিজে বীর সৈনিক, তার সেনানায়কের (দাদা প্রকৃত অর্থেই তার নেতা) মৃত্যুতে সে last post জানাচ্ছে।

একটু আগে মায়ের চোখে দেখা যে ঘটনাটি তুলেছি, তাতে দেখেছি মৃত্যুর মুখে দুইভাই জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়েছে। বর্তমান ঘটনাটি যেন তারই মতো—মৃত্যুর পর, বা মারবার পর, দুই ভাই আবার এক আলিঙ্গনে ধৃত হচ্ছে। উৎকৃষ্ট প্লট রচনার এও এক সুন্দর নিদর্শন: ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় ঘটনার বিন্যাস।

জাগরী উপন্যাসের মানবিক মর্যাদার আলোচনায় আর একটি দিকের সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যে জিনিসটি এই উপন্যাসে আদ্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, সংখ্যাতীত ঘটনায় ফিরে ফিরে এসেছে, তা হচ্ছে মা ও ছেলের সম্বন্ধ, স্নেহ। সেই স্নেহ আবার রূপে-রূপান্তরে উপস্থাপিত, পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ, ভাইএর প্রতি ভাইএর। কেন এমন হল একটু ভেবে দেখতে চাই।

রবীন্দ্রকাব্যে 'অসীম' 'আনন্দ' প্রভৃতি অনেক প্রত্যয়-সাধক শব্দের মধ্যে 'নূতন' শব্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। হে নূতন দেখা দিক আরবার, তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে, নব আনন্দে জাগো—কবির কামনা, আত্মা-চৈতন্যের বিপরীতমুখিন শক্তির দ্বন্দ্বে যে মালিন্য, আবর্জনা জমে, তা দূরীভূত হোক, সত্তার আবির্ভাব হোক নূতন, নির্মল। ঠিক অনুরূপ কারণেই শিশু-চিত্র তাঁর কাব্যধারায় ফিরে ফিরে আসছে। যখনই কবি মানসিক ও আত্মিক-সংকটের সম্মুখিন হয়েছেন বা বিশ্বে দেখছেন বিনাশের আয়োজন, তখন তারই বিপরীত চিত্র শিশুকে আদর্শরূপে ধরতে চাইছেন—তা সে 'ছবি ও গান', থেকে 'গল্পসল্প পর্যন্ত যে পর্যায়ের রচনাই হোক না কেন।

সতীনাথের রচনার পটভূমি আগেই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে— অস্তিত্ব-চৈতন্যের এক নিদারুণ মারণমুখিন সংকটমুহূর্তে উপনীত হয়েছেন লেখক। তারব পটভূমিতে সতীনাথ আনছেন মা ও শিশুর ছবি। এ হচ্ছে

সর্বব্যাপী মারণ-প্রতিবেশ এবং অস্তিত্বের অনুবর্তনে উত্থিত বিকৃতি ও বীভৎসতার-শিশুহত্যাও আছে—বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিকল্প আদর্শায়িত জীবনের উপস্থাপনা।

বাবা মা প্রৌঢ়, পরিণত, বিলু নীলু বয়স্থ যুবক—কিন্তু লক্ষণীয় যে সবাই ছোটবেলার বিলু নীলুর কথা ভাবছে, বর্তমানের কথা নেই বললেই চলে। মা কথাটা উপলব্ধি করে বলছেন, 'বিলু নীলুর কেবল ছোটবেলার কথাই মনে পড়ে কেন? বোধহয় ওরা আমার কাছে সেই ছোট্টটি থেকে গিয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে একটি সবিনয় প্রস্তাব আছে। সেই বৈষ্ণব যুগ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে অনেক মাতৃচিত্র পেয়েছি, কিন্তু সতীনাথের মা-র মতো এমন উৎকৃষ্ট মাতৃচিত্র আর আছে কি? মনে হয় না। সে যাই হোক, লক্ষণীয় যে, মা তাঁর শিশু সমেত এই উপন্যাসে প্রতীকমূল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন, জীবনের আদি বিন্দু জননীতে, তার primal essence-এ, কিন্তু তথাপি বাস্তব মায়ের দেহ-মন-ঈর্ষা-বেদনা-ত্যাগ-আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসা সমেত অত্যন্ত জীবন্ত হয়েও ওঠেন। মায়ের সৌরভ ছড়িয়ে আছে সমস্ত উপন্যাসেই। মা যখন ছোট বিলু নীলুর কথা ভাবছেন তখন তো বটেই, যখন অন্যান্যরা শিশুর কথা ভাবছে তখনও—সথাবতীর শিশুপুত্র লাড্‌লী, যে 'বাঙ্গালী'-র কাছে যাবার জন্য সর্বদাই বায়না ধরে, সেও এখানে গণনীয়। লক্ষণীয় যে বিলু যখন ছোট ভাইএর, নীলু যখন দাদার, বাবা যখন তাঁর দুই পুত্রের কথা ভাবেন, তখন বিরল দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড়া মা-র সঙ্গে জড়িয়ে একত্র করেই ভাবেন। পাঠনিরত বিলুর পিছন দিয়ে পা টিপে টিপে মা চলে গেলেও সে বুঝতে পারে, এবং স্নান করে এলেই না কি বিলু মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, এখনই ঠিক মায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। এই কথাটাই ঠিক, আমরা পাঠকরা সমগ্র উপন্যাসে শুদ্ধ-স্নান মায়ের সৌরভই অনুভব করি। এক সমালোচক ঠিকই ধরেছেন, 'একদিক থেকে দেখলে মনে হয়, লেখকের প্রধান কৃতিত্ব এই মায়ের চিত্রেই।'

উদাহরণ? না, পড়তে গেলেই দেখা যাবে জাগরী-র প্রতি স্তরেই সে ছবি ছড়িয়ে রয়েছে—মা আর শিশু। খুঁজতে হয় না। কেবল সামান্য দু'একটি চিত্র এখানে আনছি:

> বিলু যখন হয় তখন দিব্যি মোটাসোটা ছিলে—এতবড় কোলজোড়া ছেলে। আঁতুড়ে হেডপণ্ডিতজীর স্ত্রী দেখতে এসেছেন। রুক্‌মিনী দাই এক থাবড়া কাজল ছেলের গায়ে লাগিয়ে দিল।...বুড়ি দাই

আমাকে তখন চব্বিশ ঘণ্টা শাসনে রাখে—এটা করো তো ওটা করো না ; উঠতে বসতে আমাকে সাবধান করে। আচ্ছা বাবা যা বল তাই।…পণ্ডিতজীর স্ত্রী বিশ্বাসই করবে না যে বিলুর বয়স তখন কুড়ি দিন। বিলুর কোঁদা কোঁদা হাত পা'র দিকে তাকায়, আর রুক্মিণী গজগজ করতে করতে ঢেকে দেয়।

* * *

নীলু কান্নাকাটি আরম্ভ করল। বিলু তাকে বোঝাতে বোঝাতে আমার কাছে নিয়ে এল। 'বোকা ছেলে কোথাকার, ক্ষ্যাপালে বুঝি কাঁদতে হয়। তাহলে যত কাঁদবে তত ও ক্ষ্যাপাবে।' তারপর বিলু আমার কাছে গল্প করে—'নীলুটা একটুও বোঝে না। আমি যত বোঝাই তত কাঁদতে আরম্ভ করে।' যেই বিলুকে বলি, 'তুমি হলে ওর দাদা, তুমি না বোঝালে ওকে আর কে বোঝাবে বল', অমনি বিলু ভারি খুশী। দাদাগিরির দায়িত্ব তো কম নয়।

* * *

আমি হয়তো ওকে তক্তাপোশের উপর বসিয়ে রেখে ভাঁড়ারে কি রান্নাঘরে গিয়েছি, আর সেখানে কোনো কাজে আটকে পড়েছি। খানিক পরে এসে দেখি, ছেলের দুচোখ দিয়ে জল পড়ে বুক ভেসে যাচ্ছে। নিচের ঠোঁটটা একটু যেন বাইরে এসেছে, আর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমাকে দেখে ছেলের কী অভিমান। 'আমার আসতে দেরি হয়েছে বলে কাঁদছিস। মরে যাই, মরে যাই—কী লক্ষ্মী ছেলে আমার; বিলু' এই বলে ওর মাথাটা বুকের দিকে টেনে নিলাম। আর ছেলে আমার ঠাণ্ডা—মধ্যে মধ্যে খালি একটু ফোঁপানির শব্দ।

* * *

সরস্বতীর হাতে খেয়ে কিন্তু বিলুর একদিনও পেট ভরত না। বিলু আমার তরকারি খেতে ভালবাসে। বসে বসে টুকটুক করে খাবে, যতটা ভাত ততটা তরকারি। তাই খেয়েই তো কোনরকমে হাড় কখানি টিকে আছে—তা না হলে ভাত খাওয়ার যা ছিরি। পাখির মত ঠোকর মেরে এই তো চারটি ভাত খাওয়া।

পুনরাবৃত্তি হলেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এসব স্নিগ্ধ বাৎসল্যের ছবি যন্ত্রণাময় মৃত্যুবিদ্ধ জীবনের পটভূমিতে আঁকা ঃ এবং যে জীবনকে ধরতে চাইছেন সতীনাথ, তা কত তাজা, আদিম গন্ধে ভরপুর।

৬

জাগরী-র আলোচনা সঙ্গত কারণেই দীর্ঘ হল—কিন্তু এর ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু না বললে এর আস্বাদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সতীনাথ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী, তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার সময় থেকেই। যখন জাগরী লেখেন, তখন তিনি বয়স্ক, চল্লিশের কাছাকাছি—এই বয়সেই গোবিন্দদাস লিখতে আরম্ভ করেন—অধ্যয়নে এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বেশ পরিণত। কেমন করে লিখতে হবে এ ভাবনা তাঁর ছিল—অর্জনও করেছেন তদভিমুখে, হিন্দি তিনি খুব ভালোই জানতেন, এবং 'উর্দু শিখেছি, ফ্রেঞ্চ ভাষাও আয়ত্ত করেছি'। জাগরীর পরিমণ্ডল, ঘটনা, এবং চরিত্র চিত্রণে কোন্ ভাষা উপযুক্ত হবে এ নিয়ে ভাবনা ছিল, লিখেওছেন সেই ভাবে।—"স্থানীয় বর্ণবৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।' শুধু তাই নয়, যে চারজনকে দিয়ে সতীনাথ তাঁর উপন্যাসে কথা বলিয়েছেন, ভাষা ঠিক তাঁদের চরিত্রানুযায়ী হয়েছে। উদাহরণত, মা যখন কথা বলেন, তখন বাচনভঙ্গি ও প্রবাদ-প্রবচন সমন্বিত মেয়েলি ভাষিত অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু লেখকের এই সচেতনতা সত্ত্বেও, কিংবা, সেই কারণেই, জাগরী-র সামগ্রিক ভাষা-রূপ অত্যন্ত সরল, মনে হয় সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত। এবং একটু পুরনো ধরণের—পদ-বিন্যাসে প্রধানত তৎসম বা তৎসম-ঘেঁষা, ক্রিয়াপদের রূপ সাধু। সব মিলে একটি নিরাভরণ সহজতা—ঘটনা বা চরিত্র চিত্রণে ভাষায় কোথাও অলংকরণের চেষ্টা মাত্র নেই, না ধ্বনিরূপে, না অর্থরূপে। কেবল, প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে, যখন চরিত্রের চেতনা প্রবাহ শীর্ষতা লাভ করে (উদাহরণ আগেই নেওয়া হয়েছে), তখন ধ্বনিঝংকার ও অর্থময়তা সংগত কারণেই উঁচুতে উঠে যায়। অলংকরণ নেই, তার মানে অবশ্য এই নয় যে, জাগরী-র ভাষায় কোথাও উপমা রূপক প্রভৃতির নমুনা নেই। কিন্তু অলংকার থাকা এবং লেখকের অলংকরণ মানসিকতা দুটো এক জিনিস নয়। জীবনে মাথা উঁচু করে চলতে শেখো—এ বাক্যে অলংকার আছে, অলংকরণ নেই। আর আমাদের অতি-প্রচলিত মুখের বুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অলংকারের তো ছড়াছড়ি, সেগুলো ভাষার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

সে যাই হোক, জাগরী-র ভাষা যতই সরল নিরাভরণ হোক, সে ভাষা যে পরম আস্বাদ্য একথা সবাই স্বীকার করেছেন। জাগরী-র হিন্দি রূপান্তরের

ভূমিকায় সুনীতিকুমার বাঙলা সাহিত্যে সতীনাথের পূর্বসূরী প্রধান ঔপন্যাসিকদের নাম উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত করছেন, 'ইস জ্যোতিষ্কমণ্ডলমেঁ অপনী নঈ প্রকাশভঙ্গী লেকর অব উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁয় শ্রীমান সতীনাথ।' সাম্প্রতিক কালের এক লেখিকা বলছেন, 'এক নিরাসক্ত হাতে লেখক তাদের বলে যাওয়াটা লিপিবদ্ধ করেন।' উক্ত হিন্দি-রূপান্তরের প্রকাশক একটি কথা বলেছেন, 'কিতাব রাজনৈতিক হ্যায় ঔর লেখক নিপ্‌পক্ষ, য়হ হ্যায় লেখককে সৎসাহিত্যিক হোনেকা সবুত।' রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, সেটা আমরা আগেই দেখেছি, কিন্তু ওই 'নিপ্‌পক্ষ' কথাটা অর্থবহ, যদিও বিষয় সম্বন্ধে কথাটা বলা, ভাষা সম্বন্ধেও খুবই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যেমন বিষয়বস্তুতে, তেমনি ভাষা-রচনার ক্ষেত্রে এমন একটা অবস্থান বেছে নিয়েছেন লেখক, যা প্রতীয়মাণত নিরপেক্ষ, দূরবর্তী। দু'দিক থেকে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

ক, লেখক, এবং প্রতিভাবান সৃজনশীল লেখক কি কখনো ভাষা রচনায় নিপ্‌পক্ষ বা নিরাসক্ত হতে—অথচ একই সঙ্গে নঈ প্রকাশভঙ্গীও আনতে পারেন? পারেন না—কেননা, সৃজনী মন গভীর ও বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির দ্বারাই চালিত হয়। আর কল্পনাশক্তি—তা সে কবি বা কথাকার যাঁর ক্ষেত্রেই হোক না কেন—বিষয়ের অঙ্গে অঙ্গে প্রবেশ করে তাকে বাঞ্ছিত রূপান্তর দেয়, 'It dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate'। কিন্তু কল্পনাশক্তির প্রয়োজন যদি এমনি হয় যে, তা বিষয়কে তদবস্থ রেখেই নিজেকে পুরোপুরি সক্রিয় করতে পারে, তাহলে বিষয়ের রূপটাই বিশেষ কল্পনার রূপ হয়ে যায়। অনেক শিল্পী আছেন, গাছের একটা শিকড় বা ডালকে এমনভাবে বসিয়ে দেন, একটু-আধটু কাট-ছাঁট করে, যে সেটাই আর এক শিল্প-মূর্তি হয়ে দেখা দেয়। জাগরী-তে দেখা যায়, ঘটনা এবং চরিত্র-চিত্রকে লেখক এমনভাবে রেখে দিয়েছেন যে, সতীনাথের কল্পনা পুরোমাত্রায় সক্রিয় হয়েও নিজেকে জানানি দেয় না, রসবস্তু ও বিষয়বস্তু একই রূপ পরিগ্রহ করে। যে কোনো কবির, বিশেষ করে ঔপন্যাসিকের এটা একটা মহৎ গুণ সন্দেহ নেই—কেননা, উপন্যাসে আমরা জীবনের বাস্তব তন্নিষ্ঠ রূপটাই দেখতে চাই। তবে ক'টা রচনাতেই বা আমরা এই গুণটি দেখতে পাই, শক্তির অভাব ঘটলেই আমরা বিষয়ের বিকৃতি এবং লেখক-মনের আরোপটাই বড় হতে দেখি।

খ. জাগরী আলোচনার প্রথমেই এর বিশিষ্ট গঠন-রীতির পরিচয়

নিয়েছিলাম। এতে গল্প নেই, প্রচলিত আদর্শে চরিত্র-চিত্রণও নেই।' এক নতুন ধরণের প্লট রচনা আছে—এর ঘটনাগুলি এসেছে চরিত্রের স্মৃতিচারণার সূত্রে, তার অন্তশ্চৈতন্যের বাহন হয়ে। ঘটনাগুলি কিন্তু অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক, মানব-সংসারের নানা ছোট-বড় আস্বাদ্য উপাদানে ঠাসা। এইভাবে ঘটনাগুলো ঘটতে ঘটতে প্রায় একটা স্বয়ংক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত জগতকে যেন সৃষ্টি করে তোলে। অথচ মনে রাখতে হবে, ওগুলো মোটেই ফোটোগ্রাফ নয়, জাগরী-র কল্পনা-কেন্দ্রে যে অস্তিত্ব-চৈতন্য তারই বৃন্তে ওগুলি বিধৃত, তারই বাহ্যরূপ। আমরা আগেই নমুনা হিসেবে এইরূপ কিছু ঘটনা-চিত্রের ব্যাখ্যা করেছি।

প্রাগুক্ত হিন্দি-ভূমিকায় সুনীতিকুমার আর একটি কথা বলেছিলেন, 'মনকে গহিরে-সে-গহিরে প্রদেশোঁকী খোলকর অবচেতনাকী ক্রিয়া দিখাঈ হ্যায়, বহ কিসী ভী ভাষাকে কথাসাহিত্যকে লিয়ে অপূর্ব রসসর্জনা বনী হ্যায়।'—অবচেতনা কথাটি সমালোচক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন জানি না, ফ্রয়েডের সাব্‌কন্‌সাস হলে জাগরী-র ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা, অবচেতনার অবলম্বনে যে সব মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কিংবা পরাবাস্তবী শিল্প রূপ পায়, তাতে বিষয়ের এতই রূপান্তর ঘটে যে, তাকে আর চেনাই যায় না। অবচেতনা গভীর অস্তিত্বচেতনারূপেই গ্রহণীয়। সতীনাথের কৃতিত্ব এই যে তিনি অস্তিত্ব-চৈতন্যের পূর্ণ সক্রিয়তা সত্ত্বেও বস্তুর বিকৃতি বা রূপান্তর ঘটান নি।

এখন, তাহলে আমরা জাগরী-র ভাষা সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এ ভাষা জাগরী-র মূল জীবন-কল্পনারই ভাষা। ভাষা থাকছে সহজ, সরল, নিরাভরণ, মৃদু কাকলির মতো, প্রায় অলক্ষভাবে সক্রিয়—তাকে বেঁধেছেনও নিচু স্বরে, কোথাও যেন তা সোচ্চার না হয়। আর তারই মাধ্যমে, বা তারই ফলে, উপন্যাসের চৈতন্য-বাহিত বস্তুরূপ তার নিজস্ব কুন্টুরে, রঙে ও আস্বাদ্যতায় স্বতোৎসারিত হয়; কোথাও কষ্ট-কল্পনা বা প্রয়াসের চিহ্নমাত্র নেই। এটা বিনা সাজের সাজ—শ্রেষ্ঠ অর্থে স্বভাবোক্তি অলংকার।

জাগরী-র ভাষা দেহের পরিচয় নিচ্ছিলাম, তার অন্তরঙ্গ প্রাণময়তা সমেত। এখন তার বিচ্ছুরিত লাবণ্যের প্রতি অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আলংকারিকেরা বলেন, কবির অভিনিবেশ বাচ্যার্থ রচনায়, সেইভাবেই তাঁরা শব্দ-নির্মাণ করেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিরা রচনাগুণে সেই বাচ্যার্থকে অবলম্বন

করেই সূক্ষ্ম রমণীয় অর্থের অনুরণন সৃষ্টি করতে পারেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য হতে পারে। সার্থক উপন্যাসে ঘটনা-বিন্যাসে ধ্বনি প্রতিধ্বনির ভাষাই অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এমন উপন্যাস আছে, যার ঘটনার পর ঘটনায়, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে অন্য এক সূক্ষ্ম অর্থের ব্যঞ্জনা চলতে থাকে—জাগরী সেই জাতীয় উপন্যাস।

এখানে অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে, ব্যঞ্জনাময়তা না থাকলেই কোনো উপন্যাস অপকৃষ্ট হয়ে যাবে। রচনার বিশেষ প্রকৃতি অনুসারেই কোনো উপন্যাসে ব্যঞ্জনাশক্তি সক্রিয় হয়, কোথাও হয় না। কপালকুণ্ডলা ও গোরা উভয়েই মহৎ সৃষ্টি—কিন্তু কপালকুণ্ডলায় অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়তা, গোরা-র বিশেষ ঘটনায় বা পরিচ্ছেদের বিশেষ অংশে সেই লক্ষণ বিদ্যমান।

জাগরী-র বাস্তব বর্ণনার স্বরূপ ও প্রকৃতির পরিচয় নিয়েছি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে জাগরী-র বাস্তব চিত্রগুলিতে এবং জৈবনিক পরিবেশে সূক্ষ্ম অর্থের অনুরণন হতে থাকে। আমরা আগেই এর অনেক উদাহরণ পেয়েছি। সেল, কারাগার, বাবা মা বিলু নীলুর চার জায়গায় অবস্থান, তারা যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, বাঁশের খুঁটি ধরে সরস্বতীর বনবন করে ঘুরপাক খাওয়া, মায়ের গাড়ির সামনে হঠাৎ দু'টি ছেলের জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়া—এসব পরিচিত জৈবনিক চিত্র হয়েও অন্য কোন অর্থ ফুটিয়ে তোলে তা দেখানো হয়েছে। এখানে আরো দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

'আমার নীল আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলাইতেছে। সিঁদুরে রঙ বেগুনি হইয়া উঠিল,—দেখিতে দেখিতে ধূসর হইয়া উঠিতেছে—আবার এখনই জমাট অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে।'

জেলের ভেতর সেল থেকে বিলুর দেখা গোধূলির ছবি, অতি পরিচিত রঙের পরিবর্তন। কিন্তু এই ছবিটি বিদগ্ধ পাঠকের কাছে অন্য একটি অর্থ বহন করে আনেঃ মানুষের চৈতন্যোৎসারিত ভাবনার নিয়ত পরিবর্তনশীলতা।

> 'অনেকগুলি পাখি একবার এ ডালে একবার ও ডালে যাইতেছে। এক দণ্ডও বিশ্রাম নাই! কিছুক্ষণের মধ্যেই তো চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে। তাহার পর সারা রাত নিঝুমের পালা;—তাই বোধ হয় শেষ মুহূর্তের এই চঞ্চলতা, এত ডানা ঝটপটানি, এত আনন্দ উৎসব—'

পাখিদের বর্ণনা, বাস্তবতার এতটুকু লাঘব নেই, কিন্তু ওরই মধ্যে মানুষের সত্তা-চৈতন্যের আলোড়ন এবং তার অন্তিম পরিণতি যে বিনাশ তা সুন্দর-ভাবে দ্যোতিত হয়েছে। তুলনীয়—

'নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।'

এ দুটি জাগরী-র প্রথম দিককার উদ্ধৃতি, একেবারে শেষ থেকে একটি তুলছি—মধ্যবর্তী অংশ থেকে জের টেনে নিয়ে ঃ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলিতে মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা বা উক্তির পুনরাবৃত্তির দ্বারা গভীর সাংকেতিক তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলেন। ডাকঘর-এ আছে, রাজা অমলকে চিঠি লিখেছেন, সে চিঠি আসছে, কেবলই আসছে—অমলের কাছে আনন্দময় যিনি মৃত্যুরূপে আসছেন, এ তারই সংকেত। রক্তকরবী-তে নন্দিনী বারবার অনুভব করছে, রঞ্জন আসবে—রঞ্জন নবযৌবনের দূত, মুক্তপ্রাণকে বরমাল্য পরিয়ে দেবার জন্য তার যাত্রা, মৃত্যুর ঘটনায় তার আসা একটি পরিণতি লাভ করেছিল।

জাগরী-র বিভিন্ন অত্যন্ত নিরীহ ঘটনায় সতীনাথ এইরকম সাংকেতিক তাৎপর্য সৃষ্টি করেন। বিলু বুঝতে পারছে—'গিনতি মিলান শেষ হইল, ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।' উপন্যাসের চার পাত্র-পাত্রী এইরকম বিভিন্ন উপলক্ষে জানতে পারছে, রাত এগোয়—নটা, দশটা, বারোটা, শেষ রাত্রি তিনটে, এইরকম। যেটি ক্রমে নিকট হয়ে আসছে, সেটি আর কিছু নয়, মৃত্যুরই পদধ্বনি। অন্যত্র, মৃত্যু যখন অত্যন্ত আসন্ন, তখন সতীনাথ সেটিকে ধরেন মোটর গাড়ির হর্ণের আওয়াজে, চারটি চরিত্রই সেটা নিজের নিজের অবস্থান থেকে শুনতে পায়। আমরা অনুভব করি, মানুষের সব চেষ্টিত, সব মানসিক আলোড়ন, এইখানটিতে এসে থেমে যায়—'মৃত্যু, শুধু মৃত্যুই ধ্রুব সখা'।

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি—রবীন্দ্রনাথ যাকে মৃদু মাধুর্যে ধরেন, সতীনাথ তাকেই নীলুর অনুভূতিতে পান অত্যন্ত তীব্র প্রখর রূপে—'খট্, খট্, খট্! গেটের দোতলা হইতে কে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছে।—বলদৃপ্ত গর্বান্ধ ব্যক্তির পৌরুষব্যঞ্জক পদধ্বনি—ধরণী তুমি বুঝিয়া লও, এই স্থানটুকুর মধ্যে আর কাহারও ক্ষমতা বা আদেশ চলিবে না—এখানে আমিই সর্বেসর্বা—এই ভাব।' নীলু বর্ণনা দিচ্ছে জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের, কিন্তু 'এখানে আমিই সর্বেসর্বা'—কে সর্বেসর্বা বুঝে নিতে আমাদের একটুও অসুবিধে হয় না।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ও বঙ্গের প্রথম কৃষি বিদ্যালয়

বসন্তকুমার সামন্ত

বাংলাদেশের প্রথম কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গৌরব হুগলী জেলার এক প্রাচীন সংস্থা উত্তরপাড়া হিতকরী সভার। স্বভাবতই পুরোনো এই কৃষি বিদ্যালয়ের আলোচনার আগে হিতকরী সভা সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু খবর জানা প্রয়োজন। উত্তরপাড়া নিবাসী হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত যুবক ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল* উত্তরপাড়া হিতকরী সভা স্থাপন করেন। "সভার উদ্দেশ্য ছিল এই রূপ: দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দুর্গতদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান, দরিদ্র রোগীদের ঔষধপথ্য প্রদান, বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুদের ভরণপোষণ, বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণী সভার শাখা স্বরূপ মাদক দ্রব্য বর্জ্জনে সহায়তা এবং সভার সভ্যদের উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন।"[১]

প্রতিষ্ঠার দিন থেকে হিতকরী সভা তার বহুবিধ হিতকর কর্মসূচী সাধ্যানুসারে অনুসরণ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে সভার অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] জাতীয়

---

* মেরি কার্পেন্টার তাঁর 'Six months in India' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল বলে উল্লেখ করেছেন সম্ভবতঃ সময়ের ব্যবধানে বিস্মরণবশত। কারণ, তিনি ১৮৬৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর উত্তরপাড়ায় এসেছিলেন এবং পুস্তকাকারে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। তা ছাড়া খসড়া নোট থেকে তোলার সময়ও তারিখ ভুল হতে পারে। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' পুস্তকের অন্তর্গত 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' প্রবন্ধে একই ভুল করেছেন। মনে হয় তিনি প্রত্যক্ষ সন্ধান-সূত্রের সাহায্য না নিয়ে মেরি কার্পেন্টারের বিবরণীকে প্রামাণ্য ধরেছিলেন। হিতকরী সভা প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃত বিবরণের জন্য এই লেখকের সদ্য প্রকাশিত 'হিতকারী সভা স্ত্রীশিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

১। বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮) পৃঃ ৭৫

২। দেশ-১৬ই নভেম্বর, ১৯৮৫ (৫৩ বর্ষ ২৭ সংখ্যা) বসন্তকুমার সামন্ত লিখিত প্রবন্ধ—'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ও অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা' (প্রচ্ছদ শিরোনামা 'বন্দিনী বামা') পৃঃ ২৭-৩৪

জাগরণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবংবিধ কর্মপ্রবাহ ছাড়াও উত্তরপাড়া হিতকরী সভা বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় কাজ করেছিলেন তার জন্মের দশ দিনের মধ্যেই। উত্তরপাড়ার পার্শ্ববর্তী মাখলা গ্রামে সভা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ) চাষী পরিবারের ছেলেদের জন্য এক কৃষিবিদ্যালয় Makla Peasant Boys' School স্থাপন করেন। স্পষ্টত বোঝা যায় কৃষিপ্রধান দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা সভার যুবক সভ্যবৃন্দ বেশ আগেই শুরু করেছিলেন। অন্যথায় ৫ই এপ্রিল যে সভা জন্ম নিল, সম্পূর্ণ নূতন এক ক্ষেত্রে তার কাজ ১৪ই এপ্রিল সুরু করা সম্ভব হ'ত না। সভায় সভ্যবৃন্দের এ চিন্তাপ্রবাহের সূত্র অনুসন্ধান করলে উনবিংশ শতাব্দীর তিনজন চিন্তানায়কের কথা বিশেষভাবে মনে আসে। তাঁর হলেন রেভাঃ ডঃ উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) ও জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮)।

এদেশে কৃষি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্গীয় কৃষি-উদ্যান সমিতির (Agricultural and Horticultural Society of Bengal) মাধ্যমে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও অভিজ্ঞতার নিরিখে এদেশে কৃষি শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে প্যারীচরণ সরকার বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করার সময় ছাত্রদের অবসরকালে শিক্ষার্থে ১৮৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষে একটি কৃষি শিক্ষা শ্রেণী পত্তন করেছিলেন। "An agricultural class was started by Peary churn for the training of the Barasat school students during their liesure hours."[৩] বাংলার শিক্ষাধিকারিকের ১৮৫১-৫২ সালের বার্ষিক বিবরণীতে তাঁর এই অভিনব প্রচেষ্টার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কৃষি শ্রেণীতে প্যারীচরণ ছাত্রদের উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্যাদির পর্যবেক্ষণ, সার প্রস্তত করণ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দিতেন, এ ছাড়া বারাসতে প্যারীচরণের সমস্ত সৎপ্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষক মহাপ্রাণ কালীকৃষ্ণ মিত্র ও স্থানীয় সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন দীননাথ ধর কৃষি শিক্ষা দান কার্যে তাঁকে

৩। Life of Peary Churn Sircar—M. N. Sircar M.A. B.L (Calcutta, 1914) p. 30

সাহায্য করেছিলেন। বারাসত স্কুল থেকে প্যারীচরণের কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (বর্তমান হেয়ার স্কুলে) বদলির (১৮৫৪ খ্রীঃ) কয়েক বৎসরের মধ্যেই উক্ত কৃষি শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটেছিল। এদিকে কৃষি উদ্যান বিদ্যা সমিতির কাজের প্রসারের জন্য সমিতির জেলা শাখাগুলি স্থাপিত হচ্ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর সিভিল সার্জন ডাঃ টমাস ওয়াইজের নেতৃত্বে সমিতির হুগলী জেলা শাখার পত্তন হল। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৮৩৬ সালের ১লা আগস্ট হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে তিনি এর অধ্যক্ষতার দায়িত্ব নিয়েছিলেন) প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় উত্তরপাড়ার কুলপতি ('Patriarch of Ooterparah') ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ জেলা সমিতির সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক হন এবং মূল কেন্দ্রীয় সমিতিতে যোগ দেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। কৃষি সম্বন্ধে কেরীর বৈজ্ঞানিক ভাবনা জয়কৃষ্ণকে স্বভাবতই উৎসাহিত করেছিল। তিনি বিদেশী পত্র পত্রিকার মাধ্যমে কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন ক'রে তার ভিত্তিতে তাঁর উত্তরপাড়ার প্রদর্শনী কৃষি খামারে নূতন ফল-ফসলের পরীক্ষা করতেন এবং পরীক্ষা সফল হ'লে তেমন ক্ষেত্রে তাঁর জমিদারিতে সেই নূতন চাষের প্রবর্তন করতেন। কৃষি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে তিনি মহাবিদ্যালয় স্তরে এরকম শিক্ষা প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে সরকারের কাছে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়েছিলেন। "Now Jaikissen began to realize that education can not be isolated from its social setting···After a careful study of this problem ·· Jaikissen came out with his plan of agricultural education on a collegiate level.···He outlined his scheme in a letter dated Mareh 15, 1864 to F. R. Cockerell, the Officiating Secretary to the Government of Bengal."[8]

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার যুবক সভ্যবৃন্দের কেউ কেউ অবশ্যই শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরী ও উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কৃষি-বিজ্ঞান মনস্কতা থেকে উৎসাহিত হয়ে বিদ্যালয় স্তরে কৃষিশিক্ষা প্রবর্তন-প্রসঙ্গে ভাবনা সুরু করেছিলেন। তাঁদের সভা প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে স্থাপিত বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণী সভার শাখা হিসাবে মাদক বর্জনে সহায়তার কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। স্বভাবতই বারাসত বিদ্যালয়ে প্যারীচরণ-প্রবর্তিত

৪। A Bengal Zamindar : Nilmani Mukherjee (1975)—p. 239

কৃষিশিক্ষা শ্রেণী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ তাঁরা পেয়ে থাকবেন। এ-সবের ফলাফলস্বরূপ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল যাখলায় কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় কৃষক সমাজের অনাগ্রহে অভিনব এই প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে মহাবিদ্যালয় স্তরে কৃষিশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তাঁকে নিরুৎসাহকর জবাব দেওয়া হল। কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে এরকম হতাশাজনক পরিস্থিতির কথা বাংলার ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে: "Agricultural Education had been persistently neglected though a beginning had been made early in 1821* by William Carey with the Agri-Horticultural Society, warmly supported, by Ram Gopal Ghosh and others."[৫]

কৃষি শিক্ষার স্বীকৃত ইতিহাস অনুসরণ করলে জানা যায় যে "In the middle of the 19th century, steps were taken for the first time to develop Indian agriculture on scientific lines by promoting research and agricultural education in the country.···In India the foundation for agricultural education and research was laid with the establishment in 1868 of a model farm at Saidapet near Madras, which was later converted into an agricultural school."[৬] পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কৃষি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু কৃষি শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় ভারতের একমাত্র কৃষি কলেজটিও অর্ধমৃত অবস্থায় চলছিল। "We have in India only the Madras Agricultural College....This institution since its foundation six years ago...has led to a half-starved

---

* Agri-Horticultural Society প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে। ১৮২০ সালের শেষ দিকে জন্ম বলে এখানে ১৮২১ সাল বলা হয়েছে মনে হয়।

৫। The History of Bengal—Edited by Narendra Krishna Singha—p. 468

৬। Agricultural Education in India—K. C. Naik (Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, April 1961) p. 29

existence."[৭] পাশ্চাত্য ধারায় সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রণী ছিল। কিন্তু প্যারীচরণ প্রবর্তিত সরকারী বিদ্যালয়ের কৃষি শ্রেণী (১৮৫১-৫২) ও উত্তরপাড়া হিতকরী সভা-প্রতিষ্ঠিত মাখলা কৃষি বিদ্যালয় (১৮৬৩) এর কথা বাদ দিলে কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রদেশের স্থান পশ্চাৎবর্তী। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শিবপুরের হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ('কৃষিদর্পণ' গ্রন্থ-প্রণেতা) মহাশয়দের মতো বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা সরকার কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন উৎসাহ দেখান নি। এমন কি রাজ্যের কৃষিসংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য অনেক দিন পর্যন্ত কৃষি বিভাগ খোলার কথাও ভাবা হয় নি। "ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এক একটি কৃষিবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালার কৃষি বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে ইহা স্থাপিত হয়।"[৮] কৃষিবিভাগের বিলম্বিত প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে তথা ভারতের রাজধানী কলকাতায় কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থাসহ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল—একথা সমসাময়িক পত্রিকা থেকে জানা যায়। "আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কৃষিশিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি স্কুল খোলা হইতেছে। ১১৬ নং বহুবাজার স্ট্রীটে ১লা মে (১৮৮৬) হইতে "বঙ্গবাসী স্কুল" নামে একটি স্কুল খোলা হইবে, কৃষি শিক্ষার জন্য তাহাতে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে।"[৯] অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে বঙ্গবাসী স্কুলের দুটি বিভাগ ছিল— সাধারণ বিভাগ ও কৃষি বিভাগ এবং ঐ বৎসর ১লা জুন থেকে ক্লাস শুরু হয়েছিল। বিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন কৃষি শিক্ষায় পারদর্শী বিলাত-প্রত্যাগত শিক্ষাব্রতী গিরিশচন্দ্র বসু **। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবাসী স্কুলের কৃষি বিভাগকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি।

শিক্ষায়তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিত ইতিহাসে সম্ভবত স্বল্পজীবী হওয়ার কারণে বারাসত

৭। The Indian Agriculturist—October 2. 1882—'The Improvement of Indian Agriculture', p. 352

৮। কৃষি গেজেট ২২ তম সংখ্যা ৩০শে মাঘ ১২৯৩ সাল—'বাংলার কৃষিবিভাগ' পৃঃ ৩১৬

৯। কৃষি গেজেট ১২শ সংখ্যা ৩০শে চৈত্র ১২৯২ সাল—পৃঃ ২৬৫

** প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্র বসু হুগলী ডাফ স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৮৭০) এবং হুগলী কলেজ থেকে এফ. এ (১৮৭৩) ও বি. এ (১৮৭৬) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

বিদ্যালয়ের কৃষিশ্রেণী, মাখলা কৃষি বিদ্যালয় ও কলিকাতাস্থ বঙ্গবাসী স্কুলের কৃষি শাখার কোন উল্লেখ নেই। সেখানে ইতিহাস সুরু হয়েছে ১৮৯৩ সাল থেকে। "The Bengal veterinary college was founded in 1893 and developed to the stature of a college in 1899. The University commission 1902 rightly stressed on the importance of Agricultural Science in a predominently agricultural country like India.......The higher Agricultural course that was opened at Shibpur college in 1899 was abandoned in 1901 and the lower course of two years fell in a moribund condition. The recommendation of the Govt. of India in its Despatch to the Secretary of state in 1905 for an Agricultural college in each province remained a pious hope never realised"[১০]

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষিশিক্ষার পূর্বোক্ত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা স্থাপিত মাখলা কৃষি বিদ্যালয় নিঃসন্দেহে এক অভিনব প্রচেষ্টা। বারাসত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবসর সময়ে চর্চার জন্য প্যারীচরণ সরকারের কৃষি শিক্ষা শ্রেণী প্রবর্তনের কথা মনে রেখেও একথা বলা যায় যে অল্পবয়সী কৃষক পুত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষাদানের প্রচেষ্টা এদেশে প্রথম সুরু করেন উত্তরপাড়া হিতকরী সভা এবং এদিক থেকে সভার গৌরবজনক প্রয়াস অবশ্যই স্মরণীয় ও আলোচনাযোগ্য। সভার যুবক সভ্যদের ধ্যানধারণা যে কতখানি সঠিক ছিল তার প্রমাণ মেলে পরবর্তীকালে কৃষি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনার মধ্যে। "In a purely agricultural colony such as this is, we want the children to grow up to be useful members of the community and this is the end that should be aimed at in their early training i'[১১] হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত কৃষি-বিদ্যালয়টি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে প্রথম। ভারতবর্ষেও তার স্থান প্রথম হতে পারে। কারণ, মাদ্রাজের সৈদাপেটে অবস্থিত আদর্শ খামার ও

১০। The History of Bengal, Edited by Narendra Krishne Singha—p. 468

১১। The Indian Agriculturist—July 2, 1883—p. 253

কৃষিবিদ্যালয়—যেটিকে কৃষি শিক্ষার ইতিহাসে এ যাবৎ প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠার (১৮৬৮ খ্রীঃ) পাঁচ বৎসর আগে মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে সভার এই দুঃসাহসী অভিনব প্রচেষ্টা যুগের অনেক অগ্রবর্তী হওয়ায় জনসাধারণের অনাগ্রহে স্থায়িত্ব লাভ করে নি। কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে এধরণের অনীহা ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকেও বর্তমান ছিল। "Agricultural education held out such forbidding prospect that the few Bengalis who received it in England towards the close of the century, were on their return driven to seek employment as Deputy Magistrates."[১২]

উত্তরপাড়ার স্থানীয় এক ইতিহাস থেকে জানা যায় "১৮৬৩ অব্দে উত্তরপাড়ার পার্শ্ববর্তী স্থান মাখলা গ্রামে কৃষক বালকদিগকে কৃষিবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাদান কল্পে হিতকরী সভা একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ও উহার মাসিক বেতন দু' আনা হইতে ছ' আনা পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। ইহার শিক্ষাদান কার্য্য কৃষকদিগের মনঃপূত না হওয়াতে বিদ্যালয়টি বৎসরাধিক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।"[১৩] শিক্ষায়তনটি স্থায়ী না হলেও বাংলার তথা ভারতের প্রথম কৃষি বিদ্যালয় হিসাবে অনন্য মর্যাদার অধিকারী এবং ভারতের কৃষিশিক্ষার ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের সীমিত জীবনকাহিনীর বিশেষ গৌরবজনক স্থান থাকা উচিত। সভার উক্ত মহতী প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সমর্থন দিয়েছিলেন হাওড়া সার্কেলের তৎকালীন উপবিদ্যালয় পরিদর্শক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। (সে সময়ে উত্তরপাড়া এই সার্কেলের অন্তর্গত ছিল।) মাখলা কৃষি বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত রাজকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়; তাঁর পদের নাম ছিল হেডপণ্ডিত। সে যুগে তাঁর বেতন ছিল মাসিক সাড়ে ছ' টাকা। বিদ্যালয়ের অবস্থান উপযুক্ত পরিবেশেই হয়েছিল। উত্তরপাড়া শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে

১২। The History of Bengal—Edited by Narendra Krinhna Singha—p. 468

১৩। উত্তরপাড়া বিবরণ—অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০) পৃঃ ৫০

অবস্থিত মাখলা গ্রামের মাটি স্বভাবত উর্বর। গ্রামের দক্ষিণে প্রবাহিত বালি-খাল থেকে প্রয়োজনীয় সেচের জল শস্য উৎপাদনের নিশ্চিত সহায়ক। মাখলা এলাকার বাসিন্দারা প্রধানত কৃষিজীবী। সে দিক থেকে কৃষক পরিবারের পুত্রেরা বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষা গ্রহণ করলে তাকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নততর উৎপাদন সম্ভব করতে পারবে—এমন আশা বাস্তবায়িত হতে পারত। কিন্তু যে কোন প্রাচীন ব্যবস্থার অচলায়তনকে ভাঙা সহজসাধ্য নয়। যে কৃষকেরা পূর্বপুরুষের থেকে প্রাপ্ত পুরাতন ক্রিয়া-কৌশলের দ্বারা ফসল ফলাতেন তাদের নূতন ভাবনায় ভাবিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। মাখলা কৃষি বিদ্যালয় সম্পর্কে স্থানীয় কৃষক অধিবাসীবৃন্দের কোন আগ্রহ ছিল না। তবু হিতকরী সভার সভ্যদের উৎসাহের ফলে প্রথমে কিছু সাড়া মিলেছিল। মাত্র ১২ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪০। এদের মধ্যে ৫ জন ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে দেয় এবং আরও ৫ জন ১৮৬৩ সালের নভেম্বরে স্থানীয় এক মারক জ্বরে মারা যায়। ফলে ১৮৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষের শেষে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল ৩০ জন। ছাত্রগণ অল্পবয়স্ক হওয়ায় তাদের লাঙ্গল-চালানোর কাজ করতে হত না। বস্তুর সাধারণ গুণাবলী, আকর্ষণ, ফুল ও গাছের গঠন, কৃষি-সার প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করানো হত।

প্রথম বৎসর বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্যারীমোহন মালিক শ্রেষ্ঠ ছাত্র বিবেচিত হয়েছিল। সেই পরীক্ষার এক প্রশ্নপত্র ও সে বিষয়ে প্যারীমোহনের উত্তরটি উদ্ধৃত করা যাক।

প্রশ্ন

(১) বস্তুর সাধারণ নাম কি? পরমাণু কাহাকে কহে, কিরূপে পরমাণু পরীক্ষা করা যায়, বায়ুতে পরমাণু আছে কি না?

(২) পদার্থের সাধারণ গুণ কি কি, এবং জড় পদার্থের কোন গুণ থাকাতে দুই বস্তু এক সময়ে একস্থানে থাকিতে পারে না?

(৩) আকর্ষণ কাহাকে কহে, তাহাদের নাম কি? বৃক্ষ হইতে পাতা পড়িতেছে, এবং বৃক্ষ মস্তকে জল উঠিতেছে, এই সব কোন্ আকর্ষণের কার্য্য?

(৪) পুষ্পের প্রত্যেক অংশের নাম দাও, পুষ্প হইতে বীজ কিরূপে জন্মে, পরিপক্ক বীজ কতদিন থাকিতে পারে, গোলাপ পুষ্পের বীজ কতদিন পরে অঙ্কুরিত হইতে পারে?

(৫) সার কাহাকে কহে, সার কত প্রকার, কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়? কোন্ কোন্ (সার) শস্যক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে, কোন্ প্রকার সার না পাইয়া অরণ্যে কি প্রকারে বৃক্ষ জন্মে?

শ্রীপ্যারীমোহন মালিকের উত্তর অবিকল প্রকটিত হইল।

১। বস্তুর সাধারণ নাম পদার্থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু মিলিয়া পদার্থ হয়। পদার্থের যে অতি সূক্ষ্ম অংশ যাহা কোন যন্ত্র বা কৌশল দ্বারা বিভাগ করা যায় না তাহাকে পরমাণু কহে; কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ সকল পদার্থ পরমাণু সমষ্টি। স্পর্শজ্ঞান দ্বারা বায়ু অনুভব হয়, বায়ুতে পরমাণু আছে।

২। স্থানাবরোধতা, বিস্তৃতি, আকৃতি, বিভাজ্যতা, নিশ্চেষ্টতা পদার্থ মাত্রেরই এই কয়েকটি গুণ আছে। স্থানাবরোধতা গুণ থাকাতে এক সময়ে দুই বস্তু এক স্থানে থাকিতে পারে না, যেমন একটা কলসী বিপরীত দিকে মগ্ন করিলে কলসীর ভিতর জল উঠিয়া কলসী মগ্ন করিতে পারে না।

৩। যে বন্ধনী দ্বারা পরমাণু সকল পরস্পরে আকৃষ্ট হয় তাহাকে আকর্ষণ কহে; আকর্ষণ তিন প্রকার, যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিকাকর্ষণ। গাছ হইতে পাতা পড়িতেছে ইহা মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য, গাছে রস উঠিতেছে উহা কৈষিকাকর্ষণের কার্য্য।

৪। পুষ্পের চতুর্দিকে পাবড়ি আছে উহাকে দল বলে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতার মত কেশর আছে তাহাকে পরাগকেশর বলে। পরাগকেশরের মধ্যস্থলে যে একটি স্থূল কেশর আছে তাহাকে গর্ভকেশর কহে; পরাগকেশরের মাথাতে যে অণু আছে তাহা গর্ভকেশরে পড়িয়া বীজ উৎপন্ন করে। পরিপক্ক বীজ দুই সহস্র বৎসর থাকিলে নষ্ট হয় না। গোলাপের বীজ দুই বৎসর পরও অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। যে বস্তু মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে তাহাকে সার কহে। সার চারি প্রকার, যথা, বস্তু সার, উদ্ভিজ্জ সার, ধাতু সার ও মিশ্র সার। জন্তু সার মধ্যে রক্ত, শৃঙ্গ, পচা মাংস ও হাড়ের গুঁড়া। রক্ত, চারার পক্ষে উত্তম উপকারি, হাড়ের গুঁড়া স্থূল ২ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে উত্তম সার হয়, মাটি আলগা রাখে, ইহা ইক্ষু ও গেঁড়োর পক্ষে উপকারি। জন্তু দেহ, মাংস, নখ ইত্যাদি পচিয়া উত্তম সার হয়, এই জন্য গোরস্থানে সহজে বৃক্ষ

জন্মিয়া থাকে। জন্তু দেহ পচাইতে হইলে উহা মাটিতে পুতিয়া উহার উপর চূণ ছড়াইতে হইবেক।

উদ্ভিজ্জ সার নানাপ্রকার, তন্মধ্যে খোল প্রধান, বৃক্ষের পাতা, ও বড় বৃক্ষ শাখা পচিয়া উত্তম সার হয়। ধাতু সারের মধ্যে চূণ অপেক্ষা জল প্রধান, চূণ হিমপ্রধান দেশে প্রচলিত। জন্তু, উদ্ভিজ্জ ও ধাতু সার মিশ্রিত হইয়া মিশ্রসার হয়। মিশ্রসার মধ্যে গোময় ও গোমূত্র প্রধান। অরণ্যে কোন সার না পাইয়া বৃক্ষের বৃদ্ধি হয় তাহার কারণ এই গ্রীষ্মকালে পাতা পড়ে বর্ষাকালে উহা পচিয়া উদ্ভিজ্জ সার হয়; কাজে কাজে গাছ বাড়িয়া উঠে।"[১৪]

পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা সম্পর্কে সীমাবদ্ধ সাফল্য থাকলেও কৃষকদের অনাগ্রহের ফলে দ্বিতীয় বছরে তেমন ছাত্র ভর্তি না হওয়ায় বিদ্যালয়ের কাজে ভাটা পড়ল। এইভাবে বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয়ের বিলুপ্তি ঘটল। তবে স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও এ ধরণের বিদ্যালয়ের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে সে কথা তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ ভাবতে সুরু করেছিলেন। হিতকরী সভার প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে তার শিক্ষসূচীর তত্ত্বাবধায়ক মন্মথ চট্টোপাধ্যায় মাথলা কৃষি বিদ্যালয় সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়ঃ "In conclusion, I beg to draw the attention of the Shova to the importance of this valuable institution as a means for the improvement of Agriculture, on which depends the future prosperity of our country, and a neglect of which is the source of misery which befals man in the shape of famine so horrible and dreadful in nature as the people of Ireland, Scotland, Lancashire and India had to suffer most bitterly."[১৫]

১৪। Report of the Utterparrah Hitokorry shava for the year 1863-64-Appendix C—pp. 20-21.

১৫। Ibid—p.8

উত্তরবাংলার লোকসমাজ ঃ দেশী-পলি-ক্ষত্রী

শিশির মজুমদার

সাংস্কৃতিক পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—তিন বিষয়ে যে বেদ-বিধি তাতে দেশী ও পলিতে বিশেষ ভেদ নেই। সন্তানের নামকরণ বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের মতোই। ধর্মাচরণেও উভয় সমাজই বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। তবে নিজ নিজ দেবদেবীর প্রতিও তারা অনুগত। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও কালীকে উভয় সমাজে কেউ অস্বীকার করেন না। আবার অন্যপক্ষে, পীরও উপাস্য। মহরমের সময় জঙ্গের গান করেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানসিক অনুযায়ী ঐ গান করা হয়। তেমনি সৈত্‌পীর, বিষহরি, লক্ষ্মীয়ালা ও লবকুশের গান, এবং চণ্ডীয়ালা গীত হয়। সৈত্‌পীর, জঙ্গের গান, বিষহরা, দেশীরাই করে থাকেন।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যে দেশী পলি, মুসলমান ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর অবদান সংমিশ্রিত, তুলনামূলকভাবে দেশী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমন পাখার বাড়ীর গান রঙ্কুয়ালা, কালীপূজোর অমাবস্যায় চোরচুন্নী নটুয়া, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোয় খ-জাগর, দোলপূর্ণিমায় ভোলের গান, মরিয়া চাড়িয়া, বিষহরা পূজো উপলক্ষে ব-খেলার গান প্রভৃতিতে দেশীদেরই প্রাধান্য। সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি 'খন' গান তো তাদেরই সৃষ্টি।

ব্রতকে 'ব' নামে অভিহিত এঁরাই করেছেন। যেমন, বৈশাখ মাসে বৈশাখ-ব, আষাঢ় মাসে আষাঢ়ী-ব, শ্রাবণে বিষহরি-ব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী-ব, খোয়ত্ত পীরের-ব, জিতুয়া-ব, আশ্বিন মাসে দলছিটা বা গাড়িগুড়িয়া-ব, কার্তিক মাসে গোধন-ব, বা চণ্ডী-ব, অগ্রহায়ণে একাদশী-ব, পৌষ মাসে লক্ষ্মী-ব, মাঘ মাসে-মাঘী-ব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ও এঁদেরই প্রভাবে ব্রতকে 'ব' বলেন। এর উদাহরণ কুশমণ্ডীথানার করঞী গ্রামের তাঁতি গণেশ সম্প্রদায়-এর মাঘী পূর্ণিমার কাম-ব। এবং নবশাখ, রাজবংশী ও কোন কোন মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ঘাটে-ব।

কাঠের মুখোশ, যা গমীরা খেলা বা রাম বনবাস চণ্ডীয়ালা গানে ব্যবহৃত হয়; তা দেশী পলি উভয় সম্প্রদায় তৈয়ারি করলেও দেশীরাই এর ব্যবহারে ও প্রচারে অগ্রণী। শোলার ফুল ও বিবাহ ইত্যাদিতে সোনা, রূপোর অলংকার নির্মাণে তাদেরই প্রধান অধিকার।

পলিরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীতে ছ' গুণ উপবীত ধারণ করাল দেশীরা ন' গুণ উপবীত ধারণ করেন।

দেশী-পলি উভয়েই সগোত্রে বিবাহ হয়। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি বিবাহ বা প্রেমও হয় তবে আজও এই নিয়ে 'খণ্ড' হয় এবং পরিণামে খন গান বেঁধে গ্রামে গ্রামান্তরে সেই 'খণ্ড' প্রচারিত হয়।

দেশীদের বিয়েতে ঘটকের নাম কারোয়া, পলিরা তাকেই বলেন কামিয়। বিয়ের দায়িত্ব নেন 'শয় সামান'। এই সামানের প্রধানের নাম মহৎ। বিয়েতে কৈনা পণ প্রথা এখনও প্রচালত। পলিরা বিয়েতে হলুদ কোটেন। কিন্তু দেশীরা কাসাই নামে এক রকমের গাছ (যার পরিচয় লোকগানে দেওয়া হয়— 'কাশাইয়ের গাছটো থেকেরা গে খুকুর) খুঁড়ে, ঢেঁকিতে কুটে 'খলায়' ভেজে বিয়েতে বর কনের গায়ে মাখান। বিয়েতে 'পারাম' অবশ্য পূজ্য। আবার অধিবাসে কীর্তনও আছে। আছে 'অখাল' বা রাখাল ভোজন।

দেশী পলিদের দেবদেবীর সংখ্যাও অনেক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূর্তি নেই। একটি গাছের নীচে মাটির বেদি, টুকরো পাথরই সেই দেব-দেবীর প্রতীক। তবে ইদানীং মূর্তি তৈরি হয়েছে অনেক। কিন্তু অসংখ্য কালীর কোন মূর্তি প্রায়শ দেখা যায় না। তাদের কয়েকটি দেবদেবীর নাম বুড়িমা, বসন্ত ঠাকুরণ, মাশান কালী, বুড়োকালী, চণ্ডী, সাপকালী আবার মাশান, মহারাজ, বুড়া, গ্রামবাবা এবং মুসকিল আসান পীর, তাজবাজপীর, একিন পীর, বুড়াপীর চেল পীর প্রভৃতি।

দেশী পলিজনের মহান ঐতিহ্য

৬

দেশী পলিদের সঙ্গে পঃ দিনাজপুর জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক খুবই কৌতূহলকর। বহু দেশী পলিকে মুসলমানদের প্রণাম করতে দেখেছি। মুসলমান সমাজের বহু ক্ষেত্রে বিয়ের গান ও আচারে দেশী-পলি সমাজের আচার-আচরণ লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া দেশী-পলি সমাজের ঘরজিয়া, ভাসুয়া, পাছুয়া, ঘরঢোকা বিয়ের রীতি এখানকার বহু মুসলমান সমাজেও দেখা যায়।

দেশী-পলিদের দেবদেবী বহু মুসলমানের দেবদেবী। একই সঙ্গে কালী বা বুড়ির থানে পায়রা মানসিক করে বলি দিচ্ছেন। মুসলমান সমাজও যে দেশী পলিদের থেকে বেশি দূরে নয়, তাই দুর্নীতি, অবৈধ-প্রণয়ের ঘটনা ঘটলে 'খন্ গান' বাঁধা হয়। কিন্তু কখনোই উচ্চ বর্ণের হিন্দুর কোনো ঘটনা নিয়ে খন বাঁধা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় উচ্চ বর্ণ-হিন্দুদের থেকেও মুসলমানরা তাদের সমাজের অনেক কাছাকাছি।

দেশী-পলিরা মুসলমানদের তুরুক বলেন। এই নামকরণ তুর্কী আক্রমণের ইতিহাসকে স্মরণ করায়। মুসলমানরা যে শাসক ছিলেন তা দেশী পলিদের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। একথাও শোনা যায়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বহু দেশী পলি মুসলমান হয়েছেন। আমার ধারণা, এ ধর্মান্তরকরণ বলের দ্বারা হয়নি। বর্ণ হিন্দুদের অনুদারতা মুসলমান ধর্মের উদারতায় এ ধর্মান্তরকরণ হয়েছে। তবে, ধর্মান্তরকরণ হোক বা না হোক নীচের তলায় দেশী পলি ও মুসলমান সমাজ জীবনে পরস্পরের খুব সন্নিকটে।

সামাজিক নানা কারণে দেশী ও পলিদের মধ্যেও উপবিভাগ আছে। দেশীরা মোট ২টি উপবিভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে আবার ৫টি উপবিভাগ আছে। সেদিক থেকে পলিরা মাত্র দুটি উপবিভাগে বিভক্ত। (১) মতুয়ান্ বা রাবু পলি, (২) সাধু পলি।[২] দেশীদের মধ্যে বড় দেশী ও ছড় বা ছোট দেশী—এই দুই প্রধান বিভাগ আছে। বড় দেশীর নাম ধানুয়া। ছট দেশী হল, (১) একুকরিয়া, (২) ডকই (৩) ঢ্যাকড়া, (৪) টুনি কোচ।

ধানুয়া বা বড়দেশীর মেয়ের সঙ্গে ছোট দেশী একমাত্র টুনি কোচ ভিন্ন বাকি সকলের ছেলের বিয়ে হতে পারে। কিন্তু ধানুয়ার ছেলের সঙ্গে ছোট দেশীর মেয়ের বিয়ে হয় না।

আর কোনো 'দেশী' ছেলে মেয়ের সঙ্গে পলির ছেলে মেয়ের বিয়ে হবে না। অর্থাৎ দেশীরাই এ বিয়ে সম্বন্ধ করেন না।

ধানের সঙ্গে উয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধানুয়া। ধানের অধিকারী দেশী ধানুয়া দেশী। যে দেশীদের বেদবিধিতে এক সংখ্যা তারাই একুকরিয়া। অর্থাৎ বিয়েতে একটি মাত্র কলাগাছ ব্যবহার ও এক পাক ঘোরা এবং মৃতব্যক্তিকে একটি বাঁশে ধোকরায় মুড়ে নিয়ে যাওয়া একুকরিয়ার বৈশিষ্ট্য। যে পরিমাণে বেশি খায় সে হল ডকুই। ঢ্যাকড়া ও টুনিকোচের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি।[২]

দেশী পলিদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো বিনিময় প্রথা বিদ্যমান।

যেমন শাকসবজীর বদলে ধান। কিংবা মাছের বদলে ধান। অথবা ধানের বদলে ধোকড়া। আবার, শ্রমের বদলে ধান বা অন্য শস্য। একটি নটুয়া গানে মাছের বদলে ধান সংগ্রহ করার তথ্য শুনি। 'খন গানে' লালু সোহাগী পালায় সোহাগীর দরিদ্র পিতা তাকে 'খিয়ার বদলাই খা'-এর কথা বলেছে। অর্থাৎ খিয়ার অঞ্চল ধানের জায়গা। সোহাগীর পিতার এলাকায় ধান বেশি নেই কিন্তু শাকসবজী আছে। তার বদলে ধান নিয়ে আসতে বলা হয়েছে ঐ পালায়। অথবা ঢাকোশোরী খন-এ দেখি 'ভাতার ছাড়ি' (যে স্বামীকে ছেড়ে আসে) মনোকে তার বাবা 'শাওনিয়া' মাসের আমের বদলে ছোট ছোট কচ্ছপ নিয়ে আসার কথা বলছে।

জলপাইগুড়ি কোচবিহারে বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দিলে হুদুম দেবতার পুজো করেন রাজবংশী মেয়েরা। তার নাম হুদুম দেওর গান। পশ্চিম দিনাজপুরে দেশী-পলি এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েরা অনাবৃষ্টির সময়ে রাত্রে নগ্ন হয়ে যাদু বিশ্বাসের অনুবর্তী 'জলমাঙ্গী' আচার ও গান করেন।[৩] এইসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশীদের পার্থক্য সামান্যই।

সুতরাং, দেশী পলি ও রাজবংশী মূলত একই গোষ্ঠীর। রাজবংশী ও দেশীর নামের তাৎপর্য বোঝা গেলেও 'পলিয়া' নামের তাৎপর্য এখনো নির্ণীত হয়নি। বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী তাঁর আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি গ্রন্থে লিখেছেন 'গরদের পোকা পোষণ এবং তুঁতে গাছের চাষ জীবিকার জন্য রাজবংশী জাতীয় একাংশ বরেন্দ্র বিভাগে 'পলিয়া' নাম পাইয়াছেন। বরেন্দ্রে গরদের কীটকে 'পলু' বলে।'[৪]

শ্রী:যাগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পলিয়াদের 'The Military castes' বলেছেন। তাঁর মতে, The paliyas themselves drive their class name from the Sanskrit word 'paloyita' which means 'fugitive' and claim, to be fugitivs kshatriya degraded to the rank of Sudras for the cowardice betrayed by them in a great battle which took place at some remote period of antiquity.[৫]

অধ্যাপক গৌতম ভদ্র তাঁর মুঘল যুগে কৃষক বিদ্রোহ নিবন্ধে[৬] উত্তরবঙ্গের 'পালি পাইক'দের কথা উল্লেখ করেছেন। এই পালিরা হাতি ধরার কাজও করতেন। এঁরা ছিলেন একাধারে সৈনিক ও অন্য ধারে কৃষক। সামন্ত প্রভুদের যুদ্ধের সময় সাহায্য করার জন্য বা সীমান্ত অঞ্চল পাহারা দেবার জন্য

এরা বিনা রাজস্ব 'পাইকান' বা 'চাকরাণ' বলে চাষযোগ্য ভূমি ভোগ করত।

G. H. Damant সাহেবের প্রতিবেদন থেকেও বোঝা যায় কোচ, পাল, রাজবংশীগণ যুদ্ধজীবী জাতি। তাঁরা লোহার অস্ত্র ব্যবহার জানতেন না। বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরীও তাঁর গ্রন্থে অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন।[৭]

পশ্চিম দিনাজপুরে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে করতোয়া মহানন্দার মধ্যবর্তী যে অংশে পলিয়ারা বসবাস করেন, এই অংশটি পলিমাটি দ্বারা সুগঠিত। অর্থাৎ পলি অঞ্চলের বাসিন্দা বলে পলি বা পলিয়া।

পলিয়া নামের উৎপত্তি যাই হোক তাঁরা অতীতে যুদ্ধজীবী জাতি ছিলেন। তাঁদের প্রধান অস্ত্র ছিল লাঠি। রাজবংশী ও কোচদের সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা যেতে পারে।

এখন, আমাদের কাছে স্পষ্ট যে কোচদেরই একটি অংশ বহুকাল পূর্বে দিনাজপুর ও তৎসন্নিহিত শস্য শ্যামলাঞ্চলে এসে ভূমির অধিকারী কৃষিজীবী হন। সুতরাং কৃষিজীবীর বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, এই অঞ্চলে তখন 'সাংস্কৃতিক হিন্দুত্বের' প্রাধান্য। দেশীরা এর দ্বারা কিছু প্রভাবিত হতেই পারেন। তাঁদের মুখের ভাষা ও আচারগুলো কিছু কিছু এর নিদর্শন। রাজবংশীরা যেখানে ভুটান দেশে নিরাপত্তা বোধ করেন, সেখানে দেশীরা মোরঙ্গ। এর থেকে এও অনুমান করা চলে যে রাজবংশীদের পিতৃভূমি ভুটান আর দেশীদের মোরঙ্গ।[৮]

দেশীদের ঢেঁকির ব্যবহার, সীতাকে লক্ষ্মীরূপে বন্দনা,[৯] কৃষিজাত দ্রব্য হাটে বিক্রি না করা। সম্প্রতিকালে ন'গুণ উপবীত ধারণ করা, পিতৃভূমি মোরঙ্গ নির্দেশ করা এই অঞ্চলের দীর্ঘকালীন ভূম্যধিকারী রূপে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া চলে এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁরা স্বগোষ্ঠী থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করেন। অন্যপক্ষে, পলি রাজবংশীদের উদুখল ব্যবহার, হাটে বাজারে জিনিসপত্র বিক্রি এবং নানা ধরনের পেশা গ্রহণও তাঁদের যুদ্ধজীবী জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

জীবন-জীবিকা অর্থনৈতিক বা 'সভ্যতার' অধিকারের উপর শ্রেণীবিন্যস্ত হয়। সেই কারণেই দেশীদের সঙ্গে পলিদের পার্থক্য। এবং ধানুয়া দেশীর তুলনায় অনাদেশীরা তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর।[১০]

পলিদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে ছ'গুণ উপবীত ধারণ, যার ফলে শ্রেষ্ঠতর

বোঝাতে দেশীদের ন'গুণ উপবীত ধারণ এবং বর্ণহিন্দু আচার আচরণ অনুসরণ প্রমাণ করে an effort to raise their status.[১১]

আমরা এও দেখি দেশী পলিয়াদের সামাজিক গড়ন পিতৃতান্ত্রিক বা কর্তা প্রধান। বর্ণহিন্দু সমাজের মতো তা সুদৃঢ় বা ঋজু নয়। এ ক্ষেত্রেও আর্যকরণ বা সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাসের ভাষায় 'Sanskrit Hinduism' 'এর প্রতি প্রবণতা যা পুনশ্চ তাঁরই ভাষায় 'Sanskritisation-এর ফল। কিন্তু, পুরোপুরি মাতৃত্বে-বা নারী স্বাধীনতা হৃত হয়ে যায় নি।[১২]

আরেকটি বিষয় Sanskritic Hinduism-এর গোঁড়ামি এবং অনুদারতায় বৈষ্ণব ধর্মের দিকে এঁদের প্রবণ করেছে এবং পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতা যখন হিন্দুদের গোঁড়ামির মতোই সু-উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করে 'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ' মতকে সংকুচিত করে তখন তাঁরা আউল বাউল সহজিয়া বৈষ্ণবতার এবং কোথাও কোথাও নাথধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

তাই, দেশী পলি সমাজ 'সাংস্কৃতিক হিন্দুত্বের' এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে সাংস্কৃতিক আসরে আরো অবহেলিত বহু গোষ্ঠীকে সঙ্গী করলেন। অথচ নেতৃত্ব তাদেরই হাতে থাকল।

প্রমাণপঞ্জী :

১। দা ট্রাইব্স এণ্ড কাষ্টস্ অব বেঙ্গল (১৮৯১) গ্রন্থে রাইজন সাহেব ও বাবু পলি ও সাধু পলির কথা বলেছেন।

২। এইসব তথ্য দিয়েছেন :

নারায়ণ চন্দ্র সরকার (দেশী)	গ্রাম: সরলা।	কুশমণ্ডী।	পশ্চিমদিনাজপুর।
ভূপালচন্দ্র সরকার	(ঐ) গ্রাম: দিনের।	ঐ	ঐ
অজিতচন্দ্র সরকার	(ঐ) গ্রাম: কৃষ্ণানগর।	ঐ	ঐ
হরেন দেবশর্মা	(ঐ) গ্রাম: টুঙ্গুইল।	কালিয়াগঞ্জ,	ঐ
শিবচরণ দেবশর্মা	(ঐ) গ্রাম পশ্চিম রামপুর।	ঐ	ঐ

৩। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই অনুষ্ঠানের নাম মোতিয়া। 'মুহম্মদ আয়ুব হোসেন 'মতিয়া: একটি লোক উৎসব' নিবন্ধে জানাচ্ছেন যে তিওর, চুলি, রাজবংশী, পরয় এবং মুসলমানরা এই অনুষ্ঠানে করে থাকেন। দ্র:

'লোক সংস্কৃতি' ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা-৫ম সংখ্যা—শ্রাবণ-আশ্বিন। ১৩৮৫, ৮ম বর্ষ : কার্তিক-আশ্বিন ১৩৮৬, পৃ: ১-৫।

৪। পৃ: ৩৬৪

৫। Jogendranath Bhattacharya, Hindu Cast and Sects part III : The Military Castes, page : 122.

The Paliyas and the Koch of North Bengal seem from their physiognamy to be a Mongolian race. They are now purely agriculture.'

৬। 'এক্ষণ' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৫, পৃঃ ৮৯। এই বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের আকর : মুঘল সামরিক কর্মচারী মির্জানাথনের (জাহাঙ্গীরের আমলে) প্রতিবেদন 'বহরিস্তান-ই-ঘায়েবি'। এম. আই বোরা অনূদিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, গৌহাটি ১৯৩৬।

৭। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Kirata-Jana-kriti গ্রন্থে উত্তরবঙ্গে 'Mongoloid Origin' দুর্দ্ধর্ষ পাইকদের কথা উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ৩৩।

৮। জলপাইগুড়ি জেলার একটি থারোছলি গানের অংশ :

বন্ধু পালাবতে চল আজি
পালায়া যাম পশ্চিম তি

....

পশ্চিম পানি ভোটের গাও।

গায়ক : ভাটিয়া রায় (রাজবংশী) খুরকি পাড়া। ডাকঘর : ভাঙ্গাপাড়া। জেলা : জলপাইগুড়ি। নিজস্ব সংগ্রহ।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বন্ধুয়ালা গানের অংশ :

তুহিয়ে মুহিয়ে পলাই থামরে
ঘরং দেশং ভিতি।

গায়ক : মুনিয়া দেশী। গ্রাম—শিবপুর, ডাকঘর : বাঘন। নিজস্ব সংগ্রহ।

৯। আকর : লক্ষ্মীযানা গান।

১০। অর্থনীতিভাবে স্বচ্ছল আদিবাসীদের স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেণী চরিত্রের বদল ঘটে এবং তখন তারা বর্ণহিন্দু ভূস্বামীদের অনুকরণ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করে।

—'ভারত ভূমিদাস প্রথা'—মহাশ্বেতা দেবী ও নির্মল ঘোষ। বর্তিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা। ১৯৮১ পৃঃ ৩৯

১১। When a great tradition Modernises : Milton Singer p. 68

১২। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতন্ত্রী। দাস প্রথার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ নারী জাতীর এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। এঙ্গেলস্ পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি : পৃঃ ৬৫।

এবং "সমাজে পুরুষের প্রাধান্য দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জোড় পরিবার এবং একপতি পত্নী পরিবারের মধ্যবর্তী স্তরে কর্তা প্রধান পরিবার দেখা দেয়। এই পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবারের কর্তার কর্তৃত্ব স্বাধীন মানুষ ও দাস নিয়ে পরিবারের সংগঠন।" আদিম সমাজের ইতিহাস : মনোরঞ্জন রায়, পৃঃ ২৮।

নানা মুখোশের ভারতবর্ষ

শুভ বসু

কলকাতার, বা হয়তো ভারতবর্ষেরই নাট্যআন্দোলনের ইতিহাসে আগামী বহুদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারিত হবে 'নান্দীকার'-এর নাম। এক অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাঁরা আমাদের ভারতচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন। আমাদের আজকের ভারতচর্চা তো অনিবার্য হয়ে ওঠে আত্মানুসন্ধানেরই তাগিদে, ভাষা ধর্ম সম্প্রদায়গত নানা বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ আক্রমণের সামনে যে আত্মানুসন্ধান আমাদের আত্মরক্ষারই প্রয়োজনে জরুরি বলে বিবেচিত হতে পারে।

তাই 'নান্দীকার' যখন উপর্যপরি চার বার ভারতের নানা প্রান্তের নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন কলকাতার মঞ্চে, তখন আর একভাবে সুযোগ পাওয়া গেল সেইসব প্রান্তের জীবনের শিল্পিত বাস্তবকে ছুঁয়ে ভারতবর্ষকেই আবার নূতন করে চেনার। তাতে তার বিভিন্ন প্রান্তের নানা সমস্যার ঐক্যকে যেমন অনুভব করি, তেমনি চিনতে পারি সে সব সমস্যার মোকাবেলায় রক্তাক্ত মানুষের মুখও, নিজেরই শনাক্তি যেন খুঁজে পাই মহারাষ্ট্রে, কেরালায়, কর্ণাটকে।

একথাও সত্যি যে, নাটকে ভারতবর্ষকে চেনা শুধুমাত্র সমাজভিত্তিকের চেনা নয়। চিত্রকলায়, নাটকে, চলচ্চিত্রে আমরা যে ভারতবর্ষকে পাই, তার সমাজবাস্তবতা নন্দন জিজ্ঞাসায় যে নূতন মাত্রা পায় তাতেই আরো অর্থময় হয়ে ওঠে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার আবেগ। হাবিব তানবির, জব্বর প্যাটেল, করন্থ বা বিজয়া মেহতারা আমাদের যে বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেন তাতে এসে লাগে শিল্পিতার এমন এক আভা, যা আমাদের সত্যকে চিনিয়ে দেয় এবং যাতে জীবনের বাস্তবতা, তাকে দেখার ভঙ্গি এবং তার রূপায়ণের কৌশল সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

আমাদের নিশ্চয় আরো বহুদিন মনে পড়বে তনবিরের 'চরণদাস চোর', 'বাহাদুর কলারিনে' কিম্বা কোভালম নারায়ণ পানিক্কর-এর 'করিম কুট্টি' বা শান্তা গান্ধীর 'যশমা ওড়ান'-এর কথা, যেখানে আবহমানের লোকায়ত আধুনিকের অন্বেষার সঙ্গে মিশে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার সামনে উন্মোচিত

করে দেয় চিরকালীন ভারতেরই এক সত্যস্বরূপ। আবার লোকায়তেরই অন্য এক নিরীক্ষার চিহ্ন হিসেবে মনে থাকবে 'ঘাসিরাম কোতোয়াল'-এর কথা। আজকের ভারতীয় নাটকের লোকায়তপ্রবণতা এবং তার অসামান্য সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণালাভের সুযোগ 'নান্দীকার'-এর গত তিনটি নাট্যোৎসবে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা।

কিন্তু তার পাশাপাশি অন্যধারাগুলিও যে উপেক্ষিত নয়, তাও জানা গিয়েছিল সেসব উৎসবেরই ভেতর। সমসাময়িক বাস্তবতার নিরলঙ্কার নির্মোহ ও স্বাভাবিক অভিনয় নির্ভর রূপায়ণও যে অস্তিত্বকে কতখানি আমূল আলোড়িত করবার ক্ষমতা রাখে তার অনবদ্য পরিচয়তো আমরা পেয়েছি সদাশিব আম্রপুরেকার-এর পরিচালনায় 'কন্যাদান'-এর মত নাটকে। 'পরগম'-এ আবার তরুণ প্রজন্ম বনাম প্রতিষ্ঠানের সংঘাত যেভাবে রূপকবর্জিত অথচ সংগীতনির্ভর স্টাইলাইজড বাস্তবের ভেতর দিয়ে ধরা হয়েছে, তা যেমন একদিকে রোমাঞ্চিত করেছে আমাদের তেমনি আবার জটিল দুরূহ নিরীক্ষার অভিযানগুলো সম্পর্কে সচেতনও করে তুলেছে।

চতুর্থ বছরে, 'নান্দীকার'-এর নাট্যোৎসব যখন আমাদের বার্ষিক রুটিনে নির্দিষ্ট ঋতুর মতই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যখন প্রাথমিক রোমাঞ্চের রেশ ম্লান হয়ে এসেছে অনেকটা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন প্রবণতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করে নেয়া গেছে, তখন নিশ্চয় আমাদের চাওয়া পাওয়ার হিসেব আগেকার বছরগুলোর চেয়ে একটু কঠোরতর হয়ে উঠবে। আমরা বুঝে নিতে চাইব আমাদের দর্শক অভিজ্ঞতায় কতখানি সত্যিকারের ফসল ফলাতে পারল এবারের নাট্যোৎসব। আমাদের পাওয়ার কিছুটা নিষ্করুণ হিসেবই কষতে চাইব আমাদের সত্যিকারের চাওয়ার সাথে মিলিয়ে।

'নান্দীকার' অবশ্য আত্মজিজ্ঞাসার এই প্রশ্নটিতে রাষ্ট্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশকে আলাদা রাখেন নি। কেননা, এবিষয়ে নিশ্চয় আত্ম জিজ্ঞাসারও অবকাশ নেই, রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতাসত্বেও আমরা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। এর আগে 'ঢাকা থিয়েটার'-এর 'কীর্তন খোলায়' সেদেশের সাম্প্রতিক নাট্যনিরীক্ষার পরিচয় পেয়ে নন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন এখানকার দর্শক।

এবারের নাট্যোৎসব শুরুই হয় তাঁদের নূতন একটি প্রযোজনা 'কেরামত

মঙ্গল' দিয়ে। যদিও আজকের বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য খুব পুরনো নয়, তবু সেখানকার তরুণ পরিচালক কিভাবে নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে পৌঁছোতে চাইছেন নাটকেরই নূতন এক ধারণায়, কিভাবে রূপক পরম্পরার ভেতর দিয়ে ধারণ করতে চাইছেন গত কয়েক দশকের বাংলাদেশের জনজীবনপ্রবাহের সমগ্র ইতিহাসকেই, তা লক্ষ্য করবার মত।

তাই নাটকটি রচনার পেছনে সেলিম আল-দীন যে দায়বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন তা আমাদের মুগ্ধ করে। চতুর বাবু-মনোরঞ্জনী কলাকৌশল নয়, তাঁর সমস্ত নিরীক্ষা ও নাটকের এক নূতন আঙ্গিকে পৌঁছোনোর প্রয়াসের পেছনে কাজ করে সেই তাড়না, যা শরীরে আত্মায় দেশজেরই রূপায়ণ ঘটাতে চায় নাটকে। সে তাড়নার পেছনকার দৃষ্টিভঙ্গিটি ঠিকমত বুঝতে সেদিনকার ছাপানো ইস্তাহার থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি হয়তো আমাদের সাহায্য করবে: "বাংলা নাটকের কাহিনী বহুক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ পঞ্চাঙ্করীতির ভয়াবহ অনুবর্তনে ক্লিষ্ট। কিন্তু 'কেরামত মঙ্গল' নাটকে মধ্যযুগীয় বাংলা নাট্যআঙ্গিক ও সমৃদ্ধ উপাখ্যানের ধারা একীভূত। এই নাটকের বিষয়বস্তুর কোনো তুলনা আধুনিক বাংলা নাটকে নেই। শুধু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত কাহিনীর সঙ্গে অংশত তুলনা চলে।" একটু পরে আরো বলা হয়েছে "আমরা এতে ইউরোপীয় নাটকের ঘটনাসংঘাতের রীতি থেকে কিছুনখোলার মতই একটা ভিন্ন আবহ পাই।'

অতএব নাট্যকারের অন্বেষণ স্বতন্ত্র দেশজ নাট্যরীতি প্রবর্তনেরই অন্বেষণ।

৪৬-এর বালক কেরামত তার বাবাকে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় চিরকালের জন্য হারায় তা-ই তার জীবনে প্রথম নরক দর্শনের অভিজ্ঞতা। সে আঘাতে ছিন্নমূল যেহেতু, তাই এরপরে স্থান থেকে স্থানান্তরে জীবনের টানে ভেসে যেতে হয় তাকে। ভেসে যেতে যেতে একের পর এক যে সমস্ত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে পৌঁছোয় সে, তার সমাহারই 'কেরামত মঙ্গল' নাটক। মঞ্চে রূপায়িত এরকম এগারোটি অভিজ্ঞতা যেন এগারোটি খণ্ড, যা নাটকে উল্লেখিত হয়েছে গণ্ডী বলে। এই এগারোটি অভিজ্ঞতা বা খণ্ডের ভেতরে রয়েছে ব্যাপক অর্থে স্থান ও কালপারম্পর্যগত ঐক্য, যদিও সংঘাতসংকুল কোনো সংহত কাহিনীতে ধরা হয়নি তাদের। প্রত্যেকটি খণ্ডের অবসানে নেপথ্যের 'গণ্ডী গণ্ডী'—এই সুরধ্বনি যেন বলে দেয়, একটি অভিজ্ঞতার শেষ হল, আর একটি অভিজ্ঞতায় এবার পৌঁছোবে কেরামত।

এ সমস্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নাট্যকার আমাদের যে দেশ-কালকে চেনাতে চান তার আগাপাশতলা যেন নরকের গ্রাসের ভেতর চলে গেছে একেবারে। প্রত্যেকটি গণ্ডী যেন এক একটি নরকের প্রতিরূপ, ভ্রূণ বিনষ্টি যার স্বভালক্ষণ। মরিয়া কেরামত তার সমস্ত কিছু দিয়ে অন্তত একটি ভ্রূণকে বিনষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে চায় এবং পরিণতিতে অন্ধত্ব বরণ করে নেয়। এভাবেই, কেরামতের চোখ দিয়ে নাট্যকার আমাদের চিনিয়ে দিতে চান ৪৬ সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের বাস্তবতাকে।

এ কাজ যেভাবে করতে চেয়েছেন তরুণ পরিচালক নাসিরউদ্দীন ইউসুফ তা আমাদের মনে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে সম্ভ্রম জাগায়। জামিল আহমেদ পরিকল্পিত চমৎকার মঞ্চটি ও আলো তাঁকে সহায়তা দিয়েছে, যদিও আলোর প্রয়োগ সেদিন কোথাও কোথাও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছে, হয়তো অনিবার্য কোনো যান্ত্রিক কারণে। বাংলাদেশের প্রথম সারির কয়েকজন অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী সাহায্য করেছেন তাঁকে। ফলে, আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবার মত বেশকিছু নাট্যমুহূর্ত আর দৃশ্যপ্রতিমা রচিত হয়েছে।

অথচ সবসত্ত্বেও দর্শক হিসেবে আমাদের অতৃপ্তি বেড়েই উঠেছে ক্রমাগত। তা এতটাই যে, বহু দীক্ষিত নাট্যদর্শক, মেহনৎ করে টিকিট সংগ্রহ করে, যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে 'কেরামত মঙ্গল' দেখতে এসেও বিরতির পর আসন ফাঁকা করে উঠে গিয়েছেন একে একে। তার কারণ নিশ্চয় এ নয় যে, বাংলাদেশের বাস্তবতায় তাঁদের আগ্রহ কম। বস্তুত দাঙ্গা, দেশভাগ, সামরিক শাসন, হাজং বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা—জনজীবনে এসব ঘটনার প্রভাব দেখাতে গিয়ে 'কেরামত মঙ্গল' যতখানিই সৎ ও সফল হয়েছে নাট্যরিপোর্টাজ হিসেবে, ততখানিই সম্ভবত সরে গিয়েছে নাটকের মৌলিক শর্তটি থেকে। ফলে, দর্শক হিসেবে আমাদের মনে হয়েছে, মঞ্চে প্রযোজিত ব্যাপারটি বহু গুণপনা সত্ত্বেও ঠিক নাটক হয়ে উঠল না।

কেরামতের চোখ দিয়ে পরিচালক দেখাতে চাইলেন দেশকে। সে ঘটনায় অংশগ্রহণ করল হয়ত, কিন্তু কোথাও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না শুধু নয়, চেষ্টাও করল না। ফলে সে হয়ে দাঁড়ালো এক ধর্মপরায়ণ হতভাগ্য, যার সদিচ্ছা আছে সত্যি, কিন্তু তার জন্য বীরের মত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে লড়াই করে না, বা করতে পারে না, অনায়াসেই ভিনদেশে চম্পট দেয়

সদিচ্ছা আর চোখের জলটুকু সম্বল করে। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করবার মত ব্যক্তিত্বই তার তৈরি হয় না।

এমন মানুষ আমাদের করুণা জাগায় সত্যি, নাটকের শেষে হয়তো খানিকটা সন্ন্যাসী ফকিরের প্রাপ্য সম্ভ্রমও। তাকে নিয়ে পালা রচনা করা চলে এবং আসরে সে গান আপ্লুতও করতে পারে হয়তো। কিন্তু দু-আড়াই ঘণ্টা আমাদের শিরদাঁড়া টানটান করে বসিয়ে রাখতে তেমন মানুষেরই দরকার, যিনি কব্জি বা কৌশলের জোরে এমন এক লড়াই চালাতে পারেন যাতে পরিস্থিতির কর্তৃত্বের সিংহভাগ অন্তত তাঁর ওপর বর্তায় এবং সে প্রক্রিয়া স্বভাবতই যেহেতু কেন্দ্রাভিগ তাই তার অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে।

নাটককে তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার নিরীক্ষাকে কোনো দেশিয়তার অজুহাতেই নাটকীয় সিদ্ধির বিকল্প ভাবাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া হ্যাভেলের অভিজ্ঞতার পর নির্বিচার দেশজ সর্বস্বতার ঝোঁক একটু কালানুচিত মনে হতে পারে না কি? যে যুগে নাটক মানে ছিল সম্ভ্রান্তজনের মৌতাতের মেজাজে বিভিন্ন সুকুমারকলার সমন্বয়ে রচিত দৃশ্যকাব্যের ভেতর রসসম্ভোগের আনন্দ, সে যুগে হয়তো সংঘাতকে প্রাধান্য না দিলেও চলত। কিন্তু যখন নাটকে জনসাধারণ জীবনের রুক্ষ ও বহুকৌণিক বাস্তবতার স্বরূপসন্ধান করে এবং বাস্তব যখন স্বরূপতই সংঘাতময়, তখন কোনো অজুহাতেই কি তাকে অস্বীকার করা সমীচীন?

তার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে, দেশজ আঙ্গিকের ভেতর আধুনিক নাটকের নূতন দিগন্ত উন্মোচনের নিরীক্ষাকে অস্বীকার করার কথা উঠেছে বা উঠতে পারে। কোনোই সন্দেহ নেই 'চরণদাস চোর', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' বা 'করিমকুট্টির' মত নাটক আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রধানতম অর্জন। যেহেতু সেসব নাটকে অভিযান চালানো হয়েছে আমাদের লোকনাট্য আঙ্গিকেরই ঐতিহ্যের গভীরে, অতএব সে নিরীক্ষায় নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সংঘাত বিসর্জিত হয় নি, এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রটি ঘটনার ওপর প্রভাববিস্তারের ক্ষমতার জোরেই কেন্দ্রীয় হয়ে উঠতে পেরেছে। দেশজে অনুসন্ধানের এই ধারাটি যে আজকের ভারতের অন্যতম এক প্রধান ধারা হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় ছিল এবারের নাট্যোৎসবেও।

ব্যাঙ্গালোরের নাট্যগোষ্ঠীযুগল 'স্পন্দন' ও 'বেনাকা'র এবারকার প্রযোজনা-

ছিল যথাক্রমে 'করিমায়ী' আর 'জোকুমারস্বামী'। প্রথমটি ড. চন্দ্রশেখর কামবার-এর উপন্যাসের নাট্যরূপ, দ্বিতীয়টি তাঁরই লেখা নাটক।

'স্পন্দন'-এর পরিচালক বি. জয়শ্রী 'লক্ষপতি রাজন কথে'-র মহিমায় গতবার মাতিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতাকে। ফলে এবারে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল প্রচুর। যে দেশজ ধারায় নাটক আর নাচগান একাকার হয়ে যায়, হাবির তনবির, পানিক্কর বা আরো কারো কারো মতোই তাকে আশ্রয় করে তিনি ধরতে চেয়েছেন আমাদের গ্রাম জীবনের গভীর এক বদল—গ্রাম দেবী 'করিমায়ী-র দাপট কিভাবে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল আধুনিকতার তীক্ষ্ণ অভিযানের মুখে পড়ে, তার ছবি।

বিষয় হিসেবে এটি নতুন নয় নিশ্চয় এবং এমনকি এ সংশয়ও হয়তো ভিত্তিহীন নয় যে, আমাদের পরিসংখ্যানের বাইরে উপরোক্ত সত্য কতটা প্রোথিতমূল। তবু তার শিল্পরূপায়ণের পদ্ধতিতে এমন কিছু থাকে যা আমাদের আত্মজিজ্ঞাসাকেই উসকে দিতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে ভাষার বাধা এতটাই দুর্লঙ্ঘ্য ঠেকে যে খেদ হয়, উদ্যোক্তারা কেন 'জোকুমারস্বামী'-র মত এটিরও একটি দৃশ্যওয়াড়ি সংক্ষিপ্তসার দেবার ব্যাপারে আর একটু যত্নবান হলেন না! যেটুকু পাওয়া গেল তা নেহাৎই ভাবসংক্ষেপ এবং আমাদের ভাষাগত অজ্ঞানতার ফাঁক তাতে অতি সামান্যই ভরে।

এসব সত্ত্বের আমাদের চেষ্টা করতে হয় 'স্পন্দন'-এর নিরীক্ষার স্বরূপটি বুঝে নিতে। গ্রামদেবী করিমায়ী-র বশম্বদ গৌড়ার সঙ্গে শহর থেকে আসা আইনের স্নাতক গৌড়সিকারার সাক্ষাতে নূতন মাত্রা যোজনা করে বহিরাগত বাসবরাজা ও চিমনা। মঞ্চের পেছনদিককার কেন্দ্রে স্থির হয়ে থাকে কালীমূর্তি, যার সামনে ঘটে চলে সেইসব ঘটনা, নাট্যকার ও পরিচালকের গ্রহণে বর্জনে যা আমাদের সামনে নির্দিষ্ট একটি সত্য উন্মোচিত করবার জন্য পরিকল্পিত।

নিজের বাবা ও স্ত্রীকে খুন করে লোকটি গৌড়ার আশ্রয় চাইতে এলে যে রহস্য জমে ওঠবার কথা ছিল, তাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে নাটকটি তাকে হিজড়ের বেশে সারাক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে খানিকটা কৌতুক জমাতে চায়। পুলিশ আসে, যায়—মঞ্চের চলতি রেয়াজ অনুযায়ী ভাঁড়ামো করে। গৌড়ভৃত্যকে নিয়ে মজা করে গৌড়সিকারা। দেবীর চামরটি চুরি করে নিয়ে যায় চিমনা এবং দেবীর ভক্ত পূজারী তা ফিরে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠলে,

বাসবরাজের সঙ্গে তা নিয়ে লোফালুফি খেলে। রামযাত্রারকুশীলবরা মাতাল হয়ে গেলে মজা পায় গৌড়সিকারা।

এভাবে, করিমায়ীর সামনেই হয়তো ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে তাঁর নিজের দাপট, যার পরিণতিতে আমরা দেখি মিছিল করে নিয়ে আসা সোনার দেবীপ্রতিমাটি চুরি হয়ে যায় বাসবরাজা ও বিমনার হাতে এবং অনিবার্য হয়ে ওঠে পূজারীর আত্মহত্যা। এভাবেই নাট্যকার ও পরিচালক গ্রামের মানুষের মনে করিমায়ী'-র পৌরাণিক দাপটের অবসান-কাহিনী শোনান।

কিন্তু এমন কোনো বিশেষ মাত্রা কি সঞ্চিত হল আমাদের অভিজ্ঞতায়, যার জন্য একমাত্র শিল্পেরই কাছে যেতে হয় আমাদের? 'পুরাণের প্রতিমারা প্রভাব হারাচ্ছেন'—এই সাংবাদিক সমাজসত্যের অতিরিক্ত আমাদের কপালে যা জোটে তা হল, লোকনাট্য কাহিনীর সরল বিন্যাসের ভেতর নাচ, গান, সহজ তামাসার রঙ্গ, কয়েকটি অনবদ্য কম্পোজিশান ও অভিনয়। কিন্তু শুধু এতেই কি তৃপ্ত হতে পারে আধুনিকের আগ্রহ? স্বয়ং জয়শ্রীর অভিনয়ে যে অসামান্য প্রাণশক্তি থাকে, পূজারিটি তরবারীনৃত্যের প্রমত্ততায় ও আত্মহত্যায় যে নাট্যবোধ কাজ করে, জনতাদৃশ্যগুলির কম্পোজিশানের সফলতায় বহুক্ষেত্রেই আমাদের দৃষ্টির যে উৎসব রচিত হয় সে পাওনা নিশ্চয় কম নয়। কিন্তু তা কি কোনো শিল্পের কাছে আমাদের চাওয়ার সবটা?

যে লোকায়ত আঙ্গিকের গুণে 'চরণদাস চোর' আমাদের পৌঁছে দিতে পারে উপলব্ধিরই শিল্পসম্ভব উত্তরণে, তার অনেক উপাদান এখানে থাকা সত্ত্বেও কি আমরা পৌঁছোতে পারি তেমন কোনো অনির্বচনীয়তায়? ড. চন্দ্রশেখর কামবারের দেয়া সুর মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। কোনো কোনো মুহূর্তে নিঃসঙ্গ করুণ কোনো মূর্চ্ছনা বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে যায়। তবু, গানের মারফৎ বিষয় ও কাহিনীর ধারাভাষ্য রচনার ধরণে ও সুরের বৈশিষ্ট্যে মনে পড়ে যেতে থাকে হাবিব তানবিরের সফলতার কথা। আর মনে হয়, এসমস্ত প্রয়াস কি কেবলই ভারতীয়তা অর্জনের তাড়নায়? অভিনয় বা নাটকের কোনো ফাঁক ভরাবার প্রয়োজনে নয় তো?

সে সংশয় আরো তীব্র হয়ে ওঠে, মনকে আর একটু তেতো করে দেয় 'জোকুমারস্বামীতে'। মনে পড়ে বি. ভি. করন্থের পরিচালনায় 'ম্যাকবেথ'-এর যক্ষগান-রীতি ভিত্তিক প্রযোজনা 'বর্ণাম বন' দেখার রোমাঞ্চ। দেশীয় রীতিতে পশ্চিমী ধ্রুপদীর সে রূপায়ণ-পরিকল্পনায় যে সার্থক আধুনিক নিরীক্ষা ছিল তার সাফল্য আমাদের করন্থ সম্পর্কে কৌতূহলী আর শ্রদ্ধাশীল করে

তুলেছে। তারপর 'ঘাসিরাম কোতোয়াল'-এও আমরা তাঁর দেশজ লোকায়ত আঙ্গিক বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় পেয়েছি।

ড. কামবারের নাটকটি শেষ পর্যন্ত যে প্রায় একটি রূপকের মেজাজ পেয়ে যায় তার একটা বড় কারণ, নাটকটির অনুপুঙ্খ নির্দিষ্ট কোনো সময়চিহ্ন বহন করে না। অত্যাচারী গৌড়া আর অত্যাচারিতের বীর্যবান প্রতিনিধি বাসন্যার সংঘাতের যে কাহিনী রচিত হয় এখানে, সেটি বেশ সরল। দুয়ের শত্রুতা যে রাত্রে জয়পরাজয়ের সিদ্ধান্তে পৌছনোর কথা সে রাত্রেই গৌড়ার খল চতুরতা বিপরীত ফল লাভ করে—অনিবার্য অথচ আকস্মিক কার্যকারণের পরিণতিতে গৌড়ার পত্নী গৌড়থীর গর্ভে অত্যাচারিত রক্তের বীজ বুনে দেয় বাসন্যা, যার পরিণামে নাটকের শেষে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় গৌড়ার গুণ্ডাদের হাতে। এর ভেতরে গৌড়া ও সাবি এবং নিঙ্গি-শিবি-র সম্পর্কের খণ্ড উপকাহিনীদুটি নাটকীয় সংঘাতে খানিকটা উপলব্যথিত গতিসঞ্চার করে চলে।

ঠিক যে, ফার্টিলিটি কাল্টের ধারণার প্রয়োগ হল নাটকে। ঠিক যে, বন্ধ্যা জমিতে বীজ বপন সত্ত্বেও শোষিতেরা শেষ পর্যন্ত শোষকের শিকার—এমন এক সামাজিক সত্য কাহিনীতে নিহিত হওয়ায় বিজ্ঞজনের সোৎসাহ অনুমোদনের সুযোগ মিলল। ড. কামবার আর করন্থের স্মার্ট অভিনয়ে সমৃদ্ধ উপক্রমণিকা অংশটি সত্ত্বেও, দৃশ্য পরিকল্পনার নানা চমক সত্ত্বেও, গুণ্ডাদের কাঁধের ওপর বন্দুকটির অর্থময় ব্যবহারের অভিনবত্ব সত্ত্বেও, কোরাসের গানে সুরের সমস্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অর্জিত হল কি নাটকের কাছে আমাদের প্রার্থিত বহু কৌণিকতা? গৌড়ার গুণ্ডাদের হাতে প্রতিবাদী বাসন্যার মৃত্যুর কাহিনী রূপকপ্রতিম, তাই সরল, ঠিকই। কিন্তু সে সরলতার পরোক্ষে কি এমন কোনো ব্যঞ্জনা থাকে যাতে তৃপ্ত হবে আধুনিকের জিজ্ঞাসা, যার জানা হয়ে গেছে, এমনকি অত্যাচারিত-অত্যাচারীর সংঘাতও কদাচিৎ একমাত্রিক?

ফলে, কারো যদি 'করিমায়ী' আর 'জোকুমারস্বামী' নাটক দুটিকে মনে হয় সাধারণ দুটি বিবৃতির সালঙ্কৃত দুটি ইলাসট্রেশান, নাচ গান আর স্টাইলাইজড অভিনয়ের আপাতমুগ্ধতা সত্ত্বেও, তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না। নাচের নানা মুদ্রার ব্যবহারে, গানের সুরে ও তালে আমরা আমাদের বিভিন্ন ভাব আর অভিব্যক্তির আদর্শায়িত প্রকাশই খুঁজি। তেমন কোনো গানে বা নাচে ভাবের আদর্শায়নের যে নান্দনিকতা তা অনন্য। কিন্তু আজকের মানুষ কি সেই আদর্শায়নের নান্দনিকতার খোঁজেই যাবে নাটকের কাছে?

সে কি খুঁজতে যাবে না বাস্তবেরই অন্তর্লীন ছন্দকে, যা নিজের জোরেই সুন্দর ?—শুধু ভারতীয় অভারতীয়ের যুক্তিতে কি তার সেই খোঁজার ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে ?

আর ব্রেখটের উদাহরণকে কেউ যদি নজির হিসেবে দেখাতেও চান, তাঁকে নিশ্চয় ভাবতে হবে যে, ব্রেখট যে নাচ আর গানকে মেলাতেন অভিনয়ের সঙ্গে, মঞ্চে বাস্তবের প্রতিরূপ রচনার বিরুদ্ধে লড়াই যে চালাতেন স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গে, তা এক বহুমাত্রিক বাস্তবতারই স্বরূপ রচনার প্রয়োজনে। তাঁর 'এপিক থিয়েটার' তত্ত্বের মহাকাব্যিকতায় তা মিলে মিশে বহুকৌণিক ও ব্যঞ্জনাময় বাস্তবতা রচনা করত, যেখানে চরিত্রগুলি তাদের নানা স্টাইলাইজেশান সত্ত্বেও একমাত্রিক হয়ে উঠে নিজেদের দ্ব্যর্থময় মানবিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিত না।

ঠিক, বাস্তবের রূপায়নের দাবিকে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে ভাববেন অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে ফটোগ্রাফিক বাস্তব রচনারই দাবি। কিম্বা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা রূপায়নেরই দাবি, তিরিশ চল্লিশ বছর আগে তার যে রূপ ছিল, হুবহু সেটাই ফিরিয়ে আনার দাবি।

কিন্তু নগ্ন ও অনলঙ্কৃত বাস্তবের রূপায়ন যে কতখানি মহিমান্বিত হতে পারে, ফটোগ্রাফিক বাস্তবতার বিপরীতে তা যে কেমন অন্তর্লীন ছন্দের গহন সূক্ষ্মতায় আমাদের মগ্ন করতে পারে এবং আমাদের আত্মআবিষ্কারের প্রশ্নে হয়ে উঠতে পারে অতি তীক্ষ্ণরকমের প্রয়োজনীয়, তার চমৎকার পরিচয় পাওয়া গেল বম্বাই-এর 'কলাবৈভবে'র প্রযোজনায় ও বিজয়া মেহতার পরিচালনায় 'ওয়াড়া চিরেবন্দী'তে। মহেশ এলকুঞ্চোয়ার-এর এই নাটকটি ভাষাগত সমস্ত বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করে আমাদের বাস্তবের সেই আলোকিত অথচ রহস্যময় অন্দরমহলটিতে পৌঁছে দিতে পারে, একমাত্র শিল্পেরই কাছে যার জন্য আমাদের প্রার্থনা চিরকালের।

বিদর্ভের ধারাগাঁও-এ দেশপাণ্ডেদের পৈতৃক বিশাল অথচ জীর্ণ বাড়িটিতে তাতিয়াজীর মৃত্যুর পরবর্তী কয়েকটি দিনে, যখন বোম্বাইয়ে কর্মরত সুধীর ও তার পত্নী অঞ্জলি সহ নাতিবিশাল পরিবারটির প্রায় প্রতিটি সদস্য উপস্থিত, নাট্যকার উন্মোচিত করে দেখান মানবিক পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল আর অন্তর্লীন এক নাটক। তীব্র কোনো টানটান কাহিনী বা তথাকথিত নাটকীয় সংঘাতের ডামাডোল এড়িয়েও এখানে এমন এক গোপন সংঘাত রচিত হতে পারে, যেখানে রূপায়িত বাস্তব তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যে ধরা দেয়, যা আমাদের

শিল্পিত মানবসত্যের কেন্দ্রে নিয়ে যায়, তেমনি একেবারে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নট-নড়ন-চড়ন করে বসিয়ে রাখে।

এ কাজ করতে স্বভাবতই বিজয়া মেহতা বেছে নেন নীচুগ্রামের অভিনয় আর প্রযোজনার রীতি। ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের হিসেব থেকে তৈরি হয়ে ওঠা নীচতায় জমে ওঠা পরিবারিক-সম্পর্ক-ভিত্তিক সংঘাত কিভাবে এক আকস্মিক পারিবারিক বিপর্যয়ের পরিণতিতে উত্তীর্ণ হয়ে যায় কল্যাণকর মানবিক আবেগে, মঞ্চে রূপায়িত সে নাটক আমাদের অভিজ্ঞতায় এতটাই মূল্যবান হয়ে ওঠে যে, যেন নরকযাত্রার শেষে পুরগাতোরিও-র স্বস্তির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এ সুকৃতির অনেকটাই অবশ্য নাট্যকারের প্রাপ্য। কিন্তু পরিচালনার যে এলেম প্রযোজনাগত দর্শনকে মঞ্চসজ্জা, আলো আর অভিনয়ে, শব্দ আর নৈঃশব্দের ব্যাবহারে এতটাই সফল করে তুলতে পারে যে, সত্যের রহস্যময় মুখের আলো অন্ধকার আমাদের বোধকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়, তাকে বিস্মিত সেলাম না জানিয়ে পারা যায় না। প্রতিটি আলোকপাত, প্রতিটি স্বরক্ষেপ প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন এমনকি মঞ্চসজ্জাটি পর্যন্ত বাস্তবের শর্ত এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করেও তার ভার এড়িয়ে এমনভাবে এক অন্তর্লীন ছন্দ রচনা করে চলে, যা আমাদের বাস্তবের সারাৎসারটি চিনিয়ে দেয়, কিন্তু বস্তুভারে বিপন্ন করে না।

এ আঙ্গিকে আদর্শায়নের দায় নেই যেহেতু, অতএব বাস্তবের অনুপুঙ্খতার দাবি অনায়াসেই পূর্ণ হতে পারে। আমরা বুঝতে পারি, আমাদের অভিব্যক্তি তার চরমতম স্বাভাবিকতাতেও ছন্দোবদ্ধ হলে কতখানি শিল্পময় হয়ে উঠতে পারে। এতো আমরা পেতে পারি একমাত্র নাটকেরই ভেতর। এখানেই তার সার্বভৌমত্ব, এখানেই আদর্শায়িত অভিব্যক্তির শিল্পকলাগুলির কাছে ঋণ না নিয়ে সে তার অহংকার বজায় রাখতে পারে।

সুলভা দেশপাণ্ডের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ছিল এবারের আর এক অন্যতম আকর্ষণ। তাঁদের 'আবিষ্কার' নাট্যগোষ্ঠী বম্বাইতে অত্যন্ত সম্মানিত। বর্তমান প্রযোজনাটি নিয়ে নানা বিতর্কের কথাও লোকপরম্পরায় শোনা গেছে।

কোনো রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা আজো নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাঁরই হাতে তো প্রথম নাটকে ভারতীয়তা অর্জনে আমাদের প্রয়াস বিশিষ্ট

যাত্রা লাভ করেছিল। অনুকৃতিসর্বস্বতার বাইরে নাটকের এক নূতন ধারণার জন্ম দিতে গিয়ে তিনি যে কেবলমাত্র অতীতমুখী হয়ে পড়েন নি বা এড়িয়ে যান নি আধুনিকের সংঘাতকে, তাতেই তাঁর নাটক এখনো আমাদের আত্মজিজ্ঞাসায় অনিবার্যরকম জরুরি হয়ে রয়েছে। তেমন কোনো প্রযোজনা যখন আমরা দেখতে যাই তখন সেই রাবীন্দ্রিকতা বা রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির জগৎ কতখানি রূপায়িত হতে পারল সেটাই জানতে চাই। কেননা সেই উপলব্ধির জগতেরই নিজস্বতার সূত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে নাটকের নূতন আঙ্গিকের জন্ম, নূতন ধারণার জন্ম।

সুধার জন্য মমতা আর রাজার জন্য আকর্ষণের মাঝখানে ছোট্ট অসুস্থ অমলের দৈনন্দিন বাস্তবতা, বিশাল জগৎ আর সুদূরের আকর্ষণে মাখানো নিরুপায় গৃহবন্দী দিনযাপনের সংক্ষিপ্ত নাটকটিকে পরিচালক ধরতে চান 'মৃত্যু জীবনের পরম পরিপূরক' এই তত্ত্বের আশ্রয়ে। কিন্তু ভয় হয়, মৃত্যু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কবিতাকে নাটকটির ভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে উপরোক্ত তত্ত্বের সমর্থন মিললেও, নাটকের ক্ষেত্রে তাকে অত সরলভাবে ব্যবহার করা কি তেমন সংগত? এক্ষেত্রে নাটকের ভেতরকার অন্যান্য মাত্রাগুলি কি একটু অবহেলিত হয়ে পড়ে না?

তাই নাটকের শেষ দৃশ্যে বন্দীদশামুক্ত অমল যখন ধাবমান গ্রহনক্ষত্রের অনন্তযাত্রায় একাকার হয়ে যায় তখন তাতে এক রাবীন্দ্রিকতা রূপায়িত হয় সত্যি, কিন্তু তেমনি আড়ালে চলে যায় রাবীন্দ্রিকতারই আর একটি দিক যা ধরা পড়েছিল 'সুধা তোমাকে ভোলে নি' এই সংলাপে।

তবে, সামান্য কিছু কিছু যোজনা যে করেন দু-এক জায়গায় তাকে মঞ্চ প্রযোজনার পক্ষে পরিচালকের বিবেচনায় জরুরি বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না আমাদের। দইওয়ালা যখন অমলকে নানা ভঙ্গিতে দই বিক্রির কৌশল শেখায় কিম্বা ফকিরবেশী ঠাকুরদাদা শিখিয়ে দেয় ভিখারীর সুর তখন পরিচালনার মুন্সীয়ানাই অনুভব করি। তবে তাঁদের প্রযোজনায় মঞ্চে স্বয়ং রাজার আবির্ভাবের ব্যাপার আছে বলে যা শুনেছিলাম, তেমন দেখতে না পাওয়ায় সে বিষয়ে কোনো বিশেষ ধারণা করা গেল না।

'আবিষ্কার'-এর বর্তমান প্রযোজনাটির সবচেয়ে বড় সম্পদ অমল। সাধারণত আমরা অমলকে যেভাবে অসুস্থ বা কাতর ও ক্লান্ত হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত তার বিপরীতে এখানে অমল রীতিমত প্রাণবন্ত ও প্রায় উচ্ছল। প্রণতি প্রধানের অনবদ্য অভিনয়ে এই অমল নাটকীয়তার দিক থেকে

অধিকতর ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। অনিবার্য নৈঃশব্দ্যের বিপরীতে তার চঞ্চলতা, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা এমন পরিকল্পনা ও অভিনয়ের গুণেই আমাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করে যেতে পারে। সেই সঙ্গে আমাদের বহুকাল মনে থাকবে মাধবদত্তের ভূমিকায় অরুণ কাকাড়ের বা ঠাকুর্দার ভূমিকায় চন্দ্রশেখর কামেরকার-এর কথা। তবে মোড়লের নিশ্চয় অতটা চীৎকৃত না হলেও চলত বা শেষদৃশ্যে ঠাকুর্দার মাথায় পাখি-মার্কা পাগড়ির ব্যবহার বাহুল্য জ্ঞানে বর্জন করলেও চলত।

এবারের নাট্যোৎসবের সত্যিকারের পিলে-চমকানো প্রযোজনা এন. এস. ডি রেপেটোরি, দিল্লির 'মশারিকী হুর'। বি. এম. শাহ্‌ পরিচালিত এ নাটকটি শুরুর আগে উদ্যোক্তারা জানিয়েছিলেন যে প্রযোজনাটি পুরোনো পার্শি নাটকের ধাঁচে পরিকল্পিত। যে অভিনয় ও প্রযোজনারীতি আমাদের আড্ডাগুলিতে মশকরার বিষয় হয়ে গেছে বহুকাল, উদ্যোক্তাদের বদান্যতায় এবারে তার পরিচয় খানিকটা মালুম হল। খুন, রাহাজানি, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, তলোয়ারবাজী, নারীর ছদ্মবেশ ধারণ, একাধিক প্রেম, অরণ্য ও রাজপ্রাসাদ, নিকৃষ্ট স্তরের ভাঁড়ামো ও অঙ্গভঙ্গী—যাকে আমরা 'হিন্দী ফিলিম' বলে আসছি গত কয়েক দশক ধরে তার অনুপ্রেরণার উৎস কি, তার বড় জবরদস্ত প্রমাণ প্রযোজনাটি। তাও হয়ত মজাদার হিসেবে খানিকটা উপভোগ করার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু আগাপাশতলা অমন হাস্যকর উচ্চগ্রামের সংলাপ কোনো পরিশীলিত কানের পক্ষে রীতিমত নির্যাতন। এ-ও কি সেই পার্শী থিয়েটারী আদল? অথচ গত দুটি বছরে অপার্শী 'ওথেলো' আর 'অন্ধযুগ'-এও তো উচ্চ স্বরগ্রামের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন বি. এম. শাহ্‌। এবার মনে হল যেন নিম্নগ্রামের অস্তিত্বেই আদৌ বিশ্বাস রাখেন না তিনি। তবে কি দিল্লির সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এখন এমনই?

বলা বাহুল্য এ নির্যাতন শেষ পর্যন্ত সহ্য করবার হিম্মৎ অনেকেরই থাকে না।

ইতিহাস অনেককিছু দুষ্পাচ্য জ্ঞানে বর্জন করে। কারো কারো মনে হতে পারে তারও তত্ত্বতালাস শিক্ষার্থীর পক্ষে জরুরি হবে হয়তো। কিন্তু শিক্ষার্থীর গুরুদায়িত্ব কি একজন দর্শকের কাঁধে চাপানোটা জরুরি? যা কিছু অতীতে জনপ্রিয় ছিল তার প্রতিটি বিষয়ের শ্রদ্ধাশীল থাকতে গেলে তো তরজা, হাফ-আখড়াই আর খেউড়কেও ফিরিয়ে আনতে হয়।

ঠিক যে, শিক্ষা বা পেশার কারণে মড়া কাটা অনেক ছাত্রের পক্ষেই দরকারী। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার্থী মাত্রেই নিশ্চয় মড়া কাটেন না!

আশা করি উদ্যোক্তারা কথাগুলো একটু ভাববেন। কেননা, 'নান্দীকার'-এর নাটোৎসব তো আজ কলকাতার সংস্কৃতিজগতেরই গর্ব। হালকা শীতের কয়েকটা দিন রবীন্দ্রসদন আর একাদেমীর চত্বর শুধু নাটক নয়, আমাদের সংস্কৃতি আর মননচর্চারই ক্ষেত্রে এমন এক সমীহ আদায় করে নেয়, যা আমাদের স্মৃতিকে স্বর্ণময় করে তোলে যেমন, তেমনি উদ্যোক্তাদের দায়িত্বকেও পর্বতপ্রমাণ করে তোলে।

AIDS এবং

গেরাল্ড হ্বাইসম্যান

[Gerald Weissmaun New York University Medical Center-এর অধ্যাপক। এ যাবৎ প্রচুর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং সম্মান ইনি পেয়েছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় Cell Biology and Inflammation। তিনি সমাজ সচেতন এবং সমাজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়দের স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করেন। সমাজ সচেতন এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর যুক্তিপূর্ণ মতামত যথাসাধ্য প্রচার করা প্রয়োজন মনে করে এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করা হলো। সম্পাদক পরিচয়]

অপকীর্তির দৌলতে নতুন নতুন সব ব্যাধি সংবাদপত্রের দুনিয়ায় প্রাধান্য পায়। কিছুকাল আগেও মনে হতো Legionnair's dissase-কে দমন করতে চিকিৎসাবিজ্ঞান বুঝি বিব্রত। তারপর পাওয়া গেল এই শ্বাসকষ্টের কারণ যে-জীবাণু, তার সন্ধান এবং উৎস। সেই দশকেরই পরবর্তী হুমকীর নাম toxic shock syndrome। এই বিপর্যয়কারী ব্যাধির কারণও খুঁজে পাওয়া গেছে—মহিলাদের স্বাস্থ্যবিধি না মানার ফলে এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার প্রতাপ। তারপর সাংঘাতিক মহামারী—এর ফলে আক্রান্ত হয় হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস এবং ঐ সংক্রান্ত সব টিস্যু। কারণ স্পেনদেশে একবার দৈবাৎ অলিভ অয়েল-এর সঙ্গে রেপসিড মিশে গেছিল। তারপর আমেরিকা সরকার যখন মারিজুয়ানা-ধূমপায়ীদের ফুসফুস সম্বন্ধে প্রচার শুরু করল, তখন paraquat শব্দটা যত্র-তত্র শোনা যেত। এর ফলে শুধু মেক্সিকোতেই এই উদ্ভিদ ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়নি, আন্তর্জাতিক Drug Control প্রকল্প এই সেদিনও জর্জিয়ার Chattahoochi National Forest-এও এই উদ্ভিদ ধ্বংসকারী paraquat ব্যবহার করে, ফলে আমাদের খাদ্য উৎপাদনে টান পড়ে। এরকম আরো অনেক আছে। সংবাদপত্রগুলি অর্ধসত্য প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। যাবতীয় প্রচার মাধ্যমই এই দোষে দুষ্ট।

চিকিৎসাক্ষেত্রের এরকম হিসেব করে বেছে নেওয়া খবরগুলোর সঙ্গে অদ্ভুত এক সত্যের যোগ আছে। বছর দশেক আগেও এসব ব্যাধির উল্লেখ চিকিৎসাশাস্ত্রে ছিল না। তাহলে কী এইসব জীবাণু হঠাৎই সংঘবদ্ধভাবে আমাদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে? নাকি, আমি পুরোনো

ব্যাধিগুলোকে নতুন নামে চিহ্নিত করছি? আমার মনে হয়, দুটোই আংশিকভাবে সত্য। যেমন, আমরা জানি নিউমোনিয়ার বারবার প্রকোপের কারণ Legionella। এজন্য আমরা apidemiologist-দের কাছে কৃতজ্ঞ। আর toxic shock syndrome-এর কারণ জানা গেছে, তার ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। এসব গেল পুরোনো এবং পরিচিত ব্যাধি, যা ফিরে এসেছে প্রায় মহামারীর রূপ নিয়ে। কিন্তু, কিছু জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে মানবদেহে, যেগুলো আগে শুধু অন্য প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, ১৯০৪ অবধি tularemia ঘটিত রোগ বন্যপ্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ওটির জীবাণু কেমন করে যেন পায়রাজাতীয় পাখিতে সংক্রামিত হয়। সেখান থেকে মানবদেহে। আর Lyme arthritis-ও আমাদের মধ্যে এসেছে গৃহপালিত পশুর মাধ্যমে।

এসব কথা মনে এল Hans Zinsser-এর Rats, Lice and History পড়ে—তার ওপর হাল আমলের খবরের কাগজে জনস্বাস্থ্যের ওপর এক নতুন ব্যাধির বিস্তার আর তার ফলে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ পড়ে। ব্যাধিটির নাম Acquired Immune Deficiency Syndrome, সংক্ষেপে AIDS।

১৯৮৩-র গ্রীষ্মকালে AIDS-এ আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে প্রায় দু'হাজার মানুষের, যার মধ্যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ জন মারা গেছে। সেই বছর আগস্ট মাসে Peter Justice চল্লিশ বছর বয়সে Cabrini Medical Center, New York-এ ভর্তি হন। তখন Ms. Margaret M. Heckler ছিলেন Secretary of Health and Human Services; তিনি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ঘোষণা করেন, congress থেকে চল্লিশ মিলিয়ন ডলার খরচ করার অনুমতি তিনি আদায় করবেন এবং সেই অর্থ খরচ করা হবে পরবর্তী বছরে AIDS research বাবদ। ৪০ মিলিয়ন ডলার, প্রথমে চাওয়া হয়েছিল তার অর্ধেক। এই বাড়তি অর্থ শ্রীমতী Heckler যেন যাদুবলে বের করেছিলেন। তাঁর দপ্তরের অন্য কাজের জন্য বরাদ্দ অর্থ থেকেই তিনি এই অর্থের ব্যবস্থা করবেন মনে হয়—গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ বরাদ্দ অর্থ থেকে, "আসবাবপত্র এবং নির্মাণ" কাজের জন্য বরাদ্দ ২২ মিলিয়ন ডলার খরচ না করে সেটা AIDS গবেষণা খাতে ঢালা হবে বলে মনে হয়। তাছাড়াও আগামী বছর সরকারী বাজেট-এ AIDS গবেষণা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে, একথা জানায় জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা। যদি ধরে নেয়া যায়, আগামী

বছর AIDS রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৪০০০ হবে, তাহলে সহজ হিসাব মত দাঁড়াচ্ছে, প্রতি রোগীর জন্য দশ হাজার ডলার খরচ হবে গবেষণার কাজে। সমান পরিমাণ অর্থ যদি প্রতি ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগীপিছু খরচ করা হয় গবেষণার কাজে, তাহলে জাতীয় বাজেট-এর অবস্থা কী হবে অনুমান করা খুবই সহজ। ঠিক বলতে পারছি না, সংখ্যাটা সঠিক কিনা—তবে মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ অবশ্যই নয়, দুই মিলিয়ন Alzheimer's desease-এ আক্রান্ত রোগীপিছু যদি সমান হারে খরচ করা হতো, তাহলে খরচের অঙ্ক দাঁড়াত বছরে কুড়ি বিলিয়ন ডলার। আর, Arthritis Foundation যে হিসাব দিচ্ছে, তাতে রোগীর সংখ্যা ৩২ মিলিয়ন, তাহলে আমার নিজের গবেষণা ক্ষেত্রে অনায়াসে ৩২০ মিলিয়ন ডলার আশা করা অনুচিত হবে না।

যদি AIDS আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং সেই অনুপাতে গবেষণার জন্য বরাদ্দ অর্থের এই বিপুল অঙ্কের কথা ভাবা যায়, তাহলে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশেষ মহামারী কেন এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। আমার ধারণা, AIDS ব্যাপারে এমন আতঙ্কের কারণ এই বিদঘুটে ভাইরাস যে কোনো মুহূর্তে সীমিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে জনসাধারণকে বিপর্যস্ত করতে পারে। বর্তমানের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৭০ জন রোগী সমকামী পুরুষ, বাকিটা heterosexual drug abusars, Hitians এবং hemophiliacs-এর মধ্যে সীমিত। তবে AIDS-এর আতঙ্ক ছড়াচ্ছে টেলিভিশান, রেডিও এবং খবরের কাগজ। এগুলোর বীভৎস বর্ণনা বহু লোককে আতঙ্কিত করে তুলেছে। শুনেছি, christopter street-এ ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ভাড়ার প্রাপ্য হাতে নিতে ভয় পায়, AIDS রোগী আছে জানতে পারলে সেই এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী এবং ধাঙররা বিশেষ প্রতিরোধ পোশাক দাবি করছে, ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে। যেহেতু আমরা এখনো যথেষ্ট প্রমাণ পাইনি যে এমন একটু আধটু ছোঁয়াচ লাগলেই রোগটি ছড়াবে, সেইজন্যই ঝুঁকি নিয়ে বলা যাচ্ছে না, এই বিশাল অনুভূতি-প্রবণতা জনসাধারণকে অকারণ আতঙ্কিত করছে।

Zinsser-এর বইটিতে পশ্চিম ইয়োরোপ-এ সিফিলিস-এর আবির্ভাবের এক ইতিহাস সম্মত বিবরণ আছে। পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে এই ব্যাধি প্রথমে দেখা দেয় Naples-এ। Columbus-এর জাহাজের খালাসী বা তাদের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ ছিল এমন সব মানুষের মধ্যে। ইয়োরোপ-এ এই

ব্যাধি মহামারী আকারে দেখা দেয় "হঠাৎ, প্রচণ্ড এবং ব্যাপকভাবে" Charles VIII-এর ফরাসী সেনাবাহিনী ১৪৯৫-এ Naples দখল করবার পর। তারপরই এই ব্যাধি সৈন্যদলের মধ্যে অব্যাহতভাবে ছড়াতে শুরু করে, তাদের ছাউনির লোকেদের মধ্যে এবং সহরের নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে। রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে এটির উৎস খুঁজে নাম দেয়া হয় "French" বা "Neapolitan" ব্যাধি। শুরুতে সিফিলিস প্রচণ্ড রকম তীব্র এবং সাংঘাতিক ছোঁয়াচে ধরনের ছিল, পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই প্রকোপ অবশ্য অনেকটা কমে আসে। ব্যাধিটিও ছিল বীভৎস এবং যন্ত্রণাদায়ক। বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এই ব্যাধির প্রকৃতি অনেক শান্ত হয়ে আসে। সংক্রামক রোগগুলোর ইতিহাসই এই রকম। মধ্যযুগের কুষ্ঠ বর্তমানে আয়ত্বের মধ্যে। যন্ত্র সভ্যতার শুরুতে শিশুদের মধ্যে যে Scarlet fever দেখা গিয়েছিল তার প্রকোপ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই অনেক কমে গেছে।

Antibiotic যুগের আগের সংক্রামক রোগের এই ইতিহাস পরবর্তীকালে গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তার আগের শতাব্দীগুলিতে লোক-সংস্কারগত অভ্রান্ত (?) ধারণার ফলে কোনো এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দায়ী করা হতো সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এবং তার ব্যাপ্তির জন্য। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল ভিখারী, ইহুদী, যাযাবর এবং অন্যান্য সম্প্রদায়। সুখের কথা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে এজাতীয় দোষারোপের স্থান আর নেই। তাই এখন আমরা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে দায়ী করে তাদের আর এড়িয়ে চলি না। একমাত্র AIDS এর চমক রয়ে গেছে, ব্যাধিটি মারাত্মক এবং তার ফলে এসব রোগীকে সাধারণভাবে দূরে রাখা হয়।

নতুন সংক্রামক রোগ চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের বরাবরই কিছুকাল ব্যস্ত রেখেছে। প্লেগ, টাইফয়েড, যক্ষা ইত্যাদি রোগকে আয়ত্বে আনতে গিয়ে আমরা পেয়েছি chemotherapy-র সন্ধান। এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেছে ফার্মাকোলজীর উন্নততর মান থেকে। বিজ্ঞানের সার্বিক উন্নতির ফলে microbiology, epidemiology, immunology ইত্যাদি আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে অনেক বিস্তৃত করেছে। তবে বিজ্ঞানের এইসব শাখা ব্যয়সাপেক্ষ। তাই এগুলোর সাহায্য নিতে যে ব্যয় হবে,

হিসাব করলে হয়তো তা রোগী পিছু দশ হাজার ডলারের কাছাকাছি পৌঁছুবে।

এই যুক্তির সূত্র ধরে Ms. Heckler AIDS-এর গবেষণার জন্য যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছেন, সেটি আমি সমর্থন করি। প্রথম পর্বের চল্লিশ মিলিয়ন ডলার-এর অধিকাংশই যাবে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারে, সেখানে AIDS ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হবে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা এক অর্থে AIDS সম্বন্ধেও কিছু জেনে গেছি। তাছাড়া genetic engineering শাখাটিও প্রচুর সাহায্য করতে পারবে এবং সেইসঙ্গে এই শাখা নিজেও আরো উন্নত হবে। সুতরাং একথা স্পষ্ট, AIDS জাতীয় নতুন ব্যাধির গবেষণা বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ করবে। আবার বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া AIDS গবেষণা এক পা-ও এগোতে পারবে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, AIDS বিজ্ঞানকে অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে যাবে। AIDS-কে দমন করা যাবেই, সব সংক্রামক ব্যাধিকে যেমন করা গেছে। বর্তমানে অস্বস্তিকর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম।

দুঃখের কথা, Peter Justice বা অন্যান্য অপরিচিত AIDS আক্রান্ত যুবক এবং সমর্থ ব্যক্তিদের এই দুর্দশা যুক্তিহীন সংস্কারকে আবার উস্কে দিচ্ছে, এটা কখনই কাম্য হতে পারে না। সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে AIDS আর সব সংক্রামক ব্যাধির মতই। সুতরাং এটিকেও অচিরে বশে আনা যাবে। প্রাথমিক যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এই ব্যাধির কারণ কোনো ব্যর্থতা, যার ফলে রক্ত প্রবাহে এক virus-এর সৃষ্টি হয় এবং রক্ত, লালা অথবা বীর্যে ছড়িয়ে পড়ে। AIDS-এর গবেষণা চলবে, সেইসঙ্গে চলবে অনেক জল্পনা-কল্পনা যাবতীয় প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে। জনজীবন স্বভাবতই আতঙ্কিত হবে। কিন্তু তাতে AIDS-কে সংযত করা যাবে না।

যদি ধরে নেয়া যায় Heckler-এর অর্থের আবেদন যুক্তিপূর্ণ, তাহলে শুধু Peter Justice বা অন্য রোগীরাই উপকৃত হবে না, বিজ্ঞানও উন্নত হবে। এই গ্রীষ্মে, যখন AIDS গবেষণার কথা খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়, ঠিক তখনই সেই সব কাগজেরই শেষ পৃষ্ঠায় বেশ কয়েকটা মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হয়, নানা ধরনের বিজ্ঞাপনের মাঝের ফাঁকগুলোতে। AIDS-কে মহামারী বলা গেলে এইসব মৃত্যুও মহামারী। মৃতেরা সকলেই দরিদ্র এবং বৃদ্ধ। Effie Albright-কে মৃত অবস্থায় তার

ঘরে পাওয়া যায়, বয়স ৭৬ বছর। Joanne Smith-কেও মৃত অবস্থায় তার ঘরে পাওয়া গেছে, বয়স ৬৮ বছর। উভয়েরই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ছিল। এমনি আরো ১৯ জনের একইভাবে মৃত্যু হয়েছে। জুলাই ১৫ থেকে ২২, এই সপ্তাহে মোট মারা গেছে এরকম ৩০০ জন। আগস্ট-এর মাঝামাঝি মারা যাবার খবর পাওয়া গেছে ২০০ জনের, আর ১৯৮০ সালে মোট মারা গেছে এরকম ১০০০ জন। এই সবকটি মৃত্যুর কারণ গ্রীষ্মের উত্তাপের আধিক্য, চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয় hyperthermia, এই রোগের প্রধান শিকার বৃদ্ধরা। এত মৃত্যু, তবুও সবাই উদাসীন। খবরের কাগজে খবর দিতে হয়, তাই দেয়, "গত তিন বছর ধরে প্রচণ্ড গরম চলছে, এক ডজন মারা গেছে মিসৌরিতে··· আর জর্জিয়াতে নয় জন। ৩০০-র বেশি গবাদি পশু বিনষ্ট হয়েছে সাউথ ডাকোটাতে"—খবরটি দিয়েছিল Associated Press, জুলাই মাসের ২২ তারিখে।

আগেই বলেছি, এই রোগের শিকার প্রধানত বয়স্ক বা অসমর্থ লোকেরা। সেইসঙ্গে আরো বলা দরকার, বেশির ভাগই শহরাঞ্চলের লোক। চোর-ছ্যাচোরের উপদ্রব এড়াতে জানালা-দরজা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় এইসব গরিব অঞ্চলের লোকেরা। কিন্তু 'মহামারী'—এই শব্দটি ব্যবহার করতে হচ্ছে, AIDS-এর বেলায় করা হয়েছে বলে—জনসাধারণের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম এইসব মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। (গরিবরা মরলে এমন কি ক্ষতি!) কিন্তু একই কারণে গবাদি পশুর ব্যাধি বা শস্য উৎপাদনে ক্ষতির কথা অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। কারণটা স্পষ্ট করে বলার দরকার নেই।

আমেরিকার কোন উচ্চবিত্ত পরিবারে এমন মৃত্যু হয় না। কারণ এদের কর্মস্থল বা বাসস্থান সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে এবং এই ব্যাধি সংক্রামক নয়—প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যাধিই নয়। এইসব বেচারীদের প্রয়োজন স্বাস্থ্য-সম্মত পরিবেশ। সুতরাং এইসব মৃত্যু অকারণ। আমি হিসাব করে দেখেছি, এইসব লোকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে খরচ পড়বে মাথাপিছু বছরে চল্লিশ ডলার। এইবার তুলনা করুন মাথাপিছু বছরে দশ হাজার ডলারের সঙ্গে—এটা খরচ করা হচ্ছে AIDS আক্রান্ত রোগীদের বেলায়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, উষ্ণতাজনিত মৃত্যু ঘটে গরিবদের মধ্যে

যারা বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত কিম্বা বেকার—থাকেও দরিদ্র পল্লীতে। এদের সঙ্গে বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত বা কাজ করে না এমন যারা La Jolla, Palm Beach বা Bar Horbor-এ থাকে তাদের তুলনা করা ঠিক হবে না। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, মাথাপিছু চল্লিশ ডলারের সংস্থান কীভাবে করা যাবে। উত্তর সহজ, Ms. Heckler-এর দুনম্বর তহবিল থেকে (বা প্রয়োজন বোধে Secretary Weinberger-এর)। "নতুন আসবাবপত্র এবং নির্মাণ" খরচ যোগাবে সরকার। বন্যা, খরা, গবাদি পশুর মৃত্যু, চাষের প্রচণ্ড ক্ষতি যদি সরকারের অর্থের বরাদ্দ পেতে পারে, তাহলে Effie Albright আর Joanne Smith-এর দোষটা কোথায়? এদের জন্য কেন কোনো অর্থের সংস্থান করা যাবে না?

এটা কেমন কথা যে আমরা একটা নতুন ব্যাধি দমন করতে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করবো, অথচ পুরানো কোনো মৃত্যু রোধ করতে সামান্য ব্যবস্থাও নেব না? অন্তত তিনটে কারণ আমার মাথায় আসছে। এক—AIDS ব্যাপারে আমাদের Frendian প্রভাব আছে। অর্থাৎ আমাদের যৌনজীবনের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা। এই ব্যাধি তো প্রথমে দেখা দিয়েছে উচ্ছৃঙ্খল সমাজে এবং সেই সমাজ দরিদ্র নয়; না-জেনে এই জঘন্য রোগের সংক্রামণের "নোংরামী" থেকে বাঁচা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা নীতিগত-ভাবে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের পক্ষে বেশ কঠিন। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেও সেই অর্থ বরাদ্দ করে এটিকে দমন করতে হবে, যাতে AIDS-এর শিকার হবার আগেই ব্যাধিটিকে ধ্বংস করা যায়। ওদিকে Effie Albright-দের তরফ থেকে সেরকম কোনো আশঙ্কা অন্তত আমাদের নেই।

দুই—নতুন কিছুর ব্যাপারে আমাদের যত উৎসাহ তার থেকে অনেক বেশি উদাসীনতা পুরানো দৈনন্দিন ব্যাপারে। প্লেগ আর টাইফয়েড-এর কালে Columbus এবং Magellan সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইয়োরোপ-এর জনগণের বেশির ভাগই ছিল ঝুপড়ি আর তার চারপাশের খোলা ড্রেন-এর বাসিন্দা।

তিন—আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেকেই সমাজের উন্নতিসাধনের কষ্টকর প্রথায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের পেশার লোকহিতকর লক্ষ্য থেকে আমরা বিচ্যুত। Proust-এর Duchesse de Buermantes-এর মত আমরা বলছি:

"যাদের আমরা বুঝতে পারিনা, তাদের উপকার আমরা কীভাবে

করতে পারি? তাছাড়া, কার উপকার করা দরকার আর কার নয়, তাইতো জানা নেই—ফলে উপকারের চেষ্টা করা হয়ে থাকে ভুল লোকেদের। সেটাই সবচেয়ে ভয়ানক।"

আমি ভাবছি, Peter Justice এবং Effie Albright, এই দুটো দলের উপকারই আমরা করতে পারি। এদের কেউই ভুল লোক নয়, সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের শুধু জানতে হবে, ওদের মৃত্যুর কারণটা কি। তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। AIDS গবেষণা চলুক, কিন্তু অন্যদলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা তো আমাদের সাধ্যের মধ্যে, সেটা নিতে বাধা কোথায়!

পুনশ্চ। এই নিবন্ধ লেখা হয়েছিল ১৯৮৩-র গ্রীষ্মকালে। মূল বক্তব্য অস্বীকার করবার মত কিছু ঘটেনি এখনো। দুঃখের কথা হলেও যা আশঙ্কা করা গেছিল, AIDS-এ প্রকোপে বেড়ে চলেছে—১৯৮৫-র জানুয়ারিতে রোগীর সংখ্যা সারা পৃথিবীতে প্রায় ৭৫০০ দাঁড়িয়েছিল, তার ভেতর ৩০০০ জন মারা গেছে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত কেউ বেঁচে উঠেছে বলে শুনিনি। তবুও শুভ সংবাদ আছে, একদল ফরাসী গবেষক সেই etiologic agent-এর সন্ধান পেয়েছেন এবং সেটিকে আলাদাও করতে পেরেছেন। National Institute of Health (Bethesda)-ও এক ধরনের virus আলাদা করে তার নাম দিয়েছেন LAN/HTLV। এই virus-কে অত্যন্ত আধুনিক molecular biology-র সাহায্য নিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দেহে কিছু antibody-ও পাওয়া গেছে। Genetic engineering-এ বর্তমানে প্রতিষেধক টিকার আবিষ্কার প্রায় হয়ে গেছে বলা যায়। বেশিরভাগ কাজই হয়েছে এমন একরকম virus নিয়ে, যেটির অস্তিত্ব ১৯৭৪-এর আগে আমাদের জানা ছিল না। তবে এসব কাজই হয়েছে এবং ফল পাওয়া গেছে cancer দমন করার জন্য যেসব গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছিল, সেইসব গবেষণাগারে—AIDS-এর জন্য বরাদ্দ অর্থে নয়। AIDS বাবদ বরাদ্দ অর্থে আমাদের immunology-র জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটাও অবশ্য ভাল কাজ হয়েছে।

AIDS এখনো আছে, তবে আমরা অনেকটা দূর এগিয়েছি, একথা সত্য। বিজ্ঞান এই ব্যাধিটিকে দমন করার উপায় প্রায় হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। তবে শহরগুলির দরিদ্র এলাকায় যারা অতি পরিচিত কারণে প্রতিদিন প্রায় বিনা ব্যাধিতে মারা যাচ্ছে, তাদের দিকে এখনো নজর দেয়া হচ্ছে না। এই Effie Albright-রা এখনো ওমনি মরছে।

অনুবাদ: নীহার ভট্টাচার্য

শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

শরৎ-উপন্যাসের রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে কোনো সঙ্গতি নেই। প্রকাশ-কাল ধরে শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতির বিবর্তন বিচার করতে গেলে আমরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যেমন, 'দেবদাস' উপন্যাস। মাসিকপত্রে মুদ্রিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা মাসিক 'ভারতবর্ষ'-এ), গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ৩০ জুন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (আষাঢ় ১৩২৪ বঙ্গাব্দে)। অথচ 'দেবদাস' রচিত হয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্বে—ভাগলপুরে।

শরৎচন্দ্রের জীবন ঘটনাবহুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ। তাঁর জীবনে তিনটি পর্ব। এক: ভাগলপুর-পর্ব। ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে পড়বার সময় (তখন তাঁর বয়স সতের-আঠার: ১৮৯৩-৯৪) থেকেই সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত হয়। এই পর্বের আকস্মিক সমাপ্তি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি নিরুদ্দেশ হন। এ সময়ে তিনি লিখেছিলেন বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, শুভদা। ভাগলপুরের যে ঘরোয়া সাহিত্যসভায় শরৎচন্দ্র সাহিত্যচর্চা করতেন তার বিবরণ দিয়েছেন 'বাল্যস্মৃতি' রচনায় ('ছোটদের মাধুকরী', আশ্বিন ১৩৪৫/১৯৩৮)। ঐ রচনায় তিনি লেখেন—দ্বিতীয় বই 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।" অথচ গ্রন্থাকারে এগুলির প্রথম প্রকাশ এইরূপ—'বড়দিদি' (১৯১৩), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'শুভদা' (১৯৩৮: মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

শরৎচন্দ্রের জীবনের দ্বিতীয় পর্বেতে সূচনা তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে (১৯০০)। সন্ন্যাসিবেশে এখানে-সেখানে কিছুদিন ঘোরবার পর তিনি মজঃফরপুরে দুবছর ছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ (১৯০২-এর মাঝামাঝি) ভাগলপুর ফিরে এসে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে চলে যান কলকাতায়—সেখানে মাসকয়েক কাটিয়ে আকস্মিক ভাবে উধাও হন, চলে যান বার্মায় (১৯০৩)। শরচৎন্দ্রের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব কেটেছে বার্মায় (১৯০৩ থেকে ১৯১৬)। ১৯১২ আর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু রেঙ্গুনে ফিরে

গিয়েছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ এপ্রিল তিনি রেঙ্গুন পরিত্যাগ করেন। এখানেই দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে প্রথম যান ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। যাবার আগে তিনি রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক উপন্যাস 'চোখের বালি'।

এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য—'ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না।' ('জয়ন্তী-উৎসর্গ', পৌষ ১৩৩৮/১৯৩১)।

এই নিবন্ধেই তিনি লেখেন,—'এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোনদিন লিখেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে।'

রেঙ্গুনে থাকাকালীন ১৩১৯ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দের মধ্যে (১৯১১ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস কলকাতার 'ভারতী' 'যমুনা', 'সাহিত্য' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলির অধিকাংশ ভাগলপুর-পর্বে রচিত।

এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুধাবনযোগ্য।—"রেঙ্গুনে অবস্থানকালে আত্মীয়বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা—১৩১০ সালের ভাদ্রমাসে [১৯০৩] প্রকাশিত 'কুন্তলীন পুরস্কার' ১৩০৯ সন' 'পুস্তকের 'মন্দির' নামে একটি গল্প। ব্রহ্মদেশে যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে গল্পটি তিনি সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়াছিলেন (মাঘ ১৩০৯)। বলা বাহুল্য, গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫ টাকা পুরস্কার লাভ করে। সে-বার পুরস্কৃত রচনাগুলির প্রথম দশটি নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন—তৎকালীন 'বসুমতী' সম্পাদক জলধর সেন।

ইহার চারি বৎসর পরে—১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা [১৯০৭] 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের একটি অপরিণত বয়সের রচনা—'বড়দিদি' নামে উপন্যাস প্রকাশিত হইলেও, মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাব যে ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়, একথা নিঃসংকোচে বলা চলে।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পরে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক) ছিলেন 'যমুনা'-সম্পাদকের বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহারই মধ্যস্থতায় শরৎচন্দ্র 'যমুনা'য় লিখিতে স্বীকৃত হন। 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা—'বোঝা' নামে একটি গল্প (কার্তিক-পৌষ ১৩১৯/১৯১২)। ইহাও তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনা।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাগুলি ভাগলপুরে তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুলদের নিকট ছিল। এই সময়ে তাঁহারা শরৎচন্দ্রের এই সকল প্রাথমিক রচনা যাহাতে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়, তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্যে' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জানাইলে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা-সম্বলিত একখানি খাতা দিয়াছিলেন। পাছে পুরাতন রচনা প্রকাশে শরৎচন্দ্র আপত্তি করেন, এই ভয়ে উপেন্দ্রনাথ একথা তাঁহাকে পূর্বাহ্ণে কিছুই জানান নাই। বলা বাহুল্য, 'সাহিত্যে' 'বাল্যস্মৃতি' (মাঘ ১৩১৯), 'কাশীনাথ' (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), 'অনুপমার প্রেম' ও 'হরিচরণ' প্রকাশিত হইলে শরৎচন্দ্র প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অপরিণত বয়সের রচনা হুবহু মুদ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।......

প্রকৃতপক্ষে ১৩১৯ সালের শেষার্ধ হইতে ১৩২১ সাল পর্যন্ত 'যমুনা'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা সমালোচনা—কোন-না-কোন রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি 'বড়দিদি' (অনিলা দেবীর ছদ্ম নামেও কতকগুলি প্রবন্ধ—'নারীর লেখা' 'নারীর মূল্য' 'কানকাটা' ও 'গুরুশিষ্য সংবাদ' ১৩১৯-২০ সালের (১৯১২-১৩ খ্রি) 'যমুনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।......

'যমুনা'য় 'রামের সুমতি' (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯) 'পথনির্দেশ' (বৈশাখ ১৩২০) ও 'বিন্দুর ছেলে' (শ্রাবণ ১৩২০), এই তিনটি নূতন গল্প উপর্যুপরি প্রকাশিত হইবার পর চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। রচনার জন্য বড় বড় পত্রিকাগুলির উপরোধ-অনুরোধ রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে লাগিল।......

'ভারতবর্ষের' পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বিরাজ-বৌ' প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায় (১৩১৩ খ্রি)।...১৩২১ সালের (১৯১৪ খ্রি) 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নূতন রচনা—'পণ্ডিত মশাই' ও আরও তিনটি গল্প প্রকাশিত হইল; এই বৎসরের প্রথমার্ধেই আবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

অ্যান্ড সন্‌স কর্তৃক 'বিরাজ বৌ' ও 'বিন্দুর ছেলে' এবং রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যান্ড সন্‌স কর্তৃক 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিতমশাই' পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল। শরৎচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ('শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৫২ সংখ্যক পুস্তক, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫২/১৯৪৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা)।

শরৎচন্দ্রের জীবনের তৃতীয় পর্বের সূচ ' ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে যখন তিনি রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসেন। প্রথমে বাজে শিবপুরে ভাড়াবাড়িতে, পরে রূপনারায়ণের তীরে হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রামে নবনির্মিত বাড়িতে (১৯২৫) বাস করতে থাকেন শেষজীবনে দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন (১৯৩৪)। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর জীবনের তৃতীয় ও শেষ পর্বের সমাপ্তি।

তৃতীয় পর্বের সূচনায় শরৎচন্দ্রের বয়স পঞ্চাশ বৎসর (১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ)। 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্র ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্‌স প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানের মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মাসিক একশ টাকা আয়ের ভরসা দিয়ে শরৎচন্দ্রকে পত্র লেখেন। প্রাথমিক দ্বিধার পর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের অ্যাকাউনটান্ট জেনারেলের আপিসের এক শ টাকা বেতনের পাকা চাকুরি ছেড়ে চলে আসেন। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য,—

"একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হল না। যার কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।" ('জয়ন্তী-উৎসর্গ' পৌষ ১৩৩৮)।

২

'সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি'—শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পরিচায়ক। 'চোখের বালি' পড়ে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—"সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ ফিরে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এত দিনে

শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।" (জয়ন্তী-উৎসর্গ)

রবীন্দ্র-সাহিত্য কিশোর শরৎচন্দ্রকে কতো গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তার পরিচয় এখানেই শেষ নয়। 'চোখের বালি' পড়বার আগেই তিনি স্বাদ পেয়েছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের। তাঁর কথায়—

"যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করবে এবং উকীল হবে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড়ো করে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো।" (তদেব)

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মানবিকতা ও গভীরতা গড়ে তুলেছিল শরৎচন্দ্রকে। বার্মায় লেখকের অজ্ঞাতবাস। সেদিন তিনি নিজেকে সাহিত্যসাধনার জন্যে তৈরি করে নিচ্ছিলেন। লেখকের মূল্যবান স্বীকৃতি,—

"সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার করে পড়েছি—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কিনা,—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথাসাহিত্যে, আমার ছিল এই ঝুঁকি।" (তদেব)

অজ্ঞাতবাস শেষে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন বাংলাসাহিত্য কেন্দ্রে। লক্ষণীয় তাঁর যাবতীয় প্রধান গল্প-উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তারপরেই ১৯১৬ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। যেমন, শ্রীকান্ত প্রথমপর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৭, ১৯১৮), চরিত্রহীন (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২০)। পরবর্তী এক যুগে প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ্য—দেনা পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শ্রীকান্ত তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব (১৯২৭, ১৯৩৩), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)।

উপন্যাসের পরিকাঠামো ও ভাষাভিত্তি (matrix) শরৎচন্দ্র নিয়েছিলেন রবীন্দ্র-উপন্যাস থেকে। চোখের বালি, গোরা ও গল্পগুচ্ছ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) শরৎচন্দ্রের প্রেরণাস্থল ছিল।

ভাগলপুর-পর্বে লিখিত সব গল্প-উপন্যাসকে শরৎচন্দ্র বাল্য রচনা বলে অভিহিত করেছিলেন, ঘোর বিরোধী ছিলেন সেগুলির প্রকাশে। এই আপত্তি নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এখানে তার সামান্য পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

(১) একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনিভাবে ছাপা হয়, অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, রেঙ্গুন, ২৬. ৪. ১৯১৩)।

(২) চন্দ্রনাথ গল্পটি আমার বাল্য রচনা। তখনকার দিনে গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনের যে-ভাষা ব্যবহার করা হইত এই বইখানিতে সেই ভাষাই ছিল। বর্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্তিত করিয়া দিলাম। ইতি ১৮ই আশ্বিন ১৩৪৪। গ্রন্থকার। (চতুর্দশ সংস্করণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ১৯৩৭)

(৩) 'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা করব। (উপেন্দ্রনাথকে লেখা পত্র, রেঙ্গুন, ১০. ৫. ১৯১৩)

৪। আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করলেন, সমাজ-পতিও তেমনি ঐটে (কাশীনাথ) ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। (ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত পত্র, রেঙ্গুন, জানুয়ারি ১৯১৩)

৫। তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল করনি। ওটা 'বোঝা'র জুড়ি, ছেলেবেলায় হাত পাকানোর গল্প। ছাপানো ত দূরের কথা, লোককে দেখানোও উচিত নয়। (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, রেঙ্গুন, ১০.১.১৯১৩)

৬। যদি 'চন্দ্রনাথ' বৈশাখে শুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকিটা পরিবর্তন পরিবর্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। (ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত পত্র, রেঙ্গুন, ১৯১৩)

৭। তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি' পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধকরি ভাল হইত। (ফণীন্দ্রনাথ পালকে পত্র, রেঙ্গুন, ১০-১০-১৯১৩)

এইসব উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ হয়, শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্যরচনা মুদ্রণের বিরোধী ছিলেন, আর একান্তই যদি ছাপা হয় তবে তা অবশ্য সংশোধিত হবে—

এই ছিল তাঁর দৃঢ় অভিমত। চন্দ্রনাথ, দেবদাস, বোঝা, বড়দিদি ও ভাগলপুর পর্বের অন্যান্য রচনা সম্পর্কে লেখকের এই অভিমত আমাদের মনে রাখা দরকার।

রেঙ্গুন-পর্বে লেখা তাঁর একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি (চরিত্রহীন) আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের দুটি মন্তব্য স্মর্তব্য:

(ক) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript; নারীর ইতিহাস প্রায় ৪০০/৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এবৎসরে publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল। (প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র, রেঙ্গুন, ২২. ৩. ১৯১২) স্মর্তব্য, রেঙ্গুনেই তিনি নতুন করে 'চরিত্রহীন' লিখতে শুরু করেছিলেন। এই পত্রেই শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—

'পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।'

(খ) চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্পবয়সে। তারপর ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হলো বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য-রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানাস্থানে নানা অন্ধকারে। অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—ঐভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করেদিলাম। (১৪.৭.১৯৩৭)

শরৎচন্দ্রের এইসব বক্তব্য থেকে আমরা এ সিদ্ধান্ত করতে পারি, ভাগলপুর পর্বের উপন্যাস অবলম্বনে শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতি বিচার করা উচিত হবে না। রেঙ্গুন-পর্বে রচিত একটিমাত্র উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আগুনে পুড়ে যায়। সুতরাং বিচারের জন্য আমাদের অবলম্বন কলকাতা-পর্বে রচিত উপন্যাস।

৩

এই বিচারে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে উপন্যাসের রচনারীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিমত দেখা যেতে পারে।

(ক) কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন করে না রাখি। অলিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। শ্রী—তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে, পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো—কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়। (৪ ফাল্গুন ১৩৩৭, দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র, দিলীপকুমারের 'অনামী'-তে সংকলিত)

(খ) মাসিকপত্রে বহুলোকের প্রিয় করে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে। তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও যে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। (২৪ ভাদ্র ১৩৪০, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লিখিত, 'স্বদেশ' আশ্বিন ১৩৪০ সংখ্যায় মুদ্রিত)

(গ) উপন্যাসে অনেক রকম প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্লভ। কুমারসম্ভবের প্রব্লেম, উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরায় প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম এক জাতীয় নয়। ('প্রচারক'-সম্পাদক অতুলানন্দ রায়কে, 'বাতায়ন' ১৭ কার্ত্তিক ১৩৪০ সংখ্যায় মুদ্রিত)

এইসব উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায়, শরৎচন্দ্র তিনটি বিবেচনা নির্দেশ করেছেন। লেখা ও না-লেখার বিবেচনা, আবেগ প্রকাশে সংযম ও অসংযমের বিবেচনা, উপন্যাসকাহিনীর নিজস্ব প্রব্লেম ও অপরাপর প্রব্লেমের বিবেচনা।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একপত্রে ('নাচঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত, ২৫ আশ্বিন ১৩৩১) শরৎচন্দ্র উপন্যাস-রচনারীতি ও নাট্য-রচনারীতি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা অনুধাবনযোগ্য।—

"গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারে স্থ

হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটে নি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গাটায় অ্যাকশন কম,—দর্শকে নেবে না, কিম্বা এতই অচল, ত' তাকে সচল করার কোন উপায় নেই।...নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কত সোজা করে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানিনে, তা নয়। এছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলে বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে হয়, চরিত্র সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দুরকমের হতে পারে। এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দের দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত বিশ বছর আগে উইল্‌সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্তন। হয়ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্তে পড়ে পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যিকার বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হলে' তা হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্য দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি করে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অংকে ভাগ করা, তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না।"

এ থেকে প্রমাণ হয়, শরৎচন্দ্র উপন্যাস ও নাটকের সিচুয়েশান, অ্যাকশন ও চরিত্রের ক্রমবিস্তার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ডায়ালোগ ও চরিত্র সৃষ্টিতে ছিল তাঁর নৈপুণ্য।

লেখা ও না-লেখা, সংযম ও অতিরেক, প্লট ও চরিত্র, সিচুয়েশান ও

অ্যাকশন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য এখানেই শেষ নয়। আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি নেওয়া যেতে পারে।

(ক) রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেকনিক বল···এই বস্তুটা যা আছে, তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত' নয় ভাই, না-লেখা বিদ্যেটাও শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে-কথা শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতে সম্পূর্ণ হয়ে আসে। (দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ ফাল্গুন)

(খ) যাহারা লিখিতে জানে না···মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই।···কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়, না তা নয়।···বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়। (হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ১৩২৬)

(গ) রচনার আগে অধ্যায় ভাগ করিতে হয়। (লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিতপত্র,৫ আগস্ট ১৯১৯)

(ঘ) আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে। (ঐ, ৭ ভাদ্র ১৩২৬)

(ঙ) আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে। (শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃ ২০৭)

(চ) আমি ঘটনার সৃষ্টি উপন্যাসের আসল জিনিস বলে মনে করিনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে চরিত্র সৃষ্টি। তার সঙ্গে ঘটনা আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করতে হয় না। (শরৎসাহিত্য সংগ্রহ ১ম খণ্ড, পৃ ৪১৪)

(ছ) গল্প পারতপক্ষে ট্রাজেডি করতে নেই।···গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয়, 'আহা বেশ।' তবে আবার গল্প কি? (গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্র' ৩য় খণ্ড)

(জ) পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে, তবে আর সে গল্প কি? (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃ ৯১)

(ঝ) ট্রাজেডি লিখিব না। ট্রাজেডি ঢের লিখিয়াছি আর না। তাছাড়া ছেলে ছোকরারা ট্রাজেডি লিখুক, আমাদের এবয়সে ট্রাজেডি লেখা কালি-কলমের অপব্যয়। (গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্র' ৩য় খণ্ড পৃ ৫৯)

এইসব উদ্ধৃতি সযত্নে অনুধাবন করলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনা কৌশল প্রতিভাত হয়। এইসব মন্তব্য তিনি করেছেন এক দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে। উপন্যাস রচনায় তাঁর অভিজ্ঞতার ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্জিত শিল্পসত্যের পরিচায়ক এগুলি। উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণে সংহতি ও সংযমের উপর শরৎচন্দ্র বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। স্বীকার্য এই সংযমবোধ একদিনে অর্জিত হয় না, তা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। সেকারণেই শরৎচন্দ্র ভাগলপুর পর্বের রচনা সম্পর্কে কুণ্ঠিত ছিলেন। ঐ পর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ভাগলপুর পর্বে (১৮৯৪-১৯০০) লিখিত উপন্যাসগুলির ত্রুটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, রেঙ্গুন থেকে লিখিত পত্রাবলীর উদ্ধৃতাংশ সমূহ তার পরিচায়ক। বঙ্কিম-প্রভাব বলতে আমরা এখানে বুঝি ঘটনানির্ভরতা, ঘটনার আকস্মিক ও নাটকীয় যোগাযোগের প্রাধান্য, বঙ্কিম রীতির রোমান্স উপাদান ব্যবহার চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের আপেক্ষিক প্রাধান্য। বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ তার পরিচয়স্থল। বড়দিদি-র পরিণতিতে নাটকীয়তা, দেবদাস-এ পার্বতী-দেবদাসের অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়চিত্রে আর চন্দ্রনাথ-সরযূর প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রণয় সঞ্চারে রোমান্স দৃষ্টিতে বঙ্কিমী-প্রভাব অনায়াস লক্ষণীয়।

আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত নিটোল প্লট রচনায় শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র (স্কট, হার্ডি, স্কোব্যার স্মর্তব্য) অনুবর্তী। আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত কাহিনী, সুগ্রথিত প্লট, চরিত্র ও প্লটের সুসমঞ্জস ছাঁচ শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে। শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পরবর্তী অধ্যায় আগে লিখে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ পরে লিখতেন। শরৎচন্দ্র তা পারতেন বলে শোনা যায় (অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু সেকথা লেখক মুখে শুনেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন এক নিবন্ধে, 'দেশ' ১৫মে ১৯৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুগ্রথিত প্রাকনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অভ্রান্তগতিতে ধাবমান প্লট, যার পরিণামে নিটোল সমাপ্তি,—এটি শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের কাছেই পেয়েছিলেন। উপন্যাসের অধ্যায় বিভাজনের উপর শরৎচন্দ্র জোর দেওয়ায় তার পরিচয় পাই।

স্মর্তব্য, বঙ্কিম-উপন্যাস প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সে লিখেছিলেন, "পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক থেকে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।"

কিন্তু শরৎচন্দ্রের বঙ্কিম-অনুসৃতি স্থায়ী হয় নি। তিনি ভারত ছেড়ে

বার্মায় চলে যাবার পূর্বেই নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে পড়েছিলেন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'। তিনি যে বছর রেঙ্গুন চলে যান সে বছরেই চোখের বালি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯০৩)। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকৃতি পুনঃস্মর্তব্য—'ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না।' (জয়ন্তী-উৎসর্গ, ১৯৩১)

"আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে চরিত্রসৃষ্টি"—শরৎচন্দ্রের এই দাবির পিছনে যে আধুনিক শিল্পে মানসিকতা ক্রিয়াশীল, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে, চোখের বালির কাছে ঋণী। বাইরের ঘটনা প্রধান নয়, নরনারীর মনোলোকের বিশ্লেষণই উপন্যাসের অন্বিষ্ট,—একথা শরৎচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন 'চোখের বালি' পড়ে। পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, চরিত্রহীন—এগুলি খসড়া তিনি করেছিলেন রেঙ্গুন-পর্বে (১৯০৩-১৯১৬)। রেঙ্গুন বাসকালে শরৎচন্দ্রের সঙ্গী ছিল যে ক'খানি বাংলা বই, সেগুলি রবীন্দ্ররচিত কাব্য আর উপন্যাস। ঘুরে ফিরে তিনি সেগুলিই পড়তেন (দ্রষ্টব্য জয়ন্তী-উৎসর্গে সংকলিত শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ)। বলা বাহুল্য, সেদিন যে তিনটি রবীন্দ্র-উপন্যাস তাঁর সঙ্গী ছিল, তাদের নাম—চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা। স্মর্তব্য, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান বাংলা মাসিক সাহিত্যপত্রের গ্রাহক ছিলেন (ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা পত্র থেকে তা জানা যায়)।

শরৎচন্দ্র উপন্যাসের নিটোল সমাপ্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর পত্রাবলী থেকে আমরা আরো জানতে পারি। তিনি ট্রাজেডির পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি লিখেছিলেন, 'ট্রাজেডি লিখিব না। ট্রাজেডি ঢের লিখিয়াছি আর না।' (গোপালচন্দ্র রায়ের শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড, পৃ ৫০)। সেই সময়—১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে—শরৎচন্দ্রের একটিমাত্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে 'বড়দিদি', তাও পূর্বেকার লেখা। তথাপি ট্রাজেডি সম্পর্কে তাঁর বিমুখতা এখানে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিসত্তায় দ্বি-ট্রাজিক মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছিল, শরৎচন্দ্র তা গ্রহণ করেননি, পরন্তু রোমান্টিক ভাবালুতাপূর্ণ ইচ্ছাপূরণধর্মী প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ রায়ের ট্রাজিক মহিমার পাশে সে-কারণেই দেবদাস জীবানন্দ শ্রীকান্ত অনুজ্জ্বল।

শরৎচন্দ্র কি চরিত্রের স্বাভাবিক অনিবার্য পরিণামকে মেনে নিয়েছিলেন?

ট্রাজেডি বিমুখতার পরিচয়বাহী উদ্ধৃতি দুটি পড়ে মনে হয় তিনি চরিত্রের ট্রাজিক পরিণতিতে আনন্দের আতিশয্যসঞ্চারী কমেডিতে পর্যবসিত করেছেন। এই অভিমত (ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বাংলা কথাসাহিত্য-প্রসঙ্গ, পৃ ৬৭) সম্পর্কে বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র হৃদয়াবেগের অনুভূতি প্রাবল্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবারই পক্ষপাতী ছিলেন। অনেকক্ষেত্রে ঘটে আত্মপ্রক্ষেপণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে লেখকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাবাবেগ-প্রবণতা বিশেষভাবে জড়িত থাকে। ফলে তাঁর নিজ ব্যক্তিচরিত্রের ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে সংক্রামিত হয়। তাঁর চরম উদাহরণ—শ্রীকান্ত-চরিত্র। এই চরিত্রে বারবার লেখকের আত্মপ্রক্ষেপণ ঘটেছে। আর সে-কারণেই তিনি উপন্যাসে নির্লিপ্ত (ডিট্যাচ্‌ড) থাকেন নি। ফলে তাঁর উপন্যাসে নাট্যমূহূর্ত অনেকক্ষেত্রেই লেখকের নিজস্ব ভাবপ্রবণতায় ভেসে গেছে বা রঙীন হয়েছে। তা থেকে মনে হয়, চরিত্রের বিকাশ ও বিবর্তন অপেক্ষা নানা চমকপ্রদ নাটকীয়তায় বিক্ষুব্ধ ঘটনার সাহায্যে চরিত্রের নিছক বিস্তৃতিসাধনই লেখকের লক্ষ্য। "পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে, তবে আর সে গল্প কি ?"—শরৎচন্দ্রের এই উক্তির তাৎপর্য এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

[ক্রমশ]

কিছু সফলতা চাই

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কিছু সফলতা চাই জীবনে, না পেলে দিন যায়
ঘুঘু-ডাকা দুপুরের শূন্যতার অবসন্নতায় ;
কিন্তু কোন্ সফলতা ? প্রসারিত রাত্রির ভিতর
ডুব দিয়ে দেখি জ্যোৎস্না-উচ্ছ্বসিত স্বপ্নের শহর :
কারা যেন হেঁটে যায় রাজপথে, নিশ্ছিদ্র সুষমা
মুখে উদ্ভাসিত, কাঁটা উপড়ে নেওয়া পথে পরিক্রমা
করে নবজাতকেরা, স্থির প্রত্যয়ের দিকে হাঁটে
চোখ রেখে আত্মগত, আমি দেখি নিষ্প্রভ কপাটে
চোখ দিয়ে. বুঝি না তো সনির্ভার পা তোলা পা ফেলা :
নিজের খনিত কূপে কখন যে ডুবে গেলো বেলা !

রুপী যৌবনের তাপে হিমদেহ গলে হয় জল,
হাজার সূর্যের শিখা জ্বলে ওঠে মঞ্চে, কী প্রবল
জীবন ! পৌরুষ প্রেম অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও সুখের
উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের আনন্দ ঘোষণা, সাফল্যের
এই তুঙ্গ চূড়া ছুঁয়ে ফিরে আসি চোরকুঠুরিতে,
পথের কুকুর কাঁদে ডিসেম্বরের তীক্ষ্ণ শীতে :
কী বিশাল শীতরাত্রি, ক্ষমাহীন উদাসীনতায়
উচ্ছিন্ন শিশু বা নারী ফুটপাতে বা খোলা বারান্দায়,
তৃতীয় বিশ্বের ভাবী নাগরিক শরীরের ওমে
শীতকে তাড়ায়, দূরে জমে ওঠে শীতের বিক্রমে,
বারে রেস্তোরায় যৌন উৎসবের দীর্ঘ মাহ্‌ফিল
রাতের শূন্যতা চিরে ভেকে ওঠে চিল।

উদ্‌যাপন

সামসুল হক

কোজাগরী পূর্ণিমায় সমুদ্রতীরে আমাদের প্রিয় কবি
তাঁর সফলতা উদ্‌যাপন করছেন
প্রথমে তাঁর মাকে তিনি সমুদ্রের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন
তারপর তাঁকে তুলে দিলেন এক সংসদ্‌-সদস্যের হাতে
এবং স্ত্রীকে তিনি জ্যোৎস্নার উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন
তারপর তাঁকে তুলে দিলেন তিন বিধায়কের হাতে

আমাদের প্রিয় কবি আমাদের প্রিয় দুটি কবিতা পড়লেন
কবিতা দুটি আবার পড়ালেন তাঁর দুই ছেলেমেয়েকে দিয়ে
কোজাগরী পূর্ণিমায় সমুদ্রতীরে সফল মত্ত কবি
অর্ধমত্ত বালক-আত্মজের গলার উপর ডান-পা চেপে দাঁড়ালেন
এর পরের অনুষ্ঠানটি আমরা এখনো জানি না

হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে সাতসমুদ্র সপ্ত-আকাশ
একজন অতিথি বলছেন হাততালি দিচ্ছে কাশ্মীর কন্যাকুমারিকা
একজন অতিথি বলছেন কালাহান্দি ও ইথিওপিয়া
তাদের শরীর ছুঁড়ে দিচ্ছে কবির গলায়

এসময় মাথার উপরে সকলের মাথার উপরে
সামগান গাইতে-গাইতে একখণ্ড মেঘ

'ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ'

জোড়া গির্জার মোড়ে

জিয়াদ আলী

আমাদের সম্পর্কগুলো ইদানিং
কেমন যেন বদলে যাচ্ছে,

বন্ধু কেরাণীরা কেউ কেউ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত অফিসার
আর কোনো কোনো অফিসারও হয়ে যাচ্ছে
রাজা-বাদশাহদের পাইক-পেয়াদা বা
চাকর-বাকরের মতো।
যে বালক প্রত্যহই টিফিনের জন্য আবদার করতো
সে-ও সম্রাটের পোশাক পরবে বলে
অহরহ ছুটছে
চিৎপুর থেকে বসির আমেদ
বা আসলামের দোকান।

আচমকা তাকে আমি প্রবুদ্ধ প্রবুদ্ধ বলে
ডাক দিই হৈ হৈ করে
কতো দিন পরে দেখা—মাসিমার বাতের অসুখ……
কথা শেষ হতে না হতেই
সে ছিটকে বেরিয়ে যায় হাত ফসকে যাওয়া গুলতির
মার্বেলের মতো।

জোড়া গীর্জার মোড়ে আমি
বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকি—
বুঝতে পারি না
প্রবুদ্ধ খুব বড়ো হয়ে যাচ্ছে, না আমি
হয়ে যাচ্ছি খুবই ছোট
পাঁচু খানসামা লেনের এক চিলতে বারান্দার মতো!

এই চলা

প্রকাশ সান্যাল

তাপদগ্ধ পথ ভুলে ভুলে
রোদে ভেজা ঘাস জমি
শাল তাল বন সাথে নিয়ে
পাশ দিয়ে অবিরাম ছুটে চলে যায়

উত্তপ্ত বাতাস কাঁপে পীচের রাস্তায়
ফুটন্ত জলের মতো ধোঁয়া হয়ে
উড়ে যায় যেন।
মাঝে মাঝে মৃদু স্নিগ্ধ হাওয়া
আলতো ভাবে ছোঁয়
ন্যাশনাল হাইওয়ে বেয়ে
মালবাহী—ভারী ভারী ট্রাক
চলে সারাক্ষণ।
কটা বেলা হোলো
বিমন্ত যাত্রীর প্রশ্ন
বাস ছোটে গ্রাম গঞ্জ সদর সহর পার হয়ে।
ড্রাইভার স্টীয়ার বদলায়।

ক্রীতদাসী

সুমিত্রা মজুমদার

দিয়েছো মণিহার
দীর্ঘ শাকাহার
অন্ন বস্তু-মেখ
আমি যে ভিক্ষুক

কবচ কুণ্ডল
নবম শৃংখল
মারুতি মর্মে
এখানে মহাসুখ

আমার দেহ-ঘিরে
রূপের বিদ্যুৎ
আমি যে ক্রীতদাসী
আশিরনখ

রমণে বমনে
ত্রাসে ও তাণ্ডবে
পেয়েছি শীৎকার
হে প্রভু হে রাজন

হৃদয়ে এ দহন
অগুরু চন্দন
বিলীয়মান হায়
মেঘের নীল

পরেছি বর্ম
থাকবে লুকানো
গোপন সে অহং
কলনশীল।

নিজেও জ্বলে ওঠো

নন্দিতা সেনগুপ্ত

এখন শুধুই ঘুমিয়ে থাকার স্বপ্ন অবসান,
দেউলে রোদ নদীর বাঁকে অন্যকথা বলে।
নষ্ট হোক জীর্ণ দিন, দীর্ণ ভালবাসা,
তীক্ষ্ণমুখ ঝড়ের বুকে উঠতে হবে একা।

পাথুরে হিম হাড়ের মতো, হীরের কণা চোখ,
শ্যাওলা জমাট শরীরে নেই একছটাকও তাপ।
আসছে মেঘ, উড়িয়ে ধুলো, রোদনভরা দিন,
সমাপ্তি তার আকাল মাঠে তুরন্ত বর্ষণ।

এখন বীজ বপন করো, শান্ত হবে মাটি,
রুক্ষ মাঠে রিক্ত হাওয়ায় জ্বলছে যতো চিতা।
তাদের ছাই কুড়িয়ে আনো, দু'হাতে বুকে মাখো।
যেখানে যত শীতল প্রাণ তাদের ঘিরে রাখো।
শ্মশানে এই অগ্নিদাহে তাদের দাও তাপ,
তাদেরই হাতে তোমারই হাত নিজেও জ্বলে ওঠো।

সন্ধের লোকাল ট্রেন

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ভিক্ষে দেওয়া কি উচিত কখনো ? ভিক্ষে দেওয়া কি ভালো ?
আমার পকেটে খুচরো পয়সা উদ্বৃত্ত কি আছে,
উদ্বৃত্ত কি কারুর কখনো থাকে ?
ভাবতে ভাবতে, ট্রেন জানালায়
দেখছি বাড়ানো বোবা শিরা ওঠা হাত
হঠাৎ আমার পাশে সাদামাটা মধ্যবয়সী লোক
আমার হাতেই একটি আধুলি গুঁজে বলে, দিয়ে দিন—
আমি যান্ত্রিক ত্বরিতে পয়সা পৌঁছে দিলাম সেই ম্লান বোবা হাতে
ট্রেন তো ছাড়বে, এখনই সে হাত সরেও তো যেতে পারে

প্রার্থী ও দাতা, তারই মাঝপথে আমার হাতটি পরিচিতিহীন দ্বিধায়
তুচ্ছ মজার খেলায় শিখেছে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় অর্থনীতি
উদ্বৃত্ত না ইচ্ছেই শেষ কথা ? প্রার্থী যে, তারও অভাব সত্যি আছে ?
ট্রেন জানালায়, আমার এপাশে, শেষ গোধূলির রঙে
বস্তির ধোঁয়া ধুলোয় মাখানো অভ্রংলিহ হর্ম্যনগরী দেখে

নিয়তিবাহিত, পরিচিতিহীন, খুঁজেই চলেছি,
একাকী আমরা, মাঝখানে যারা
বসে থাকি, তারা কতখানি ক্রীতদাস ?

আজ

সুব্রত রুদ্র

চোখের পাতা না-ফেলে সূর্যিঠাকুর বসে আছেন
দুপাটি দাঁতে ভোরবেলার জুঁই ছড়াতে ছড়াতে
বাচ্চারা দৌড়চ্ছে
যেখান থেকে আজ শুরু হলো·····

এখনো সময় আছে

প্রবালকুমার বসু

শান্ত হও, আমার চোখের দিকে চোখ রাখো,···স্থির
এখন সময় নয় হেরে যাবে, সামনে অনেক যুদ্ধ বাকি
বুকের গভীর গভীর ক্ষত খুঁজে পেতে দেখেছি কোনো অস্ত্রচুক্তি নেই
গোপনে রেখেছি নোট, সামনে শীতের মাস···ডিসেম্বর, সাত
তাই এখনো সময় আছে, শান্ত হও···ওষ্ঠে তিলের মত বাঁচো।

লালবাড়ির দিকে

কল্যাণ দে

চ্যাংগা নদীর পারে গ্রাম। মেজমান গছ। গাঁয়ের চারধারে ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ। চ্যাংগা নদীর দুপারে বনজঙ্গল। সে জঙ্গলে পলাশ, শিমুল, ময়না কাঁটা, ডুমুর, জিয়ল, শেওড়া, মাদার, বটের বিশাল বনস্পতি ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাত ধরাধরি করে যেন দাঁড়িয়ে। এ জঙ্গলের ভেতর ভাঁট, পিশাচ, চেকান্দি, বড়চেকান্দি, কালসিমা, বন তুলশি, বন হলুদ, হাতি শুঁড়া, ফুটকী, বন বেগুন এসব জঙ্গুলে গাছের ঝোঁপ। নানাধরনের লতা বনস্পতির গা জড়িয়ে নির্ভাবনায় পেতেছে বনজ সংসার। গন্ধ বাধুলে পাতায় কটুতিক্ত গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। চিলহাসার পাতা, পানপাতার অবয়ব নিয়ে ধোঁকা দিচ্ছে সহুরে মানসিকতায়। নানা ধরনের ঘাস মখমলের মত ঢেকে রেখেছে মাটি। রিফিউজি ঘাস নির্বিবাদে দখল করে চলেছে ছাই রঙা মাটি। বিচিত্র স্বরের, বিচিত্র বর্ণের পাখি লেজ দুলিয়ে এগাছ ওগাছ করে গাইছে সুখের গান। দোয়েল, ফিঙে, বুলবুলি, ছোট টিয়ে বা মাটি টিয়ে, মুনিয়া, গাঙ-শালিখ, শালিখ, চড়ুই, কাক, ঘুঘু, চিল, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, বৌ কথা-কও পরম সুখে দিন কাটাচ্ছে এখানে। শজারু, বনবেড়াল, ইত্যাদি জীব নির্ভয়ে সংসার পেতেছে জঙ্গলের ভেতর। খরগোসের সাদা তাজিম শরীর বিদ্যুৎ লতার মত ঝলসে উঠছে এখানে ওখানে। বেশ সুন্দর এ জঙ্গল। এ গ্রাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিলাম এখানে। জঙ্গলের ভেতর বনস্পতি বটগাছের নীচে আছে যুগযুগান্তরের পূজিত মাসান দেবতার থান। নদীর পারে বসে নদীর কলকল্লোল শোনা যাচ্ছিল স্পষ্ট। এমন সুন্দর পরিবেশে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ সজাগ হলুম, হালুম শব্দে। না। বাঘ নয়। সামনে দাঁড়িয়ে মেজমান গাছের জোতদার কামিনী সিংহ।

—কি ভাতিজা। চমকাইছিস্?

—না কাকা। চমকাউনি।

—ক্যানে। যদি বাঘ আসিল হয়?

—সোনা রায়ের নাম করিলে বাঘে কোনো না কয়।

—হ্যাঁ বারে ভাতিজা, তুই হামার দেশের ছাওয়া না হয়—আও কেমন সোন্দর হামার কাথালা কহছিস। শিখেছিস কোন্‌ঠেনা ?

—কাকা। মোর জনম যদিও আসাম দেশৎ। ছোট-অ থাকিয়া মুই এইঠে রাজবংশীর ঘর্‌ থাকিয়া মানসি হইছু।

—ঠিকে কাথা। মুই ফম হারায়া ফেলায়ছিনু। যাবৃ। তুই এলহা কোন্‌ঠে পড়েছিস্‌ ?

—আঠারোখাড়ি। কালি প্রসাদ সিংহের ঘরৎ থাকিয়া নরসিংহ বিদ্যাপীঠৎ পড়ঙ।

—মোর একটা ছোয়াও মানসি হইলনি। জোতদারী যাবার ধরিছে। সরকার সিলিং বেনাইছে পঁচিশ একর তক জমি রাখা যাবে। বাবু, তুই শুনি রাখেক, হামার সুখের দিন যাবার ধরিছে। হামার এই বন, এই মাসান দেবতার থান, শাইস্ত্রী, পাঁইচালী গান আর বেশী দিন বাঁচবেনি। ছোয়ালা খড়িবাড়ি ইস্কুলৎ পড়ে। কিন্তুক এমার ঠাটবাট দেখিয়া মনডা হাতাসে কান্দে। হামাক—বুড়ালাক মানিবার চায়গেনা। শ্যাম, যদু দোনোজনে বডিংয়ৎ রহে। হপ্তায় হপ্তায় ঘর্‌ আসে। অমার শুধু টাকা নাগে, টাকা। মুই জমি বেচায়া টাকা দিউ। কি দিয়া যে কি করমু। আগের লাখাড়ি ধান-অ না হয়।

—কাকা। বাদ দাও ক্যানে। সংসারৎ সুখ দুখ দুইভাইছে। দুখ কনেক বেশী। কাজে-এ সুখের কাথা মনৎ রাখেয়া যতটুকু মিলে অতটুকু চাখে লিবা হবে।

—তুই ঠিক-এ কইছিস বাবু।

—কাকা। আজি দুইডা গাছের অসুধ মোক শিখায়া দাওনা ক্যানে ?

—হ। হামা দোন-অজনা হইছি ভাল্‌। গাছ আর গাছ লিয়া হামার কারবার। লে। এই দ্যাখেক দণ্ড কলস গাছ। এই গাছের পাতার রস যদি নাকৎ দিয়া টানা যায় তা হলে যার পুরনা মাথার দরদ ছে, একদম সারি যাবে। যার কম দিনের দরদ আর কনেক নাগবে, জলবে। কিন্তুক সহ্য করির পারলে ঠিক হয়-আ যাবে। ফম রাখিস ফের। লে। এইডা হইল, চিল হাগা লতা। এমার ফল গুলান গুল মরিচের লাখান। যদি বলদ, না হয় ষাঁড়ের বিচা ফুলিয়া যায় তা হইলে এই ফল পিষিয়া লাগালে ভাল্‌ হয়-আ যায়। যদি কার-অ দেহা কাটে যায় কিংবা ঘা হয় তা হলে চিলহাগার মুল পিষিয়া তুরির তেলৎ মিলাই দিয়া নাগালে ঘা সারি যাবে। লে বাবু। আজি

আর নাহে। ঘরৎ চল্। ভেইল দিন বাদ আইছিস। ধুনি খায়-আ যাবো।

তুজনে মিলে এলাম জোতদার বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে ইঁটের প্রাচীর মাঝখানে কাঠের দরজা। বাড়ির পাশেই বিশাল বাঁশবাগান। বাহির বাড়িতে টিনের কাছারী ঘর। বাড়ির ভেতর ঢুকতে গিয়েই শোনা গেল গরুর হাম্বারব। প্রাচীরের কিছু কিছু ইঁট খসে পড়েছে।

—কাকা। প্রাচীরের ইঁটগুলান খসবা ধরিছে। ঠিক করেন না ক্যানে?

গভীর তুঃখে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামিনীবাবু বলে উঠলেন, কি হবে ঠিক করিয়া বাবু? চ্যাংগা নদীর কাইও দেখিস নাই? চ্যাংগা হামার গ্রাম ভাঙবা ধরিছে। প্রতিবছর অয় হামার জমি খাছে। এইডা হইল হামার সমাজের, হামার জীবনের ভাঙন্। ঐ নদীর নাখান দিন আসেছে। ঐ দিনের দেও হামার সব ভাঙিবে। ইঁট খসে যেন সি কাথাই মোক্ কয়হা যাছে।

—কি আং সাং কবার ধরছেন বাবুক নিয়া! আইস্-অ ক্যান্ এইঠে না। গাই ছ্যাকবা হবে। বলে ওঠেন জোতদার-গৃহিনী রূপসী সর্বেশ্বরী দেবী।

—কি ঘরৎ ধুনি নাই? বাবু, বইস গে মোর ঘর। কম্‌লা, কম্‌লা, তোর বাবুদাক ঘরৎ নিয়া গিয়া গপ্ সপ্ করনা ক্যান্।

কমলা। ষোড়শী তন্বী মেয়ে কমলা, আমার আদরের বোন কমলা এসে হাত ধরল। ঘরে গিয়ে বসলাম।

আধ ঘণ্টা পর এক জামবাটি ভর্তি গরম তুধ নিয়ে হাজির হলেন কামিনী কাকা।

—ধুনি বোধ হয় আর খিল্‌বা পারমনি ভাতিজা। গাই বেচাইতে বেচাইতে মাত্র দশটাৎ আসেয়া ঠেকিছে। গলায় তাঁর আক্ষেপের বৃষ্টি।

তুধ খেয়ে বিদায় নিলাম।

পথে নামতেই দেখি হেমন্তের রোদ পিঠটান দিচ্ছে। বিচিত্র বর্ণের পাখিরা বিচিত্র ভাষায় গান গাইছে। সেই গানের সঙ্গে এসে মিশেছে রাখালের কণ্ঠের ভাওয়াইয়া গান। "বাপই চ্যাংরারে, গাছৎ উঠিয়া মোক একনা জলপই পাড়েয়া দে"...। মাঠে মাঠে ফলন্ত সোনার ধানগাছ বাতাসে তুলছে... নাচছে...পেট ভরে ঘাস খেয়ে গরুরাও যেন ধান গাছের মতই হেলে তুলে মনের আনন্দে ঘরে ফিরছে। হায় রূপসী উত্তর বাংলা, এখনো কয়জনে জানে তোর মাঠে প্রান্তরে ফুটে থাকা বুনো ফুলের নাম? বুনো গাছ, লতার নাম?

এক বৎসর আঠারখাই থেকে বিধান নগরে ফিরে আবার গিয়েছি সেই মাসান দেবতার থানে। জানি, বনপাগল, প্রকৃতিপাগল কামিনী কাকাকে এখানেই পাব। ঠিক তাই। গাছগাছরার ভেতর বসে নিবিষ্ট মনে দেখছেন শুঁই পোকা।

—কাকা!

—কায়? অঃ। তুই হে। ভেল দিন বাদ আইছিস বাবু। ভালছিল তো?

—হ্যাঁ কাকা। ভালইছু। সামনে মোর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা।

চুপ করে আছেন কামিনী বাবু। কি যেন ভাবছেন। মাথা নত।

—কি হইছে কাকা?

—বাবু, বাবুরে, কমলা মোর মরিয়া গেইছে তিনদিন হইল। মোর ওকালি অসুধ কামৎ দেয়নি। ডাক্তার-অ দেখির পার-অ নাই। মোর টাকা থাকিছে ও বিনা অসুখে কমলা মরিয়া গেছিল। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, কাকা, এই দুনিয়ার নিয়ম হইল যার যাবার অয় যাবেই। অক ধরে রাখা যায়না। যাবেও নি বোধ হয় কোনো-অ দিন-আ।

—ঠিকে কাথা। আজিলে মুই মনৎ শক্তি পাহু। শান্তি পাহু। এলহা একটা কাথা কহবু—মুই-অ বোধ হয় আর বাঁচিমুনি।

—ক্যানে?

—তুইতো জানিস-ও। মুই ধুনি ছাড়া আর কোনয় চিহ্নগেনা। আর বোধ হয় ধুনি খাবার পারমনি। গাই মাত্র পাঁচটাৎ আসি ঠেকিছে।

—কিনে লওনা ক্যানে?

—কোনঠে পাম-অ টাকা?

—ক্যানে জমি বেচায়া।

—জমিও প্রায় শেষ। পঁচিশ বিঘা মাত্রয়ছে।

ছোট বেলা থেকে এবাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ চেকে আসছি। কামিনী কাকা আর বাবা দুজনে বন্ধু। যে কোন উৎসবে অনুষ্ঠানে দু'পরিবারের যাওয়া আসা চলে। এ বাড়ির প্রাচুর্য চিরদিন কিংবদন্তীর পর্যায়ের। গোলা ভর্তি ধান। গোয়ালে গরু-ছাগলের পাল। সে ছিল একদিন, মণকে মণ দুধ হত। কারো বিয়ে অন্নপ্রাশনে এ বাড়ির দুধ না হলে চলত না। এ পরিবারের প্রত্যেকে দুধে-ভাতে মানুষ। অথচ আজ

দুধ বিনে মারা যাবে জোতদার কামিনী সিংহ! ভাবতেও কষ্ট লাগে।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বলে ফেললাম, আচ্ছা কাকা, এই উরি পোকা দিয়া কি কোনো অসুখ না হয়?

নিজেকে ফিরে পেলেন যেন কামিনীবাবু। আগ্রহে বলে উঠলেন, হয়। হয়। ক্যানে হবেনি। তবে কাকু, এইডা হইল হামার দেশী অসুধ। মানে তোমহারালা যাক কহেন টোট্‌কা।

—যা হোক। কওনা ক্যানে।

—কেলার ভিতর এই উরি পোকা ঢুকাই দিয়া ভগমানের নাম তিনবার কয়হা যদি কোনো কুকুর-কাটা কিংবা বিড়ালের কামড় দেওয়া মানসিক খিলাল যায় তা হলে পেটৎ বাচ্চা হবার ভয় রহেনা। বুঝলো?

আমি ঘাড় কাৎ করে জানালাম। হাঁ।

—চল এলহা ঘর্।

বাড়ি এসে দেখি প্রাচীরের দেয়াল ভেঙে গেছে অনেক দিকে। টিনের দোতালার কাঠের বেড়াও অনেক দিকে ভেঙে গেছে ঝড়ে। কয়েকটা টিন নেই চালায়। কাছারিঘরটা পোয়ালে ছাওয়া। সত্যি সত্যি যেন চ্যাংগা নদীর গ্রাসে পড়েছে এবাড়ি।

বাড়িতে গত বছরও দেখে গেছি লোহার খাঁচায় ময়না ছিল। এবারে ফাঁকা। গোয়ালে ঢুকে দেখি সত্যি চার-পাঁচটে গাই।

কাকি ছুটে এসে বললেন, কি দেখেছিস বাবু! রবেনি। এবাড়িৎ কোনো কিছুই রবেনি। ডাকু ঢুকিছে ঘরৎ। যা বললেন তাতে বোঝা গেল—শ্যাম, বড় ভুভাই চুরি করে ধান, পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে যায়। স্কুলের লেখা-পড়ার বদলে সব কিছু বেচে সে টাকা দিয়ে মদ খায়। ফুর্তি করে।

কমলার অভাব বড় বেশী বুকে বাজছে। গতবারেও কমলা ছিল। ওর সঙ্গে কত হাসি ঠাট্টা করেছি। ওকে বলেছিলাম, আমি ওকে কালো কুচকুচে সাঁওতাল বর এনে দেব। দুজনে মিলে মাঠে গরু চরাবে। ও ভীষণ খেপে গিয়ে আমার বুকে ঘুসি মেরেছিল। হায়! মাত্র এক বছরের মধ্যে কমলা কোথায় চলে গেল! অথচ আশ্চর্য, কাকি কমলার কথা আদৌ বলছেন না বা বুঝতে দিচ্ছেন না। শেষে এল দুধ। পরিমাণে কম। পাত্রটি এনামেলের বাটি।

কাকি চুপি চুপি বললেন, বাবু, তোর কাকাক্ বোধ হয় আর বাঁচাবা পারমুনি।

—কাকি, কাসার থুরি কি হইল?

—বেচায়া খাইছু।

দিন খারাপ যাচ্ছে বোঝা গেল। বাইরে এসে দেখি, বাঁশবাগানও অর্ধেক হয়ে এসেছে। চারদিকে আনারসের বাগান দেখা যাচ্ছে। আনারস বাগান বাড়াবার জন্য ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ চলছে।

—যাছিস্ বাবু?

—হ্যাঁ কাকা।

—ফের যে না আসবো—কি দেখবো জানিস? দেখবো বাঁশবাগান নাই। হামার দোতালার কাঠ নাই। টিন নাই। চ্যাংগা নদীর পারৎ দেবতা থানের জঙ্গল নাই। সব-এ বিধাননগর বন্দর আর শিলগুড়ির বাবুরা কিনিয়' লিয়া আনারস বাগান বেনাইছে। সে বাগানের টং ঘর হইছে জোতদার কামিনী সিংহের দোতালার কাঠ আর টিন দিয়া।

চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করছে চ্যাংগার শুষ্ক বালির মতই। মনে কি এল জানিনে। এলাম আবার মাসানদেবতার থানে।

কাঠবেড়ালি বটগাছের ডাল ধরে ঝুলে নেমে এসেছে দেবতার থানে। বন মোরগ ডেকে উঠছে, কোক্রো কো—। নদীর ঝির ঝির শব্দ ভেসে আসছে। ঝিঁঝির করুণ কান্না আমাকে উদাস করে দিচ্ছে। দুপুরের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে করুণ সুরে ডেকে উঠছে ঘুঘু। যেন একটা বিদায়ের মন্ত্র বলে মনে হচ্ছে। সত্যি সত্যি কী এই সুন্দর প্রকৃতি আর থাকবে না? এই বট, শিমূল, মাদার, ময়না, কাঁটা শেওড়া, ডুমুর, পলাশ, লোধা গাছ মানুষের নির্মম কুঠারের ঘায়ে ঝরে পড়বে চিরদিনের মত! পাখিরা চলে যাবে? চলে যাবে চিরপরিচিত কাঠবেড়ালি, বন বেড়াল, শজারু, বন মোরগ, খরগোশের দল? এই মাসান দেবতার থানে আর কেউ পূজা দিতে আসবে না? এখানে গজিয়ে উঠবে আনারসের বাগান! হে মাসান দেবতা তা যেন না হয়। না হয়। চোখে জল এসে গেল। হঠাৎ হাল্কা মেঘ থেকে নেমে এল বৃষ্টি। একি বৃষ্টি! না মাসানদেবতার দ্রবময় বাণী ওঁর চোখের জল।

দু বৎসর পর। বাড়ি ফিরে ফের এলাম মেজমানগছ। চ্যাংগা নদীর পারে এসে সত্যি সত্যি আমি একী দেখছি! হঠাৎই আমার হু-হু করে কান্না

পেয়ে গেল। সত্যিই তো আমার চিরপরিচিত মাসানদেবতার থান, আমার প্রিয় সে বন জঙ্গল কোথায় গেল? সমস্তই ধূ-ধূ করছে। শুধু আনারসের লাল-সবুজ গাছ চারিদিকে ছেয়ে আছে। কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে ফেলেছে আমার এক পয়সার গ্রাম। এগিয়ে গেলাম সামনে। মন বলছে, এই শেষ নয়। আরো করুণ কিছু আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কোথায় জোতদার কামিনী সিংহের বাড়ি! কোথায় প্রাচীর দেওয়া কাঠের দোতালা বাড়ি? সব যেন খা-খা করছে। শুধু মাত্র দুটি পোয়ালে ছাওয়া ঘর দেখা যাচ্ছে।

তবুও এগিয়ে গেলাম। আনারসবাগানের সবুজ সমুদ্রে যেন খড় কুটোর মত ভাসমান এই বাড়ি। জোতদার বাড়ি।

ভাঙা বাঁশের দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি বাঁশের মাচায় কে শুয়ে।

পায়ের শব্দে ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল, কায়?

কান্নায় বুক ভেঙে যাচ্ছে। বুঝেছি, এটা কামিনীকাকার কণ্ঠস্বর।

কাঁদতে কাঁদতে বললাম, কাকা, কাকা, কাকা তোর-এ কাথা ঠিক। কেমন করি এনং হইল?

—আর কবার পারিরেনি বাবু। মুই কহচু।

তাকিয়ে দেখি ছিন্ন মলিন বসন-পরা পর্বেশ্বরী কাকিমা। আগেকার রূপ লাবণ্য হারিয়ে রুগ্ন দেহে অন্য ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি যা বললেন, তাতে বোঝা গেল—শ্যাম, যদু জমি জমা সব বেচে লেখা পড়া না করে ফুর্তির পর ফুর্তি চালিয়ে গেছে। শেষে একদিন একে একে সব শেষ হয়ে এলে ওরা টাকার জন্য ধরল ডাকাতি। ডাকাতি করতে গিয়ে একদিন পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল।

কামিনীকাকার এখন হয়েছে পেটে ক্যানসার। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার বাবু বলেছেন, বেশী দিন আর বাঁচবে না।

একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। পাশে পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখি চ্যাংগা নদীও ভাঙতে ভাঙতে চলে এসেছে ভিটের কাছাকাছি। মানসিক উত্তেজনায় এতক্ষণ খেয়াল করিনি এটা। এবারে যেন মন বলছে, প্রকৃতির মৃত্যু…চ্যাংগার গ্রাস…এমনি করে উত্তরের এক পয়সার গ্রাম নিঃশেষ করে দিল। এই যে খেলা, এ খেলা বুঝি অনন্ত অনাদির খেলা। এই খেলার মধ্য দিয়েই সুয়োরাণী গ্রাম, একদিনের আদরিণী গ্রাম আজ যেন 'মূল্যহীন এক পয়সার মতই অর্থহীন দুয়োরাণী।…

—কি ভাবছিস বাবু?

—না কাকা। কোনো না হয়।

—বাবু, মুই বুঝুরে। হামরালা পুরানা দিনের মানসি। চ্যাংগা নদীর নয়া চল, নয়া জল হামরালাক আর মানায়গে না। হামা চলিয়া যাম-অ। তোমহা রয়হা যাবেন। একটাই তোমহারটে অনুরোধ, তুই শুধু আনারস বাগানের মালিক অনিল বাবুক কাহিস, অয় যেন্ হামার মাসানদেবতার থানডা ফের গড়-এ দেয়। আর অর পোড়ৎ লাগায়া দেয় নয়া করি একনা বটগাছ। মুই জানো। মুই বিশ্বাস করো, ঐ নয়া মাসানদেবতার থানের ভিতর দিয়া ফের হামরা উত্তরবঙ্গের বোকা, সাদা, সিধা মানসি গুলান জন্ম-অ লিম-অ। হামার আশা-আকাইঙ্ক্ষার মরণ নাই। মরণ নাই। ওফ্ঃ! যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠেন কামিনীকাকা।

—কাকা, কাকা, খুবে-এ কি ব্যথা?

—বাবু, এই ব্যথাডা বড়-অ না হয়। বড় ব্যথা মোর, বন জঙ্গল হারাইয়া মানসি বাঁচিবে কেমন করি সিডাই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেঁকে বলে ওঠেন, কোন্ঠে গেলোগে? বাবুক লাল চাহা আনি দে। ধুনি নাইতো কি হইছে? নয়া জমানার চাহা—চিনি নাই—নুন-চাহা খা বাবু—নুন—

থেমে যায় কণ্ঠস্বর। ধীরে ধীরে ঘুম নেমে আসে কামিনীকাকার চোখে। অসুখের পর থেকে নাকি এমনি হয়েছে আজকাল। বেশী কথা বললে ক্লান্তিতে ঘুম পেয়ে যায়।

পর্বেশ্বরী কাকিমা সত্যি সত্যি কাঁচের গ্লাসে করে নিয়ে আসেন নুন-চা।

ভারত-সোভিয়েত উৎসব

ঠিক এ মুহূর্তে সারা মহানগরী সোভিয়েত-উৎসবে আলোড়িত। ঠিক এই মুহূর্তেই সোভিয়েত ইউনিয়নেও চলেছে ভারত উৎসব। দুই দেশের সার্বিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধুতায় এমন উদ্দীপ্ত প্রকাশ অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক। উৎসবের প্রাক্কালেই কলকাতায় বিশিষ্ট সোভিয়েত কবিরা এসেছিলেন তাঁদের কবিতা শোনাতে। আগামী সংখ্যায় তাঁদের নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ এ উপলক্ষে আমরা ছাপাচ্ছি।

অরুণ মিত্রের অকাদেমি পুরস্কার

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় এবং প্রবীণতম কবি অরুণ মিত্র এবার সাহিত্য-অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। তিনি আমাদের উপদেশকমণ্ডলীর এক বিশিষ্ট সদস্য। বহু-বিলম্বিত হলেও আমাদের সময়ের অগ্রগণ্য কবির এই সম্মানে আমরাও সম্মানিত।

ধরণী গোস্বামী

PARICHAYA JANUARY 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265

৭০তম মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত

কি করে বিপ্লবের জয় হয়েছিল

ইসাক মিণ্টস্

অনুবাদক: জ্যোতি দাশগুপ্ত

দাম: ছয় টাকা

আদর্শগত সংগ্রাম ও সাহিত্য

ইউ এস সোভিয়েতবিদদের লেখা
সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

এলবার্ট বেলিয়ায়েভ

অনুবাদক: সৌরি ঘটক

দাম: কুড়ি টাকা
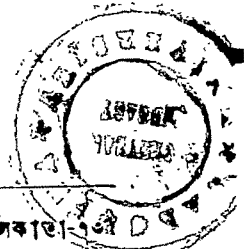
মনীষা গ্রন্থালয় / ৪-৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

সম্পাদনা দপ্তর: ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর: ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

দাম—তিন টাকা
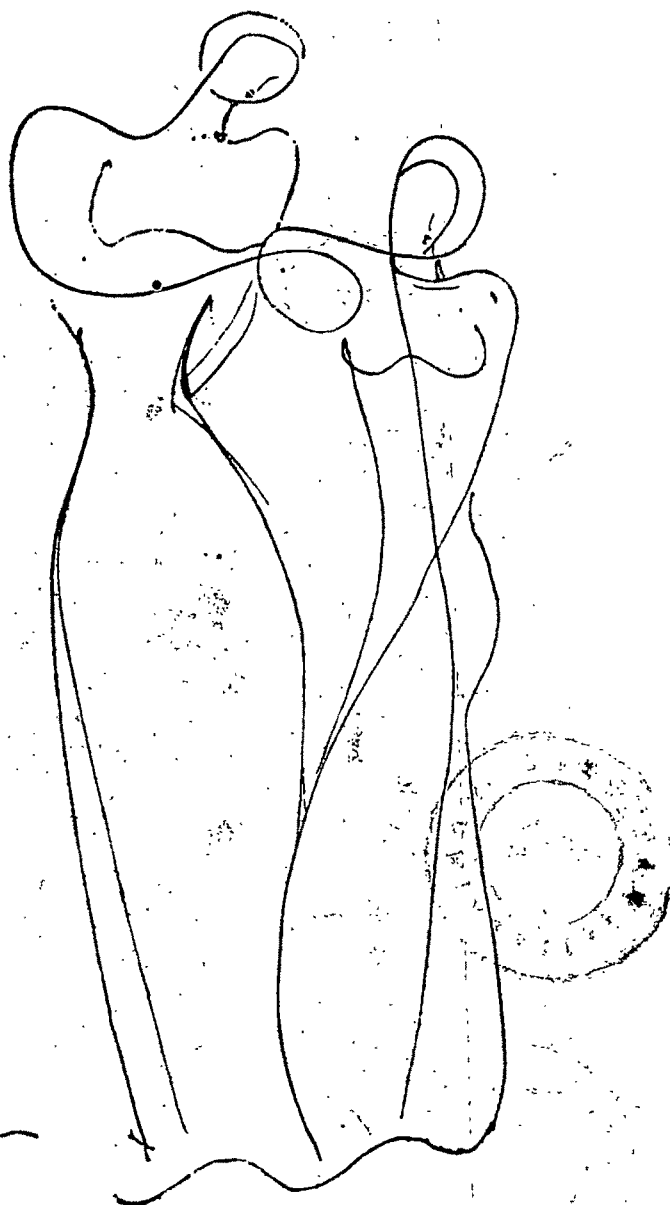
পরিচয়

রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা, সঙ্গীত ও নৃত্য সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের চিত্তাকর্ষক বিবরণ ও সরস স্মৃতিকথাপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি-বিধৃত এই গ্রন্থগুলি রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের অবশ্য-পাঠ্য। সুন্দর প্রচ্ছদে, চিত্রে ও রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিচিত্রে অলংকৃত।

অজিতকুমার চক্রবর্তী ॥ কাব্যপরিক্রমা ১০.০০, রবীন্দ্রনাথ ৬.০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানী চন্দ ॥ ঘরোয়া ১৫.০০
জোড়াসাঁকোর ধারে ১৮.০০
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসংগম ৮.০০
উইলিয়াম পিয়ারসন ॥ শান্তিনিকেতন-স্মৃতি ৮.০০
চিন্মোহন সেহানবীশ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ ৩৫.০০
প্রতিমা দেবী ॥ নির্বাণ ৬.০০
প্রমথনাথ বিশী ॥ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ২৮.০০
মীরা দেবী ॥ স্মৃতিকথা ২২.০০
শ্রীরানী চন্দ ॥ আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ ১৬.০০, গুরুদেব ১৬.০০,
সব হতে আপন ৩০.০০
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ শান্তিনিকেতনের একযুগ ২৪.০০
শ্রীশঙ্খ ঘোষ ॥ নির্মাণ আর সৃষ্টি ২৮.০০
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ॥ রবীন্দ্রসংগীত ৪৫.০০
শ্রীশিবানী রায় ॥ রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য অভিঘাত ১৫.০০
শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী ॥ রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায় ১৫.০০
Krishna Kripalani : Rabindranath Tagore :
A Biography 65.00
L. K. Elmhirst : Poet and Plowman 25.00, Rabindranath Tagore : On The Edges of Time 30.00, Probodh chandra Sen ; India's National Anthem 2.00

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ

* সারা দেশে আইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক।

* জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র কেন প্রয়োজন

বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি, ভোটাধিকার অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, পাসপোর্ট সংগ্রহ, বীমা পলিসি পাওয়া, পেনসনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীর নিরসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

* শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল

কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃমঙ্গল সংক্রান্ত পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্ভুল জনসংখ্যা, তার গতিপ্রকৃতি ও বিভিন্ন নীতির যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পঞ্জীকরণ একান্ত আবশ্যক।

* কাকে সংবাদ পৌঁছে দেবেন

শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা ক্যান্টনমেন্টে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর-এর কাছে জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

* কতদিনের মধ্যে

শহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও মৃত্যুর তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দদিন জন্ম মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে সংবাদ পৌঁছানো আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি পেশ করলে পঞ্জীকরণের প্রমাণপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরিচয়

৫৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ ফাল্গুন ১৩৯৪

প্রবন্ধ

•

ক্রোড়পত্র

গল্প

কবিতা

স্মৃতিকথা

নাট্য প্রসঙ্গ

পুস্তক আলোচনা

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা ১৭ থেকে প্রকাশিত

জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

নীহাররঞ্জন রায়

(১৯৮০-র ১২ আগষ্ট উইলিয়াম কেরী স্টাডি অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার-এর উদ্যোগে জাতীয় সংহতির উপর অনুষ্ঠিত একটি সভায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সেই বক্তব্য টেপ্ করে রাখা হয়। শ্রীরঞ্জিত রায় চৌধুরীর সৌজন্যে সেটির অনুলিখিত রূপ আমরা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করছি।—সম্পাদক পরিচয়)

শ্রদ্ধেয় সভামুখ্য মহোদয় ও সর্বান সমাগতান্। আজকের যা বিষয়—ন্যাশন্যাল ইনট্রেগেশান এ্যাণ্ড সেপারেটিজম—জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। এ নিয়ে হঠাৎ যেন আজ আমরা খুব সজাগ হয়ে উঠেছি!

সজাগ হওয়ার প্রধান কারণ—সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে একটা অস্বাভাবিক রকমের গোলমাল শুরু হয়েছে। তার মধ্যে আসামও আছে ত্রিপুরাও আছে। যতগুলো রাজ্য আছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে, অরুণাচল, মিজোরাম, আসাম ত্রিপুরা ইত্যাদি প্রত্যেকের সমস্যা কিন্তু এক নয়।

প্রত্যেকের সমস্যা আলাদা আলাদা।

মিজোরামের সমস্যা, নাগাল্যাণ্ডের সমস্যা নয়। মণিপুরের সমস্যা, ত্রিপুরার সমস্যা নয়।

আমি, একান্ত সাম্প্রতিক মুহূর্তের যে সমস্যা, সেগুলোর আলোচনা করবোনা। আমাকে উদ্বোধন করতে বলা হয়েছে, ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে।

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস—বিশেষ করে আমরা যাদের 'ট্রাইব' বলতে অভ্যস্ত হয়েছি সে কথাটা আমাদের নয়। ট্রাইব কন্‌সেপ্টটাও আমাদের নয়। বর্তমানকালের সোসিওলজিষ্ট, এ্যান্থ্রোপলজিষ্টরা কথাটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ সমাজতত্ত্বে এবং নেতৃত্বে আমরা যে সমস্ত কনসেপ্ট ব্যবহার করি সে সমস্তই বিদেশী কন্‌সেপ্ট। এবং এ নিয়ে আমার আপত্তি বহুদিনের।

তার মধ্যে আমি এখন আপাতত যাচ্ছিনা। আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত দিলীপ চক্রবর্তী মশাই অনেকগুলো প্রশ্ন তুলেছেন, যেগুলো আলোচ্য বিষয় আমাদের।

প্রশ্নগুলোর আর একটু গোড়ায় যাওয়া দরকার।

প্রশ্নগুলো হচ্ছে, যা সাম্প্রতিক রোগ তা কি করে এলো? কোথা থেকে এলো? আর একটু গভীরে বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। এবং যেহেতু এটা সেমিনার, আমি কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা করছি না—আমি যথাসম্ভব যাকে বলে এ্যাকাডেমিক, হওয়ার চেষ্টা করবো।

অর্থাৎ ইতিহাসকে খুঁজবো, ইতিহাস আমাদের কোন সন্ধান দিতে পারে কিনা এই সমস্যার—সেইটে একটু আলোচনা করবো। খুব বিশদ বিবরণের মধ্যেও যাব না।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁরা একটু তলিয়ে দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে ইতিহাসে দুটো শক্তি সক্রিয়। একটি হলো কেন্দ্রাতীত একটি হচ্ছে কেন্দ্রমুখ। ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স ও সেন্ট্রিফুগ্যাল ফোর্স। এই দুটো শক্তিই অত্যন্ত ক্রিয়াশীল।

যখন ভারতবর্ষের কেন্দ্রে বা কোথাও কোন শক্তিমান রাজশক্তির উদ্ভব ঘটেছে—যখন ভারতবর্ষের যে ঐক্য তার ওপর জোর পড়েছে, সসাগরা ভারতবর্ষের যতটা সম্ভব তাকে অধিকার করে নিয়ে বড় সাম্রাজ্য গড়া হয়েছে, তখন আমরা যাকে বলি সেন্ট্রিফুগ্যাল ফোর্স অর্থাৎ সমস্ত দেশটাকে একত্র করার দিকে একটা প্রবণতা দেখা গেছে।

আর একটা ফোর্স প্রায় সমান শক্তিধর। সেটা হচ্ছে; যখন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়েছে তখন যাকে আমরা আঞ্চলিক শক্তি, রিজিওন্যাল ক্যারেক্টর সেইগুলো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজ্য বা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেছে।

একেবারে সেই—আমরা যতদিন থেকে ইতিহাসটা জানি, অর্থাৎ ধরা যাক খৃষ্টপূর্ব ছয় শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে একেবারে ইংরেজ আমল পর্যন্ত।

এতে ভারতবর্ষের কিছু ক্ষতি হয়নি।

আঞ্চলিক টান যতটা ছিল সামগ্রিক ভারতবর্ষের টানও ততটা ছিল। এবং এটা শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়।

এটা সত্যিকথা সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একটা সময় সরকারী যে ভাষা উচ্চকোটি লোকেদের যে ভাষা সেটা সংস্কৃত ছিল। কিন্তু প্রত্যেক অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষাও ছিল। এবং এমন যে অশোক, যাঁর সর্বব্যাপী সাম্রাজ্য, তিনিও

যে ভাষায় ('গিরনার' গুজরাট অঞ্চলের জন্য) লিখেছেন সেই ভাষায় কিন্তু কলিঙ্গ অঞ্চলের লিপি নয়। তুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। তুটোই প্রাকৃত ভাষা। তুটোর প্রকৃতি আলাদা। তেমনি স্ক্রীপ্‌টের বেলায়ও আছে।

যতদিন পর্যন্ত সর্বভারত জোড়া একটা স্বপ্ন ছিল ততদিন পর্যন্ত লিপি একটা। নাগরী লিপি আমাদের উত্তর ভারতে। দক্ষিণ ভারতে অন্যলিপি। অন্ততঃ উত্তর ভারতে একটাই লিপি ছিল। আমরা তাকে ব্রাহ্মীলিপি বলতাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কিন্তু আর একটা—তাকে খরোষ্টি লিপি বলতাম। কিন্তু খ্রিষ্টীয় নবম দশম শতক থেকে শুরু করে প্রত্যেক জায়গায় আঞ্চলিক লিপি এক একটা গড়ে ওঠে। শুধু আঞ্চলিক লিপি নয়, আঞ্চলিক ভাষাও। এমন কি সংস্কৃত, প্রাকৃত অপভ্রংশ ছেড়ে একেবারে আঞ্চলিক ভাষা।

•

আমাদের যে ভাষা যে সংস্কৃতি যে লিপি—আমরা যাকে বলছি বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া, এই সমস্তরই সূচনা কিন্তু খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

এবং তারপর থেকে এই ভাষাগুলো সমানে চলে আসছে।

তেমনি আপনারা সবাই জানেন কিন্তু আমরা কখনো লক্ষ্য করে দেখিনি, আমাদের বিয়ে বলুন, শ্রাদ্ধ বলুন যা কিছু আমাদের অনুষ্ঠান আছে হিন্দুদের মধ্যে দেখবেন সমস্ত ভারতজোড়া একটাই আচার আছে, একটাই মন্ত্র আছে। যেটাকে আমরা বলি শাস্ত্রাচার। সেটা হচ্ছে সর্বভারতীয়, এক। কিন্তু আবার একটা জিনিষ আছে সমান তার শক্তি, সমানভাবে স্বীকৃত। সেটা হচ্ছে দেশাচার লোকাচার।

এই যে আঞ্চলিক আচারগুলোকে আমরা বলি লোকাচার দেশাচার, এই যে জিনিষটা, এটা কিন্তু পুরোপুরি আমাদের সমস্ত ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান।

তেমনি যদি দক্ষিণ ভারতে দেখেন, সেখানেও কিন্তু ভাষা সাহিত্য নিয়ে আঞ্চলিক সত্তা আছে।

আবার যখন দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাপটের কথাটা ওঠে তখন কিন্তু সমগ্র দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কার ও সংস্কৃতি এক হয়ে যায়। উত্তর ভারতেও তাই হয়।

এইতো ভারতবর্ষের ইতিহাসের চরিত্র অথবা প্রকৃতি। এ নিয়ে কিন্তু

আমাদের কোন একটা বিরোধ বাধেনি। সমানেই চলে আসছে। বিরোধটা বাধছে। অর্থাৎ—আমাদের একটা টেরিটোরিয়াল ইউনিটি ছিল। আমরা জানতুম একেবারে সেই কালিদাসের আমল থেকে, পুরাণের আমল থেকেই জানি যে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অথবা হিন্দুকুশ থেকে আরম্ভ করে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত একটাই ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটি।

এটা মোটামুটি স্বীকৃত, বহুকাল থেকেই স্বীকৃত।

কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটি এবং টেরিটোরিয়্যাল ইউনিটি এক নয়। যেই মুহূর্তে টেরিটোরিয়্যাল ইউনিটির কথা আসছে সেই মুহূর্তেই কিন্তু রাষ্ট্র-শক্তির কথা আসছে। জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির কোন কথা আসছে না।

তখন সেই জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটির সঙ্গে সংস্কার সংস্কৃতির সম্পর্ক। জীবন আচরণের সম্পর্ক। কিন্তু টেরিটোরিয়্যাল ইউনিটির সঙ্গে একমাত্র রাষ্ট্র এবং রাজনীতির সম্পর্ক।

এই টেরিটোরিয়াল ইউনিটির কথাটা কখন এলো? আগেকার দিনে রাষ্ট্রের, রাজ্যের মধ্যে সীমানা নিয়ে এত লড়াই ছিল না···অন্তত ভারতবর্ষে। উনিশশতকে আমরা অষ্টাদশ ও উনিশশতকীয় একটি পাশ্চাত্য ধারণা গ্রহণ করলাম। সেটির নাম হচ্ছে—ন্যাশন্যালিজম। এবং ন্যাশন্যালিজমের সঙ্গে যে জিনিষটাকে গ্রহণ করলাম—সেটা হচ্ছে, আইডিয়া অব এ নেশান ষ্টেট।

এই আইডিয়াটি এলো, নেশান ষ্টেটের, এর সঙ্গে ভারতবর্ষের যে চিরাচরিত ধ্যানধারণা, তাকে মেলানো যায় না।

আজকে যত সংকট আপনারা দেখছেন—যা কিছু দিলীপ উল্লেখ করেছেন—সে সমস্ত হচ্ছে, যে জিনিস দুটোকে মেলানো যায় না সে দুটোর মধ্যে সংঘাত লেগেছে। নেশান স্টেট্ আইডিয়ার সঙ্গে আমাদের সাধারণ মানুষের, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের যে ধ্যানধারণা তার সংঘাত।

নেশান স্টেট জিনিষটা কী?

এখন নেশান, ন্যাশন্যালিজম, নেশানহুড্, এগুলোর নানা রকম সংজ্ঞা আছে। স্ট্যালিন সাহেবও একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞার মধ্যে না গিয়ে—যেগুলো লোয়েষ্ট কমন ডিনোমিনেটর অর্থাৎ যা দিয়ে নেশান, নেশান ষ্টেট গড়ে ওঠে সেগুলো বলছি।

প্রথম কথাটা হচ্ছে—কমন টেরিটরী। অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটা টেরিটরী

আছে। তার একটা বাধা সীমানা আছে। সেই সীমানার একমাইল দুমাইল এদিক ওদিক হলেই যুদ্ধ বাধে। এ জিনিষ কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ছিল না। এখন সীমানার একমাইল দেড়মাইল···এদিক ওদিক হলে যুদ্ধ বেধে যায়। অর্থাৎ একটা কমন টেরিটরী—এবং আমরা সেই কমন্ টেরিটরীর অধিবাসী। কমন টেরিটরীর নাম হচ্ছে—ভারতবর্ষ। ভারত দ্যাট্ ইজ্ ইণ্ডিয়া—এই হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন-এ লেখা। সেই কনস্টিটিউশন অনুযায়ী আমাদের একটা ন্যাশন্যাল টেরিটরী আছে। তার সীমা বাধা।

কাজেই রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান এবং শেষ দায়িত্ব হচ্ছে এই টেরিটরীর আইডেনটিটি বজায় রাখা।

যদি কোন জায়গায় আধমাইল একমাইলেরও সংশয় দেখা দেয় এবং সেই এলাকা যদি আবার সীমান্ত থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে তাকে শাসন করা।

যদি ন্যাশন্যালিষ্ট এবং নেশান স্টেটের আইডিয়া আমরা গ্রহণ করে থাকি তাহলে তাকে যেমন তেমন করে হোক আমাদের কায়েম রাখতেই হবে। দেয়ার ইজ নো গোইং ব্যাক্। লেট্ আস ফেস ফ্যাক্ট্।

কাজেই এমন যদি হয় সীমান্তে কেউ সেসেশনিস্ট ক্রাই তুলেছে—সেখানে আমার রাষ্ট্রের সৈন্য শক্তি, পুলিশ শক্তি যত কিছু শক্তি আমার আছে তা নিয়োগ করবো।

এবং আমাদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের স্বাধীনতার ইতিহাসে দেখা গেছে সেই আশংকা দেখা দেয়, আমার সীমান্ত আক্রান্ত হয়—যতকিছুই বিভেদ থাকুক···চীন আক্রমণের সময় কি হয়েছিল?

সমস্ত জাত কি এক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়নি সেই পশ্চিম সীমান্ত থেকে পূর্ব সীমান্ত, উত্তরাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র পর্যন্ত?

যে কারণেই হোক—যে ভাবেই হোক, ইতিহাসের চক্রে এই যে কমন টেরিটরী, একে মেনে নিয়েছি।

এটা হচ্ছে নেশানহুডের একেবারে এক নম্বরের কথা। নেশান স্টেটেরও।

তারপরের কথা হচ্ছে—যে কমিউনিটিদের কথা আমরা বলছি—এই কমিউনিটিদের একটা হিস্টোরিক্যালি ইভলভ্ড স্টেবিলিটি আছে। অর্থাৎ ইতিহাসের ভেতর দিয়ে এমন কমিউনিটি যেটার খুব বেশি অদলবদল হয়নি।

পৃথিবীতে এমন অনেক কমিউনিটি আছে যা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

একেবারেই এমন অদলবদল হয়েছে তারা আর প্রাচীন থাকেনি। যেমন ধরুন এখন যাঁরা নিজেদের গ্রীক বলে তারা কিন্তু গ্রীক নয়। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মানুষ আগের দেশেই বাস করছে। ইজিপ্টের যারা এখন নাগরিক তারা কিন্তু আরব দেশীয়। এ্যথনিক্যালি তাঁরা আরব। প্রাচীন মিশরীয়দের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই ইজিপশিয়ানরা, আজকের ইজিপশিয়ানরা কিন্তু হিস্টরিক্যালি ইভলভ্ড স্টেবল কমিউনিটি নয়।

আমরা কিন্তু ভারতবর্ষে হিস্টরিক্যালি ইভলভ্ড ষ্টেব্ল কমিউনিটি।

আমি এসব কথা বলতাম না। এটা তো কলেজের ক্লাশ নয়। কিন্তু আমরা এই পেছনের কথাটা অনেকে জানিনা বলে নানা রকমের সংশয় দেখা দেয়।

•

তৃতীয়তঃ এই যে দুটো বললাম কমন টেরিটরি এবং হিস্টরিক্যালি ইভলভ্ড স্টেবল কমিউনিটি এই দুটো কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের যারা প্রজা অর্থাৎ আমরা যারা নিজেকে ভারতবর্ষীয় বলি, আমরা কিন্তু এদুটো কণ্ডিশান মিট্ করি। পুরোপুরি মিট্ করি। এবং অনেকের চেয়ে বেশি ভালো করে মিট্ করি।

এখন তারপরের কথাটাই হচ্ছে একটা কমিউনিটি অব্ ল্যাঙ্গুয়েজ। ভাষার একটা ঐক্য থাকা দরকার। এখন ধরুন গোড়া থেকেই কিন্তু আমরা এই কণ্ডিশানটা মিট্ করি না।

আজকের যে সোভিয়েত রাশ্যা ন্যাশন্যালিষ্ট। যে করেই হোক, আমরা তার সঙ্গে এক হতে পারি নাও হতে পারি, কিন্তু রাশ্যান ইজ দি ফার্ষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, হুইচ্ মাষ্ট্ বি লার্নট্, বাই এ তাজীক্, বাই এ উজবেক্, বাই এ বালটিক্ ম্যান—যে কেউ। সে সেটাকে চালু করেছে। যার নাম গফুর তার নাম গফুরোভ হতেই হবে। তা না হলে সে সিটিজিয়ান্ হতে পারবে না। আলি যার নাম তাকে আলিকোভ হতেই হবে। এছাড়া উপায় নেই।

রাশিয়ান ইজ দি ফার্ষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাণ্ড ইট্ ইজ এ্যান্ অব্লিগেটারী ল্যাঙ্গুয়েজ। আর যা কিছু ভাষা সমস্তই কিন্তু সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ।

এখন এমন সব ন্যাশনালিটি আছে যারা কিন্তু এই কণ্ডিশানটা সেটিস্ফাই করে না। ইওরোপের নেশান স্টেট্গুলো এই কণ্ডিশান সেটিস্ফাই করে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি ভাষা। কিন্তু দেখুন ভাষার ঐক্য থাকলেই কিন্তু একটা রাষ্ট্র হয় না। যুদ্ধোত্তর জার্মানী তা প্রমাণ করেছে। একই ভাষা

নিয়ে দুটো জার্মানী তো হয়ে গেল। দুটো রাষ্ট্র হয়ে গেল। আর একটা হচ্ছে কমিউনিটি অব্ ইকনমিক্ লাইফ্। দিলীপ যখন বলছিল—তিন চারটে দৃষ্টান্ত সে দিয়েছে যে—ইকনমিক্ লাইফে কমিউনিটি নেই আমাদের। ইকনমিক্ বৈষম্যে ভর্তি আমাদের এই সমাজ। সেখানে এই প্রশ্নটা ওঠে। যে খেতে পায় না নিষ্করুণ দারিদ্র্য যার ভাগ্য তার যে নেশান সম্বন্ধে ধারণা—সে জনগণ গাইবে কি বন্দেমাতরম গাইবে তা নিয়ে প্রাণপাত করতে পারে··· কিন্তু যার লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই খেতে পায় না তার কি কোন ব্যথা আছে বন্দেমাতরম জনগণমন নিয়ে।

কাজেই এই যে কমিউনিটি অব্ ইকনমিক্ লাইফ না থাকলে নেই সব জায়গায় ন্যাশন্যালইজমের সেন্স ব্যাহত হয়। এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গ্রেট্ ব্রিটেনের মতো দেশ। ওয়েলস্‌দের ইকনমিক্ কণ্ডিশান বৃটিশদের চেয়ে খারাপ। তাদের ভাষাটা অন্য। সামাজিক আচার ব্যবহার অন্যতর। প্রায়শ কিন্তু বিবাদ বাধে। এমনকি স্কটিশরা যারা ইংরেজের সমগোত্রীয় বলতে পারেন অর্থনৈতিক দিক থেকে···। সেখানে কিন্তু স্কটিশ স্কচ্ এবং ইংরেজ একই হিস্টোরিক্যালি [illegible]ভড্ স্টেবল কমিউনিটি নয়!

তারা দুটো হিষ্টরির ইভলভড্ ষ্টেবল কমিউনিটি। এক হিষ্ট্রির নয়। সেই জন্যেই কিন্তু ওখানে এই সংঘাতটা রয়ে গেছে।

আর একটা আছে—সেটা হচ্ছে কমিউনিটি অব্ কালচার্। এটা কিন্তু আমরা ভারতবর্ষে মোটামুটি মিট্ করি। সে দক্ষিণ ভারতেই হোক, পূর্ব ভারতেই হোক। বা পশ্চিম ভারতেই হোক। মোটামুটি আমাদের একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য আছে।

শুধু কতগুলো অঞ্চল ছাড়া।

সেখানে কিন্তু সংস্কৃতিটা এক নয়।

কমিউনিটি অব কালচার সেখানে নেই।

নাগাদের কালচার তার সঙ্গে আমার কালচারের কোন বিশেষ মিল নেই। মিজোরামের কালচারের সঙ্গে যদিও বা আছে।

আর আপনারা মনে করেন মনিপুরী কালচারের সঙ্গে আমাদের একটু একটু মিল আছে। যেহেতু তারা বৈষ্ণব, ফোঁটা তিলক কাটে এবং···। আপনারা বোধহয় জানেন না যে তারা চণ্ডিদাস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বৈষ্ণব

গীতিকারদের গান করে কিন্তু তার একটি কথার অর্থও জানে না। সুরগুলো মুখস্থ করেছে, নকল করেছে। এবং আমরা শুধু মনিপুরী এক ধরনের রাসনৃত্যের সঙ্গে পরিচিত। অন্ততঃ দশ রকমের নাচ আছে। রাসনৃত্যই এক বা একতম নৃত্য নয়। যাই হোক, এখন মণিপুরে মণিপুরীরা ছাড়াও আরো দুটি পৃথক ট্রাইব আছে। কিছু-নাগা আছে, কিছু চাকমা আছে। আর মৈথী সম্ভবতঃ ৩৪%, ৩৫% পার্সেণ্ট আছে। কাজেই ওয়ান্ থার্ড মণিপুরী হচ্ছে মৈথী। এই সমস্ত সমস্যার তথ্যগুলো আমাদের ভালোভাবে জানা নেই।

…মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষে কমিউনিটি অব কালচার একটা আছে। এই কণ্ডিশানটা আমরা মিট্ করি। যেটা পারি না, সেটা হচ্ছে কমিউনিটি অব ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। তা নিয়ে তো ঝগড়া ঝাটি দেখছেনই আপনারা। আর কমিউনিটি অব ইকনমিক লাইফ নেই।

আর ট্রাইবাল এরিয়াজ, বিশেষ করে যেগুলো সীমান্ত অঞ্চলের ট্রাইবাল এরিয়াজ তাদের সঙ্গে কমিউনিটি অব কালচার নেই। এবং যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, আমাদের ন্যাশন্যালইজম এর যে গুলো স্ট্রেসেজ এ্যাণ্ড এবং স্ট্রেইট্‌স, যেখানে সংঘাত [illegible] কলহ সে হচ্ছে এই জায়গায়।

কি কি টেনশানস্ আমাদের আছে ?

আমি বহুদিন আগে যেখানে টেনশানের একটা বড় কেন্দ্র সেখানে কতগুলো বক্তৃতা করেছি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালইজমের ওপরে। সে জায়গাটার নাম হচ্ছে আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি। একেবারে যাকে বলে ফেসিং দি কনফ্রন্টিং লায়নেস্ অন্ হার ওন্ ডেন্।

যেখানে আমি বলেছিলাম যে আমাদের টেনশান গুলো কি কি। এই যে ন্যাশন্যালইজমের ওপর যে টেনশানটা রয়েছে। ইন্টিগ্রেসানি অর্থাৎ ন্যাশন্যাল ইন্টিগ্রেসানের যে বাধাগুলো, তার কারণ কি কি।

পাঁচটা কারণ আমি আইডেন্টিফাই করেছিলাম বহুদিন আগে। একারণের একটিও কিন্তু আমরা সলভ্ করতে পারিনি। তেত্রিশ বছরের স্বাধীনতার পরেও পারিনি।

প্রথম কারণটা হচ্ছে যেটা নিয়ে এখনকার সমস্যাটা দাঁড়িয়ে নেই হয়তো, কিন্তু সেই সমস্যাটা আছে। এবং সেটা আমরা এখনো মেটাতে পারিনি।

সেটা হচ্ছে হিন্দু মুসলিম্ টেনশান্। এটা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে লাভ নেই। আগে তো গোড়ার কারণটা বলেনি। প্রথম কারণটাই হচ্ছে—টেনশান্ বিটুইন্ আইডিয়ালস অব অল ইণ্ডিয়া ইউনিটি এ্যাণ্ড ইনটিগ্রিটি অন্ দি ওয়ান্ হ্যাণ্ড এ্যাণ্ড রিজিওন্যাল আইডেন্টিটি অন্ দি আদার।

আমার আঞ্চলিক সত্তা এবং আমার সর্বভারতীয় সত্তার মধ্যে একটা সংঘাত। আমি কি প্রথম বাঙালী তারপর ভারতবাসী? না আমি ভারতবাসী তারপর বাঙালী? এই নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা সংঘাত আছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে হিন্দুমুসলিম টেনশান। তৃতীয় কারণ হচ্ছে টেনশান্ বিকজ অব পলিটিকালাইজেশন অব কাষ্ট। এ্যাণ্ড দ্যাট বিটুইন্ কাষ্ট হিন্দুজ এ্যাণ্ড হরিজনস্। এই সমস্যাটা আমরা মেটাতে পারিনি। আজও পর্যন্ত হরিজনের অবস্থা যা ছিল তাই আছে। খবরের কাগজে আজকাল মিডিয়াটা খুব একটিভ হয়েছে বলে আমরা সেই সব খবরগুলো কাগজে পড়তে পারি। আগে সেগুলো জানতে পারতাম না। কিন্তু যে অত্যাচার অবিচার আগে ছিল এখনো ঠিক তাই আছে। তারপর চতুর্থ টেনশান হচ্ছে দি টেনশান বিটুইন দি মেইনষ্ট্রিম ন্যাশন্যাল সোস্যাল ইকনমি এ্যাণ্ড দি অফ্ বিট্ কারেণ্ট অব ট্রাইবাল সোস্যাল ইকনমি।

একটা কথা আপনারা বরাবর শুনবেন যে এই যে ট্রাইবসগুলোর কথা সে বর্ডারের ট্রাইব হোক বা নাগাল্যাণ্ডের ট্রাইবস্ হোক এই যে ট্রাইবস্ ট্রাইবাল পিপল্ এদেরকে মেইনষ্ট্রিমে আসতে হবে।

অর্থাৎ মেইনষ্ট্রিম্ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ এ্যাণ্ড কালচার এ্যাণ্ড পলিটিক্সের সঙ্গে না আসতে পারলে—যদ্দিন পর্যন্ত না আসতে পারবে তদ্দিন পর্যন্ত টেনশানটা থেকে যাবে।

এখানে অনেক এনথ্রোপলজিষ্ট আছেন। তাঁরা কি বলেন জানেন তো? ওদের অনেক রকম ফ্রেজ্ আছে। একটা বলেন, গ্রেট্ ট্রাডিশান। গ্রেট-ট্রাডিশানটা হচ্ছে আমি আপনি এই আমরা যারা বসে আছি তারাই গ্রেট ট্রাডিশানের ধারক এবং বাহক।

আর বহুসংখ্যক লিট্‌ল ট্রাডিশানস্। এই সব স্মল্ ট্রাডিশানের মধ্যে ট্রাইবাল ট্রাডিশান।

নাগাদের সংস্কৃতি, মিজোরামের সংস্কৃতি বাস্তারের সংস্কৃতি। কোল ভিল

শবরদের সংস্কৃতি ইত্যাদিগুলো হচ্ছে লিট্‌ল। এই সংঘাতটা হচ্ছে গ্রেট্ ট্রাডিশানের সঙ্গে লিট্‌ল ট্রাডিশানের সংঘাত।

আর একটা সংঘাত আছে। সেটা ধরা পড়ে না। আমরা বলি না। কিন্তু আছে। সেই সংঘাতটা খুব প্রবল। মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনৈতিক রূপ নেয়। যেমন ধরুণ চরণ সিং-এর সঙ্গে যিনি পেজেণ্ট। তিনি তো বলেন—আমি পেজেণ্ট, রুরাল এরিয়ার রিপ্রেজেণ্টেটিভ্। আর ধরা যাক জওহরলাল নেহেরু। যিনি আরবান এরিয়ার রিপ্রেজেণ্টেটিভ্।

এই যে আমাদের দেশে যা আমরা প্রত্যেকে জানি আমাদের সমস্ত উনিশশতক জুড়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে গান্ধীজী পর্যন্ত সবাই বলেছি ব্যাক্ টু দি ভিলেজস্। গ্রামের নষ্টালজিয়ায় ভুগেছি। প্রত্যেকেই কিন্তু বসবাস করি শহরে। এবং কেউ আমরা গ্রামে গিয়ে থাকতে চাই না।

এবং এই যেটা বলেছিলাম আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমি ভারতীয় না বাঙালী দুই সত্তার মধ্যে একটা সংঘাত। তেমনি নাগরিক সত্তা এবং গ্রামীণ সত্তার মধ্যেও একটা সংঘাত।

এই সংঘাত মারামারি কাটাকাটিতে দেখা দেয় না। কিন্তু এই সংঘাত সর্বদা সক্রিয় এবং রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।

আমরা এখনো মনস্থির করতে পারিনি লার্জ স্কেল্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশানে যাব কিনা। আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি রেজুলেশান্ পড়ুন, সেই পলিসি রেজেলিউশানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ এবং সাইন্টিফিক রেজেলিউশানের কোন তফাৎ আছে?

অথচ আমরা মুখে বলি কিন্তু যে আমাদের সমস্ত ইকনমিষ্টকেই গ্রামমুখীন করতে হবে। কখনো ভেবে দেখেনি যে মুহূর্তে আমি গ্রামে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে যাবো কিম্বা মডার্ণ গ্যাজেট্‌গুলো নিয়ে যাবো, পরের মুহূর্তে ট্রাকটর যাবে, 'মোয়ার' যাবে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশানের একটা লজিক আছে। সাইন্সের একটা লজিক আছে। সেই লজিকে সে চলে। একবার যদি চাবিটা চালিয়ে দেন রথটা চলতে থাকবে।—জগন্নাথের রথ। সেটা চলবে। তার টেম্পো অত্যন্ত কুইক্।

এখন ভাবা যাক—দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। চোখের সামনে যেগুলো, এখানে ইতিহাসের ছাত্র অমলেন্দু বসে আছেন, জানেন। এই সাঁওতাল পরগণায়… যখন কোল্ বেল্ট্‌টা আবিষ্কৃত হল। তখনতো আমরা রাস্তাঘাট করতে আরম্ভ

করলাম। রাস্তাঘাট যে মুহূর্তে বড় করতে আরম্ভ করলাম এই রাউরকেল্লা, বোকারোর এই যে স্পটগুলো গড়ে উঠলো গত পনেরো কুড়ি বছরের মধ্যে ওখানে সামাজিক জীবনে অর্থাৎ ট্রাইবাল জীবনে কি দারুণ বিপর্যয় এসেছে আমরা কি তার খবর রাখি?

এখন বর্তমান সভ্যতার রথচক্রের ঘড়্‌ঘড়্‌। যে মুহূর্তে আপনি বুল্‌ডজার নিয়ে যাচ্ছেন কনট্রাক্টর যাচ্ছে আগে আগে। কনট্রাক্টরের সঙ্গে ঠিকাদার যাচ্ছে। তারপর ইঞ্জিনিয়াররা সব যাচ্ছে। ক্রমশ বুরোক্রাট্‌সরা যাচ্ছে। কি হচ্ছে সেখানে? আড়কাঠিরা কি করছে? কি ভাবে লেবার সংগ্রহ হচ্ছে? এই যে দোকানদারেরা যাচ্ছে দোকান করছে তারা কোন কন্‌জিউমার গুড্‌স্‌ নিয়ে যাচ্ছে? খবর রাখি আমরা? সেই কন্‌জিউমার গুড্‌স্‌ কোথায় বিক্রী হচ্ছে? এই ট্রাইবাল্‌ এরিয়ার মধ্যে। পাঁচ বছরের মধ্যে এদের জীবনে তো বিপর্যয় এসে যাচ্ছে!

শুধু তো তাই নয় আপনার ল্যাণ্ড সিষ্টেম্‌! একজন মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন জানেন সব। আমরা কি করলাম?

প্র্যাকটিক্যাল যে ল্যাণ্ড সিষ্টেম্‌টা এ্যাডপ্ট্‌ করলাম সেই যে ওয়ারেন হেষ্টিংস থেকে কর্ণওয়ালিস প্রমুখ যে সিস্টেম্‌টা বলে গিয়েছিলেন সেগুলোই তো করছি এখনো!

এই ল্যাণ্ড সিস্টেম্‌ কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত? ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর। যে মুহূর্তে আমি সাঁওতাল পরগণায় গেলাম কি করলাম সেখানে? সেটেলমেণ্ট অপারেশান আরম্ভ হলো। সেটেলমেণ্ট অপারেশান মানেই পাট্টা। পাট্টা মানেই হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা। কোন্‌ জায়গায় সেটা করছেন? যেখানে ল্যাণ্ড ইজ হেল্ড্‌ অন কমিউন্যাল ওনার্সসিপ্‌। সেখানের দাগ কতটুকু আছে কেউ জানে না। তারা শুধু জানে এই এলাকাটা এই অঞ্চলটা সাঁওতালদের, মুণ্ডাদের অথবা শবরদের।

আপনি দুবছরের মধ্যে তাদের ডেস্‌পজেষ্ট করছিলেন ল্যাণ্ড্‌ থেকে! এই যে সমস্ত জিনিষগুলো এগুলোকে আমরা কখনো তলিয়ে ভাবি?

এই যে সমস্ত বিপর্যয়টা এসেছে, তাঁরা কি আপনাকে ধরে চুমু খাবে? তাদের সমস্ত জীবনে আমরা বিপর্যয় এনেছি। আমাদের আইন তাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি।

রাউরকেল্লা, বোকারো এখন ভাবুন, মডার্ন সিভিলাইজেশানকে গ্রহণ করেছেন, না গিয়ে উপায় নেই।

এই সভ্যতা নির্মম নির্মোহ। ইণ্ডাষ্ট্রির কোন আত্মা নেই। এটি একটি জগন্নাথের রথ। দু'শ টন চারশ টন আমাকে ষ্টেল্ মিল্ করতে হবে।... আমাকে উৎপাদন করতে হবে।

বোকারোতে হোক, রুরকেল্লাতেই হোক, রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স নিয়ে অমুক করলাম, তমুক করলাম।

সমস্ত রাউরকেল্লা-বোকারো অঞ্চলে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে—যেখান থেকে আড়কাঠিরা লেবার সংগ্রহ করে এনেছে তাদের চিরাচরিত জীবন থেকে বিচ্যুত করে। আর এই যে দু'তিন হাজার মানুষ সেখানে গিয়ে বাস করছে। বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার থেকে আমার দেশের কেরাণী পর্যন্ত।

প্রথম পাঁচ সাত বছর সেটা নন্ ফ্যামিলি এরিয়া! মনে রাখবেন। সেই নন্ ফ্যামিলি এরিয়ায় দু'তিন হাজার মানুষ কি করে?

তারা স্থানীয় ঐ ট্রাইবাল মেয়েদের নিয়ে ঘর করে। দু'দিন পরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

আপনারাতো কখনো এগুলো দেখেন নি! আমি তখন গিয়ে দেখেছি।

আমি সেই ঐতিহাসিক নই যে লাইব্রেরিতে বই পড়ে এসেছি।

এখন উপায় কী?

একটা কথা বলি। ওভার নাইট সলিউশান নেই, রেডিমেড্ সলিউশান নেই।

যেদিন থেকে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশানের সাইন্টিফিক্ রেজেলুশান নিয়েছি সেদিন উই হ্যাভ্ কমিটেড্ আওয়ার সেল্ভস্।

আজকের নাগাল্যাণ্ড। এ্যালুইন্ সাহেব এসে পরামর্শ দিলেন পণ্ডিতজীকে। এই ট্রাইব্‌গুলোকে মেনটেইন্ করো এ্যাজ মিউজিয়ামস। অর্থাৎ তারা যা আছে, তাদের জীবনকে বিচলিত করো না—বিপর্যস্ত করো না।

আমি গল্প করছি না। আপনাদের একটা ঘটনা বলছি।

ওখানে প্রথম যে কটি মেটারনিটি হাউজ খোলা হয়েছিল—ভীষণ চাইল্ড ডেথ এবং বার্থ বলে এক মাসের বেশি সেগুলো টেকানো গেল না! ভেঙ্গে চুরে দেয়। তখনওতো হেড্ হান্টিং কিছু কিছু চলছে। হেল্থ সেণ্টার করা হলো।

যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দিত। কারণ তাদের যারা ট্রাইবাল মেডিসিনম্যান তাদের পশার যাচ্ছে।

অর্থাৎ যে মুহূর্তে সভ্যতার জিনিষগুলো যাচ্ছে, সেই মুহূর্তেই কিন্তু তাদের জীবনে একটা তছ্‌নছ্‌ আসবে!

অথচ আপনি এ্যাজ্‌ এ সিভিলাইজ্‌ড্‌ ষ্টেট্‌ টুডে: আপনি কি পারেন এই গুলো চলতে দিতে?

কতদিন পারেন?

আজকে আপনারা কি জানেন···মণিপুরে সমস্ত ইকনমিটা বেজড্‌ অন্‌ স্মাগ্‌লিং? মণিপুর-বার্মা রোড দিয়ে স্মাগলিং হচ্ছে। এখন সেই স্মাগলিংই সমস্ত মণিপুরের ইক্‌নমিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে!

আমরা যারা চিৎকার করি, খবরের কাগজে লিখি তারা কখনো এই'সব জিনিষ আলোচনা করি না, জানিও না। অথচ এই স্মাগ্‌লিংটা বন্ধ করার উপায়ও নেই। সমস্ত ইকনমিটার তাহলে ব্রেক্‌ ডাউন্‌ ঘটবে। এবং এই স্মাগলিং-এর ওপর এপারের ভারতীয় ব্যবসায়িরাও বেঁচে আছে।

আজকে ইনসারজেন্সি বজায় রাখা নেউইন গভর্ণমেণ্টের অবলিগেশান। আজকে যদি সে ইনসারজেন্সী বজায় না রাখে এলং দি বর্ডার তাহলে তো আর মিলিটারী গভর্ণমেণ্টের অজুহাতটাই থাকে না। সে তো বলছে ইনসারজেন্সি আছে বলেই—আমাকে আর্মিগুলো রাখতে হবে। কাজেই সে ইনসার্জেন্সি বন্ধ করাতে চায় না। তার যে ইষ্টার্ণ বাউণ্ডারী ওয়েষ্টার্ণ বাউণ্ডারী জুড়ে সে ইনসারজেন্সী পুষছে।

নেউইন আমার বন্ধু, উনু আমার বন্ধু। নেউইনের সঙ্গে আমার এসব কথাবার্তা হয়েছে।

যাই হোক, এখন আমরা কি করতে পারি? এই যে ওভারনাইট সলিউশান খুঁজছি, কি রকম একটা সলিউশান হতে পারে?

যেমন আসামে একটা সলিউশানের কথা হচ্ছে। লেনদেনের। কিম্বা মিজোরামেও একটা কথা হচ্ছে। মণিপুরেও কথা হচ্ছে। হলে, এগুলো দিয়ে আপনি একটা সমাধান, রাষ্ট্রীয় সমাধান করতে পারবেন।

সমাধানটা কিন্তু রাজনৈতিক সমাধান। এবং মজা হচ্ছে—আমাদের যাঁরা

অপজিশানে আছেন (মনে কিছু করবেন না) তাঁরাও বলেন উই মাষ্ট সিক্ এ পলিটিক্যাল সলিউশান। লক্ষ্য করেছেন আপনারা! আরে যাঁরা শাসন করছেন তাঁরাতো বলবেনই। অপজিশানের লোকেরাও বলবে উই মাষ্ট সিক্ পলিটিক্যাল সলিউশান।

তা খুঁজুন আপনারা পলিটিক্যাল সলিউশান। আজকে পলিটিক্যাল সলিউশান খুঁজবেন, একটা সলিউশান হবে। কালকে আর একটা ইরাপশান হবে।

এই যে লিভিং ফ্রম ডে টু ডে ইন পলিটিক্স এই তো আমরা করছি গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে!

সেই জন্যেই যদি একটা লংটার্ম মেজর্স নেওয়া যায়। রাত পোহালেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটা মনে করবেন না। এই সমস্যা আজকের সমস্যা নয়।

রামচন্দ্র তমসা নদী পার হচ্ছেন—ঋষিরা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন পার করে। ঐ যে দণ্ডকারণ্য সেটা এখন যে দণ্ডকারণ্য তখনও দণ্ডকারণ্য। বলছেন—এই সেই জনস্থান। ট্রাইব কথাটা আমরা জানতাম না। ঐ যে জনমজুর খাটে। মানে কখনো জিজ্ঞেস করেছেন নিজেকে? জনমজুর কথাটার অর্থ কী? আমরা আগে এই জনমজুর সংগ্রহ করতাম কোথা থেকে?

সাধারণতঃ যারা লোক সমাজের সীমান্তে আছে, যারা মেইনষ্ট্রিমে মেশেনি। যাঁরা লিটল্ ট্রাডিশানের মানুষ। সেইখান থেকে কিন্তু আমরা জনমজুর সংগ্রহ করতাম। এবং সেই জন্যেই বলতাম জনমজুর। আজকালকার ভাষায় ট্রাইবাল লেবার। আমি ঐ ভাষাটা বুঝিনা। আজকালকার এ্যানথ্রোপলজিষ্টরা সোসিওলজিষ্টরা ঐ সব চালিয়েছেন।

সে যাই হোক, তখন ঋষিরা বলছেন—এই দণ্ডকারণ্য দেখিয়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বলছেন, এই সেই জনস্থান। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস যাঁরা পড়েছেন, নিশ্চয় মনে আছে? এই সেই নির্ঝরিণী প্রস্রবিত। এইখানে তারা বাস করে যারা এখনো আর্যব্রাহ্মণ সভ্যতার মধ্যে আসেনি।

রামায়ণে আছে কথাটা।

সেই দণ্ডকারণ্য এখনো তাই। কোল ভিলেরা এখনো আছে রাজস্থানে।

রাজস্থানে জিংক পেয়েছি আমি সেইখানে…আমার তিনটে জিংক মাইন আছে উদয়পুরে। এবং সমস্ত কোলভিলদের এনে জনমজুর খাটাচ্ছি।

সেই জীবনে…। একটা ভবিষ্যৎবাণী করছি। ভগবান করুন না যেন হয়, তবু করছি। সমস্ত মহারাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত যে সিমারিং ডিস্‌কনটেণ্ট এই সব ট্রাইবালদের মধ্যে রয়েছে, যে কোনদিন তার ইরাপশান হবে।

সেই জন্যেই বলছিলাম। যদি আমরা পলিটিক্যাল সলিউশান না খুঁজে অন্য কিছু খুঁজি, খুঁজতে হবেই। একটা আশু সমাধান তো চাই। কাজেই একটা পলিটিক্যাল সলিউশান যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা খুঁজুন।

কিন্তু কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম না নিতে পারলে, এর কোন সমাধান নেই।

আজকে এখানে এটা করবেন, কালকে সেখানে সেটা করবেন মাত্র।

একটি চিঠির সন্ধানে

সুধী প্রধান

আমার সাম্প্রতিক ইয়োরোপ সফরের বিবরণ দিতেই শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শারদীয় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'কার্লমার্কস : ভারত চিন্তা ও ভবিষ্যৎ'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং আমার অনুসন্ধানের বিষয় লিখতে বললেন।

হীরেনবাবু উক্ত প্রবন্ধে—১৮৭১ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতা থেকে প্রেরিত প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্যপদ প্রাপ্তির আবেদন কে দিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে প্রয়াত বন্ধু চিন্মোহন সেহানবীশের গবেষণা এবং জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা হিউম সম্পর্কে সম্প্রতিকালের গবেষকদের অনীহা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমি নিজেকে ঠিক গবেষক মনে করি না—তবে ইতিহাস সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে এবং Marxist cultural movement-এর দলিলগুলি প্রকাশের পর এদেশের এবং ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস গবেষকদের সঙ্গে কিছু সংযোগও হয়েছে। বন্ধু চিন্মোহন সেহানবীশের পুস্তিকা Socialism and India আমি ১৯৮৩ সালে পাই। বইটির প্রকাশ কাল ১৯৭৬। এই পুস্তিকাতে তিনি মস্কো থেকে প্রকাশিত প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলের বিবরণভিত্তিক বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বোক্ত চিঠির উল্লেখ করেন এবং জানান যে পূর্বভারত থেকে প্রথম আন্তর্জাতিকের কাছে অন্তর্ভূক্তির যে আবেদন যায়—তার একটি প্রমাণ চিন্মোহনের প্রয়াত জার্মান বন্ধু H. D. Zimmer 'Collected Works of Karl Marx' (জার্মান ভাষায় প্রকাশিত) বই থেকে দেন। দ্বিতীয়তঃ, মস্কো থেকে প্রকাশিত বইতে ও সে যুগের লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র Eastern Post-এ ঐ চিঠির যতটুকু বক্তব্য ছাপা হয়েছিল—তা চিন্মোহনবাবু বৃটিশ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক James Klugman-এর সাহায্যে প্রমাণ করিয়ে নেন। সুতরাং চিঠি যে প্রথম আন্তর্জাতিক পেয়েছিল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কে বা কোন্ সংগঠন চিঠি পাঠিয়েছিল—এইটাই অনুসন্ধানের বিষয়। বিষয়টির গুরুত্ব এই কারণে যে কেবল কলকাতা বা পূর্বভারত নয়—এশিয়া থেকে এই প্রথম একটি চিঠি গিয়েছিল—যখন পৃথিবীর এইসব অঞ্চলে শিল্পবিপ্লব জাত

শ্রমিক শ্রেণীর জন্মই হয়নি—এবং জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশ ছিল সংগঠিত শ্রমিক। কিন্তু জেনারেল কাউন্সিলের বিবরণে পাই—যে এই চিঠি পেয়ে কার্লমার্কস অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন 'আন্তর্জাতিকের' বিস্তৃতি দেখে।

চিন্মোহনবাবু তাঁর পুস্তিকায় সম্ভাব্য লেখকের তালিকায় অমৃতবাজার পত্রিকার প্রয়াত সংবাদদাতা কালিপদ বিশ্বাসের রচনা, বিপিন পালের রচনা এবং অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা থেকে কিছু উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন—যার মধ্যে ১৮৭০ সালে বরানগরে প্রতিষ্ঠিত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে বিবেচ্য। আর দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে ঐ সময় রেলপথ তৈরি করতে বৃটেন থেকে যে সকল শ্রমিক এসেছিল—সম্ভবত তাদের কেউ উক্ত চিঠির লেখক হতে পারে কিন্তু তারা হঠাৎ ভারতে এসে প্রবল বৃটিশ-বিরোধী হতে যাবে কেন? কারণ উক্ত চিঠিতে ভারতে বৃটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা ছিল। আবার একথাও তো ছিল যে, জেনারেল কাউন্সিল চিঠি পড়ে নির্দেশ দিচ্ছে: সংগঠনে যেন দেশীয়দের সংখ্যা যথেষ্ট থাকে। এই নির্দেশ থেকেই সন্দেহ হয়েছে—হয়তো এদেশে আগত বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে যারা বৃটেনে চার্টিষ্ট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত তারা ঐ চিঠি লিখেছে।

১৯৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আলোচনাচক্র হয়েছিল, তাতে আমার বক্তৃতায় আমি এই বিষয়ে অধ্যাপক শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি এবং ১৯৮৫ সালে আর্মাস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞানীদের সম্মেলনের বক্তৃতাতেও আমি এই পত্র উদ্ধারের জন্য ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া থেকে আগত শতাধিক সমাজতান্ত্রিক গবেষকদের কাছে আবেদন জানাই। এই সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক এরিক হবস্‌বাম। তাঁর পরামর্শে চিন্মোহনের পুস্তিকার নির্দিষ্ট অংশ Xerox করে আমস্টার্ডামের Institute of Social History-র মার্কস-গবেষকদের দিই। ওখানে সমবেত গবেষকরা আমাকে জানান যে নাজী আক্রমণের ভয়ে 'প্রথম আন্তর্জাতিকের' অনেক কাগজপত্র ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি সংগ্রহালয়ে সরানো হয়েছিল—যার মধ্যে কোপেনহেগেন এবং স্টকহল্‌ম শহর পড়ে। আমার সেই সময় সুযোগ হয়েছিল—স্টকহল্‌ম যাওয়ার এবং সেখানে সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টির শ্রমিক আন্দোলনের দলিল-সম্পর্কিত সংগ্রহশালাতে অনুসন্ধান করার। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক Lars Wersman চমৎকার লোক। তিনি ভারত-সম্পর্কিত সব সংগ্রহ আমার সামনে উপস্থিত করার

ব্যবস্থা করেছিলেন। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' যে কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী উপস্থিত ছিলেন—অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর ছবি এখানে আমি পাই—এবং চিন্মোহনকে এনে দিই। তা' ছাড়া 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এ যে সকল ছবি প্রকাশিত হয়েছে—তার অনেকগুলি ছবি এবং নেগেটিভ চিন্মোহনকে এনে দিই—ষ্টক্‌হলম রেডিও-টিভি-র লাইব্রেরি থেকে। শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রহশালা থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল পাই—তা' হচ্ছে—কলিকাতায় ১৯২২ সালে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিবরণ। এই বিবরণ ইতিপূর্বে শ্রমিক আন্দোলনের কোন ইতিহাসে প্রকাশ পায়নি। এটি আমি 'শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' রচয়িতা পার্লামেন্টের সদস্য সুকোমল সেনকে দিই। পাঠকরা শুনে কৌতুকবোধ করতে পারেন—যে, এই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনে পাইকপাড়া সিংহ বাবুদের নেতৃত্ব ছিল এবং ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন দরদী পৃষ্ঠপোষক জনাব কুতুবুদ্দিন আহমদ সাহেব খানসামা ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছিলেন। পুরানো লোকরা জানেন, কুতুবুদ্দিন সাহেব জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে কৃষি-শ্রমিকদের একটি ট্রেড ইউনিয়নের সংবাদ ঐ বিবরণে ছিল। বহরমপুরের বন্ধুদের এই সংবাদ দিয়ে আমি আজো কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।

যাই হোক—স্টক্‌হল্‌ম থেকে ফেরার পথে মস্কোতে দুদিন ছিলাম। তার মধ্যে অনেক অনুরোধ করে Institute of Marxism-Leninism-এ হাজির হই উক্ত চিঠির সন্ধানে। চিন্মোহন আমাকে বলেছিলেন—ওরা ঐ চিঠির খবর রাখে না। কিন্তু আমার কথাবার্তা শুনে ওঁরা সব কিছু—অর্থাৎ চিন্মোহনের অনুসন্ধানের তথ্য লিখে নিলেন—এবং বললেন, "কলকাতায় তোমাকে চিঠি দিয়ে জানাব আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।"

পরে মস্কোর ইন্‌সটিটিউট আমাকে এক পত্রে জানান সে চিঠি তাঁরা পাননি। তবে তাঁদের মনে হয়ঃ—"there is a possibility of the existing commune of the native Indians, probably calcutta's dockers which was according to the article, affiliated to the Ist International, but we have to underline that it is only our suggestion." এরপর তাঁরা লিখলেন যে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রথম আন্তর্জাতিকের শেষ সম্পাদক John Hales-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে চিঠির অনুসন্ধান করতে পারি। এই চিঠি পেয়ে বন্ধু এবং প্রাক্তনমন্ত্রী অশোক

মিত্রের পরামর্শে T. Byres,—লণ্ডনস্থ Asian and African Studies এর পরিচালকের শরণাপন্ন হই—মস্কোর পত্রের xerox কপি পাঠিয়ে। দুঃখের বিষয় তাঁর কোন জবাব আজো পাইনি।

কিন্তু এই বছর অষ্ট্রিয়া থেকে একটা নিমন্ত্রণ পেয়ে স্থির করলাম, নিজে লণ্ডনে গিয়ে অনুসন্ধান করব। ইতিমধ্যে পড়াশুনো করে জেনে ছিলাম যে 'প্রথম আন্তর্জাতিকের' মধ্যে মতভেদ সুরু হলে 'অফিস আমেরিকাতে স্থানান্তরিত হয়'। সুতরাং আন্দাজে আমার টিকেট New York পর্যন্ত করে নিয়েছিলাম। আগস্ট মাসের ১১ তারিখ থেকে আমি সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ পর্যন্ত লণ্ডনে ছিলাম যার মধ্যে ৭ দিন হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ মিউজিয়ামে John Hales-এর কোন সংগ্রহ ছিল না। ওঁরা দুদিন ধরে সন্ধান করেছেন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে। তারপর ওঁরা পাঠালেন, চ্যান্সারী-লেনের একটি সংগ্রহশালায় যেখানে লণ্ডনের সমস্ত লাইব্রেরিতে যা কিছু আছে তার একটা তালিকা থাকে। সেই তালিকা থেকে জানা গেল Bishop's gate লাইব্রেরিতে John Howells-এর সংগ্রহশালায় প্রথম আন্তর্জাতিকের দলিল আছে। সেখানে যেতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা আমাকে সব কাগজপত্র এনে দিলেন, যার মধ্যে ছিল মহামূল্যবান কালো রঙের কভারওয়ালা exercise book, যাতে আছে ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত জেনারেল কাউন্সিলের হাতে লেখা মিনিট বুক। আর ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সদস্যদের নাম ও চাঁদা দেওয়ার হিসাব। কিন্তু আমার দরকার ১৮৭১ সালের মিনিট বুক ও কাগজপত্র। তবুও আমি সারাদিন ধরে ঐগুলি পড়লাম এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম। শেষ পর্যন্ত ওঁদের বললাম, ১৮৭১-৭২ সালের কাগজপত্র কোথায় পাব? ওঁরা আমাকে একটা টাইপ করা বইয়ের একটা পাতা xerox করে দিলেন। বইটির নাম The political history of the English labour movement from 1857-1872. documents and commentaries vol. 2.2. লেখক Gustav Mayer.

তিনি লিখেছেন: "When in 1872 the International broke up, the then general Secretary, John Hales, (I was told by the late Edward Bernsteen) refused to hand over the minutes for the year october 1865 to october 1869 to Karl Marx. So they remained in England, while the rest, after the death of Engels, went to Berlin with the bulk of the papers of Marx and Engels".

অগত্যা এই বইটির খোঁজে আমাকে London school of Economics-এর লাইব্রেরিতে যেতে হল। কিন্তু ঐ বইটিতে আর বিশেষ কোন খবর না পেলেও উক্ত লাইব্রেরিতে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় অনেক বই দেখতে পেলাম যার মধ্যে Samuel Bernstein এর লেখা The First International in America-তে জানলাম যে The State Historical Society, Madison, Wisconsin, USA এবং পশ্চিম জার্মানীর বন-এ সোশাল ডেমক্রাটিক পার্টির লাইব্রেরিতে প্রথম আন্তর্জাতিকের অনেক অপ্রকাশিত দলিলপত্র আছে। এই বই-এ আরো অনেক ঠিকানা আছে। আমি অন্যভাষা জানিনা বলে ফরাসী ও ইতালির ভাষায় লিখিত বইগুলি পড়তে পারিনি। কিন্তু বের্ণষ্টাইনের বই পড়ে মনে হ'ল এবং রজনীপাম দত্তের বইতেও জেনেছিলাম আমেরিকার শ্রমিক নেতা Sorge-এর কাছে অনেক কাগজপত্র চলে যায়। সুতরাং New York থেকে কিভাবে Wisconsin-এ যাব এই যখন চিন্তা করছি তখন হার্ণিয়ার ব্যথা প্রবল হওয়ায় হাসপাতালে যেতে হ'ল এবং আমেরিকা যাত্রা স্থগিত হ'ল। কারণ ৮ সেপ্টেম্বরে অষ্ট্রিয়ার Linz শহরে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসবেত্তাদের সম্মেলনে উপস্থিত না হতে পারলে আমার ইউরোপ ভ্রমণের ব্যয়ের অধিকাংশ সংগ্রহ করতে পারবো না। তবু লণ্ডন ত্যাগ করার আগে অধ্যাপক হবস্‌বামের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি অধ্যাপক আব্রাহামস্কির সঙ্গে কথা বলতে বললেন। শেষোক্ত অধ্যাপক এইচ কলিন্সের সহযোগিতায় Marx and the British Labour movement নামে বই লিখেছেন। ইনি আমাকে নিরুৎসাহী করলেন এই বলে যে তিনি অনেক খুঁজেও ঐ চিঠি পান নি। আমার প্রশ্ন হ'ল—কেবল তো একটি চিঠি নয়, এখন দুটো চিঠির কথা ভাবতে হবে। কারণ জেনারেল কাউন্সিল নির্দেশ দিয়েছিল কলিকাতাস্থ সংগঠনকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করবে। বিশপ্‌স গেট লাইব্রেরিতে যে ধরনের কাগজপত্র দেখেছি তাতে আশা করি যে কোনো না কোনো যায়গায় পত্রটি না থাকলেও প্রেরকের নাম, সংগঠনের নাম ঠিকানা থাকতে পারে। সুতরাং···অধ্যাপক আব্রাহামস্কি বললেন 'করো চেষ্টা'। আমার মনে হল, উনি বন-এর লাইব্রেরি দেখেছেন, কিন্তু আমেরিকাতে যথেষ্ট খোঁজ করেননি।

Linz পৌছাতেই ইতালির অধ্যাপক ম্যালকম সিলভার্স আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে আমার পূর্বে প্রচারিত Paper-এর জন্য অভিনন্দন জানাতে আমি আমার অনুসন্ধানের কথা বললাম। তিনি নিজে Wisconsin's-এর

ঐ লাইব্রেরিতে দুবছর কাজ করেছেন, তাই তাঁর contacts এর ঠিকানা দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন বললেন। বন-এর সেই লাইব্রেরিতে যুক্ত একজন অধ্যাপকও এসেছিলেন ওখানে। তিনি বললেন, তিনি যতদূর জানেন প্রথম আন্তর্জাতিকের কোন কাগজ ওখানে নেই; তবু তিনি সন্ধান চালাবেন। আমি Linz থেকে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিকে যাই এবং সেখান থেকে বন-এ। বন-এ একজন মহিলা Dr. Fischer আমার সব কথা শুনে বললেন যে, Sorge'র ব্যক্তিগত সংগ্রহ সন্ধান করতে হবে এবং সে কাজে তিনি সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার কলকাতার ঠিকানা নিয়ে রাখলেন।

কলকাতাতে ফিরে অক্টোবরের শেষে ইতালির অধ্যাপকের প্রেরিত Madison-Wisconsin এর দুজন অধ্যাপকের নাম পেয়েছি এবং অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন পাঠিয়েছি। এখন উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

আমার অনুসন্ধানের ফলে বিষয়টি বহু সমাজতন্ত্রী গবেষকদের নজরে এসেছে। কিন্তু আমার আশংকা, ইউরোপের সংগ্রহশালাগুলিতে গিয়ে যে উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি পত্রের সাহায্যে সেই ধরনের সহযোগিতা না পেতেও পারি।

দ্বিতীয়ত আমার পক্ষে আর ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করা সম্ভব হবে কিনা জানি না। কাজেই যে সকল বাঙালী ছাত্র ও গবেষক ঐ সকল দেশে যান, তাঁরা যদি বিষয়টি নিয়ে একটু সময় দেন, তাহলে ঐ চিঠি বা তার প্রেরকের সন্ধান মিলতে পারে। অষ্ট্রিয়া এবং বন-এর রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালাতেও আমি গিয়েছি এবং ২।১ দিনের কাজে দেখেছি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বেশ কিছু ইতিহাসের উপকরণ সেইসব যায়গায় আছে। হিউম-সম্পর্কেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি। স্টকহল্‌ম থেকে ১৯১৭ সালে বার্লিন কমিটি প্রেরিত একটি স্মারকলিপি সংগ্রহ করেছিলাম যা ডাচ স্ক্যাণ্ডিনেভিয় শান্তি সম্মেলনে প্রেরিত হয়েছিল। এটি খুব সম্ভবতঃ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা যাতে প্রকাশ, বিদেশস্থ ভারতীয় বিপ্লবীরা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সারা পৃথিবীতে উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ কামনা করেছেন। এই দলিল আমি নেহরু মিউজিয়ামে ১৯৮৬ সালে দিয়ে এসেছি। এই স্মারক লিপির সারাংশ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে পাঠ করি এবং প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশকে দিই, যেহেতু তিনিই বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বই লিখেছেন। অবসর পেলে এবং শরীর সুস্থ থাকলে এইসব বিষয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করব। মৃত্যুর সাত দিন আগেও চিন্মোহন আমাকে এই অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। আমি তাঁর শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা করব।

বিপ্লবী কমরেড ধরণী গোস্বামীর স্মরণে

ডাঃ রণেন সেন

কমরেড ধরণী গোস্বামী প্রথমে অনুশীলন পার্টির সভ্য ছিলেন। ময়মনসিং জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় তাঁর জন্ম। অনুশীলন পার্টির সভ্য হিসেবে তিনি পুলিশের বিষদৃষ্টিতে পড়ে স্বগৃহে অন্তরীণ হন।

প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে রুশবিপ্লবের ধাক্কা আসে। কমঃ ধরণী গোস্বামী সেই ধাক্কায় আন্দোলিত হয়ে পড়েন। অনুশীলন পার্টির বামপন্থী অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। এই সময় কমঃ মনি সিং ময়মনসিং জেলায় কৃষক আন্দোলন করছিলেন। তিনি ধরণী গোস্বামীর দ্বারা প্রভাবিত হন। 'আমার জীবন সংগ্রাম'-এ মনি সিং একথা উল্লেখ করেন (ঢাকা থেকে প্রকাশিত)।

১৯২৫-২৬ সালে অনুশীলন পার্টির এই অংশটা নিয়ে তিনি কলকাতায় শ্রমিক কৃষক পার্টিতে যোগ দেন। এই সময় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৭-২৮ চটকল ধর্মঘটে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, ডঃ ভূপেন দত্ত, বকরালী মির্জার সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। কমঃ গোপেন চক্রবর্তীও মস্কো থেকে ফিরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

১৯২৮সালে কলকাতায় ধাঙর ধর্মঘটে মুজাফ্‌ফর আমেদের সঙ্গে একত্রে তিনি ধর্মঘট পরিচালনা করেন। ঐ সালে তিনি East India Rly ধর্মঘটে যোগদান করেন। ঐ সময় তিনি Workers Peasant Partyতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যাঁরা মার্ক্সবাদের দিকে আকৃষ্ট হন যথা—কমঃ মনি সিংহ, নীরদ চক্রবর্তী, কমঃ প্যারী দাস, জ্যোতির্ময় শর্মা, ঢাকার নলীন্দ্র সেন প্রভৃতিকে নিয়ে Young Comrades League গঠন করেন এবং তিনি সেই League-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২৮—এ পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও শ্রমিকদের কয়েকটি দাবি নিয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই সময় শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর অবদান এবং শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের Marx-বাদে টানার চেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৯২৯-এর ২০ মার্চ বৃটিশের রোষ নজরে পড়ে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়

গ্রেপ্তার হন। সেই মামলায় নিম্ন আদালতে তিনি, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল বসাক (এবং যেহেতু তাঁদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ দেওয়া হয় নি) Communist by Conviction বলে বিবৃতি দেন। পরে উচ্চ আদালতে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হলেও অন্য কমিউনিস্ট আসামীর সঙ্গে একটি বিবৃতি দেন যা ভারতের তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রচণ্ড সাহায্য করে। এই যুক্ত বিবৃতিতে এস. এ. ডাঙ্গে স্বাক্ষর না করে আলাদাভাবে বিবৃতি দেন।

মীরাটের মামলা চলাকালীন এই বন্দীদের আচরণ ও বক্তব্য কমিউনিস্ট ভাবধারাকে সঞ্জীবিত করে ও দেশবাসীর মনে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে উচ্চ ভাবধারা উজ্জীবিত করে।

১৯৩৪ সালে ধরণীদা, গোপালদা ও গোপেনদা জেল থেকে মুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি আবার বিনা বিচারে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে কাটান। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত রক্ষা আইনে অনেক কমিউনিস্টদের সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হন।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ভারত সোভিয়েত মৈত্রী সমিতিতে কাজ করেন। ১৯৪৪ বছর খানেক তিনি জামশেদপুরের পার্টিতে কাজ করেন। সেখানে শ্রমিক কমরেডদের ক্লাস নেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জামশেদপুরের পার্টি বাংলার পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল। কারণ বাংলার পার্টি জামশেদপুরের পার্টি গঠন করে।

১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি কলকাতায় এসে পার্টির কিছু শিক্ষা শিবির সংগঠিত করেন।

১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হলে তিনি আত্মগোপন করে পার্টির নির্দেশে কাজ করতে থাকেন। পার্টির প্রকাশ্য কাজ শুরু হলে তিনি পার্টির কাজকর্ম করতে থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি ইসকাসে কাজ করতেন।

পার্টি বিভক্ত হলে তিনি পার্টির সঙ্গে থাকেন। পার্টির রাজ্য কমিটির সম্মেলনে রাজ্য পরিষদে নির্বাচিত হন এবং প্রাদেশিক Control Commission-এর Chairman হন।

তিনি কয়েকটা পুস্তক রচনা করেন, Nehru Award পান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য যে Advisory কমিটি গঠিত হয় তার সদস্য ছিলেন। এই দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর আস্থা ও অনুরাগ কোনদিন শিথিল হয় নি। তাঁর মৃত্যুতে প্রাক-মীরাট যুগের শেষ সুত্রের অবসান হল।

ভারত-সোভিয়েত উৎসব

রুশি কবিতা

এখন একই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে ও ভারতবর্ষে ভারত-উৎসব ও সোভিয়েত উৎসব চলছে। ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি বিনিময়ের অঙ্গ হিশেবে পাঁচজন প্রখ্যাত রুশি কবি ভারতে এসেছিলেন। এঁরা হলেন রসুল গামজাতভ, রবের্ত রজদিয়েস্তভিনস্কি, ইভান দ্রাচ, মারিস চাকলাইস এবং রিমা কাজাকোভা। এঁরা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতার শিশির মঞ্চে বাংলা ভাষার কয়েকজন বিশিষ্ট কবির সঙ্গে আমাদের একটি স্মরণীয় কবিতা-সন্ধ্যা উপহার দিয়েছিলেন।

কলকাতার সল্ট লেক-এর ইনস্টিটিউট অফ রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ-এর তরফ থেকে প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবেই ঐ অনুষ্ঠানে পঠিত রুশি কবিতাগুলির অনুবাদ করা হয়েছিল। সেগুলি থেকে কয়েকটি কবিতা আমরা এখানে প্রকাশ করছি। এর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর সেন-কৃত দুটি অনুবাদও ছাপা হল। আমরা হয়তো এভাবেই ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের শরিক হতে পারি।

কবিতাগুলি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমরা ইনস্টিটিউট অফ রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

সম্পাদক, পরিচয়

রসুল গামজাতভ

প্রিয়ার নামে

(২)

প্রিয়ার নামে লেখেন কবি পদ্য—
তুমি আমার আলো, চোখের তারা
কাছে যখন রয়েছ—আমি সুখী
রইলে দূরে—আমিও বাসা-হারা।

আলো—চোখের তারায় তো সেই মেয়ে
চৌকাঠে যেই দাঁড়ায়, কবি বলে—
দোহাই তোমার, অনেক কাজ তো বাকি
আবার এলে? এক্ষুণি যাও চলে।

অনুবাদ: বিশ্বরূপ সান্যাল

বলাকা

রক্তপ্লাবিত রণক্ষেত্র থেকে
সৈন্য যারা ফেরেনি আর ঘরে
হয়তো তারাই—মাঝে মধ্যে ভাবি—
মাটি ছাড়িয়ে সারস হয়ে ওড়ে।

স্মরণাতীত সময় থেকে আজও
কথার পাঁতি এমনি উড়াল আসে
তাই বসেছি হৃদয়ে ভার বয়ে
স্তব্ধ হয়ে তাকাই দূরাকাশে।

আজকে দেখি সাঁঝ ঘনাবার আগে
সুনির্দিষ্ট গঠন কুয়াশায়
যেমন তারা মাটিতে হেঁটে গেছে
তেমনি করেই আকাশে উড়ে যায়।

উড়াল তারা কাদের বা নাম ডাকে
আকাশে যায় দীর্ঘ রেখা এঁকে
'আভার' ভাষার মধ্যে সারস ডাকায়
তাই বুঝি মিল চলে যাচ্ছে রেখে।

তীক্ষ্ণ ক্লান্ত তীরের ফলার মতো
বন্ধু তারা শুভ্র ধবল ভাই
ওদের পাঁতির গঠনে হয়তো আছে
আমার জন্যে একটি ফাঁকা ঠাঁই।

একদিন তো আমিও যাবো, ঐ
নীলিম ছায়ায় ওড়ে বকের ঝাঁক
তোমরা—যাদের পিছনে ফেলে যাবো,
আকাশ থেকে শুনো আমার ডাক॥

অনুবাদ : বিশ্বরূপ সান্যাল

রবের্ত রজদিয়েস্তভিনস্কি

বছরগুলোর গান

হোক ধূসর-ধোঁয়াটে আমার চুল
শীতে আমি ভয় পাই না।
তারই শুধু নয় আমার বছরগুলো
আমার বছরগুলো আমার সম্পদ।

প্রায়ই সময়কে আমি তাড়া দিই
সব কাজে তাড়াহুড়ো করা
আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল
কোনো টাকাপয়সা আমি জমাইনি
আমার বছরগুলোই আমার সম্পদ।

বছরগুলোকে কানে-কানে বলি, ধন্যবাদ,
ধন্যবাদ তোমাদের
পদের ভেতরকার তেতো আমি খাই
কারুর কাছে ওদের আমি
ছেড়ে দেব না।
আমার বছরগুলোই আমার সম্পদ।

সময় যদি আমায় এসে বলে
'তোমার নক্ষত্র আজ শেষবারের মত নিভলো…'
আবার উঠবে
শিশুর হাত
তবু আমার বছরগুলোই আমার সম্পদ।

অনুবাদ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়
শংকর সেনগুপ্ত

সব কিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে

সবকিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে
অনেকে বলে
প্রথমে ছিল শব্দ

তবু আমি আবার ঘোষণা করি
সবকিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে
ভোর হওয়ার সঙ্গে
কাজও শুরু হয়
ফুলের চোখ
শিশুর চোখ
কিন্তু, সবকিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে

সবকিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে
তাকে ভালোবাসা দিয়ে
আমি তা নিশ্চিত করে জেনেছি
সবই
এমন কি ঘৃণা, সেও
ভালোবাসার নিজস্ব ও চিরকালের সহোদরা।
সবকিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে
স্বপ্ন ও ভয়
সুরা এবং বারুদ
বিয়োগ বিষাদ বীরত্ব
সবকিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে

বসন্ত ফিসফিসিয়ে তোমায় বলে, 'বাঁচো'
আর সেই ফিসফিসানি থেকে গায়ে
দোলা লাগে তোমার
সোজা দাঁড়িয়ে ওঠো তুমি
আর শুরু করো
সবকিছুই শুরু হয় ভালোবাসা থেকে।

অনুবাদঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর সেনগুপ্ত

রবার্ত বোঝ্‌দেস্তভেনস্কি

প্রাচীন হিন্দু

ব'সে আছে এক বুড়ো,
কালের ভারে, বোধ হয়,
শীর্ণ—
রুশী নভেম্বরে
শীতে-জমাট ঝোপের মতো ;

নতুন কেতায়
দুরন্ত যারা,
তাদের দিকে তাকিয়ে
সে চিবোয় শুধু হাওয়া—
আর মনে করে
ফেলে-আসা দিন আর সামনের
কিছু মুহূর্ত।

আর কাছাকাছি
একটা জট-পাকানো ভীড়ের
ঝাপ্টা—
হঠাৎ উঠে-আসা
রঙের পোঁচ কিছু অস্থির।

তার চোখ দুটো
কোটরে-ঢোকা কিন্তু গভীর :
তার পিছনে
কয়েক হাজার বছরের জোড়—
তাই সামনের দিনগুলিতে তাকাতে, বুঝি বা,
মনে হয় খানিক অনিশ্চিত !

অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

ডানা

জলে জঙ্গলে খড়ের গাঁদার ওপর
ছড়ানো ছেটানো ভালো লোকদের জন্ত
নতুন বছর আনে তার সওগাত—
অম্ভ্রাখানের টুপি বা সস্তা হুঁকো,
মেরজাপও আনে, আনে দেওয়ালির বাজি,
কয় কিলো নুন, মাঠভরা হাওয়া, ছ্যাকরা গাড়ির জিন্
আর কিছু নয়, কিরিল খুড়োর জোড়া ডানা উড্ডীন।

দিন ছিল তবু দিনের মতোই ঠিক
বেল্‌চার নীচে এফোঁড়-ওফোঁড় ছোরা
হঠাৎ কখন ছেঁড়া-খোঁড়া তুলো ছেনে
বাতিল জ্যাকেটে অবাক জাতুর খেলা
রৌদ্রে নাচায়, টানটান মেলে দিয়ে
গর্বিত ডানা ঝাপটায় আশমানে,
দীপ্ত ভুবন, তবুও খুড়োর হৃদয়ে
অন্ধদৃষ্টি, বিষাদ এবং ছায়া।

হীরে-জ্বলা এই আকাশ হয়তো কারো
পিঠে-পুলিময়, কারো বা নতুন অন্ন,
তরুণীর ঘরে বাসর শয্যা সাজানো,
হয়তো সে রাত কারো কাছে ঘোর মরণ,
হঠাৎ বুঝিবা ভেঙ্গে চুরমার বজ্র—
হায় ঈশ্বর! কিরিল পেয়েছে ডানা।

গিন্নি কেবলই ঘ্যানঘ্যান করে চলে,
মানুষজন তো মানুষেরই মতো বাঁচে,
তুমি আমি আর উজবুক যতো সব
স্বপ্ন দেখে না, অমোঘ কথাটি আছে—
কেউ ফেল্ট জুতো, মধু বা বাহারি নৌকো
পেয়ে কেউ এব আহ্লাদে আটখানা,

এই বুড়ো হায়, এই নবান্নে পেলে
খোদা-তাল্লাহ্, স্রেফ এক জোড়া ডানা।

কী আর বলবো, এখন কিরিল খুড়ো
ছেঁড়াখোঁড়া জামা কোথায় লুকোয় বলো
কাস্তের 'পরে যতো জোরে পড়ে শান
সেই ধার লেগে, ছাখো, পাখা চার টুকরো।

কিন্তু যখনই গোধূলি খুড়োর দিকে
চোখ মেলে যায়, ডাকে প্যাঁচা থুথ্থুরে,
আবার নিশীথে সেই ফুটিফাটা কামিজে
ছটফট করে জেগে ওঠে জোড়া ডানা।

কাজেই কিরিল সশস্ত্র হয়ে বাঁচে
আঁতিপাঁতি চলে ডানাহীনতায় একা
না-ডানায় রচে নিজের কুঁড়েটি তার
এলোমেলো যত রাজ্যের ব্যস্ততা।

সদা-সতর্ক—পাছে চুরি হয় গান
ডানাহীন খুড়ো সেই ভয়ে চৌচির
ছিন্নভিন্ন ছড়ানো ছেটানো তার
ডানার টুকরো, স্বপ্নে আকাশ ছাখে।

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত
শুক্তিসমা ঘোষ
প্রবীর সেন

মাক্সিস চাকলাইস

যে হ্রদ বাড়ছে

তোমায় আমি ভালবেসেই যাব—
লাজুক চোখে প্রথম ভালবাসা, সেই তো প্রশ্রয়
জলাবনের নলখাগড়ার মতো

জড়িয়ে থাকা গুল্মলতার মতো
তোমায় আমি রাখব স্বচ্ছ দূরে।

পিছলে যাওয়া নৌকোখানির বুকে
ভাসতে থাকা পদ্মকুঁড়ির দিকে
বাড়িয়ে দেওয়া তোমার আঙুলগুলোয়
একটু চুমো খাব।

বুনো হাঁসও জোট বাঁধবে উড়তে ডানা মেলে
নীল পালকের গুচ্ছ খুলে খুলে
কুসুম শোভা ভরিয়ে দেবে শরের ঝোপে আ

প্রতিপলেই বাড়ছে ভালবাসা; আমার ভালবাসা
ভালবাসছি—এমন ভালবাসা
হবে না যা ক্লান্ত কক্ষণো
পূর্ণতাতেও মিটবে না যার তৃষা।

এই যে তুমি, এই যে জলাভূমি—
এই-ই আমার ভালবাসার ভূমি;
ক্ষীণ শরীরের সাঁতারুরা, কিংবা স্নানার্থী—
কাদাখোঁচা? কাঁকড়া-কুমির? ভয় পাওয়াবে কি—
তারাও আমার বহুত প্রিয়, ভালবাসার খনি।

ভালবাসার এই হ্রদেরই ডুবো প্রসাদপুরী,
জলদানো আর ড্রাগন মাছি, মায়াবী জলপরী,

ভালবাসব গহীনতলেও পোকা-মাকড়, যাদের
ভালবাসায় যায় নি আজোও ধরা।

কিন্তু তারা আসছে ফিরে, আসছে ফিরে ত্বরা
ঘিরতে সেই জলা···
মুক্ত ভ্রমেই রয়েছে আজ যা।

তোমার চোখেও স্বপ্ন স্বাধীনতার :
মগ্ন এখন, শোন নি তাই মোহনবাঁশির স্বর,
বোঝ নি সেই নেই-ছায়ারই মায়া—
ভুলিয়ে তোমায় নামছে ধীরে ধীরে
কণ্ঠনালী শুষ্ক করা দাঁড়া
ভালবাসার দাঁড়া।

অনুবাদ : অনিৰ্বাণ দত্ত

তব করতল ঃ একটি বিলাপগাথা

আমি তো মৌমাছি নই
তুমি নও আমার আবাস
তবু কথা বলি তোমার ভিতর ঘরে
যেন গুঞ্জন কোনো এক মৌচাকে।
তব করতল সুদূরগামিনী আজ
—এ দূরগমন নিশ্চিত প্রত্যয়,
সমাদর কোরো
আবারও একটিবার
যখন তোমার যাত্রাটি সমাপন।

তব করতল এখনও ক্লান্ত নয়
সম্বর্ধনা জানাতে অন্তজনে,
হাতবদলের উষ্ণতা-ঋণ নয়
নিজ সঞ্চিত উত্তাপে গরীয়সী,
মানচিত্রের ধুসর রেখায় কীর্ণ
নদী পর্বত বাধা-বন্ধনহীন
তব করতলে আজ শুধু লাঞ্ছিত।

যবে আশ্লেষে ঢেউয়ের চুড়োয় বাঁধো,
সর্পিল গতি সূর্য্য-অয়ন পথে,
অথবা ক্লিষ্ট পরিক্রমণ চলে
চান্দ্রেয় পথ—ছায়াপথ ধরে ধরে
চিত্রল হয় পাহাড়ের হৃদিরেখা ;
এদিকে বাড়ছে জলের অন্ধকার—
ঘন থেকে আরো ঘণীভূত হ'তে হ'তে
এত অস্বচ্ছ ছায়াময় হ'য়ে যায়
আমি শুধু পারি বৃষ্টি ধারার মত
ঝঞ্ঝা দাপটে এ জীবন ছুঁড়ে দিতে
—পরিত্যক্ত পোশাকের মত সব
পেরোতেই পারি নদী নালা পর্বত
অন্তবিহীন···বাধাবন্ধনহীন······

অনুবাদ ঃ কমল রায়

মারিস্ চাক্‌লাইস্

ভারতীয় ছেলে-ভুলোনো ছড়া

গাছপালার শেকড় এমনভাবে জড়িয়েছে
চেনা ভার ডাল আর মূল,
ঠাসাঠাসি সবুজ গজিয়ে ওঠে আকাশে
পায়ের নিচে ঘাসের কোমল

ব্রাহ্মণ আর হাতিটি দুই-ই ঘুমিয়েছে
রিক্সাওয়ালা আর রাজনীতিক,
ঈশ্বর ভাল করুন এমন বিপাকে
মাজাঘসা ভোর এনে দিক

মিঠাই আর নয়া পয়সার মুখ দেখুক ছেলেটা,
ভাতরুটি, যা খেলে সে বাঁচে,
আধ-আনি প্রাসাদটা তুলছে সুখী হাই
দুঃখী বস্তি প্রাণপাতে আছে

ক্যিচেল বাঁদর শুধু ল্যাজ দেয় নাড়া,
ক্যিকে জ্যোৎস্না, কিছু একটা খোঁটে,
বুঝে উঠতে পারে না সে, ভিড়বে ঠিক কোথায়
মানুষ না মানুষেতর হাটে।

অনুবাদঃ সিদ্ধেশ্বর সেন

ইভান দ্রাচ
সূর্যমুখীর গাথা

সূর্যমুখীর হাত ছিল পা ছিল
শরীর সবুজ, বাড়ন্ত, খড়খড়ে
হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতো
কোঁচড় ভরে তুলতো বনের ফুল
আমের গাছে তরতরিয়ে উঠতো।

হাওয়া-কলের ধারাতে স্নান সেরে
গরম শুকো বালিতে মেলে গা
গুলতি ছুঁড়েছিলো ঘুঘুর পানে।

সূর্যমুখী একপায়ে ভর দিয়ে
কানের থেকে টানতো ফোঁটা জল
যেই দিয়েছে মাথা হেলিয়ে লাফ
সূর্যিমামার চোখেই সূর্যমুখী!

গনগনে আঁচ তরুণ সূর্যিমামা
সোনালি রঙ কোঁকড়া চুলে মাথা
আকাশ বেয়ে চলছিলো সাইকেলে
এড়িয়ে খানা খন্দ, মেঘের খাঁজ।

সূর্যমুখী স্থির হয়ে দাঁড়ালো
সোনারঙের নীরব বিহ্বলতা
'দাও না মামু চালাতে একবার
নিদেনপক্ষে বসাও না হাতলে—
কতোই বা আর কষ্ট তোমার হবে?

কবিতা, তুই সূর্য শতরঙা
প্রতি পলেই কোথাও তরুণ কবি
তোকে করে হঠাৎ আবিষ্কার
চিরটাকাল, থাকিস সূর্যমুখী!

অনুবাদ: শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ সান্যাল, শংকর সেনগুপ্ত

কুলীন-সাধনা

অজয় চট্টোপাধ্যায়

কোন তাড়া নেই, অলস মুদ্রায় ঘরময় ঘুরঘুর করে গৃহস্থালি কাজ সম্পন্ন করছে মন্দিরা, কর্মে রত থেকে সে মন্তব্য ছোঁড়ে, "কালচার? ও তুমি ধুয়ে খাও। আমি পষ্টাপষ্টি বলে রাখছি বাংলা স্কুলের খোঁয়াড়ে আমাদের ছেলে বন্দী থাকুক এ আমি হতে দেব না।"

অতএব, অনুমেয়, আলোচনা শুরু হয়েছে আগেই এখনও তার ধারা অব্যাহত। তর্ক করার প্রবণতা যে মন্দিরার মনে খুব প্রবল তা তার বাঁকানো গ্রীবা, স্ফুরিত নাশারন্ধ্র, কুঞ্চিত ভুরু ইত্যাদি শরীরগত চাঞ্চল্যে আভাসিত। কিন্তু তর্কের আভাস জাগ্রত করে মুহূর্তে ছেদ টানে। যেহেতু ডোর বেল বেজে ওঠার ধ্বনি কর্ণগোচর হয়েছে। সুপ্রিয়কে ঠেলে দেয়, "দ্যাখো তো কে?" দরজা খুলে যাওয়ামাত্র প্রথম দর্শনেই সুপ্রিয় হতচকিত, ক্রমে দৃষ্টি সয়ে এলে প্রসন্নতায় মুখ ভরে যায়, "আসুন আসুন। আজ সারাদিন অনেকবার আপনাকে মনে পড়েছে।"

"আমি ত এখন বাতিলের দলে, স্ট্রেনজ। আমাকে আবার কারো মনে পড়ে। তবে বলে রাখছি ভায়া আমায় দিয়ে কিছু গোছাতে পারবে না। বিকজ আই হ্যাভ নো মারকেট ভ্যালু।" পায়ে পায়ে দুজনে হাঁটছে। গন্তব্য ভেতর ঘর, ঘরে পৌঁছে মুখোমুখি চেয়ারে আসন নেয়। বেশ আলগা হয়ে পায়ের ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে বিমলদা। মুখে মুচকি হাসি। সুপ্রিয় আচমকা প্রশ্ন উদ্গার করে, "বিমলদা সফলতার চাবি কাঠি কি? আপনি সন্ধান জানেন কি?" খাপছাড়া প্রশ্নবানে বিমলদা বিমূঢ়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সুপ্রিয়র মুখ জরিপ করে। না। মুখে মস্করার ছায়া নেই।

"বিমলদা একসময় আপনাকে দেখলে আমরা কতিপয় যুবক ফিসফিস করতাম, আপনার কানেও যেত—ঐ যে বিপ্লবদা আসছেন। কী মনে পড়ে?"

বিমলদার মুখ ছায়াচ্ছন্ন।

আবার জিজ্ঞাসা করে সুপ্রিয়, "মনে পড়ে?"

অস্ফুট গুঞ্জন বাতাসে কম্পন জাগায়, "পড়ে।" বলে বিমলদা উদাত্ত হাঁক পাড়ে, "হ্যালো ম্যাডাম, কণ্ঠনালী যে শুকিয়ে মরুভূমির হাহাকার—"

সঙ্গে সঙ্গে অদূর থেকে ভেসে আসে গলা, "জল ফুটছে। আর একটু—"

সুপ্রিয় অসহিষ্ণু। তার উত্তপ্ত গলা চড়তে থাকে, "যুগ যুগ ধরে এত ত্যাগ, কষ্টবরণ, তেলাঙ্গানা-তেভাগা-খাদ্য মিছিল সব আয়োজন ভেসে গেল, শহর কাঁপানো গণ আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, মৃত্যু-রক্তপাত কিন্তু কি ফল ফললো? সেই থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়। নীট ফসল শূন্য।"

আস্তে আস্তে ছায়া অস্তমিত। বিমলদার মুখ উদ্ভাসিত প্রচ্ছন্ন কৌতুকে। রগড়ে স্বর ঝরায়, "কী ব্যাপার, কোন সমস্যায় ভুগছ? কি সমস্যা? পদোন্নতি? কারো লেঙ্গিবাজিতে মুখ থুবড়ে পড়েছ অফিসে?"

"না না। এসব কিছু নয়, লক্ষ্য করেছেন মানুষ কী রকম হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ হয়ে পড়েছে সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে। যেন তেন উপায়ে আত্মজদের অভিজাত বানাতে হবে। এ কী কুৎসিত মিশন।" সুপ্রিয় উত্তেজিত। সে তার রাগ, ঘৃণা এবং অন্তস্থ ক্ষোভ বিস্তার করে। "রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন এতসব করে কি ঘোড়ার ডিম প্রসব করলেন?"

কথোপকথনে বিরতি নেমেছে, শ্লথ গতিতে মন্দিরা এগিয়ে আসছে, দুহাতের ঘেরে বয়ে নিয়ে আসছে ট্রে। বিকীর্ণ ধূমে তৃষ্ণার প্রবলতর জাগরণ। মন্থর পদপাতে মন্দিরা নিকটবর্তী হয়ে নত হয়। সেণ্টার টেবিলে ট্রে-টা রাখে। খাদ্যবস্তু নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে।

"জোরদার আলোচনা—আমিও বসে যাব নাকি।"

"ও শিওর—"। বিমলদা উৎসাহে প্রদীপ্ত। একটা প্লেট সে ছোঁ মেরে তুলে নেয়, নুন-ঝাল মশলা মাখা ভাজা চিঁড়ে এক গাল নিয়ে মুখে পুরে দেয়। চিবিয়ে চিবিয়ে আস্বাদ নিতে নিতে বলে, "দুজন পুরুষে একজন রমণী—এই বেসিসে আড্ডার এক আলাদা বিউটি গড়ে ওঠে—।"

চাইনিজ বোন দিয়ে উৎপন্ন চায়ের আড়ম্বরপূর্ণ সরঞ্জাম। পট থেকে কাপে কাপে লিকার ঢালছে মন্দিরা। পরিমাণ মত চিনি দুধ মিশিয়ে ধীরে ধীরে সযত্ন হাতের ক্রিয়ায় নির্মাণ হচ্ছে মহার্ঘ চা। নিবিষ্ট মন্দিরা মুখ তোলে, "না স্যার। দুজন নয় পাঁচজন পুরুষে একজন রমণী—যতদূর মনে পড়ে উক্তি করেছিলেন নীরদ চৌধুরী।"

"ও আইডিয়া এখন অবসোলিট। ত্রিরিশ বছরের প্রাচীন। মৃত। সমাজ অনেক দূর এগিয়েছে।" বিদ্রূপে ঝকঝক করে সুপ্রিয়র চোখে, সে ঝল্‌সে ওঠে, "দেশ এগিয়েছে? কিছু, সারাজীবন ঝাণ্ডা উঁচিয়ে কোথায় এসে দাঁড়

করিয়েছেন দেশকে? কখনো কি সমীক্ষা করেন? কেন এমন হোল, কে দায়ী? আপনারা আপনি ইউ আর দা কজ।"

স্বপ্রিয় ভুলে যায় এটা চায়ের দোকান নয়। নয় কোন অফিস ক্যান্টিন বা ক্লাব-রুমের চা-চক্র। যেখানে রুচি ও দৃষ্টিকোণ অনুসারে মাঝখানে টেবিল রেখে মুখোমুখী বিভক্ত শিবির।

স্বপ্রিয়র আক্রমণে বিমলদা তীব্র আলোড়িত। ম্লান ও অপ্রতিভ হয় মুখশ্রী। কোন জবাব খুঁজে পায় না।

কিন্তু স্বপ্রিয় আজ তাকে কথা বলাবেই। সে চাপ দিয়ে বলে, "ক্ষেত্র বিশেষে মৌনতা অবলম্বন এক ধরনের ওপর-চালাকি। বলুন, কেন পারস-পেক্টিভ ভণ্ডুল হয়ে গেল।"

চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। অনেক কিছু বলতে নিজেকে উপুড় করে দিতে বিমলদা অন্তর ব্যেপে তাড়না অনুভব করে। বলে, "অফিসজীবী এবং সংগঠিত শিল্প শ্রমিকরা আমাদের পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। ক্রমে ক্রমে তারাই হয়েছে ধ্যানজ্ঞান, তারা রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন দরবারে হাজির হয়েছে। রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন মঞ্চ থেকেও একঘেয়ে আহ্বান জানান হয়েছে।" বলে বিমলদা দুহাত প্রসারিত করে, বরাভয় প্রদানের ভঙ্গিতে, "আইস, আমি তোমাদিগকে মোটা বেসিক দিব ঈর্ষণীয় ডি. এ. দিব, ইলেক্ট্রনিক্স কালচার। শুধু চাই চাই লড়াই। মহৎ কিছু উৎপাদন হবে কেমন করে! নীট ফসল উৎপীড়িত মানব সমাজ পা-পোষের মত পড়ে থাকল বাইরে। আমরা অপরাধী। আই মাস্ট কনফেস।" তার দৃষ্টিতে ব্যথার বিকাশ।

এতক্ষণ বিনীত শ্রোতার ভূমিকা পালন করছিল মন্দিরা। এই প্রথম মুখ খুলল, "ও আজ খুব উত্তেজিত। টেনশনের উৎস আমি।"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে বিমলদা নড়ে চড়ে বসে।

স্বপ্রিয় ক্ষিপ্ত স্বরে বলে, "ছেলেকে নির্দিষ্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে হবে গোঁ ধরেছে মন্দিরা।"

সংশয় নেই। দ্বিধা নেই। প্রত্যয়ী গলায় মন্দিরা বলে, "আমাদের একমাত্র সন্তান—তার ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা—আজীবন নিরাপত্তার ভিত পাকা করা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে সস্তা সেন্টিমেন্ট প্রশ্রয় দিও না।"

স্বপ্রিয় নিরুত্তর। চোখে অবসাদের ভাঁজ পড়ে। তা লক্ষ্য করে মন্দিরা

তার শেষ বলশালী অস্ত্র মরণাহত দৃষ্টি এবং কাতর আবদার প্রয়োগ করে। "প্লী-ই-জ, কথা দাও।"

প্রার্থনা নিগূঢ় আকুতিপূর্ণ। দৃষ্টিপাত এমন হৃদয় বিদারক এবং অভিমান জর্জর অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে সমর্থ, আবেদন হতে পারে এমন অব্যর্থ, জানা ছিল না। জানল। সুপ্রিয় পরাস্ত হল। হার মানল। নিরংকুশ আনুগত্য বোধে সুপ্রিয় ঘোষণা করে, "আই প্রমিস।" ভুইফোঁড়ের মত যেন বিমলদা ভেসে উঠল উদার আওয়াজে, "আজ আমি উঠি।"

বিমলদা প্রস্থান করলে ঘরময় বিরাজ করে স্তব্ধতা। অন্তত মন্দিরা স্বস্তি ফিরে পায়। এবার সে রান্নার আয়োজনে মনোনিবেশ করতে ব্যাকুলতা অনুভব করে। হেঁসেল অভিমুখে মন্দিরা পা বাড়ায়। অলস চরণে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কানে এসে বিঁধছে সংশয়দীর্ণ বিলাপ "কিন্তু কি করে যে ভর্তি করব। কঠিন প্রতিযোগিতা।" মন্দিরা এ্যাবাউট টার্ন। মুখ ঝামটা দেয় "ওসব খোলস, চাল। আসলে হোল পুশিং। সোর্স বার করো। কোটা সিস্টেমে থাবলা বসাও।"

হোক পরিস্থিতির চাপে, তবু সুপ্রিয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং তা বাস্তবে পালন করতে প্রাথমিক স্তরেই বেশ কাবু হয়। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তার জানা আছে। পরাক্রমশালী পৃষ্ঠপোষকতার আশ্রয়তুষ্ট হতে হবে। অতএব মুরুব্বি সংগ্রহের অভিযান অনিবার্য।

পরিচিত জগৎ সীমাবদ্ধ, আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, পরিচিতের পরিচিতি ইত্যাদি দিক/থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী নাম চেতনার ওপর কিলবিল করতে থাকে, ঝাড়াই বাছাই করে নামগুলো একটি নির্বাচিত তালিকায় সংযত করে সুপ্রিয়।

তালিকা অনুসারে একে একে প্রত্যেকের কর্মস্থলে অথবা বাসস্থানে সুপ্রিয়র কুন্ঠিত পদধূলি পড়ল। তিরস্কার-বিরক্তি-নির্লিপ্ত-সহানুভূতিশীল-পরামর্শমূলক বিভিন্ন আচরণ প্রত্যক্ষ করল সুপ্রিয়। নিরতিশয় ক্লান্তি ও অবসাদে দেহমন ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কোন ওজনদার শুভার্থীর সন্ধান মিলছে না। কোথায় সে? সুপ্রিয় প্রার্থনায় আকুল হয়। এসো, দেখা দাও। দেখা দাও। তালিকার প্রান্তে এসে চোখ বুলচ্ছে সুপ্রিয়। তলানি হিসেবে নেক্সট নাম গোকুলচন্দ্র রায়। বড় বড় স্কুলের বয় ড্রেস এবং ফার্নিচার সাপ্লায়ার। সম্পর্কে লতায় পাতায় মামা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়ের দর্শন পাওয়া যাতে সুনিশ্চিত হয় তারই প্রত্যাশায়

এত সকাল সকাল সুপ্রিয়র আগমন, বাড়ির ভেতর অবধি প্রবেশ করতে হয় না। বাইরেই দেখা মিলল। উদোম গা। ফর্সা আণ্ডার প্যান্ট পরে গ্রীলে রং দিচ্ছেন স্বয়ং। পায়ের নীচে গৃহপালিত বিড়াল গোঁফের ফাঁকে লেপটে থাকা দুধ জিভ দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে। সুপ্রিয়কে লক্ষ্য করে তিনি আপ্যায়ন করেন, "আয় পচা আয়।" সুপ্রিয় ক্ষুণ্ণ হয়। বহিরঙ্গ জীবনে ও নাম অনেকদিন বাতিল হয়ে গেছে। অন্তরে ক্ষুব্ধ বাইরে সপ্রতিভ ভাব বজায় রাখে সুপ্রিয়। বিনীত স্বরে নিজের প্রয়োজন উপস্থিত করল। মামা শুনলেন। শুনে সুপ্রিয়র প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দিয়ে হাসলেন, "ছেলেকে এলিট করতে চাস?" বলে ডান হাতের বুরুশ বাম হাতে চালান করে, "সাদা কাগজ আছে—দে—।"

সুপ্রিয় সাদা কাগজ ও ডট পেন বাড়িয়ে দেয়। দাবনার ওপর কাগজ পেতে ভদ্রলোকের কলম তির তির করে বইছে। চকিতে ভদ্রলোক চোখ তোলেন, সুপ্রিয়র মুখ জরিপ করেন, কৌতুক স্বরে বলেন, "খুব বুঝি উপরি পাস?"

তারপর চিঠি ভাঁজ করে প্রাপকের নামধাম লিখে সুপ্রিয়র হাতে তুলে দিয়ে আগতপ্রায় একটা হাই মুঠি দিয়ে চেপে ভরসা দেন উদাত্ত স্বরে "ভাবিস না, হয়ে যাবে। বিরতি দিয়ে পুনরায় যোগ করেন, "কী হয় আমাকে রিপোর্ট করিস।" অর্থাৎ লেগে থাকার নির্দেশ দেন।

সুপ্রিয় পথে নামে। সুপারিশপত্র পকেটে স্থিত হয়ে এখন তার হৃদয় জুড়োচ্ছে।

আবার শীত এসেছে। উত্তীর্ণ দুপুর। মুমূর্ষু আলোকময়তার প্রেক্ষাপটে সুপ্রিয় এসে উপস্থিত হয় নির্দিষ্ট স্কুলটির প্রবেশ দ্বারে। নির্বিকার দারোয়ান অবারিত করে দেয় চাকা লাগান লোহার গেট। অন্দরে প্রবেশ করে সুপ্রিয়। তার সামনে উদার লন। কদমছাঁট নবজাত তৃণে আচ্ছন্ন। দূরে খাড়া হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদ। ব্যবধান যোজকের মত জুড়ে দিয়েছে চওড়া বাঁধান রাস্তা। চারদিকের প্রাচীর ঘেঁসে গ্রথিত গাছগাছালির সুচারু বিন্যাস। একটা শান্ত ভাব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুপ্রিয়র মন্থর পদযাত্রা অফিসমুখী। অবশেষে অফিস ঘরের একটি সোফায় সে আশ্রয় নেয়। ভিজিটর স্লিপে রেফারেন্সসহ নিজের নাম লিখে তার আগমন বার্তা রেকটরের ঘরে পৌছে দেয়। পথের শ্রম লাঘব করতে সোফার পিঠে হাত ছড়িয়ে আয়েস করে বসে, বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর তার

ডাক এলো। গা ঝাড়া দিয়ে সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়। চাকরির অন্বেষণ অথবা পারমিট লাইসেন্স যাবতীয় বড় কিছু লাভের প্রত্যাশায় উমেদার যে ভঙ্গিতে মুরুব্বির নিকটবর্তী হয়—হুবহু সেই উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-শঙ্কার প্রত্যাগমন সুপ্রিয়র দৈহিক ভাঁজে। এক পাল্লা দরজায় তার কম্পমান হাতের চাপ পড়তেই উন্মোচিত হয় ঘর। মোজাইক ফ্লোরে তার কুণ্ঠিত পায়ের ছাপ পড়তেই সাথে সাথে গম্ভীর স্বর ভেসে আসে, "আসুন আসুন।"

বিদ্যুৎ নেই। অভ্যন্তর যেন প্রদোষাবৃত। সব কিছু আবছা লাগে। ক্রমে চোখ সয়ে এলে সুপ্রিয় দেখে হাতের ইসারায় ভদ্রলোক একটা চেয়ার চিহ্নিত করছেন। অর্থাৎ বসার অনুরোধ।

সুপ্রিয় বসে। তার উপবেশন কিঞ্চিত আড়ষ্ট। দেয়ালঘড়ি কোমল ক্লান্ত আওয়াজে চারটে বাজার সংকেত দিল। সময়ের যেন কোন তাড়া নেই। স্তব্ধ ঘরে অবেলার ধূসর গোধূলি নামল।

বেল টিপতে ঘরে একজন ঢুকল। ভদ্রলোক বললেন, "দুকাপ চা এনো, একটা র।" বলে সুপ্রিয়র দিকে মুখ ফেরান, "গোকুল ফোন করেছিল, বলেছিল আপনার কথা।" সংলাপ উৎক্ষেপনের সাথে সাথে মাথাটা দোলে। মাথার চারপাশে চুলের আল, মাঝখানে চরের মত ভেসে ওঠে মস্ত টাক। টাকে হাত বুলিয়ে ভদ্রলোক রহস্যময় হাসি হাসেন। বলেন, "গোকুল আমার বন্ধু, ফ্রম বয়হুড। আমার আলাপে যদি ব্যক্তিগত টাচ এসে যায় মাইণ্ড করবেন?" বলে অনুমোদনের প্রত্যাশায় নীরব থাকেন। সুপ্রিয় মৌন। যদিও দুদিকেই তার মাথা দোল দেয়। সায় অথবা আপত্তি যে কোন অর্থ গ্রহণ করার স্বাধীনতা পায় বক্তা। বক্তা নিজেকে এলিয়ে দেন ঈষৎ ঢালু গদি আঁটা চেয়ারে, বুক পকেট থেকে তুলে নেন সিগারেট প্যাকেট। একটা নিজে নিয়ে আর একটা বাড়িয়ে দেন সুপ্রিয়র প্রতি। সুপ্রিয়র চোখ চারিপাশ, উপর এবং নিচ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। অবশেষে দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় দেওয়ালের এক অংশে। গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ। কার্ল মার্কস। সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান তিন মণীষীর ছবি এক দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন হয়ে শোভা বর্ধন করছে। সুপ্রিয় তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, ফলে দাঁতের ডগা আভাসিত। পরিব্যাপ্ত ঠোঁট মৃদু কৌতুকে তরঙ্গায়িত। এই অভিব্যক্তি ভদ্রলোক প্রত্যক্ষ করেন। ডট পেনের ডগা দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলেন, "ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত সহাবস্থান চোখকে বুঝি পীড়া দিচ্ছে! দেখুন জ্ঞান চর্চ্চার

ভূমিতে গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। অন্তত আমার আমলে। অবশ্য আমার আশঙ্কা নেকস্‌ট জমানায় এ যুক্তি ধোপে টিকবে না।"

ভদ্রলোকের মুখনিঃসৃত বাণী প্রত্যয়পূর্ণ। স্বর ভরাট। পদ মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে ধারাবাহিক যত্ন দ্বারা এ দক্ষতা কি অর্জিত? অথবা স্বভাবগত প্রকৃতি? সুপ্রিয়র ধন্দ লাগে। বোধহয় নিরলস চর্চা এবং স্বভাবগত ঝোঁক উভয়ের সংমিশ্রণ। এই সিদ্ধান্ত আরোপ করে সুপ্রিয় বিশ্লেষণে ছেদ টানে। সাথে সাথে চিন্তার অস্বস্তি থেকে মুক্ত হয়।

কথোপকথনের সময় বক্তার প্রতি মনোযোগ প্রদান প্রচলিত রীতি। সৌজন্যবোধ মান্য করতে সুপ্রিয় দৃষ্টি ছবি থেকে সরিয়ে বক্তার মুখে স্থাপন করেছিল। ভদ্রলোক আপাতত কথন স্তব্ধ রেখেছেন। এই অবকাশে সুপ্রিয় পুনরায় দৃষ্টি উপরে নিবদ্ধ করে। এবার ছবির অন্তরূপ তার অন্তর্লোক স্পর্শ করে মনে হয় যেন ভৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, দাড়ি আকীর্ণ গাল ভেদ করে বিনীত ভাবে জেগে আছে মার্কস-এর চোখ এবং নাক, দৃষ্টি কিছুটা বিষণ্ণ এবং খুব বেশি বিহ্বল। পণ্ডিত প্রবর কার্ল মার্কস, হেথায় আসিয়া কি তুমি পথ হারাইয়াছ। সুপ্রিয় বুঝি আনমনা হয়ে পড়েছিল। সচকিত হয় ভদ্রলোকের আচমকা জিজ্ঞাসায়। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে আসেন ভদ্রলোক, "এ্যাট প্রেজেন্ট ইয়োর ফ্যামিলি কম্পোজিসন?"

সুপ্রিয় শান্ত ভাবে উত্তর দেয়, "মা, এক ভাই এবং এক বোন। তারা দেশের বাড়িতে থাকে। এছাড়া আমাদের তিনজনের নিজস্ব ইউনিট। কলকাতার এসটাব্লিসমেণ্টে।"

"বোন অবিবাহিত? ভাই?"

"বোন ছাত্রী। ভাই কর্মপ্রার্থী যুবক।"

"মধ্যবিত্ত সংসারের কমন পিকচার। মা আছেন, ভাই-বোন আছে, তাদের খাই-খরচ সাধ-আহ্লাদ, অসুখ-বিসুখ আছে। ডোল দিয়ে যেতে হয় প্রতি মাসে, খুব চাপ থাকে, না?" প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চোখ জাগ্রত রাখেন।

শীতার্ত অনুভবে সুপ্রিয়র প্রতিটি রোম খাড়া হয়ে ওঠে। "ডোল" শব্দ বড় অশ্লীল প্রতিপন্ন হয়। তারই পারিবারিক সম্পর্কের ওপর অহেতুক এক পোচ কদর্যতা লেপে দিলেন ভদ্রলোক। অথচ সে বৃহন্নলা হাসি বিস্তারিত করে বলে, "আপনার অনুমান সঠিক। ডোল অবলম্বন করে টিকে আছে আমার মা-ভাইবোন।" বুক ভরা শ্বাস নিলেন ভদ্রলোক। চিবিয়ে

চিবিয়ে বলেন, "স্ত্রী যেহেতু অফিসজীবি সামলিয়ে ওঠেন কোনক্রমে।" তোড়ে আরো কিছু বলতে উদ্যত হয়েছেন, উদ্গত কাশি বাধাসৃষ্টি করে। ভাল করে কেশে ফের বলেন, "আপনি গোকুলের লোক, অতএব ভেতরের কিছু বিষয় জানান দেওয়া প্রয়োজন।"

প্রবলতর কৌতূহলে সুপ্রিয়র দৃষ্টি বিস্ফারিত।

"টিউশন ফি—লেভেল আঁটা পোশাক বাস-বইখাতা-স্টেশনারী ইত্যাদি বাবদ খরচ একশ ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু এই খরচ প্রকাশ্য, ঘোষিত। এ ছাড়া আরো আছে। স্কুলেরই টিচারকে প্রাইভেট টিউটর হিসেবে নিয়োগ করা কমপালশন। আনুষঙ্গিক বাড়তি উপসর্গ আছে বিস্তর। অর্ডার বিহাইণ্ড দ্য স্কিন।" এই অবধি বর্ণনার পর তিনি কথনে যতি টানেন। উদ্গ্রীব হলেন দৃষ্টিপাত দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে, যে, প্রার্থীর মানসভূমিতে কোন এফেক্ট উৎপন্ন হয়েছে কিনা। তিনি নজর করেন আগন্তুকের পাংশু মুখে আতঙ্কের নিশান। তা লক্ষ্য করে তিনি আলাপের গতি ভিন্নমুখী করেন। নম্রস্বরে সুধান, "ফিলিং আন নার্ভড ?"

সুপ্রিয়র অন্তর দ্বিধাদীর্ণ। কৃপাপ্রার্থীর দৃষ্টি। শরণাগত পুরুষটির জন্য ভদ্রলোক দরদ অনুভব করেন। আচমকা উদার হাসিতে ঘর ভরিয়ে তিনি বলেন, "ডোণ্ট ওরি। আরে মশাই আপনার চেয়ে লো ইনকাম গ্রুপের মানুষ দলে দলে এখানে এসে হানা দিচ্ছে। ভিড়েও পড়ছে অনেকে। অবশ্য কি করে যে ম্যানেজ করে দ্যাটস্ এ মিষ্ট্রি—আই মাস্ট সে।"

আবার—আবার সেই ইঙ্গিত। উপরি রোজগারের প্রতি কুৎসিত ইসারা। ঝড়ের মুখে বিপর্যস্ত পাতার মত কাঁপতে থাকে অন্তর। সামান্য সময় মৌনতা দিয়ে অতিক্রম করে সুপ্রিয় আপন মনোভাব ব্যাখ্যাসহ প্রকাশে তৎপর হয়—"আসলে মধ্যবিত্ত আউটলুক থেকে আমাদের নিরন্তর চিন্তা কেমন করে সন্তানদের ভাল শিক্ষা দিতে পারব। দুঃসহ বেকারীর যুগ এটা, ভাল শিক্ষার অর্থ ভাল চাকরি, ভাল চাকরির অর্থ জীবনে সফলতা—"

ভদ্রলোক আড়মোড়া ভাঙেন। উদাসীন হাই তুলে আচমকা ঘোষণা করেন, "এনি ওয়ে যদি রাজি থাকেন ভর্তি করতে পারেন পুত্রকে এই স্কুলে এবং আজই," বলে স্বাক্ষরিত একটি ফর্ম বাড়িয়ে দেন।

কৃতজ্ঞতাবোধ সুপ্রিয়কে অধোমুখী করে। এক হাতের তালুতে অপর হাতের তালু ঘনিষ্ঠ হয়। অনভ্যাসে ঠিক পরিপাটি হাত কচলান হয়ে ওঠে না। সুপ্রিয় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নতশীরে। প্রণত। প্রার্থীর

ঐতিহাসিক ভঙ্গি। কোন ভাষা নয়। দৃষ্টিপাতে চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতার প্রকাশ মূর্ত করে সুপ্রিয় বিদায় নেয়।

বহু পথ ঘুরে যেন অনেক দিগন্ত পার হয়ে সুপ্রিয় অবশেষে ঘরে ফিরে আসে। মৃদু করাঘাতের সাথে সাথে যে ত্রস্ততায় মন্দিরা দরজা উন্মুক্ত করে তা একান্তই সে যে উদ্বিগ্ন এবং প্রতীক্ষার্থী তারই প্রকাশ চিহ্ন। প্রশ্ন করা বাহুল্য। মন্দিরা দাঁড়িয়ে থাকে।

সুপ্রিয় কাঁধ থেকে আদিদাস নামায়। মন্দ্র স্বরে বলে, "তোমার জন্য গ্রেট নিউজ—পিণ্টু ভর্তি হতে পারবে। তোমার আইডল স্কুলে। সব ব্যবস্থা পাকা করে তবে আসছি।"

আনন্দে মন্দিরা নৃত্যের ছন্দে চরণ তুললো, মুহূর্তে সুপ্রিয়র নিকটতমে চলে আসে। হাঁটু জড়িয়ে ধরে মুখটা উর্দ্ধে ভাসিয়ে রাখে। স্নিগ্ধ স্বরে শুধোয়, "সত্যি—ছলনা করছ না তো।"

মৌনতা ঘিরে রাখে পরিবেশ, সুপ্রিয় নির্বাক। চোখ মৃত্যুস্বপ্নে লীন। স্তব্ধ দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র ইয়ার্কির প্রশ্রয় নেই। নিশ্চিন্ত মন্দিরা ত্বরিতে দুহাত জোড়া করে কপাল স্পর্শ করে। যন্ত্রবৎ চোখ মুদিত। মুখে নম্র অথচ স্পষ্ট স্বগতোক্তি, "জয় সন্তোষী মা। অষ্টপ্রহর তোমায় জপ করেছি।"

॥ দুই ॥

এক সন্ধ্যা। সুপ্রিয় বাড়ি ফিরল। সঙ্গে এক ভদ্রলোক। নিচু স্বরে পরস্পর সংলাপ বিনিময় করে। ভদ্রলোক নোটের একটা তাড়া বাড়িয়ে দেয়। সুপ্রিয় তা গ্রহণ করে। না গুণে পকেটে পুরে রাখে। ওরা কথা বলছিল চা খেতে খেতে। এখন কথা বন্ধ। চা পান শেষ। ডীল সম্পন্ন। একই ক্ষণে দুজন উঠে দাঁড়ায়, চলে আসে এক ঢাকা বারান্দায়। বারান্দার কোণ থেকে সুপ্রিয় মোটরসাইকেলটা হাত দিয়ে চালিয়ে চালিয়ে নিয়ে আসে। লোকটার কাছে এসে হাত বদল করে। আগন্তুক কুঁজো হয়ে হাতলটা চাগিয়ে তোলে, নামায়, উবু হয়ে টিপে টিপে বিভিন্ন পার্টস পরীক্ষা করে। পর্যবেক্ষন পর্ব সমাধা করে ঠেলে ঠেলে টু-সিটারটা রাস্তায় নামায়। ভট্ ভট্ শব্দ বাতাসে কম্পন জাগিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পাশে পাশে চলছে সুপ্রিয়। তার পাঞ্জা সিটে হাত বোলাচ্ছে, স্বত্ব নেই। রয়ে গেছে টান। অধিকার বোধ ছিন্ন করতে দ্বিধাগ্রস্ত।

এইমাত্র আলো ছিল। আকাশে এবং মাটিতে। সহসা নির্বাপিত হোল আলোকময়তা। লোডসেডিংয়ে আক্রান্ত হোল চরাচর। সন্ধ্যা প্রয়াণে অন্ধকারের একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম হল। অথৈ আঁধার সাঁতরে ক্রমে অপসৃত হতে থাকে চলন্ত ছবি।

জানালার ফাঁক দিয়ে মন্দিরা সবকিছু ছাখে। বিনা স্থদের লোন থেকে কেনা, বড় শখের জিনিষ ছিল ওর। মাস মাইনে থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে লোন শোধ হচ্ছে। বুক ঠেলে তার কান্না আসে।

দরজা অবারিত ছিল। স্থপ্রিয় নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। ঘরময় বিরাজ করছে শান্ত ভাব। কিছুক্ষণ আগে যেন অনেক আলোড়ন, অনেক কিছু ছিল। এখন নেই, সদ্য সমাপ্ত যাত্রা আসরের মত।

মন্দিরা বোবা দৃষ্টিপাত দিয়ে স্থপ্রিয়কে জড়ায়। থমথমে পরিবেশ, বাতাস প্রবাহন যেন থেমে আছে। উদার হাসিতে স্থপ্রিয় ঘর ভরিয়ে দিল। পরিবেশ হাল্কা হচ্ছে। ঝির ঝির করে বাতাস বইতে শুরু করেছে। হাসি জিইয়ে রেখে স্থপ্রিয় মুক্ত কণ্ঠে বলে, "ওটা বিদেয় করলাম। যত না চলে তার চেয়ে বেশি গলা বাজি করে।"

মন্দিরার মনের সব চাঞ্চল্য মুর্ছিত হয়ে পড়ে। কোন কৈফিয়ত সে শুনতে পায় না। পায়ে পায়ে হংস গমনে কাছে আসে। ঘনিষ্ঠ হয়। বিনম্র মালার মত বাহুদ্বয় গলা বেষ্টন করে। বিনিময়ে স্থপ্রিয় ওর পিঠে হাত রাখে। স্নেহশীল হাতের স্পর্শে অনুভূত হয় শিরার কঠিন অস্তিত্ব। স্থপ্রিয় আফসোস করে, "তোমার শরীর ভেঙে পড়ছে।"

"যা খাই হজম হচ্ছে না।" মাতৃতান্ত্রিক স্বভাবে মন্দিরা দারিদ্র প্রচ্ছন্ন রাখল। "মাছ মাংস ডিম দুধ ফল কিছুই জুটছে না, স্বাস্থ্য কি করে হবে।"

আলো জ্বললো। পুনরায় আলো ফুটল আকাশে এবং মাটিতে। উদ্ভাসিত হল মুখ। এক থালা উপছে পড়া জল টলমল করছে মন্দিরার সারা চোখময়। বিশীর্ণ হাসি হাসে স্থপ্রিয়। ক্ষীণ স্বরে বলে, "উই নীড মোর প্রোটিন।"

দিনাবসানে প্রসাধিত হতে বয়সনিরপেক্ষ সকল নারী অভ্যস্ত। সীমিত উপাদান ব্যবহার করে এই সন্ধ্যায় মন্দিরাও পূর্ণ বিকশিত। মিহি রুবিয়ার হণ্টার নেক ব্লাউজে বুক ছড়ান। গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে এসেছে গাছগাছালি চিত্রিত শাড়ীর বিন্যাস। কাঁধ থেকে প্রবাহিত নির্লোম নগ্ন বাহু। কনুইয়ের একটু ওপরের জমি উগ্র সাদা। ত্বকের স্বাভাবিক বর্ণ নয়, মাদুলির দাগ, এখন মাদুলি পরিত্যক্ত, শ্লীভলেস পরেছে তাই। এক পাশের নাকের

লতিতে ছিদ্র চিহ্ন প্রকট। পূর্বে সেস্থানে গাঁথা থাকত পোখরাজ। রাগে, ক্ষোভে, ব্রীড়ায় এবং অনুরাগ মুহূর্তে ঝিক মিক করত। এ্যালার্জি সংক্রমণে এখন সে বস্তু বিবর্জিত। পাথর নেই। রেখে গেছে তার চিহ্ন। স্বাস্থ্য ঝরে গেছে। রূপ অস্তমিত। টিকে আছে শুধু মুখ। মূল আদল জিইয়ে। যেন ছাঁচে ফেলে হাতের আদরে গড়া। স্থির দৃষ্টি ভাসিয়ে রেখে অপলক মন্দিরাকে দর্শন করে। মন্দিরাকে বড় সরল এবং নিজস্ব লাগে। কোষে কোষে প্লাবিত হয় তীব্র স্বাজাত্য বোধ। দমকে দমকে বাতাস ঢুকছে। ত্বকে ত্বকে বুলিয়ে দিচ্ছে আরামের প্রলেপ, হাওয়ার ঝাপটায় আন্দোলিত স্খলিত পাতলা শাড়ীর উর্ধাংশ। চকিত উদ্ভাস দৈহিক তরঙ্গ। সুপ্রিয় চমৎকৃত। বয়সী নারীর কানে গ্রীবায় আপন মুখ সংলগ্ন করে আর্তস্বর ঝরায়, "দারুণ লাগছে কিন্তু। অন্তত দশটা বছর ঝরিয়ে দিয়েছ।" সুপ্রিয় স্তব করল। প্রশস্তি মন্দিরাতে সংক্রামিত হয়। পুলকে অন্তর দোল খায়। মস্তিষ্ক কেমন ঝরঝরে লাগে। হাসি হাসি মুখ খুশি খুশি গলায় বলে, "সবই বহুজাতিক সংস্থার অবদান।"

সুপ্রিয়র দৃষ্টিতে ঘনিয়ে আসে লোলুপতা, চাউনিতে বিস্তারিত বিহ্বলতা। সদালস কণ্ঠে বলে, "খুব ইচ্ছে করছে চল ছাদে যাই। জ্যোৎস্নায় ভাল করে তোমায় দেখি।"

মন্দিরা চোখ পাকায়। ভুরু কোঁচকায়, "আহা শখ কত।"

ধ্বনির উৎসে তাকায় সুপ্রিয়। প্রশ্রয় নেই। তটের পাষাণে আছাড় খায় তার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। নিবিড় সংগ্রামে সুপ্রিয় অবদমন করে স্নায়বিক ক্রিয়াশীলতা। ধীরে ধীরে মুখময় বিস্তারিত হয় আবছা কৌতুক। দু আঙুলের অগ্রভাগ একত্রিত করে মন্দিরার গালে টোনা মারে, "ডিয়ার তুম বিলকুল বুড্ঢা বন গিয়া—" ঠোঁট সরু করে আলগা বাৎসল্য চুম্বন উৎকীর্ণ করে দেয় মন্দিরার মেচেতা আকীর্ণ মুখে।

উত্তেজনা অবমিত। রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক, বসে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। কখনো ছবি দেখছে, কখনো হেডিংয়ে চোখ বুলচ্ছে। অলস দৃষ্টিচারণ। এক সময় মাথা তুলতে চোখে পড়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরা মুখে ক্রিম ঘসছে। ওর ঐ এক মুদ্রা দোষ। যখন তখন গালে ক্রিম ঘসা। সুপ্রিয় কৌতুক বোধ করে, ইচ্ছে হয় বলে, ম্যাডাম যতই গালে ক্রিম বোলাও, হোমিওপ্যাথ করো—ও দাগ মুছবে না। প্রবল পরাক্রমশালী বয়স থাবা বসাচ্ছে। দেওয়াল ঘড়ি বিলম্বিত গম্ভীর দশটা ধ্বনি দিয়ে গৃহবাসী-দের স্মরণ করায়। এইবার আহার ও বিশ্রামের সময় হয়েছে। মন্দিরা

সচকিত হয়। আয়না থেকে মুখ ফেরায়। বলে, "হাত মুখ ধুয়ে এসো খাবো।"

খাবার আসরে সুপ্রিয় কথাটা পাড়ল, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ।" মন্দিরা চোখ টান করে। ভ্রু সন্ধিতে উঠে আসে অনামিকা, "কি জিনিস।"

"পিণ্টু সব সময় মন মরা, একদম খেলাধুলা করে না।"

মন্দিরা হাঁফ ছাড়ে, "এই কথা, চোখ খোলা রাখ দেখবে চারপাশে যতসব আগামী দিনের চোর-জোচ্চর-মাস্তান-বেকারের দল কিলবিল করছে। ও নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে, সেটা বরং ভাল লক্ষণ।"

সুপ্রিয় মানতে চায় না, "তবু এই বয়সে নিঃসঙ্গ থাকা স্বাস্থ্যকর নয়।"

"ঐ টুকু তো ছেলে। তার প্রতিটি ষ্টেপিং নিয়ে পাহাড় পাহাড় চিন্তা কেন!"

সুপ্রিয় উদ্বিগতা প্রকাশ করে, "মোটে খেলাধুলা করে না। সব সময় বিষণ্ণ। এতটুকু বয়সে এই রকম হবে কেন!"

"হবে না! মাথার ওপর যে রকম পড়ার চাপ তা সামলে খেলায় মন দেবে সে সময় কই।"

"সেটাই চিন্তার বিষয়। খুব খারাপ লাগে। কি কাল যে পড়েছে মন্দিরা। নির্দয় নিষ্ঠুর কাল। এই বয়সে আমরা বই খাতা নিয়ে এত যুদ্ধ করিনি। যাই বল আমরা বাচ্চাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছি। আমাদের স্বার্থে।"

বিস্ময়ে নিনাদিত করে ওঠে মন্দিরা, "আমাদের স্বার্থে? কি বলছ তুমি? যতসব আজে বাজে কথা।"

"—ইয়েস—আমরা আমাদের সন্তানদের মানুষ করাতে চাই আমাদের স্বার্থের ছাঁচে।"

সুপ্রিয়র কথায় শ্লেষ ছিল, তার আঁচ মন্দিরাকে উত্তেজিত করল, "খোটা দিচ্ছ? আমি পিণ্টুর রোজগারের মুখ চেয়ে ওকে মানুষ করতে চাইছি? ভাবা যায়! বিশ্বাস করো আমি ওর রোজগার ভোগ করার প্রত্যাশা করি না। আমি চাই ও বড় হোক। জীবনে সফল হোক।"

স্বভাব ভাবুক সুপ্রিয় নয়। তবু এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ও উপেক্ষা করতে পারে না। চিন্তা বাড়ে। সাথে সাথে যন্ত্রণাও। পূর্ব প্রসঙ্গের জের টানে। সুপ্রিয় বলে, "ওটা কি কম হোল, তুমি ওর রোজগার খেতে চাওনা। তবে অন্য কিছু খেতে চাও।"

"খেতে চাই—অন্য কিছু? কী যে হেঁয়ালি করো।" মন্দিরার কান পুড়তে থাকে। "ওর প্রতিষ্ঠা ওর সম্মান ওর বড় হওয়া। লোকে বলবে অমুকের মা, এই ধ্বনি শোনার জন্য মাতৃহৃদয় তৃষিত থাকে, স্তুতি পেয়ে গর্বিত হওয়ার সুযোগ মেলে অহং বোধ তৃপ্ত হয়, নিটোল পরিপূর্ণ বোধ হয় জননী জীবন। এটা কি কম প্রাপ্তি।" মন্দিরার ঘাড় বাঁকানোর একটা ভঙ্গি আছে। ব্যবহার করে কদাচিৎ। এখন সেই ভঙ্গি দৈহিক ভাঁজে নিরতিশয় রাগ এবং চোখে দুপুর সূর্যের দীপ্তি জাগ্রত করে বলে, "শুধু কথা, কথা, তর্কের শিরোমণি।"

সকাল নটা। মন্দিরা পিণ্টুকে ধরে জামা-প্যাণ্ট খুলতে শুরু করে, "আজ তোমায় ভাল করে চান করাব। গায়ে মাথায় খুব ময়লা জমেছে।" পিণ্টু শরীর তোলপাড় করতে থাকে, জুড়ে দেয় কান্না। মন্দিরার বাহুবেষ্টনির মধ্যে ছটফট করতে থাকে। মন্দিরা দু হাত দিয়ে পিণ্টুর চুলে তেল ঘসতে থাকে। বন্ধন মুক্ত হতে সমস্ত শক্তি জড়ো করে দেহ ঝাপটাতে থাকে পিণ্টু, চান করানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মন্দিরা বাঁকা পথ ধরে। কথার পর কথা সাজিয়ে মায়াজাল বিস্তারে মনোযোগী হয়। উদ্দেশ্য বিভ্রান্ত করে পিণ্টুকে বশে আনা।

"বলতো আমার লক্ষ্মী ছেলে, এটা কি?"

"হেড।"

"এটা?"

"ফোরহেড।"

কপালে উপছে পড়া চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে মন্দিরা, "এগুলো?"

"হেয়ার।"

"এটা?"

"আই।"

মন্দিরা কথা বন্ধ রাখে। মুগ্ধ নয়ন নিবদ্ধ পিণ্টুর চোখে, কান্না অবসানে ভিজে সপসপ করছে চোখ, আহা কি চোখ। গোলাপ যেন কাঁদছে। বড় হয়ে এ ছেলে নির্ঘাৎ অনেককে কাঁদিয়ে ভাসাবে। মন্দিরা ফের শুরু করে, "এটা?"

"ফিংগার।"

"এটা?"

"নোজ।"

গামছা দিয়ে আঙুলের ফাঁকে কানের গর্তে টিপেটিপে ময়লা সাফ করতে
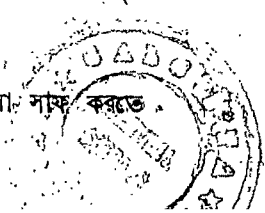
থাকে মন্দিরা। শাসন, আদর, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি সমন্বয়ে ভুলিয়ে পিন্টুকে স্নান করান সম্ভব হল। স্নান পর্ব সমাপ্ত। এবার খাওয়ানোর পালা।

একটা থালায় সব বেড়ে নিয়ে এল মন্দিরা। পিন্টু খাবে, এ এক কঠিন সমস্যা। রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। অবশেষে চন্দ্রসূর্য, গ্রহ-তারা, পশু-পাখি, রাজা-রাণী-রাক্ষস, সব এসে হাজির হয় ভাতের থালায়। মন্দিরার পাতা ফাঁদে পিন্টু আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ে। তার চোখে ঘনায় ঘোর। আবেশে অভিভুত চোখ, চোখ বড় বড় করে পিন্টু কথা গেলে, সেই ফাঁকে সুড়সুড় করে মুখের গর্তে ঢুকে যায় খাদ্য। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে সুপ্রিয় বের হয়ে আসে। রগুড়ে গলায় বলে, "এই যে সাহেবদের খয়ের খাঁ, শেষমেষ দেশজ সংস্কৃতির আশ্রয়ে মুক্তির উপায় খুঁজছে?" বিদ্রূপ মন্দিরাকে বিদ্ধ করে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে অন্যমনস্ক হয়। সেই অবসরে বাহু বন্ধন কিঞ্চিত্ শিথিল, চকিতে পিন্টু ছিটকে সরে যায়, দুপায়ের জাম্প দিয়ে বাবার হাঁটু ধরে, কৌতুহল নিবৃত্তিতে মুখর হয়, "ডারউইন না আদম-ইভ কোনটা সত্যি, ও বাবা বল না গো।"

সুপ্রিয় দ্বিধাশূণ্য। অকুণ্ঠ উচ্চারণে বলে "ডারউইন।"

এক লাফে পিন্টু মায়ের কাছে আসে, হাত ধরে টানে, উত্তর চায়, "মা তুমি?"

মন্দিরা দ্বিধায় জড়ায়। কি উত্তর দেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দোমনা, ব্যালেন্স করে, "আন্টি কি বলে?"

পিন্টুর চটপট উত্তর, "আন্টি বলে ডারউইন এবং আদম-ইভ দুটোই সত্যি।"

সুপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত ঘোষণা করে, "নো। ইয়োর আন্টি ইজ রং। আদম-ইভ রিলিজিয়ান ইজ মীথ। ডারউইন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার, মেটিরিয়াল ট্রুথ। নীরব ভর্ৎসনায় মন্দিরা দৃষ্টি ছড়াল, "অহরহ ছাত্র-শিক্ষক টাসেল চলছে। তুমি আবার ইন্ধন যোগাচ্ছ।"

"তা বলে ডারউইন হেরে যাবে পোপের প্রচারে! ভাবা যায়?"

বাইরে বাস অসহিষ্ণু হর্ণ দিচ্ছে। আঁটসাট পোশাকে টাই এঁটে দিল মন্দিরা। হাঁসফাঁস করছে পিন্টু। মন্দিরা ছেলের হাত ধরল। লম্বা লম্বা পা ফেলে টেনে নিয়ে চলল, তার গর্বিত পদপাতে দ্যুলোক ভুলোক কাঁপে। মন্দিরার পেছনে পিন্টু, পিন্টুর পেছন পেছন টিফিন কৌটো এবং বই-খাতা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে দ্রুত লয়ে কাজের মেয়েটি। শৈশব বঞ্চিত আর এক শিশু।

দৃপ্ত পদক্ষেপে পিণ্টু বাসের গর্ভে প্রবেশ করে। বাসের জানালায় সার সার কচি কচি মুখের উদ্ভাস, উজ্জ্বল একঝাঁক নবজাত পুষ্প, নবনীত হাতে লাল, নীল সবুজ রুমাল। রুমাল পতপত করে ওড়ে, বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য পাখি একসঙ্গে ডানা ঝাপটায়।

॥ ৩ ॥

স্বপ্রিয় আফশোস করে, "বিশেষ হতে শেখানো, বিশিষ্ট করার সাধনা বড়ই মর্মান্তিক।" মন্দিরার ভ্রুভঙ্গিতে জেগে ওঠে শ্লেষ, ওষ্ঠদ্বয়ে অভিমানী বক্রতা, "তোমার সায় ছিল না?" অভিযোগ খণ্ডন করতে স্বপ্রিয় কোন প্রেরণা অনুভব করে না। মন্দিরার অভিযোগ কিসে নিজের মধ্যে শোষণ করে নিতে উৎসুক? যেহেতু জন্মান্তর প্রচেষ্টার সন্ধিকালে তার বিরোধী ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। পরিস্থিতির তাঁবেদার হয়ে গিয়েছিল সে।

কোন কৈফিয়ত দেওয়া নিরর্থক, আসলে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আমরা আমাদের সম্পর্ক আক্রান্ত, বিজ্ঞাপনী জগৎ এর উৎপত্তিস্থল। চমকপ্রদ ভাষা এবং ধ্বনিবিলাপের নিরবিচ্ছিন্ন দাপট চিন্তাশক্তিকে দেউলে করে দেয়। ফলে সম্পর্কের ভিৎ, সম্পর্কের গড়ন, সম্পর্কের বহুমুখী প্রসারতা বিপর্যস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বাণিজ্যিক পুঁজির কাছে রুচির স্বাধীনতা পরাজিত। মানবিক সত্তা ক্রীতদাস হয়ে পড়ে, অর্থতন্ত্রের বিস্তারিত স্বর্ণজালে, আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে বুঝি না। তুমি আমার মন বোঝ না। চিন্তার সন্ধান পাও না।

আমি তোমার আকাঙ্ক্ষার তল পাই না, কল্পলোকের শরিক হতে ব্যর্থ হই।

সন্ধ্যা নামলেই মেয়েরা তাড়া অনুভব করে জলের সঙ্গ লাভ করতে। মন্দিরা উসখুস করে, তাড়না বোধ করে গা ধোয়ার। মনোগত ইচ্ছে কার্যকর করতে মন্দিরা উদ্যোগ নিলে স্বপ্রিয় প্রস্তাব রাখে, "চলো একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে?" অনুরূপ অভিলাষ মন্দিরাতে সংক্রামিত হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়। চোখে আকুতি জাগ্রত রেখে জানান দিল আমি তৈরী হচ্ছি।

শূণ্যঘরে স্বপ্রিয় ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে। মন্দিরা ফিরে এল। বেশ তরতাজা। মুখ-চোখ কপাল হাতের অনাবৃত অংশ তকতক করছে, প্রচুর জল সাবান ব্যবহারের অবদান। মন্দিরা আড় চোখে স্বপ্রিয়কে দেখল, স্বপ্রিয়র মুগ্ধ দৃষ্টি তারই প্রতি নিবদ্ধ। মন্দিরা বলল, "চোখ বোজ।"

স্বপ্রিয় নাড়া খায়, "কেন?"

মন্দিরা চোখ পাকায়, "নো কোশ্চেন।" স্বামীর সামনে বিবসনা হতে

আজো. মন্দিরার সংকোচ, ব্যতিক্রম অন্ধকারে। সুপ্রিয় চোখ বোঁজে। দেয়ালের দিকে মুখ করে মন্দিরা পোশাক পরিবর্তন পর্ব সমাপ্ত করে।

খুশি খুশি মন্দিরা পথে নামল। পাশে পাজামা-পাঞ্জাবীতে সুপ্রিয়। বোঁটা থেকে চুন জিভে টেনে নেয় মন্দিরা। গালের একপাশ ঢিবি হয়ে আছে। পরমুহূর্তে আর এক পাশ। চোয়াল নড়ছে। সুপ্রিয় বিরক্ত হয়, "সব সময় কি যে কচর মচর করো। জর্দা খয়ের চিবিয়ে চিবিয়ে পেট তো অম্বলের ডিপো, দাঁতে ঘুন, মাড়ি সরে যাচ্ছে। সুপ্রিয় ক্ষোভ প্রকাশ করে, "একদম বুড়িয়ে গেলে।" পিচকিরি দিয়ে রঙ ছিটানোর মত মন্দিরা পানের পিক ফেলে। প্রবীন গিন্নীর আদলে মুখ চিবিয়ে ট্যারা চোখে তাকায়।

আলোকিত পৃথিবীতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত জনগণের পদযাত্রা। অগ্রগমন অসম্ভব। সুপ্রিয় ও মন্দিরাকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হয়। উপায় নেই। রাস্তার ধার ঘেঁসে চাপ চাপ মানুষ। হাতের কাজ ফেলে অন্তঃপুরের নারীরা ছুটে এসেছে। বাড়ির ঝুল বারান্দায়, জানালার গ্রীলে, ছাদের আলসেতে উপচে পড়া মানুষ ভাসন্ত মুখ।

দুলে দুলে মন্থর চালে মিছিল আসছে। প্রথমে লরি। পেছন পেছন পরস্পর সাইকেল ভ্যান। তার উপর এক এক করে দেব-দেবীর মূর্তি। দুপাশে শ্রেণীবদ্ধ কিছু মানুষ। মাথায় গ্যাসের আলো এবং কাঁধে স্থাপিত স্টিক আলো নিয়ে বহমান। লরী ঘিরে সাইকেল ভ্যান ঘিরে টুনি বালবের ঝাড়, আলোক সম্পাতে পদ্মফুল, ব্যাটিংএ গাভাসকর, জলদায়িনী নারী ইত্যাদি। আলোর চমকানিতে ধরণীতে আঁধার বলে কিছু নেই। বর্ণাঢ্য রঙিন মিছিল বহমান। লাল পাজামা এবং জামায় বেশ কয়েকজন বাজনাদার। কয়েকফুট ব্যবধান রেখে মেদল শরীরে আদ্দির শুভ্রতায় ক্লাবের মাথাসকল। অনুবর্তী সাধারণ সদস্যবৃন্দ। চলতি ফিল্মের গানের সুর উঠল ক্লারিওনেটে, গেট, বিউগল, পেস্টিন, ম্যারাকার্স বেজে উঠল। বাজনার তালে তালে নাচ হচ্ছে। তরুণরা নাচছে। তেড়ে ফুঁড়ে সামনে এগিয়ে আসছে হাঁটু কখন বা কোমর। রক্তলোচন। পুলকিত কিন্তু ক্লান্ত মুখশ্রী। দক্ষিণ থেকে আসা হাওয়ায় চুল আলুথালু। চোখ ও কান আবৃত বিপর্যস্ত চুলে। পা টলমলো, মিছিলে নারীও আছে। তার মধ্যে একজন সূর্যকিরণের মতো ঝলমল করছে। সে নাচছে। তার নিতম্ব হিল্লোলিত। যেন মৃদঙ্গে বোল পড়েছে। স্পট লাইটের আলোয় ঘাম-তেল মুখ বৃষ্টিতে ভেজা পাথরের মত চিকচিক করছে। চুল সোজা নেমে এসে ভূমি স্পর্শিত। একটা কালো রেখা। উন্মত্ত ছন্দহীন অঙ্গ সঞ্চালন এই

কি নাচ? প্রকৃত নাচ সে যে বড়লোকী। বিলাসিতা। বিস্তর পয়সা প্রচুর সময় টেনশন ফ্রী প্রাত্যহিকতা খরচ করে বিনিময়যোগ্য নৈপুণ্য অর্জন করতে হয়। অত অর্থ অত অবসর কোথায় সাধারণের? এখানে গতিই রূপ। উচ্ছ্বাসই সৌন্দর্য। বাজনা থামল। বাজনাদারদের হাতে ঝুলছে বাজনাযন্ত্র। বিশ্রামান্তে তাদের মুখ উদাসীন। বাঁকা পায়ে হাঁটছে। বাতাস কাঁপিয়ে বলিষ্ঠ শ্লোগান উঠল, "দুর্গা মাইকী," সমস্বরে ধুয়ো দিল, "জয়—"। "যাচ্ছে কারা?" উত্তরে বাতাসে কাঁপন জাগল, "যুবক সংঘ।" কদম কদম পা বাড়িয়ে কখন বা অতর্কিত দ্রুততায় মিছিল বহমান। মিছিলের দুসারির মাঝখানে যে ফাঁকে সেখানে এসে এক কিশোর দাঁড়িয়ে পড়ে। তার হাতের অবলম্বনে ধুনচি, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক ঝাপসা, অস্পষ্ট সব মুখায়ব। শূণ্যে হাতের পাক দিয়ে দিয়ে সে নাচছে। প্যাণ্টের প্রান্ত হাঁটু অবধি গোটানো। খোলা চোখ, কোল বসা, কপালে লাল ফোঁটা যার আঁচড় বাড়তি উৎসাহে নাকের ডগা অবধি বিস্তৃত। হাত-পা-মুখের বিচিত্র মুদ্রায় শরীরে মোচড় দিয়ে দিয়ে সে নাচছে। মিছিল প্রবাহিত। গতি অতীব মন্থর। মোড়ের মুখে এসে নৃত্যরত কিশোর চীৎকারে চরাচর বিদীর্ণ করল, "ঠাকুর মাইকী।" বজ্র নিনাদে ঐক্যতান ধ্বনিত হল, "জ-য়-।" শ্লোগান থামল। স্তব্ধ হল পরিবেশ।

চমকে ওঠে সুপ্রিয়। তার মুখে কে যেন একপোঁচ কালি লেপে দিল। কোনক্রমে সে তার আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে ধরে মন্দিরার প্রতি। আঁৎকে ওঠে, যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রান্তরের মত রিক্ত বীভৎস কুৎসিত হয়ে উঠেছে সে মুখ। জীবনের সব আশা স্বপ্ন আর সান্ত্বনা মাড়িয়ে থেৎলে দিয়ে গেল। মিছিলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ, নিমগ্ন, অন্তর ছিন্নভিন্ন। সমগ্র সত্ত্বা কাঁপনে তোলপাড়, সুপ্রিয়র ধমনী-ব্যেপে রক্ত চলাচল দ্রুত চাপ বৃদ্ধি করে। বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে স্ত্রীকে জড়ায়।

যে প্রবাহমানতা কিঞ্চিত এলিটবাদির শোক তাপ শূণ্য নিটোল জীবনের প্রতি লুব্ধতা, মোহ এবং অসামাজিক স্বাতন্ত্রবোধ অবরোধ সৃষ্টি করে মাত্র কিন্তু স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয় জীবনের গতি। হয়ত তার ধারা কখন ধীরে মন্দাক্রান্ত কখন বা শীর্ণ বা আঁকাবাঁকা তবু অস্থির এবং গতিশীল।

সুপ্রিয় সুস্থির, শান্ত। সব সংশয় সব দুঃখ উত্তীর্ণ করে তার মুখ এখন দ্বন্দ্বশূন্য। ঠিক মায়ের মুখের মত। আপাত শান্তি কল্যাণ প্রার্থনায় না প্রসন্ন না বিষণ্ণ। বিপ্রতীপে মন্দিরা চিত্রাপ্রিত। থম থম করছে মুখ। যেন হিমালয়ের বুকে সন্ধ্যা নামছে। ক্রমশ গাঢ় বিষাদে ছেয়ে যাচ্ছে মুখ। চোখ শুকনো। কিন্তু আষাঢ়ের গাঢ় মেঘের মত গম্ভীর। এই বুঝি অবিরাম ধারা ঝরবে।

মিছিল নির্লিপ্ত। টাল খেয়ে খেয়ে বয়ে যাচ্ছে। ভাসন্ত উৎসবে পিণ্টুর মাথা এই ভাসে এই ডুবে যায়। ক্লীন্ন স্বরে সুপ্রিয় শূণ্যতার হাহাকার প্রকাশ করে, "ত্যাখ তু চোখ ভরে ত্যাখ।"

উত্তরবাংলার লোকসমাজ ঃ দেশী-পলি ক্ষত্রা

শিশির মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

দেশী ও পলিদের জাতিকর্ম ও বিবাহ আচার

সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতির গ্রন্থবিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় মানুষের বৈশিষ্ট্য—সে প্রতি নিয়ত নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করে। সাংস্কৃতিক হিন্দুত্ব যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। সাংস্কৃতিক হিন্দুত্বের এমন একটি শক্তি আছে যে আদিবাসী সমাজ তাকে আশ্রয় এবং সংমিশ্রিত করে দাঁড়াতে চায়। এই রীতিটিই হল প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানীর ভাষায়' Sansakritization.'

দেশী পলি সমাজেও জন্ম-বিবাহ মৃত্যুতে আদিতে কোন বেদবিধি না থাকলেও ধীরে ধীরে বর্ণহিন্দু দ্বারা প্রভাবিত ও Sanskritization এর ফলে সন্তান ক্রম বিষয়ক বেশ কিছু ক্রিয়াকর্ম পালিত হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় এইসব ক্রিয়াকর্ম পুরোপুরি বর্ণহিন্দু প্রথা অনুসারী নয়। বরং নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুসারী।

দেশী পলি সমাজের ধারণা যদি সোমবার পুত্র এবং বুধবার কন্যা জন্মে, শুভ। এই কারণেই বিয়ের সময় ছেলেকে সোমবার ও মেয়েকে বুধবার বিদায় দিতে নেই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সমগ্র আচারের নাম 'পান্টি'।

সন্তান যে ঘরে জন্মে সেই ঘরকে বলে কোণঘর। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর ডাম্মা (দাই মা) দ্বারা সন্তানের ফুল এবং নাড়ি 'ছুরকানি' দ্বারা কেটে (যদি কন্যা সন্তান হয় তবে দরজার ডান দিকে একসঙ্গে ধাপের (বারান্দার) নীচে পুঁতে রাখে। কোণঘরের দরজার সামনে একটি 'সিজ' গাছ পুঁতে রাখা হয়। সন্তানের মায়ের 'নাড়' সিন্দুর বা মুষ (পোড়াছাই) দিয়ে মাখিয়ে কাটতে হয়।

সন্তান হওয়ার পর যদি তার মাকে কোন কারণে বাইরে যেতে হয় তবে ঝাঁটার ৫টি কাঠি (কেলাইন) নিয়ে বাইরে যেতে হয়। সমাজের বিশ্বাস এতে কোন 'দোষ ছুষি' লাগে না। সন্তানের গলায় ডাম্মার বচ (একরকমের গাছ) ও হলুদের চাকা মালা তৈয়ারি করে পরিয়ে দেয়।

তিনদিন বা চারদিন কোথাও পাঁচদিন পরে 'কামান কুছিয়া' করা হয়।

কুছিয়ার দিন সন্তানের মাকে বাড়ির অন্যান্য এবং গুতিয়াকে (জ্ঞাতি গোষ্ঠী) খার করতে হয়।

কুছিয়ার নিয়ম ঃ—দু'টি গোবরের গুলির উপর পাঁচ দূর্বা একটি পান সুপারি 'পুহাতি'র দেয়ালে গেঁথে দেয়। আতপচালের গুঁড়োর 'টশনা' খেরক' দ্বারা ভাড় করে একটা ঘটির মধ্যে দুধ জল সহ দেওয়া হয়। পাঁচজন মেয়ে দ্বারা একটি চুয়া (ইঁদারা) কে সরষের তৈল সিঁদুর দিয়ে লেখন করাকে বলে চুমানো বা গুজিয়া। গুজিয়া করার পর পাঁচবার ঘটির জল হুলুধ্বনি সহকারে চুয়ার মধ্যে ঢেলে দেয়। এরপরে একটি তালার মধ্যে 'অশুসি পাশুসি' বা পাঁচ শস্য দূর্বা দিয়ে সাজিয়ে নবজাতককে তার মধ্যে শুইয়ে বাড়ির তুলসী মঞ্চের সামনে কিছুক্ষণ রাখা হয়। তারপর গারাম দেবতার কাছে পান সুপারি সহ পুজো দিয়ে নবজাতককে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘরে নবজাতকের মাথার সামনে একটি কালির দোয়াত খাতা ও কলম রাখা হয়। চাল পুড়িয়ে জল দিয়ে গুলে কালি তৈরি করা হয়। গয়েচ (কলম) বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি।

গারাম দেবতা পুজো করে নবজাতকের মা মেয়েদের হাতে তেল দেয়। এক ঘটি জল কুয়ো থেকে তুলে ঘরে রেখে দেয়। নবজাতক যদি ছেলে হয় তবে বাড়ির অন্যান্যদের কোলে করতে দেয় নবজাতকের মা। মেয়ে হলে দেয় না।

'পালি বউ' অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ নাপিত নবজাতকের মাথা মুড়িয়ে দেয়। নবজাতকের পিতারও দাড়ি কামিয়ে দেয়।

এই সমস্ত নিয়মাদির নাম কুছিয়া।

পলিয়াদের কুছিয়া করার পরই সন্তানের নামকরণ হয়। কিন্তু দেশী সমাজে এই কুছিয়া বা মস্তক মুণ্ডনের ১৫ দিন পরে সন্তানের নামকরণ হয়। সন্তানের জন্মের তিন মাস পরে মুখেভাত।

নামকরণ রাজবংশীদের মতোই। অর্থাৎ যে মেয়ে জন্মকালে খুব জ্বালিয়েছে সে মাতো। যন্ত্রণা দেওয়াকে সাতানা বলে। হিন্দীতেও ওই একই শব্দ ব্যবহৃত। খুব বক বক করে কথা বলে যে মেয়ে সে টাকো। জ্যোস্নাপক্ষে সে জন্মেছে তার নাম জোনাকু। অন্ধকার রাতে জন্মালে আন্ধারু। ঘোর বর্ষার মধ্যে জন্মালে ঝরু। মেয়ে হলে ঝরি।[২]

এই বিষয়ে ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের প্রাপ্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। দেশী পলিয়াদের নামকরণে বিশেষত্ব কিছু নেই।

ছেলের চুল মাঝে মাঝেই কেটে ফেলা হয়। অবেশষে ৫।৬ বছর বয়সে যখন চুলে জুটো বা জটা ধরে তখন আবার আনুষ্ঠানিক চুল কাটা হয়। তার নাম চূড়াকরণ।

এবার বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা বলি।[৩] যদিও এই বিবাহ অনুষ্ঠান রীতি নীতি কোচ রাজবংশীদের মতোই। তবু কিছু বিশেষত্ব দেখা যেতে পারে।

বিবাহ অনুষ্ঠানও কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত।

১। নিয়মিত বিবাহ[৪] (২) অ-নিয়মিত বিবাহ।

(১) নিয়মিত বিবাহ ঃ—কারোয়া বা কারুয়া ক্ষেত্রে জামিয়া কইনার বাবার কাছে যায়। কনের বাবাকে বলেন, 'এইবার বেয়া লাগাবেন'। 'কুইনা' বা 'কুইনার' বাবা বলেন 'বর ঘরিয়া থাকেতে নিয়ে আয়'।[৫]

এরপর বর ঘরিয়া বা পাঁচজন আসেন কনে দেখতে। কনে দেখতে যাবার দিন কইনার মা এককাঠা ধান মেপে রাখেন। ঐ দিন কনে দেখতে যাবার পথে কোদাল কাঁধে বা বাঁশ কাটার জন্য কোনো কুড়ুল কাঁধে লোককে অথবা কাউকে যদি কাপড় কাচতে দেখা যায় তাহলে এই সমৃদ্ধ অশুভসূচক বলে গণ্য করা হয়।

বর ঘরিয়াদের পূর্ব বা পশ্চিমে বিছানা পেতে বসতে দেওয়া হয়। যদি বর ঘরিয়াদের পূর্ব দিকে বসতে দেওয়া হয় তবে কইনা পক্ষ কনেকে পশ্চিম ঘর থেকে সাজিয়ে নিয়ে আনবে। এই কাজটা করবে 'সমাজের মাগী'। এখন কইনার বৌদি বা বিবাহিতা সধবা দিদি সমাজের মাগীর কাজ করে। কনে উপস্থিত বর ঘরিয়াকে প্রণাম করবে। দেশী পলিদের ভাষায় 'ভক্তি' দেবে। বরঘরিয়া কইনাকে ঘর গেরস্থালী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে। কইনা তার উত্তর দেয়। বরঘরিয়ারা কইনাকে দেখার জন্য টাকা দেবে। কইনা দেখার কাজ শেষ হলে কইনা পুনরায় ভক্তি দিয়ে 'সান বা সামাজের মাগী'র সঙ্গে বর-ঘরিয়াদের দক্ষিণ পার্শ্ব ঘুরে পশ্চিম ঘরে ফিরে যায়। বরঘরিয়াদের ভাত ছাড়া চিঁড়ে মুড়ি বা অন্য কোনো খাবার দেওয়া হয়। বরঘরিয়ারা রাত্রিবাস না করে বাড়ি ফিরে আসে।

এরপর 'শুভ' বা অশুভ পড়ার জন্য দিন অপেক্ষা করা হয়।

প্রথম 'শুভ' বা 'অশুভ' কইনা দেখতে আসার সময় প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায় 'শুভ' বা 'অশুভ' কনে দেখে ফিরতি পথে।

তাছাড়া, (১) কনে দেখে যাওয়ার দিন থেকে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে যদি কাঠার ধান না বৃদ্ধি পায় তবে এ বিয়ের সমৃদ্ধ অশুভসূচক বলে গণ্য হয়।

(২) যদি উপর পক্ষের বাড়িতে কুয়োর বালতি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায় তবে অশুভ। (৩) উভয়ের বাড়িতে যদি কোনো মাটির হাঁড়ি ভেঙ্গে যায় বা (৪) কারো রক্তপাত হয় কিংবা (৫) কোনো প্রকার জীবহানি ঘটে তবে, এই বিবাহ সম্বন্ধ অশুভসূচক।

উভয় পক্ষেই 'শুভ' পড়লে বরঘরিয়া পুনরায় কনের বাড়িতে আসে মিষ্টি নিয়ে। কারোয়া কইনার হাতে এসে শুভর পান দেয়। এই বরঘরিয়াদের সঙ্গে থাকে সামান বা সমাজের প্রধান ব্যক্তি,[৬] পাত্র স্বয়ং অথবা পাত্রের ভাই। ঐসময় পাঁচ অথবা সাতজন ব্যক্তি কইনা বাড়ি যেতে পারেন। এরপরে হবে বিয়ের 'দরহ' অনুষ্ঠান। অর্থাৎ বিয়ের সম্বন্ধ দৃঢ় করা হয়।

এই 'দরহ' অনুষ্ঠান হয় উভয় পক্ষের সমাজের উপস্থিতিতে। বর-ঘরিয়ারা সামানের জন্য পৃথক মিষ্টি নিয়ে আসে। আবার কইনা কইনার মা-বাবার জন্য পৃথক মিষ্টি।

এই 'দরহ' অনুষ্ঠান হয় রাতে। দরহর সময় কইনা একটি মাটির ঘট নিয়ে আসে। ঘট মাটিতে রেখে বরঘরিয়াসহ উপস্থিত সবাইকে সে 'ভক্তি' দেয়। বরঘরিরা কন্যার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি তুলে দেয়। সে ওই মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে পুনরায় প্রণাম করে 'সমাজের মাগী' সহ চলে যায়। এই সময় বরঘরিয়াদের সঙ্গে দইয়ের হাঁড়ি, চিঁড়ে, চিনি, কলা নিয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে দু'জন ব্যক্তি যায়।[৭] দরহর দিনই আশীর্বাদ। কইনার হাতে হাঁসুলি বা পেচা বালা (রুপার বা সোনার) দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়।

এরপর বিয়ে বা বেহার দিন স্থির হয়। এর নাম ধরবা। কারোয়া সহ বরঘরিয়ারা আসে। সে সময় সাইভে চাড়িয়ে মাছ, মিষ্টি হলুদ মাখানো কতকগুলো সুপারি দিয়ে আসে। হলুদ মাখানো সুপারিগুলো নিমন্ত্রণ দানের উদ্দেশ্যে যার যার হাতে দেওয়া হয় তারাই নিমন্ত্রিত হিসাবে গণ্য। মাছ, মিষ্টি দেওয়া হবে কনের হাতে। সেই দিনটি কইনা পণ স্থির করা হয়। বরঘরিয়ারা এই পণ দেবে কনের বাবাকে।[৮] তিরিশ থেকে তিনশ টাকা পর্যন্ত পণ হতে পারে। গহনা, এমন কি জমিও এই পণের সঙ্গে দেওয়া হয়। এইজন্য এর আরেক নাম কইনা ব্যাচা। যে পিতার অনেক মেয়ে তার অনেক টাকা লাভ হয়। সে তখন বলে, 'মুই কই না বেচায়া খাচু'। অনেক সময় অর্থ ও সম্পত্তির লোভে কইনার বাবা বৃদ্ধ, খোঁড়া, কিংবা অন্ধ পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়। দেশী পলিদের রচিত নানা গানে এই রকম ঘটনায় কনের মনোবেদনার পরিচয় আছে।[৯]

বিয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই সামানের মর্যাদা উল্লেখযোগ্য। উভয় পক্ষেই পান সুপারি দিয়ে সামান ধরা হয়। এই সামানের আরেক নাম মহৎ।

এবার বিয়ের অনুষ্ঠান। আজকাল কনের বাড়িতে পাত্র পালকিতে চড়ে বিয়ে করতে আসছে। পূর্বে পাত্রপক্ষ কনেকে পালকিতে তুলে নিয়ে যেত। যারা পালকিতে করে কনে নিয়ে যেত তারা বিত্তবান শ্রেণীর। দরিদ্র শ্রেণীর বিয়েতে কনের বইনোই কনের পিঠে করে পাত্রপক্ষের বাড়িতে নিয়ে যায়।

কনের বাড়িতে বিয়ের স্থানকে বলে থানি। সেখানে খুঁটির সাহায্যে পাল খাটানো হয়। চারকোণে চারটি কলাগাছ পুঁতে পাটের সুতো দিয়ে সামনের দিকটা খোলা রেখে ঘেরা হয়। সেই সুতুলিগুলো আখের পাতা দিয়ে সাজানো থাকে। একে বলে মাণ্ডুয়া। জলপাইগুড়ির রাজবংশীরা বলেন 'মাড়োয়া'।

পলিয়াদের বিয়েতে কাঁচা হলুদ বেটে পাত্র বা পাত্রীর গায়ে মেখে দেয়। কিন্তু দেশীদের বিয়েতে হলুদের ব্যবস্থা নেই। সেখানে কাশাই নামে একটি গাছের গুঁড়ি আগুনের তারিয়ায় বা শিখায় পুড়িয়ে ঢেঁকিতে গুঁড়ো করা হয়।

দেশী মেয়েরা (আয়রাতি বৈরাতি) দলবদ্ধ ভাবে গান করতে করতে জঙ্গল থেকে কাশাই খুঁড়ে নিয়ে আসে। কাশাই খুঁড়ে নিয়ে আনার নাম 'কাশাই খুঁড়া'। কাশাই রোদে শুকিয়ে পোড়ানোর নাম 'কাশাই কুটাগীত'। দেশীদের পাশাপাশি বাস করার ফলে পলিরাও কাশাই কোটেন। তবে উদুখলের মধ্যে মুষলদণ্ড বা গাহিন দিয়ে। এই কাশাই তেলের সঙ্গে মিশিয়ে পাত্রকে মেখে দেওয়া হয়। একে বলে 'তাকুয়ার কুর কাশাই'। এরপর একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে একটা বিন্নার খোপ দেওয়া হয়। তার উপর একটা শিল পাটা দিয়ে বসানো হয়। ভগ্নিপতি (বোহনই)র কোলে চড়ে পাত্র সেখানে দাঁড়ায়। গুরুজনেরা ঘটে করে পাত্রের মাথায় জল ঢেলে দেয়। স্নানের পর পাত্রের মাথায় একটি চাদর ধরে বোহনাই তাকে কোলে করে ঘরে নিয়ে আসে।

বিয়ে করতে যাবার আগে পালকিটাকে তেল সিঁদুর দিয়ে পুজো করতে হয়। পাত্র সাজগোজ করে অর্থাৎ মাথায় সাদা পাগড়ি গায়ে চাদর, পরনে কোছা কাছা সহ ধুতি। ধুতির কোছা হাঁটুর সামান্য নীচ পর্যন্ত ঝুলে থাকে। হাতে দর্পণ, ছুরি, একজোড়া সুপারি, আম্র পল্লব, তুলসী পাতা, ধানের শীষ ও কয়েক গাছি দূর্বা। হাতের দ্রব্যগুলো দর্পণের বাঁট সহ বাঁধা থাকে। কোছায় একছড়ি কলা থাকে। তাকে বলে 'কোহভুন্নি কলা'। সঙ্গে থাকে "বাসুয়া' সাজগোজ করে বরপাত্র সর্বপ্রথম গায়ের গারাম দেবতা পুজো করতে

যান। গারাম কোন বিশেষ দেবতা নন। বহু দেবতার সমষ্টি। তারপর গিয়ে পালকিতে ওঠেন। বরের মা পালকিতে ওঠার আগে বরণডালা দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

কাশাই খুঁড়া থেমে আরম্ভ করে বরের স্নান পূজা পালকিতে চড়া সব ক্ষেত্রেই সমবেত মেয়েরা (আয়রাতি বৈরাতি) দলবদ্ধ হয়ে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে নাচ গান্ করেন।

কইনাবাড়ির দরজায় বরের পালকি (দোলা) আয়রাতি বা কইনা বাড়ির এয়ো নারীরা আটকান। এঁকে বলে 'আগুয়ারী টেকা'। বরের নামে নানা কটূক্তি করে নাচ গান করতে থাকেন। 'বয়রাতি', বারোয়া বাস্থয়া অনেক অনুরোধ উপরোধ করে বেশ কিছু টাকা দিলে মেয়েরা পথ ছেড়ে দেন। পালকি কইনার বাড়িতে প্রবেশ করলে কইনার বা 'সামাজের' মাগীদের নিয়ে পালকির মাথায় পাঁচবার সরষের তেল সিন্দুর দেন। 'চেরাগবাতি' ছোঁয়ান। পালকি থেকে বরকে হাত ধরে নামান। তার আগে থেকে অবশ্য বরের পালকির দরজায় সমবেত 'সামানীরা' পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কটূক্তি পূর্ণ গান গাইতে শুরু করেন।

বর পাল্কি থেকে নামলে এই সব' আয়রাতি' 'সামানী' 'দু'পাশে দাঁড়িয়ে কোমরের উপরের শরীর ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে ঐ সব গান গাইতে থাকেন। বরকে সর্বপ্রথম নিয়ে যাওয়া হয় ভেতর বাড়ির তুলসীমঞ্চে। বরপক্ষের গহনাদি একটা থালার মধ্যে পানসহ একজন 'মাসানী' কইনার বড়দিদিকে নিয়ে তুলসী মঞ্চের সামনে কইনাকে পরিয়ে দেয়। তারপর বরকে 'মাগুয়ায়' নিয়ে গিয়ে পূর্বদিকে মুখ করে একটি কলা গাছের সামনে দাঁড় করানো হয়। কইনার বোহনাই বা বড়দি কইনাকে কোলে করে মাগুয়া তলায় নিয়ে আসেন। সঙ্গে থাকেন 'মাগী' বা 'বেছুয়া'। তারা পাঁচজন জলপূর্ণ ঘট ও আম্রশাখাসহ মাগুয়ায় আসেন। এরপর ঘরের চারপাশে কইনা আতপ চাল ছিটিয়ে দিতে দিতে পাঁচ পাঁক ঘোরে। বর তার কোছায় আতপ চাল কইনার মাথায় দেয়। কইনা বরের পায়ে সেই চাল ঢেলে দেয়। এই রকম পাঁচ পাঁকে পাঁচবার করা হয়।

একজন গোঁসাই বা মালাকার নাম-মন্ত্র ও আমের শাখা দিয়ে কন্যা-বরের হাতে জল ঢেলে দেয়। বর ও কনের হাতে একটি পান সুপারি দেওয়া হয়। কইনার বাবা দানপত্র নিয়ে এসে দেন। লক্ষণীয় কোন শুভদৃষ্টি বিনিময় নেই।

বিয়েতে সিন্দুর দান প্রচলিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নিযুক্ত হচ্ছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে দেশী-পলিদের বহু বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছি। কালিয়াগঞ্জ থানার সুরমা গ্রামে দেশী সম্প্রদায়ের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত মৈথিলী ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে যে উত্তর পেয়েছিলাম তা থেকে বুঝেছি। Sanskritization এর ফলে বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেক কিছুই যুক্ত হয়েছে—কিন্তু বর্ণ হিন্দুর অনুযায়ী পুরোপুরি নয়। কামরূপী মৈথিলী ব্রাহ্মণরা ধীরে ধীরে বর্ণহিন্দুর বেদবিধি যুক্ত করার চেষ্টা করছেন।

এ পর্যন্ত নাপিতের কথা বলা হলা হয়নি। বলাবাহুল্য, বিয়েতে নাপিত বা নাট এর উপস্থিতি আবশ্যিক। সে পাত্রের ক্ষৌরকর্ম করে, পাত্রীর নখ কাটে এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে।

বিয়ের পরদিনেই কনে তার বাড়িতেই উপস্থিত সকলকে নিজের হাতে ভাত, ডাল ইত্যাদি খাদ্য পরিবেশণ করে।

অষ্টমঙ্গলা বা 'আঠুয়ারী'। কইনার বাবা সামান ধরে আঠুয়ারী আনতে যান। অর্থাৎ এক কাঁদি কলা, দুধ নিয়ে বরের বাড়ির দুয়ারে গিয়ে 'আঠুয়ারী আনাসাক' বলেন। সামানের সামনে পুজো দিয়ে হুলুধ্বনি সহকারে বাড়িতে প্রবেশ করেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করেছি, বরের দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যা দাঁড়ায়। মাণ্ডুয়ার তলা দিয়ে প্রদক্ষিণের সময় সর্বাগ্রে কন্যা, তার পশ্চাতে বর থাকে। সুতরাং এদের সমাজে স্ত্রী বামা নয়।

বেহা দু'রকম। উসনি ও বসানি। উসনি বিয়েতে কনেকে পিত্রালয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে বরের বাড়িতে বিয়ে দেওয়া হয়। বসানি বিয়ে কন্যার বাড়িতেই হয়। প্রান্ত লোকনাট্য ঢাকেশ্বরীতে উঠানি বিয়ের দৃশ্য আছে।

নিয়মিত বিবাহের আরেকটি হল 'ধুলাবেহা' বা ধুলামাখা বেহা'। এই বিবাহ দেশী পলি সমাজে আউল বাউল সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের অনুপ্রবেশের পর যুক্ত হয়েছে।

দরিদ্র কৃষিজীবীদের পক্ষে বিবাহ অনুষ্ঠান ব্যয়সাধ্য। যারা গুরু গোসাঞির শিষ্য হয়েছে, তাদের বিবাহে এতসব আড়ম্বর পূর্ণ আয়োজন নেই। গোসাঞি স্বয়ং কারোয়ার কাজ করেন। গোসাঞি তাঁর দু'তিন জন শিষ্য সহ এই বিয়ের অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। এইসব বিয়েতে গোসাঞি প্রধান। তিনিই সামান। অনুষ্ঠানও খুবই সংক্ষিপ্ত। তিনিই নামমন্ত্র পড়ে দেন বর কনের কানে। সিন্দুর দানের পরিবর্তে ধুলোদান হয়।

নিয়মিত বেহোর আরেকটা হল ঘরজিয়া। অপুত্রক গেরস্ত একমাত্র

নাবালিকার কন্যার বিবাহ দেন চাল চুলোহীন সমর্থ কৃষকের সঙ্গে। তারই নাম ঘরজিয়া বা ঘরজামাই। ঘরজিয়াকে তার শ্বশুরের নির্দেশ মতো সব কাজই করতে হয় খাওয়া পরা ও কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। নাবালিকা কন্যা যুবতী হলে ঘরজিয়ার সঙ্গে হয় ফুলরেহা। এই সময় সেই ঘরজিয়া পরপ্রাপ্ত পারিশ্রমিক কন্যাপণ হিসেবে দেয়।

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর রাজবংশীস অব নর্থ বেঙ্গল গ্রন্থে কয়েকটি অনিয়মিত বিবাহরীতির উল্লেখ করেছেন। যেমন :

(১) পানির্ছিটা, (২) পানি মরপন, (৩) গাওগছ, (৪(ঘরঢোকা, পাছুয়া, (৫) কাইন (৬) কইনাপাত্র, (৭) ছত্রদানি, (৮) ভাঙ্গুয়া।

পলি-দেশী সমাজে এর সবগুলি রীতি একই রূপে নেই। কিছু কিছু রীতি প্রায় একই রূপে আজও বিদ্যমান। সংকলিত কয়েকটি পালায় ঘরঢোকা ও ভাঙ্গুয়া রীতির বারংবার উল্লেখ আছে। এই দুই রীতি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

(১) পানিছিটা : কনের পিতা বা অভিভাবক পাশাপাশি উপবিষ্ট বরকনের মাথায় আমের শাখা দিয়ে জল ছিঁটিয়ে দিলে পানিছিটা স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে পারে।

(২) পানিসরপন : খুবই দরিদ্র কৃষক, যে কইনা পণ সংগ্রহ করে বিয়ে করতে পারে না, গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে কনের বাবাকে অনুরোধ করে আম গাছের শাখা দিয়ে পাত্র ও পাত্রীর মাথায় জল ছিটিয়ে দিতে। পরবর্তী সময়ে পাত্র টাকা পয়সা সংগ্রহ করলে পুনরায় বিয়ে হয়।

(৩) গাওগাছ : কোন বিধবা নারী গর্ভবতী হলে এই প্রথায় সেই অপরাধী পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। অপরাধী পুরুষটির নাম গছ বা গাছ।

(৪) ঘরঢোকা, পাছুয়া : ঘরঢোকা, পাছুয়া বিয়ের আরেক নাম ঘরসধানী। বিধবা নারী অসহায় হলে একজন সম্পন্ন বিবাহিত ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করে তার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মতে জীবনযাপনের নাম ঘরঢোকা। এই স্বামীর নাম ঢোকাভাতার।

(৫) কাইন : বিধবা বৌদি বা ভাউজির সঙ্গে দেবরের অথবা ভাসুরের সঙ্গে ভাউসানের বিবাহের নাম কাইন।

(৬) কুমারী অবস্থায় কোনো পুরুষের সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মতো জীবন-যাপনের নাম কইনা পাত্র।

(৭) ছত্রদানী রীতিতে বিবাহিতা রমণীর পুর্ণবিবাহ হতে পারে। যে সব 'রমণী ভাতার ছাড়ি' হয়ে যায় অর্থাৎ নানাবিধ কারণে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে আসে তার পুর্ণবিবাহ ছত্রদানী রীতিতে হয়।

(৮) বিধবা নারীর সম্পত্তি ও যৌবন রক্ষনাবেক্ষণের জন্য আশ্রয়হীন অথচ স্বাস্থ্যবান পুরুষ, সাধারণত বিধবার থেকে বয়সে অনুজ, যখন ভাং ধরে বিধবার ঘরে এসে থাকে তখন তাকে বলে ভাঙুয়া।

বিবাহ বিচ্ছেদও খুব সহজ। স্বামী স্ত্রীর বনিবনা না হলেই যে কেউ অনায়াসে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। তবে পূর্বে স্ত্রীই যে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসত তার প্রমাণ 'ভাতার ছাড়ি' শব্দটিতে। নাং বা উপপতি থাকাটা এই সমাজে খুব অস্বাভাবিক নয়।

এই বিবাহ রীতিগুলি ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে সমাজে নারীর মূল্য, স্বাধীনতা যে যথেষ্ট তা বলা যেতে পারে।

১। পলিয়াদের তিন দিন এবং দেশীয়াদের পাঁচদিন পরে।

২। এই সব তথ্য দেশী ও পলি পরিবার থেকে সংগৃহীত। এঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখ করি :—

সরকারনি বুড়ি। কৃষ্ণবাটী। হেমতাবাদ। পঃ দিনাজপুর।
সুরেন দেবশর্মা। বাঘন। কালিয়াগঞ্জ। পঃ দিনাজপুর।
শচীন্দ্রনাথ সরকার। কৃষ্ণবাটী। হেমতাবাদ। পঃ দিনাজপুর।

৩। দেশীদের সমাজে দেখেছি আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই বেশি বিয়ে হয়।

৪। নিয়মিত বিবাহকে 'ফুল বেহা' বলে। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল প্রণীত 'দা রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থে 'ফুল ষেহা' কথাটি পাওয়া যায়।

৫। দ্রঃ Some Account of Palis of Dinajpur. G. H .Damant, The Indian Antiqurry Vol. I 1372, p 338.

৬। 'মহৎ'

৭। দু'জনে বাঁশের মধ্যস্থলে এইসব দ্রব্য ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার নাম 'সাইং'।

৮। পণের টাকা সরাসরি কনের বাবার হাতে দেওয়া হয় না। মহতের মাধ্যমে এই লেন দেন হয়। বিয়ের দিনও হ'তে পারে।

৯। লক্ষ্মী পূর্ণিমায় গীত থ-জাগর গান।

শরৎ উপন্যাসের শিল্পরীতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতি সম্পর্কে এই ভূমিকার পর এর বিচারে অগ্রসর হতে পারি। স্বীকার্য, শিল্পরীতির দিক থেকে শরৎ-উপন্যাসকে মাত্র দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে প্রায় সবকটা উপন্যাস, অপরদিকে শ্রীকান্ত উপন্যাস। প্রাথমিকভাবে যে চোখে পড়ে, তা হল, বেশির ভাগ শরৎ-উপন্যাসে লেখকের ভূমিকা সর্বদর্শীর, কেবল 'শ্রীকান্ত' ও 'স্বামী' উত্তম পুরুষের জবানীতে কথিত। এই দৃষ্টিকোণ (point of view) একালে উপন্যাসবিচারে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

"The question of the point of view is the question, of relation in which the narrator stands to the story. ('The craft of Fiction',—Lubbock, p. 25).

প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহার থেকে অনুধাবন করা যায় লেখকের অভিপ্রায়। বেশির ভাগ শরৎ-উপন্যাসে প্রথম পুরুষের (third person) প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহৃত। অর্থাৎ সর্বদর্শী সর্বগ লেখকের দৃষ্টিকোণ। এর সাহায্যে লেখক সবই দেখেন ও জানেন; কাহিনীর অলিগলি অগ্রগতি পশ্চাৎগতি বাধাবিপত্তি, চরিত্রের অভ্যন্তর, আলোয়, আঁধারি প্রত্যন্ত দেশ,—সবকিছুই লেখকের আয়ত্তে। এই রীতি রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় ইংরেজি উপন্যাসে ব্যবহৃত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত।

শরৎচন্দ্র এই দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন, একথা স্বীকার করেও বলা যায় সর্বদর্শী সর্বগ লেখকের অভিভাবকদুলভ যে প্রাধান্য বঙ্কিম উপন্যাসে দেখা যায়, শরৎচন্দ্র তা থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে নিয়েছেন, কোথাও কোথাও এই সর্বগামিতা ও সর্বদর্শিতাকে কিছুটা সঙ্কুচিত করেছেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, এই সর্বথা পরিব্যাপ্ত অভিভাবকোচিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষুণ্ণ করে উপন্যাসের বাস্তবতার আভাসকে (illusion), ব্যাঘাত ঘটায় জীবনের স্বাভাবিক গতিকে। তার উদাহরণ দত্তা ও গৃহদাহ উপন্যাস। এখানে কাহিনী যদিও প্রথম পুরুষে বিবৃত, তথাপি দুই নায়িকার দৃষ্টিবিন্দুর আপেক্ষিক প্রাধান্য ঘটেছে।

এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী পূর্বোক্ত নিবন্ধে।

ঔপন্যাসিক দত্তা উপন্যাসে নায়িকা বিজয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই যথাসম্ভব গল্পটিকে ও চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। এর ফলে কাহিনী ও চরিত্রের বিকাশ ও পরিণাম নায়িকার মধ্য দিয়েই একটু একটু করে পাঠকের গোচরে এসেছে। পাঠকের মনে কৌতূহল উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়বোধ অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান রাখতে এই রীতি যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কারণ এর ফলেই নরেনের ব্যক্তিগত জীবন ও রাসবিহারীর কূট চরিত্র পাঠকের মনে আলোছায়া মেশানো রহস্যময়তা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথম পুরুষে বিবৃত গৃহদাহ উপন্যাসেও এই প্রেক্ষণবিন্দু মুখ্যত নায়িকা অবলার। দু-একটি জায়গায় মহিম বা সুরেশের দিক থেকে কাহিনীর কোনো বিশেষ পর্যায়ের আরম্ভ সূচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের তেমন কোনো স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই উপন্যাসের মধ্যে প্রযুক্ত হয়নি। এর ফলে তাদের অন্তর্লোকে পাঠকের যথাযথ অনুপ্রবেশ ঘটে না। ঔপন্যাসিক তাঁর সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও এদের চরিত্রের নিভৃতলোকে তেমন আলো ফেলেন নি; অন্যদিকে, উপন্যাসে অচলার দৃষ্টিবিন্দুর আপেক্ষিক প্রাধান্যের ফলেও ওই দুটি পুরুষ চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ফুটে ওঠার বিশেষ সুযোগ মেলেনি।

এ দুটি উদাহরণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রথম পুরুষে বিবৃত সর্বগ সর্বদর্শী লেখকের কাহিনীকে যখন মুখ্যত একটি চরিত্রের আংশিক প্রেক্ষণবিন্দু থেকেও দেখা হয় বা বলা হয়, তখন সেই কাহিনীতে এক ধরনের আত্মনিষ্ঠ ভঙ্গির পরোক্ষ আভাস সূচিত হয়। দত্তা ও গৃহদাহ উপন্যাসে এর আভাস, অল্পমাত্রায়, আমরা পেতে পারি।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাস এই ধরনের নয়। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম চরিত্রহীন। এটি যথারীতি সর্বগ সর্বদর্শী লেখক ও প্রথম পুরুষের কথনভঙ্গিতে লেখা।

কিন্তু এখানে দত্তা ও গৃহদাহ উপন্যাসের মতো কোনো একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য নেই। অধ্যাপক রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন (পূর্বোক্ত নিবন্ধ) এখানে সতীশ, সাবিত্রী, উপেন্দ্র, কিরণময়ী, দিবাকর ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ দেখা দিয়েছে বারবারে ঘুরে ঘুরে। এরই মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়েছে, কাহিনীতে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, চরিত্রে সংঘর্ষ শুধু নয়, এক চরিত্রের উপর অন্য চরিত্রের অভিঘাতের ছবিও একইভাবে ফুটে উঠেছে।

এই যে পরিবর্তনশীল দৃষ্টিবিন্দু বা প্রেক্ষণবিন্দু, একে ফরাস্টার আখ্যা দিয়েছেন 'shifting point of view'। তা একই সঙ্গে লেখকের সর্বগতা-সর্বদর্শিতা ও বিভিন্ন চরিত্রের সীমিত প্রেক্ষণবিন্দুর মধ্যে একটি মিশ্রণ ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষণবিন্দুর ফলেই দেখা দেয় অধ্যায়-বিভাজনের প্রকরণগত প্রয়োজন। সেকারণেই চরিত্রহীন উপন্যাসের অধ্যায়গুলি বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে পাঠক যখনই প্রবেশ করছেন তখনই উপন্যাসটির ঘটনা ও চরিত্র ভিন্নতর দৃষ্টিকোণের আলোয় বিচিত্রবর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে।

একটা প্রশ্ন থেকে যায়, এই বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দুর প্রয়োগ চরিত্রহীন উপন্যাসে কি শিল্প-সংহতি দিতে পেরেছে? ফরাস্টার কাকে বলেছেন 'Bouncing', তার প্রয়োগের পিছনে থাকে উপন্যাসলেখকের প্রধান আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব। যা একই সঙ্গে লেখকের সর্বদর্শিতা ও বিভিন্ন চরিত্রের সীমিত প্রেক্ষণবিন্দুর মধ্যে একটি মিশ্রণ ঘটায়। চরিত্রহীন উপন্যাসে লেখকের সেই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করতে পারেন নি; পারলে আপাত-বিচ্ছিন্ন উপকরণ বা অধ্যায়গুলি পেত সামগ্রিক সংহতি। একই ব্যাপার ঘটেছে শেষপ্রশ্ন উপন্যাসে; সেখানেও লেখক এই প্রয়োগে অসমর্থ বলে উপন্যাসে সংহতি আসেনি। রাজেনের দেশসাধনা ও কমলের যুক্তিবাদিতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি।

শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে)—পূর্ববর্তী শরৎ-উপন্যাস ও বড় গল্পগুলির সামান্য বৈশিষ্ট ছিল:

(ক) একরৈখিক প্লট

(খ) বিষয়বস্তু ও প্রকরণ—ভিক্টোরীয় যুগের শেষভাগের ইংরেজি ও বাংলা উপন্যাসের অনুসারী অর্থাৎ ডিকেন্স-মেরিডিস-বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী।

(গ) গল্পকথনের ভঙ্গি ও গদ্যরীতি—বঙ্কিম-উপন্যাসের শেষ পর্বের ও বঙ্কিম-অনুসারীদের উপন্যাসের রীতি ও প্রকরণের উপর নির্ভরশীল।

(ঘ) সর্বব্যাপী আবেগময়তা—ইমোশন বা হৃদয়াবেগের গভীরতা ও বৈচিত্রের উপর বিশেষ নির্ভরতা।

(ঙ) প্লট এমনভাবে নির্মিত যাতে কোনো বিচ্যুতি, জটিলতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া তা সরলরেখায় অগ্রসর হতে পারে।

(চ) ইমোশন বা হৃদয়াবেগর শিখর-মুহূর্তের (ক্লাইম্যাক্স) কাছে চরিত্রের পরাভব স্বীকার।

(ছ) আবেগ-উপাদান (ইমোশনাল কন্‌টেন্‌ট) কখনো কখনো কূলপ্লাবী বিষাদে পর্যবসিত ; যেমন—'বড়দিদি', বিরাজ বৌ', 'চন্দ্রনাথ'। যদি তা মৃত্যুতে পর্যবসিত না হয়, তবে তা মৃত্যুর নিকটবর্তী যেমন—'বিন্দুর ছেলে' ; অথবা মৃত্যু-উপম আত্মবিলুপ্তিতে উপনীত, যেমন—'পল্লীসমাজ' ; অথবা এমন পরিণতিতে পর্যবসিত যেখানে পাঠকের হৃদয় হয় ভারাক্রান্ত, নয়ন অশ্রুপ্লাবিত, যেমন—'অরক্ষণীয়া'। একেই বলা যায়, ইচ্ছাপূরণমূলক ভাবালু হৃদয়প্লাবী round-up পরিণতি, তা Stern reality থেকে শতহস্ত দূরবর্তী।

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে (১৯১৭) আমরা লক্ষ্য করি এই শিল্পরীতি বর্জিত হয়েছে, সেখানে গৃহীত হয়েছে এক নূতন রীতি। শ্রীকান্ত উপন্যাসের শিল্পরীতির এই অভিনবত্ব কীভাবে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু ও জীবনদর্শনের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত, তা প্রথম দেখিয়েছেন ডঃ অমলেন্দু বসু শরৎ-জন্মশত-বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত সাহিত্য অকাদেমির সেমিনারে পঠিত এক নিবন্ধে। এই নিবন্ধ নানাদিক থেকে আমাদেরকে ভাবায়।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রকরণ-আলোচনার সূচনায় দুটি কথা মনে রাখতে হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে যখন 'শ্রীকান্ত' ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে তখন তার নাম ছিল—'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। দ্বিতীয় কথা—এই উপন্যাসে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে।

এ দুটি বিষয়ই বিশদ আলোচনার যোগ্য। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম দুই পর্বেই ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত। এই উপন্যাসকথক-ভ্রমণকারীর জবানীতে উপন্যাসটি ব্যক্ত। এই কথক জীবনের চলমান ঘটনাস্রোতকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন নানা চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের চরিত্র ওইসব ঘটনা ও চরিত্রের অভিঘাতে তেমন বিবর্তিত কী রূপান্তরিত হচ্ছে না।

এখানে কথক-নায়ক যথার্থভাবে উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক চরিত্র হয়ে ওঠে নি। এই ভ্রমণকারী অনেকটাই নির্লিপ্ত চরিত্র। শ্রীকান্তের দৃষ্টিকোণ যথার্থ উপন্যাসের নায়কের দৃষ্টিকোণ হয়ে উঠেছে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে, এখানে যে ঘটনাস্রোত ও অন্যতর প্রধান চরিত্রের (রাজলক্ষ্মীর) সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে উঠেছে জটিল, তার ফলে উত্তম পুরুষে বর্ণিত উপন্যাসের নায়কের ভূমিকাটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। শেষ দু পর্বেই নায়ক হয়ে উঠেছে উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক চরিত্র বা dramatised author। প্রথম দুই পর্বে নির্লিপ্ত, আর শেষ দুই পর্বে ঘটনা ও চরিত্রের ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়া

(Onvolvement) ;—শ্রীকান্ত-চরিত্রে উত্তম পুরুষের ভূমিকা প্রথম দুই পর্বে অনুপস্থিত, শেষ দুই পর্বে উপস্থিত বলে মনে করা যেতে পারে। তাই বলা যায়, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ দ্বিধাবিভক্ত।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'—এই নামের অন্তরালে উপন্যাসের প্রকৃতিগত তাৎপর্য নিহিত। ভ্রমণকারীর নির্লিপ্তি, দায়িত্বহীনতা, চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের শেষ পর্যন্ত না থাকার বা না দেখবার স্বাধীনতা, সামগ্রিক শিল্পসংহতি গড়ে তোলার দায়িত্ব না থাকা, খণ্ড বিচ্ছিন্ন দৃশ্য সাজিয়ে ছেড়ে দেবার স্বাধীনতা ভ্রমণকাহিনী লেখকের থাকে। এই লেখক জীবনের চলমান ঘটনাপ্রবাহ আর নানা চরিত্রকে দেখে, তাদের একটি বাঁধে না, তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে না; হঠাৎই গড়ে তোলা দৃশ্য ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের শিল্পরীতির আলোচনায় এইসব অ.পাত লক্ষণ আমাদেরকে ভাবায়। প্লটর রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত, ইচ্ছামত পরিণতিতে কাহিনীকে পৌছনোয় যিনি নিপুণ, সেই লেখক এই উপন্যাসে নৈপুণ্য ও সিদ্ধিকে আপাত দৃষ্টিতে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

শ্রীকান্ত প্রথমপর্ব সম্পর্কে গোড়াতেই যে-কথা বলা যায়, তা হল—এখানে পরপর আগত বৃত্ত-সজ্জারীতি অনুসৃত। 'শ্রীকান্ত'-এর প্লট আসলে পরপর সজ্জিত এক গুচ্ছ খণ্ড দৃশ্য (episode)। শ্রীকান্ত নামক এক নির্লিপ্ত ঈষৎ কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টিতে সেগুলি চলচ্চিত্রের মতো প্রতিভাত। সেইসঙ্গে পিয়ারী বাঈজী ওরফে রাজলক্ষ্মী ও অনুচর রতনের উপস্থিতির দ্বারা সংযুক্ত।

শ্রীকান্ত স্পর্শ-রচিত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী—'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে প্রকাশ সূচনায় এভাবেই ঘোষিত হয়েছিল উপন্যাসটি। ডঃ অমলেন্দু বসু সেকারণে এটিকে চিহ্নিত করেছেন। picaresque novel রূপে।

যে উপন্যাসের নায়ক ভবঘুরে, বৈচিত্র্যসন্ধানী, সতত ভ্রমণশীল ও জীবনের বিচিত্র চলমান প্রবাহের নির্লিপ্ত দর্শক। স্পেনীয় শব্দ picaro থেকে picareque। পিকারো হল সেই দুর্বৃত্ত সমাজের নিচুতলার যুবক যে নানা অসৎ উপায়ে ও কৌশলে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, চৌর্যে ও লাম্পট্যে যার নৈপুণ্য তর্কাতীত। তার চরিত্রের কোনো বিবর্তন নেই। পিকারো উত্তমপুরুষে তার কাহিনী বলে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে (episode) বিন্যস্ত সে কাহিনী প্লট আসলে ক্ষীণসূত্রে ভ্রাম্যমাণ, পথে পথে ঘোরে, এক কাজ থেকে অন্য কাজে যায়। তার অভিজ্ঞতা বিচিত্র, সমাজের নানা স্তরের মানুষকে সে দেখে, ছোটবড় উঁচু নিচু তলার মানুষের বিচিত্র ব্যবহার অনুধাবন করে।

শেষে সে শুধরে যায় (সকলে তাকে শুধরে দেওয়া হয়)। সৎ যুবকে পরিণত হয়, কোনো ধনী যুবতী বিধবা বা ধনী উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করে বাকি জীবনটা আরামে কাটায়। তার চরিত্রের কোনো বিবর্তন নেই, সে জীবনের দর্শক ও উপভোক্তা। শ্রেষ্ঠ ইংরেজি picareque novel হল ফীলডিঙের Tom Jones (১৭৪৯)

ফীলডিঙের 'টম জোনস' স্পেনীয় পিকারো-নায়কের ভদ্রতর উন্নততর সংস্করণ। শিল্পায়ন ও চরিত্র-রূপায়ণ, দুদিক থেকে এই উপন্যাস পূর্বতন পিকারেকস নভেলের তুলনায় অনেক উন্নত, ভদ্র ও শোভন। একটি দুরন্ত দুর্বৃত্ত পিকারোকে ফীলডিঙ ভদ্র রুচিসম্মত সংযত চরিত্রে পরিণত করেছেন, তবে তার সতত ভ্রাম্যমাণ কৌতূহলী জীবন-দর্শকের ভূমিকাটি বর্জিত হয় নি। পূর্বতন পিকারো চরিত্রের কোনো বিবর্তন ছিল না, ফীলডিঙ তৎসৃষ্ট টম জোনস-চরিত্রে সে বিবর্তন দেখিয়েছেন। দুরন্ত দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে আত্মদর্শী, অন্তরে সৎ, জীবনোৎসাহী যুবক। টম তার পূর্বেকার দুরন্ত জীবনযাপন ছেড়ে দিয়ে রমণীপ্রিয় সুজনে পরিবর্তিত হয়েছে, সোফিয়ার ভালবাসা পেয়েছে, যদিও টমের অন্তরের সৎভাবের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও সোফিয়ার সন্দেহ থেকেই গেছে যে টমের স্বভাবে দুরন্তপনা ও উন্মার্গগামিতা শেষ হয়ে যায় নি। সন্দেহ নেই, টম জোনস' comedy of manners, একে বলা যায় comedy বা characters, comedy of intrigues.

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাস, বলা বাহুল্য, সোজাসুজি 'টম জোনস' উপন্যাসের অনুকৃতি নয়। শরৎচন্দ্র ফীলডিঙ থেকে কিছুটা নিয়ে থাকতে পারেন, অনেকটাই ছেড়েছেন। তাঁর কলমে ও বিশিষ্ট জীবনভঙ্গিতে ফীলডিঙের সহাস্য ব্যঙ্গধর্মী সমাজদর্পণ বদলে গেছে, তার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি, যৌবনেই প্রবীণ অকালবৃদ্ধ তরুণ শ্রীকান্তকে, যে সব কিছুতেই হাল ছেড়ে দিয়েছে, যার জীবনে নেই কোনো উচ্চাশা, নেই কোনো লক্ষ্য : জীবনের ঘাটে ঘাটে স্রোতের অনুকূলে পৌঁচেছে, আবার চলে গেছে অন্য ঘাটে। দায়িত্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ, উচ্চাভিলাষহীন, ভ্রাম্যমাণ এক স্বভাব-দার্শনিকের নাম শ্রীকান্ত শর্মা। তারই অভিজ্ঞতার যে বিবরণ, তার নাম— 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'।

দুটি প্রশ্ন এখানে বিচার্য—(১) শরৎচন্দ্র এই ছদ্মনাম (শ্রীকান্ত শর্মা) নিলেন কেন ও পরে বর্জন করলেন কেন ? (২) উপন্যাসের নাম শেষ পর্যন্ত কথকের নামে 'শ্রীকান্ত' রাখলেন কেন ?

শ্রীকান্ত উপন্যাসে লেখক নির্মাণ করেছেন একটি কাল্পনিক চরিত্রকে ('পার্সোনা)।' এই চরিত্র লেখকের মুখচ্ছদ হতে পারে। সে কল্পনাপ্রসূত আর সেকারণেই আদর্শচরিত অস্তিত্ব। সে কখনও আসল ব্যক্তিগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়।

এই কাল্পনিক ব্যক্তি-রীতিতে লেখক উত্তম পুরুষে কথা বলেন। সেটাই গল্পকথকের বিশেষ অধিকার আর তা নিরবধিকাল ধরে প্রচলিত। এই রীতিতে বর্ণনা এগিয়ে চলে দুই স্তরে। প্রধান স্তরে বহে চলে কল্পিত নির্মিত কাহিনী। আর প্রায়শ অদৃশ্য বা অস্পষ্ট দৃশ্য বা জল নিহিত স্তরে বহে চলে লেখকের জীবন থেকে গৃহীত কিছু-কিছু ঘটনা।

কাল্পনিক ব্যক্তি-রীতিতে লেখক সুযোগ পান আত্ম-ভাবাবেগকে মুক্তিদানে। বলা যেতে পারে, আভমোচনের, আত্মমুক্তির সুযোগ।

এই রীতির উদাহরণ উপন্যাসে অবিরল। ডিকেন্স স্বয়ং ডেভিড কপারফিল্ড নন। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি ডেভিড কপারফিল্ড ছিল ডি, এইচ লরেন্সের কল মোরেল চরিত্র, টলস্টয়ের লেভিন-চরিত্র সম্পর্কে কথা বলা যায়।

সৃষ্ট চরিত্র আর সৃষ্টিকারী লেখকের মধ্যে আংশিক বিভাজিত আত্মবোধ, কাল্পনিক ব্যক্তিচরিত্রের (পার্সোনা) প্রক্ষেপণ ঔপন্যাসশিল্পে এক দুরূহ কর্ম, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তা কেবল দুরূহ নয়, সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম, তা উপন্যাসের নান্দনিক বৈচিত্র বাড়িয়ে তোলে। এই রীতির প্রয়োগে অবশ্য-স্বীকার্য, শরৎচন্দ্র এক নিপুণ শিল্পী।

শ্রীকান্ত শর্মা লেখকের এই ছদ্মনাম গ্রহণের পিছনে এই শিল্পতাৎপর্য নিহিত। শরৎচন্দ্র এভাবেই উপন্যাসে প্রকাশ করেন কাল্পনিক ব্যক্তিচরিত্র।

তাহলে পরে তিনি তা বর্জন করলেন কেন? এর উত্তর একটাই,—তিনি দেখলেন বাঙালি পাঠক এর সত্য তাৎপর্য গ্রহণে অক্ষম।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের শিল্পরীতির দ্বিতীয় যে প্রধান বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল গল্প কথনের রীতি ধারাবাহিকভাবে ক্রটির পর একটি সুগোল খণ্ডদৃশ্যের (এপিসোড) বিন্যাস, এবং কাহিনীতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত একটিমাত্র চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলির পর্যবেক্ষণ। এই বিন্যাস ও পর্যবেক্ষণের ফলে গড়ে উঠেছে এক একীভূত দৃষ্টিকোণ—শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন এই রীতি। তার ফলে উপন্যাসটি পেয়েছে সুরগত ঐক্য, কাহিনীগত ঐক্য, অর্থগত, ধারাবাহিকতা,—এমনকি যখন খণ্ড-

দৃশ্যগুলি উপন্যাসের ক্রিয়ানুযায়ী সজ্জিত নয়, তখনো ব্যাহত হয়নি এই অর্থগত ধারাবাহিকতা।

টমাস হার্ডি বলেছিলেন, উপন্যাস আসলে একটি ইম্প্রেশন, যুক্তির উপস্থাপন নয় (A novel is an impression no an argement :—Thomas Hardy)। শ্রীকান্ত উপন্যাসের শিল্পরীতি এই ইম্প্রেশনের যোগফল।

তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হয়, শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক শিল্পরীতির কুশল প্রকাশ ঘটেছে এইসব প্রকরণে কাল্পনিক ব্যক্তি (পার্সোনা) রীতিতে, একীভূত দৃষ্টিকোণে, সঞ্চিত ইম্প্রেশনের যোগফলে।

অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু পূর্বোক্ত নিবন্ধে আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি লক্ষ্য করেছেন এমন উপাদান যা উপন্যাসটির জাতিপ্রকৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

স্বীকার্য, শ্রীকান্ত একটি উপন্যাস নয়, উপন্যাসের মালা (যা আজ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে অভিনব)। এখানে শরৎচন্দ্র একটিমাত্র ব্যক্তিচরিত্রের (শ্রীকান্তের) দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো ব্যাপারটাকে, জীবনটাকে দেখেছেন। কেন তা বিশিষ্ট ও চমকপ্রদ ?

শ্রীকান্ত ভবঘুরে, উদ্দেশ্যবিহীন, রিক্তআশ চরিত্র। তার নেই কোনো কাজকর্ম, নেই কোনো নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি সে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় তার ঘুরে বেড়ানোর পিছনে বিশেষ কোনো মতলব আছে বলে জানা যায় না। সে নিজেকে বলেছে ভবঘুরে। (এখানে স্মর্তব্য, শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে বহু বছর ভবঘুরে ছিলেন)।

এই নায়ককে (শ্রীকান্ত) গড়ে তুলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সেই পুরনো পিকারেস্ক বর্ণনারীতি অবলম্বন করেছেন বলে অধ্যাপক বসু মনে করেছেন। এই সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিসহ তা আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে খণ্ডদৃশ্যগুলি (এপিশোড) প্লট অনুযায়ী পরস্পর-সংযুক্ত নয়। সেকারণে একটি ঘটনার সঙ্গে অপর ঘটনা কার্যকারণ-সম্পর্ক নেই। যেমন, ভাগলপুরে গঙ্গায় শ্রীকান্তের নৈশ অভিযানের সঙ্গে রেঙ্গুনে জাহাজঘাটায় বর্মী স্ত্রীকে ঠকিয়ে পালাবার দৃশ্যে বদমাশ বাঙালি বাবুর ছদ্ম দুঃখপ্রকাশের কোনো সম্পর্ক নেই। বিহারের গ্রামে বিবাহিত বাঙালি তরুণীর দুঃখের সঙ্গে নন্দমিস্ত্রী-টগর বাড়িউলির ছদ্মদুঃখের কোনো সম্পর্ক নেই। উপন্যাসের চারপর্বে এইরকম খণ্ডদৃশ্য আছে প্রায় পঁচিশটি, 'প্রতিটি পর্ব আত্মনির্ভর, আপনাতে সম্পূর্ণ।

স্বীকার্য, শ্রীকান্ত উপন্যাসে অরিস্ততল-কথিত ত্রি-ঐক্যবিধি আদৌ পালিত হয় নি। কাহিনীর থাকবে স্পষ্ট আদি, মধ্য, অন্ত; প্লট হবে সুগঠিত,— এমন চিঠি এখানে পদে পদে লঙ্ঘিত। এই লঙ্ঘনের পক্ষে যে যুক্তি উপস্থিত করা যায়, তা এই—যদি কোনো শিল্পকর্ম জীবনের একটি খণ্ডাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তবে তা জীবনকে একটি আদি-মধ্য-অন্ত-যুক্ত কাঠামোতে আবদ্ধ করে দেখাবে না। কারণ তাতে নিপুণভাবে ছাঁটকাট করা উপন্যাস হতে পারে, কিন্তু জীবন তো তা নয়; তা বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী হয়ে যায়।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের ছাঁচটা হল খণ্ডদৃশ্য। সমন্বিত ছাঁচ (প্যাটার্ন), তা শিথিল-গ্রথিত পরস্পর সম্পর্ক বিযুক্ত খণ্ডদৃশ্যের সমাহার, যা একটিমাত্র দৃষ্টিকোণে বিধৃত আর সেকারণেই ঐক্যবদ্ধ।

এই ছাঁচ স্বীকরণের কয়েকটি ফল অনুধাবনীয়।

এর ফলে আমরা পেয়েছি, একটি দৃষ্টিকোণ। এবং একটিমাত্র ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ। যেহেতু জীবন একটি ধারাবাহিকতা সেকারণে কোনো একটি বিন্দুতে জীবনচিত্রণের সূত্রপাত ও অপর কোনো বিন্দুতে তার সমাপ্তি ঘটানোর একটিমাত্র যুক্তি থাকতে পারে—তা হল যে কোনো মরণশীল মানুষের মতো পজীবনের ব্যক্তি দর্শকেরও থাকে একটি সূচনা ও একটি সমাপ্তি। শ্রীকান্তর জীবন-অভিজ্ঞতা সমূহের আছে একটি সূচনা ও একটি সমাপ্তি। আর সেকারণেই কাহিনীর সূত্রপাত হতে পারে পছন্দমত এমন এক বিন্দুতে যেখানে শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতাসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে অগ্রসর হতে চলেছে, আর তা শেষ হতে পারে এমন এক বিন্দুতে যেখানে তার অভিজ্ঞতা প্রবাহের আর কোনো বিশেষ তাৎপর্যপূণ অগ্রগতি ঘটে না।

প্রত্যেক পর্বের সূচনায় নায়ক তার জীবনের উদ্দেশ্যহীনতার কথা ঘোষণা করেছে, সেইসঙ্গে নতুন করে কাহিনী-সূচনার কৈফিয়ৎ দিয়েছে।

উপন্যাসের সূচনা ও সমাপ্তিতে নায়কের অভিজ্ঞতাসমূহের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি। মন্থরগতি ও তার শেষ লক্ষ্য করা যায়। সন্দেহ নেই, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের আদ্যোপান্ত ইতিহাস—তার সূচনা, বিকাশ সমৃদ্ধি ও পরিণতি—এ উপন্যাসের ধারণ-সূত্র। পর্বে পর্বে তার অগ্রগতি। কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে দুজনের আকস্মিক সাক্ষাৎকারে দুজনের ফেলে-আসা জীবনের ছিন্নসূত্রে পড়ল নতুন গ্রন্থি, আর অতীতচারণায় জানা গেল পূর্বের ইতিহাস। অবশ্য এই পূর্বের ইতিহাস কেবল প্রথম পর্বে নয়, চতুর্থ পর্বে একটু-একটু করে বর্ণিত। রাজলক্ষ্মীর ভালবাসার স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করলেই

দুজনের প্রেমের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত আমরা অনুধাবন করতে পারি। প্রথমপর্বে স্নেহোৎকণ্ঠার ছদ্মবেশে তিরস্কারের আড়ালে পিয়ারী বাঈজী ওরফে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের আকস্মিক প্রকাশ (পর্ব ১, অধ্যায় ৮) ঘটে শিকার পার্টিতে। আরা স্টেশনের বাইরে টিনের শেড থেকে জ্বরে অচৈতন্য শ্রীকান্তকে তুলে নিয়ে এস পাটনায় স্বগৃহে পিয়ারীর সেবা। এবং তারপরই সপত্নী বঙ্কুর উপস্থিতি দুজনের ভালবাসায় ছেদ টানল (পর্ব ১, অধ্যায় ১১-১২)। ছমাস করে শ্রীকান্তের মায়ের গঙ্গাজল সইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উপলক্ষে রাজলক্ষ্মীর ভালবাসা যাচাইয়ের পর শ্রীকান্তের বর্মা-যাত্রা (পর্ব ২, অধ্যায় ১)। বর্মা-প্রত্যাগত শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ (পর্ব ২, অধ্যায় ১৩)—আবার তার ভালবাসার জোয়ার এলো। এখানে দর্পভরে প্রেমিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শ্রীকান্ত পুরুষের সম্ভ্রম ছেড়ে তাকে গ্রহণ করতে পারবে না এবং রূপ-গুণ টাকার প্রভুত্ব রাজলক্ষ্মী কিছুতেই ছাড়তে পারবে না—এদুই যুক্তিতে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠল। কাশী ছেড়ে শ্রীকান্ত বহুদিন পরে তার গ্রামে ফিরে গেল (পর্ব ২, অধ্যায় ১৫)। অসুস্থ শ্রীকান্তকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলো রাজলক্ষ্মী। সমস্ত সামাজিক অপমান লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে প্রেমিকা এসে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তার দয়িতকে। পর্ব ৩, অধ্যায় ১)। তারপর গঙ্গামাটিতে সুনন্দা কুশারীর প্রভাবে পড়ে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে অবহেলা করে জপতপে মেতে রইল। গঙ্গামাটির পালা শেষ করে রাজলক্ষ্মী ফিরল কাশীতে, শ্রীকান্ত কলকাতায়। পুনর্বার বর্মা ফিরে যাবার আগে শ্রীকান্ত কাশীতে যে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করে এলো, তাকে মনে হলো অপরিচিতা (পর্ব ৪, অধ্যায় ১)। গঙ্গামাটি পর্বে রাজলক্ষ্মী ভুল করেছে, তার স্বীকৃতি এলো পত্রোত্তরে—শ্রীকান্তের পুঁটুকে বিবাহের অনুমতি প্রার্থনার প্রত্যাখ্যান-উত্তরে (পর্ব ৪ অধ্যায় ৩)। শ্রীকান্তের পুনরায় বর্মা-যাত্রার উদ্যোগে রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়েছে, নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করেছে দয়িতের কাছে। এপ্রসঙ্গে তার স্বীকার্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (পর্ব ৪, অধ্যায় ১২)। সন্দেহ নেই, শ্রীকান্তর জীবনে কমলতার আবির্ভাব (পর্ব ৪, অধ্যায় ৫-৭) রাজলক্ষ্মীকে আত্মউন্মোচনে সাহায্য করেছে। রাজলক্ষ্মী চরিত্রের উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ছিল কমললতার। তার স্বীকৃতি ও শ্রীকান্তের কাছে রাজলক্ষ্মীর শর্তহীন বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণে কাহিনী পেয়েছে সম্পূর্ণতা (পর্ব ৪, অধ্যায় ১২)।

চার পর্বের শ্রীকান্ত উপন্যাসে সামগ্রিক সংহতি নেই। ছোট ছোট খণ্ডদৃশ্য

(এপিসোড) নিজস্ব গণ্ডীতে আবদ্ধ। এই উপন্যাসে আদি অন্তের সমগ্রতা নেই, নিটোল রূপ নেই। কোনো সমস্যাকে আশ্রয় করে এর উন্মোচন, বিস্তার বা ক্রমবিকাশ হয় নি। ছবির পর ছবি এসেছে, ঘটনা গ্রন্থিত হয়েছে স্মৃতিসূত্রে। সর্বদর্শী লেখকের ভূমিকা অস্পষ্ট নয়। নায়কের কথায়—উত্তমপুরুষের জবানীতে কাহিনী বিধৃত। নায়কের ভবঘুরে জীবনের রূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে স্মৃতিপর্যালোচনার মাধ্যমে।

প্রথম পর্বের সূচনায় বালকবয়সের স্মৃতি। অষ্টম পরিচ্ছেদে শিকারপার্টিকে এসে শুরু হয়েছে নতুন গল্প—পিয়ারী বাইজীর গল্প। একাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত পাটনায় পিয়ারী-বাইজীর কাছে গেছে।

দ্বিতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মী-কাহিনীর পূর্বানুবৃত্তি, স্মৃতিচারণ। প্রথম পর্বেই পিয়ারী বাইজীর নির্মোক ছেড়ে এসেছে রাজলক্ষ্মী। তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে শ্রীকান্তর জীবনে পটপরিবর্তন—তার বর্মা যাত্রা। এ পর্বে অভয়ার কাহিনী। প্রাধান্য পেয়েছে অভয়া।

তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে শুরু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাঙামাটিতে শ্রীকান্ত আর রাজলক্ষ্মীর আগমন ও অবস্থান। দ্বিতীয় থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে নিত্যনতুন চরিত্রের আবির্ভাব; বজ্রানন্দ, কুশারী গৃহিণী, সুনন্দা, চক্রবর্তী পরিবার। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকান্ত কলকাতায় ফিরেছে, উদ্দেশ্য বর্মা-পাড়ি।

চতুর্থ পর্বে মুরারিপুরের আখড়ার কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ তৃতীয় পর্বের অনুস্মৃতি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভিন্ন ঘটনাস্রোত; বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে শ্রীকান্তর সাক্ষাৎ। পঞ্চম পরিচ্ছেদে মুরারিপুরের আখড়ায় কমললতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ঘনিষ্ঠতা। একাদশ পরিচ্ছেদে কমললতাকে দেখতে রাজলক্ষ্মী মুরারিপুর গেছে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তর চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়েছে।

আবার, সূত্রাকারে একথা বলা যেতে পারে, প্রথম পর্বে অন্নদাদিদি ও রাজলক্ষ্মীর প্রাধান্য, দ্বিতীয় পর্বে অভয়া ও রাজলক্ষ্মীর প্রাধান্য, তৃতীয় পর্বে সুনন্দা ও রাজলক্ষ্মীর প্রাধান্য, চতুর্থ পর্বে কমললতা ও রাজলক্ষ্মীর প্রাধান্য। সবকটি পর্বেই রাজলক্ষ্মীর অনিবার্য উপস্থিতি দেখা যায়। চার পর্বের যোগসূত্র শ্রীকান্ত। তারই জবানীতে সমগ্র কাহিনী বিবৃত।

এই ঐক্যসূত্র ও একটি চরিত্রের দৃষ্টিবিন্দুর প্রাধান্য সত্ত্বেও শ্রীকান্ত উপন্যাসের পিকারেস্‌ক রীতির ভূমিকা গৌণ হয়ে যায় না।

পিকারেস্কীয় খণ্ডদৃশ্যের সমাহারে চরিত্রগুলি বেড়ে ওঠে না। শ্রীকান্ত উপন্যাসের গৌণ চরিত্রগুলি সম্পর্কে একথা খাটে। এইসব স্মরণীয়, কিন্তু তাদের কোনো পরিবর্তন নেই। ইন্দ্রনাথ, অন্নদা-দিদি, নিরু-বোন, নতুনদা, শ্রীনাথ বহুরূপী, টগর বোষ্টমী, রোহিনীবাবু, প্রতিমনোহর চক্রবর্তী-দম্পতি, মেজদা, ছোড়দা, যতীনদা, শাহ্‌জী, মাতৃসখী গঙ্গাজল-মা, নন্দমিস্তিরী, জাহাজের ডাক্তার, পরিপদ মিস্তিরী, হোটেলওলা দা-ঠাকুর, বিধোরাগ্রামের বধূ গৌরী, অভয়ার ভূতপূর্ব স্বামী, চট্টগ্রামের দুটি রত্ন—দাদা আর ভাই, প্রতারিতা ধর্মী মেয়ে, বঙ্কু, রতন, নিত্যযাত্রী কমলার বাবা, বজ্রানন্দ, মধু ডোম, শিবু ডোম রাখাল পণ্ডিত, শিব পণ্ডিত, নবীন ও মালতী ডোম, রাঙাদিদি ও পুঁটু, তালুকদার কালিদাস মুখুয্যে, গহরকবি, তার সেবক নবীন, দ্বারিক্‌দাস বৈরাগী পদ্মা-লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রমুখ তরুণী বৈষ্ণবী—চরিত্রের মিছিল। এইসব চরিত্র একটি সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে দেখা দিয়েছে, সেখানে তাদের চরিত্রের ক্ষণিক উদ্ভাস ঘটেছে, আর পরিস্থিতি শেষ হয়ে গেলেই তারাও অদৃশ্য হয়ে গেছে, শ্রীকান্ত উপন্যাসের বিচিত্র জীবনপ্রবাহে তারা ঢেউয়ের মতো উঠেছে, আর পড়েছে। তবে অভয়া আর সুনন্দা-চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেছে।

যে-চরিত্র গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, পেয়েছে পরিণতি, তার নাম রাজলক্ষ্মী, উপন্যাসের নায়িকা।

শ্রীকান্ত, যে আগাগোড়া জীবন প্রবাহের দর্শক, ভবঘুরে, উদাসীন, নির্লিপ্ত, —সে কিন্তু বদলায়নি। অথচ তার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ, এবং তা দিনে দিনে হয়েছে সমৃদ্ধতর।

পিকারেস্ক উপন্যাসের আরো একটি লক্ষণ শ্রীকান্ত উপন্যাসে প্রতিভাত। এই ছাঁচে লেখক সুযোগ পেয়েছেন জীবনের নির্লিপ্ত দর্শক শ্রীকান্তের প্রেক্ষণ-বিন্দু মারফৎ সমকালীন সমাজ সম্পর্কে নানা চিন্তা প্রকাশে। সমাজ সম্পর্কে শ্রীকান্তের নানা চিন্তা ও লেখকের নানা সামাজিক ধারণার মধ্যে প্রায়শই মিল ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে সমাজ-সম্পর্কিত যে ভাবনা প্রচারিত, তার অনেককিছুই শ্রীকান্তের ভাবনায় সমন্বিত। আর সেকারণেই অনেক পাঠক লেখক আর লেখক-সৃষ্ট কল্পিত চরিত্রকে (পার্সোনা) এক করে দেখতে প্রলুব্ধ হন। কিন্তু কল্পিত চরিত্রের মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তাকে প্রতিফলিত করার অভ্যাস লেখকের বরাবর ছিল, একথা অবশ্যস্মর্তব্য।

কল্পিত চরিত্র (পার্সোনা) আর লেখক এক নয়, শ্রীকান্ত উপন্যাসের শিল্প-

রীতির আলোচনায় একথা আমাদের মনে রাখতেই হয়। লেখক নিজেও তা একাধিকবার বলেছেন। এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন।

"রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাব? ও-সব বানানো মিছে গল্প। 'শ্রীকান্ত' একটি উপন্যাস বই তো নয়। ও-সব মিছে কলরবে কাণ দিতে নেই।" (লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্র, ১৪ আগষ্ট ১৯১৯)

এক সাক্ষাৎকারে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,

"শ্রীকান্ত—শ্রীকান্ত। আপনারা আমার উপন্যাস পড়তে বসে অনুগ্রহ করে ঘটনা ও পরিস্থিতির ওপর জোর দেবেন না। কারণ আমি ঘটনার সৃষ্টি উপন্যাসের আসল জিনিস বলে মনে করি নে। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে চরিত্র-সৃষ্টি। তার সঙ্গে ঘটনা আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করতে হয় না। আমার চরিত্রগুলির অন্তরালে কোন কোন স্থলে বাস্তব হয়ত আকতে পারে। চিত্রের Background হিসেবে, তার বেশী নয়।" ('প্রভাতী' বর্ষ ১, শ্রাবণ ১৩৪৭, অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'শরৎ স্মৃতি' নিবন্ধ)।

স্বীকার্য, শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে প্রধিনিধিস্থানীয় ও জনপ্রিয় উপন্যাশ শ্রীকান্ত। আরো স্বীকার্য, শ্রীকান্ত পরবর্তী শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতিতে যদিব দেখা গেছে নতুন নতুন কৌশল ও উপাদান, তথাপি শ্রীকান্ত উপন্যাসের শিল্পরীতি পরবর্তী উপন্যাসমূহের শিল্পরীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

পেরিস্ত্রোইকা

মণীন্দ্র রায়

পেরিস্ত্রোইকা !!···বাষ্পকণা আয়স-মণ্ডলে উঠে এসে
চোখ যেন আহিতাগ্নি—এবার শব্দের ওষ্ঠাধরে
বৃষ্টির ফোঁটায় নামা। যেন বা কলম গেছে ভেসে
ঈগলের পিঙ্গল পাখায়, আর শব্দের পাহাড়ে
সমুদ্র-জাহাজ যেন তুলেছে মাস্তুল, ওড়ে পাল।
যেন-বা অপ্সরানৃত্যে আঙুলের গির্জার অর্গান
কখনো ঝঙ্কার, কিংবা চন্দ্রালোকে আনে ইন্দ্রজাল।
যেন মুভি-ক্যামেরার ফিতে পায় নাট্যের সন্ধান
খোলা অ্যাপার্চারে। যেন টাল সামলে কালের লাটিম
আবার সৃষ্টির কেন্দ্রে তেজোষ্ক্রিয় মেধার সাহস
ফিরে পেল।···ভাবা যায় না মস্তিষ্কের সে মহামহিম
বিস্ফোরণ! সেসব মানুষ বুঝি, হৃদয়ে সরস,
আকাশের সিঁড়ি ভাঙবে!···অনেক লেখার বীম ছুঁড়ে
উঠে যাবে, পেরিস্ত্রোইকা, শতাব্দীর চূড়ান্ত দুপুরে!

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক

সৌরি ঘটক

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ভাগ্যি জেলখানায় বসে মেঝের ওপর কয়লা দিয়ে লিখে মুছে ফেলি।

ভাগ্যি আমার লেখা কেউ পড়ে না তাই রক্ষে।

নইলে বাইরে যদি সোচ্চারে বলতাম 'আমরা সাময়িকভাবে পরাজিত', তাহলে বহু ভ্রূ কোঁচকানি দেখতে হত। সামনে হয়ত কেউ কিছু বলতেন না, গম্ভীর হয়ে থাকতেন, কিন্তু আড়ালে বলতেন—'কি আজে বাজে লেখা লিখছে। এ সব লেখা হতাশা ছড়ায়। কমরেডদের উৎসাহ নষ্ট করে দেয়।'

এ নিয়ে তর্ক করব না। কারণ জয় আর পরাজয়ের পার্থক্য বহু মানুষই জানেন না। কোন জয় পরাজয়ের চেয়েও লজ্জাজনক, কোন পরাজয় জয়ের চেয়ে গৌরবময়, কোন জয়ে ভরা থাকে শুধু আত্মগ্লানি, কোন পরাজয়কে ইতিহাস দেয় মহত্বের গৌরব, কোন জয় ডেকে আনে বৃহত্তর সর্বনাশ আর কোন পরাজয় নতুন উদ্যমে শক্তি সংগ্রহের স্পৃহাকে আরও তীব্রতর করে তোলে একথা যাঁরা বুঝতে পারেন তারাই শুধু পরাজয়কে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

জীবনের শুরুতে একটি শিশু যখন মাটির ওপর প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বারবার আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ে তখন সে হতাশ হয় না। সে যতবার পড়ে ততবার নতুন উদ্যমে চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াবার। কিন্তু একজন বৃদ্ধ যখন আড়ে পড়ে তখন সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। তার অন্তরে তখন একটি মাত্রই আর্তি : আর আমি উঠে দাঁড়াতে পারব তো?

এর কারণ কি? পরাজয় তখনই হতাশা আনে যখন তাকে জয় করার শক্তির উৎস নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু শক্তির উৎস যদি অটুট থাকে, যদি তার বিকাশের গতি অব্যাহত থাকে তবে পরাজয় আনে হতাশাকে জয় করার দৃঢ়সংকল্পতা। একটি শিশু যখন পড়ে তখন তার দেহের ও মনের শক্তির

ভাণ্ডার ক্রমবর্ধমান। ফলে সে একবারে নয় বারে বারে, একদিনে নয় অনেক দিনের চেষ্টায় পরাজয়কে রূপান্তরিত করে জয়ে। আর বুদ্ধের ক্ষেত্রে হয় এর বিপরীত। সে বোঝে তার শক্তির ভাণ্ডার নিঃশেষিত। ফলে তার পক্ষে পরাজয়কে জয় রূপান্তরিত করা হয়ত আর সম্ভব হবে না এ জীবনে।

তাই আজ আমরা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও এতে হতাশ হওয়ার কি আছে? আমাদের শক্তির ভাণ্ডার তো নিঃশেষ হয় নি, বরঞ্চ কা নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের সাধনায় ব্রতী। ফলে সে নিশ্চিতই অল্পদিনের মধ্যে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে, নতুন করে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে আহ্বান জানাবে শত্রুকে।

এটা হবেই। এ কেন বিশ্বাসের কথা নয়, ইতিহাসের গতি অনিবার্যরূপে এই পরিণতির দিকে ধাবিত।—'কার সাধ্য যেন যে সে রোধে তার গতি।'

আজ কি দেখছি আমরা? বিশ্ব ইতিহাসের বিপুল রঙ্গমঞ্চে আজ ক্ষণে ক্ষণে পট পরিবর্তন, নতুন নতুন দীপাবলীতে আজ আলোকজ্জল জীবনের যাত্রাপথ উনিশশো সতের সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে ধরিত্রীর এক তৃতীয়াংশে চিরকালের লাঞ্চিত মানুষগুলির এক নতুন মহীমায় উত্তরণ, ধর্ষিতা আফ্রিকায় অন্ধকার লাতিন আমেরিকায় মুক্তি সংগ্রামের বিপুল গর্জন শোষিত দেশগুলিতে শোষনের জোয়াল ভেঙ্গে পড়ার বিকট আর্তনাদ ধাবমান কালের সম্মুখভাগে সাম্যবাদের তোরণদ্বারে, আপন সৃষ্টির চূড়ান্ত উৎকর্ষতার দৌলতে মানুষ আজ মহাকাশ বিজয়ী আজই তো মহাকবির কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলতে ইচ্ছে করে 'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি যে এইকালে।'

কি বিস্ময়। এ যুগের একজন মানুষ বলে কি গৌরববোধ কি আনন্দ।

আমাদের পূর্বপুরুষরা কি প্রত্যক্ষ করেছে এমন একটা যুগ। স্বপ্নেও কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই নাটকীয় সংঘাতের চমক। তাদের চলার পথ ছিল কি এত দোলায়িত, চৈতন্যলোকে ছিল কি এত দ্বন্দ্ব?

সমকালকে ব্যাখ্যা করা যায় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর সেই উপমা দিয়ে। শুরু হয়েছে যেন পিনকির তাণ্ডব নৃত্য। একদিকে তার মৃত্যু আর একদিকে জীবন, একদিকে ধ্বংস আর একদিকে সৃষ্টি, একদিকে পরাজয় আর একদিকে জয়, একদিকে দাবাগ্নি আর অন্যদিকে সুষমা, একধিকে বক্ষভরা দহনজ্বালা আর একদিকে চির প্রশান্তির স্নিগ্ধতা।

এই চৈতন্য আলোড়নকারী যুগে কাজ করছি। ইতিহাসের পাতায় রেখে

যাচ্ছি আমাদের স্বাক্ষর। জানি আজ আমার কুটিরে আজ অমাবস্যা, এই ভাঙ্গাগড়ার উৎসবের অঙ্গনে আমার মুখ মলিন, বেসবাস দীন। কিন্তু এও জানি আগামীকালের সূর্যোদয়ের রশ্মি এসে আমার মুখে পড়ে আমাকে উদ্ভাসিত করে দেবে, নতুন যৌবনের স্পর্ধিত দম্ভে চূর্ণ হবে যযাতির জরা, শঙ্খনাদে ঘোষণা করব—'আমি জয়ী।'

কিন্তু এতো ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আজ? এই মুহূর্তে?

এক চোরাবালিতে পা ঢুকে গেছে আমাদের। নিষ্ঠুর পথের দেবতা শুধু লুকোচুরি খেলছে আমাদের সঙ্গে। মরীচিকাকে সত্য মনে করে বারবার সেদিকে ছুটে যাচ্ছি। গিয়ে দেখছি শুধু ছলনা শুধু বিভ্রম। দিনের পর দিন শুধু

"জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে"—
—করে যাচ্ছি।

এটাই হয়ত ইতিহাসের দেওয়া নির্দিষ্ট শাস্তি, যা ভোগ করতেই হবে।

শুধু আমরা কেন, গোটা সমাজের রথের চাকাই আজ এক চোরাবালিতে আটকে গেছে। পুরাতন ভেঙ্গে গড়ছে, নতুন বিকল্প গড়ে উঠছে না। মানুষ এমন একটা জীবন্ত বিশ্বাস পাচ্ছে না যাকে সবলে আঁকড়ে ধরে। এই যে শূন্যতা, ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন আর বিকশিত নতুনের মধ্যে এই যে ফাঁক এরই শিকার আজ গোটা দেশ, গোটা সমাজ, সমগ্র দেশবাসী।

একদিন মানুষ পরম বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। আজ সেখানেও নানা প্রশ্ন। মনে পড়ে একজন কমরেডের কাছে শোনা প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার কথা।

উনিশশো আটচল্লিশ সালে পার্টি বে-আইনী হলে গ্রেপ্তার হন তিনি। বেরিয়ে আসেন উনিশশো বায়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের পর। যখন জেলে গিয়েছিলেন তখন মুর্শিদাবাদের গঙ্গার চর অঞ্চল ফাঁকা, এসে দেখেন সেখানে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠেছে। চলছে রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজ।

তিনি জেল থেকে ফেরার পর স্থানীয় এস, ডি, ও রিলিফ কমিটির এক সভা ডাকেন। সহরের ব্যবসাদার, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে মিটিং। রিলিফ কমিটি গঠন হচ্ছে। সভাপতি বড় ব্যবসাদার। সম্পাদক নতুন এম, এল এর প্রতিনিধি, সহ' সভাপতি উকিল মোক্তার শিক্ষক। ক্যাশিয়ারের কথা উঠতেই হঠাৎ সেই বুড়ো ডব্লু, বি, সি,

এস, এস, ডি, ও বলে ওঠেন 'ক্যাশিয়ার একজন কমিউনিস্টরে করেন। টাকা কাড়া লোকে ঠিক ঠিক গাইব। চুরি চামার হইব না।'

এস, ডি, ও'র কথা শুনে অন্যরা হতবাক।

এ হল উনিশশো বাহান্ন সালের কথা। আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরে এই সার্টিফিকেট সব কমিউনিস্ট সম্পর্কে মানুষে দেয় কি?

হিসেব মিলছে না মানুষের। দেখছে নানা ঘটনায় কথায় ও কাজে গরমিল, সব কিছুর মধ্যে কেমন যেন একটা ফাঁকি, একটা চালাকি, একটা ভণ্ডামির গন্ধ। বাইরের প্রকাশ্য জীবন আর অন্দরের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে আলো-আঁধারির খেলা। বলা আর চলার মধ্যে অনেক ফারাক। মনের সঙ্গে কেমন যেন খাপ খাচ্ছে না মানুষের।

এই রকম একটা ইতিহাসের পর্যায় শুরু হয় সর্বনাশের পাশা খেলা। মানুষ ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থেকে গুটিয়ে নেয় নিজেকে, হয়ে দাঁড়ায় দর্শক। 'যে না করে-করুক আমাকে নিজেরটা গুছিয়ে নিয়ে বাঁচতে হবে—' এই মনোভাব পেয়ে বসে তাকে। অমনই সে প্রতিরোধের পথ ছেড়ে আপোসের রাস্তা ধরে।

এ রকম একটা অবস্থার যে সৃষ্টি হয়েছে কি দেখে সেটা বোঝা যায়?

তিনটি লক্ষণ অনুধাবন করলে এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা আঁচ পাওয়া যায়।

এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল বিচার্য যুগে ধর্মের প্রাবল্য বাড়ছে না কমছে?

দ্বিতীয় হল যৌনতা, ব্যাভিচার সমাজে কোন স্তরে?

আর তৃতীয় হল সংস্কৃতি সে যুগে কি মূল্যবোধ সৃষ্টি করছে। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কি?

কি ঘটছে আজ দেশে?

মধ্যযুগের বাতিল হওয়া যত বর্বর কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতা নতুন রূপে ফিরে এসে মানুষের মূল্যবোধকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

—যে সতীদাহ প্রথাকে একদিন ঘৃণিত বলে বর্জন করা হয়েছিল ধর্মান্ধরা তাকেই আবার মহিমান্বিত করে তুলতে চাইছে।

—পুজা পার্বনকে বলা হচ্ছে জাতীয় অনুষ্ঠান। বলা হচ্ছে দুর্গাপুজা নাকি বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্য। সে বাঙালি জাতির মধ্যে অর্ধেকের মত

ইসলামপন্থী, যে বাঙালির মধ্যে অনেকে আছেন খৃষ্টান, বৌদ্ধ, তাঁদের স্পর্শকাতরতা কোন বিচার্য বিষয় নয়।

—ধর্মগুরু, বাবা, স্বামীজীর দল ?

বলা হচ্ছে এঁরা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠছে গুরু, ঠাকুর, বাবা, মোহান্ত, ব্রহ্মচারীরা। চাগিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের শিষ্যরা। শুধু কি তাই। পাড়ার মোড়ে মোড়ে গড়ে উঠছে শনি মন্দির। ঘটা করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শীতলা, ওলাইবিবি প্রভৃতির পূজা। এমন কি গর্বের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান।

—শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহ ?

—এ সব আজ নাকি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। রেজেষ্ট্রি বিয়ে হলেও পুরোহিত ডেকে মন্ত্র পড়ে, 'অগ্নিসাক্ষী' করে তার সামাজিকীকরণ করিয়ে নিতে হয়। এ যেন মধ্যযুগে বিলাত থেকে ফিরে গোবর খেয়ে জাতে ওঠার মত।

—দেবস্থান, ধর্মস্থান ?

—দাবি করা হচ্ছে এসব জায়গা হল অলঙ্ঘনী। এমন কি রাষ্ট্রেরও অধিকার নেই এদের কাজে হস্তক্ষেপ কবার।

—শুধু কি তাই! দাবি করা হচ্ছে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বদল করতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন হবে রাষ্ট্রের আইন। ভিন্ন ধর্মমতালম্বীদের বাস করতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকা হিসাবে।

এক নজরে এই হল আজকের বাস্তব পরিস্থিতি। যারা এইসব প্রচার করছে তারা কোন বিচ্ছিন্ন বা গোপন শক্তি নয়। তারা সোচ্চারেই ঘোষণা করছে তাদের দাবি। মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করে দলে টানছে, ভোটে দাঁড়াচ্ছে, ভোট পাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করছে।

মনে পড়ছে এক তরুণ কমিউনিস্ট কর্ম্মীর কথা। তাঁর বাসায় কয়েক বছর আগে পাড়ার একদল তরুণ গিয়েছিল পূজার চাঁদা আদায় করতে।

তরুণটি নম্রভাবে তাদের বলেছিল—'আমি কমিউনিস্ট। পূজায় চাঁদা দিই না।'

শোনামাত্র দলের একজন প্রশ্ন করল—'আপনি ধর্ম মানেন না ?'

কমিউনিস্ট কর্মীটি জবাব দিল—'না।'

সে একটু অবাক হয়ে বলল—'ধর্ম মানে না এমন লোক আছে ?'

এরপর চাঁদার জন্যে জুলুম, ভয় দেখান, পাড়া থেকে তুলে দেওয়ার হুমকি।

তার কথা শুনতে শুনতে আমার কানে যা খট্ করে বাজল সেটা হল ঐ কথাটা—'ধর্ম মানে না এমন লোক আছে?'

—কে বলল কথাটা?

—একটি তরুণ।

—কোথায় বলল?

—এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে।

—কত বয়স তার?

—আন্দাজ করছি বিশ বাইশ বছর হবে।

—কখন বলল?

—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে।

আর প্রায় দেড়শো বছর আগেকার একটি ঘটনা।।

—'তখন ডিরোজিওর শিষ্যগণ একত্র হইয়া Athenium নামে এক মাসিক ইংরাজি পত্রিকা বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রাচীন কাজ ছিল। এই পত্রে মাধব চন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন—'If there is anything that we hate from the bottom of our heart, if is Hinduism'—'যদি হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুকে ঘৃণা কার তবে তাহা হিন্দুধর্ম।'

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী)

সময়ের ব্যবধান দেড় শতাব্দী। মাঝখানে কত পতন-উত্থান, কত আন্দোলন, কত বিদ্রোহ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বন্যা। কিন্তু সেদিন ঐ তরুণটির যুক্তিবাদী মুক্ত মনের কাছে এই ছেলেটির তরুণ মন হল ধর্মীয় সংস্কারের ক্রীতদাস।

সেকালে মাধবচন্দ্র মল্লিক বা হিন্দু স্কুলের ছেলেরা যখন বলতেন 'হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করি' তখন তার মধ্যে কোন ফাঁকি বা ভণ্ডামি ছিল না। তাঁরা একথা জোরের সঙ্গে বলতেন, এই কথামত আচরণ করতেন, এর জন্যে যে সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে হত সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করতেন।

অনেকের কথা না বলে একটি উদাহরণ দিই। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের কথা: তখন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে হিন্দু সাক্ষীগণকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্বক সাক্ষ্য দিতে হইত।···তখন কোন এক মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয়া বালক রসিককৃষ্ণকে সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলে উড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রথামত তাম্রকুণ্ড

লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক বিষম সংকট উপস্থিত। রসিককৃষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে চাহিলেন না। স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আদালত সুদ্ধ লোক বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে রসিক বলিলেন—'আমি গঙ্গা মানি না।' তখন একেবারে চারিধারে ইস্ ইস্ শব্দ উঠিয়া গেল। হিন্দু শ্রোতৃগণ কানে হাত দিলেন। অর্ধদণ্ডের মধ্যে এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পড়িল। 'মল্লিকের বাটীর ছেলে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়া বলিতেছে 'গঙ্গা' মানি না। ঘোর কলি উপস্থিত। দেখ কলেজ শিক্ষার কি ফল।'

ক্রমে রসিক সম্পর্কে—"বাড়ীর লোক ভীত হইয়া পড়িল। রসিককৃষ্ণের জননী কোন প্রকারে তাহার মতিগতি ফিরাইতে না পারিয়া পাড়ার নির্বোধ বৃদ্ধা স্ত্রীদিগের প্ররোচনায় তাহার মন ফিরাইবার জন্য তাঁহাকে পাগলা গুঁড়ো খাওয়াইলেন। হেয়ারের জীবনচরিতে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন এবং রসিককৃষ্ণের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের মুখেও শুনিয়াছি যে এই ঔষধ খাইয়া তিনি সমস্ত রাত্রি অচেতন হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাহাকে কাশীতে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। নৌকা প্রস্তুত। তাঁহার হাত পা দড়িতে বাঁধা। তিনি চেতনা লাভ করিয়া কোন প্রকারে আপনাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া পলায়ন করিলেন।"

ধরা যাক রামতনু লাহিড়ীর কথা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমানে গেলেন বটে কিন্তু সেখানেও বহুদিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার উপবীত পরিত্যাগের গোলোযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার উপবীত পরিত্যাগ সম্পর্কে দুই প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথম—তিনি কৃষ্ণনগর বাটীতে তাঁহার জননীর সাম্বৎসরিকা শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন এমনসময় একটি বালক দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন—"এদিকে তো বলা হয় কিছুই মানি না। ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্তে বসা হয়েছে। পৈতাটি বেশ ঝুলছে। বামনাই দেখান হচ্ছে।" এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি মর্মান্তিক লজ্জা পাইলেন! ঐ বালকের কথাগুলি তাঁহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কার্যের একতা যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তাঁহার পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি ক্লেশকর। এই ঘটনা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প তাঁহার মনে উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়—১৮৫১ সালের পূজার ছুটির সময় লাহিড়ী মহাশয় নৌকাযোগে

কতিপয় বন্ধুসহ গাজিপুরে গমন করিতেছিলেন।…তারিমধ্যে নৌকার মাল্লাদিগের দ্বারাই পাকাদি কার্য করাইয়া আহারাদি চলিতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়া বলিলেন 'এদিকে তো মাল্লাদের হাতে খাইতেছি, অথচ পৈতাটা রাখিয়া ব্রাহ্মণ্য দেখাইতেছি, কি ভণ্ডামিই করিতেছি।' বাক্যগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত হইল বটে কিন্তু তাহা লাহিড়ী মহাশয়ের চিত্তে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। তিনি তৎপূর্বে আপনার উপবীতটি নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহা আর গ্রহণ করিলেন না।

…যাহা হউক তিনি যখন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া বর্ধমানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু সমাজের লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল। দাস দাসীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিশু। সেই শিশু পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কার্য নির্বাহের ভার তাঁহার বালিকা পত্নীর উপর পড়িল। যিনি অপরের ক্লেশ একটু সহিতে পারিতেন না সেই লাহিড়ী মহাশয় যে স্বীয় পত্নীর ক্লেশ দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? তিনি জলবহা, কাঠ কাটা, বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমুদয় কাজ নিজে নির্বাহ করিতে লাগিলেন।"

এই যে তেজস্বিতা, এই যে সাহস বিশ্বাস আর আচরণের মধ্যে এই যে মিল, এই যে চারিত্রিক সততা, এর অভাবই আজ সবচেয়ে বেশি করে প্রকট হয়ে উঠেছে।

সতীদাহের বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং কি হয় না? ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ, পুস্তিকা, প্রচার অভিযানের কি ঘাটতি আছে? 'ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কস, লেনিন—প্রভৃতি শিরোনামে মৌলিক লেখাও তো প্রকাশিত হয়। কিন্তু তবু কেন ধর্মীয় কুসংস্কারের এই পুনরুত্থান?

কারণ গলদ বিসমিল্লাতে। কারণ কথা ও কাজে গরমিল।

এ যুগে পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে ক্লাব। তাদের শীর্ষদেশে প্রগতির পতাকা। কিন্তু তারাই যখন আবার ঘটা করে দেব দেবীর পূজা করে, পূজার খরচের জন্য মানুষের কাছে চাঁদার জন্য জুলুম করে, আনন্দ করার নামে বিলেল্লাপনা করে তখন তাদের কথা ও আচরণের মধ্যে কোন মিল থাকে কি?

ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার, পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান, ধর্ম—আত্মা, ইহলোক

পরলোকের প্রচার মৌলবাদীরা করলে সেটা প্রতিক্রিয়াশীল আর বামপন্থী নামধারীরা করলে প্রগতিশীল এমন কোন ব্যাখ্যা তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নেই।

এ ধরনের হুকুম মানুষ মানবে কেন?

ভাববাদ হল ভাববাদ। কালো জামার বদলে লাল জামা গায়ে দিলে তার কোন হেরফের হয় কি?

নিজেকে চালাক ভাবা কিন্তু অপরকে বোকা ভাবা ঠিক নয়।

ভাববাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার আর ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের দেশের একদল বুদ্ধিজীবী ও সাহসী তরুণ যে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন সেকথা আজকে কি তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরণ করা হয়?

একালের হাজার হাজার তরুণ'তরুণী কাঁধে একটা বাঁক নিয়ে 'ভোলে বাবা পার করে গা'—বলে তারকেশ্বর যাচ্ছে। কিন্তু তারা কি জানে এই তারকেশ্বরের শিব মন্দিরের কর্মকর্তাদের অনাচার ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ত্রিশের দশকে এই বাংলাদেশে একটা আন্দোলন হয়েছিল। সুভাষ বসু ও অনান্য রাজনৈতিক নেতারা জড়িত ছিলেন সেই আন্দোলনে। আন্দোলনের ফলে মামলায় জেল হয়েছিল তারকেশ্বরের মোহান্তের।

আজ তারকেশ্বরের মাহাত্ম্য নিয়ে সিনেমা হয়। তরুণ তরুণীরা ফিল্মস্টারের চেয়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে ঐ ধরনের হাঁটা নকল করে। বুর্জোয়া কাগজের পাতায় দিনের পর দিন এইসব ধর্মস্থানের মাহাত্য নিয়ে প্রবন্ধ ছাপা হয়।

এইসব দেখে মনে পড়ে যায় ইলিয়া এরেনবুর্গের একটি ভাষণ। সাম্রাজ্যবাদ অবিরত নানা প্রলোভনে সোভিয়েত লেখকদের প্ররোচিত করে সোভিয়েত বিরোধী লেখা লিখতে।

এই প্ররোচনার জবাব দিতে গিয়ে এরেনবুর্গ বলেছিলেনঃ গোগল পুশকিন, তলস্তয়, চেকভ, গোর্কি প্রমূখ মহান সাহিত্যিকদের উত্তরাধিকার বহন করছি আমরা। তারা কি মনে করে যে আমরা এই ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হব? তাদের কি ইচ্ছা ঈগলের বাসায় চড়ুই শাবক জন্মাক। কিন্তু তা হবে না।

এই উপমাকে ব্যবহার করে বলা যায় একালের এইসব তরুণ তরুণীরা কোন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে। হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখরা ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন তাঁর? না কি অন্যকিছু? বাংলার বাঘের ঘরে এরা কিসের বাচ্চা?

এই যে তরুণ তরুণীরা ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার হচ্ছে প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করে না। কারণ এরা ভোট জোগাড় করে, চাঁদা তোলে, মিছিলে আসে? এমন কি কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী অনেকে এদের পূজা কমিটিতে যোগ দেন, পূজামণ্ডপের উদ্‌বোধন করেন। যুক্তি কি? গণসংযোগ হবে।

হায় মার্কস? জীবনে অবদমিত মানুষদের মুক্তির পন্থা নিয়ে কত চিন্তা করেছেন, কত কথা লিখেছেন, সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু গণসংযোগের জন্য কোনদিন গীর্জায় যাওয়ার কথা তাঁর মনে হয় নি।

বোকা ছিলেন নিশ্চয়?

:

আসলে সমাজে ধর্মকে জিইয়ে রাখার, মানুষকে ধার্মিক করার দায়িত্ব কার?

শ্রমিক শ্রেণীর কোন প্রয়োজন নেই ধর্মের। নেই কৃষক শ্রেণীর কি সহরের নিম্নবর্গের মানুষদের। তাদের ধর্মভীরু, ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ—

হওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। ধর্ম বা ভাববাদ তাদের মুক্তি আনবে না। তাদের মুক্তি আনবে বিপ্লবী চেতনা, বিপ্লবী সংগঠন। তীক্ষ্ণ তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম। তাদের মুক্তি আনবে বস্তুবাদ।

তাহলে কে ধর্মকে জিইয়ে রাখতে চায়? নতুন করে ধর্মের এই যে প্লাবন এর পেছনে কালো হাত কাজ করে। কে মদত দেয়?

বুর্জোয়া শ্রেণী। দেশী এবং বিদেশী উভয়েই। এ ব্যাপারে তাদের গাঁটছড়া বড় শক্ত করে বাঁধা। দেশী ও সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের মধ্যে অন্য সে ব্যাপারে যত মতভেদই থাক এ ব্যাপারে তারা শতকরা একশত ভাগ একমত—'ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে'যে কোন উপায়ে। যে কোন মূল্যে।'

কিন্তু কেন?

এঙ্গেলেস তাঁর 'কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল চার্টিস্টদের পরাজয়, তারপর সেই বছর জুনে প্যারিস শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দমন, তারপর ইতালি, হাঙ্গেরী, দক্ষিণ জার্মানিতে বিপর্যয়, পরিশেষে ১৮৫১ সালে ২ ডিসেম্বর প্যারিসের ওপর লুই বোনাপার্টের জয়। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধর্ম প্রসঙ্গে এঙ্গেলেস বলেছেন: অন্তত কিছুকালের জন্য শ্রমিক দাবিদাওয়ার জুজুটাকে দমন করা গেল। কিন্তু কি মূল্য দিয়ে! সাধারণ লোককে ধর্মভীরু করে রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি বৃটিশ বুর্জোয়ারা আগেই বুঝে

থাকে তবে এত সব অভিজ্ঞতার পর সে প্রয়োজনীয়তা তারা আরও কত বেশি করেই না টের পাচ্ছে। নিজের মহাদেশের ভাইদের বিদ্রুপের পরোয়া না করে তারা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে চলেছে; নিজের দেশীয় ধর্মমন্ত্রে তুষ্ট না হয়ে তারা আবেদন জানিয়েছে ধর্ম ব্যবসার বৃহত্তম সংগঠন মার্কিন দেশের 'জোনাথান ভাইদের' কাছে; আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে রিভাইভ্যালিজম, সবশেষে 'স্যালভেশন আর্মির বিপজ্জনক সাহায্যও গ্রহণ করেছে··· ।

—'···চার্টিস্ট আন্দোলনের বছরগুলিতে তারা শিখেছে জনগণের ক্ষমতা কেমন!···এখন জনগণকে সবচেয়ে বেশি করে শৃঙ্খলায় রাখতে হবে নৈতিক উপায়ে এবং জনগণের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তারের কার্যকরী সমস্ত উপায়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল এবং রয়ে গেল ধর্ম।

—'···ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকরা বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রে তারা একেবারে সংক্রামিত। এবং নিজেদের প্রাধান্য অর্জনের জন্য পথের বৈধতা নিয়ে তারা ভাবিত নয়। ছোকরা যাত্রী যেমন লড়াই করে জ্বলন্ত চুরুট নিয়ে জাহাজের ডেকে উঠে সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে সেটিকে লুকিয়ে ফেলে দেয় তেমনি শেষ পন্থা হিসাবে ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়ার পক্ষে নিঃশব্দে তাদের স্বাধীন চিন্তা ত্যাগ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর রইল না। বাইরের ব্যবহারে একের পর এক ঈশ্বর বিদ্বেষীরা ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগল, চার্চ, শাস্ত্রবচন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে কথা বলতে লাগল সম্মান করে, ফরাসী বুর্জোয়ারা শুক্রবার হবিষ্যি শুরু করল আর জার্মান বুর্জোয়ারা প্রতি রবিবারে শুনতে লাগল ধর্মীয় ভাষণ। বস্তুবাদ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে। ধর্মকে জিইয়ে রাখতে জনগণের জন্য—সমূহ সর্বনাশ থেকে সমাজের পরিত্রাণের এই হল একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়।"

সমাজকে সমূহ সর্বনাশ থেকে রক্ষা (শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতায় আসাটাই হল বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে সমূহ সর্বনাশ) করার জন্য ধর্মকে জিইয়ে রাখার, মানুষকে ধর্মভীরু করার প্রয়োজন কোন শ্রেণীর পক্ষে জরুরী তার বিশ্লেষণ এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে।

আমাদের দেশেও আজ এরই প্রতিফলন দেখছি আমরা। বুর্জোয়া রাষ্ট্র-নেতারা খুব বিনীতভাব মাথা নত করে ধর্মস্থানে গিয়ে পূজো দিচ্ছেন, ভাগ্য গণনা করছেন, জ্যোতিষীদের কাছে হাত দেখাচ্ছেন, কুগ্রহ [illegible] অমঙ্গল করতে না পারে তার জন্য মাদুলি, তাবিজ, গ্রহরত্ন ধারণ [illegible]াই

নয়, এগুলো ঘটা করে প্রচারও করছেন তাঁরা। বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্র (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন) ঘটা করে প্রচার করছে ধর্মের, ধর্মস্থানের, ধর্মগ্রন্থের।

কেন? কারণ একটিই। দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্বাধীন হলেও মানুষের কোন একটি মৌলিক সমস্যারও সমাধান করতে পারেন নি বুর্জোয়া নেতারা। 'চাষীর হাতে জমি দান' দূর অস্ত সাধারণ ভূমিসংস্কার পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। সামন্তপ্রভু ও ধনী চাষীরাই এখনও গ্রামের অঘোষিত শাসক। কারখানায় দিন দিন শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ বাড়ছে। মালিকরা ইচ্ছামত কারখানা লকআউট করছে, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা চুরি করছে, তাদের বেতন সংকোচ করছে। বেকারে ছেয়ে গিয়েছে দেশ। সরকারি চাকরির ওপর ঘোষিত হয়েছে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা, বুর্জোয়া শ্রেণী, তাদের ক্রীড়নক ফটকাবাজ, আর দালালদের চক্রান্তে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে জিনিষের দর, মানুষের আয়-ব্যয়ের সমস্ত হিসেব-নিকেশ প্রতিদিন বানচাল হয়ে যাচ্ছে। এ এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা!

মানুষ পরিত্রাণ চাইছে এ থেকে। পরিস্থিতি হয়ে উঠছে অগ্নিগর্ভ। একটা সাধারণ বিপ্লবী রূপরেখা না থাকায় নানা বিকৃতভাবে উঠছে দাবি, মাথা চাড়া দিচ্ছে প্রাদেশিকতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, আর তার সঙ্গে নানা ধরনের রাজনৈতিক উগ্রপন্থা।

এইরকম একটা সময়ে ধর্মই তো হল বুর্জোয়া শ্রেণীর শেষ অস্ত্র। শুধু দেশের নয় বিদেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও চায় না এতবড় দেশটা বুর্জোয়া ব্যবস্থার কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে সমাজতন্ত্রের শিবিরে যাক। তাই তো আজ প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পেছনে বিদেশী মদত। তাই তো সাহেব মেমদের দেশ ছেড়ে এদেশে এসে হরিনামের গুণগান গাওয়া, জগন্নাথের রথে মিছিল করা।

এই সব ধর্মীয় বিদেশীদের কে পাঠায়? কে টাকা দেয় এদের? কে দেয় পাসপোর্ট, ভিসা?

যাদের পাঠাবার দরকার তারাই পাঠায় আর যাদের আনার দরকার তারাই আনে। সাধারণ লোকে ভাবে আমাদের ধর্মের কি মাহাত্ম্য। বিদেশ থেকে সাহেব মেম এসে হরিনাম গাইছে।

মানুষ জানে না যে দেশ থেকে এরা আসছে সেদেশে কৃষ্ণকায় বলে নিগ্রোদের নিন্দে করা হয়, টেলিভিশনে শিশুদের দেখান হয় খুন করতে, একঘণ্টা লোডশেডিং হলে শত শত দোকান লুট হয়। পথে শত শত নারী ধর্ষিতা হয় [illegible] হাজার হাজার মানুষ ছিনতাইবাজদের কবলে পড়ে নিঃস্ব হয়।

এদেশে হরিনাম বিলোতে না এসে তারা যদি নিজের দেশে বর্ণবৈষম্য-বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করত, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলত !

তা হবে না কারণ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কাজেই এসব হচ্ছে, হবে এবং আরও বাড়বে। কিন্তু যারা এদেশে বস্তুবাদের সমর্থক তারা কেন এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না ? যে মানবতাবাদীরা তরুণ-তরুণীদের ধর্মীয় মিছিলে যৌবনের জ্বালা দেখেন তাঁরা কেন বলেন না সে ঐ জ্বালা 'তারকনাথ' নেভাবে না, কি পুজো পার্ণণ করেও শান্ত হবে না। জ্বালা যদি থাকে তবে সে জ্বালা নিয়ে বুর্জোয়াদের সদর দপ্তরে আগুন জেলে দাও।

যে রাজনৈতিক দলেরা বস্তুবাদকে তাঁদের পতাকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁরা কেন জোরের সঙ্গে দেশবাসীকে বলেন না ভাববাদকে বর্জন কর, গ্রহণ কর বস্তুবাদকে।

বলেন না ভয়ে। ভোটে দাঁড়াতে হয় তো ! যদি ভোট ভেঙ্গে যায়।

দল করতে হয় তো ! যদি দলে লোক না আসে ? তাই পূজা মণ্ডপে যেতে হয় গণসংযোগ করতে।

হায়রে ভোট্ ! হায়রে দল !

তাই বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিক আত্মহত্যা করে, গ্রামের হরিজন, ক্ষেতমজুর ভূস্বামীদের হাতে খুন হয়, আর যে হাতে তার প্রতিবাদপত্র বিলি হয় সেই হাতেই তোলা হয় পূজার চাঁদা।

বাংলায় একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি।

আর ভাবের ঘরে এই চুরি সাময়িক। কিছু লাভ দিলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে ডেকে আনে এক চরম সর্ব্বনাশ। সে সর্ব্বনাশের মূল্য মেটাতে দেউলিয়া হতে হয়।

রেঁনেশার যুগে যারা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ছিল তারা ছিল সৎ। যা বলতেন তাই তারা করতেন।

এ কালে এই সততারই অভাব দেখছে মানুষ।

আর এই পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিয়ে ফুঁসে উঠেছে যত ধর্মীয় বিশ্বাস আর কুসংস্কার।

যারা আজ একে এড়িয়ে যেতে চাইছেন তাঁদের জানা উচিত বেহুলার বাসর ঘরে সাপ ঢুকতে বড় গর্ত লাগে না ; চুলের মত একটা ছিদ্রই যথেষ্ট।

(চলবে)

নিরীক্ষার আরেক দিক

নাটক : মিষ্টার কাকাতুয়া প্রযোজনা : বহুরূপী পরিচালনা : কুমার রায় আলোচিত অভিনয় : ২০ ডিসে, ৮৮ একাডেমী অফ ফাইন আর্টস

পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের প্রায় কোনো আশাই যখন আর ব্যক্তির জন্য অবশিষ্ট থাকে না, যখন ক্রুর বাস্তব আর কুটিল রাজনীতি সমষ্টির সঙ্গে তার অন্বয়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বিপন্ন করে তোলে, তখন সেই ব্যক্তির আহত মনুষ্যত্ব কখনো কখনো এক কল্পনার জগতের ভেতর আশ্রয় নিয়ে নিজের মত করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। আজকের দিনেও, যেসব ক্ষেত্রে পরিবেশের বিরূপতা প্রবল, আমাদের ক্ষুরধার আত্মজিজ্ঞাসার চর্চার ভেতর সেই একই কারণে ঢুকে পড়তে পারে রূপকথার জগৎ, যা আমাদের বাস্তবতা বোধকেই শ্লথ আর জটিল মাত্রাময় করে তোলে।

বিংশ শতাব্দীতে, ফ্যাসিবাদ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ত্রাসের সামনে রূপকথা এভাবেই কোনো কোনো দেশের শিল্পে আর চেতনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমাদের এ কলকাতাতেও, মনে পড়বে, ষাট আর সত্তর দশকের 'নক্ষত্র' প্রযোজিত নাটকগুলির কথা। মনে পড়বে 'বৃষ্টি-বৃষ্টি' 'কণ্ঠ নালিতে সূর্য', 'ক্যাপ্টেন হুররা' বা 'নয়ন কবিরের পালা'র মত নাটক কিভাবে ছুঁয়ে দিতে পারছিল আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত।

আমাদের আজকের মনস্তত্ত্বেও যে রূপকথার প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হয় নি একটুও, তা আবার টের পাওয়া গেল 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'মিষ্টার কাকাতুয়া' দেখে।

প্রশান্ত দেব এ নাটকটি লিখেছেন একটি বিদেশী নাটকের অনুপ্রেরণায়। তাতে তাঁর মৌলিকতা কতখানি বিপর্যস্ত হয়েছে সে প্রশ্নটি, যেহেতু ঠগ বাছতে প্রায়ই গাঁ উজাড় হবার ভয় থাকে, এড়িয়ে গেলেও আমরা দেখতে পাব রূপায়িত চরিত্রপাত্র নির্ভুলভাবে আমাদেরই সত্তাপরিচয় তুলে ধরে। নাটকটি দেখবার সময় যে রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা আমাদের বিপন্ন করে, তা মূলত এ কারণেই। এবং শেষে তাই খানিকটা স্বস্তি লাগে যখন যান্ত্রিক বস্তুবাদের দাপটের সামনে আমাদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব করুণভাবে হলেও, জিতে যেতে পারে।

মোটামুটি সম্পন্ন আর অকৃতদার মানিকলালের বাড়িতে থাকে প্রবলভাবে সামাজিক আর তাই যান্ত্রিক বস্তুবাদে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত বোন বীণাপাণি ও ভাগ্নী শ্যামশ্রী। স্বার্থপর, সংকীর্ণ আর বস্তুসর্বস্ব সেই সামাজিকের জগতে সরল আর হৃদয়বান মানিকলাল যেহেতু অনেকটাই বেমানান, তাই তার মানসিক আশ্রয় আর সঙ্গী হয়ে ওঠে কল্পনার এক কাকাতুয়া। তার ছোটো-বেলাকার যে কাকাতুয়াটির সঙ্গে তার নিষ্পাপ শৈশবের অনুষঙ্গ, যে হারিয়ে গেছে বহুকাল আগে, তাকেই যেন কল্পনায় তৈরি করে নেয় সে এবং কল্পনার সেই জবরদস্ত কাকাতুয়াকে সঙ্গী করে নিজের শৈশবের অনাহত মনুষ্যত্ব আর স্বপ্নকে মরিয়ার মত টিকিয়ে রাখতে চায়।

ফলে বোন, ভাগ্নী এবং আর সবার কাছে সে হয়ে ওঠে মানসিকভাবে অসুস্থ। অতএব, তাকে সুস্থ ও আর সকলের মত স্বাভাবিক করে তোলবার চেষ্টায় তার চিকিৎসা চলে। সেই চিকিৎসার প্রক্রিয়ায় এমন সব নাটকীয় ও কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাতে কে সুস্থ আর কে অসুস্থ এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। তারপর যখন ডাক্তার তাকে বীণাপাণি ও অন্যান্যদের মত সুস্থ করে তোলবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন তখনই ঘটনাচক্রে বীণাপাণি উপলব্ধি করে, একজন সংকীর্ণ স্বার্থপর আর অনুদার মানুষের চেয়ে 'অসুস্থ' মানিকলাল অনেক বেশি কাম্য। অতএব, চিকিৎসার বিপদের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত সে আর তার কাকাতুয়া রেহাই পেয়ে যায়। আমরাও স্বস্তি পাই এই ভেবে যে, স্থূল আর যান্ত্রিক বস্তু সর্বস্বতার ঠাসবুনোনের মধ্যে কোথাও এখনো একটু ফাঁক রয়ে গেছে, যার ভেতর দিয়ে আজো চুঁইয়ে আসে আমাদের সুদূর শৈশবের সবুজ আলো এবং যা আমাদের লুণ্ঠিত মনুষ্যত্বে দীর্ণ সান্ত্বনার মত মনে হয়।

নাটকটি যে আমাদের আকর্ষণ করে তা কেবল এই জটিল আধুনিক প্রশ্নটি রূপায়ণের কারণেই নয়, হাল্কা, কৌতুকচালের বুননটিরও জন্য। সেখানে নাট্যকারের উদ্ভাবনক্ষমতার সঙ্গে মিশেছে কুমার রায়ের মত বিশিষ্ট নির্দেশকের অভিজ্ঞ প্রয়োগসামর্থ্যের মহিমা।

'মিষ্টার কাকাতুয়া'র অভিনয় পরিকল্পনায় অতিরেক আর সংযমের যে দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল, যার অভাবে মঞ্চে নাটকটিকে ব্যর্থ মনে হতে পারত, তাঁর মত কজন পরিচালকই বা আজ তাকে এমন সফলভাবে কাজে লাগাতে পারতেন? অবশ্য দিলীপ ঘোষের মত অভিজ্ঞ শিল্পীর আলোক সম্পাতের সহায়তা যে এর জন্য প্রয়োজন ছিল, সে কথা না মেনে নিলে অন্যায় হবে।

অভিনয়ের দিক থেকে সমস্ত পরিকল্পনাটির মেরুদণ্ড সম্ভবত নমিতা মজুমদারের অভিনয়। বীণাপাণির ভূমিকায় নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে রূপায়িত করতে তিনি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিকতা আর অতিরেকময়তাকে যে সক্ষমতায় রূপায়িত করেছেন তা যেমন একদিকে তাঁর অভিনয় প্রতিভাকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে, তেমনি সমগ্র প্রযোজনাটিরই অভিনয় পরিকল্পনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যেন।

অবশ্য, তার মানে এমন নয় যে, কথাটা ব্যক্তিগত অভিনয়ক্ষমতার তুলনাসূত্রে বলা হল। কেননা সে ক্ষমতার পরিচয় আর কারো কারো ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রবল। মানিকলালের ভূমিকায় গৌতম বসুর অভিনয়, তাঁর এতাবৎ সেরাই শুধু নয়, আমাদের মঞ্চের সাম্প্রতিক অভিনয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজকও বটে। সুমিতা বসুর শ্যামশ্রীকেও আমাদের মনে থাকবে বহুদিন, গভীরতাহীন বস্তুসর্বস্ব আজকের মেয়েদের একজন হিসেবে। মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী বীণার চরিত্রের একাধিক মাত্রাময়তা চমৎকার ছাঁচ পেয়ে যায় দীপা দাশগুপ্তের অভিনয়ে। তবে, উচ্চারণের ব্যাপারে তাঁর যত্ন কারো কারো কানে একটু কৃত্রিম ঠেকতে পারে কি?

ছোট একটি ভূমিকাকেও স্রেফ অভিনয়ের দাপটে নাটকে কতখানি উল্লেখযোগ্য করে তোলা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল দেবেশ রায়চৌধুরীর অভিনয়ে। এই শক্তিমান অভিনেতা আবার প্রমাণ করলেন যে, সংগত কারণেই তাঁর ওপর আমাদের প্রত্যাশা ক্রমাগত আরো বেড়ে উঠছে। সুকৃতি লহরীর মিসেস পাকড়াশী যতখানি প্রত্যয়গম্য হয়ে ওঠে, প্রমীলা যে ততটা হয়ে ওঠে না, তার কারণ সম্ভবত বার্ধক্যে পৌঁছোতে এতগুলো বছর টপকে যাওয়া খুবই কঠিন।

দুঁদে আইনজীবী রমাশঙ্কর রায় অভিজ্ঞ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যেভাবে ধরা দেন তা আমাদের ভালো লাগলেও, একটু কি মনে হয় না যে অভিনয় ব্যাপারটা আর একটু গোপন হয়ে থাকলে এমন একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ অভিনেতার রূপায়ণে?

উৎপল ভট্টাচার্যের ডঃ পাকড়াশী কি আর একটু প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে রূপায়িত হলে নাটকের অভীষ্টকে পূর্ণতর করত না? ড. ঘোষের অভিনয়ে রজত গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের যথাযথ মনে হয় এবং ভালোও লাগে, যদিও বিজয়ের ভূমিকায় উৎপল ঘোষ, যাকে আমরা অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি বলি, তার কিছু বাদ দিলে, হয়ত আর একটু বেশি ভালো লাগত।

সবশেষে বহুরূপী ও কুমার রায়কে আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাবো এ কারণে যে, প্রতিভাসের দাসত্ব আর অনুপলব্ধ যান্ত্রিকতার বাইরেও যে নাটকের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে, যা আমাদের একইসাথে স্বস্তি ও আত্মআবিষ্কারের প্রেরণা যোগাতে পারে, সে কথা আর একবার মনে করিয়ে দিলেন তাঁরা।

শুভ বসু

লোককবি নিবারণ পণ্ডিত ও জনযুদ্ধের গান

চল্লিশের দশককে অনেকেই "গণনাট্য আন্দোলনের স্বর্ণযুগ" বলে আখ্যা দেন। এই দশকে সারা ভারতের অগ্রণী শিল্পীরা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বলেই হয়তো এই রামরাজ্যের পত্তন হয়েছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে এমন আরো অনেকে এসেছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে, অর্থাৎ, চল্লিশের দশক পার হয়েও বর্তমানকাল পর্যন্ত একটা অভিজ্ঞতাপ্রসূত বৈদগ্ধ নিয়ে এসে প্রথম সারির শিল্পী বলে গণ্য হয়েছেন। তৎকালীন প্রথম সারির শিল্পী ও কালক্রমে প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ শিল্পীরা নিঃসন্দেহে ভারত-মণ্ডলের সাংস্কৃতিক বলয়কে সমৃদ্ধ করেছেন কিংবা সমৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গোটা আন্দোলনের পর্যালোচনাপ্রসূত ফলাফল যাচাই করলে দেখা যাবে যে, এই স্বর্ণযুগটা ছিল কারুর কারুর কাছে একটা নিশ্চিন্তির যুগ। যেকালে কোনও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়ে একটা প্রগতিশীল ভাবনাসম্পন্ন নতুন কিছু সাংস্কৃতিক ফসলের উৎপাদন বা তার গবেষণা করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল বলে বহু গুণীজনের সমাবেশ এই যুগে ঘটেছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকে সরকারী ও বেসরকারী নিপীড়নে কিংবা চিন্তার দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত অনেক গুণীজনই সদিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার বিবরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আর গণনাট্য আন্দোলনের পোড় খাওয়া কর্মীরা যতক্ষণ পেরেছেন ততক্ষণ গণনাট্য আন্দোলনকে দৃঢ় প্রত্যয়ে আঁকড়ে ধরে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন বা আজও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ মাঝপথে বসে পড়লেও পথভ্রষ্ট হননি বা হতে চাননি। চল্লিশের এই সংগ্রামী অংশটি যাঁরা গণনাট্য আন্দো-লনকে গণ আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা অনেক ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ঘটিয়ে এই আন্দোলনকে কোনও যুগবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মানবসমাজের জীবৎকাল পর্যন্ত গণনাট্য আন্দোলনকে অগ্নিযুগের আন্দোলন বলে গ্রহণ করেছেন। চল্লিশের দশক থেকে

আশীর দশকের প্রবাহমানকালে গণনাট্য আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে গ্রীক পুরাণোক্ত যে সমস্ত অগ্নিধ্বজ প্রমিথিউসদের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটেছে তাঁদের মধ্যে লোকশিল্পী নিবারণ পণ্ডিত ছিলেন প্রথম সারির অন্যতম। যিনি ১৯৮৪ সালে লোকান্তরিত হওয়ার সময় পর্যন্ত গণনাট্য আন্দোলনের পতাকা উর্ধে তুলে রেখেছিলেন সগৌরবে। চরম দারিদ্রজনিত অনাহার, কংগ্রেসী আমলের পুলিশ ও কংগ্রেসী চমূদের নির্যাতন উপেক্ষা করেও।

নিবারণ পণ্ডিত প্রথম জীবনে লোকশিল্পীর ভূমিকায় থেকে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হন এবং ক্রমে কমিউনিষ্ট কর্মীতে পরিণত হন। সাচ্চা কমিউনিষ্ট শিল্পীর মত তাঁর ব্যক্তিজীবন, সংগ্রাম-মনস্কতা ও মননশীলতার মধ্যে কোনও ফারাক ছিল না বলে যেখানে কোনও আপোষকামী চালাকির স্থান ছিল না। এবং তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের গায়ে কূটনৈতিক চালের ছোঁয়াচও তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন। গণআন্দোলনের জীবনকে অনেক সংঘাতের মধ্যে শিল্পীর কর্তব্যের সাথে অন্বিত করতে সততঃই তিনি উন্মুখ ছিলেন। অনেক ব্যর্থতার মধ্যে থেকেও সার্থক ছিলেন। এহেন সংগ্রামী লোকশিল্পী তথা লোককবিকে জনসমক্ষে মরণোত্তর সম্মান দিয়ে গণনাট্য পত্রিকার সম্পাদক শান্তিময় গুহ ও তাঁর কুশলী সহযোগিরা একটা গোটা আন্দোলনের কালের ব্যাপ্তিকেই সম্মানিত করেছেন এবং একালের লোকশিল্পকে উৎসাহিত করেছেন। শুধু তাই নয়। নিবারণ পণ্ডিতের নজীর সামনে এনে বিচ্যুতি থেকে লোকশিল্পকে উদ্ধার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। নিবারণ পণ্ডিত রচিত লোকগাথা, তাঁর বক্তব্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ, কিছু মূল্যবান তথ্য সম্বলিত চিঠিপত্র অনেক আয়াসে যথাসম্ভব সংগ্রহ ও উদ্ধার করে শান্তিময় গুহ একটি সঙ্কলনগ্রন্থ গণনাট্য পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রকাশ করে এক অসাধ্য সাধনায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্য। সম্পাদক ও তাঁর সঙ্গীরা এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে গবেষকের দৃষ্টি, মার্ক্সীয় নান্দনিক হৃদয় ও সংগ্রাহকের স্বচ্ছ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই তাঁদের সংগ্রহের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের তৎকালীন মানুষদের পুনরায় পথের ডাকের স্বথে মনকে প্রলুব্ধ করে ও নতুন প্রজন্মকে শিল্পীর প্রকৃত ভূমিকার প্রতি দিক নির্দেশ করে।

নিবারণ পণ্ডিতের সারাজীবনের সাধনার ফসল থেকে আহরিত এই—গ্রন্থটির সার্থক নামকরণ "জনযুদ্ধের গান"। নামে নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট রয়েছে। গণশিল্পীর সারাজীবনটাই যুদ্ধের—জনযুদ্ধের। নামের সাথে সমতা

রেখে কমল আইচ পরিকল্পিত প্রচ্ছদচিত্রে লাল রংয়ের সরল পটভূমিতে খরস্রোতা নদীর নীল রংয়ের সাথে তিন কালের তিন গায়কের মুখের রেখা আগে ভাগে বলে দেয় পাঠক কোন পথে অগ্রসর হবেন।

নিবারণ পণ্ডিত ছিলেন লোককবি ও কণ্ঠ সংগীতে পারঙ্গম। কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে গণসংগীতকে লোকসংগীতের কাঠামোয় পাথেয় করে নেন। সংগ্রাম সংগীত—সঙ্গী ছিলেন দোতারাবাদক ও সুগায়ক অখিল চক্রবর্তী, সফিরুদ্দীন, জহুর আলী, অতুল মজুমদার, চুনী সেন এবং আরো অনেকে। পাকিস্তানী আমলে এঁদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চলে। লক্ষ্মীকুড়া গ্রামের হাজং কবিয়াল চন্দ্র সরকারকে জেলখানায় পিটিয়ে খুন করা হয়। ভারতে আসার পরেও গণতন্ত্রপ্রেমী ভারত সরকার নিবারণ পণ্ডিত ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের নিগ্রহ থেকে রেহাই দেয়নি। আলোচ্য গ্রন্থের "আত্মস্মৃতি" অধ্যায়ে তার মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়। এই সমস্ত লোকশিল্পী জীবনে জীবন যোগ করতে গিয়ে নিজেদের নিঃশেষিত করেছেন। অর্থ ও খ্যাতির মোহের ঊর্ধে তাঁদের অবস্থান ছিল। একালে গণসংগীত যখন ভিন্ন নামে কতিপয় শিল্পীর ব্যবসায়িক পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন নিবারণ পণ্ডিতের "আত্মস্মৃতি" গণনাট্য আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

নিবারণ পণ্ডিতের গানতো বটেই, তাঁর অন্যান্য রচনাগুলোর মূল্যও অসীম। এই গ্রন্থের গণসংগীতসহ প্রতিটি অধ্যায় এক নিঃশ্বাসে পড়তে ইচ্ছা করে। সম্পাদক শান্তিময় গুহর "শিল্পী ও সংগ্রাম" নিবন্ধে প্রথমে পাঠকের পরিচিতি ঘটে আপোষহীন সংগ্রামী নিবারণ পণ্ডিতের সঙ্গে। শিল্পীর লেখা "গদ্য রচনা", "চিঠিপত্র" ইত্যাদির সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটে গণনাট্য আন্দোলনের সাথে সাথে রক্তক্ষরা কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, মূলত স্বদেশ চেতনার গানের সাথে গণসংগীতের কোনও বিরোধ নেই। স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে স্বদেশচেতনার গান শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের গান হয়ে গণসংগীতের মর্মবাণীতে প্রকাশ পায়। এরই মধ্যে লোকসংগীতের স্থান সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। একমাত্র লোকসংগীতই নিখাদ হয়ে স্বাধীনতার সপক্ষে শোষণহীন সুন্দর সমাজ সৃষ্টির শাশ্বত বাণী বহন করে চলে মানবসভ্যতার উন্মেষকাল থেকে। ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী সমাজ পরাধীনতার প্রথম অধ্যায় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যখন বিদেশী প্রভুর পদলেহনের আশায় অষ্টাঙ্গ প্রণামে

লিপ্ত ছিলেন, তখন থেকেই একমাত্র লোকসংগীতের বাণীই আমাদের স্বদেশ চেতনাকে অগ্নিদীপ্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকপরম্পরাপ্রসূত এই সমস্ত গান আমাদের আজ্ঞা দেয় প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটনে। পলাশী যুদ্ধের কাল থেকেই বাংলার আদিবাসী সমাজসহ সমগ্র কৃষক সমাজ বিদেশী প্রভুর অন্যায় আস্ফালনকে বারবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় কিষাণসভার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নানা ঘাত প্রতিঘাত ও হাজারে হাজারে আত্মাহুতির বিনিময়ে আমাদের চেতনাকে স্বদেশ প্রেমের সংগ্রামের পথে ধাবিত করতে সচেষ্ট থেকেছে। ভারতের কৃষক ও আদিবাসী সমাজের জমির অধিকার অর্জনের আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ পায় সারা ভারত কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন পর্বের ইতিহাস একমাত্র লোকসংগীত থেকে যথাসম্ভব আহরণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। ১৯৪১ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বের ইতিহাসের আস্বাদও আমরা নিবারণ পণ্ডিতের গানের কথা ও সুর থেকে লাভ করি এবং তৎকালীন কৃষক সমাজের আন্দোলন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শোষণ ও অপশাসনের বিভিন্ন দিক জ্ঞাত হতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ও চীনের বীর সন্তানদের ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে ভারত তথা বিশ্বজনমতকে উদ্বুদ্ধ করা, সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের অনাহার ও অপুষ্টিজনিত মৃত্যু, জোতদার, চোরাকারবারী ও মজুতদারদের লোভ ও শোষণের সাথে আমলাতন্ত্রের যোগসাজস, ময়মনসিংহের টঙ্ক আন্দোলন, হাজং আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে লেখা গানগুলির একটি পর্ব, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তান ও ভারতে বিভিন্ন গণআন্দোলনের উপর সরকারী উৎপীড়ন ও নিপীড়ন নিয়ে লেখা বাস্তুহারার মরণ কান্না, খাদ্যের বদলে গুলি ইত্যাদি পাঁচালী ও ছড়া গানগুলি একসময়ে পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিবারণ পণ্ডিত তাঁর দল নিয়ে গ্রামে গঞ্জের হাটে, মেলায়, শহরের পথে ঘুরে ঘুরে গাইতেন। কখনো কখনো পুলিশের হুলিয়া উপেক্ষা করেও। আজীবন এই চারণবৃত্তিকে তিনি আশ্রয় করে গভীর আন্তরিকতায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন স্বদেশ চেতনার মিশনে। পুলিশের রক্তচক্ষু ও জোতদারসেবী কংগ্রেসী গুণ্ডাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন তাঁকে বা তাঁর সঙ্গীদের কখনও নিরস্ত করতে পারেনি। তাঁর চিঠিপত্র ও বিভিন্ন নিবন্ধে তাঁর আপোষহীন চরিত্রের চিত্র দেখতে পাই। অর্থ না হোক, যশের প্রলোভনকে

তিনি প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কাছে তাঁর দৃষ্টিতে যা সুন্দর তাই ছিল সত্য। নিজের দৃষ্টিশক্তির ওপর তাঁর এমনই এক গভীর আস্থা ছিল। তাঁর দেখা সেই সুন্দরের মূর্তি কখনো রক্তাক্ত, কখনো নীলকণ্ঠ, কখনো শ্বেতশুভ্র, কখনো মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর কখনো জীবনদায়ী মৃতসঞ্জীবনী, আবার কখনো পারাবতের মত উদার আকাশে আনন্দে উড্ডীন। ভিন্নমতাবলম্বী প্রগত মানুষকে তিনি বিচার করতেন বন্ধুত্বসুলভ প্রতিযোগীর দৃষ্টিতে, প্রতিবাদী বলে নয়। এক কালের সহযাত্রী মনি সিংহের মতবাদের সাথে অমিল হওয়ায় তিনি নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মনিসংহের ত্যাগ ও সততার প্রতি তিনি কখনো অশ্রদ্ধা কটাক্ষও করেননি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে পত্রালাপে এই কথাই তিনি যেমন তীব্রভাষায় জানিয়েছেন তেমনি দৃঢ়চিত্তে নিজ মতবাদকে প্রয়োগ করতে গিয়ে পুরানো বন্ধুদেরও পথ ছেড়ে দেননি।

এই গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় নিবারণ পণ্ডিতের কয়েকটি গন্ত রচনার অনুলিপি। বিশেষ করে "গণসংগীতে লোকসংগীতের সার্থক প্রয়োগ" সম্পর্কে আলোচনা আগ্রহী লেখক ও গবেষকদের অবশ্যই পাঠ করা উচিত। একালে গণসংগীতের রূপরেখা নিয়ে যে এত তর্কবিতর্ক চলছে তার ফলে উৎসাহী সংগীত রচয়িতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উদ্যম হারিয়ে ফেলছেন অথবা গোঁজামিলের আশ্রয় নিচ্ছেন। এই আলোচনাটি তাঁদের পথনির্দেশের সহায়ক হবে। তবে, শহুরে লেখকদের লেখায় কৃত্রিমতার ছাপ থেকেই যায়। নির্ভেজাল লোকসংগীতের উৎসমুখ গ্রামীণ শিল্পীদের নিজস্ব মননশীলতার গ্রামীণ জগৎ। যেখানে নিবারণ পণ্ডিতের মত লোকশিল্পীর জন্ম ও পর্যটন, নিজের ভাষায় ও সুরে মর্মবেদনার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ। সে ভাষার বীজে রয়েছে বিদ্রোহ, শান্তি ও মৈত্রীর স্বচ্ছন্দতা সরল ও সাবলীল। নিবারণ পণ্ডিতের মত কবিয়াল রমেশচন্দ্র শীল, চন্দ্র সরকার, গুরুদাস সরকার, ব্রজলাল অধিকারীরা এই উৎসমুখ থেকে জন্ম নিয়ে গণনাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এখন অনেক বেশী সুসংহত। শ্রমিক ও কৃষকের মর্মমূলকে আরও গভীরে প্রবেশ করাতে হবে, গ্রামীণ শিল্পী ও কবিদের সাথে তাঁদের আরো ঘনিষ্ঠ হতে হবে, নিবারণ পণ্ডিতদের মত মানুষদের আবিষ্কার করতে হবে। নিবারণ পণ্ডিতের জীবন ও বাণী আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, গণসংগীতকাররা জনজীবনের সাথে একাত্ম না হলে গণসংগীত পর্যবেশিত হয় গণহীন সংগীতে। যত বেশী করে লোকশিল্পীরা দেশপ্রেমের বিষয়বস্তুকে একাত্ম করে নেবেন ততই লোকশিল্পের প্রকৃত রূপ

আকৃতি পাবে। লোকশিল্পকে শুধুমাত্র কৈবল্যবাদ নির্ভরতা থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনও যথেষ্ট রয়েছে। এবং গ্রামীণ শিল্পীদের পক্ষেই তা সম্ভব। তার মধ্যে রয়েছে গণসংগীতের পথের সন্ধান।

আলোচ্য গ্রন্থটি অতিকথনে জর্জরিত নয় বলেই পাঠকের ভালো লাগবে, গণনাট্য কর্মী ও গবেষকরাও যথোচিত উপকৃত হবেন। ঐতিহাসিক তথ্যের শুদ্ধতার প্রয়োজনে সামান্য দু-একটি কথা বলা দরকার। ২৬৩ পৃষ্ঠার শেষাংশে নিবারণ পণ্ডিত বলেছেন যে, নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত কিষাণ সভায় সারা ভারত সম্মেলনের কিছুদিন পুর্বে ময়মনসিংহ শহরে শম্ভু মিত্র, বিনয় রায় প্রমুখের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি মিলিত হয়েছিলেন। তাঁর লেখা কিছুদিন পূর্বে হয়তো কয়েক বছর পূর্বে হবে। কারণ ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের অনেক আগে থেকেই বিনয় রায় কেন্দ্রীয় গণনাট্য স্কোয়াডের সংগঠনের কাজে বোম্বেতে চলে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্র জন্মদিনে কবিতাটি কবি লিখেছিলেন ১৯৪৩ সালে। ঐ পৃষ্ঠার ফুটনোটে কায়ুরের শহীদদের অন্যতম কুশহামবু নায়ারের নাম ছাপার ভুলে "কুনজামন্থ" হয়েছে। অবশ্য ছাপার ভুলের সংখ্যা খুবই কম। ছাপাখানার কর্মীদের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। যথাযোগ্য স্থানে ফুটনোটের ব্যবহার সুন্দরভাবে সূত্রধরের কাজ করেছে।

"জনযুদ্ধের গান" গ্রন্থটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রচার কামনা করি। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের বহু লোকশিল্পীর অবদানসহ শিল্পীর পরিচয় আজ বিস্মৃত। তাঁদের যথাসম্ভব উদ্ধারের কাজে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত এ্যাকাডেমিকে এইসঙ্গে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানাই।

সাধন দাশগুপ্ত

জনযুদ্ধের গান—নিবারণ পণ্ডিতঃ সম্পাদনা—শান্তিময় গুহ। গণনাট্য প্রকাশনী, ১৩।১ ক্রীক লেন কলিকাতা-৭০০০১৪ কুড়ি টাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম

২২ নভেম্বর ১৯৮৭ স্টেটসম্যানে ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধির লেখা একটি প্রতিবেদন বেরয়। থ্রি রাজাস ফর বাংলাদেশ ট্রাইবস। তা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ সরকার অবশেষে তাঁদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির অন্যতম, চাকমা ও অন্যান্য উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘকালীন সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান করতে চলেছেন।

প্রতিবেদনে যেসব সরকারি সিদ্ধান্তের কথা আছে তার উল্লেখ পরে করা যাবে। যে কথা মূল্যবান তা গোড়ায় বলা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বিবিধ দাবিদাওয়া মেটাবার উদ্দেশে যে জাতীয় সমিতি তৈরি হয়েছে তার অন্যতম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খোন্দকার বলেছেন, "বিশ্বাস করুন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অতীতে আমরা অনেক ভুল করেছি, কিন্তু সেগুলি ইচ্ছাকৃত নয়।"

স্বীকারোক্তির ভাষা হৃদয় স্পর্শ করে এবং আশা জাগায়। কিন্তু ঘটে যাওয়া সরকারি ভুলগুলো কী আর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি মানুষ সেসব ভুলের কী মাশুল দিলেন তা জানতে ইচ্ছে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি মানুষের খবর এখন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা কাগজে পড়ছি ভিটেমাটি ছেড়ে সেখানকার মানুষ ভারতবর্ষে চলে আসছেন। উপজাতি অনাথ শিশুদের লালনপালনের ব্যাকুল তাড়নায় বেশ কিছু পশ্চিমী সেবাপ্রতিষ্ঠান তাঁদের পরম করুণাঘন শ্বেতহস্ত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রশ্ন জাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের এ তাড়া-খাওয়া-দশা কেন? কেনই বা সেখানকার শিশুরা সনাতনী ঔপনিবেশিক-শক্তির দেশগুলোর রকমারি ভণ্ড সেবাপ্রতিষ্ঠানের করুণার পাত্র হবে?

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি মানুষের সূত্রে যেসব প্রশ্ন আজ মানুষকে বিচলিত করে সিদ্ধার্থ চাকমা তাঁর 'প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম' বইয়ে তাদের পর্যালোচনা করেছেন। লেখক খুব কাছে থেকে সেখানকার সমস্যাগুলি দেখেছেন। আর তাদের নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরার চেষ্টায় বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকায় লেখা ও সাক্ষাৎকার প্রভৃতি মালমশলা ব্যবহার করেছেন।

আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম—খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাঙামাটি এই তিন

জেলা নিয়ে গড়া বাংলাদেশের একটি অঞ্চল। এর তিনদিক ঘিরে আছে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং ব্রহ্মদেশ। তিন জেলায় জাতিগতভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির তেরটি সম্প্রদায়ের বাস। তাদের নাম চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, রিয়াং (প্রকৃতি-পূজারী), খুমি, চাক, মুরুং, রিয়াং (বৌদ্ধ), বনযোগী, পাংকো এবং লুসাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠি উপজাতিরূপে পরিচিত। বৌদ্ধ, হিন্দু, প্রকৃতি-পূজারী ও খ্রিস্টান এই চার ধর্মমতের চর্চা এঁরা করে থাকেন। জনসংখ্যার বিচারে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী চাকমা উপজাতি এঁদের মধ্যে প্রধান।

যেমন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম একসময় ভারতবর্ষের অংশ ছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চিরকাল মূল ভূখণ্ডের জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছে। সেখানকার তেরটি উপজাতি তিন রাজার অধীনে তাঁদের ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি আর সমস্যার গণ্ডিতে আটকে থেকেছেন।

ইংরেজ আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন রাজার শাসন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়। ইংরেজ সরকার ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নন-রেগুলেটেড জেলার মর্যাদা দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম 'বহির্ভূত এলাকা' রূপে চিহ্নিত হয়। বিশেষ আইনের সুবাদে রাজা ও প্রজা উভয়েরই স্বস্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বেড়ে যায়। এই স্বস্তি নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা তাঁরা ভোগ করেন ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত।

১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ দু টুকরো হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে। ভারত ও পাকিস্তান—দুই নতুন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা-নির্ণয় জনজীবনে সংশয়, অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার লগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারত ও ব্রহ্মদেশের পতাকা ওড়ান হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ কোন দেশের নাগরিক হতে চলেছেন এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থেকে তাঁদের এ বিভ্রম। এর মূল্য তাঁদের দিতে হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও তাঁরা কখনো ভারতপন্থী কখনো বা ব্রহ্মদেশপন্থীরূপে সন্দেহভাজন হয়েছেন। জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে একাত্ম হতে পারেন নি।

কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও বাঁধের নির্মাণকার্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ আবাদী জমি নষ্ট হয়। উপজাতি চাষীরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও পেলেন না, বিকল্প জমিও পেলেন না। ফলে তাঁদের দুর্দশা বাড়ল।

পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও বাংলাদেশে রাষ্ট্রের জন্মপর্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়ের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। উপজাতিরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের শরিক হন নি। বরং 'জাতিগতভাবে আমরা বাঙালি নই' এ রকম একটা বক্তব্য নিয়ে তাঁরা জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের পাল্টা একটা স্রোত গড়ে তুলতে চাইলেন। রাজা ত্রিদিব রায় এবং অংশৈ প্রু চৌধুরী পাকিস্তান ফৌজের দুই সক্রিয় সহযোগী ছিলেন। উপজাতিদের মুক্তিযুদ্ধে টানার সুযোগ এসেছিল কিন্তু নেতারা তা কাজে লাগান নি। তার বদলে বাংলাদেশের নেতারা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়ে চললেন। উপজাতি জীবনে লুটতরাজ, পীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি নেমে এল। এরপর সরকারি প্ররোচনায় আর একটি নতুন উপদ্রব শুরু হল। তাঁরা সমতলের মানুষ এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢোকাতে লাগলেন। সমতলের মানুষ আর পাহাড়ি মানুষের মধ্যে শত্রুতা বাড়ল। পুলিশ-মিলিটারি রক্ষক না হয়ে ভক্ষক হলেন। ১৯৭৭-এর ২৬ ডিসেম্বর সামরিক কর্তৃপক্ষ আয়োজিত খাগড়াছড়ির এক জনসভায় মেজর জেনারেল মঞ্জুর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের হেঁকে বলে দিলেন, "আমরা তোমাদের চাই না। তোমরা যেখানে খুশি চলে যেতে পার। আমরা তোমাদের মাটি চাই।"

অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় অবশেষে মরিয়া হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি মানুষ নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন। তাঁরা বুঝলেন মানুষের মতো বাঁচতে চাইলে এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। ১৯৭৩-এর গোড়ায় তৈরি হল সশস্ত্র বাহিনী। তার নাম শান্তি বাহিনী। অস্ত্রের জবাব অস্ত্রে চলল। উপজাতিদের মধ্যে মাও-সে-তুঙের লাল চটি বইও ছড়াল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে উঠল।

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দাবি কী? দাবি চারটি। এক, শরণার্থী পুনর্বাসন বন্ধ করো। দুই, পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ফিরিয়ে নাও। তিন, আমাদের জমি ফিরিয়ে দাও। এবং চার, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাও।

লেখক সিদ্ধার্থ চাকমা ছটি অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভৌগোলিক অবস্থান, উপজাতি বিন্যাস, তাদের সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শেষে শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবিতে জনসংহতি সমিতির আবেদন, ১৯৭২ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০—দুটি মূল্যবান দলিলও জুড়েছেন।

এ বই পড়ে বোঝা যায় কোনো সময়েই জাতীয় নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি মানুষের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকান নি। হয়ত তা তাঁদের ছিল না। ফলে পাহাড়-জঙ্গলের সরল মানুষের মানবিক মর্যাদার ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ব্যাপার। কিন্তু অপমান, বঞ্চনা ও পীড়নের বিরুদ্ধে ওইসব মানুষ যখন মাথা তোলেন, অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্রে করেন, তখন নেতাদের সুর পালটায়। তখন তাঁরা বলেন, ভুল হয়ে গিয়েছে।

এই নতুন সুর স্টেটসম্যানের প্রতিবেদনে আশা জানাবার মতো কথাও আছে সেখানে। বাংলাদেশ সরকার অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কর্মসূচী প্রয়োগ করতে চলেছেন তাদের প্রথমটি হল, পুনরায় উপজাতি প্রথানুসারী রাজার-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন। দ্বিতীয়, সমতলবাসীর অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন নিষিদ্ধকরণ। তৃতীয়, গায়ের জোরে বা ঠকিয়ে উপজাতিদের যে সব জমি দখল করা হয়েছিল তা আবার উপজাতিদের প্রত্যর্পণ।

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের চারটি দাবিই মেনে নিচ্ছেন। শুধু তাই নয় তাঁরা সেই সমস্ত বিধিব্যবস্থা নিতে সংকল্পবদ্ধ, যার দ্বারা উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং আঞ্চলিক প্রশাসন পরিচালনে ও সামগ্রিক উন্নতিসাধনে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ্য ভূমিকা নিতে পারবেন।

সিদ্ধার্থ চাকমার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি এজন্যে যে তাঁর বইটি পড়া না থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনার বিষয়টি ভালো বুঝতে পারতাম না। এর পূর্বসূত্রও তাঁর বইতে পাওয়া যায়। ১৯৮৩-র ৩ অক্টোবর খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত তিনটি সভায় জেনারেল এরশাদ উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা ও বিকাশসাধনের উপযোগী কর্মসূচী নেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সে সূত্রে লেখক বলেছেন, "আশার কথা, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের কোন সরকার যা বলেন নি, তা বলিষ্ঠভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জেনারেল এরশাদ।" (প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৩২)

আশা করা যায় বাংলাদেশ সরকারের সহানুভূতি মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃত জাতীয় নীতি ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে টেনে নিতে পারবে।

এখন তো শুধু প্রতিশ্রুতি। সরকারের নীতি তাঁদের কাজে কী রূপ নেয় তা দেখার অপেক্ষা রাখে।

রণজিৎ সিংহ

প্রসঙ্গ: পার্বত্য চট্টগ্রাম—সিদ্ধার্থ চাকমা। পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৯২। দাম পঁচিশ টাকা।

লখনৌ ঃ সারাভারত বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা

৪২ দিন ব্যাপী সারাভারত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল লখনৌ-এ বেঙ্গলি ক্লাবের আয়োজনে। ৩৩টি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। ১২ ডিসেম্বর ৮৭ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত নাটক প্রতিযোগিতা চলে। এই দীর্ঘদিন ব্যাপী নাটকের প্রতিযোগিতা নাট্যচর্চার আন্দোলনে বিরল ব্যতিক্রম। প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতার রজত জয়ন্তী ছিল এই বছর। প্রতিযোগিতার দিনগুলিও উৎসবের এক-একটি দিন ছিল। উদ্বোধনের দিনে নাট্য আন্দোলনের অন্যতম কর্মী, অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার অশোক মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান বক্তা।

আয়োজক ও অংশগ্রহণকারী নাট্যদল সকলেই নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। প্রবাসী বাঙালিরা যেমন তাঁদের নাটক নিয়ে গেছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত নয় এমন 'গ্রুপ থিয়েটার' কে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। আবার অফিস ক্লাবগুলিও যোগ দিয়েছিল। নাটকের বিষয়বস্তুর সমাবেশ ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলো, শব্দ সংস্থাপন দলে দলে ভিন্নতা, কোথাও দক্ষতা দেখিয়েছেন, কোথাও আলগা হয়ে গেছে।

প্রায় সব নাটকই ছিল দুর্বল। অথচ অভিনয় শিল্প ও অনুষঙ্গ আয়োজনে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। নাটকের বিষয়ে সমাজ পরিবার ও তার সঙ্গে বিশ্বসমস্যাকে অন্বিত হতে দেখা গেছে। ইতিহাসের অনিবার্যতার ভেতরও ছিল নাটকের গতিপথ। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' এবং 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ। প্রতিবেশী ভাষার অনুবাদ নাটক বিজয় তেণ্ডুলকরের 'চোপ আদালত চলছে', বাদল সরকারের 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', প্রেমচাঁদের কাহিনী নিয়ে 'দানসাগর', উৎপল দত্তের 'তুরুপের তাস', চন্দন সেনের 'হিসাব শাস্ত' এবং ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অপারেশন ফাউস্টাস'।

হিজড়াদের জীবন নিয়ে লেখা নাটকটি, 'জীবন প্রশ্ন' অনেক বেশি প্রামাণিক বিশ্বস্ততা আশ্রয় করেছে। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে হিজড়াদের স্বভাবগত আচরণে শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিতে দেখা গেছে হাওড়া ই, পি থিয়েটারের শঙ্করীপ্রসাদ অধিকারীকে। দিনহাটার 'প্রগতিনাট্য' সংস্থার 'আলীবাবা পাঁচালী' নাটকে প্রত্যেকেই জমজমাট ভাল অভিনয় করেছেন। কলকাতা 'ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স' এর 'তুরুপের তাস' অভিনয় ছিল জমজমাট। চাকদহ নদীয়ার 'হ-য-ব-র-ল' 'হিসাবশাস্ত্র', নাটকের প্রযোজনাটি ছিল অনবদ্য, উল্লেখযোগ্য। এর কাছাকছি মানে যে-সব দলগুলি তাঁদের প্রয়োজনা করেছিলেন সেগুলি হল, বোম্বের 'লিটল পাইওনিয়র' 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', বাঁকুড়ার কোরাস'-এর 'দানসাগর', দিল্লির 'ধূমকেতু'-র 'উত্তরপুরুষ' 'যাযাবর'-এর 'খিদে'—কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্কের 'মুক্তিদীক্ষা', 'দুর্গাপুর কেমিকেল'-এর 'ডাইন', পশ্চিম দিনাজপুর 'স্ফুলিঙ্গ'-র 'তিতুমিরের লাঠি', 'হিল্লোল' নাট্যসংস্থার 'বিসর্জন', কলকাতা জি, ই, সি-র 'অপারেশন ফাউস্টাস'।

২৬ জানুয়ারি ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রযোজনায় তিনটি পুরস্কার। প্রথম, দিনহাটা 'প্রগতি নাট্য সংস্থা'র আলীবাবা পাঁচালী, দ্বিতীয়, হাওড়ার 'ই, পি থিয়েটারের 'জীবনপ্রশ্ন' এবং তৃতীয় পুরস্কারটি কলকাতার ন্যাসনাল ইন্সরেন্সের 'তুরুপের তাস' নাটক পায়। অভিনেতার দুটি পুরস্কার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্করীপ্রসাদ অধিকারী পেয়েছেন। দুজন অভিনেত্রী পুরস্কার পেয়েছেন, প্রথম স্বপ্না মিত্র, দ্বিতীয় ইতি চক্রবর্তী। পরিচালনায় দুটি পুরস্কারের প্রথমটি প্রগতি নাট্য সংস্থা ও দ্বিতীয়টি অমল বিশ্বাস পেয়েছেন।

ঐতিহ্যসমৃদ্ধ লখনৌর বেঙ্গলি ক্লাব এই প্রতিযোগিতাকে একই মঞ্চে ভৌগোলিক বিস্তৃতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও প্রবাসী বাঙালীদের নাট্যচর্চাকে মিলিত করতে পেরেছিলেন। এই প্রতিযোগিতাটি এক কথায় বলা যায় বাংলা নাট্যচর্চার অন্তর্গত এক ঘনিষ্ঠ সাহচর্য।

আফসার আমেদ

প্রসঙ্গ ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাস

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, পরিচয়,

আমি পরিচয়-এর আজীবন শুভানুধ্যায়ী এবং মনোযোগী পাঠক, অনেকদিনের কর্মী ও লেখক। কেউ যখন জানতে চান কোথায় লিখি, নির্দ্বিধায় বলি, পরিচয়-এ। পরিচয়কে আমি আমার পত্রিকাই ভাবি। সেই পরিচয়েই এই চিঠি লেখা।

জানুয়ারি সংখ্যায় (১৯৮৮) প্রয়াত গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাক্ষাৎকারটি একবার পড়ার পর আরো কয়েকবার পড়তে হলো। মনে হলো, লেখাটির এই প্রকাশ কিছু অবিচার করেছে, হেমাঙ্গদা এবং পরিচয় উভয়ের প্রতিই। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সৌরি ঘটক। যতদূর মনে করতে পারি বছরকয়েক আগে সৌরীবাবু গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকজন পুরোধার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিলেন অধুনালুপ্ত 'শিলাদিত্য' পত্রিকায়। বর্তমান সাক্ষাৎকারটি পড়তে ও বুঝতে সুবিধা হতো যদি উত্তরের আগে আগে প্রশ্নগুলিও থাকত। প্রশ্ন থেকেই তো উত্তর আসে।

লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে "তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল ৪০-এর দশকে গণনাট্য ও প্রগতি লেখক আন্দোলন যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিল তা ধীরে স্তিমিত হয়ে এল কেন? কেন দিন দিন তরুণ প্রজন্মের কাছে এর আবেদনগ্রাহ্যতা কমে যাচ্ছে?"—ফলে, আমাদের ধরে নিতেই হয় হেমাঙ্গদা যা কিছু বলেছেন তা-ই এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্য।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরো বলা হয়েছে, "প্রয়াত শিল্পী খোলা মনে অনেক কিছু বলেছেন যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শিল্পভাবনা, ক্ষোভ, ব্যথা, আশা, আনন্দ সব কিছু···গণসংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কে হেমাঙ্গদার একটি সার্বিক মূল্যায়ন। একালে যাঁরা এই ধারার সাধক তাঁদের এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। তাই এটি প্রকাশ করা হচ্ছে।"

প্রশ্নগুলির অনুপস্থিতিতে আসলে আমরা যা পাই তা কিছু মন্তব্য। নানা ঘটনা, আন্দোলন, সংগঠন ও ব্যক্তি সম্পর্কে ছাড়া ছাড়া কিছু মন্তব্য। মন্তব্যগুলি যতো মর্মান্তিকই হোক তার মর্মে প্রবেশ করা মুশকিল, কারণ যাঁর মন্তব্য বলে ছাপা হয়েছে তিনি নেই। থাকলে সহজে করা যেত, একটা বিতর্ক হতে পারত, যদিও মন্তব্যের অনেকগুলিই এমন সব বিশিষ্ট এবং ত্যাগী ও সংগ্রামী মানুষ সম্পর্কে যাঁদের অনেকেই প্রয়াত। অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। (১) "এর সবচেয়ে ভালো উপমা কবি বিষ্ণু দে। এঁর কবিতা মানুষে বোঝে না। অথচ ইনি একজন বড় কমিউনিস্ট কবি।" (রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিশ্বের সমস্ত সময়ের-চেয়ে-এগিয়ে-থাকা জাতকবি সম্পর্কেই বোধহয় এমন মন্তব্য শোনা গেছে)। আবার মন্তব্য সলিল চৌধুরীর "অত্যন্ত

চটুল প্রেমের গান" নিয়েও। এবং এ প্রসঙ্গে পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য: "তখন পার্টি নেতাদের যুক্তি ছিল—'বুর্জোয়ারা তা এদের স্বীকার করে'!"

(২) "পার্টি সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে কতটা তাচ্ছিল্য দেখাত তো বোঝা যায় এই ফ্রন্টের চার্জে কখনও থাকতেন নিরঞ্জন সেন, কখনও খাঁ সাহেব (আবদুর রেজ্জাক খাঁ)।" আবার, "সরোজ মুখার্জিকে এ কথা বলতে গেলাম। তিনি বললেন, এসব দেখা তাঁর দায়িত্ব নয়।"

(৩) "কলকাতার কালচারাল গ্রুপটা বরাবরই খুব উন্নাসিক...এছাড়া কলকাতার লেখক শিল্পীদের মধ্যে বড্ড দলাদলি।

(৪) "আজকাল বাড়ির ছোট মেয়েটা পর্যন্ত সকালে উঠে মান্না দে, লতা মঙ্গেশকরের গান শোনে।...অথচ এগুলো নিকৃষ্ট প্রেমের গান।"

(৫) "ধরা যাক সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজংঘা ছবি। বিষয় হল দার্জিলিং-এ বড়লোকের ছেলেমেয়েদের প্রেম। অথচ সেখানকার স্থানীয় নেপালি অধিবাসী কি চা বাগানের শ্রমিক ছবিতে এল না।"

মন্তব্যগুলির কোনটিই যুক্তি ও ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত নয়, অবশ্য প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টাও হয় নি। এবং এগুলি এতোই ছাড়া ছাড়া, ঘরোয়া আড্ডায় যেমন ঘটে থাকে, এক মন্তব্যের সঙ্গে পরেরটির যোগসূত্র বুঝে ওঠাই দায়। বরং যেন কমিউনিস্টে কমিউনিস্টে ঘরে বসে একান্ত আড্ডায় লাগামছাড়া কথাবার্তার মতো। এইসব মন্তব্য "গণসংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কে হেমাঙ্গদার একটি সার্বিক মূল্যায়ন," এমন কথা ভাবা কঠিন ও বেদনাদায়ক। এমন দাবি তিনি নিজেও করতেন না হয়তো। এ মন্তব্য তাঁর প্রতি সুবিচার করে না, যেমন করে না বিষ্ণুদের মতো বড় মাপের কবি, সত্যজিৎ রায়ের মতো বড় মাপের চলচ্চিত্রকার, খাঁ সাহেবের মতো সংগ্রামী কমিউনিস্ট এবং নিরঞ্জন সেনের মতো সমর্পিতপ্রাণ, স্থিতধী কমিউনিস্ট সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যরাজি অথবা পার্টির ভূমিকার নেতিবাচক দিকটিই সমগ্র বলে মনে হওয়ার মতো তাঁর কথাগুলি। বস্তুতঃ পার্টি সম্পর্কে মন্তব্যগুলি থেকে "একালে যাঁরা এই ধারার সাধক" তাঁরা যদি ধরে নেন, পার্টি অতি ভয়ংকর বস্তু, তবে তাঁদের বড় দোষ দেওয়া যাবে না। এটা নিশ্চয়ই হেমাঙ্গদার অভিপ্রেত নয়। অন্যদিকে সংস্কৃতি, রাজনীতি ও পার্টি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের অনেকগুলিই সঙ্গতিহীন এবং পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে। যেমন, "Dogmatism সব সময় dominate করেছে। আমরা শুধু ঘটনার tailism করেছি" এই মন্তব্যের কিছু পরেই, "আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ধীরে ধীরে অর্থনীতিবাদে ঢুকে গেল। ফলে কালচারাল মুভমেণ্ট শুকিয়ে গেল। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করার কাজ বাদ পড়ে গেল।"

অথচ এইসব ভুল রাজনীতির সময়ে ও নেতৃত্বে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্যঃ "আমি এই সময়ে 'মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গল কাব্য' লিখি। এটাও সমাদৃত হল। কিন্তু কেন? কারণ আমাদের তখনকার এইসব সৃষ্টির একটা Positive দিক আছে। নইলে স্বীকৃতি পেলাম কেন?"

রাজনীতির লাইনটা ভুল কিন্তু সে লাইন থেকে জন্ম নেওয়া সংস্কৃতিটা ঠিক, এমন ধারণার সঙ্গতি ও সারবত্তা নিয়ে সংশয় দেখা দিতেই পারে। বিশেষ করে যখন রবীন্দ্রগুপ্ত নামে ভবানী সেনের "সংকীর্ণতাবাদের দোষে দুষ্ট" প্রবন্ধ সম্পর্কে বলা হয়, "তখন ভবানীবাবুর মাথায় ছিল সব কিছুই Telengana way···এই প্রবন্ধ শুধু একটা সমালোচনা নয়, এটা একটা outlook-এর প্রতিফলন।" এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতি-ইতিহাসের ছাত্রের কিছু অপূর্ণতার কথাও মনে হতে পারে। ভবানী সেন অমন লেখা লিখেছিলেন এ-ও যেমন ইতিহাস, তিনি নিজেই সে ভুল পার হয়ে, নিজের ত্রুটি স্বীকার ও শোধন করে রবীন্দ্রনাথের অন্য মূল্যায়ণ করেছিলেন, এটাও তেমনি সত্য।

এহো বাহ্য! হেমাঙ্গদা ছিলেন সংগ্রামে সমর্পিত-প্রাণ গণশিল্পী। তাঁর চিন্তাভাবনা সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়েছে মৃত্যুর দিন অবধি। সেই কারণেই নানা পথে হেঁটে জীবনের শেষ দিকে তিনি আবার তাঁর আদি পার্টির খুব কাছে চলে আসতে পেরেছিলেন। পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে। পশ্চিমবঙ্গে আই-পি-সি-এ'র সভাপতিপদে ছিলেন। সর্বভারতীয় মঞ্চেও ক্রমশ খুঁজে পাচ্ছিলেন নিজেকে। স্বভাবতঃই সাত-আট বছর আগের ধ্যানধারণা আঁকড়ে ছিলেন না তিনি। একথার সত্যতা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব জানেন। এদানিং তিনি কীভাবে পার্টির নেতৃত্বে এবং পার্টির রাজনীতি অনুসরণ করে কাজ করছিলেন তা বিশদে জানেন সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের ভারপ্রাপ্ত পার্টিনেতা নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। আমরাও কিছু জানি। কিন্তু পরিচয়-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাত-আট বছর আগের কিছু মন্তব্য। সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয় একাশি সালের পনেরোই মে। এ প্রকাশ তাই তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি।

অন্যদিকে এযুগের তরুণ সংস্কৃতি কর্মীকে নিদারুণ সংশয়ে ফেলে দেয় এইসব মন্তব্য। এমনিতেই বাম-দক্ষিণ উভয় দিক থেকেই জীবনের এই ক্ষেত্রে যখন সংশয় ও ভেদাভেদের বিষ ছড়ানো হচ্ছে প্রাণপণে। কাজেই "একালে যাঁরা এই ধারার সাধক তাঁদের এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার," এমন মন্তব্য পরিচয় এর মতো ঐতিহ্যসমৃদ্ধ, প্রগতিপথে অঙ্গীকারবদ্ধ, গুণীজনমহলে সমাদৃত এবং দায়িত্বশীল সাহিত্যপত্রের শোভা পায় কি? খুব বিনীতভাবে পত্রিকার বিশিষ্ট কবি-সম্পাদককে এবং সম্পাদকমণ্ডলীর বিদ্বজন সদস্যদের ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

প্রীত্যন্তে,
আপনাদের
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ চিন্মোহন সেহানবীশের সাক্ষাৎকার

মাননীয় সম্পাদক

'পরিচয়' সমীপেষু;

'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় (১৩৯৪) সংখ্যায় আমার দ্বারা গৃহীত শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ-এর সাক্ষাৎকারটির দুটি 'ভুলের দিকে' শ্রীসুস্নাত দাশ পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, "১৯৮৬-এ প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠার পর্বে..." ইত্যাদি। সালটা হবে '১৯৩৬'।" বলা বাহুল্য, এই প্রমাদের জন্য আমি বা প্রয়াত শ্রীসেহানবীশ—কেউই দায়ী নই। এটি একান্তভাবেই মুদ্রণ বিভ্রাটের ফল।

দ্বিতীয় যে প্রমাদের কথা সুস্নাতবাবু উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি সাক্ষাৎকারের নিম্নোক্ত অংশ তুলেছেন—"এখনকার যে মস্ত বড় প্রফেসর সুশোভন সরকার এব্যাপারে খুবই জড়িত ছিল। অবশ্য তখন সে একেবারেই বালক।..." ইত্যাদি। পত্রলেখক মন্তব্য করেছেন, "খুব সম্ভব 'সুশোভনের' স্থলে ওটি হবে অধ্যাপক সরকারের বালক পুত্র 'সুমিত'।

যখন এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করতে নিয়মিতভাবে শ্রীসেহানবীশ-এর কাছে যেতাম, তখন দেখেছি, আমার মত প্রাপ্তবয়স্কা যুবতীকেও তিনি স্নেহচ্ছলে কখনো কখনো বালিকা বলে সম্বোধন করতেন। অনেক প্রবীণ ব্যক্তি তাঁদের চাইতে বয়সে ছোটদের ছেলেছোকরা বলে উল্লেখ করে থাকেন। আমি নিশ্চিত, চল্লিশের দশকের একান্ত যুবক সুশোভন সরকারকে শ্রী সেহানবীশ ঐ একইভাবে 'বালক' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

বিস্ময়কর হল, সুস্নাতবাবু সাক্ষাৎকারদাতাকে শুদ্ধ (!) করে দিয়ে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন—"উল্লিখিত বালকটি সুশোভন নয়, তাঁর পুত্র 'সুমিত'।" বেশি কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বলে পত্রলেখককে শুধু এ টুকুই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—সুমিত সরকারের তখন জন্মই হয়নি।

বিনীত

সন্ধ্যা দে

কলকাতা-২৬

PARICHAYA FEBRUARY 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : তিন টাকা

পরিচয়

৫৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা মার্চ ১৯৮৮ ফাল্গুন ১৩৯৪

স্মৃতিকথা

প্রবন্ধ

আলোচনা

গল্প

কবিতাগুচ্ছ

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

কমিউনিস্ট গণসঙ্গীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস

কিছু স্মৃতিকথা

জ্যোতির্ময় নন্দী

গৌরচন্দ্রিকা

বঙ্গ তথা ভারতের লোকগীতি এবং গণসঙ্গীতের অন্যতম আধুনিক প্রবক্তা, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রয়াণের পর তার অবস্থান, অবদান সম্পর্কে নানা ধরনের মূল্যায়ন আরম্ভ হয়েছে।

তার জীবিতকালেও তাকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিতর্ক হয়েছে। জবাবে তিনি, কিছু কিছু কথা বলেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি নিজে বইও লিখে গিয়েছেন। আমি এ বিতর্কে যাব না—জ্ঞান তেমন নেই বলেই।

যেহেতু ছেলেবেলা থেকেই আমরা ছিলাম পরিচিত এবং পরে একটা অধ্যায়ে তিনি—ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, আমি ছিলাম তখনকার পার্টি নেতৃত্বের একজন, কাজেই অনুরোধ এসেছে তাঁকে কখন কিভাবে দেখেছি তা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে বলতে।

প্রথমেই বলে রাখছি, স্মৃতিই লেখার প্রধান উপজীব্য—কাজেই তা ত্রুটিপূর্ণ হবার কথা।

হেমাঙ্গ আর আমি ছিলাম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তার নিজের গ্রাম মিরাশি আর আমার বেজুড়া। দুই-ই ছিল অবিভক্ত ভারতের, অসম প্রদেশের বঙ্গভাষী প্রাক্তন জেলা শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমায়।

হেমাঙ্গর মামার বাড়ি ছিল আমাদেরই গ্রামে। তার দাদামশায় ছিলেন আমার বাবার আপন পিসতুতভাই এবং এক পর্যায়ে বাবার অভিভাবকেরই মত। তাঁর ছেলেমেয়ে সবারই ছিল ভাল গানের গলা। হেমাঙ্গর মা-ও ছিলেন সুগায়িকা।

মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে হেমাঙ্গও মামার বাড়িতে এলে প্রথমেই ছুটে আসতেন আমাদের বাড়িতে। তার গান শুনতে আমার যেমন ভাল লাগত তেমনি আমার মা বাবাও ছিলেন অনুরাগী শ্রোতা।

নিজেদের বাড়িতে কড়া মেজাজের রাশভারি বাবার শাসনে হেমাঙ্গকে বেশ জড়সড় হয়ে থাকতে হত। মামার বাড়িতে সে তুলনায় ছিল অবাধ স্বাধীনতা। আর তাই বেজুড়ার কটা দিন তার কাছে হত অত্যন্ত আনন্দের।

স্বামী মুক্তানন্দের আশ্রমে

বাবা ছেলের মতিগতি লক্ষ্য করে হেমাঙ্গকে পাঠিয়ে দিলেন ডিব্রুগড়ে, তাঁর গুরু স্বামী মুক্তানন্দের আশ্রমে। আশা করেছিলেন আশ্রমের অনুশাসন তাঁর ছেলেকে একদিকে লেখাপড়ায় যেমন মনোযোগী করতে পারবে, তেমনি খেলাধূলা বা গানবাজনাও হবে সুশৃঙ্খল ভাবে।

বাবার আশা বিশেষ সফল হল না বটে, তবে ঐসময়ে হেমাঙ্গর কিছু লাভ হয়। তিনি অসমীয়া ভাষা এবং গান দুটি বেশ কিছুটা আয়ত্ত করতে পারলেন।

অবশেষে তাকে আবার হবিগঞ্জে এনে সেখানকার বেসরকারি হাইস্কুলে ভর্তি করা হল। অভিভাবক তারই ভগ্নিপতি। আমি তখন হবিগঞ্জেই পড়ি—সরকারি হাইস্কুলে। বেশ কিছুকাল পরে আবার আমরা নিয়মিত মেলামেশার সুযোগ পেলাম।

এ-পর্যায়ে হেমাঙ্গর অভিভাবক ছিলেন কিছুটা উদার প্রকৃতির, অথচ আমার অভিভাবক ছিলেন অপেক্ষাকৃত কড়া।

দুজনই দুই স্কুলে হলেও একই ক্লাসে পড়তাম বলে পড়াশুনার ব্যাপারে আমার কাছে হেমাঙ্গ এলে আমার অভিভাবক পরিবারের কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু একই কারণে আমি যদি তার ভগ্নিপতির বাসায় যেতাম তাহলে তাঁরা প্রায়ই আপত্তি করতেন। তার ফলে আমার পড়াশুনা ব্যাহত হতে পারে—ওই ছিল তাদের ধারণা।

বলে রাখা ভাল, আমার হবিগঞ্জের অভিভাবক আবার ছিলেন হেমাঙ্গরই আপন পিসেমশাই। তাঁদের ধারণা ছিল 'লালু' (হেমাঙ্গ) পড়াশুনা করার চেয়েও খেলাধূলা, গানবাজনা আর গল্পগুজব করাতেই বেশি পটু। আর আমি মোটের উপর একজন 'ভাল ছাত্র'।

এভাবেই একই বছরে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে আমি চলে গেলাম ঢাকায় পড়তে। আর হেমাঙ্গ সিলেট শহরের মুরারি চাঁদ কলেজে। ফলে কিছুকাল আর আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

তারপর দেখা হল তিনি যখন আইন অমান্য আন্দোলনের একজন

স্বেচ্ছাসেবক হলেন তখনই। আর আমি তখন বঙ্গপ্রদেশ থেকে কার্যত বহিষ্কৃত হয়ে হবিগঞ্জ মহকুমাতে নজরবন্দী।

আইন অমান্য আন্দোলনে হেমাঙ্গ

তার মাসিমা প্রয়াত সরলাবালা দাশ ছিলেন শ্রীহট্ট জেলার কংগ্রেস আন্দোলনের একজন স্বীকৃত মহিলা নেতা। তিনি তখনকার জেলা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় কর্মী বীরেশ মিশ্রকে নিয়ে বেজুড়াতে এলেন। সঙ্গে রয়েছেন হেমাঙ্গ। উদ্দেশ্য আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচার।

দুজন অনেক দিন পর মিলিত হলে সেদিন যে কত আনন্দ হয়েছিল আজও মনে আছে। একে অপরকে বিচ্ছেদকালের বৃত্তান্ত জানাতেই অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল সেদিন।

বুঝলাম, হেমাঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় যোদ্ধা হবার ব্রত নিয়েছেন। আমি অবশ্য তখনও মন স্থির করতে পারি নি।

হবিগঞ্জের ঋষিপ্রতিম কংগ্রেস নেতা শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাসের কাছে মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জানাতেই তিনি বললেন; "তুমি বরং সংগ্রামের রসদ সংগ্রহে মনোনিবেশ কর।" তাই করতে লাগলাম। গ্রামের যুবকদের একটা গোষ্ঠীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অর্থাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তখনই এক পর্যায়ে শুনতে পেলাম হেমাঙ্গ সত্যাগ্রহ করে কারাদণ্ডিত হয়েছেন।

এল রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের দেউলে অধ্যায় এবং ৩২-এ আবার আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার ব্যর্থ প্রয়াস। অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ইত্যাদির পর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও হতোদ্যম।

আমার মত-পরিবর্তনের পালা

এমন একটি পর্যায়েই সাক্ষাৎ ঘটল নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের ছোট ভাই নবেন্দুর সঙ্গে। এক অভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে। তার কাছ থেকেই পেলাম 'Socialsm : Utopia of Scientific', 'Communist Manifesto' 'Family Private Property and State'-এর মত কয়েকটি অমূল্য উপহার।

তিনিই সন্ধান দিলেন কলকাতার 'বর্মণ পাবলিশিং হাউস' এবিষয়ে কিছু কিছু বাংলা বইও প্রকাশ করেছে। হঠাৎ সুযোগও এল। কয়েকদিন পরেই আমাদের নিকট প্রতিবেশী এক পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্রজবিহারী বর্মণ

এলেন হবিগঞ্জে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা করে তাঁর শরণাপন্ন হতে তিনিও তাঁর সঙ্গে যে কখানা মার্কসবাদী লেনিনবাদী বই ছিল সেগুলি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন: "এগুলি তোমাকে উপহার দিলাম। পড়ে জানিয়ো কেমন লাগল। আরো পাঠাব।"

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম। গোগ্রাসে বইগুলি পড়লাম এবং তুয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও পড়ালাম। তখন যে কজনকে ঐগুলি পড়ানো গেল না বলে আফশোস হচ্ছিল হেমাঙ্গও ছিলেন তাদের একজন।

তারপর কতকগুলি যোগাযোগের মাধ্যমে কলকাতায় চলে এলে প্রথমেই কথাবার্তা হল নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সঙ্গে (নবেন্দুরই মাধ্যমে)।

আমি অল্পদিনের মধ্যে মন স্থির করে চলে গেলাম গার্ডেনরীচ অঞ্চলে মুখ্যত তখনকার 'হাড্ডিকল' বলে পরিচিত 'গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ'-এ ইউনিয়ন গড়তে, শ্রমিকদের মধ্যে থেকে—বাইরে থেকে গিয়ে নয়। তখন আমাকে খিদিরপুরের ডক শ্রমিক ইউনিয়নের কাজেও সহযোগিতা করতে হত।

আমার কারাদণ্ড: হেমাঙ্গর যক্ষ্মারোগের সংবাদ

এল ১৯৩৪-এর খিদিরপুরের ঐতিহাসিক ডক শ্রমিক ধর্মঘট।

তাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান, সংগ্রামী শ্রমিকের জঙ্গী অথচ সুশৃঙ্খল সংগঠন সামর্থ, অগ্রণী শ্রমিকদের প্রখর রাষ্ট্রশক্তি চেতনা—এসবই স্বচক্ষে দেখলাম তাদেরই শরিক হয়ে। তারপর তুই রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতার দায়ে তিন বছরের জন্য হল কারাবাস তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিরূপে।

কলকাতায় অবস্থানকারী আত্মীয়রা এসে জেলে সাক্ষাৎ করে একদিন জানালেন হেমাঙ্গ জেলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁকে তখনকার ফরিদপুর টি. বি হাসপাতালে আনা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হেমাঙ্গের পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ। তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আমার হয়ে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনার কথা জানান। পরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাক্ষাৎকারের সময় তিনি যখন জানালেন হেমাঙ্গ রোগমুক্ত না-হলেও বিপদ মুক্ত হয়েছেন, তখন যে কত আশ্বস্ত হয়েছিলাম আজও ভুলি নি।

তারপর এক সময়ে 'অবাধ্য কয়েদি' হিসাবে জেলের টিকেট রঙীন হওয়ায় আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।

অবশেষে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসেই বোধহয় দমদম জেল থেকে মুক্তি

পেয়ে কলকাতায় বন্ধু ও কমরেডদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জানতে পারলাম হেমাঙ্গকে তার বাবা শিলং-এ একটি বাড়ি ভাড়া করে নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন।

শ্রীহট্ট জেলায় আমার স্থানান্তরণ

কলকাতায় ১৯৩৮-এর মে দিবসের সমাবেশে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা ঘোষণা করেছিলেন যে, অন্যান্যের সঙ্গে আমিও মুক্ত হয়েছি এবং আবার আমি গার্ডেনরিচ খিদিরপুর অঞ্চলেই কাজ করব। আর আমিও মনে মনে সেকথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বাস্তব তা হতে দিল না।

কুমিল্লায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতা থেকে আমিও গেলাম। আর সেখানেই শ্রীহট্ট জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিদের দাবিতে বাধ্য হলাম মত বদলাতে। শ্রীহট্টের কমরেডরা বঙ্কিমদা এবং অন্যান্য পার্টি নেতাদের এমনভাবে চেপে ধরলেন যে শেষ পর্যন্ত তারাও এতে সম্মতি জানাতে বাধ্য হন।

হেমাঙ্গর সঙ্গে আবার দেখা

শ্রীহট্ট জেলাতে স্থানান্তরিত হতেই আমার উপর পার্টি শিক্ষা, প্রচার এবং পার্টির সাপ্তাহিক 'নয়া দুনিয়া' পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

বিশেষত কলকাতায় ডক শ্রমিক ধর্মঘটের সময় সাংবাদিকতায় আমার হাতে খড়ি হয়েছিল। তাছাড়া তার আগে শ্রীহট্টের কোন কোন পত্র পত্রিকায় আমার কিছু লেখা প্রকাশিত এবং কিছুটা আদৃত হয়েছিল। বোধহয় সেই সুবাদেই আমার উপর শেষোক্ত ভারও পড়েছিল।

আমার কয়েকটি বাড়তি দায়িত্ব হল, তখনকার অসম বিধানসভায় পার্টির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সমর্থক কংগ্রেসী এম এল এ করুণাসিন্ধু রায়কেও কিছু কিছু কাজে সাহায্য করা।

ফলে বিধানসভায় অধিবেশন কালে তো বটেই তাছাড়াও মাঝে মাঝেই যেতে হত শিলং-এ। আবার দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর হেমাঙ্গর সঙ্গে হতে লাগল দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা।

বোঝা গেল, আমাদের রাজনীতি সম্পর্কে তার সংশয় থাকলেও কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনীতি সম্পর্কে কোনও দ্বিধা ছিল না। তার প্রধান আকর্ষণ তখনও সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি।

ঐ কালপর্বে শিলং-এর একটি প্রধানত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর (যার নাম বোধহয় ছিল 'বোধচক্র') সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়।

আমার ডাক পড়ল সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনার জন্য। যতটা জানতাম ও বুঝতাম তা যথাসম্ভব সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করলে তাদের মধ্যে কয়েকজন পৃথকভাবেও এবিষয়ে আরও বিশদ আলোচনার জন্য যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলেন। আমিও যথাসাধ্য তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলাম।

শিলং-এ 'এ্যাকটিভিস্ট গ্রুপে'র হেমাঙ্গর সঙ্গে সেতুবন্ধ

শ্রীহট্ট জেলার পার্টি নেতৃত্বের কাছে এ রিপোর্ট দিতেই কয়েকজন নেতা আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সমর্থকেরও সন্ধান দিলেন।

শিলং-এ ছাত্র ফেডারেশনের একটি ইউনিট গঠনের জন্য তখনকার ছাত্রনেতা সত্যব্রত দত্ত শিলং-এ গেলেন। 'বোধচক্রের' ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য পার্টি সমর্থক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হল। যার প্রধান হলেন অঞ্জলি দাশ (পরে লাহিড়ী)।

ঘনিষ্ঠ পার্টি দরদিদের নিয়ে পরে শ্রীহট্ট জেলা পার্টির সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস, আমি এবং বারীন দত্ত গঠন করলাম একটি 'এ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ'। তারও নেতা হলেন অঞ্জলিই। অন্যান্য কাজের মধ্যে হেমাঙ্গর সঙ্গে যোগাযোগ করা, নিয়মিত পার্টি পত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং মাঝে মাঝে ফলমূল ইত্যাদি দেবার ভারও তারা নিলেন।

ফলে একদিকে যেমন পার্টি নীতি ইত্যাদির সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তেমনি তার আসল প্রতিভা, গান রচনা ও তা পরিবেশনেরও একটা মাধ্যম তিনি পেয়ে গেলেন। বোধহয় পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার প্রধান রাজপথও তার কাছে তুলে দিয়েছিলেন আমাদের এ্যাকটিভিস্টরাই।

১৯৩৮-এর শীতকালীন অধিবেশনের সময় অসম বিধানসভা এবং শিলং এক অভূতপূর্ব অভিযান প্রত্যক্ষ করে। শ্রীহট্ট জেল থেকে কৃষকদের এক মিছিল পায়ে হেঁটে দুস্তর পাহাড় অতিক্রম করে শিলং-এ উপস্থিত হয় মুখ্যত 'শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ত বিল' নামক একটি বিলকে আইনে পরিণত করার দাবি জানাতে। অবিভক্ত অসমের রাজনৈতিক জীবনে তখনকার রাজধানী শিলং-এ আর কখনও এরকম অভিযান সংগঠিত হয়নি।

হেমাঙ্গ ঐ অভিযাত্রী দলকে স্বাগত জানিয়ে একটি গান লিখেন এবং তারই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয়ে পার্টির এ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ গানটি পরিবেশন করেন এমন দৃপ্ত ও পরিশীলিত ধরনে যে তা এমনকি অভিযাত্রিদের অভীষ্টের সঙ্গে একমত নন এমন বহু ব্যক্তিকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সেদিন সব কথা শুনে হেমাঙ্গ যে-মন্তব্য করেছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায় গান অনেক লিখেছি, গেয়েছি এবং গাইয়েছি। তবে তার আগে বোধহয় এত সার্থকতার প্রসাদ কখনও পাইনি।

এক পর্যায়ে অসম বিধানসভায় তখনকার মুসলিম লীগপন্থী সাতুল্লা মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং অসম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার।

এই উপলক্ষে তখনকার কংগ্রেক সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু শিলিং-এ এলে শ্রীহট্ট জেলার কংগ্রেসসেবীরা হেমাঙ্গকে মাদ্রাজের ভেলোর বা অন্য কোনো সমপর্যায়ের হাসপাতালে পাঠিয়ে পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। সুভাষচন্দ্র মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী সি. রাজগোপালচারিকে তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালে তিনি তেমন ব্যবস্থাই করেন। হেমাঙ্গকে বোধ হয় ভেলোরেই কিছুকাল রেখে সেখানকার চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচর্যা করে ফেরত পাঠান এই বলে যে, তার যক্ষ্মারোগের নামগন্ধও আর নেই। একটা প্রণালীবদ্ধ জীবন যাপন করলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে কাজকর্ম করে যেতে পারবেন। তবে এক নাগাড়ে বেশি শারীরিক শ্রম বা মানসিক চাপ সহ্য করা তার পক্ষে অসুবিধাজনক হবে।

তখনও হেমাঙ্গ সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিরই ছিলেন ভক্ত। কমিউনিস্ট মতবাদ এবং সুভাষের রাজনীতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাও তিনি করতেন।

* * *

কিভাবে কখন তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন তার নানা বিবরণ নানা স্থানে প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়তো আরও হবে। তবে বর্তমান লেখকের সুচিন্তিত ধারণা, সুভাষচন্দ্র অবশেষে অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে প্রথমে বার্লিনে এবং পরে টোকিওতে যাবার পথ ধরলে তখনই তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আমার বা শ্রীহট্ট জেলা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোনও কোনও কমিউনিস্ট প্রতিনিধির নিরন্তর সংযোগও এ সিদ্ধান্ত নিতে তাকে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অন্য কথা।

সবসময়ের পার্টিকর্মী হেমাঙ্গ

হেমাঙ্গ পার্টির সবসময়ের কর্মীরূপে কাজে লেগে যেতেই গোড়াতে তিনি সিলেট শহরে তাদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিবারেই থাকতেন। কিন্তু কিছু-কাল পরেই বোঝা যায় যে, সে বাড়িতে থেকে তার কর্তব্য ভালভাবে করা যাবে না। তখন তাকে পার্টির এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সমর্থক পরিবারে রাখার ব্যবস্থা হয়। প্রথমোক্ত পরিবারের মত ধনী শেষোক্ত পরিবারটি ছিল না। তবে সেখানে তিনি অনেক বেশি সহজ স্বাচ্ছন্দ্য পেলেন।

প্রথমোক্ত পরিবারের কর্তা ও গিন্নী দুজনই তাতে ক্ষুব্ধ হন।

পরেও দেখেছি, এধরনের পরিস্থিতিতে হেমাঙ্গ প্রায়ই অপরপক্ষের মনোভাব অনুমান করে সহজ ও সুন্দরভাবে তার নিষ্পত্তি করতেন বা করতে পারতেন না। মনে হচ্ছে এই সমস্যার মীমাংসা করতেও আমাদের ছুটতে হয়েছিল সে বাড়িতে।

শ্রীহট্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলনে

শ্রীহট্ট জেলাতে প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনে প্রথমে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ মাসিকপত্র 'বলাকা' এবং তার সম্পাদক কালিপ্রসন্ন দাশ এবং অবশ্য সাপ্তাহিক 'নয়া দুনিয়া' বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপর গণনাট্য আন্দোলন এবং বিশেষ করে হেমাঙ্গ তাতে এক বিশিষ্ট মাত্রা যোগ করেন। কিন্তু তার পর্যালোচনা আমি করব না।

পার্টি তাকে শ্রীহট্ট জেলাতে প্রথমে পার্টির সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গড়ার কাজেই ব্রতী করেছিল এবং তারপর ক্রমে ক্রমে এলো গণনাট্য সংঘ গড়া ও তাকে প্রসারিত করার দায়িত্ব।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, একাজে পার্টি তাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেও, যাকে বলে রাজনৈতিক সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেওয়া, তা তখনকার জেলা পার্টি নেতৃত্বের সামর্থ্যের বাইরেই ছিল। কখনও কখনও প্রশ্নটি যে জেলা নেতৃত্ব সামনে আনেন নি তা নয়। তবে তাকে সুবিন্যস্ত করে সাধারণ দিগ্‌দর্শনের বেশি কিছু দিতে তারা পারেন নি। এটাই আমার ধারণা। কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জি উপস্থিত থাকলে আলোচনা অপেক্ষাকৃত উন্নত হত। এই পর্যন্তই। আসলে তার বাস্তবিক পরিচালনা তো বটেই এমনকি সময় সময় বাস্তব দিগ্‌দর্শনও স্থির করতে হত হেমাঙ্গ এবং তার কিছু সংখ্যক অগ্রণী সহযোগীকেই।

হেমাঙ্গ পার্টিতে এসেই পান সিলেট, সুবাসগঞ্জ, হবিগঞ্জ, শিলচর, শিলং ইত্যাদি শহরে পার্টি ও পার্টি পরিচালিত গণসংগঠনগুলির একদল গায়ক ও শিল্পীকে, যারা ইতিপূর্বে সভা সমাবেশে দেশাত্মবোধক ও আন্তর্জাতিক গান করতেন। এদের গানের পুঁজি ছিল সীমিত। নজরুলের 'আন্তর্জাতিক' এবং জ্যোতির্ময় নন্দী অনূদিত 'কমরেড শোন বিউগল ঐ হাঁকছেরে' ইত্যাদি আন্তর্জাতিক গান, নজরুলের 'সাম্যের গান', নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান, এবং মুকুন্দদাসের কোন কোন গণ আন্দোলন সহায়ক গানই ছিল প্রধান পুঁজি। হেমাঙ্গ এসেই ঐ গায়ক ও শিল্পীদের নিয়ে গড়তে লাগলো সংগঠিত গানের স্কোয়াড।

আগস্ট আন্দোলনের গড়ার মুখে

তখন সাধারণভাবে চলছে ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের পর্ব। তার প্রথম অংশ অর্থাৎ ভারতে আগস্ট আন্দোলনের আগে পর্যন্ত গানগুলি সমস্ত দলমতের মানুষেরই সাধারণ সমর্থন পেত। কিন্তু আগস্ট আন্দোলন, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন ও ভারতের দিকে অগ্রগতি নতুন পর্যায়ের সৃষ্টি করে। তখন গোটা পার্টি ও তার প্রভাবাধীন সমস্ত সংগঠনকেই দাঁতে দাঁত চেপে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়তে ও এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে হচ্ছিল। সাংস্কৃতিক স্কোয়াডকেও তদুপযোগী অনুষ্ঠান সংযোজিত ও পরিচালিত করতে হত। তবে কোন স্তরেই আমাদের কণ্ঠরোধ করা যায়নি। আর তাতে হেমাঙ্গ পরিচালিত স্কোয়াডের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট।

আবার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বিশ্রাম

প্রথম স্তরেই, অর্থাৎ ১৯৪১-৪২-এর স্তরে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক শ্রম এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপে হেমাঙ্গর শরীর আবার ভেঙে পড়ে। আগে এধরনের অবস্থায় বাবা অকৃপণভাবে সাহায্য দিতেন; কিন্তু কমিউনিস্ট গ্রুপের জন্য তিনি এক কপর্দকও দিতে নারাজ। পার্টিকেই তাই তার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নিতে হয়। শেষ পর্যন্ত তারই মাসতুত ভাই পঞ্চখণ্ডের জমিদার প্রমথনাথ দাস তার মেশোমশাইয়ের ক্রোধ জাগাতে পারে জেনেও আশ্রয় দেন।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের এই সময়েও হেমাঙ্গ কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। প্রায়ই নতুন গান নিয়ে সুর দিয়ে নির্মলেন্দু চৌধুরী প্রমুখ স্কোয়ার্ডের প্রথম সারির গায়কদের

দিয়ে সেগুলি পরিবেশনের ব্যবস্থা করতেন। ঐ সময়েই তার 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে' ধরনের সে যুগের কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গান লিখিত ও গীত হয়।

শ্রীহট্ট জেলা পার্টি সম্মেলন ও হেমাঙ্গ

ঐ সময়েই পার্টির শ্রীহট্ট জেলা কমিটির সর্বপ্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন বসে ঐ পঞ্চখণ্ডেরই কাছে শ্রীচৈতন্যের পিতৃ-পুরুষদের গ্রাম ঢাকা দক্ষিণে। হেমাঙ্গ সম্মেলনের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যের কারণেই যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু পঞ্চখণ্ড খুব কাছে বলেই সম্মেলনের খবরাখবর প্রতিদিনই পেতেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে হঠাৎ একজন এসে খবর দিলেন, তিনি পথে শুনে এসেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর নেই। শুনে সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা হতবাক অশ্রুসজল। নেতৃত্বের সন্দেহ জাগল, হয়তো বা এটা কমিনিস্টবিরোধী মহলগুলিরই সাজানো রটনা। একজন নেতৃস্থানীয় কমরেড দ্রুত সাইকেল চালিয়ে পঞ্চখণ্ডে গিয়ে খবর নিয়ে এলেন, হেমাঙ্গ বহাল তবিয়তেই রয়েছেন এবং সম্মেলনকে আরেকটি গান উপহার দিয়েছেন।

সম্মেলনে বসেই তার ঐ গানে সুর দিয়ে নির্মলেন্দুরা তা গেয়ে এই সুসংবাদকে অভিনন্দিত করলেন।

পার্টিতে এবং তার চারপাশের কর্মী, জনগণের মধ্যে হেমাঙ্গ যে জনপ্রিয় ছিলেন তা এ ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

সম্মেলনে যে জেলা কমিটি নির্বাচিত হয় তাতে হেমাঙ্গও ছিলেন বিকল্প সদস্যরূপে।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হেমাঙ্গ স্বাস্থ্যের কারণেই যোগ দিতে পারেন নি। তার কিছু দিন পরেই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের যে সংগঠন কমিটি গঠিত হয়, তাতে বোধহয় হেমাঙ্গ ছিলেন। ঐ বছরই (১৯৪৩) নেত্রকোনায় সারা ভারত কিষাণ সভার যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে অবশ্য তারই নেতৃত্বে শ্রীহট্ট জেলার সাংস্কৃতিক স্কোয়াড সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান করেছিল। ঐ সম্মেলনেই মণিপুরের নেতা ইরাবৎ সিংহের নেতৃত্বে কাছাড়ের প্রধানত মণিপুরী শিল্পীদের স্কোয়াডও গভীর রেখাপাত করেছিল।

গণনাট্য আন্দোলন সংগঠনে

শেষোক্ত সম্মেলনে উপস্থিত পার্টি সম্পাদক কমরেড পি. সি জোশি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিশ্বনাথ মুখার্জি বিশেষ করে শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং শিলং-এর পার্টি পরিচালিত স্কোয়াডগুলির সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীহট্ট জেলা পার্টির তখনকার সম্পাদক হিসাবে আমিও তাতে যোগ দিই। সেখানে তিনি গণনাট্য আন্দোলন গড়ার প্রয়োজনের উপর জোর দেন। সেখানেই এই তিন অঞ্চলের শিল্পী ও নেতারা মিলে গোটা অঞ্চলের জন্য গণনাট্য সংঘ গড়ার একটা রূপরেখাও তৈরি করেন।

ক্রমে মণিপুর থেকে দলে দলে ভারতীয় শরণার্থী আগমনের স্রোত, বঙ্গ প্রদেশের মন্বন্তর, যুদ্ধে প্রথমে জাপানের পরাজয় এবং পরে নাৎসী জার্মানির পরাজয়, যুদ্ধোত্তর কালে একদিকে সামরিক বাহিনীতে এবং নৌ-বাহিনীর একাংশের বিদ্রোহ এবং বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ সংহতি সংগ্রাম, আজাদ হিন্দ নেতাদের মামলা ও বীরত্বপূর্ণ গণপ্রতিবাদ সংগ্রাম, ঐখানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে ক্যাবিনেট মিশন ইত্যাদির কূট চক্রান্ত এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের দোলাচল, দর কষাকষির লড়াই—এই সমস্ত স্তর এবং বিষয়ে শ্রীহট্ট জেলার সাংস্কৃতিক স্কোয়াড কোন না কোন সার্থক অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকত না, আর সেক্ষেত্রে হেমাঙ্গর কৃতিত্বই ছিল সর্বাধিক।

সুরমাভ্যালি স্কোয়াড গঠনে

এই কালপর্বে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশনের রোয়েদাদের স্বরূপ প্রকাশ করে একটি নৃত্যনাট্য-ভিত্তিক প্রোগ্রাম।

একাজে তাকে প্রভূত সাহায্য করেন কলকাতার গণনাট্য শিল্পী পানু পাল এবং উষা দত্ত। আর সহদর ছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, গোপাল নন্দী প্রমুখ সুগায়ক, হেমন্ত দাস, খালেদ চৌধুরী প্রমুখ চিত্রশিল্পী এবং অন্য অনেক গায়ক গায়িকা। গোটা পরিকল্পনা রচনাতে জেলা পার্টি নেতৃত্ব এবং কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জিও তাদের সহায়তা করেছিলেন।

পানু এবং উষার সুদক্ষ প্রশিক্ষণে ঐ নৃত্য নাট্যে হেমন্ত দাসের মত পার্টি কর্মী, খালেদ চৌধুরীর মত চিত্রশিল্পী, আশু সেন, দেবব্রত দত্ত প্রমুখ পার্টির যুব

ও ছাত্র কর্মী পর্যন্ত নাচে পটু হয়ে উঠেছিলেন। কিশোরী ছাত্রী সন্ধ্যা দাস হয়ে উঠেন রীতিমত কুশলী নৃত্য শিল্পী।

গোটা প্রোগ্রামের গীতিগুচ্ছ নির্মলেন্দু, গোপাল প্রমুখ স্বগায়কেরাই পরিবেশন করেন।

৪৬-৪৭-এ এই স্কোয়াড তখনকার গোটা অসম প্রদেশ পরিক্রমা করে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ, অসমের শিল্পগুরু বলে স্বীকৃত বিষ্ণুরাভা, উদীয়মান বিশিষ্ট অসমীয়া গায়ক ভূপেন হাজারিকা এবং দিলীপ শর্মাও ঐ স্কোয়াডকে স্বাগত জানান।

অসম প্রদেশে তখন কমিউনিস্ট পার্টি ক্যাবিনেট মিশনের 'গ্রুপিং' সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং হেমাঙ্গ পরিচালিত স্কোয়াড তাতে জোগায় প্রবল প্রাণশক্তি।

প্রয়াত দধি মহন্ত ও বিষ্ণু ভরার মত পার্টি নেতারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পরিক্রমা কালে স্কোয়াডের সঙ্গে ছিলেন। কোন কোন বাংলা গানের অসমীয়া অনুবাদে তারা হেমাঙ্গকে সাহায্য করেন। সেগুলি স্কোয়াডের গায়কেরা চমৎকারভাবে পরিবেশন করলে দর্শক ও শ্রোতারা তাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়। অনুষ্ঠানের নেপথ্য ধারাভাষ্যের প্রাঞ্জল অসমীয়া অনুবাদও করেন হেমাঙ্গ তাদেরই সহায়তায়।

নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনের পরেই বিশেষত গোলাঘাটে কবি ও গীতিকার ধীরেন দত্তের নেতৃত্বে একটি গণসঙ্গীতের স্কোয়াড গঠিত হয়েছিল। বোধহয় ডিব্রুগড়েও তেমন একটি স্কোয়াড গড়ে উঠেছিল। ঐ সফরের সঙ্গে সঙ্গেই পার্টি নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য হেমাঙ্গকে ঐ উপত্যকায় আনা দরকার। কারণ তার গণসঙ্গীত ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিভাও ছিল অসমীয়া ভাষার উপর।

তারপরই এক সময়ে পার্টির প্রাদেশিক সংগঠন কমিটি হেমাঙ্গকে কমিটির সংগঠকরূপে মনোনীত করেন।

একে একে এল মাউন্টব্যাটেন, রোয়েদাদ, দেশবিভাগ এবং তারই ফলশ্রুতিতে পার্টি এবং গণসংগঠনগুলিরও বিভাজন। যতদূর মনে পড়ে পার্টি ও সংগঠন বিভাগের এক পর্যায়েই হেমাঙ্গর কর্মকেন্দ্র সিলেট থেকে পরিবর্তিত হয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। ১৯৪৮ সালে তার লেখা 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য', 'বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা বাঁচবোরে বাঁচবো' ইত্যাদি গানের আবেদন অসম সীমান্ত

অতিক্রম করে প্রাক্তন বঙ্গপ্রদেশের দুই অংশেই, বিশেষত নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের নগরে ও প্রান্তরেও সাড়া জাগাত।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হেমাঙ্গ

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তার ভূমিকাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রাক-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর।

প্রাকস্বাধীনতা কালে তার কাজ সীমিত থাকে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে, প্রধানত পার্টির কাছাকাছি গায়ক-গায়িকা ও নৃত্য শিল্পীদের নিয়ে স্কোয়াড গঠনে। আর স্বাধীনোত্তর কালে এক পর্যায়ে আর-সি-পি আই থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে বিষ্ণু রাভা, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীদের প্রত্যক্ষভাবে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যোগ দেন।

তারপর আবার বোধহয় ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হয়েছিল ১৯৪৯-এর শেষ দিকে। কিন্তু ঐসময়ে লেখক ছিলেন বিবর্তন-মূলক আটক আইনে বন্দিশিবিরে। তাছাড়া ঐ সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লেখককে অসম প্রাদেশিক কমিটি থেকে তো অপসারিত করেছিলেন—পার্টি সদস্যপদও বিলম্বিত বা সাসপেণ্ডও হয়েছিল। ফলে ১৯৪৯ থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু সময় তার সঙ্গে আমি ছিলাম নিঃসম্পর্কিত। তাই তখনকার ঘটনাদি সঠিকভাবে বলতে পারছি না।

তবে ১৯৫০-এর গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গে আবার 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হলে আমি তাতে কর্মী হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। আর বেশ কিছুকাল 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক মণ্ডলীতেও ছিলাম। ফলে তার চিকিৎসার জন্য তাকে চীনে পাঠাবার প্রয়াসাদির সঙ্গে আমারও কিছুটা সম্পর্ক ছিল। একথা হেমাঙ্গ জানতেন। তাই চীনে গিয়েও আমাকে মাঝে মাঝেই চিঠিপত্রও দিতেন।

চীন থেকে তিনি যেসব পত্র লিখতেন তার অংশবিশেষ তখনকার 'স্বাধীনতা' প্রকাশও করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে হেমাঙ্গ

তারপর এক পর্বে তিনি যখন কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করলেন, তখন তিনি কি কি অবদান রাখেন তা বিশদ বিবৃত করার মত স্বাক্ষর তিনি নিজেও বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে রেখে গিয়েছেন। অন্যরা নানা

আলোচনায় তা প্রকাশ করছেন। তাই এদিকে কোনও আলোকপাত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি। কারণ এব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত।

এ পর্বেই একসময়ে তার সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য ও প্রচার বিভাগের কর্মীরূপে যোগদান, এবং পরবর্তীকালে ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বাকি জীবন প্রায় এককভাবে গণসঙ্গীতের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াসাদি নজরে পড়লেও আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিরাই বিবৃত করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, আমি কেবল এই দাবিই করতে পারি যে, তার রাজনৈতিক মতামত ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমার কোন কোন পর্যায়ে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্য সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কখনও মতান্তর হয়নি। সমস্ত সময়েই দুজন মিলিত হয়েছি এবং মত বিনিময়ও করেছি। অনেক সময়েই 'agree to disagree' মনোভাব নিয়েই আলোচনা থামত।

হেমাঙ্গ সর্বদাই ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। তার প্রধান চালিকা শক্তি ছিল অন্তরের তাড়না। বাস্তব ও তার কঠিন দাবি তাই অনেক সময়েই তিনি অতিক্রম করতে চাইতেন ভাবাবেগের জোরে।

যতদূর তাকে বুঝেছি তাতে বারবার মনে হয়েছে, স্তালিনের ব্যক্তিপূজা সম্পর্কে সোভিয়েত নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সমালোচনা, সোভিয়েত-চীন বিরোধ এবং মাও সে তুং-এর প্রতি তার প্রবল আসক্তিই পরবর্তীকালে তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত করেছিল। এমনকি হালে চীনের নেতৃত্ব যে নানাভাবে মাও সে তুং-এর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ সমালোচনা করেছিলেন তাতেও তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বাজারে একটা কথা চালু করার চেষ্টা কোন কোন মহল করেন যে, হেমাঙ্গ কিসানপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা সঠিকও নয় সঙ্গতও নয়। বিশেষত নক্সালপন্থীদের যেসব অংশ ভাঙ্গচুর ও হত্যার নীতিকে সমর্থন করতেন তাদের তিনি রীতিমত মাও-বিরোধী বলেই মনে করতেন।

আরেকটা কথা না-বললে বোধহয় তার সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হবে।

নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি যখন বুঝতেন যে, আগে তিনি কোনও ঘটনা বা ঘটনাগুলি সম্পর্কে যে মত পোষণ করতেন তা সঠিক ছিল না তা স্বীকার করতে কিন্তু কুণ্ঠিত হতেন না। অবশ্য তার প্রকাশভঙ্গি হত একটু ভিন্ন ধরনে—চিরাচরিত প্রথা প্রণালীতে নয়।

মনে পড়ে আবার যখন তিনি গণনাট্য আন্দোলনে যোগ দিতে স্বীকার

করলেন এবং নিজের শোচনীয় স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তা নিয়ে খাটাখাটনি করতে আরম্ভ করে দিলেন তখন একদিন আমাদের বাড়িতে এসে সন্তোষ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন: "তোমাদের সঙ্গে মতের অমিল থাকলেও কাজ করা যায়। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তা করা যায় না। এমনকি আমি নিজেও তো এক সময়ে তা করতে পারিনি। বোধ হয় অসহিষ্ণুতা এবং আত্মচরিত্রই সেজন্য দায়ী।"

তারপর মৃত্যুর কয়েকমাস আগে অসমের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতা দধি মহন্তর শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি অশ্রুসজল হয়ে বললেন: "আমরা বোধহয় নিজেদের অন্ধ ধ্যানধারণায় তাড়িত হয়ে খাঁটি সোনাকেও রাং বলে চালাতে কুণ্ঠিত হই নি। আমাদের গোটা আন্দোলনের সঠিক বিশ্লেষণ কে করবে কে বলতে পারে?"

বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের জবাব দেবার অধিকার মুখ্যত গোটা কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই এবং কমিউনিস্ট গণনাট্য কর্মীদেরই।

* * *

জানি এই স্মৃতিচারণে নানা ত্রুটি থেকে গিয়েছে। অনেক ঘটনা বাদ পড়েছে। অনেক তথ্যই আংশিক। হয়তো পারম্পর্যও সব সময়ে থাকেনি। কিন্তু তবু লিখেছি এই ভেবেই যে, তা যদি পূর্ণাঙ্গ বিচার বিবেচনার সময়ে সত্যিকারের বিশ্লেষণের কোন কাজে লাগে।

আরও বলে রাখছি, এই স্মৃতিচারণকে অগণিত বন্ধু ও কমরেডের নাম উল্লেখ করিনি ইচ্ছা করেই। কারণ তাহলে কলেবর অত্যন্ত বেশি বড় হয়ে পড়ত। তাছাড়া এই বয়সে অনেকেরই নাম তো মনেও নেই। ফলে কেবল বিভিন্ন পর্যায়ে তার কাছে উল্লেখ্য ভূমিকা যারা নিয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে তাদেরই নাম উল্লেখ করেছি। এজন্য সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে গোটা বিবরণে যদি আমার প্রসঙ্গ একটু বেশি মাত্রায় এসে থাকে তাহলেও সবাই যেন ক্ষমা করেন। তা এসেছে বিষয়গতভাবে বিষয়ীগত বা মনগড়া ধরনে নয় বলেই বিশ্বাস। তবু সর্বক্ষেত্রে আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। সেজন্য তাই আগেভাগেই দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি।

এই সময়ের ছবি ঃ
ছবি ও এই সময়

মৃণাল ঘোষ

এক ঘরোয়া আড্ডায় কথা হচ্ছিল এই সময়ের বিশিষ্ট ও সুখ্যাত এক শিল্পীর সঙ্গে। কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন এক বিদেশী শিল্প সমালোচকের কথা। এদেশে এসে যিনি দেখা করেছিলেন সেই শিল্পীর সঙ্গে। তাঁর ছবি দেখেছিলেন। আরও নানা আলাপচারিতার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ছবি আঁকার এতদিনের অভিজ্ঞতায় ছবি কী—এ সম্বন্ধে কোন্ ধারণায় পৌঁছেছেন তিনি। উত্তরে জানিয়েছিলেন আমাদের সেই শিল্পী, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে রেখা ও রঙে সাজিয়ে তোলা, ছবি আঁকার পরম লক্ষ এখন পর্যন্ত তাঁর কাছে এই।

কথাটা শুনে ভাবতে হয়। এরকম অনেকেই আছেন যারা সহজেই সায় দিতে পারবেন না শিল্পীর এই সিদ্ধান্তে। সাজিয়ে তোলাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় শিল্পের, এ-রকম যাঁরা ভাবেন, শিল্পের মধ্যে যাঁরা দেখতে চান গভীরতর এক দায়বোধ—জীবনের জন্য, সমাজের জন্য, সময়ের জন্য—প্রতিবাদে মুখর হতে চাইবেন তাঁরা। ভাবলে দেখা যাবে একেবারে অমূলকও নয় তাঁদের যুক্তি। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেবেন, সাজিয়ে তোলার এই দর্শন, সর্বাংশে এই আঙ্গিক নির্ভরতা, কেমন করে গভীরতর নৈরাজ্য ও বিমানবিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে শিল্পকে। দেশে বিদেশে সর্বত্র। দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে পারবেন তাঁরা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত গত আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিকীতেও (১৯৮৬) কেমন ছেয়ে ছিল এরকম নৈরাজ্যের নজির। যেমন, জাপানের কোনো এক শিল্পী, কোইচি এরিজুকা, আয়তক্ষেত্রাকার কিছু কাঠ মেঝেতে রাবারের চাদরের উপর একটার উপর, একটা সাজিয়ে আর দুপাশে দুটি লোহার টুকরো রেখে গড়ে তুলেছিলেন এক শিল্পকর্ম। নাম দিয়েছিলেন 'রিলেটেড এফেক্ট'। বা অস্ট্রিয়ার 'মাইনাস ডেলটা টি' ($-\Delta t$) নামে কোনো এক গ্রুপের তিনজন শিল্পী মেঝের উপর বৃত্তাকারে সাজিয়ে রেখেছিলেন চলন্ত কিছু পেডেস্টাল পাখা তাঁদের সৃষ্টিকর্মের নমুনা হিসেবে। এরকম নৈরাজ্য আমাদের দেশের আধুনিকতাতেও যে একেবারে নেই তা নয়।

প্রতিবাদে বলতে পারেন কেউ কেবল কর্মসর্বস্বতা বা আঙ্গিকবাদের বাড়াবাড়িতেই কি নৈরাজ্য ঘটে শিল্পের জগতে? এর উল্টোটাও কি অহরহ দেখছি না আমরা, সমাজের বাস্তবতা প্রকাশের প্রকটতায় কেমন করে নাভিশ্বাস ওঠে নান্দনিকতার! গত ত্রিয়েনালেই ত কোনো কোনো সমাজ-তান্ত্রিক দেশের শিল্পে ছড়িয়ে ছিল তার নমুনা।

কিন্তু এ ত গেল দুপ্রান্তের দুই চরম বিচ্যুতির উদাহরণ। শিল্পের সফলতার নিজস্ব ক্ষেত্র ত এই দুই প্রান্ত থেকেই দূরবর্তী এক সমন্বয়ের কেন্দ্রে। তবু কেন এই সময়ের সফল একজন শিল্পী সাজিয়ে তোলাকেই বলতে চান ছবির পরম লক্ষ্য? আর এ ত কেবল বিশেষ একজন শিল্পীর বিচ্ছিন্ন কোনো উক্তি নয়। ঠিক এরকমই ত আমরা বলতে শুনেছি পাশ্চাত্যের আধুনিকতার প্রতিভূ স্থানীয় বিখ্যাত অনেক শিল্পীকেই। সময়কে রূপের স্মিত প্রশান্তিতে ধরতে চান যে মাতিস, তিনি যেমন, তেমনি পিকাসোও, সামাজিক প্রতিবাদের তীব্রতায়, আজীবন যিনি ছিলেন মুখর। তাহলে এই আঙ্গিকের দিক থেকে বা রূপবিন্যাসের শুদ্ধতার দিক থেকে ছবিকে দেখা এটা কি আধুনিকতারই এক অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ?

আমাদের শিল্পের আধুনিকতার সূচনা পর্বে ছবির বিচারে জোর দেওয়া হত তার বিষয় বা বক্তব্যের উপর। নন্দলালের 'কৈকেয়ী' নামের কোনো ছবিকে ঠিক করে দিতে পেছনে অস্পষ্ট মন্থরাকে এঁকে দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বা মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'সেতারী' ছবিতে দূরের গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এক গ্রামীণ যুবতীকে আর ঘরের জানলায় এঁকে দিয়েছিলেন কয়েকটি শিক। নন্দলালের কৃষ্ণ সত্যভামার ছবি দেখে খুব চটে গিয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা (১৯০৬)। নন্দলালের নিজের স্মৃতিচারণায়, "এই ছবি দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, এরূপ ছবি আর এঁকো না। পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোকের পা ধরে মানভঞ্জন করা বড় লজ্জার কথা।" তাঁর মা কালীর ছবি দেখে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—"এ মূর্তি ঠিক হয় নি। এত কাপড় জড়িয়েছ কেন? কালী যে দিগবসনা, নির্ভীকা, প্রলয়ংকরী।" পত্রপত্রিকায় ছবির আলোচনাতেও জোর পড়ত বিষয়ের উপরেই। নন্দলালের "শিবতাণ্ডব' ছবির পরিচিতিতে প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৬, বৈশাখ) লেখা হয়েছিল, "বিশ্বজগতের মঙ্গলে যে আনন্দ, সেই আনন্দরস পানে বিভোর নৃত্যপরায়ণ শিবের মূর্তি চিত্রকরের কবিসুলভ কল্পনাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। সত্য বটে শিব প্রলয়জনিত ধ্বংসের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন,

তাঁহার পার্শ্বে ও পদতলে প্রলয়াগ্নি শিখারও রক্তিম আভা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু প্রলয়ের মধ্যেই স্বষ্টির বীজ নিহিত, মৃত্যুই উচ্চতর জীবনের দ্বার, নাশ স্থিতিরই রূপান্তর।" এমন কি ত্রিশের দশক পর্যন্তও চিত্রসমালোচনার এই সাহিত্য নির্ভর ধারা খুব একটা পালটায় নি। চিন্তামণি কর তাঁর 'স্মৃতিচিহ্নিত' বইতে লিখেছেন, "তৎকালীন উদীয়মান লেখকদের পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'তে স্বরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার অনুরূপ শিল্প-সমালোচনা হত ....'শনিবারের চিঠি'র চিত্র সমালোচনার কদাচিৎ উদ্দেশ্য ছিল ছবির গুণাগুণের ব্যাখ্যা, মূল উদ্দেশ্য ছিল কেবল এই অজুহতে রঙ্গরস পরিবেশন।" 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল তাঁরই 'অজবিলাপ' নামে একটি ছবি। শনিবারের চিঠিতে তার আলোচনায় লেখা হয়েছিল "ছবিটির নাম 'অজবিলাপ' না হইয়া 'ছাগবিলাপ' হইলে ঠিক হইত।"

আর আজ ষাট বা সত্তর দশক বা তার পরবর্তী সময়ের কোনো শিল্পীর কাছে, কী বলা হচ্ছে ছবিতে সেটা আর বিশেষ গুরুত্বের বিষয় থাকল না, কেমন করে বলা হচ্ছে, কিভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ছবিকে সেটাই হয়ে উঠল প্রধান বিচার্য বিষয়। আগেকার শিল্পী কি আর ভাবতেন না আঙ্গিক নিয়ে, বা এখনকার শিল্পী কি আর ভাবেন না ছবির বক্তব্য বা ভাব নিয়ে? এরকম, দুটি মেরুতে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেও সংকীর্ণতা থাকে এক ধরণের। কেননা এই দুইয়ের সুষম সমন্বয়ের ভারসাম্যেই যে শিল্পের প্রাণ কোনো শিল্পানুরাগীর কাছে বিশেষ করে বলবার মতো কোনো কথাই নয় এটা। তবু এই কথাটা ওঠে। কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে জোর পড়ে কখনো আঙ্গিকের উপর, কখনো বিষয়ের উপর। এছাড়াও শিল্পে সময়ের প্রতিফলনকে বুঝতে চাওয়া হয় যখন, সামাজিক দায়বদ্ধতার দিক থেকে যখন দেখার চেষ্টা করা হয় শিল্পকে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই বিচারের প্রবণতা এসে যায় বিষয়ের দিক থেকে, প্রকাশিত ভাবের দিক থেকে যতটা, আঙ্গিকের দিক থেকে ততটা নয়। এই দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় তখন। এই বিচ্ছিন্নতা শিল্পকে তার স্বরূপ ও সম্পূর্ণতা থেকে বিচ্যুত করে।

এরকম বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত অনেকটা যেন আধুনিকতার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী হয়ে জড়িয়ে আছে। এদেশে বা বিদেশে সর্বত্র। বিশেষত তথাকথিত প্রগতিশীল নন্দনভাবনায় এটা যেন একসময় একটু বেশিই প্রকট ছিল। আজও নেই একেবারে, তা নয়। ইম্প্রেশনিজমকে বা কিউবিজমকে অনেক তথাকথিত প্রগতিশীল শিল্পসমালোচকই একসময় নাকচ করে দিয়েছিলেন তাদের আঙ্গিক

নির্ভরতার জন্য। বলা হত, প্রবহমান সময়ের কথা বলে না তারা, সামাজিক জীবনপ্রবাহের কোনো প্রতিফলন থাকে না তাতে, তাই তারা এক অর্থে অবক্ষয়েরই শিল্প, প্রতিক্রিয়ার অস্ত্র হয়ে ওঠে তারা। এরকম চিন্তায় সোচ্চার এখনও আমাদের দেশের অনেক প্রগতিশীল সমালোচকই।

কেমন করে ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম বা স্যুররিয়ালিজমের মতো শিল্প আন্দোলনগুলো প্রকারান্তরে শিল্পের প্রগতিরই ইঙ্গিত বহন করে, সময় ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার নিরিখেও, কেমন করে সময়েরই মূলগত সত্যের প্রতিফলন হয়ে ওঠে তারা, তার বিশ্লেষণ আমাদের এ আলোচনার সীমার মধ্যে পড়ে না। বস্তুত স্তালিনীয় রাশিয়ায় শিল্পনন্দনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে মার্কসীয় নন্দনভাবনাকে তার পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে যে চিন্তা রেখে গেছেন গিয়র্গ লুকাচ, বের্টোল্ড ব্রেখট, বেঞ্জামিন বা থিওডোর অ্যাজোর্ণোর মতো চিন্তাবিদরা তাতে মার্কসীয় নন্দনের নিরিখেই এইসব আধুনিক শিল্পআন্দোলনের প্রগতিশীলতা বা সময়-সম্পৃক্ততা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আঙ্গিকের মধ্যে প্রকাশভঙ্গির মধ্যেই কেমন অনিবার্যভাবে এসে যায় সময়ের প্রতিফলন, অথবা সময়কে আত্মস্থ করার গভীর প্রবণতাই কেমন করে রূপ পায় শিল্পীর অনুশীলিত আঙ্গিকে, শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকতার এটাই প্রধানতম এক লক্ষণ।

দুই

অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, "ক্রিয়া বা টেকনিককে ছাপিয়ে চলা হল সুন্দর চলা।" টেকনিকের স্বরাটত্বে নয়, শিল্পের স্বরাটত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। 'আর্ট ফর আর্ট'কে অপাংক্তেয় মনে হত না তাঁর। বরং একটু বেশিই যেন ঝুঁকতেন শিল্পকে উদ্দেশ্যের সমস্ত আগাছা থেকে মুক্ত করে তার নিজস্ব বৈভবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বলতেন, "আর্ট ধর্মের জন্য কি জাতীয় গৌরবের ধ্বজা সাজাবার জন্য কি নেচারের সম্মুখে মিরার ধরার জন্য অথবা বিশ্চিতাম খতমকে বলবৎ রাখার জন্য, এ তর্ক আর্টের জগতে উঠতেই পারে না।...আর্টিস্ট যে উদ্দেশ্যেই কাজ করুক আর্টের দিকে চেয়ে করাই হল তার প্রধান কাজ।"

টেকনিকের উগ্র দেখানোপনা থেকে, স্বাজাত্যাভিমানের ভ্রান্ত ও প্রকট প্রকাশ থেকে উদ্ধার করে শিল্পের প্রকৃষ্ট এক পাদপীঠ গড়ে নিতে হচ্ছিল তাঁকে। তাই ঘোষণা ছিল তাঁর, "শিল্প যে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাষা—আনন্দকাকলি আনন্দের দোলা।" কিন্তু সময় থেকে কি সরে যেতে পারলেন

তিনি ? যে অভিযোগ দীর্ঘদিন উঠেছে তাঁর সম্বন্ধে, বা এখনও ওঠে ? "কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, চোখে দেখা জগতের সঙ্গে মনে ভাবা জগতের মিলন না হলে যে আর্ট হবার জো নেই" একথা একাধিকবার বলতে হয়েছে তাঁকে। সময়ের দিক থেকে অতীতের আলো আর সাম্প্রতিকের হাওয়া এই দুইয়ের মিলনেই মুক্তির দিগন্ত খুঁজেছেন তিনি। "সেকাল ছেড়ে কোনো শিল্প নেই এটা ঠিক, কিন্তু একাল ছেড়েও কোনো শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে এটা একেবারেই ঠিক।"

জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবনীন্দ্রনাথ এককালে এঁকেছিলেন 'ভারতমাতা'র ছবি। লালাভ গেরুয়া বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই নারী প্রতিমার মাথার পেছনে দেবত্বের দ্যোতক ছিল আকাশী আলোর বৃত্ত। প্রেক্ষাপটে ছিল স্মিত রৌদ্রাভা। সেই নারীর চার হাতে ছিল অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা ও মন্ত্র জীবনের মূলগত চার সারাৎসারের প্রতীক। সরল সুন্দর এই ছবিতে সময়চেতনার যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ ছিল, ততটা প্রত্যক্ষতায় সময়কে খুব বেশি ধরেন নি অবনীন্দ্রনাথ। শেষ পর্যায়ের 'আরব্য রজনী' বা 'কৃষ্ণ মঙ্গলে'র ছবিগুলিতে তিনি দেশকে বা সময়কে তুলে আনতে চেয়েছেন আরও মূল থেকে। আর্যপূর্ব ভারতীয় সভ্যতার যে নির্যাস প্রবাহিত আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই বীজ থেকে অঙ্কুরের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন তিনি। একভাবে তাও ছিল আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে ভাবের উদ্বোধন। সেই অঙ্কুরেরই নানামুখী বেড়ে ওঠা, আমাদের আজকের ছবি।

সময়ের এই উচ্ছ্বাসহীন স্মিত প্রকাশকে বোঝাতেই নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথের ছবিকে বলেছিলেন, "উষার আলোর মতো, ফুল ফোটার মতো, বীজ হতে অঙ্কুর হওয়ার মতো নিঃশব্দ"। সেই তুলনায় তাঁর নিজের ছবিতে সময়ের সেই আবহকে অনেক উগ্র মনে হত নন্দলালের। কানাই সামন্তকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "হ্যাঁ আমার ছবিতে একটা লড়াই করার ও challenge-এর ভাব কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে যা গুরু অবনবাবুর ছবিতে নাই। তা অতি ধীর ও নম্র তাতে আমার ছবির উগ্রতা নাই।" এর কারণও বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি সেই চিঠিতেই। জাতীয়তার গৌরব প্রতিষ্ঠাকে আরও অনেক গভীরতর কর্তব্য হিশেবে নিতে হয়েছিল তাঁকে। "ভারত-শিল্পের গৌরব সাব্যস্ত করতে হবে, আর আমরাও করণকৌশলে দক্ষ জাপান চীনের চেয়ে হীন নই তা প্রমাণ করতে হবে।"

সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজ ভাবনায় জাতীয়তাবোধের যে উদ্ভাস তারই প্রত্যক্ষ প্রতিফলনে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল নন্দলালের ছবি। ভারতীয় নন্দনের এই

চিরায়ত সত্যই উদ্ভাসিত হয় তাঁর এই উচ্চারণে—"রস একটি অখণ্ড অতুলনীয় বস্তু।" ছবির জন্য কারিগরের মতোই খেটেছেন আজীবন। সেই গল্প ত প্রায় সবারই জানা যে শান্তিনিকেতনে জয়পুরী ফ্রেস্কোর কাজ শেখাতে রাজস্থান থেকে আনিয়েছেন এক ওস্তাদকে, আর পরিচয় না দিয়ে তাঁর কাজে সহায়তা করে গেছেন কারিগরের নিষ্ঠায়। তবু শিল্পের সঙ্গে কারিগরী বা টেকনিককে মেলাতে চান নি কখনো। বলেছেন, "আর্টিস্টকে কেবল টেকনিকের কথা শুধোলে তাঁর অপমান। সে ত কারিগর নয়।" যদিও নির্মাণ যে শিল্পেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একথা মানতে কোনো দ্বিধা ছিল না স্বভাবতই। স্পষ্ট করে বলেছেন "চিত্রে দুটি জিনিস আছে—এক্সপ্রেশন আর আর্কিটেকচার। অভিব্যক্তি আর নির্মাণ।"

অভিব্যক্তি আর নির্মাণ, এই যেমন শিল্পের চিরায়ত এক দ্বৈত। তেমনি অভিব্যক্তির প্রান্তেও আছে আর এক দ্বৈত—রূপ ও অরূপ। "অরূপের সত্তায় রূপের সত্য, রূপের অস্তিত্ব"—এ কথা বলেন যখন নন্দলাল, তখন চিরায়ত ভারতীয়তারই প্রতিধ্বনী করেন তিনি। কিন্তু তার পরের বাক্যেই যখন শুনি তাঁর উচ্চারণ "রূপ অরূপ দুই নিয়েই সৃষ্টির সমগ্রতা। সৃষ্টিতে অরূপ ও রূপ একটি বাদ দিয়ে আরেকটির ধারণা আংশিক সত্য বা মিথ্যাই।"—তখন সনাতন ধ্রুপদী ভারতীয়তা থেকে এক পলকে তিনি পৌঁছে যান তাঁর সময় বিধৃত আধুনিকতায়।

ধ্রুপদী ভারতীয়তাকে ছুঁয়ে থেকেও সময় সম্পৃক্ত আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারা আমাদের আধুনিক চিত্রকলায় নন্দলাল বসুর প্রধানতম এক অবদান। এই অবদানের দুই ভিন্নমুখী প্রসারণ দেখি একদিকে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে, অন্যদিকে যামিনী রায়ের ছবিতে।

শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার মধ্যে এক সমন্বয় খুঁজে নিতে চান বিনোদবিহারী। 'শিল্প জিজ্ঞাসা'য় লেখেন তিনি, "নিজের হৃদয় দিয়ে সমাজের হৃদয় স্পর্শ করা এবং সমাজের হৃদয় দিয়ে নিজের হৃদয়কে বিস্তৃত করাই শিল্পীর একমাত্র দায়িত্ব।" এই সমন্বয়ের পথে শিল্পী প্রকাশ করেন যে সৌন্দর্য 'নিছক অনুকরণও' নয় তা, 'শুদ্ধ আকারও' নয়। অভিব্যক্তির দ্বৈত দেখেছি নন্দলালে—রূপ ও অরূপ। এর সঙ্গে বিনোদবিহারী যোগ করলেন নির্মাণেরও এক দ্বৈত—নিছক অনুকরণ ও শুদ্ধ আকার। এই দুই দ্বৈতের মিলনেই গড়ে উঠছে শিল্প, শিল্পের সৌন্দর্য। বিনোদবিহারী বলছেন, "প্রাণশক্তিই" সেই

"সৌন্দর্যের কারণ এবং ভাষা সেই শক্তির প্রকাশক এবং বিষয় উভয়ের যোগসূত্র।"

"আমি এতখানি বাস্তববাদী হয়েও অবাস্তব ছবি আঁকি, এই লীলা"— একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন যামিনী রায়। বাস্তবতাকে সময়ের উপরিস্তরের প্রতিফলন হিশেবে না দেখে মাটির নিকটতম লোকায়তিক প্রাণপ্রবাহ হিশেবে দেখতে পারা এবং সেই প্রবাহ থেকে রস সংগ্রহ করে আধুনিকতার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ প্রশান্ত এক ভাষা আবিষ্কার, যামিনী রায়কে আমাদের আধুনিকতার ইতিহাসে অনন্য করেছে।

তিন

আমাদের ছবিতে পাশ্চাত্য প্রভাব এসেছে মূলতঃ দুভাবে। প্রথম পর্বে প্রাকৃতিকতা বা স্বাভাবিকতা আশ্রিত ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতির চর্চার মধ্য দিয়ে। যামিনী রায়ের প্রথম জীবনের ছবি সেই স্বাভাবিকতার চর্চার সফলতার শ্রেষ্ঠতম এক দৃষ্টান্ত। এই রীতিতে তাঁর পূর্বসূরী বা সমসাময়িক ছিলেন শশি হেস, রণদা গুপ্ত, হেমেন মজুমদার, বসন্ত গাঙ্গুলী, প্রহ্লাদ কর্মকার, অতুল বসু প্রমুখ শিল্পীরা। অ্যাকাডেমিক রীতির সেই চর্চায় সময়ের কি প্রভাব ছিল কোনো? অতুল বসু সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর এক স্মৃতিচারণায় একে বলেছেন "রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত চিত্রচর্চা।" সময়েরই অনিবার্যতায় জাতীয়তাবোধের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশে গড়ে উঠছিল অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্ট যে নব্য-ভারতীয় চিত্ররীতি তার প্রতি তীব্র অতৃপ্তির সোচ্চার কিছু বিবৃতি পেয়েছি আমরা অতুল বসুর সেই স্মৃতিচারণায়। (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১৭ মে ও ২৪ মে ১৯৮৭)। একদিকে স্বদেশ ও সময়ের ভাবমূর্তিকে ধরতে চাওয়া ছবির মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে সময়-নিরপেক্ষ বাস্তবতার স্থবির প্রতিলিপি রচনা এই দুটি ধারা পাশাপাশি চলছিল আমাদের ছবিতে প্রায় ত্রিশের দশক পর্যন্ত। এই দুটি ধারা থেকেই মুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল এক সময়।

যামিনী রায়ের মতো শিল্পী সেই মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন একভাবে। তা আজ সুপরিচিত। অন্যভাবে আরেক মুক্তির সন্ধান চলছিল, যার পরিচয় রয়েছে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চর্চার মধ্যে। নব্য ভারতীয় রীতির আদর্শায়িত সৌন্দর্যচর্চাকে তিনি মেলাতে পারছিলেন পাশ্চাত্যের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে। পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁর কাজে আসছিল শুদ্ধ স্বাভাবিকতায় নয়। অভিব্যক্তির পথ ধরে। ফলে ইম্প্রেশনিজম প্রভাবিত চিত্রপটে

তেলরঙের দ্বিমাত্রিক বিন্যাসের সঙ্গে তাঁর ভাস্করসুলভ আয়তনময়তার প্রতি স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণকে এক জায়গায় মেলাতে পারলেন তিনি। দ্বিমাত্রায় আলোকবিচ্ছুরণ অনুযায়ী রঙের বিন্যাস, ত্রিমাত্রিকতার গাঠনিক সংহতির নির্যাস, ও আদর্শায়িত সুরেলা সৌন্দর্যময়তা, এই তিনের সমন্বয়ে আধুনিকতার এক নতুন নিরিখ এনেছিল তাঁর ছবিতে। যদিও সময় সেখানে আদর্শায়িত সময়, তবু সময় নিরপেক্ষ অতীতচারিতা নয় তা, স্থবির প্রাকৃতিকতাও নয়।

পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বিতীয় ধারাটির সূত্রপাত এখানেই। ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম ও এক্সপ্রেশনিজমের প্রভাব সময়কে ধরতে চাওয়ার অনিবার্যতাতেই ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে আমাদের ছবিতে। অমৃতা শেরগিলই সম্ভবত প্রথম শিল্পী পাশ্চাত্য রীতিতে যিনি ভারতের গ্রামীণ মানুষের বাস্তবতাকে ধরতে চেষ্টা করেন। কিউবিজম তার প্রথম ছায়া যেটুকু ফেলেছিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে তাতে বাস্তবতার অভাবাত্মক বিশ্লেষণ কিছু ছিল না, যে বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে কিউবিজমের প্রভাবের অনিবার্য মাত্রা হয়ে উঠেছে। বাস্তবতার দৃশ্যময়তার দেশগত (spatial) বিশ্লেষণকে এক ভারতীয় সুরেলা সঙ্গীতময়তায় উত্তীর্ণ করে নিতে পেরেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ অনেকটা কিউবিজমেরই ছায়ায়। বাস্তবতার কালগত (temporal) বিশ্লেষণের শ্রেষ্ঠ নজির অবশ্য তাঁর কার্টুন-ধর্মী ছবিগুলি।

রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় অনেকটা 'ভলক্যানিক ইর‍্যাপশনে'র মতো যে নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন আমাদের ছবির ভারতীয় ঐতিহ্যে তা এক নতুন সংযোজন। তাতে এক্সপ্রেশনিজম বা স্যুররিয়ালিজমের ছায়া প্রচ্ছায়া যদি কিছু দেখা যায় তা সচেতন গ্রহণ যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশি সময়ের অনিবার্য প্রতিফলন। যে নিঃস্বতা, যে শূন্যতা আন্তর্জাতিক আবহমণ্ডলকে ক্লিন্ন করছিল ক্রমান্বয়ে তারই চিত্ররূপ গড়ছিলেন। যেন রবীন্দ্রনাথ তার আজীবন লালিত সদর্থক সৌন্দচেতনার আলো মিশিয়ে।

চল্লিশ দশকের শিল্পীরা নব্য-ভারতীয় রীতির গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের সামনে ছিল সময়ের অনিবার্য চাপ। সেই চাপই প্রকারান্তরে তাঁদের প্রভাবান্বিত, করছিল পূর্বোক্ত শিল্পীদের উত্তরাধিকারকে প্রসারিত করতে। জাতীয়তাকে তাঁরা খুঁজতে চাইলেন লোকায়তের গভীরে। আন্তর্জাতিকতাকে মেনে নিতে চাইলেন তাঁদের ছবির ভাষার উন্মোচনে। লোকায়তিক যে জাতীয় ঐতিহ্য ক্রমান্বয়ে হীনবল হতে হতে নিঃশেষিত প্রায় হয়ে উঠছিল উপনিবেশিকতার চাপে তাকে উজ্জীবিত

করে পাশ্চাত্য আধুনিকতার যে অর্জন তাকে সেই উত্তরাধিকারে অভিষিক্ত করে সময়ের উপযোগী নতুন ভাষা গড়তে চাইছিলেন তাঁরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাপ এসে লাগছিল বাংলার শহর ও গ্রামে। তারই ফলশ্রুতি—১৯৪৩-এ দেখা দিল মন্বন্তর। এই একটি ঘটনা শিল্পীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন এনেছিল। এতদিন সমাজ ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংযোগে থাকতে চাননি যারা, এ ঘটনায় শিল্পী হিশেবে সাড়া দিয়েছিলেন তারাও। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় চৈত্র, ১৩৫০ (১৯৪৩) সংখ্যায় একটি খবর দেখি এরকম—"সম্প্রতি কলিকাতায় বাঙ্গলা দেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর-নারীর বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া একটি চিত্র প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। 'কারুকলা সংঘ' ইহার আয়োজন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এই সংঘের সভাপতি। কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে অনুষ্ঠিত এই চিত্র প্রদর্শনীটি দর্শন করিয়া দর্শকরা একাধারে বেদনা ও আনন্দ উভয়ই অনুভব করিয়াছেন।" অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে এই খবরের সঙ্গে তা এরকম—"অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অঙ্কিত নাতিবৃহৎ তৈলচিত্র···পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর স্কেচ ও জলরঙ চিত্রাঙ্কন", এছাড়া রয়েছে বিমান মজুমদার, ফণী গুপ্ত, আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দত্ত, গোবর্ধন আশ, ইন্দু গুপ্ত, ত্রিভঙ্গ রায়, শরদিন্দু ঘোষ, শৈল চক্রবর্তী, বরদা গুহ, অনিল মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মিত্র প্রমুখ শিল্পীদের নাম। দল ও মত নির্বিশেষে ৪৩-এর মন্বন্তর প্রতিবাদে সোচ্চার করেছিল বাংলার অধিকাংশ শিল্পীকেই। নন্দলাল বসুর মতো প্রশান্তির শিল্পীও এঁকেছিলেন অন্নপূর্ণার দুয়ারে ভিখারী শিবের ছবি।

চল্লিশ দশকে সারা দেশ জুড়ে জাতীয়তার সঙ্গে যে আন্তর্জাতিকতাবোধের উদ্বোধন, তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। এই পার্টিরই আওতায় দেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক বাস্তবতার ছবি আঁকছিলেন চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিন ও সোমনাথ হোরের মতো শিল্পীরা। সময় ও সময় সঞ্জাত বাস্তবতা রাজনৈতিক চেতনা থেকে হয়ত এই প্রথম আমাদের ছবিতে প্রত্যক্ষ অভিঘাত আনতে পারল।

১৯৪৩-এ কলকাতায় 'ক্যালকাটা গ্রুপ' সৃষ্টি হল। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা নানা স্মৃতিচারণাতে দেখা যায় তাঁরা পাশ্চাত্যের শিল্প আঙ্গিকের প্রভাবকে যত বড় করে দেখেছেন তাঁদের চিত্ররীতির উদ্ভাবনে দেশীয় লোকায়ত আঙ্গিককে তত গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু অনেক শিল্পীরই সেই সময়ের কাজে লোকায়তের প্রভাব স্পষ্ট ছিল। রথীন মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোবর্ধন আশ,

পরিতোষ, সেন, সুনীলমাধব সেন প্রমুখ শিল্পীদের ত ছিলই, এমন কি নীরদ মজুমদার, যিনি পরবর্তী কালে ফরসী রীতিকেই তাঁর নিজের করে নিয়েছিলেন, তাঁর সেই সময়ের ছবিতেও লোকায়তের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। লোকায়তের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আঙ্গিকের মেলবন্ধনই চল্লিশের দশকের, বিশেষত ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের, ছবির মূল সুর। সমাজ বাস্তবতার বা বিষয়ের মধ্য দিয়ে সময়কে ধরার ততটা চেষ্টা করেন নি ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা, যতটা চেষ্টা তাঁদের ছিল সময়ের উপযোগী নতুন শিল্পভাষা গড়ে তোলার। আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে সময়ের তাপ ও সত্যকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাই আধুনিকতায় তাঁদের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে।

ক্যালকাটা গ্রুপের মতো একই দশকে বম্বেতে তৈরি হয়েছিল 'প্রগ্রেসিভ গ্রুপ', দিল্লিতে 'দিল্লি শিল্পীচক্র', কাশ্মীরে 'কাশ্মির গ্রুপ'। এরকমভাবে চল্লিশ দশকে লোকায়ত ও আন্তর্জাতিকতায় পুষ্ট আধুনিকতা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বড় শহরগুলোতে। হুসেন, রাজা, সুজা বা কনওয়ালকৃষ্ণের মতো শিল্পীরা কেউ আঞ্চলিক লোকায়ত, কেউ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি করে গড়ে তুলতে লাগলেন নিজ নিজ চিত্ররীতি। সারা ভারতবর্ষ চিত্ররীতিতে ও অভিব্যক্তিতে সমন্বের দিক থেকে আধুনিকতায় পদার্পণ করল।

চার

চল্লিশ দশক পর্যন্ত এই উত্তরাধিকার নিয়ে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে প্রবেশ করল যখন আমাদের ছবি, সময়ের জটিলতা তখন বেড়ে গেছে এতটাই যে আগের দশকগুলির বাস্তবতার সঙ্গে তার কোনো সাজুয্য রইল না আর। সেই বাস্তবতা শিল্পীকে ধ্যানমগ্ন নির্লিপ্ততায় আচ্ছন্ন থাকার সুযোগ দিল না একেবারেই। ষাটের দশক থেকে আমাদের ছবিতে সেই প্রতিবাদী অভিব্যক্তির তীব্রতা ক্রমশই বাড়ছে।

এর পাশাপাশি নির্লিপ্ততার চর্চা নেই যে একেবারে, তা নয়। ধ্রুপদী প্রশান্তির সন্ধানও রয়েছে। রয়েছে আঙ্গিক-সর্বস্ব নৈরাজ্যের চর্চাও। শিল্পকে কেবলই নির্মোকে হিশেবে ব্যবহার করতে চান যারা সময় ও বাস্তবতার সমস্ত-রকম দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে দূরে সরে থাকতে, তাঁদের প্রসঙ্গ স্বভাবতই আসে না আমাদের এই আলোচনায়। কিন্তু বাস্তবমনস্কতার ভুল প্রয়োগের ক্ষেত্র-গুলিকেও ত চিনে রাখতে হয় সঠিক প্রয়োগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যকে ঠিক মাত্রায় বুঝতে।

হুসেনের মতো অত বড়মাপের শিল্পী রাজনীতির আলগা হাওয়ায় ভেসে গিয়ে চটজলদি এঁকে ফেলেন জরুরি অবস্থার সমর্থনে তাঁর ছবি। ১৯৭৩-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর বড় রেট্রসপেকটিভে যা দেখেছি আমরা দুটি ছবির কথা বলা যায়। ছবির সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা যে বাণী ছিল শিল্পীর, তা থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যেতে ছবির বিষয়ের। বাংলা রূপান্তরে তা অনেকটা এরকম। "জান্তব একটি ট্যাঙ্কে বাহিত হচ্ছে বিপুলকায় জ্বলন্ত এক ফুল। শান্তি শাশ্বত। কিন্তু কখনো কখনো শান্তির প্রতিষ্ঠায় ইতিহাসকেও সশস্ত্র যানে আরূঢ় হতে হয়।" আর একটি ছবিতে ছিল এরকম লেখা, সবুজ বিপ্লবে সমৃদ্ধ এক কমলা আলোর ক্ষেত্র। শুভ্র দিগন্ত তার মধ্যভাগে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শক্তির প্রতিমা কল্যাণময় হয়ে জাগছে।" কোনো বিশেষ রাজনীতির সমর্থনে বা অসমর্থনে অপাংক্তেয় হয়ে যায় না ছবি। ছবির নন্দনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন দেখা যায় রাজনীতি, তখনই ত তা হয়ে ওঠে ভুল রাজনীতি বা সময়ের ভুল প্রতিফলন।

বিপরীত এক পাদপিঠ থেকেও দেখে নেওয়া যায় বিষয়টিকে। দিল্লীর শিল্পী অর্পণা কাউর গত ত্রিয়েনালে পুরস্কৃত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন যথেষ্ট। তীব্র প্রতিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই ছবি আঁকেন তিনি। আমাদের এই দেশে, এই সময়ে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। একটি নৃশংস হত্যার পাশে নির্লিপ্ত হয়ে থাকে সমস্ত সমাজ। এরকমই তাঁর ছবির বিষয়। সুরারিয়া-লিজমের আভাস লাগা ফ্যাণ্টাসি দিয়ে গড়া তাঁর ছবির বিচ্ছিন্নতা ও বিমানবিকতার পরিবেশ। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে অবলম্বন করে যে গড়ে ওঠে তাঁর প্রতিবাদ, এই রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থান বড় বেশি প্রকট হয়ে ওঠে বলেই নয়, ছবির আঙ্গিক ও নন্দনের দিক থেকেও নানা অসম্পূর্ণতা বাস্তবতার বা সময়ের ভুল বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যায় তাঁর ছবিকে।

কোনো রাজনৈতিক অবস্থান থেকে শতহস্ত দূরে থেকেও সময়কে, সময়ে বিধৃত জীবনকে তুলে ধরতে চান যাঁরা, তাঁদের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা কেমন করে অবনমিত করে ছবির নন্দনকে তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। জাহাঙ্গির সাবাভালা সুচারু দক্ষতায় যখন আঁকেন আমাদেরই দেশের কোনো কৃষকের ছবি, বা বোরখা পরা পর্দানসিন মুসলিম নারী সমাজের অধীনতার ছবি, তখন তাঁর সেই অসামান্য দক্ষতায় ধ্রুপদী স্থৈর্য দিয়ে সামাজিক বাস্তবতার রূপারোপের চেষ্টা— যে শীতলতার দিকে নিয়ে যায় ছবিকে তাতে জমাট বেঁধে যায় সময়ের চলিষ্ণু

প্রাণস্পন্দন। অথবা বিঃ প্রভা যখন পেলব সুচারুতায় লোকায়ত ও কর্মিষ্ঠ নরনারীর ছবি আঁকেন, বাস্তবতার সঙ্গে তার কোনো সংযোগ না থাকায়, রূপবন্ধ নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা না থাকায় তা হয়ে উঠতে পারে বড় জোর ভাল ক্যালেণ্ডারের ছবি।

এই সমস্ত বিচ্যুতিকে ত চিনে নেয়া যায় সহজেই। আর এসব দৃষ্টান্তের নিরিখেই সরল সমীকরণে পৌঁছে যেতে চান অনেকে সময়ের কথা বাস্তবতার কথা প্রত্যক্ষে বলা হল না যেখানে, সমাজভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য নয় সেই শিল্পী। একটা দৃষ্টান্ত হিশেবেই বলা যায়, বিচারের এই ভিত্তিতে নীরদ মজুমদারের মতো শিল্পী অপাংক্তেয় হয়ে যান অনেকের কাছে। কেন না কেবলই তন্ত্র দিয়ে ভেবেছেন তিনি। চলমান জীবনের কথা কোথায় তাঁর ছবিতে? এরকম প্রশ্ন ওঠে।

একটা জটিলতার ক্ষেত্র তৈরি হয় এখানেই। ধরা যাক, জি. আ সন্তোষের কথা। তিনি ত তন্ত্র নিয়েক ছবি আঁকছেন ইদানীং। একেবারে বিমূর্ত রূপবন্ধে তন্ত্রের প্রতীক নিয়ে। আর নীরদ মজুমদারও অনেক সময়ই এঁকেছেন তন্ত্রের প্রতীক ও প্রতিমা নিয়ে ছবি। অধিকাংশ সময়েই সুস্পষ্ট মানবিক প্রতিমায়, ক্বচিত কখনো বিমূর্ততায়। নীরদ মজুমদার তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তৈরি করে দিলেন তেলরঙ মাধ্যমে ভারতীয় ধ্রুপদী আধ্যাত্তিকতার প্রশান্তিকে রূপ দেয়ার পথ। বিষয়ের জটিলতায় প্রবেশ না করেও আঙ্গিক ও প্রকরণের আস্বাদনের মধ্য দিয়ে দর্শক পৌঁছতে পারেন নান্দনিক গভীরতায়। সদর্থক জীবনচেতনার কেন্দ্রে যে পৌঁছে দিতে পারে তাঁর ছবি, সময়চেতনার দিক থেকেও এখানেই তাঁর সফলতা। কিন্তু তন্ত্রে দীক্ষিত নয় এমন কোনো দর্শকের চেতনায় যদি স্পন্দন বা আবিষ্টতা না আনে জি আর. সন্তোষের তন্ত্র আশ্রিত বিমূর্ততা, তাহলে দোষ দেয়া যায় কাকে? সেই দর্শককে? ঐতিহ্যের আচরণটিকে মাত্র আশ্রয় করে ঐতিহ্যের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে থাকেন জি. আর সন্তোষ। এই বিচ্ছিন্নতা সময় থেকেও বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে।

তাই এই কথাটিই আরেকবার মনে রাখতে হয়, সময়ের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক হন শিল্পী ছবির বিষয়ের জোরে নয়, উপস্থাপনার গুণে, ছবির অন্তর্নিহিত গঠনের নন্দনে। আর এই নিরিখ থেকে বিচার করলেই দেখব, যথেষ্ট তন্নিষ্ঠ, যথেষ্ট সচেতন আমাদের সমকালীন শিল্পীরা, যতটা সচেতনতা সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সহজলভ্য নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, বুঝে নেওয়ার সুবিধার জন্য, সময় চেতনার প্রক্রি

ফলনের দিক থেকে তিনটি সাধারণ ভাগে ভাগ করে নেয়া যায় এই সময়ের ছবিকে।

(১) সময়কে চিরায়তের প্রতিফলন হিসেবে দেখা।

(২) সময়ের নেতিকে প্রত্যক্ষ প্রতিমায় প্রতিবাদের তীব্রতায় রূপ দেওয়া।

(৩) বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষতায় নয়, সময়ের অন্তর্লীন সত্যকে প্রতীকে বা সংকেতে আভাসিত করে তোলা।

পাঁচ

প্রথম ধারাটির স্বরূপ কিছুটা বোঝা যেতে পারে নীরদ মজুমদারের দৃষ্টান্তেই। এরকম শিল্পী আছেন আরো অনেকেই। বিচ্ছিন্নভাবেই মনে পড়ে যেতে পারে কনওয়াল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হেব্বার, শিবক্স চাবদা, কৃষ্ণ রেড্ডি, সত্যেন ঘোষাল, আকবর পদমসি, গণেশ হালুই, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের নাম। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। সত্যেন ঘোষাল যেভাবে তাঁর 'ধ্যানগম্ন নিসর্গের' ছবিতে প্রায় বিমূর্ততায় প্রকৃতির নানা রূপের উন্মোচন ঘটাচ্ছেন, বা হালুই যেভাবে জলরঙের সূক্ষ্ম ও সুচারু ব্যবহারে আভাসিত করে তোলেন বাংলার প্রকৃতির স্থিত সজল রূপাভাস বা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রেখার লৌকিক সরলতায় ধ্রুপদী স্থৈর্যের রূপ দিয়ে যান, তাতে অনুভব করা যায় আমাদের দেশে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের গহন সত্যের আভাস। সময়কে ছুঁয়ে থেকেই বিশেষ সময়ের গণ্ডিকে অতিক্রম করে যান তাঁরা। সময়ের তাৎপর্যেও তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।

ষাটের দশকে যাদের আবির্ভাব তীব্র প্রতিবাদের শিল্পী হিশেবে, পঞ্চাশের দশকে তাঁদের প্রস্তুতি পর্বে তাঁদের প্রকাশে সদর্থকতার রেশ ছিল অনেকেরই। চল্লিশের দশকে নব্য-ভারতীয় রীতির প্রতি যে বিরোধিতা গড়ে উঠেছিল শিল্পীদের, তা কিছুটা কমে এসেছিল হয়ত পঞ্চাশে। পূর্বসূরীদের কাব্যময়তা ও সদর্থকতায় গ্রহণযোগ্যও কিছু দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা। অন্তত তাঁদের প্রস্তুতিপর্বে সেই উত্তরাধিকার দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে চাইছিলেন তাঁরা। নিখিল বিশ্বাসের ছবি সম্পর্কে মহিম রুদ্র লিখেছিলেন একবার 'সারস্বত' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৭৫)—"শিল্প জীবনের শুরু থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত নিখিলের কাজ চলছিল এক বীর পরিবর্তনের গতিতে।...তাঁর গোড়ার দিককার কাজ ছিল রঙে ভরা, মিষ্টি, পাহাড় নদী ঝর্ণা আকাশ মেঘ মাঠঘাট ফুলফল—এই সবই ছিল তাঁর দেখার বিষয়।" কিন্তু ১৯৬০-এর পর থেকেই দ্রুতগতিতে

পালটাচ্ছিল নিখিল বিশ্বাসের ছবি। নিজের ভাষা তৈরি করে নেয়ার পর সময়ের স্বরূপই নিমন্ত্রণ করতে লাগলো ছবির বিষয় ও আঙ্গিক। কেমন করে? মামম রুদ্রের লেখা থেকেই তা বুঝে নেয়া যায়। "১৯৬০ থেকে তাঁর ছবিতে ঘটনা গতি এবং এক ধরনের দুরন্ত জৈবশক্তির সঞ্চার হতে লাগল···। রঙ সরে যেতে শুরু করল, কালো বেড়ে উঠল, বিচিত্র লিরিক্যাল বর্ণের মাধুর্য সুষমা শান্তি কমে গিয়ে ছবিতে আসতে লাগল কর্কশ কালো অথবা লাল অথবা নীল বা তিনেরই সমাহার! পেশির চালন ও জীবনের জন্য সংগ্রাম, কষ্ট, সংঘর্ষ হয়ে উঠতে থাকল বক্তব্য।"

নিখিল বিশ্বাস এখানে একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। ষাটের দশকের শিল্পীদের মধ্যে তিনি স্মরণীয় এ কারণে যে যদিও ১৯৬৬তে খুবই তরুণ বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সেই অল্প সময়ে দুরন্ত শৈল্পিক আকুতিতে তীব্র এক প্রতিবাদের ভাষা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি, যার নানামুখী প্রসারণ দেখি আমরা পরবর্তী সময়ে!

প্রত্যক্ষতায় এই যে প্রতিবাদের ছবি আঙ্গিকের দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যায় একে—

(১) মূর্তির প্রাকৃতিকতা আশ্রিত রূপায়ণ,

(২) ভাঙন বা বিকৃতিকারণের মধ্য দিয়ে মূর্তির উপস্থাপনা।

ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক পদ্ধতি থেকে তেল রঙে মূর্তির অবিকল উপস্থাপনার যে ধারা চলে এসেছে আমাদের ছবিতে তার অন্তর্নিহিত নান্দনিক স্থবিরতাকে পরিহার করে সেই আপাত স্বাভাবিকতাকেই তীব্র প্রতিবাদের ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারলেন আমাদের শিল্পীরা মোটামোটিভাবে ষাটের দশক থেকে। বিকাশ ভট্টাচার্য একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "প্রত্যেকটা জিনিস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে দেখা, এমনকি ওই দরজার কব্জাগুলো যে দেখছেন, সেটা আমি এমনভাবে আঁকবো, দক্ষতা দেখাবার জন্য নয়, কিন্তু ছবি বিন্যাসের জন্য, যে বাধ্য হবেন কব্জা দুটিকে অন্যভাবে দেখতে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ২৭মে '৮৭) স্বাভাবিকতাকে এই 'অন্যভাবে' দেখার মধ্য দিয়েই সময়ের আর্ত করুণাকে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর ছবিতে। ষাটের শেষ, সত্তরের গোড়ার দিকে তিনি এঁকেছিলেন 'ডল সিরিজে'র ছবিগুলি তৎকালীন রাজনৈতিক হত্যালীলার প্রতিক্রিয়ায়। তারই একটি ছবিতে যেমন, নিঃসীম শূন্যতা ঘেরা শহরের বাড়িঘর, তার পাশে বিস্তৃত শূন্য রাস্তার উপরে পুতুল সদৃশ একটি শিশু বসে আছে, তার সামনে উড়ে যাচ্ছে রক্তমাখা কোনো খবরের

কাগজ। রূপায়ণে অস্বাভাবিকতা আপাতভাবে কোথাও নেই, একমাত্র সেই ভয়ংকর শূন্যতার বিন্যাস ছাড়া। কিন্তু সেই স্যুর রিয়ালিস্টধর্মী শূন্যতাতেই রয়েছে সময়ের বিশ্লেষণ। বিকাশ ভট্টাচার্য মূর্তির অবিকল উপস্থাপনায় সামান্য ডিস্টর্সন বা মোচড় এনে সময়ের ট্র্যাজেডিকে বিশ্লেষণ করেন। স্বাভাবিকতার মধ্যে স্যুররিয়ালিস্ট শূন্যতার গভীর ভূমিকা দেখা যায় ওয়াসিম-রিয়াজ কাপুরের ছবিতে ও ওয়াসিম কাপুর তাঁর ক্যানভাসে মেলে ধরেন শূন্যতার সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের সম্পর্ক ও সংঘাতের নাটক। কোন সম্পর্ক গভীরতাবে সময়-বিধৃত। একই বাস্তবাশ্রিত উপস্থাপনায় ভিন্ন নাটকীয়তার স্বাদ আনেন পাঞ্জাবের শিল্পী গুরুচরণ সিং (১৯৪৯)। অনেক চরিত্রকে নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন ছবি। তাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচয় আছে। ছবির রচনাবিন্যাসকে যেমন কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেন তিনি, সেই সঙ্গে চরিত্রগুলোও ভাগ হয়ে যায় কয়েকটি দলে। এই একেকটি অংশের নাটকীয়তা আততি সৃষ্টি করে বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক টানাপোড়েনের নাটকীয়তার সঙ্গে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশবিভাগ, ছিন্নমূল মানুষের মিছিল, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের ক্রমিক অবক্ষয় প্রখরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে শিল্পীদের বিষয় ও প্রকাশভঙ্গি। এরই প্রতিক্রিয়ায় মুখর যাদের প্রকাশ তাদের শ্রেষ্ঠতম-দের দুজন হলেন প্রকাশ কর্মকার ও যোগেন চৌধুরী। বাস্তবতার ক্রোধ ও উষ্মা প্রকাশ কর্মকারের মানুষের শরীরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট করেছে। সেই বিশিষ্টতায় চিত্রপটের দৃশ্যতার দুই মাত্রার মধ্যে যন্ত্রণার আর্তধ্বনির তৃতীয় মাত্রা অনুভব করা যায় যেন। যোগেন চৌধুরীর মানুষ শরীরের ভারে ভারাক্রান্ত নিশ্চল। সত্তাবিহীন আলোকহীন শরীর সর্বস্ব মানুষ। এই পৃথিবীতে 'নরকের প্রতিনিধি'। ১৯৬৫-তে তিনি এঁকেছিলেন 'নরকেও প্রতিনিধি' নামেই এই ছবি। মানুষের শরীরকে ভেঙে, দুমড়ে তার আভাকে, প্রাণশক্তিকে নিষ্কাশিত করে দীর্ণ আর্তির রূপক করে তোলেন যারা এ. রামচন্দ্রন, নলিনি মালিনী, বীণা ভার্গভ, আর মেহেতা, মনু পারেখ, রামেশ্বর ব্রুটা প্রমুখ শিল্পীরা তাদের অন্যতম। আবার অন্য এক ফ্যান্টাসি ধর্মী নাটকীয়তা দেখা যায় ভূপেন খাখার, গিয়েভ প্যাটেল, সতীশ গুজরাল, রামকুমার প্রমুখ শিল্পীদের ছবিতে। সুনীল দাসের ছবিতে এই সময় প্রতীকায়িত হয়ে যায় ছবির নির্মাণগত বিমূর্ততায়, ক্যানভাসের শূন্যস্থান ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষের শরীরাংশ ও বিমূর্ত প্রতীকের বিন্যাসে, তাঁর কনফ্রনটেশন ছবিগুলিতে যেমন। একটি ভাঙা পাত্রকে প্রতীক করে শ্যামল দত্তরায় তাঁর জলরঙের সজলতা ও

নম্রতার মধ্যেও দুই সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের অন্তর্নিহিত সংঘাতকে মেলে ধরতে পারেন। আবার বাস্তবতার প্রত্যক্ষতাকেই চিরায়তের আর্কিটাইপে পরিণত করে নেন রবীন মণ্ডলের মতো শিল্পী, যে আর্কিটাইপের ভিন্নধর্মী প্রকাশ দেখেছি চল্লিশের শিল্পী এফ এন. সুজার ছবিতে। সময়কে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্লীন আর্তিকে রূপ দেওয়ার এই যে এই বিচিত্র ধারা তার প্রসার ঘটেছে এই সময়ের তরুণতর শিল্পীদের মধ্যেও। অশোক ভৌমিক, কাঞ্চন দাশগুপ্ত, মনোজ দত্তের মতো তরুণ শিল্পীরা সমন্বয়ে বলিষ্ঠ করে চলেছেন তাঁদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিকে।

এরকম প্রত্যক্ষতার মধ্যে না গিয়ে, সময়ের কোনো নির্দিষ্টতাকে স্পষ্ট করে না তুলেও, সমগ্রতাবোধের প্রকাশের মধ্যেই সময়ের ব্যঞ্জনা আনেন অনেক শিল্পী। আঙ্গিকের সূক্ষ্ম মোচড়ে ধ্রুপদী বা লোকায়ত রূপবন্ধের মধ্যেও নিয়ে আসেন সময়ের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। গণেশ পাইন তাঁর ছবির মরমী রহস্যলোকের মধ্যেও সমকালের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আনেন তাঁর রেখা বিন্যাসের এক ধরনের ঋজু ও বলিষ্ঠ দ্বান্দ্বিকতায়। ১৯৭৯-র 'অ্যাসাসিন' নামের ছবির ঘাতক নৃশংসতার চিরন্তন প্রতীক হয়েও যে এই সময়ের অনুষঙ্গকে দৃঢ় করে তোলে তা প্রধানত বুকের খাঁচা ও মুখাবয়বের বিন্যাসে রেখার বা তলের কৌণিক ও যান্ত্রিক দৃঢ়তায়, চিত্রপটের ডানপাশে উপরে ও নীচে বিশিষ্ট কংকালের উপস্থিতিতে। সময় এখানে অনেকটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু যেখানে ছবির অনুষঙ্গ বা পরিবেশ আরও অতীতের বা চিরায়তের, যেমন ১৯৮৫-র 'দি নাইট অব দি মার্চেন্ট' বা 'পিচার' নামের ছবি, সেখানেও আঙ্গিক ও প্রকরণের এই সূক্ষ্ম মোচড়ই নিয়ে আসে সমকালের অমোঘ মাত্রা।

কিউবিজমেয় বিশ্লেষণ থেকে তুলে আনা যান্ত্রিকতা মেশানো রেখার কৌণিক ঋজুতা ব্যবহার করে কেমন করে চেতনার সমগ্রতা বা লোকায়ত আঙ্গিকের মধ্যেও আনা যায় সময়ের মাত্রা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হতে পারে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পী অসিত মণ্ডলের ছবি। অসিত মণ্ডলের অনেক ছবিতেই, যেমন শাদা গরু জোয়ালে বেঁধে চাষ করছে কৃষক, কুয়ো থেকে জল তুলছে গ্রামীণ মেয়ে বা কাগজের পাখি নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে বিক্রেতা, এরকম রূপারোপে মানুষ, পশু বা পাখিতে অঙ্কনগত যে জ্যামিতিক ভাঙন, তা যান্ত্রিকতার অভিমুখী। যে স্নিগ্ধতা বা সরলতা গ্রামীণ জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তা ভেঙে যাচ্ছে' এক ধরনের বিমানবিক যান্ত্রিকতায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হচ্ছে তা, সোচ্চারে কোনো কাহিনীর মধ্য দিয়ে একথা না

বলে, আঙ্গিকের রূপান্তরে এই সামাজিক সত্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেন শিল্পী।

আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে অন্বিত করার, সমকালের অন্তর্নিহিত সত্যে পৌঁছনোর ভিন্নধর্মী এক প্রচেষ্টা করছেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হয়ত এখনও একটু কম পরিচিত রাজস্থানের শিল্পী রামেশ্বর সিং (১৯৪৮)। তাঁর প্রকরণের জন্য ও পরিচিতির স্বল্পতার জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে তাঁর ছবির।

রাজস্থানী প্রথাগত ও লোকায়ত শিল্পের জীবন্ময়তা ও কাব্যময়তাকে রামেশ্বর সিং কেবলমাত্র একটি বিশেষ আঙ্গিক হিশেবে ব্যবহার করেন। সেই রূপবন্ধকে তিনি মেলান একেবারে বিপরীতধর্মী লোকায়ত সরলতা ও ধ্রুপদী প্রশান্তি বিরোধী বিশেষ রীতির এক পাশ্চাত্য আঙ্গিক-প্রস্থানের সঙ্গে। ক্যানভাসকে তিনি প্রায় বিমূর্ত চিত্ররীতিতে রঙের বিষম ক্ষেত্রে বিভাজিত করে নেন। তার উপর কোলাজের পদ্ধতিতে যোগ করেন পোড়া ও কালো হয়ে যাওয়া কাপড় বা ক্যানভাসের টুকরো। কিন্তু তাঁর ছবির মূল ঐশ্বর্য এটুকু নয়। এই পাশ্চাত্য রূপবন্ধে তিনি যোগ করেন রাজস্থানী লৌকিক ভাস্কর্য ও অনুচিত্রের জগৎ থেকে তুলে আনা মানবমানবীর প্রতিমাকল্প। সেই প্রতিমাকল্পগুলি ক্যানভাসে স্থাপিত হয় কখনো আয়তক্ষেত্রাকার কখনো বা বৃত্তাকার রচনাবিন্যাসে। এর সঙ্গে আসে রাজস্থানের মধ্যযুগীয় ধর্মগ্রন্থ ও কাব্য থেকে তুলে আনা ক্যালিগ্রাফির নানা বিন্যাস। এই যে প্রথাগত শিল্প থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলো, বিভিন্ন প্যানেলের মতো যাদের চিত্রক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়েছে, চিত্রের সামগ্রিকতায় তাঁর কোনো কাহিনীর সম্পূর্ণতায় সাহায্য করছে না। অন্যনিরপেক্ষভাবে সেই মূর্তিগুলি কোনো প্রতীকেরও দ্যোতনা আনছে না। আমরা একদিকে দেখছি মধ্যযুগীয় রাজস্থানের সামন্ত শ্রেণীর রাজন্যবর্গের শৌর্য ও বীরত্বের নানা প্রকাশ, প্রেমাবিষ্ট নায়ক নায়িকাদের শরীরের নানা ছন্দিত ভঙ্গি, ধর্মের ও পুরাণের নানা দেবদেবীর অবস্থান, অন্যদিকে এর পাশাপাশি অবস্থান করছে একেবারে বিপ্রতীপ চরিত্রর ক্যানভাসের বিমূর্তান্বিত টেক্সচার, পোড়া ও ছিন্ন অংশের নেতিবাচক মর্বিডিটি। আঙ্গিগতভাবে এই দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত হয়ে যায় ছবির বিষয় ও ভাবের ক্ষেত্রেও। দুটি বিপরীত সংস্কৃতি, দুই বিচ্ছিন্ন সভ্যতার বিপ্রতীপ মূল্যবোধ, জীবনযাপনের দুই দর্শনগত বিচ্ছিন্ন প্রবরহ, আপাতভাবে যাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় সম্ভব নয়, যাদের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান, এখানে তারা যেন

ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য নিয়মে মিলতে বাধ্য হচ্ছে। আপাতভাবে সমন্বয়ের কোনো সাধারণ ভিত্তিভূমি নেই তাঁদের। নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের সাধারণ কোনো ভাষাও নেই। কিন্তু সময় ও বাস্তবতা তাঁদের আজ এক ঐক্যের মধ্যে বেঁধেছে, যাকে অস্বীকার করার কোনো পথও তাঁদের সামনে নেই। আজকের ভারতীয় বাস্তবতার এই মূলগত দ্বন্দ্ব আঙ্গিকের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন শিল্পী।

ফিরে আসতে হয় সেই গোড়ার কথায়, আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে সময়কে ছুঁয়ে যাওয়া, আজকের ছবিতে আধুনিকতার এটাই প্রধানতম এক বৈশিষ্ট্য। সাজিয়ে তোলার মধ্যেই ছবির পরম লক্ষ্যের কথা বলেন যখন আমাদের সেই শিল্পী, তখন তিনি হয়ত আধুনিকতার এই দিকটিরই ইঙ্গিত দিতে চান।

বিভ্রম

শৈবাল মিত্র

এসপ্ল্যানেড থেকে ট্রামে উঠে ওয়েলিংটনের কাছে এসে বসার একটা জায়গা পেল কল্লোল। ট্রামের দরজার ঠিক বাঁদিকে, একানে, সিঙ্গল্ সিট্টা, বিধান রায়ের বাড়ির সামনে যে হঠাৎ খালি হয়ে যাবে, কল্লোল ভাবতে পারেনি। সিট্টায় বসে শ্যামবাজার পর্যন্ত মেজাজে যাওয়া যাবে ভেবে কল্লোল বেজায় খুশি হলো।

প্রথম হেমন্তের শনিবারের শেষ বিকেল, ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখে, মাথায় লাগতে কল্লোলের শরীর জুড়িয়ে গেল। ট্রামে ভিড় নেই। দু-একজন দাঁড়িয়ে থাকলেও সকলেই প্রায় বসার জায়গা পেয়েছে। ফাঁকা রাস্তা। শনিবারের শেষ বিকেলে রবিবার যেন শুরু হয়ে গেছে।

হাল্কা মেজাজে ট্রামের যাত্রীদের ওপর একপলক নজর বোলাতে গিয়ে কল্লোল চমকে উঠল। ধড়ফড় করে কেঁপে উঠল তাঁর বুক, মিনমিনে ঘাম জমল কপালে। এমন আরামে বসার জায়গা পেয়েও নেমে যাবে কিনা, কল্লোল ভাবতে শুরু করল। এখন টিকিট করা হয়নি। তবু নেমে যাওয়া ভালো। টিকিট কাটলেও কল্লোল নেমে যেত।

ড্রাইভারের ঠিক পেছনে, বাঁ দিকের প্রথম একানে সিটে, সরোজকে বসে থাকতে দেখে, এ ট্রামে যাওয়ার ইচ্ছে কল্লোলের দপ্ করে নিভে গেছে। একটু আগে বসার জায়গা পেয়ে কল্লোলের মনে যে পুলক ফুর্তি জেগেছিল, তা মুছে, এখন তার মনে শুধু অশান্তি, আতঙ্ক। সামনে তাকিয়ে সরোজ বসে থাকলেও একবার ঘাড় ঘোরালেই কল্লোলকে দেখতে পাবে। তারপর··· ? কল্লোল আর ভাবতে পারল না। দুশ্চিন্তা, বিরক্তিতে তার মন, মেজাজ বিগড়ে গেল। হিন্দ্ সিনেমা ছেড়ে ট্রাম চলেছে বৌবাজারের দিকে। বৌবাজার-কলেজ স্ট্রিটের মাথায় আজও প্রবল জ্যাম্। নানা জাতের গাড়ি, গা ঘসাঘসি, মিছিল করে দাঁড়িয়ে প্যাঁ পোঁ্যা, পিঁ পিঁ হর্ন মারছে। কানে তালা ধরানো আওয়াজ।

সাদা উর্দিপরা দু'জন ট্রাফিক্ পুলিশ আইন বাঁচাতে হিমসিম খাচ্ছে। তাদের কপালে ঘাম, হাতে সিকি, আধুলি।

কল্লোলের সামনে এসে কণ্ডাক্টর বলল, টিকিট!

ভাবার সময় নেই। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে কল্লোল বলল, শ্যামবাজার।

টিকিট আর খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে কল্লোল আবার দেখল, তার সরলরেখায় একদম সামনের সিটে অল্প এলিয়ে সরোজ আরামে; স্থির হয়ে বসে আছে। বৌবাজার পেরিয়ে ট্রাম চলেছে উত্তরে। কীভাবে সরোজের নজর এড়িয়ে বসে থাকা যায়, কল্লোল ভাবছে। অন্যদিন কল্লোলের হাতে একটা ব্রিফ্‌কেসে দরকারি কাগজপত্রের সঙ্গে দু'একটা বই থাকে। আজ শনিবার, অফিস ছুটি, ব্রিফ্‌কেস নেই, কল্লোলের হাত খালি। ভবানীপুরে রূপেনের বাড়িতে আড্ডা দিতে গিয়েছিল কল্লোল। আড্ডায় ব্রিফ্‌কেসের দরকার হয় না। কিন্তু ব্রিফ্‌কেস্‌টা আজ না থাকার জন্যে কল্লোলের আফশোস হচ্ছে। বাক্সটা সঙ্গে থাকলে একটা বই বা পত্রিকা বার করে এই দুঃসময়ে সে মুখটা ঢাকতে পারতো। পেছনে তাকিয়েও সরোজ দেখতে পেত না কল্লোলকে। কিন্তু তা হবার নয়, তার আদুল মুখ, ঘাড় ঘোরালেই সরোজ দেখতে পাবে। নাহ্, এ ট্রাম থেকে নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবু এই আরামের সিট্ ছেড়ে কল্লোলের নামতে ইচ্ছে করছে না।

বৌবাজার থেকে পাঁচ-সাতজন যাত্রী উঠে ট্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিড় অল্প বাড়ালেও সরোজের সঙ্গে কল্লোলের কোনো আড়াল তৈরি হলো না। কোণাকুনি কোনো সিটে বসলে কল্লোল হয়তো সরোজের দৃষ্টি এড়াতে পারতো। এখন আর তা সম্ভব নয়। রুমালে কপালের ঘাম মুছে খোলা জানালার বাইরে মুখ রেখে কল্লোল একটু তেরচা হয়ে বসল। এখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও সরোজ চিনতে পারবে না কল্লোলকে। তবু সেভাবে কল্লোল বসে থাকল। সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। সরোজের চোখকে ফাঁকি দিতে যে কোনো কষ্ট, দুর্ভোগ কল্লোল সইতে রাজি আছে।

এখনও পর্যন্ত সরোজ একবারও পিছনে তাকায় নি। কল্লোল জানে, মানুষ যখন হাঁটে, বসে, তখন তার নজর থাকে সামনে, সহজে সে পেছনে তাকায় না। সামনে তাকানো মানুষের স্বভাব। সরোজ যে সহজে পেছনে তাকাবে না,

এমন এক ভরসায় কল্লোল আশ্বস্ত করল নিজেকে। সরোজের বসার ভঙ্গি, এলিয়ে পড়া শরীর দেখে কল্লোলের মনে হলো, সরোজ ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই ভালো। সরোজ ঘুমিয়ে পড়লে কল্লোল বেঁচে যায়। এখন সরোজের নজরে এলে কল্লোলের ভরাডুবি! নিজের জায়গা ছেড়ে সরোজ ঠিক কল্লোলের সিটের সামনে এসে দাঁড়াবে। নানা খেজুরে আলাপের পর কল্লোলের কাছ থেকে হুম করে একশো টাকা ধার চেয়ে বসবে। একশো না থাকলে সত্তর, পঞ্চাশ, ত্রিশ, বিশ শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকাতে রফা হবে। যা পায়, তাই সই, খালি হাতে সরোজ ফিরবে না। টাকা নিয়ে দর কসাকসি ট্রামের অন্য যাত্রীরা যে শুনছে, দেখছে, উসখুস করছে, সরোজ সে সব পরোয়া করবে না। তার দরকার যে কতো জরুরি, নিশ্ছিদ্র, রেশন তোলার টাকা নেই, মুদির তাগাদা, বকেয়া ইলেকৃট্রিক বিল, বৌয়ের ব্রঙ্কাইটিশ, মেয়ের জীবনদায়ী ওষুধ কেনা, এরকম সাতকাহন গল্প শোনাবে। এমন এক অস্বস্তিকর, নাছোড় পরিবেশ তৈরি হবে যে, টাকা না দিয়ে কল্লোল রেহাই পাবে না। আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে। ফেরৎ দেওয়ার শপথ করে কয়েক কিস্তিতে কল্লোলের কাছ থেকে দেড়, দু'হাজার টাকা সরোজ ধার নিয়েছে। সে ধারের কানাকড়ি আজ পর্যন্ত সরোজ শোধ করেনি। কোনোদিন যে করবে, এ আশাও কল্লোলের নেই। সরোজকে টাকা ধার দেওয়া মানে যে দান, কল্লোল জেনে গেছে। এখন সরোজকে দেখলে কল্লোল পালিয়ে বাঁচতে চায়।

কলেজ স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধী রোড পেরিয়ে ট্রাম এগোচ্ছে ঠনঠনে কালিতলার দিকে। ট্রামের মধ্যে আবছা অন্ধকার। যে কোনো সময়ে ট্রামের আলোগুলো জ্বলে উঠবে। সরোজ যে কোথায় যাচ্ছে, কোন্ স্টপে নামবে, কল্লোল জানে না। কল্লোল যাবে বাগবাজারে। বেলেঘাটার ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে মাসতিনেক আগে বাগবাজারে নতুন ফ্ল্যাট কিনে কল্লোল উঠে এসেছে। বেলেঘাটার বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেলেও বাগবাজারে, কল্লোলের নতুন ফ্ল্যাটের হদিশ সরোজ এখনও পায়নি। কল্লোল তার নতুন ঠিকানা সরোজকে জানাতে চায় না।

কল্লোল ঠিক করল, শ্যামবাজার টার্মিনাসে ট্রাম ঢোকার আগে সে নেমে পড়বে। কিন্তু তার আগে সরোজ নামলে মুশকিল। কল্লোলকে যদি সরোজ দেখে ফেলে, তাহলে রেহাই নেই। কলেজ স্ট্রিট থেকে কিছু যাত্রী ওঠায় ট্রামে ভিড় বেড়েছে। শনিবারের এই সন্ধেতে সরোজ কোথায় যাচ্ছে, কল্লোল বুঝতে পারল না। প্রায় বছর খানেক বাদে কল্লোল দেখল সরোজকে।

চন্দ্রিমার বিয়েতে কল্লোলকে নীলিমা, একা নিমতন্ন করতে এসেছিল। সরোজ আসেনি। চন্দ্রিমার বিয়ের পরেও তো ছ-সাত মাস কেটে গেল। বেলেঘাটার বাড়িতে এসে সরোজের স্ত্রী নীলিমা, কল্লোলকে সপরিবারে যাওয়ার কথা বলে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়েছিল। সোনালি হরফে ছাপা দামী, সুন্দর কার্ড। যাবার কথা দিয়েও সরোজ, নীলিমার মেয়ের বিয়েতে কল্লোল যায় নি। না যাওয়ার কারণ আছে। কল্লোলের হাতে বিয়ের কার্ড দিয়ে নীলিমা বলেছিল যে, পিতৃহীন সরোজের যে জ্যাঠার নামে বিয়ের আমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়েছে, সে জ্যাঠা শিলিগুড়িতে থাকে, তাকে আনতে গত পরশু সরোজ শিলিগুড়ি গেছে। দু-একদিনের মধ্যে জ্যাঠাকে নিয়ে সরোজ কলকাতায় ফিরবে। সময় কম, তাই সরোজের পুরোনো বন্ধু, যাদের নীলিমাও অনেক দিন চেনে, তাদের নেমন্তন্ন করার দায়িত্ব নীলিমাকে দিয়ে গেছে সরোজ।

নীলিমার কথা কল্লোল অবিশ্বাস করেনি। কে নেমন্তন্ন করতে এলো, কে এলো না, এসব খুঁটিনাটি মেয়েলি বিষয়ে কল্লোল মাথা ঘামায় না। যথেষ্ট খাতির করে নিলীমাকে বাড়ির ভেতরে এনেছিল কল্লোল। বলেছিল, চন্দ্রিমার বিয়ে, যেতেই হবে, নিশ্চয় যাবো··· ।

তখন সকাল ন'টা, অফিস যাওয়ার তাড়া। মুখের একপাশের দাড়ি কামিয়ে আর একপাশ কামাবার ঠিক আগে সদর দরজার কড়া বেজে উঠল। দরজা খুলতে হলো কল্লোলকে। ছেলেমেয়ে নিয়ে কল্লোলের বৌ ভারতী দু'দিন আগে বৌবাজারে বাপের বাড়ি গেছে। বাড়িতে কল্লোল একা। আধকামানো, জবজবে সাবান মাখা, কিম্ভূত মূর্তি কল্লোল, দরজা খুলে নীলিমাকে দেখে সমাদর করে বসার ঘরে বসিয়েছিল। তাড়াতাড়ি একপাশের দাড়ি কামিয়ে ফিরে এসেছিল কলঘর থেকে। কয়েক মিনিট নীলিমার সঙ্গে কথা বলে প্রশ্ন করেছিল, চা খাবেন।

আর একদিন, ভারতী ফিরে এলে, নীলিমা বলেছিল, তাছাড়া আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে।

চা না খেয়ে চলে গিয়েছিল নীলিমা। দশ দিন পরে চন্দ্রিমার বিয়ে। চন্দ্রিমা রীতিমতো সুন্দরী, বয়স উনিশ-কুড়ি, কলেজে পড়ে। চন্দ্রিমাকে ভারতী খুব ভালোবাসে। কল্লোলও পছন্দ করে। অফিসে যাওয়ার জন্যে চটপট তৈরি হতে হতে চন্দ্রিমাকে কী উপহার দেবে, কল্লোল ভাবছিল। বাপের বাড়ি থেকে পরশু ভারতী ফিরলে, তাকে নিয়ে কল্লোল উপহার কিনতে যাবে। অফিসের পোশাক পরে, একগ্লাস কমপ্লান, দুটো বিস্কুট খেয়ে বসার

ঘরের টেবিল থেকে হাতঘড়ি নিতে গিয়ে কল্লোল দেখল, টেবিলের ওপর ঘড়িটা নেই। অথচ ঘড়ি ওখানেই ছিল। দৌড়ে কলঘরে ঢুকে কল্লোল ঘড়ি খুঁজল। নাহ্, সেখানেও নেই। বাড়ির যেসব জায়গায় ঘড়ি রাখা সম্ভব, আঁতিপাতি খুঁজেও কল্লোল ঘড়িটা পেল না। ভারি বেকামাল হয়ে পড়েছিল কল্লোল। এটা কল্লোলের বিয়ের ঘড়ি, দশ বছর আগে পেয়েছিল। গত এক দশক এই দামী ওমেগা ঘড়ি নিখুঁত, নির্ভুল সময় দিয়েছে। সে ঘড়ি গেল কোথায়? প্রশ্নটা মনে জাগতে এক ভয়ঙ্কর সন্দেহ ধারালো কাঁটার মতো কল্লোলের মাথায় বিঁধে গেল। ঘড়ি যে নীলিমা সরিয়েছে, কথাটা ভাবতেই কল্লোলের হাত, পা অবশ, ফাঁকা বসার ঘরে সে গুম মেরে বসে থাকল অনেকক্ষণ। সন্দেহের কথাটা কল্লোল কাকে জানাবে? তাছাড়া চোরকে হাতে-নাতে না ধরলে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করাও মুশকিল। নীলিমার বিরুদ্ধে ঘড়ি চুরির কী প্রমাণ কল্লোল দেবে?

অফিসের সময় বয়ে যাচ্ছে, কল্লোলের খেয়াল ছিল না। কিছুটা জবুথবু হয়ে গিয়েছিল সে। প্রায় আধঘণ্টা পরে সুনীল সরকারকে ফোন করেছিল কল্লোল। সুনীল শুধু কল্লোল নয়, সরোজেরও পুরোনো বন্ধু। কল্লোল ভাগ্যবান। একবার ডায়াল ঘুরিয়ে ফোনে পেয়ে গেল সুনীলকে। কী বলবে, বলার আছে, না ভেবেই সুনীলকে ফোন করেছিল কল্লোল। ফোনে সুনীলের গলায় গম্ভীর 'হ্যালো' শুনে কল্লোল থতমত খেল। বলল, আমি কল্লোল।

এবার সুনীল বাঁচালো কল্লোলকে। প্রশ্ন করল, সরোজের মেয়ের বিয়েতে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ, শুকনো গলায় কল্লোল বলেছিল।

কবে এসেছিল নেমতন্ন করতে?

আজ, একটু আগে, নীলিমা··· ।

আর কী বলবে কল্লোল ভেবে পেল না। সরোজ যায়নি, প্রশ্ন করেছিল সুনীল।

সরোজ শিলিগুড়ি গেছে, জবাব দিয়েছিল কল্লোল।

কে বলল?

নীলিমা।

বাজে কথা, গম্ভীর গলায় সুনীল বলল, কাল সন্ধেতে সরোজ, নীলিমা, দুজনে আমার বাড়ি এসেছিল, নেমন্তন্ন করতে··· । ওরা চলে যাবার পর থেকে আমার ওয়ালেট্‌টা··· ।

কী বলছিস, আবছা গলায় ককিয়ে উঠল কল্লোল।

বসার ঘরের ওয়ারড্রোবের ওপর অফিস থেকে ফিরে ওয়ালেটটা রেখেছিলুম, সুনীল বলল, বেশি নয়, শ-দুই টাকা ছিল।

কল্লোলের মাথার মধ্যে ভনভন শব্দ, সে বলল, আজ নীলিমা চলে যাবার পর থেকে আমার দামী ওমেগা ঘড়িটা···।

কী সাংঘাতিক!

সুনীলের আতঙ্কিত গলা কল্লোল শুনল। কথা শেষ করে ফোন রেখেও কল্লোল ধাতস্থ হতে পারল না। সরোজ শিলিগুড়ি যায়নি, কলকাতায়, কাল সন্ধেতে সুনীলের বাড়ি গিয়েছিল, অথচ নীলিমা মিথ্যে বলে গেল। কেন এ ধাপ্পাটা নীলিমা দিল? কী করবে কল্লোল ভেবে পেল না। ঘড়ি চুরির অভিযোগে নীলিমার নামে থানায় ডাইরি করা যায়। কিন্তু তারপর···? সংসারের অভাব, টানাটানিতে সরোজ যে হাবুডুবু খাচ্ছে, কল্লোল জানতো। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। কী করবে সে? সরোজের বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই, কল্লোলের চেয়ে সরোজ সাত-আট বছরের বড়ো। ভবঘুরে, বেহিসেবি সরোজকে পাঁচ, ছ'বছর আগেও কল্লোল বিপদে, সঙ্কটে পরামর্শ সাহায্য দিত। এখন আর দেয় না। নিজের ভালো মন্দ সরোজ না বুঝলে কল্লোল কী আত্মীয়-বন্ধুরা কী করবে? সরোজ যা চাকরি করে, মাইনে পায়, একটু সতর্ক, হিসেবি হলে, বৌ মেয়ে নিয়ে তিনজনের সংসার ভালোভাবে চলার কথা। কিন্তু সরোজ হিসেব-নিকেশের ধার ধারে না, মাইনের টাকা মাস শেষ হবার অনেক আগে সে ফুঁকে দেয়। তারপর ধার করে, গুলতাপ্পি, ধোঁকা দিয়ে বেড়ায়। অল্পসল্প নেশা করলেও সরোজ রেস, জুয়ো খেলে না। একটা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা নাম 'সুসময়' সরোজ সম্পাদনা করে। গাঁটের পয়সায় গত বিশ বছর ধরে 'সুসময়' বার করছে সরোজ। বাণিজ্যিক কাগজ নয়, শিল্প, সাহিত্য নিয়ে যারা হৈ-হল্লা করে, তারা জানে 'সুসময়' পত্রিকার নাম। দোকানে স্টলে 'সুসময়' সাজানো থাকলেও বিক্রি বিশেষ হয় না। কখনও সখনও দু'চারটে বিক্রি হলেও দোকানদারের কাছ থেকে সরোজ দাম আদায় করতে পারে না। তবু সরোজ অদম্য, নিয়মিত পত্রিকা বার করে যাচ্ছে।

বেশ কয়েকবার পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভেবেও সরোজ পেরে ওঠে নি। পত্রিকা বার করার জন্যে চাপ দিয়েছে নীলিমা। পত্রিকার ওপর ভালোবাসা, মমতা বা সাহিত্যপ্রীতির জন্যে নীলিমা চাপ দেয়নি। তার

চাপ দেওয়ার কারণ একেবারে আলাদা। নীলিমার আশা, তাদের পত্রিকা একদিন দাঁড়াবে, প্রতিষ্ঠা পাবে, রূপকথার রাজহাঁসের মতো সোনার ডিম পাড়বে। সরোজকে নিয়ে তৈরি অনেক বাসী স্বপ্ন, আধমরা প্রত্যাশা সুসময়ের ওপর চাপিয়ে নীলিমা দিন গুনছে। নীলিমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তার ধারণা সুসময়ের কি সংখ্যার জন্যে ত্রিশ, চল্লিশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। দরকার, সম্পাদকের ইচ্ছে, উদ্যোগ। কাগজ নিয়মিত বার করার জন্যে সরোজের ক্ষেপামির সঙ্গে যোগ হয়েছিল নীলিমার তাগিদ, তাড়না। পত্রিকার দৌলতে ফুলে, ফেঁপে বড়োলোক হওয়ার স্বপ্ন, নানা গল্প, কাহিনী ফেঁদে নীলিমার মাথাতে সরোজই ঢুকিয়েছিল। সুসময়ের মতো দু-তিনটে সাহিত্যপত্রিকা যে প্রতি সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকা বিজ্ঞাপন পায়, পত্রিকাগুলো বাজারে না চললেও, সম্পাদকদের যে রমরমা স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি, বাড়ি, গাড়িও যে দু'একজন হাঁকিয়েছে, সরোজের মুখে বারবার এসব গল্প শুনে নীলিমার নেশা ধরে গেছে। সেই নেশাতে মশগুল হয়েছিল নীলিমা। বিজ্ঞাপন জোগাড়ে সরোজের সঙ্গে নীলিমাও বেরোতে শুরু করেছিল। সরকারি, বেসরকারি অফিসের প্রচার দপ্তরে ছোট, বড়ো কর্তাদের টেবিলের সামনে স্বামী, স্ত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ণা মেরে বসে থাকতো। সরোজ, নীলিমার অফিসে আসার খবর পেলে বিরক্ত, সন্ত্রস্ত কর্তাদের কেউ কেউ অফিস ছেড়ে পালিয়ে যেত। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দু'চার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন ওরা পেয়ে যেত। কিন্তু বিজ্ঞাপন পেতে এবং টাকা আদায়ে খরচ যা হতো, বিজ্ঞাপনের টাকার চেয়ে তা খুব কম নয়। পত্রিকার কাজে অফিস থেকে সরোজ প্রায়ই ডুব মারতো। মাসে পাঁচ-সাত দিন কামাই লেগে ছিল। সরকারি অফিস বলে শুধু মাইনে কাটা যেত, চাকরি যায়নি। সব মিলে বেশ বেকায়দায় পড়েছিল সরোজ।

সরোজ যে তলিয়ে যাচ্ছে, এখবর কানে এলেও কল্লোল মাথা ঘামায় নি। মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, সে সময়ও কল্লোলের ছিল না। চন্দ্রিমার বিয়ের চিঠি হাতে নীলিমাকে দেখে কল্লোলের মনে হয়েছিল, অনেকদিন সরোজের খবর না নেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। কথাটা মনে হতে নীলিমাকে একটু বাড়তি খাতির সৌজন্য দেখিয়েছিল কল্লোল। নীলিমা যে মওকা পেয়ে হাতসাফাই করবে, কল্লোল ভাবেনি। অফিসে বেরোবার আগেই কল্লোল ঠিক করেছিল, চন্দ্রিমার বিয়েতে সে যাবে না, কল্লোলের বিয়ে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছেটা মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল।

বুকে ঘড়ির শোক নিয়ে সেই সন্ধেতে অফিস থেকে কল্লোল বৌবাজারে শ্বশুর বাড়িতে গেল। ঘড়ি চুরির কাহিনী ভারতী প্রথমে বিশ্বাস করল না। বলল, তোমার ঘড়ি বাড়িতেই আছে। ভুলো মন, কোথায় রাখতে কোথায় রেখেছো, খুঁজে পাচ্ছো না। পরশু, আমি ফিরলেই পাওয়া যাবে।

কথা শেষ করে, এক সেকেণ্ড কল্লোলের মুখের চেহারা দেখে ভারতী বলেছিল, চন্দ্রিমার বিয়েতে বরের ঘড়িটা না হয় আমরা দিলাম। জ্যাঠা, কাকারা তো দেয়…।

ভারতীর কথায় রেগে গেলেও কল্লোল খুলে কিছু বলেনি। রাগ দেখিয়েছিল অন্যভাবে। ভারতীর বহু অনুরোধ চাপাচাপিতেও কল্লোল চন্দ্রিমার বিয়েতে গেল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভারতী গুম হয়ে বাড়িতে বসে থাকল।

বিয়ের হপ্তাখানেক বাদে প্রবীর এবং আরো দু'একজন বন্ধুর মুখে কল্লোল শুনল, মেয়ের বিয়েতে সরোজ এলাহি আয়োজন করেছিল। প্যাণ্ডেল, আলো, সানাই, ফুল, ভুরিভোজ, ঘটার বিয়েতে যা যা হয়, কিছু বাদ পড়েনি। ডাক্তার বরের হাতে সোনার গয়নায় চন্দ্রিমাকে মুড়ে দিতে হয়েছে।

প্রবীর বলেছিল, মেয়ের বিয়ে দিতে সরোজ নিশ্চয় কিছু অঘটন ঘটিয়েছে।

প্রবীরের সন্দেহ যে নির্ভুল, তিন-চার মাসের মধ্যে তা প্রমাণ হলো। চব্বিশ পরগনা জেলা নাজিরখানার তহবিল লোপাটের গোপন অডিট রিপোর্ট ছেপে খবরের কাগজগুলো ফাঁস করে দিল। বিধানসভায়, দোকানে, বাজারে রাস্তায় নাজির খানা কেলেঙ্কারি নিয়ে হৈহৈ, সকলের মুখে একই কথা, গল্প। সাত, দশ লাখ বা আরো বেশি টাকা তছরুপ করার দায়ে নাজিরখানার যে পাঁচ কর্মীকে সাসপেণ্ড করা হলো, তাদের একজন সরোজ। চার সহকর্মীর সঙ্গে সরোজ সেনগুপ্তের নামও খবরের কাগজে ছাপা হলো।

চন্দ্রিমার বিয়ে, নাজিরখানা কেলেঙ্কারির পর এই প্রথম ট্রামে সরোজকে দেখে কল্লোল ভয় পেয়েছে। বিবেকানন্দ রোড পেরিয়ে চাচার হোটেলের সামনে ট্রামটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ট্রাম লাইনের ওপর উঠে একটা রিক্সার সরু চাকাদুটো স্টিলের লাইনের খাঁজে আটকে গেছে। রিক্সাওলা হাঁসফাস করছে। লাইনের কামড় থেকে বেরোতে পারছে না। ট্রামের ঘণ্টা বাজছে, ঢঙ ঢঙ।

সামনে তাকিয়ে সরোজকে হঠাৎ নড়ে চড়ে বসতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল কল্লোলের বুক। লোকটা এখনই নামবে, কল্লোলের মনে হলো। নিজের

জায়গা ছেড়ে একলাফে পেছনের লেডিস সিটের কাছে কল্লোল চলে এলো। মুখোমুখী দুটো টানা লেডিস্ সিটের একটা খালি। খালি সিটের একদম কোণে গুটিসুটি বসে, আড়চোখে কল্লোল দেখল, সরোজ আগের মতো চুপচাপ, স্থির, এলিয়ে আছে। কল্লোল বুঝল, ভুল দেখেছিল সে। এর নাম, প্রহেলিকা, বিভ্রম। শরীরের অনেক গভীরে তিরতির তীব্র কাঁপুনি টের পেল কল্লোল। ট্রামের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠল।

কল্লোলের ছেড়ে আসা সিটে একজন বসে পড়েছে। ট্রাম চলতে শুরু করতে পাঁচ, ছ-বছর আগের একটা ঘটনা কল্লোলের মনে পড়ল। যোধপুর পার্কে দু'কামরার একটা ফ্ল্যাটে সরোজ তখন থাকতো। ওরকম দামী পাড়ায় বেশ সস্তায় ফ্ল্যাটটা ম্যানেজ করেছিল সরোজ। সরোজের ফ্ল্যাটের ঠিকানা জানলেও কল্লোল কখনও যায়নি। কফিহাউসে, রাস্তায়, রবীন্দ্রসদনে বা বইমেলায় দেখা হলে সরোজ তার ফ্ল্যাটে কল্লোলকে যেতে বলতো।

এসব মুহূর্তে কল্লোলের দাদা মন্দারের নাম করে সরোজ বলতো, ও বেঁচে থাকলে কিন্তু আমার বাড়ি যেত।

বিশ বছর আগে কল্লোল যখন এম এ ক্লাসে পড়ে, মন্দার মারা গিয়েছিল। মন্দার মারা যাওয়ার পরেও কল্লোলের বাবা, মার সঙ্গে সরোজ দেখা করতে আসতো। তারপর এককময়ে কল্লোলের বন্ধু হয়ে গেল সরোজ। যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে যেতে বললেও, তাকে কখন পাওয়া যায়, সরোজ বলতো না। সরোজের বাড়িতে কল্লোলের না যাওরার এটা একটা কারণ।

অফিসের এক সহকর্মী প্রত্যূষের যোধপুর পার্কের বাড়ি থেকে এক শনিবার পার্কের পুরোনো বাসিন্দা, তিনপুরুষ ওখানে আছে। প্রত্যূষের ঘরে প্রায় দু ঘণ্টা আড্ডা মেরে তার সঙ্গে কল্লোল যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে, শরতের সূর্য মাঝ আকাশে। কল্লোলকে বাসে তুলে দিয়ে প্রত্যূষ বাড়ি ফিরবে। প্রত্যূষের বাড়ির সামনে রাস্তাটা বাঁ দিকে ঘুরে, ডাইনে পাক খেয়ে বাস রাস্তায় মিশেছে। বাঁ দিকে ঘুরে ডাইনে গেলে রাস্তার ধারে একটুকরো ফাঁকা জমি, তার পাশে এক একটা বাড়ি। বাস্ স্টপে যাওয়ার পথে ফাঁকা জমির ওপর ভিড়, জটলা দেখে প্রত্যূষ দাঁড়িয়ে গেল। কল্লোলও থামল।

সবুজ জমির ওপর ছড়িয়ে ছিল শরতের সকালের ঝকঝকে রোদ। একজন মানুষকে ঘিরে সেই জমির ওপর তিন, চারজন লোক হল্লা করছে। তাদের ঘিরে মজা দেখছে আরো কিছু মানুষ। মাঠের ধারে ডাঁই করা কিছু পুরোনো

বাসন, আসবাব, বিছানা, বালিশ, হাঁড়ি, ডেকচি, গামলা, গ্লাস। রাস্তার পাশে একটা খালি ঠেলা। ঠেলার সামনে রাস্তার ওপর হাজার হাজার নতুন, পুরোনো পত্রিকা, কিছু গাঁট বাঁধা, কিছু ছড়ানো, পড়ে ছিল। ঘন, ঠাণ্ডা বাতাসে ফরফর করে উড়ছে পত্রিকার মলাট। একটা পত্রিকার মলাটে লেখা, কল্লোল পড়ল, 'সুসময়'। তখনই মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো সরোজকে চিনতে পারল কল্লোল। সরোজের মুখ, চোখ বিব্রত, অসহায়, কাতর। তার হাই পাওয়ারের চশমা চোখে নেই, রয়েছে পকেটে। ডান হাতে পকেট আঁকড়ে ধরে সরোজ দাঁড়িয়ে আছে। তার পকেট থেকে চশমা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে একজন তাগড়া চেহারার লোক। সরোজের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তেরো, চোদ্দ বছরের ফুটফুটে, সুন্দরী একটি মেয়ে। এক নজরে চন্দ্রিমাকে চিনতে পেরেছিল কল্লোল। চারপাশের হৈচৈ, গোলমালে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল চন্দ্রিমা।

প্রত্যূষের পাশে কল্লোলকে দেখে চন্দ্রিমা ছুটে এসেছিল। চন্দ্রিমার কাঁধে হাত রেখে তাকে শান্ত করেছিল কল্লোল। চন্দ্রিমার মুখ থেকে কল্লোল শুনল, যে, বাড়িভাড়া বাকি পড়ায় কোর্টের হুকুমে পেয়াদা, পুলিশ এনে বাড়িওলা সকালে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে তাদের।

চন্দ্রিমা বলল, মা কসবায়, অনেকক্ষণ আগে মামারবাড়ি চলে গেছে।

চোখে চশমা এঁটে কল্লোল আর প্রত্যূষের সামনে এখন সরোজ এসে দাঁড়িয়েছে। সরোজ বলল, কোর্টে আমি যেতে না পারলেও উকিলকে নিয়মিত টাকা দিয়েছি। ব্যাটা উকিলটা ঘুসখোর, বাড়িওলার কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমাকে ডুবিয়েছে।

সরোজ যা বলেছিল, তার সত্যি, মিথ্যে কল্লোল আজও জানে না। কিন্তু কল্লোলের সঙ্গে সরোজের পরিচয় থাকার জন্যে সেই গোলমালে প্রত্যূষ নাক গলিয়েছিল। যে তিনজন লোক, পাড়ার মুদি, কয়লাওলা, চা দোকানী, টাকার জন্যে সরোজকে তড়পাচ্ছিল, তার জিনিসপত্র আটকে দিয়েছিল, প্রত্যূষকে দেখে তারা ঠাণ্ডা হলো। হিসেব কসে সরোজের কাছ থেকে তিনজনের পাওনা মোট পাঁচশো সাতাশ টাকার জামিন হয়েছিল প্রত্যূষ। সরোজ কথা দিল, একমাসের মধ্যে যার যা পাওনা দিয়ে যাবে।

সরোজ কথা রাখেনি। প্রথম মাসে চায়ের দোকানের এবং দ্বিতীয় মাসে মুদির ধার, সাকুল্যে তিনশো টাকা মিটিয়ে সে ডুব দিয়েছিল। আর যোধপুর পার্কে যায়নি। কয়লার দোকানের ধার শোধ করেছিল কল্লোল। যোধপুর

পার্ক থেকে সরোজ গিয়ে উঠল কসবায়, শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে কয়েকমাস থেকে কাছাকাছি একটা এক ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিল! সরোজের সঙ্গে তারপর মাঝে মাঝে, কখনো রাস্তায়, কফিহাউসে কল্লোলের দেখা হয়েছে। কল্লোলের বেলেঘাটার বাড়িতেও দু'তিন বার সরোজ এসেছে। চন্দ্রিমাকে নিয়ে নীলিমা এসেছে তিন-চারবার। চন্দ্রিমার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে শেষ এসেছিল নীলিমা। একা। সরোজের সঙ্গে দেখা না হলেও তার খবর বন্ধু চেনাজানাদের কাছ থেকে কল্লোল পেত।

কল্লোলের বৌ ভারতী খুব নরম মনের মেয়ে। বাড়িতে কেউ এলে এমন আদর আপ্যায়ন করে যে কল্লোল বিরক্ত হয়। তার মনে হয়, ভারতী বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা করছে। কল্লোল অবশ্য জানে সে ভারতীর ব্যবহারে অতিথি বাৎসল্যে একফোঁটা ভেজাল নেই।

হাতিবাগানের মোড়ে গাড়ির জটে বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে ভিড় রাস্তায় ধীর গতিতে ট্রাম চলেছে। ট্রামের কামরা প্রায় ফাঁকা। ইচ্ছে করলে কল্লোল ট্রাম থেকে এখানে নেমে যেতে পারে। কিন্তু কল্লোল নামল না। ট্রামের মধ্যে গা সিরসির এক কানামাছি খেলায় সে জড়িয়ে গেছে। আর তিনটে স্টপ্ আত্মগোপন করে যেতে পারলে, সে বেঁচে যাবে। দেখা যাক, কী হয়, এ ঝুঁকি নিয়ে সে বসে আছে। ট্রামের এই ফার্স্ট ক্লাসে এখন দশ, বারোজন যাত্রী। বাঁকা চোখে বেশ কয়েকবার সরোজকে দেখে, সে যে ঘুমিয়ে, কল্লোল বুঝেছে। কল্লোলের সিটের বাঁদিকে দরজার কাচটা মানুষের মাথার তেল, রাস্তার ধুলোয় ঝাপসা হয়ে আছে। কাচের আড়ালে বসা কল্লোলকে পেছনে তাকিয়েও সরোজ চিনতে পারবে না। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে ট্রাম প্রায় খালি হয়ে গেল। কল্লোলের সামনে বসা বৃদ্ধা নেমে যেতে কামরায় রইল সাতজন। আর একটা স্টপ ছুঁয়ে ট্রাম ঢুকবে টার্মিনাসে। নামার জন্যে সরোজ এখন যে কোনো মুহূর্তে উঠে দাঁড়াবে। উত্তেজনায় ধুকপুক করছে কল্লোলের বুক! নাহ্, আর বসে থাকা ঠিক নয়। উদ্বেগে অস্থির কল্লোল এক স্টপ্ আগে নেমে পড়তে চায়। বাড়ি পৌঁছোতে একটু বেশি হাঁটতে হবে। উটকো ঝামেলা এড়াতে এটুকু হাঁটা কিছু নয়। সিট্ ছেড়ে উঠতে গিয়ে কল্লোল দেখল, সরোজকে জাগাবার জন্যে কণ্ডাক্টর ডাকাডাকি করছে। ভয়ে কুঁকড়ে জড়োসড়ো কল্লোল নিজের জায়গায় বসে থাকল।

কয়েকবার ডেকে সরোজের ঘুম ভাঙাতে না পেরে তার কাঁধে একটু চাপ

দিয়ে কণ্ডাক্টর আঁতকে উঠল। কণ্ডাক্টরের মুখ রক্তহীন, সাদা। বলল, কী হলো লোকটার? বেঁচে নেই নাকি?

যে চার-পাঁচজন যাত্রী ট্রামের সামনের দিকে বসেছিল, তাদের দু'জন কণ্ডাক্টরের কথা শুনে সিট্ ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। একজন প্রশ্ন করল, মারা গেছে?

প্রশ্ন শুনে প্রায় সকলে হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল সরোজের দিকে। একজন সরোজের নাড়ি দেখল, তার নাকের কাছে আঙুল নিয়ে শ্বাস পড়ছে কিনা, পরীক্ষা করল একজন। দ্বিতীয় লোকটা বলল, এক্সপায়ার্ড, মারা গেছে।

কণ্ডাক্টর আর যাত্রীদের টুকরো কথা কানে যেতে ড্রাইভার ট্রাম থামিয়ে দিয়েছে। কল্লোল কী করবে, ভেবে পেল না। সেকেণ্ড ক্লাসের কণ্ডাক্টর ঘনঘন ঘণ্টি বাজাচ্ছে। পেছনের দুটো ট্রাম ঢং ঢং আওয়াজ তুলে রাস্তা চাইছে। কল্লোল জানে, সে ছাড়া এ কামরায় সরোজকে কেউ চেনে না। এখন যতো ঝকমারি, থানা, পুলিশ, মর্গ, সব তার ঘাড়ে চাপবে। আর না ভেবে কল্লোল নিঃশব্দে সুরুৎ করে ট্রাম থেকে নেমে গেল।

কল্লোল যখন বাড়িতে ঢুকল, তখন তাকে খুব ক্লান্ত, শুকনো দেখাচ্ছে।

কল্লোলকে এক নজর দেখে ভারতী প্রশ্ন করল, শরীর খারাপ?

না, কল্লোল বলল, মাথা ধরেছে। কথা শেষ না করে কল্লোল বাথরুমে ঢুকল। ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে প্রায় আধঘণ্টা স্নান করে সে যখন কলঘর থেকে বেরোলো, তখনও তার মাথা অসাড়, বুদ্ধি কাজ করছে না। তবু স্বাভাবিক গলায় ছেলে মিঠুন এবং মেয়ে মুনিয়ার সঙ্গে কল্লোল দু'চারটে কথা বলল। তারপর দুটো এ্যাসপিরিন খেয়ে ভারতীকে বলল, এখন একটু ঘুমোলে মাথা ছেড়ে যাবে।

খাবে না, ভারতী প্রশ্ন করল।

মাথা ছাড়লে···।

শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে অন্ধকার বিছানায় আচ্ছন্নের মতো কল্লোল শুয়ে থাকল। ঘুম আসলেই মাথায় ভেসে উঠছে রাস্তার কোলাহল, ট্রামের ঘণ্টা, সরোজের মুখ, ঘুম চটে যাচ্ছে। রাত ন'টা নাগাদ বিছানা ছেড়ে কল্লোল খেতে উঠল। বসার ঘরে কল্লোল এসে দাঁড়াতে হঠাৎ ফ্ল্যাটের বেল্ বাজল। পরপর দু'বার জোরালো ক্রিংক্রিং শব্দ! এ সময়ে তার কাছে কেউ আসে না। তাছাড়া এই নতুন ফ্ল্যাটের ঠিকানা বেশির ভাগ বন্ধু না জানায়

এখনও এখানে ভিড় কম। অচেনা ভয়, দুশ্চিন্তা হিম হাওয়ার মতো কল্লোলের শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। তৃতীয়বার একটু বেশি সময় ধরে কলিংবেল্ বাজল। কল্লোলের আগে ভারতী খুলে দিল ফ্ল্যাটের দরজা॥ সাদা য়ুনিফর্ম পরা দু'জন পুলিশ অফিসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ দেখে বুক কাঁপতে থাকলেও কল্লোল প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার?

এখানে কাল্লাল চৌধুরী থাকেন?

এক পুলিশ অফিসারের প্রশ্ন শুনে কল্লোল বলল, আমি কল্লোল চৌধুরী···।

দু'জন অফিসার মুখ চাওয়াচায়ি করল। দ্বিতীয় অফিসার বলল, আজ সন্ধ্যেতে শ্যামবাজারের ট্রামে এক ভদ্রলোকের ডেড্‌বডি পাওয়া গেছে। তাঁর শার্টের পকেটে আপনার নাম, ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ ছিল। কল্লোল পাথরের মতো নিশ্চল, দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম অফিসার বলল, ভদ্রলোককে সনাক্ত করার জন্যে আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে। আমরা গাড়ি এনেছি। আমাদের গাড়িতেই আবার পৌঁছে দেবো আপনাকে।

পেছনে না তাকিয়েও ভারতীর ভয়ার্ত মুখ কল্লোল দেখতে পাচ্ছে। মুনিয়া ঘুমিয়ে পড়লেও মিঠুন জেগে। কল্লোলের সামনে সে এসে দাঁড়িয়েছে। কল্লোল জানে, যেতে তাকে হবেই। পাজামার ওপর পাঞ্জাবি চাপিয়ে মিঠুনের মাথাটা ছুঁয়ে, দুই অফিসারের সঙ্গে পুলিশের জিপে চেপে কল্লোল থানায় গেল। থানার পেছনে বাঁধানো চাতালের ওপর সরোজের মৃতদেহ। মৃতদেহ দেখে সরোজকে সনাক্ত করল কল্লোল। থানার বড়োবাবুর ঘরে বসে একটা খাতায় সরোজের বাড়ির ঠিকানা না জানলেও তার শ্বশুরবাড়ির আবছা হদিস, অফিসের নাম, কল্লোল লিখে দিল।

অফিস থেকে যে সরোজ সাময়িক বরখাস্ত সে কথা কল্লোল ভাঙল না।

বড়োবাবু বলল, ভদ্রলোক বোধহয় আপনার বাড়িতে যাচ্ছিলেন।

এই সন্দেহটা বাড়ি থেকে মাথায় ঘুরলেও প্রসঙ্গ বদলে কল্লোল প্রশ্ন করল, মৃত্যুর কারণ কী?

হার্ট এ্যাটাক, বড়োবাবু বলল, ডাক্তারের তাই ওপিনিয়ন্। তবু লাশ এখন মর্গে যাবে, তারপর···।

কথা শেষ না করে একটা হাই তুলে ও সি বলল, ধন্যবাদ···।

আধঘণ্টার মধ্যে কল্লোল বাড়ি ফিরলো। বসার ঘরে উদ্বেগে, ভয়ে মুখ কালো করে ভারতী বসে আছে। তার পাশে শোফার ওপর ঘুমোচ্ছে মিঠুন্।

সোফায় বসে সরোজের মৃত্যুর খবর দিয়ে কল্লোল বলল, পুলিশের আগে, সরোজ যে মারা গেছে, আমি জানতুম।

ভারতী অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তার মানে ?

সরোজ আর আমি একই ট্রামে ছিলুম।

নাহ্, দেখা হয়নি, হতে পারতো।

দেখা হয়েছিল তোমাদের ?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কল্লোল বলল, ট্রামে বসেই সরোজ মারা গেছে। কখন মরল, কেউ টের পায়নি। টার্মিনাসে গাড়ি ঢোকার আগে ঘটনাটা জানা গেল। ট্রামের মধ্যে ঝামেলা হৈচৈ শুরু হতে আমি পালিয়ে এলুম।

বিবর্ণ মুখে কল্লোলের কথা শুনছে ভারতী।

আমাদের বাড়িতেই তো সরোজদা আসছিলেন।

ভারতী বিড়বিড় করল।

মনে হয়, কল্লোল বলল।

কেন আসছিলেন ?

ভারতীর প্রশ্নের জবাব কল্লোল দিতে পারল না। জবাব দেওয়ার কিছু নেই। হয়তো টাকা চাইতে অথবা শুধু দেখা করার জন্যে সরোজ আসছিল। সরোজ কেন আসছিল, কল্লোল জানে না, জানার উপায়ও আর নেই। কিন্তু মৃত সরোজের সঙ্গে ট্রামের মধ্যে লুকোচুরি খেলে দারুণ ধোঁকা খেয়েছে কল্লোল। জ্যান্ত কল্লোলকে মরা সরোজ নিঃশব্দে মেরে আধমরা করে দিয়েছে। বুকের মধ্যে দমকা হাহাকার, অনুতাপ, কল্লোল ভাবল, ট্রামের মধ্যে যদি আর একবার সরোজের সঙ্গে দেখা হতো… ।

কচটতপ

সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী

কাল আমন্ত্রণ পেলাম। আমার বন্ধুদের কাছ থেকে। ওরা লিখেছে ঃ 'এবার আমাদের শব্দ-মেলায় তোমাকে পেলে খুব আনন্দিত হব। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এসে গেলে খুব ভাল হয়। থাকার ব্যবস্থা আমরাই করব। অবশ্যই এস।

ওরা থাকে নস্টাপোতায়'। এর আগে একবার ওখানে গিয়েছিলাম। তখন আলাপ হয়েছিল ওদের সাথে। বুদ্ধিমান, সচেতন যুবক। গতবার যখন ওখানে গেলাম তার মাস চারেক আগে ওদের শব্দ-মেলা হয়ে গেছে। ওদের মুখে সব শুনে দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। সেকথা ওদের বলেছিলাম। এই মেলা পাঁচ বছর অন্তর হয়। চলে টানা একশ কুড়ি ঘণ্টা। মানে পরপর পাঁচদিন। প্রতি পাঁচ বছরে একবার।

টেলেক্সে জানিয়ে দিলাম, আসছি।

ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করলাম। রওনা হব এমাসের শের দিন। অর্থাৎ আর ছ'দিন বাদে।

স্টেশনে নিতে এসেছিল আমাকে। বলল, জানতাম তুমি আসবেই।

আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে শহরের মধ্যে। আমি প্রথমবার এসে এদের কথা বুঝতে পারতাম না। অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যেই শিখে নিয়েছিলাম। আমি এখন এদের কথা বুঝতে পারি। বলতে পারি ওদের মতন করে। মেপে, মেপে শব্দ বাদ দিয়ে।

শহর জুড়ে নানা মাপের ফেস্টুন, ছোট বড় হোর্ডিং, রঙীন পোস্টার। বড় বড় বাড়ির ছাদে গ্যাস বেলুন। রাতে নিয়ন লাইট। মেলার বিজ্ঞাপন। যদিও মেলাটা আদতে বড়লোকদের, তবুও সাধারণ মানুষের আগ্রহের কারণ আছে। আগামী পাঁচ বছর তাদের কথা বলার ব্যাপারটা নতুন করে রপ্ত করতে হবে।

মেলার জন্য বিরাট একটা মাঠে প্যাণ্ডেল বাঁধা শুরু হয়ে গিয়েছে। হোটেলে সব জায়গা ভর্তি। এবারের মেলায় বাইরের দেশ থেকেও বহু লোক আসছেন। এই প্রথম। শহরে বিদেশীদের ভিড়। এই দেশের অন্যান্য শহর থেকেও বহু অতিথি এসেছেন। নিজস্ব প্লেনে।

পটকা ফাটিয়ে, পায়রা আর বেলুন উড়িয়ে 'মেলা' শুরু হল সকাল দশটায়। প্যাণ্ডেলের গায়ে নিয়ন আলো জ্বলছে ঃ 'শব্দ মেলা'।

মেলা বসেছে। স্টল হয়েছে। শব্দ কেনা-বেচা হচ্ছে। স্টলের গায়ে স্টলের নাম লেখা রয়েছে। "স্বরবর্ণ", "ক-বর্গ", "চ-বর্গ", "ট-বর্গ", "ত-বর্গ", "প-বর্গ",......এবং আরও অনেক। প্রতিটি স্টলে ঝুলছে ফিক্সড্ প্রাইস-এর বোর্ড।

"ট-বর্গ" স্টলে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে ট ঠ ড ঢ ণ দিয়ে শুরু শব্দ। শব্দ কেনা-বেচা হচ্ছে। যদিও কেনার তুলনায় বেচা খুবই সামান্য। "শব্দ-মেলা"। অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ বন্ধ।

কোথাও শব্দ 'সেল' হচ্ছে। পুরনো বস্তা পচা শব্দ। একটা মজার পোস্টারও চোখে পড়ল ঃ "সরকারী নিয়মে অর্ধেক দামে অথবা কোন ছাড় দিয়ে বেচা বারণ। তাই একটা শব্দ কিনলে আরও একটা শব্দ বিনা পয়সায় পাচ্ছেন। এছাড়াও পাচ্ছেন শব্দ রাখার জন্য ছোট একটা বাক্স, ফ্রি গিফ্ট।"

স্টলে স্টলে ঘুরে শব্দ কিনছেন ব্যবসায়ীরা। মুখোস পরে। শব্দ কিনে নিচ্ছেন। বাদ যাচ্ছে অভিধান থেকে। আগামী পাঁচ বছর এই শব্দগুলো মালিকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। পাঁচ বছর পরে শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তার জন্য উপযুক্ত রয়্যালটি দিতে হবে। বিনা অনুমতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম হলে "শব্দ আইন" অনুযায়ী জরিমানা দিতে হয়। বহু শব্দ বংশানুক্রমিক ব্যবসায়ীদের হাতে আছে।

ছাপান বর্ণানুক্রমিক তালিকা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। তাই দেখে মুখোস পরা ব্যবসায়ীরা শব্দ কিনে নিচ্ছেন। মেলা কর্তৃকপক্ষ কেনা শব্দ বাদ দিয়ে দিচ্ছেন অভিধান থেকে। একটা বড় স্টলে বসেছেন অভিধান নিয়ে জনা দশেক লোক। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, "ত-বর্গ" স্টল থেকে বলছি। এইমাত্র "তামাম" শব্দটা বিক্রি হল। অভিধান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল "তামাম"। ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা টুকে রাখা হচ্ছে লেজারে। টেলেক্সে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে সদর দপ্তরের সঙ্গে। সদর দপ্তর শহরের মধ্যে। দশতলা বাড়ি। বহুলোক কাজ করেন এখানে। সারা বছর কাজকর্ম চলে। ওদের স্টক ভেরিফিকেশন পাঁচ বছর অন্তর। ব্যস্ততার মধ্যে কাটে ওদের দশটা পাঁচটা। কপি রাইট, ডিভিডেণ্ড, রয়্যাল্টি, লেজার, শেয়ার। নানা রকম শব্দের কচকচানি।

মেলা জমে উঠেছে। আরও জমবে শেষ দিন। ঐদিনই তো আসল খেলা। পয়সার খেলা। রইস আদমীদের খেলা। শব্দ নিলামে উঠবে। শেষদিনে। মেলার শেষদিনে। স্টলে ঘুরে ঘুরে শব্দ কিনছেন পাতি ব্যবসায়ীরা। একপুরুষের ব্যবসায়ী। পয়সার জোরও নেই।

লাউড স্পীকারে ঘোষণা হচ্ছে, "……বর্গ স্টল থেকে বলছি, এইমাত্র "…", "…" বিক্রি হয়ে গেল।" অভিধান থেকে বাদ গেল।

সেলের স্টলে সামান্য বচসা। এক ব্যবসায়ী "ক্রটি" শব্দটা টিপেটুপে, নেড়েচেড়ে, উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। কেনার ইচ্ছে আছে। অর্ধেক দামে পাওয়া যাচ্ছে। সস্তায় যা পাওয়া যায়। কয়েক বছর ধরে রাখতে পারলে কিছু রয়্যালটি ঘরে আসতে পারে। তাই একটু যাচাই করে নিচ্ছেন। হঠাৎই আঙুলের খোঁচায় 'ক্র'-র আঁকড়িটা খসে পড়েছে। উনি কিনতে চাইছেন না। 'ত্রটি' উনি কিনবেন না। সামান্য বচসা। ধুমকেতুর মতন এসে পড়লেন সদর দপ্তরের বড়বাবু। ব্যস্ত লোক। তিন পুরুষের বড়বাবু। ব্যবসায়ীরা খুব মানেন। গড়গড় করে কয়েক হাজার শব্দ মুখস্থ বলে যেতে পারেন। কবে, কোন সালে, কে কিনেছেন, কোথায় থাকেন, কার নামে রয়্যালটির টাকা যায়…তালিকা না দেখে বলে যেতে পারেন। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন। ম্যানেজ করে দিলেন সব। 'ত্রটি'-তে আঁকড়ি বসানর জন্য শব্দটাকে প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। আধঘণ্টার মধ্যে 'ত্রটি', 'ক্রটি' হয়ে এসে যাবে। সবাই ঘুরে ঘুরে মেলা দেখছে। পাঁচদিন শব্দ ব্যবহারের কোন বিধিনিষেধ নেই। সবাই সব শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। যত খুশি, যতবার ইচ্ছে।

পাঁচ বছর অন্তর পাঁচদিন। একটানা পাঁচদিন। প্রাণ খুলে কথা বলছে সব্বাই। ছেলে, মেয়ে, জোয়ান, বুড়ো। সব্বাই।

আমি ঘুরতে ঘুরতে "প-বর্গ" স্টলের সামনে এসে পড়েছি। এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শব্দ কিনছেন। ওঁর ঠোঁট কাটা। একটা কাগজে লিখেছিলেন: পদার্পণ, ফয়দা, বশ, ভবিষ্যৎ, মনন। কিনে নিলেন পাঁচটা শব্দ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে। চেক কেটে দিলেন। স্টল থেকে লাউড স্পীকারে ঘোষণা করা হল। বাদ গেল পাঁচটা শব্দ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অভিধান থেকে।

একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করেছেন মেলা কর্তৃপক্ষ। নানা ব্যবসায়ীর উদ্ধৃতি আর মুখোস পরা ছবি প্রদর্শনীর স্টলে ঝুলছে। ব্যবসায়ীদের মুখপত্র 'শব্দ-জব্দ'-র পুরনো কপি প্রদর্শিত হচ্ছে। ঝুলছে চীফ পেট্রনের ছবি।

প্রদর্শনীতে পনেরটা অভিধান আর চোদ্দটা তালিকা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটার ওজনও কার্ডে লিখে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অভিধানের ওজন কমছে। বাড়ছে তালিকার ওজন। অভিধানের ওজন যতটা কমেছে প্রায় ততটাই বেড়েছে তালিকার ওজন। আরও একটা পরিসংখ্যান নজরে এল : কেনা : বেচা=1000 : 2

কাল শেষদিন। একটা বিদায়ের সুর। লোকেদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। কালই আসল খেলা। নিলাম। রইস আদমীদের খেলা। মেলা চত্তরেই নিলামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবারের মতন।

সকাল দশটা। নিলাম শুরু হচ্ছে।

নিলাম প্রাঙ্গণের মধ্যেখানে একটা টেবিল। তার সামনে বসেছেন বড়বাবু। মাথায় উইগ্। গায়ে কালো ক্লোক। টেবিলে হাতুড়ী। নিলামের কাজ পরিচালনা করছেন।

রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার। ইণ্টারভিউ নিচ্ছে, ছবি তুলছে। যাঁরা শব্দ কিনতে এসেছেন তাঁদের। একদিকে বসেছেন অভিধান নিয়ে জনাদশেক লোক। একে একে ব্যবসায়ীরা আসছেন। মুখোস পরে। ব্যবসায়ীদের দারুণ খাতির। ঠাণ্ডা জল, পান, সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করছেন মেলার কর্তৃপক্ষ। টেবিলের একধারে আরামদায়ক চেয়ার সোফা। ব্যবসায়ীদের জন্য। বিদেশী ব্যবসায়ীরা এসেছেন সবার আগে। ঘড়ি ধরে। সকাল দশটায়। ওঁরা জনাপাঁচেক। সঙ্গে ইণ্টারপ্রেটর। বিদেশী ব্যবসায়ীদের মুখও মুখোসে ঢাকা।

ব্যবসায়ীদের বিচিত্র ড্রেস। কেউবা সবুজ জামা, কাল লুঙ্গি। কেউবা হাফ প্যাণ্ট, খালি গা, গলায় টাই। রং বেরং-এর জামা প্যাণ্ট।

দর্শকদের জন্য গ্যালারি। কাঠের তক্তাপাতা। বহু লোক পায়ে হেঁটে এসেছে। বহুদূর থেকে। কেউরা খালি গায়, খালি পায়। হাতে বিড়ি।

আজ বাক্-স্বাধীনতার শেষদিন। আবার পাঁচ বছর পরাধীন। মেলায় লোক গিজ্-গিজ্ করছে। প্রচুর কথা বলছে। এরা সবাই দেখতে আসে। পাঁচ বছর অন্তর। শব্দ 'কেনা-বেচা' হয়।

সভার কাজ শুরু হয়েও শুরু হয়নি। আসল লোক এখনও এসে পৌছননি। অপেক্ষা করা হচ্ছে। এসে পড়বেন যে কোন সময়। প্রতি বছর প্রচুর শব্দ কেনেন। প্রচুর দামে। সম্মানিত ব্যবসাসী। চীফ্ পেট্রন। রাজাবাবু বলেই পরিচিত।

সবাই আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। কী যেন একটা নেমে আসছে। হেলিকপ্টার। উনি আসছেন।

ক্যামেরা তৈরি।

নেমে আসছেন। ছবি তোলা হচ্ছে।

নেমেছেন।

একজন দৌড়ে গিয়ে ঘাম মুছতে গেল। ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। গতবার উনি কিনেছেন, 'অধিকার'।

ছবি উঠছে। আগামীকাল খবরের কাগজে ছাপা হবে।

একজন অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিল। উনি টিপ সই দিলেন।

স্ট্যাম্প প্যাড ওঁর পকেটেই থাকে।

রিপোর্টার জিগেস করল, আপনার শরীর কেমন ?

উত্তর দিলেন না। দশ বছর আগে উনি কিনেছেন, 'ভদ্রতা'।

মুখোসের তলায় মুখ। লাল বাদে সব রকম রং আছে এমন জামা প্যান্ট। লাল ওঁর পছন্দ নয়। সবাই হাত তুলে নমস্কার করছে।

বিরাট বড় ব্যবসায়ী। ওঁর সংগ্রহশালায় সহস্রাধিক শব্দ। গতবার কিনেছেন : অধিকার, চিরায়ত, ত্যাগ, প্রেম, মুনাফা, শৃঙ্খলা, সচ্ছলতা এবং আরও অনেক শব্দ। এছাড়াও আরও বহু শব্দ গতবার বিক্রি হয়েছে। মেলা কর্তৃপক্ষের কাছে তার তালিকা আছে। পয়সা ফেললে কিনতেও পাওয়া যায়।

তার আগের বার, মানে, দশ বছর আগে বিক্রি হয়েছে : উপকার, তপস্যা, নিঃস্বার্থ, প্রিয়, পুঁজি, বন্ধুত্ব, বাস্তব, ভদ্রতা, মনুষ্যত্ব, মুক্ত, রূপ, লাবণ্য এবং আরও অনেক শব্দ। রাজাবাবু কিনেছিলেন, নিঃস্বার্থ, পুঁজি, বাস্তব, ভদ্রতা আর মনুষ্যত্ব। এরও জেরক্স কপি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এতে রাজাবাবুর মুখোস পরা একটা ছবিও আছে।

সবার নজর ওঁর দিকে। উনি রাজা।

সভার কাজ শুরু হল।

প্রত্যেকে নিজের নিজের লিস্ট মুখ বন্ধ খামে বড়বাবুকে দিয়ে দিলেন। সবাই রাজাবাবুর লিস্ট দিয়ে শুরু করতে বললেন। রাজাবাবু বসে বসেই বললেন, এবার আমি সব শেষে, আমি এবার একটা মাত্র শব্দ কিনব।

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। তার মানে এবারের ব্যবসা ডুবল। নিশ্চয় ওঁর যত্নে ত্রুটি হয়েছে।

প্রথম খাম খোলা হ'ল। এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী বেচে দিচ্ছেন বেশ কিছু শব্দ। উনি বললেন, আমি সিন্দুকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি কয়েকটা শব্দের দলিল। উনি বেচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ কিনল না। সামনের বছর সেল্‌-এ যাবেঃ গবাক্ষ, তাম্বুল, নিদাঘ, শকট এই রকম কয়েকটি শব্দ। সামান্য কিছু টাকা দিলেন কর্তৃপক্ষ। জলের দরে ছেড়ে দিলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। আবার অভিধানে ঢুকলঃ গবাক্ষ, তাম্বুল, নিদাঘ, শকট ইত্যাদি।

পরের খাম খোলা হ'ল। এক ছোকরা ব্যবসায়ী কিনতে চাইছেনঃ 'ধর্ম'। কর্তৃপক্ষ দর দিলেন। শুরু হল নিলাম। রাজাবাবু দর তুলে দিতে ওস্তাদ। সেটা প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটু রসিকতা করা। মানে দেখি তোমার পকেটের জোর। টেবিলে হাতুড়ী ঠোকা শুরু হল।

'ধর্ম' এক। 'ধর্ম' দুই॥ 'ধর্ম' তিন॥।

ছোকরা ব্যবসায়ী কিনলেন 'ধর্ম'।

বিক্রি হয়ে গেল 'ধর্ম'। চেক কেটে দিলেন ছোকরা ব্যবসায়ী।

'ধর্ম' বাদ গেল অভিধান থেকে।

এইভাবে একে একে বিক্রি হ'লঃ আত্মপ্রত্যয়, উপলব্ধি, ঐক্য, চরিত্র, চেতনা, নির্যাতন, (বর) পণ, যুক্তি, রুচি, শিক্ষা, সম্মান, সংস্কৃতি, সাম্য। চেক কাটা হ'ল। অভিধান থেকে বাদ গেল। সব শব্দ কেনার সময়ই রাজাবাবু সামান্য ডেকে দর দাঁড়িয়ে দিতে লাগলেন। কিছু বাড়তি পয়সা পেল মেলা কর্তৃপক্ষ।

বিদেশী ব্যবসায়ীরা কিনলেনঃ অটোমেশন, কম্প্যুটার, নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক, প্রযুক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, মুদ্রাস্ফীতি, সংহতি। রাজাবাবু খেললেন রাজার খেলা। যা দাম হাঁকা হয়েছিল তার প্রায় দশগুণ দামে কিনতে হ'ল ঐ শব্দগুলো। ওরা রাজাবাবুর চালাকি বুঝতে পারেন নি। বোকা বনতে হ'ল। হালচাল না জেনে খেলতে এলে এ'রকমই হয়। বহু টাকা এল মেলা কর্তৃপক্ষের। রাজাবাবুর জয়। দেশের কথা ভাবেন। বহু ফরেন্ এক্সচেঞ্জ এনে দিলেন আধঘণ্টার মধ্যে। ধন্য রাজাবাবু। বিদেশীরা চেক কেটে দিলেন।

খোলা হ'ল শেষ খাম। রাজাবাবুর খাম।

সবাই মুষড়ে পড়ল। রাজাবাবু বেচে দিচ্ছেন বারোখানা শব্দ। উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এগুলোর জন্য কোন অর্থ আমাকে দিতে হবে না। আমি দান করলাম কর্তৃপক্ষকে। উনি ছেড়ে দিলেনঃ আদর্শ, করুণা, ঘৃণা,

নিষ্ঠুরতা, নীতি, প্রতিবেশী, বিশ্বাস, মমতা, যন্ত্রণা, লজ্জা, শোষণ আর সহানুভূতি। সাহস করল না কেউ এগুলো কিনতে। রাজাবাবু বেচছেন, তার মানে ছিবড়ে হয়ে গেছে। শুধু শুধু ওগুলো কিনে কি লাভ? আবার অভিধানে ঢুকল। অভিধানের ওজন বাড়ল।

থাম থেকে বেরুল আরেকটা কাগজ। সবাই উদ্‌গ্রীব। রাজাবাবু কিনতে চাইছেন: 'প্রতিবাদ'।

ফটোগ্রাফার ছবি তুলল। কর্তৃপক্ষ দর দিলেন। একজন ব্যবসায়ী উঠে দাঁড়িয়ে দর বাড়ালেন। রাজাবাবু একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক এগিয়ে দিলেন। মাথা নিচু করে বসে পড়লেন ঐ ব্যবসায়ী। হাততালি দিলেন অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। রাজাবাবু সাপের চেয়েও ধূর্ত। হেরে গেলেন ঐ ব্যবসায়ী। এবার উনি কিছু কেনেন নি। ভেবেছিলেন রাজাবাবুর সাথে পাঞ্জা লড়বেন।

শুরু হ'ল টেবিলে হাতুড়ী ঠোকা।

'প্রতিবাদ' এক। 'প্রতিবাদ' দুই॥

দর্শকের গ্যালারি থেকে উঠে দাঁড়াল একজন।

খালি গা, রোগা প্যাটকা।

বলল, আমি প্রতিবাদ করছি।

দু-একজন ওকে টেনে বসানর চেষ্টা করল।

হাতমুঠো করে বলল, আমি প্রতিবাদ করছি। বন্ধুগণ আপনারাও প্রতিবাদ করুন।

একজন দুজন করে গ্যালারির উপর লোক উঠে দাঁড়াতে লাগল। হাতমুঠো করে চিৎকার করতে লাগল; প্রতিবাদ, প্রতিবাদ। রাজাবাবু স্তম্ভিত।

টেবিলে হাতুড়ী ঠোকা হচ্ছে। অর্ডার, অর্ডার।

পিলপিল করে লোক নেমে যাচ্ছে। গ্যালারি থেকে মাঠের মধ্যে। টেবিল উল্টে ফেলে দিল। খুলে নিল বড়বাবুর উইগ্ আর ক্লোক। ব্যবসায়ীরা পালাচ্ছে। লোকে গোল হয়ে ঘিরে ফেলেছে, মুখোস খুলে দিচ্ছে। রাজার হেলিকপ্টারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন লাগিয়েছে তালিকা-গুলোতেও। প্যাণ্ডেলের বাঁশ খুলে পেটাচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

রাজার মুখোস খুলে দিয়েছে। মুখ দেখে সবাই চমকে উঠেছে। ভীষণ পরিচিত মুখ। বাঁশের বাড়ি খেয়ে রাজার মাথা ফেটেছে। রক্তের রং লাল।

জামা প্যাণ্টে লাল রক্ত লেগেছে। রাজার কলার চেপে ধরে বলছে, প্রতিবাদ করছি। ফেরৎ দিন, সব শব্দ ফেরৎ দিন। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে রাজা।

হাজারে হাজারে লোক আসছে।

প্রতিবাদ, প্রতিবাদ।

ভিড়ের মধ্যে আমিও আছি। ওদের সাথে মিশে গিয়েছি।

শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছয়

শরৎ-উপন্যাসের সংখ্যা পঁচিশ। নিষ্কৃতি (১৯১৭) ও নববিধান (১৯২৪) অকিঞ্চিৎকর, শেষের পরিচয় (১৯৩৯) অসম্পূর্ণ। এ তিনটি বাদ দিয়ে বাকি বাইশটি উপন্যাসের কালানুক্রমিক প্রকাশ-তালিকা নিম্নরূপ ঃ

বড়দিদি (১৯১৩), বিরাজবৌ (১৯১৪), পরিণীতা (১৯১৪), পণ্ডিতমশাই (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (১৯২৭), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (১৯৩৩), বিপ্রদাস (১৯৩৫), শুভদা (১৯৩৮)।

স্মর্তব্য, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, বড়দিদি, শুভদা শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন ভাগলপুর-পর্বে। শ্রীকান্ত-পরবর্তী উপন্যাসের শিল্পরীতির বিচার করতে গিয়ে জোর পড়ে চারটি উপন্যাসের উপর—চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন। এগুলি পরবর্তীকালে রচিত। শেষোক্ত চারটিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—চরিত্রহীন (১৯১৭) ও গৃহদাহ (১৯২০), আর পথের দাবী (১৯২৬) ও শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)।

চরিত্রহীন উপন্যাসে কাহিনীর দুটি মূল ধারা—(১) সতীশ সাবিত্রীর কাহিনী, (২) কিরণময়ী উপেন্দ্রর কাহিনী। এই উপন্যাসের কাহিনীতে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে পাঁচটি ত্রিভুজ লক্ষ্য করা যায় ঃ (ক) সতীশ সাবিত্রী উপেন্দ্রকে আশ্রয় করে। (খ) উপেন্দ্র কিরণময়ী সতীশকে আশ্রয় করে। (গ) সতীশ সরোজিনী উপেন্দ্রকে আশ্রয় করে'। (ঘ) উপেন্দ্র দিবাকর কিরণময়ীকে আশ্রয় করে'। (ঙ) উপেন্দ্র সুরবালা কিরণময়ীকে আশ্রয় করে।

এই উপন্যাসে কাহিনীর নিবিড় ঐক্য এসেছে চরিত্রগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ বিকর্ষণে। তাতে লক্ষ্য করা যায়—

(১) সতীশ ও সাবিত্রীর পারস্পরিক পরিচয়ে সতীশ সাবিত্রী কাহিনী ধারার যতটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তা উপেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে বাঁক নিয়েছে, পূর্ণতার পথে এগিয়েছে।

(২) উপেন্দ্র-কিরণময়ী কাহিনী ধারার পূর্ণতা এসেছে সতীশের উপস্থিতির জন্য।

(৩) সতীশ-সরোজিনী কাহিনী ধারায় দুজনের পরিচয়, বিচ্ছেদ ও মিলনের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রর ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য।

(৪) উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী কাহিনীধারায় এ তিন চরিত্রের মধ্যে যোগসূত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে প্রধান উপেন্দ্র আর কিরণময়ী, গৌণ দিবাকর। সে কাহিনীর পুষ্টিসাধনে ব্যবহৃত।

(৫) উপেন্দ্র-সুরবালা-কিরণময়ী কাহিনীধারায় উপেন্দ্রর প্রতি কিরণময়ীর আকর্ষণ সূত্রে যে ঘটনার ধারা প্রবাহিত তাতে সুরবালা অভিকর্ষ-শক্তি রূপে কাজ করেছে।

পূর্বেই লিখেছি, এ উপন্যাসের কাহিনীর দুটি মূল ধারা। সতীশ ও সাবিত্রীর কাহিনী, উপেন্দ্র ও কিরণময়ীর কাহিনী। এ দুটি মূল ধারার বিন্যাসকৌশল অনুধাবনীয়। উপন্যাসের নামকরণ অনুযায়ী লেখক সতীশের বুকে 'চরিত্রহীন' লেবেল (label) এঁটে দিয়েছেন। তাই সতীশ ও সাবিত্রীর কাহিনীকেই মুখ্য কাহিনী বলতে হয়। অবশ্য দুটি কাহিনীকে লেখক উপন্যাসের শেষে উপেন্দ্রর মৃত্যুশয্যায় মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রথম কাহিনীটির প্রবেশক্ষণ হল সাবিত্রীর প্রতি সতীশের ভালবাসার প্রকাশে। এর থেকেই সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই এই কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে পাঠক।

উপেন্দ্র কিরণময়ী কাহিনীতে ঘটনার অভ্যন্তরে পাঠকের প্রবেশাধিকার ঘটে সাতাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে, যেখানে কিরণময়ী উপেন্দ্রকে তার ভালবাসার কথা বলেছে।

সাবিত্রীর কাহিনী তারপর বিকাশপর্ব পার হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যখন অসুস্থ সতীশের কাছে সাবিত্রী ফিরে গেছে (পরিচ্ছেদ ৩৯)। এই মুহূর্তে সাবিত্রী ও সতীশকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবাই যায় না। শয্যালগ্ন জ্বরতপ্ত সতীশের সঙ্গে সেবাপরায়ণা আত্মলাঞ্ছনাকারী সাবিত্রীর মিলন— চুম্বনে আর অশ্রুতে কোলাকুলি (পরিচ্ছেদ ৪০)। আবেগের চড়া সুর বাঁধা

এ দৃশ্য। তারপর সাবিত্রীকে উপেন্দ্রর প্রভাবে সতীশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর পর্যায়ে তাকে নিয়ে গিয়ে এ কাহিনীর সমস্যা-মোচন করা হয়েছে (পরিচ্ছেদ ৪১)।

কিরণময়ী কাহিনীর জটিলতার চরম পর্যায় দিবাকরকে নিয়ে কিরণময়ীর গৃহত্যাগে (পরিচ্ছেদ ৩৩)। এর সূচনা উপেন্দ্রর কাছে কিরণময়ীর প্রেম নিবেদনে (পরিচ্ছেদ ২৭)। দিবাকরের নয়, উপেন্দ্রর সর্বনাশ করছে ভেবেই কিরণময়ী দিবাকরকে নিয়ে পালিয়েছিল, একথা দিবাকরের কাছে কবুল করেছে আরাকানে বসে (পরিচ্ছেদ ৪২)। আরাকান থেকে সতীশ-কর্তৃক উদ্ধার-প্রাপ্ত কিরণময়ী হারিয়েছে মানসিক ভারসাম্য। কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে যে কিরণময়ীকে সে উন্মাদিনী (পরিচ্ছেদ ৪৩)। সমস্যার সমাধান হয়েছে সাবিত্রীর হাতে কিরণময়ীসহ সকলের দায়িত্ব তুলে দিয়ে উপেন্দ্রর পরলোকগমনে (পরিচ্ছেদ ৪৪)।

স্বীকার্য, চরিত্রহীন যথারীতি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী লেখক ও প্রথম পুরুষের কথন-ভঙ্গিতে লেখা। তথাপি এখানে কোনো একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য নেই। সতীশ, সাবিত্রী, উপেন্দ্র, দিবাকর, কিরণময়ী প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ বারবার দেখা দিয়েছে ঘুরে ঘুরে। এরই মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে, কাহিনীতে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, চরিত্রে চরিত্রে সংঘর্ষ শুধু নয়, এক চরিত্রের উপর অন্যচরিত্রের অভিঘাতের ছবিও ফুটে উঠেছে। এখানে যে প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহৃত তাকে বলা যায়, পরিবর্তনশীল দৃষ্টিবিন্দু, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। চরিত্রহীন উপন্যাসের অধ্যায়গুলি বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন প্রেক্ষণবিন্দু প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে পাঠক যখনই প্রবেশ করছেন তখনই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র ভিন্নতর দৃষ্টিকোণের আলোয় বিচিত্রবর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রথম পুরুষে বিবৃত গৃহদাহ উপন্যাসে প্রেক্ষণবিন্দু মুখ্যত নায়িকা অচলার, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লেখক অচলার দৃষ্টিকোণ থেকেই যথাসম্ভব গল্পটিকে ও চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। এর ফলে কাহিনী ও চরিত্রের বিকাশ ও পরিণাম নায়িকার মধ্য দিয়েই একটু একটু করে পাঠকের গোচরে এসেছে। স্বীকার্য, পাঠকের মনে কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও বিস্ময় বোধ অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান রাখতে এই রীতি যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দু-একটি জায়গায় মহিম বা সুরেশের দিক থেকে কাহিনীর কোনো বিশেষ পর্যায়ের আরম্ভ সূচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের তেমন কোনো স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই উপন্যাসের মধ্যে প্রযুক্ত

হয়নি। এর ফলে তাদের অন্তর্লোকে পাঠকের যথাযথ অনুপ্রবেশ ঘটে না। স্বীকার্য, লেখক তাঁর সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও এদের চরিত্রের নিভৃতলোকে তেমন আলো ফেলেন নি, অন্যদিকে, উপন্যাসে অচলার দৃষ্টিবিন্দুর আপেক্ষিক প্রাধান্যের ফলেও এই দুটি পুরুষ-চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ফুটে ওঠার বিশেষ সুযোগ মেলে নি।

এ উপন্যাসে একমাত্র জটিল চরিত্র অচলা। এই চরিত্রের বৈপরীত্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধিতা এখানেই রূপায়িত। সুরেশের প্রতি তার উক্তি,' তিনি (অচলার পিতা কেদারবাবু) আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।' (পরিচ্ছেদ ৯)। চারদিন পরে মহিমের কাছে মনের দিক থেকে অচলা ফিরে গেছে, 'আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি করো।' (পরিচ্ছেদ ১০)। মহিমের অসুখে মনপ্রাণ দিয়ে অচলা সেবা করেছে। আবার তখনি সিঁড়িতে ওঠানামার সময় সুরেশ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় বেদনা পেয়েছে অচলা। (পরিচ্ছেদ ২৫)

গৃহদাহ উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস কৌশলে অনুধাবনযোগ্য। সেইসঙ্গে লক্ষণীয় চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস। ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের তিনটি ও চারটি কোণে তিনটি বা চারটি চরিত্রের অবস্থান থেকে প্রধান চরিত্র-পঞ্চকের (অচলা, মহিম, সুরেশ, মৃণাল, কেদারবাবু, রামবাবু) পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যেতে পারে।

প্রথম চতুর্ভুজে (ক) সমদূরত্বে চারটি বাহুশীর্ষে অবস্থান করছে অচলা, মহিম, সুরেশ, কেদারবাবু। দ্বিতীয় চতুর্ভুজে (খ) অবস্থান করছে অচলা, মহিম, মৃণাল, সুরেশ। প্রথম ত্রিভুজে (গ) অবস্থান করছে অচলা, মহিম, সুরেশ। দ্বিতীয় ত্রিভুজে (ঘ) অবস্থান করছে অচলা, রামবাবু, সুরেশ। এই দুটি চতুর্ভুজ (ক, খ) আর দুটি ত্রিভুজ (গ, ঘ) থেকে উপন্যাসের কাহিনীর বিন্যাস ও কালব্যাপ্তি অনুধাবন করা যায়।

প্রথম চতুর্ভুজ 'ক'-এর ব্যাপ্তি : ১ থেকে ১৩ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় চতুর্ভুজ 'খ'-এর ব্যাপ্তি : ১৪ থেকে ২৪ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত (ও ৪৪ পরিচ্ছেদ)।

প্রথম ত্রিভুজ 'গ'-এর ব্যাপ্তি : ২৫ থেকে ২৭ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় ত্রিভুজ 'ঘ'-এর ব্যাপ্তি : ৩১ থেকে ৩৭ পরিচ্ছেদ এবং ৩৮ থেকে ৪৩ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত।

এই কালব্যাপ্তি সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায়, গৃহদাহ একটি প্রায়

ত্রুটিহীন সুবিন্যস্ত উপন্যাস। অচলা-চরিত্রের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, স্ববিরোধিতার সঙ্গে কাহিনীর বুনন হয়েছে। চরিত্রের অগ্রগতি পশ্চাৎগতির সঙ্গে প্লটের অগ্রগতি পশ্চাৎগতি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

উপন্যাসের যে চারটি পরিচ্ছেদ বিভাজন চারটি ছকে আভাসিত, তা থেকে আমরা উপন্যাসকে বুঝে নিতে পারি। অচলা মহিমের জীবনে সুরেশের ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব ও জটিলতার সৃষ্টি, ও কেদারবাবু কর্তৃক জটিলতা-সঞ্চারে সাহায্যদান উপন্যাসের প্রথমাংশ। দ্বিতীয়াংশে অচলা-মহিমের বিবাহিত জীবনে জটিলতা আরো বেড়েছে, তাতে সাহায্য করেছে সচেতন ভাবে সুরেশ, অচেতন ভাবে মৃণাল, এবং মহিম-মৃণালের সম্পর্ককে ভুল বুঝে অচলা তাকে আরো জটিল করেছে। দ্বিতীয়াংশের শেষে (পরিচ্ছেদ ২৩) মহিমের গ্রামের বাড়ি যখন অগ্নিতে ভস্মীভূত হল তখন অচলা-মহিমের জীবনে সুরু হল নবতর পর্যায়। দুটি ত্রিভুজের কালব্যাপ্তি (২৫ থেকে ২৭ পরিচ্ছেদ, ৩১ থেকে ৩৭ পরিচ্ছেদ ও ৪০ থেকে ৪৩ পরিচ্ছেদ) পূর্ববর্তী দুটি চতুর্ভুজের কালব্যাপ্তি থেকে সংকীর্ণতর, কিন্তু তাদের গতি দ্রুততর। অচলার কলকাতায় ফেরা, মহিমের নিমোনিয়া, সুরেশের বাড়িতে মহিমের রোগমুক্তি, মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার দোটানা আকর্ষণ, রোগমুক্ত মহিমকে নিয়ে অচলার জব্বলপুর যাত্রার উদ্যোগ (পরিচ্ছেদ ২৪-২৭)। রেলযাত্রায় সুরেশের সঙ্গদান, পথে ডিহরী-অন-শোনে অচলা ও সুরেশের যাত্রাভঙ্গ, রামবাবুর বাড়িতে দুজনের স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাস ও দুর্যোগের রাতে সুরেশের সর্বগ্রাসী কামনানলে অচলার আত্মদান (পরিচ্ছেদ ২৮-৩৭)। এই দুটি অংশ উপন্যাসকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে এক নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে। বাকি অংশ (৩৮-৪৩) শেষোক্ত ত্রিভুজেরই পরিণামী অংশ,—সুরেশের মোহমুক্তি, অচলাকে ত্যাগ করার সংকল্প জ্ঞাপন, প্লেগ-রোগীর সেবায় মাটুলিতে সুরেশের মৃত্যু, মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে অচলা ও মহিমের উপস্থিতি। অচলার ভয়ানক একাকিত্ব ও দুঃসহ শূন্যতা (পরিচ্ছেদ ৪৪) উপন্যাসটিকে ট্রাজিক বেদনায় মণ্ডিত করেছে। অচলা সম্পর্কে সুরেশের সমস্ত মোহের অবসান ও অচলার মনে সব সম্পর্ক ছেদনের তীব্র এষণার (পরিচ্ছেদ ৪০) বিপরীতে আমরা পাই অচলার ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব (পরিচ্ছেদ ৩১, ৪৪)।

এই উপন্যাসে প্লটের বাঁধুনি ও সংযম যুক্ত হয়েছে বক্তব্যের ঋজুতা ও তীক্ষ্নতার সঙ্গে। সুনির্বাচিত দৃশ্যে ও পর্বান্তরে একই ধরনের দৃশ্য নতুন তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে দেখা দিয়েছে। সুরেশের হাত ধরে অচলা ঘোড়াগাড়ি

থেকে নেমেছে, এই দৃশ্যটি দুবার দেখানো হয়েছে—কলকাতায় কেদারবাবুর বাড়িতে (পরিচ্ছেদ ৯) আর ডহরি-অন-শোনে রামবাবুর বাড়িতে (পরিচ্ছেদ ৪০)। দুটি দৃশ্যেই দর্শক হিসাবে উপস্থিত মহিম। দু'ক্ষেত্রেই মহিমের কাছে লজ্জিত হয়েছে অচলা ও সুরেশ। প্রথম দৃশ্যে অচলার লজ্জা রাখার কোনো জায়গা নেই, সপ্রতিভ সুরেশের অপ্রতিভতা প্রকট হয়েছে; এই অপরিসীম লজ্জা থেকে অচলা মুক্ত হয়ে দিনচারেক বাদে মহিমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে পরবর্তী পরিচ্ছেদে। আর দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে যাপিত জীবন অচলা ও সুরেশের লজ্জার কোনো সীমা নেই, সুরেশের সপ্রতিভতা কাষ্ঠ হাসিতে পর্যবসিত আর সুসজ্জিতা অচলা সিঁড়ির দুধাপ উঠেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে। এখন আর তার ফিরে যাবার কোনো পথ নেই। ফিরে নতুন করে জীবন শুরু করার সুদূরতম সম্ভাবনামাত্র নেই। এই দুটি দৃশ্যের নির্মাণ ও প্রয়োগকৌশল তারিফ করার মতো।

মনে হয় শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি এখানেই উৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করেছে, তারপর আরম্ভ হয়েছে অবরোহণ।

সাত

শিল্পরীতির দিক দিয়ে শরৎ-উপন্যাসের শেষ পর্ব বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয় পাদের অন্তর্ভুক্ত, তারমধ্যে প্রধান পথের দাবী, শ্রীকান্ত তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব, আর শেষ প্রশ্ন। শ্রীকান্ত শেষ পর্ব দুটির আলোচনা পূর্বেই করেছি, শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম দুই পর্বের শিল্পরীতির সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে যুক্ত।

পথের দাবী রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল প্রচুর। গোড়াতেই স্বীকার্য, রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রেম আর প্রেমের উপন্যাসে রাজনীতি অবাঞ্ছিত উপাদান নয়। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচী। তাকে বলা যায় প্রমুখ্য মত প্রচারক চরিত্র (Protagonist Character'—W H. Harvey, 'Character and Novel')। সন্দেহ নেই যে অতিমানব চরিত্র। ভারতীয় বিপ্লবীদের যাবতীয় শৌর্য বীর্য পৌরুষের প্রতিমারূপী এই চরিত্র কেবল ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি চায় না, সবরকম অধীনতা থেকে মানুষের মুক্তি চায়। এই চরিত্র সম্পর্কে বিরোধী মত প্রচারিত। যেমন, 'চরিত্রটির সামগ্রিক মানবিক রূপ শরৎচন্দ্র ফোটাতে পারেন নি, অথবা হয়তো তিনি তা চাননি।' (কাননবিহারী গোস্বামী, 'পথের দাবী একটি

সমীক্ষা', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বর্ষ ৩, ১৯৮৩)। বিপরীত মত—'সব্যসাচীর ভয়ংকরের সাধনা অয়স্কঠিন হলেও কখনও অমানবিক ও দানবিক পর্যায়ে ওঠেনি। কেননা তাঁর ইস্পাতকঠিন চরিত্রে অশ্রুর দাগ লাগতো।' (জীবেন্দ্র সিংহ রায়, 'পথের দাবী ঃ পুনর্বিচাব', তদেব)।

এই উপন্যাসের রাজনৈতিক অংশের বা মূল কাহিনীর নায়ক সব্যসাচী ঔপন্যাসিক অংশের বা অন্যতম প্রধান উপবৃত্তের নায়ক অপূর্ব। 'কাহিনীর রাজনৈতিক ও ঔপন্যাসিক, অর্থাৎ মূলকাহিনী ও উপকাহিনী, উভয় অংশেরই নায়িকা ভারতী।'—এই মত যেমন ব্যক্ত হয়েছে (দ্রষ্টব্য কাননবিহারী গোস্বামীর উক্ত নিবন্ধ), তেমনি ব্যক্ত হয়েছে আর মত—'এই গ্রন্থের নায়ক ডাক্তার, কিন্তু নায়িকা ভারতী। আর এই দুইটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা নায়ক ও নায়িকার সম্বন্ধ নহে, নায়ক ও প্রতিনায়কের সম্পর্ক।' (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ)। তৃতীয় মতও আছে (জীবেন্দ্র সিংহরায়)—'রাজনৈতিক ভূভাগের নায়ক সব্যসাচী হলেও তার নায়িকা কে জানি না। যদি কাউকে নায়িকা বলতে হয়, তবে সে সুমিত্রা—ভারতী নয়। সত্য কথা, ভারতী শুধু উপন্যাসটির রোমান্টিক অংশের নায়িকা নয়, সে সব্যসাচীর অনেক রাজনৈতিক বক্তব্যের উপলক্ষ্যও বটে। তবু তাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নায়িকার আসন দেওয়া যায় না। সুমিত্রা রাজনৈতিক অংশের নায়িকার পদ অবশ্যই দাবি করতে পারেন।' (দ্রষ্টব্য জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের উক্ত নিবন্ধ)।

এইসব পরস্পরবিরোধী অভিমত প্রমাণ করে পথের দাবী উপন্যাসের শিল্পরূপ স্পষ্ট নয়, তাতে উদ্দেশ্য দ্বিধাবিভক্ত, শিল্পসংযম অনুপস্থিত; গঠন শিথিল; ফলে বিনষ্ট হয়েছে তার শিল্পসংহতি।

এই উপন্যাসে প্রেক্ষণবিন্দু কোনো চরিত্রবিশেষের একচেটিয়া নয়। এক থেকে সতেরো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অপূর্বর প্রেক্ষণবিন্দু, আঠার থেকে চব্বিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রধানত ভারতীর প্রেক্ষণবিন্দু, পঁচিশ থেকে একত্রিশ পরিচ্ছেদে কাহিনীর পরিণতি ও সমাপ্তি অংশে ভারতী ও সব্যসাচীর মিলিত দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পেয়েছে।

পথের দাবীর মূল বৃত্ত ও উপবৃত্ত রচনায় লেখকের দ্বিধা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃত্তগুলির বিন্যাসে। মূল বৃত্ত সব্যসাচীকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের কাহিনী। বিপ্লবের মতাদর্শের পথ ধরেই কাহিনী এগিয়েছে। কিন্তু তা একরৈখিক নয়, বহুরৈখিক। কাহিনীর এক বিন্দু থেকে বের হয়ে বিভিন্ন রেখায় প্রসারিত।

উপবৃত্ত তিনটি—(১) অপূর্ব ভারতীকে নিয়ে, (২) শশী নবতারাকে নিয়ে, (৩) সব্যসাচী সুমিত্রাকে নিয়ে। প্রথমটিই পরিপুষ্ট উপবৃত্ত, স্ফুটতর, দীর্ঘায়ত। বলা যেতে পারে প্রয়োজনের তুলনায় দীর্ঘায়ত। তারই ফলে সমগ্র উপন্যাসের শিল্পসংহতি বিনষ্ট হয়েছে, গঠন শিথিল হয়েছে। বাকি দুটি উপবৃত্ত অর্ধস্ফুট, স্বল্পায়ত। তাই এ উপন্যাসের প্লটকে বলা যায় যৌগিক প্লট।

এখানে কাহিনী মুখ্য হয়ে ওঠে নি। নিটোল গল্প তৈরির দিকে লেখকের ঝোঁক নেই। (স্মর্তব্য, শেষ পর্বের শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতির এটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য)। এতে কতকগুলি ঘটনাকে যেন পরপর বলা হয়েছে। এগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরস্পর সংশ্লিষ্ট নয়। আদ্যন্ত কোনো কাহিনী এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বীকার্য, গল্পকথন লেখকের মূল উদ্দেশ্য নয়, বিপ্লবের উদ্দেশ্য রূপ তাৎপর্য বিশ্লেষণই তাঁর লক্ষ্য।

এ উপন্যাসে বহুবিধ ঘটনা বিপ্লবের এক ইতিহাস গড়ে তুলেছে। ঘটনাগুলি সবক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে ঘটে নি। এসব ঘটনা বিপ্লবের মত ও পথকে আলোকিত করেছে। বিপ্লবের এক-একটি ক্ষেত্র ধরে লেখক কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন, সেকারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটনার গণ্ডিবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

এই উপন্যাসে ছাড়া ছাড়া ভাবে এসেছে ইতিহাস ও রাজনীতি-প্রসঙ্গ। যেমন, ইতিহাসপ্রসঙ্গঃ ইংরেজের পররাজ্য গ্রাস, স্পেন চীন ফ্রান্স জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দেশে শোষণ (পরিচ্ছেদ ২৪, ২৬)। রাজনীতি প্রসঙ্গঃ বিপ্লব, শান্তি, মানব কল্যাণ (পরিচ্ছেদ ২৫); আইন সংস্কার, সহাবস্থাননীতি (পরিচ্ছেদ ২৬). বিপ্লবের বাধাহীন বিরামহীন গতি সম্পর্কে ভাবনা (পরিচ্ছেদ ২৮); ব্রিটিশের নীতিজ্ঞান, শ্রমিকশ্রেণী থেকেই বিপ্লবের সূচনা-সম্পর্কিত মতবাদ (পরিচ্ছেদ ৩০), স্বদেশী আন্দোলন ও স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আলোচনা, ভারতীয় নেতাদের ভূমিকাবিচার (পরিচ্ছেদ ৩১)।

সত্যবাদী-ব্যাখ্যাত সর্বাত্মক বিপ্লব—রাজনৈতিক মুক্তি ও জীবনের সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি,—এই উপন্যাসের মূল বিষয়, ভাববীজ।

এই উপন্যাসে পরিচ্ছেদ সংখ্যা একত্রিশ। এক থেকে পাঁচ পরিচ্ছেদে উপবৃত্তের বিস্তার—অপূর্ব-ভারতীর পরিচয়, সংঘাত, অনুরাগের কাহিনী। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাহিনীর নায়ক সব্যসাচীর আগমন। গাঁজাখোর গিরীশ মহাপাত্র-রূপী সব্যসাচীর আবির্ভাবে কাহিনী হয়ে উঠল সব্যসাচী-কেন্দ্রিক। সাত থেকে দশ পরিচ্ছেদে অপূর্ব-ভারতীর অনুরাগ-বিরাগের পালা। এগার পরিচ্ছেদ থেকে অপূর্ব-ভারতী উপবৃত্ত মূল বৃত্ত নির্ভর হয়ে পড়েছে। এগার থেকে

আঠারো পরিচ্ছেদে সব্যসাচীর অতীত ও বর্তমান ক্রিয়াকলাপ ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত। উনিশ পরিচ্ছেদে দেখা দিয়েছে কাহিনীর সংকট—এটাই উপন্যাসের মোড় ফেরার বিন্দু (turning point)। বিশ্বাসঘাতক অপূর্ব বিচার, প্রাণদণ্ড বিধান, সব্যসাচীর কথায় তার জীবনরক্ষা। চব্বিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এই ঘটনারই জের। পথের দাবীর প্রেসিডেন্ট সুমিত্রার বিচারে অপূর্বর প্রাণদণ্ড বিধান, আর সেই দণ্ডাজ্ঞা পালনের ভার নিয়েছে ব্রজেন্দ্র। সব্যসাচী তাতে বাধা দিয়েছে। তারফলে পথের দাবী সংগঠনে এসেছে সংকট, কাহিনী উপনীত হয়েছে সংকটের শীর্ষবিন্দুতে (climax) পঁচিশ পরিচ্ছেদে, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহসৃষ্টির শাস্তিস্বরূপ সব্যসাচী ব্রজেন্দ্রর প্রাণ নিতে উদ্যত, ব্রজেন্দ্রও আঘাত হানতে প্রস্তুত, প্রেসিডেন্ট সুমিত্রার বাধায় ব্রজেন্দ্রর প্রাণ রক্ষা পেল, কিন্তু পথের দাবী সংগঠনের ভাঙন রোধ করা গেল না। ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনী ভাঙনের টানে ছুটে চলেছে। তিরিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এই নিম্নগতি টান দেখা যায়। এ সময়ে সব্যসাচী-ভারতীর আলোচনার পর আলোচনা। যা থেকে আমরা জানতে পারি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জুড়ে সব্যসাচী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের গোপন ব্যাপক আয়োজন আর স্মৃতিপর্যালোচনাসূত্রে জীবনকথার উদ্ঘাটন। এই অংশের কাহিনীর গতি মন্থর, গঠন শিথিল, ঘটনাসংযোজন ছাড়াছাড়া। এই অংশে সংযোজিত হয়েছে নানা খণ্ড দৃশ্য ও বিচ্ছিন্ন বিষয় : শশী-নবতারার কাহিনী, অপূর্ব বর্মায় প্রত্যাবর্তন ও গরিবের সেবায় আত্মনিয়োগের সংকল্প ঘোষণা, আত্মীয়ের বিপুল সম্পত্তি পেয়ে সুমিত্রার সুররায়ায় ফিরে যাবার উদ্যোগ, নীলকান্ত যোগী মহাতাপ সূর্য সিংহের কর্মপ্রয়াস। একত্রিশ বা শেষ পরিচ্ছেদে ব্রজেন্দ্রর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার ফলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সব্যসাচীর গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্রগুলি ধ্বংসের পটভূমিকায় সব্যসাচীর নব উদ্যমে অভিযানের সূচনা। পথের দাবীর কর্মকাণ্ডকে আবার নতুন করে শুরু করার কঠিন সংকল্প নিয়ে বিশ্বস্ত অনুচর হীরা সিংকে নিয়ে দুর্যোগের রাতে সব্যসাচীর দুর্গম অজানার পথে অভিযান এক নাটকীয় চড়াস্বর অঙ্কিত। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

সন্দেহ নেই, পথের দাবী উপন্যাস বক্তব্যপ্রধান। কোথাও কোথাও হয়ে উঠেছে তর্কপ্রধান। যেমন, একুশ থেকে আঠাশ পরিচ্ছেদ। এখানে 'পথের দাবী'র সেক্রেটারি ভারতীর সঙ্গে সব্যসাচীর তুমুল তর্ক হয়েছে বিপ্লবের মত ও পথ নিয়ে। পুনশ্চ, উনত্রিশ থেকে একত্রিশ পরিচ্ছেদে ভারতীর সঙ্গে সব্যষাচীর তীব্র বিতর্ক হয়েছে, এখানে তর্কের বিষয়—ভারতের স্বাধীনতা-পন্থা,

মানবকল্যাণাদর্শ, সংস্কারের স্বরূপ। নিটোল বৃত্তযুক্ত চরিত্রনির্ভর উপন্যাস ছেড়ে শরৎচন্দ্র শিথিলবৃত্ত তর্কপ্রধান উপন্যাসের দিকে ঝুঁকছিলেন, তার পরিচায়ক পথের দাবী উপন্যাস। এইসব তর্কের ক্ষেত্রে লেখকের শিল্পপ্রবণতা লক্ষণীয়। পথের দাবী উপন্যাসের কাহিনী-গ্রন্থনায় শরৎচন্দ্র নাট্যরীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা অনায়াসলক্ষণীয়, কিন্তু তর্কক্ষেত্রে (উপরি-উল্লিখিত পরিচ্ছেদ-গুলিতে) তিনি চিত্ররীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সরে যাওয়াটা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা, মানুষের সর্ববন্ধনমুক্তি—এইসব বিষয়ে লেখক তাঁর আপন বক্তব্য সব্যসাচী-মারফৎ উপস্থিত করেছিলেন।

পথের দাবী উপন্যাসের শিল্পসংহতি বিনষ্টির জন্য মূলত দায়ী এই তর্ক-প্রাধান্য নয়, একটি উপবৃত্তের অন্যায় প্রাধান্য ও মেদবাহুল্য। অপূর্ব-ভারতী উপবৃত্ত এই উপন্যাসে জায়গা জুড়েছে। মনে হয় এটি নিয়ে লেখক কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। পথের দাবী উপন্যাসের সাংগঠনিক বৃত্তে অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকাহিনী সংযোজনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আছে। এই দুটি বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের পূর্বোক্ত নিবন্ধে।

"নায়ক সব্যসাচী ও নায়িকা সুমিত্রাকে কেন্দ্রবিন্দু করে যদি কোন উপযুক্ত আকারের বৃত্ত আঁকা হয়, তবে সেই বৃত্তের—সেই সব্যসাচী-বৃত্তের অন্তর্গত যা-কিছু ঘটনাবর্ত তাদের রাজনৈতিক উপন্যাসটির গঠনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বলা যাবে। বহির্ভূক্ত যা-কিছু সব হবে অপ্রাসঙ্গিক। পথের দাবীর রাজনৈতিক পরিচয়ে অপূর্ব-ভারতীর প্রেমের গল্প উপবৃত্তের বেশি মর্যাদা পেতে পারে না। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে শরৎচন্দ্র যেভাবে অপূর্ব-ভারতীকে নিয়ে উপন্যাসে শুরু করেছেন এবং তাদের রোমান্টিক প্রণয়বিস্তারে যে পরিমাণ পরিসর জুগিয়েছেন তাতে তাদের গল্প আয়তনে ও আকর্ষণীয়তায় উপবৃত্ত বা উপকাহিনীর সীমানা খুবই ছাড়িয়ে গেছে।'

আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, সব্যসাচী গিরীশ মহাপাত্র-রূপে রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করেছেন পরিচ্ছেদে। পথের দাবীর বন্ধুর পথে অপূর্ব প্রথম পা দিয়েছে একাদশ পরিচ্ছেদে—ভারতীর বাসায় সে এসে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক উপন্যাসটির যথার্থ আরম্ভ একাদশ পরিচ্ছেদে। যদি তা স্বীকার্য না হয় তবে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। তার পূর্ববর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদ জুড়ে আছে অপূর্ব-ভারতীয় প্রেমের সূত্রপাত প্রসঙ্গ। সুতরাং উপন্যাসটির রাজনৈতিক বৃত্তের দিক থেকে প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদকে অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত

ও প্রয়োজনবহির্ভূত বলতে হবে। রাজনৈতিক উপন্যাসটির গঠন আরও শিল্পসঙ্গত হতো যদি শরৎচন্দ্র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটিকে প্রথম পরিচ্ছেদ হিসেবে ধরে নিয়ে এগার থেকে একত্রিশ পর্যন্ত পরিচ্ছেদগুলিকে দ্বিতীয়, পরিচ্ছেদ তৃতীয় পরিচ্ছেদ এই ক্রমে নির্দেশ করতেন। প্রস্তাবিত বর্জনের ফলে রাজনৈতিক কাহিনীভাগের যেমন ক্ষতি হতো না, তেমনি ক্ষতি হতো না রোমান্টিক কাহিনী-ভাগেরও। তবে সেক্ষেত্রে বিরোধের মধ্য দিয়ে তাদের প্রেমের সূত্রপাতের কিছুকথা বর্জিত পরিচ্ছেদগুলি থেকে সংকলন করে একাদশ পরিচ্ছেদে জুড়ে দিলে ভালো হতো। এই 'জুড়ে-দেওয়ার' প্রসঙ্গটি এই জন্য উত্থাপন করি যে, উপন্যাসের উপকাহিনী যাতে বক্তব্যে বিশ্বাসযোগ্য ও গঠনে নিটোল হয়ে ওঠে সেদিকে লেখককে দৃষ্টি রাখতে হয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি, রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'র গঠনের মধ্যে অপূর্ব-ভারতীয় উপকাহিনীর বর্ধিত দেহায়তন ও মেদবাহুল্য পীড়াদায়ক।…

সঙ্গে সঙ্গে এও বিচার করে দেখা দরকার যে, মুখ্য সব্যসাচীবৃত্তের সঙ্গে এই অপূর্ব-ভারতী উপবৃত্তের সম্বন্ধ কী ধরনের এবং তা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ।… সব্যসাচী চরিত্রের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে শরৎচন্দ্র বিপ্লব ও বিপ্লবী সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত উপস্থাপিত করেছেন। একজন বিপ্লবী শুধু কর্তব্যকঠোর, নির্মমচিত্ত ও হিংসাশ্রয়ী হবেন, হবেন হৃদয়বর্জিত ও আবেগহীন, এমন কোনো আবশ্যিক শর্ত নেই। তাঁর জীবন ও চরিত্রের মানবিক মাত্রা থাকতে পারে।…

'পথের দাবী'র মহানায়কের বিপ্লবচর্চার নিদর্শন, যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ ও বর্মায় তাঁর রহস্যজনক গতিবিধির বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর জীবনচর্যার মানবিক মাত্রার সন্ধান পাওয়া যায় অপূর্ব-ভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধসূত্রে। 'পথের দাবী'র রাজনৈতিক আকাশে উড্ডীয়মান থেকে প্রেমের এই নক্ষত্রমণ্ডল সব্যসাচীর ওপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করেছে এবং তাঁর ধাতব ব্যক্তিত্বের হিউমান ডাইমেনশানটি তুলে ধরেছে। অপূর্বের সঙ্গে অন্তরের প্রতিটি স্তরে ভারতীর যে মানসিক সংকট ও বেদনা তা সব সময়েই আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে সব্যসাচীর সস্নেহ সহানুভূতির সঙ্গে। যে দলনেতা ঘরে-বাইরে শত্রু তৈরি করার ও দল ভেঙে ফেলার ঝুঁকি নিয়ে অপূর্ব ও সেইসঙ্গে ভারতীকে বাঁচিয়ে দেন তাঁর মানসিকতা তর্কের বিষয় নয়। সব্যসাচী ভারতীকে বলেছেন—'আমি বাঁচাতে গেলাম ভগবানের এই অমূল্য সৃষ্টিটিকে। যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নরনারীকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে তার দাম নেই?' এই কণ্ঠস্বর, আর যাই হোক, 'ভারী নিষ্ঠুর' ও

নির্মম নয়।…সুতরাং 'পথের দাবী'র সাংগঠনিক বৃত্তে—তার সব্যসাচীবৃত্তে অপূর্ব ও ভারতীর প্রেমকাহিনী একটা মানবিক মাত্রা যোগ করায় তা গঠন-রীতির দিক থেকে আপত্তিকর হয়ে ওঠেনি।

শুধু আপত্তিকর হয়ে উঠেছে তার পল্লবিত বিস্তার। মনে রাখতে হবে, অপূর্বর বিচারদৃশ্যের পরই বর্মায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব্যসাচীর অবিলম্বে রেঙ্গুন ত্যাগ অনিবার্য ছিল। কিন্তু তিনি যে বিপদের অনেক ঝুঁকি নিয়ে রেঙ্গুনেই কিছুদিন রয়ে গেলেন তার কারণ অপূর্ব ভারতীর কাছে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি স্থানত্যাগ করতে চান নি। এটা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারণা ও পরিকল্পনার দিক থেকে সম্মত সিদ্ধান্ত নয়।"

'পথের দাবী'র পর শরৎচন্দ্রের শেষ উল্লেখ্য উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন'। বিতর্কপ্রধান উপন্যাসরূপেই এর পরিচিতি। এখানে কাহিনী অপ্রধান, প্লটের বাঁধুনি শিথিল, শিল্পসংযম অনুপস্থিত। নিটোল গল্প তৈরির দিকে লেখকের কোনো ঝোঁক নেই। সংহত বৃত্তযুক্ত চরিত্রকেন্দ্রিক উপন্যাস ছেড়ে শরৎচন্দ্র শেষজীবনে শিথিলবৃত্ত তর্কপ্রধান উপন্যাসের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তার চরম উদাহরণ শেষ প্রশ্ন উপন্যাস।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কমল। এই তীক্ষ্ণধী তার্কিক রূপবতী যুবতীকে কেন্দ্র করে কাহিনী ও সব চরিত্র আবর্তিত। কমলকে যদি একটি বৃত্তের মধ্যবিন্দু কল্পনা করা যায়, তবে দেখা যাবে তাকে সমদূরত্বে রেখে আবর্তিত হচ্ছে শিবনাথ, আশুবাবু, অজিত, সতীশ, রাজেন্দ্র, হরেন্দ্র, অবিনাশ, অক্ষয়, মনোরমা, নীলিমা, বেলা।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের অভিমত স্মরণযোগ্য,—"অতি-আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত, এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত" (৩০ বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লেখা পত্র); "এতে গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হু-হু করে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভালো লাগবার কথা নয়। তবু লিখেছিলাম এই ভেবে যে কেউ কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে। সকল প্রকার রস সকলের জন্যে নয়। অধিকারী-ভেদ আমি মানি।…কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতি নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রসসাহিত্যের একটা বড় কাজ।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত পত্র)।

এই স্বীকৃতি থেকে জানা যায়, 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে গল্পের ভাগ কম, প্লটের সংহতি ও নিটোল পরিণতি উপেক্ষিত, গঠন শিথিল। এই তর্কপ্রধান উপন্যাসে কাহিনী-গ্রন্থনায় নাট্যরীতি (Dramatic method) প্রাধান্য লাভ করেনি, চিত্ররীতি (pictorial method) প্রাধান্য পেয়েছে। Perey Lubbock ইঙ্গিত করেছেন প্রথমোক্ত রীতিতে পাঠক প্রধানত গল্পেরই মুখ চেয়ে থাকে, লক্ষ্য করে তার ক্রমপরিণতি, আর দ্বিতীয়োক্ত রীতিতে পাঠক শোনে লেখকেরই বক্তব্য—সেখানে পাঠক লেখকেরই মুখাপেক্ষী সে চরিত্র-মারফৎ শোনে লেখকেরই কথা ('The craft of fiction')।

সেদিক থেকে শেষ প্রশ্ন চিত্ররীতি-আশ্রয়ী। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির উপর সংস্কার বিশ্বাস ও চিরাচরিত প্রথার প্রভাব—এসব নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে। এই বিতর্ক শুরু হয়েছে উপন্যাসের গোড়া থেকেই। স্বীকার্য, বিতর্কের বিস্তারে উপন্যাসের অধিকাংশ পরিচ্ছেদে কাহিনী গৌণ হয়ে পড়েছে। ফলে এই উপন্যাসে বৃত্তগঠনে এসেছে শিথিলতা। স্বীকার্য, তা লেখকের স্বেচ্ছাকৃত। এও স্বীকার্য, সমাজ ব্যক্তি ধর্মসংস্কার নিয়ে বিতর্কে লেখক অনেক সময় কমল-চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে Perey Lubbock-কথিত Pictorial-রীতির আশ্রয় নিয়েছেন।

'শেষ প্রশ্ন' গোড়া থেকেই বিচার-বিতর্কমূলক উপন্যাস। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Discussion-পদ্ধতি। কমল 'Novel of Discussion'-এর নায়িকা। ঘটনার দাপট ও দ্রুতগতির বদলে প্রাধান্য পায় বিতর্ক—পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ।

কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' শেষ পর্যন্ত বিতর্কপ্রধান উপন্যাস থাকেনি। অন্যান্য শরৎ-উপন্যাসের মতই নারীচরিত্র-কেন্দ্রিক উপন্যাসে পর্যবসিত হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এখানে অনেক দীর্ঘ, কোনো কোনো সময় ক্লান্তিকর আলোচনা আছে। নারীমুক্তির স্বরূপ ও সমাজে নরনারীর সঠিক ভূমিকা নিয়ে তর্ক লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে স্বীকার্য, এ উপন্যাস প্রথম পুরুষে বিবৃত সর্বগ সর্বদর্শী লেখকের কাহিনী।

লেখকের দাবী, শেষ প্রশ্ন ঘটনাবহুল উপন্যাস নয়, বিচারবহুল। তা সত্ত্বেও ঘটনা কম ঘটেনি। আশুবাবুর মেয়ে মনোরমার প্রতি বাগদত্ত অজিত শেষ পর্যন্ত সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে (পরিচ্ছেদ ১৫)। শিবনাথের সঙ্গে কমলের তথাকথিত শৈব বিবাহের বন্ধন আপনিই শিথিল হয়ে গিয়েছে (পরিচ্ছে

১৭-১৮), মনোরমা শিবনাথকেই জীবনসঙ্গী বলে বেছে নিয়েছে (পরিচ্ছেদ ২৪) আর কমল গ্রহণ করেছে অজিতকে (পরিচ্ছেদ ২১)। এখানেই শেষ নয়। নীলিমা ভালবেসেছে প্রৌঢ় আশুবাবুকে (পরিচ্ছেদ ২৪), বেলা ফিরে গেছে তার স্বামীর কাছে (পরিচ্ছেদ ২৬)। যে অক্ষয় কিছুতেই কমলের মতামত মানে নি, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, সে-ও উপন্যাসের শেষে কমলকে জানিয়েছে শ্রদ্ধা (পরিচ্ছেদ ২৮)। মাত্র একজনের কাছে কমল পরাস্ত হয়েছে, তার নাম রাজেন; তার কাঠিন্য, ঋজুতা, আত্মত্যাগের মহিমার কাছে কমল হার মেনেছে (পরিচ্ছেদ ২৮)। পত্নীস্মৃতিনিষ্ঠ আশুবাবু জীবনে প্রেমের নব অভ্যুদয়কে মেনেছেন (পরিচ্ছেদ ২৬)।

শরৎচন্দ্র আধুনিক দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তির স্বরূপ খুঁজেছেন। নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছেন নারীমুক্তি-আন্দোলনকে।

এই উপন্যাসে চারটি নারীচরিত্রের উপস্থাপনা ও চার রকম ভিন্ন ভিন্ন পরিণতির মধ্য দিয়ে লেখকের এই ভাবনা Parallelism-এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সে চারজন হল—কমল, মনোরমা, নীলিমা, বেলা। প্রথম জনের একাধিপত্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, সংশয় আছে তার পরিণতি নিয়ে। সেকথা পরে লিখি। মনোরমার শিবনাথকে গ্রহণের মধ্যে আছে আকস্মিকতা-দোষ। বেলা-চরিত্র আমাদের কাছে বিশেষ পরিস্ফুট নয়, তাতে আছে আংশিকতা-দোষ। বরং নীলিমা-চরিত্র পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার সেবাপরায়ণতা, নম্রতা ও ভদ্রতা গোড়ায় পরিস্ফুট। কিন্তু এই নম্রতা ও ভদ্রতার আড়ালে যে একটি যুক্তিআশ্রয়ী দৃঢ় চিত্ত আছে, তা জেনে বেলার সঙ্গে পাঠকও চমকিত হয়। আশুবাবুকে ভালবেসে নীলিমা নিঃশেষে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার আশুবাবুর ভীরুতায় উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে তার নিঃশব্দ প্রস্থানে সে রেখে গেছে তার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

আর কমল? সে যেমন মুখর ও তার্কিক, তেমনি আকস্মিকতা ও অতর্কিততা-দোষপুষ্ট। তার চরিত্র পদে পদে স্ববিরোধিতায় খণ্ডিত। কমল ইহবাদী, বর্তমানে উপাসক, ক্ষণবাদী, সহজ সত্যের উপাসক বলে দাবি করে। অথচ তার আহারে বসনে যে সংযম ও কৃচ্ছ্রতা তা গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বিধবাকে হার মানায়। শিবনাথকে সে ছেড়েছে মুক্তিবিচারে, আর অজিতকে গ্রহণ করেছে ভাবাবেগে দুর্বলতায়। অজিত যখন সকলের সামনে কমলকে মিনতি করেছে, শাস্ত্রমতে বিবাহবন্ধনে ধরা দিতে চেয়েছে, কমল হেসে সবকিছু

প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে—'জোরে কাজ নেই, বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো।' (পরিচ্ছেদ ২৮)।

রহস্যময়ী কমল অজিতের কাছে দুর্বোধ্য—'যেদিন তাদের সুমুখে প্রথম দেখি সেদিনও যেমন তোমার কথা বুঝিনি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে গেলে। এইমাত্র নিজে বললে আমার ভার নিন—আবার তখনি বললে, না।' (পরিচ্ছেদ ২১)। সে-রাতেই আগ্রায় কমলের নির্জন বাসায় অজিতের কাছে কমলের ভালবাসার স্বীকৃতির পিছনে আছে আতর্কিততা। কমল, যে শরৎ-উপন্যাসের আর-পাঁচটা নায়িকা থেকে ভিন্নতর নয়, সে যে আবেগনির্ভর প্রেমনায়িকা, সে সত্য এ উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত।

আটাশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বৃত্তাকার গঠন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু রৈখিক গঠনে উপনীত হতে পারেননি। বিচারবিতর্ক এ উপন্যাসের শিল্পরীতিকে অভিনবত্ব দিতে পারেনি, নায়িকা-কেন্দ্রিক এ উপন্যাস কমলের প্রেমাশ্রয়ের প্রশ্নটিকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তের রীতিতেই অনেকটা ফিরে এসেছে। সর্বশেষে স্বীকার্য, শরৎ-উপন্যাসের শিল্পরীতিতে আছে বৈচিত্র্য, যা জীবনঘনিষ্ঠ।

এক বীর্যহীন কবিকে

কবিতা সিংহ

আপনার কলম সরুক
আবার কবিতা হোক
কবিতার দয়া আশীর্বাদ,
বন্ধু ও কনিষ্ঠদের রক্ত মেখে নিলে
আঙুলে যে আঠা লাগে
পাপ লাগে অভিশাপ লাগে
যে হাত পাপীর হাত সেহাতে কি কলম মানায়?

আপনার চক্ষু থামুক
কুৎসা ও কুষ্ঠ ঘামে গলে যাচ্ছে যৌবন গিমিক
খসে যাচ্ছে বাচন লাবণি—
সরস্বতীর সিংহাসন
উড়ে যাচ্ছে ভিতরের বাঁজা ঢোঁড়া রাগে

আপনার ভিতরে ফিরুক কবিতা হে
জ্যেষ্ঠা ভগিনী হয়ে মাতা হয়ে ভ্রাতৃবধূ হয়ে

কবিতা ফিরুক।

২.

মাঝে মাঝে কিছু কিছু হত্যা মনে পড়ে
যে হত্যায় আহত কেউ কোর্টে বা থানায়
দাঁড়ায়নি ধর্মাবতার

মাঝে মাঝে মনে পড়ে কিছু কিছু বলি
মাংস নিয়ে কিছু কিছু খেলা
মনে পড়ে মঞ্জুলিকা দাশ
মনে পড়ে যোগব্রত শঙ্কর সুব্রত
বড় বড় চোখ হাসি তুষার রায়কে মনে পড়ে

মাঝে মাঝে কানে আসে খাজনারও চেয়ে উচ্চ
গিমিকের মাতাল বাজনা
মাঝে মাঝে মনে পড়ে সময়ের বন্ধ ঘড়ির মত তুলাদণ্ডটাকে
বিষম অকেজো যন্ত্র পাপপুণ্য সূর্য পৃথিবীর নিত্যনিয়ম
যে বীজই বুনতে যাই সেই বীজে ঘুণ ধরে গেছে
আদালতে বৃথাই রয়েছ খাড়া তুলাদণ্ড হাতে
চোখ বাঁধা নারী
পৃথিবীর চাকা থেকে কেন্দ্রনাভি কীলক খুলেছে।

নষ্ট প্রবেশ লুপ্ত প্রস্থান

রবীন সুর

ভি ডি ও বাস মুভিক্যামেরা জ্যাকেটপরা বাবু
আঁকড়ে নিয়ে ডলার-ফাঁপা জিনস নিতম্বিনী
চোখ কি তোর অন্ধ ? হায় ! মুভি ক্যামেরা লেন্সে
দৃষ্টি তোর ভারতভূমি ব্যাসকে ঠিক পাবে ?
মদ গিলছো সারাটা দিন, ইমপালাকে রেখে
টিকিট কেটে জাদুঘরেই হিসি সারতে গেলে,
হায় প্রত্ন। হায় শিল্প ! জিলে লে জিলে লে
বোয়িং জেট আকাশ চষে গোটা পৃথিবী মুঠো,
আসলে ভাই কেন্দ্র নেই, পরিধি তাই যতো
বিশাল হোক, ধ্যান না জেনে ভ্রমণ বৃথা হল।

আদিম নগ্নতা তুমি তরাইএর পার্বতী কন্যার
শব্দে-গাঁথা ছবি হয়ে কথা বলো তীক্ষ্ণ কবিতায়—

শরীরে বঁদার কাজ, বৃষ্টিধোয়া নাভির নির্ঝর,
মুক্ত স্তন দুধ-গন্ধ পুরাতন কাষ্ঠমণ্ডপের
নতুন দেহের মধ্যে খুঁজে পাই কিন্নরীর মায়া।

সিঁড়ি ক্ষেত; ফালি ফালি পাথরের জমি—
সহস্র সর্ষের প্রফুল্লতা, থাক থাক জুম চাষ,
ঘুরে ঘুরে পথ গেছে একা
কোথায় স্বর্গের খোঁজে মন্দির ঘণ্টার
পূত শব্দ কোনোদিন যেখানে যাবার
সুযোগ পাবে না, সেই ধূসর রঙের বুরুজ মিনার
ছোটো মেজো বড় বড় চূড়ায় চূড়ায় ছয়লাপ
মাথাকে ছাড়িয়ে উঁচু পাহাড়ের দিক চক্রবাল
এফোঁড়-ওফোঁড়-করা সংবৎসর বরফকাঞ্চন,
তুমি কালী তুমি শিব তুমি সব জ্যান্ত দেবতার
সকল সারাৎসার হিমালয়, ভারতবর্ষের বিমূর্ত প্রতীক।

গোমতীর কোলে শুয়ে প্রণামের যোগ্য ভুজেশ্বরী,
ওপাশে বাড়ালে দৃষ্টি পশুপতিনাথ।
কতো আর সিঁড়ি ভেঙে ঊর্ধ্বে ওঠা যায়?
নদী আছে নদীর ভিতরে, ইউফ্রেটিসের সংলগ্ন টাইগ্রিস
সভ্যতার ভোরবেলা প্রত্নময় হিম যাদুঘর:
আকাশে আকাশ, নভশ্চর নাগ্গালের সীমা শেষে;
ফুলের ভড়ং নিয়ে কেন যাও পাণ্ডাপোষা ঠাকুরের কাছে?
চেয়ে গ্যাখো। শীতের ঘুমন্ত নদী। হাজার মানুষ
ফেব্রুয়ারী রোদ্দুরের সেঁক নিচ্ছে—ঘুমন্ত, উপুড়।
এসো। বহু হল ঢিপ ঢিপ প্রণামের ঘনঘটা
এবার সম্পূর্ণ ন্যাংটো সমবেত নারী ও পুরুষ
মানুষের দেহটিকে শ্রেষ্ঠতম মন্দিরের মর্যাদা জানিয়ে
নিজেদের শুদ্ধতাকে পুজো করি নদীতীর ছুঁয়ে—
নষ্ট প্রবেশ, লুপ্ত প্রস্থানের জাতিস্মর হাহাকারে।

পথে পথহীন

শুভ বসু

অনেক দূরে, অনেক দূর
গহন থেকে ঝিকিয়ে ওঠে প্রবীণ ইশারা।
প্রস্তাবিত সরণী আজো চেনে না তার দিক।

আমরা প্রায় ঘোরের মধ্যে
পা ফেলি, আর স্থলপদ্মের
গল্পে গল্পে ক্রমান্বয়েই সহযাত্রীদের
বুকের ভেতর উথলে তুলি
তীর্থরেণুর তৃষ্ণা। ওই সরণী তার নিজের
খেয়ালখুশির খেলায় অবলীলায়
আমাদের কি নিয়ে যাচ্ছে যেদিকে প্রান্তর
আগুন নিয়ে খেলে এবং কঙ্কালের পাল
জানে সব স্রোত শুকিয়ে গিয়েছে, তৃষ্ণার
অবসান নেই মৃত্যুই শেষ আশ্রয়?

কত অজস্র প্রলয়পাগল নাগিনীর
বিষনিঃশ্বাস, জিঘাংসা, ক্রোধ একদিন
অনায়াসেই তো আমরা পেরিয়ে এসেছি।

একটি মণি তখন স্থির নিশান হয়ে জ্বলত।
পায়ের চাপে তার দিকে ঠিক চালিয়ে নিতাম পথকে।
ওপর থেকে অপার্থিব রেখার মত পাখি
ডাকতে থাকলে, স্থলপদ্মের অপার মহিমা
ফুটে উঠত আমাদের প্রায় মহাকালজয়ী স্বপ্নে।

প্রায়ত পৌঁছে গেসলাম, প্রায় সবাই যখন
যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা ভাবতে যাচ্ছি,
কোথায় মণি, মনে হল ও তবে কি আলেয়া
ফুটেছিল যা আমাদের এত কথার প্রলাপে

এখন তবে অনিবার্যই পা তোলা পা ফেলা
দিশাহীন, ক্রীড়ামত্ত পথের মর্জিতে ?

স্বপ্নের মুখ

সুরজিৎ ঘোষ

আহ্, গতকালই আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম তোমাকে
অথচ বিশ্বাস কর তোমার স্বপ্নের মুখে যদিও ঠিকঠাক ছিল সব
চোখের জায়গায় কিন্তু চোখের বদলে ছিল দুখণ্ড পাথর।
একটা পাথর পোড়া কয়লার মতো কালো বোবা
আরেকটা ঘন লাল, যেন কচি গলার বাহবা
শুনে উত্তেজিত হয়ে বেরোতে চাইছে ঘর ছেড়ে।

সত্যি বলতে এরকম জটিল মুখশ্রী উন্মোচনে
আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিলনা, কে না জানে
জেগে থাকলে যাই হোক স্বপ্নের নিয়ম নেই কোনো
কীভাবে কেমন বাজে ফেলে আসা অদ্ভুত পিয়ানো।

মানুষের কথা লিখব না

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আর মানুষের কথা লিখব না
তারাদের কথা লিখব, গোলাপের কথা লিখব
পাখি ও গাছেদের কথা লিখব
সমুদ্রের কথাও লিখতে পারি, পবনের কথা
পাহাড় থেকে যে ধ্বস নামছে তার কথা

মানুষের কথা অন্য সবাই লিখুক, অন্য কবিরা
এ্যাত ভালবাসছে মানুষকে সবাই
আমার নিশ্চিন্ত হয়ে সরে আসার পালা

গতকাল একটা নদীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম
নদীর ওপর পাঁচটা নৌকা
নৌকার ওপর বাদামী মেঘ, মেঘের ওপর নীল শূন্যতা
কতকাল এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি
চল্লিশ বছর খুব বেশী সময় নয় তবুতো দেখছি

আমি কেন মানুষের কথা ভাবব
আমি তো আমার কথাই ভাবতে পারি ওর মতন
জোর গলায় বলতে পারি আমি কবি
আমি ছাড়া কেউ কবি নেই
তিনটে ঘেয়ো কুকুর রাত বারোটায় ডাকছে
"চাটুজ্যে মশাই—ও, চাটুজ্যে মশাই'

পাখিদের ঠোঁটে তৃণের মতন পড়ে আছে
স্তব্ধ তরমুজ রঙের প্রকৃতি
আর ওই লোমওঠা লোলচর্ম বৃদ্ধ কুকুর
ঈশ্বরের দোহাই, মানুষের কথা
আমাকে আর লিখতে বলো না
আমি মানুষ বলতে বুঝি
মান ও হুঁশ আছে…

আলতামিরার স্তব্ধতা

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

আলতামিরার থেকে ভয়ঙ্কর অশুভ জল
আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ?
জেবেল আমূরের গালিচার মত
দুর্বোধ্য আকাশের নিচে
নীরেট গ্র্যানাইট পাথরের ওপর দিয়ে
ঠোক্কর খেতে খেতে চলেছে
আমার জীবন্ত শবদেহ।

আমার করজোড় প্রার্থনা
প্যালিওলিথ স্তব্ধতায় ধাক্কা খেয়ে
আমাকেই চুরমার করে দিচ্ছে
কবে আমি এইসব হিমযুগ পাড়ি দিয়ে
মুখর যুগে পৌঁছোবো ?

ভালবাসলে মেঘ হয়

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

মনে পড়ে
কোন এক ডিমের কুসুমরঙা সকালে
ফুলের ঘর সাজিয়েছিলে
সেইসব ফুল
সেইসব পাঁপড়ি
জলভরা মেঘের
প্রগাঢ় প্রেমে নত হয়েছিল
স্মৃতির শহরে
কিশোরীর চুলে বকুলতলার গন্ধ
মেঘ হয়ে উড়ে যায়
দূর কোন পরবাসে।

সভাপর্বের কাহিনী

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কোথায় পাবে আমাকে, চলে তো এসেছি অনেকদিন
ফাল্গুন হাওয়ায় উড়ছে হলুদ পাতা, দানপত্র, দলিল দস্তাবেজ
তোমায় নিয়ে গল্প হলো ভবানী ভবনে, শ্বশুরমশাইদের মুখোমুখি
জন্মদিনের চিঠি এবার দাওনি তো ? তাই তো আমিও খুব সহজেই
ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলাম নিষ্প্রাণ নিয়োগপত্র, গাঁদাফুলের কুচি
ছড়িয়ে পড়ল রেললাইনের পাথরে, কোথায় পাবে আমাকে

তোমার নম্বর ডায়্যাল করে হারিয়ে ফেলেছি সব সংখ্যাগুলো
এখন আমার কোনো টেলিফোন নেই, রাজপ্রাসাদ নেই
গল্প লিখার খাতায় জমেছে ধুলো, ইঁদুররা স্বপ্নহীন ছুটছে ঘরময়
নদীর ধারে বালির ছাদ, ঢেউ তার খোলা চুলে ভাঙল কূল
তোমাকে বলা হল না, আমি ধৃতরাষ্ট্র সাজি রোজ দুপুর বেলা
ফাল্গুন হাওয়ায় উড়ছে পাঁশুটে পরচা, হাতচিঠির জেরক্স
অনর্জিত দায়িত্বের ঘামে ভাপিয়ে উঠছিল আমার নীল জামা
অনর্থক সম্পদের কাদায় ভ'রে উঠছিল লজ্জাহীন সাদা জুতো
দামোদরের বালিতে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলাম পোশাকহীন কৈশোর
যুধিষ্ঠির আজ দেখতে পায় না, এল কি এল না ছোট্ট একটা বেজী
তার রাজসূয় যজ্ঞে, পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেণ্টে, ফাল্গুন হাওয়ায়···
আমাকে কোথায় পাবে, চলে তো এসেছি অনেকদিন

হীরেন ভট্টাচার্যের কবিতা

সুখী কী তুমি ?

আমার বুকেই ছিলো গোলাপ বাগিচা,
একদিন রক্তে লুটোপুটি একটা গোলাপ
শুকনো কাঁটাকে সুধালো গোপনে ঃ
তুমি সুখী কী
সুখী কী তুমি ?

গোলাপ গাছটার হাতখানেক অন্ধকারে
আমি কান খাড়া করে রইলাম
শীতে-গ্রীষ্মে খসে ফুলের পাঁপড়ি ।

পাথরে খোদিত গান

পাথরের গায়ে কান রেখে গান শুনি,
বেজে ওঠে স্মৃতিলব্ধ বন্দী জলতরংগ ।
স্তন্যপুষ্ট বিস্ময় বুকে
তছনছ দুরূহ গান শতধার ।

পাথরের কোলে লুকালো কোন যমুনার জল ;
প্রেমের সাথে কী সম্বন্ধ তার !

ভ্রান্তিহীন সময়ের কঠিন মুখে নিন্দা নির্বাক
উজ্জীবিত সভার নমিত ভবিষ্যৎ ;

পিতা প্রেমিক কবির প্রতীক জাগরূক তীব্র প্রজন্ম,
হাতে রঙের চিহ্ন, বুকে গোলাপ গান্ধার ।

সজল দে-র কবিতা

অস্বীকার

তোমাকে পায়নি যে খুব দুঃখী, তা নয়
অপমান তার বেশী তুমি যাকে স্বীকারও করো নি
ভালো বা মন্দ আছে তা শুধু জানে যে ও তার ঈশ্বর

জীবন জল

জলের ওপরে কচুরিপানা, নীচে গুল্ম, শ্যাওলা
সরাতে সরাতে দুহাতে দুপায়ে সরাতে সরাতে এতো মাঝবিল
ক্লান্তি নামছে শরীর বেয়ে হাতে পায়ে গোড়ালিতে আর আঙুলের ডগায়
অতএব অথবা এবং এই নাকি বেঁচে থাকা

তিনি

অন্ধকার পিছনে ফেলে তিনি চলে গেছেন আলোর দিকে
সম্যক জানা নেই, অন্ধকার রেখে গেছেন কার জন্যে
অন্ধকার তবু তো আছে, অন্ধকার তবুতো থাকেই
যাকে তা খায় খাক, শুধু তাঁকেই ডেকেছে ওই ভালো

মনে নেই

আজ তাকে তত মনে নেই
সে কি কোনো সন্ধ্যায় বিজড়িত কুয়াশায়
বলেছিল 'মনে রেখ'
সে কি কোনো জ্যোৎস্নায় গ্রীলের আড়াল থেকে
হেসেছিল বিষাদের হাসি

আজ তাকে তত মনে নেই

তার ভাস্কর্যের মত চিবুক ফেরানো অন্ধকারের দিকে
আর দু হাতের ওপরে রাখা পানপাতার মত তার মুখ

ভাষ্য

প্রণবকুমার রায়

প্রথম বর্ণে অনন্ত
আর দ্বিতীয় বর্ণে—আত্মা
তৃতীয় বর্ণে ইতিহাস আর ইঙ্গিত—দুইমাত্রা

কত যে কুমারী অক্ষর
ধর্ষিতা, চিরবন্ধ্যা,
কবিতা-ঋতুতে যদি বা না-ফোটে
তাদের রাতুল-সংজ্ঞা

তির্যক আর স্বপ্নে:সরল
আলোক-পায়ী যে গ্রন্থী
জুড়ে জুড়ে হয় জরায়ু সফেন
শব্দ সে, ষড়্যন্ত্রী

আরো খোঁজো যদি বর্ণমাইল
সেই মহিমার শিঙ্
সেখানে শয়ান জননী ভাষার
পুণ্য বিষ প্রাচীন !

কয়লাশহর

দেবাশিস নাথ

কখনো ফাগুন নয়, বাদামী পশম যখন আমাদের ঢেকে দেয় পৌষে,
কালকেতু ফুল্লরা,

বা শ্রীমন্তের বাণিজ্যপোতের মতো পুরানো—
হে শহর ! ঊষর শহর !
স্মৃতিরা দৌড়ে ছোঁয় মা সাগরের মেলা ।

কখনো স্বপ্ন নয়, জলজ বুদ্বুদ হয়ে জেগে ওঠে বন্ধুরা.
অতীশ-স্থশান্ত-শুভ, ক্যাথলিক চার্চের জোনাক্-ডাঙায়—
শিশির-শিশির কিছু গল্পগুজব!
অমরেশ বলেছিল—ভোঁকাট্টা ঘুড়ির মতো হেসেছি সবাই—
"চাঁদনী রাতের হাওয়ায় কখনো চাস্‌নালায়
পায়চারি করে আজো প্রিন্স দ্বারকানাথ!"

হে শহর! উষর শহর! নৈমিষারণ্যের নদী কি লুকাও?
তোমার-ই পাললিকে ঝাঁপতালে বয়ে যায় ছুনিয়া!
অস্পষ্ট শব্দ আসে—শোণিতের ঘরে ঘরে আশ্চর্য স্বনন—
দূরান্তে মন্দ্রিল পঁচিশে বৈশাখ!
কার যেন গান ভাসে—প্রাচীন 'পৃথিবীর' দিগন্তরেখায়—
"হে নূতন,
দেখা দিক আরবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।"
ফিরেছে নূতন কি? ডিশেরগড়ের সেই স্থচরিতা সোম?

আমিও পথিক হবো উদাসী লু'-এ।
আকাশে আকাশছেয়ে চূর্ণ বিটুমিনাস্…ট্রলিদের সাঁইসাঁই…
কয়লার ঢিবি আর
ছাতাপাথর পার!
আজ যে খবর দেবে আয়নোস্ফিয়ার:
"মিশনের মোড় ছেড়ে লোকোর মাঠে
জেমিনীর কার্ণিভ্যালে ব্রাজিলের মেয়ে!"

হে শহর! উষর শহর! জন্ম-মৃত্যু আর পরিণয় মেলে
কুশলেই আছো বেশ গতানুগতিক।
যদিও অলকা নয়, নয় যে অলিম্পিয়া—
শাল—সেগুন ছুঁয়ে শের শা'র রাস্তায়
ঝুলনে-বোধনে-দোলে
আমরাও ছুটেছি কত ছুটির ছটায়!

হলুদ দুপুরেরা, ভালোটিয়া কলেজে নোটনের বকম্
হাস্নাহানার ঝোপে সূর্য হারায়!
তবে কি আমরাই? আমরাই চুপিসাড়ে গড়ি ইতিহাস?
আমাদের হাঁটাহাঁটি
ভুট্টাক্ষেতের আলে,
রিভারসাইড্ রোড ধরে সোনাঝুরি ছায়ায়
পুরানো প্রজন্ম থেকে গেয়ে যাই গান :—
"চল্ টুসু যাই, রাণীগঞ্জের বটতলা—
দেখবি কেমন করে কয়লাখনি থেকে হচ্ছে জলতুলা।"

তুমিও কি অপলক আকাশের দিকে?
কাল যে ছট্‌পরব বরাকরে ভেসে যাবে হাজার প্রদীপ,
ওই! ওই! ধাদ্‌কার হাতারেরা ওপার চুরুলিয়ায়—
এখুনি সন্ধ্যা হবে ইস্কোয় ছুটি—
লামায়ার পার্কে ঝিঁঝিঁদের গান!
বলো তো কালপুরুষ; জীবনের দিনগুলির অভিমুখ কোথায়?

এবারে নীরব হবো, বিকাশের মতো—
দোমহানী শ্মশানে মুঠো মুঠো ছাই!
তবু জাগে সেই সাধ, হে দূর বিহারীনাথ!
স্বজন বন্ধু এলো শেষের সেদিন—
কুয়াশার নৈঋতে জননী মহীশিলায়
আমি যে করব রোপণ ছোট্ট ছাতিম!

কখনো ফাল্গুন নয়, বাদামী পশম যখন আমাদের ঢেকে দেয় পৌষে—
কালকেতু ফুল্লরা
বা শ্রীমন্তের বাণিজ্যপোতের মতো পুরানো—
হে শহর! হে উষর শহর!
স্মৃতিরা দৌড়ে ছোয় মা সাগরের মেলা।

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক

সৌরি ঘটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাল রাত থেকে বৃষ্টি নেমেছে। একটানা বৃষ্টি। কখনও ঝমঝম করে, কখনও ঝিরঝির করে।

বন্ধ সেলের মধ্যে বসে বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ধারাপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ করে দমকা হাওয়া বইছে, ছাদের নীচে ছোট্ট জানলার ফাঁক দিয়ে সেই হাওয়া কিছুটা ভিজে গন্ধ নিয়ে সেলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কি ভালই লাগছে এই গন্ধটুক।

বাইরে এমন বর্ষার দিনে বসে বসে কবিতা পড়তাম। কিন্তু এখানে জেলখানায় বসে কবিতা আবৃত্তি করতে ভাল লাগছে না।

লিখছি বসে বসে। নিজের উপলব্ধির কথা। সেসব প্রশ্ন মনে বারবার উঁকি দিয়েছে তার বিবরণ।

জীবনকে এক একজন মানুষ এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। আমি রাজ-নীতি করি, আমার এক দৃষ্টিভঙ্গী। আবার সংসারী মানুষদের দেখা অন্যরকম। যারা সাধু সন্ন্যাসী তারা আবার জীবনকে দেখে আর একভাবে।

এর কোনটাই পূর্ণ সত্য নয়, আবার কোনটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। একটা সমুদ্রকে তীরে দাঁড়িয়ে দেখলে একরকম লাগে, জাহাজে চড়ে তার বুক দিয়ে ভেসে যেতে যেতে আর এক অভিজ্ঞতা হয়, আবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সমুদ্রের দিকে তাকালে আর এক অনুভূতি। সমাজ, সংসার সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণাও এইরকম নানা বয়সে, নানা পরিবেশে, নানা পরিস্থিতিতে নতুন নতুন উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়।

প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা অন্যায়ের সঙ্গে কত রকমভাবেই না আপোষ করে চলি। ঘরে চিনি কি কেরোসিন নেই, ব্ল্যাকে কিনে আন! কোর্টে কাজটা আটকে গিয়েছে—ঘুষ না দিলে হবে না, দাও। একটা চাকরি খালি হয়েছে তদ্বীর-তদারক, ধরাধরি করে দেখ নিজের ছেলেটা ঢোকান যায় কি না? তাতে অন্য যোগ্য ছেলে বাদ যায় তো যাক। আমার কাছে আমার ছেলের চাকরিটাই বেশি জরুরী। নিয়মিত এইসব করতে করতে

আমরা এমন অভ্যস্থ হয়ে যাই যে এগুলো আর নীতিহীন কাজ বলে মনেই হয় না, ভোঁতা হয়ে যায় অনুভূতি।

আবার সেই আমরাই ঘরোয়া আলোচনায়, সভা-সমাবেশে, নীতিগত প্রশ্নে তীব্র সোচ্চার হই চোরাবাজারীর বিরুদ্ধে, নিন্দা করি ঘুষ, দুর্নীতির, দাবি করি উপযুক্ত প্রার্থী চাকরি পাক।

এই দ্বৈত সত্তা নিয়েই আমাদের জীবনের অলিগলিতে চলা ফেরা।

এই সহনশীলতা এক ধরনের মানসিক জড়তার লক্ষণ। সমাজের অবক্ষয়ের এটাও একটা লক্ষণ। এর আগে লিখেছি সমাজের অগ্রগতি যখন সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন বেড়ে ওঠে ধর্ম আর কুসংস্কারের প্রাবল্য। বেড়ে ওঠে যৌনতা আর ব্যভিচার,, নষ্ট হয় সুস্থ মূল্যবোধগুলি, বুদ্ধিজীবীরা ব্যর্থ হয় তাদের ভূমিকা পালন করতে।

আমাদের সমাজে এই তিনটি লক্ষণই এখন প্রকট। যেমন বেড়ে উঠেছে ধর্মের প্রাবল্য, তেমনি চলছে অবাধ যৌনতার প্রচার আর বুদ্ধিজীবীদের বেশ একটা বড় অংশ এর সঙ্গে আপোষ করে মানিয়ে চলছে।

কোন কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচ্ছদের পাতা যদি এভাবে বিজ্ঞপিত হয় "শ্রীমতী অমুক অভিনেত্রীর কি যৌন আবেদন কমে যাচ্ছে", "শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে শ্রীমান অমুকের কি যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে",—"কিভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়",—"একমাত্র স্বামী সহবাসেই কি নারীর যৌনক্ষুধা মেটে"—"বিবাহিতা মেয়েদের পুরুষ সঙ্গী থাকা অথবা বিবাহিত পুরুষদের মেয়ে সঙ্গী থাকা কি অপরাধ" প্রভৃতি এবং তারপর এইসব পত্রপত্রিকা যখন ঘরে ঘরে যায় তখন বাড়ীর অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীরা তা পড়ে কি শেখে? কি জীবন-বোধ তারা গড়ে তোলে এসব রচনা থেকে? সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি প্রতিটি নাগরিকের যে দায়িত্ববোধ সে সম্পর্কে তাদের কোনরকম সচেতনতা বাড়ে, না উগ্র যৌনতাবোধ থেকে একদল নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে তারা?

শুধু কি এইটুকুই! বিজ্ঞাপনে নারীদেহের অশ্লীল ব্যবহার থেকে শুরু করে অশ্লীল নাটক, চলচ্চিত্র সব কিছুরই আজ প্রচার চলছে অবাধে।

এমন কি এ দাবীও তোলা হচ্ছে যে স্কুলে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন-জীবন শিক্ষা দিতে হবে এবং তাকে পাঠ্যসূচীর অংশ করতে হবে। ভাবখানা এই যেন ঐ শিক্ষাটার অভাবের জন্যই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে আছে। ঐ শিক্ষাটা পেলেই জীবনের রথের চাকা গড়গড় করে চলবে।.....

রুশ লেখকদের এক সভায় ম্যাক্সিম গোর্কি উনিশশো পাঁচ সাল থেকে উনিশশো সতের সাল পর্যন্ত রুশ সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—"রুশ সাহিত্যে এই যুগটি হল পশ্চিমের অবক্ষয়ী ভাবধারার লাগামছাড়া রাজত্বের যুগ।"

এ যুগে আমাদের দেশের সংস্কৃতি-সম্পর্কেও একথা অনেকখানি প্রযোজ্য বৈকি।

কিন্তু এর চেয়েও ভয়ের কথা এ-সম্পর্কে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের মনোভাব।

শতাব্দী শেষ হতে চলল, এখন দেশের শতকরা প্রায় সত্তরজন মানুষ নিরক্ষর। মুষ্টিমেয় যাঁরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান, যাঁদের পরিবারের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর আর্থিক সঙ্গতি আছে তাঁদের ঘরের ছেলেরাই কেউ হন বৈজ্ঞানিক, কেউ হন ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ কেরাণী, কেউ শিক্ষক।

এই দরিদ্র দেশে, যেখানে অধিকাংশ মানুষের কাছে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাওয়ার কল্পনা একটা স্বপ্নবিলাস, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাও সকলের কাছে সহজলভ্য নয়, সেখানে এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের অধিকাংশ কি ভূমিকা পালন করছেন?

মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে মুক্ত করতে গত শতাব্দী থেকে এ-শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত মানুষরা এবং বুদ্ধিজীবীরা কি কঠোর সংগ্রামই না করে গেছেন। সে সব ঘটনা আজ হল অতীতের ইতিহাস।

কিন্তু বর্তমানে? এইসব সম্প্রদায় কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন মানুষের সামনে?

একজন বিজ্ঞানী যখন ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করেন তখন লোকে সেটাকে কিভাবে নেবে? তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ না ধর্মীয় কুসংস্কার কোনটায় প্রভাবিত হবে আমাদের দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষ?

একজন ডাক্তার যখন রোগীর পয়সাকড়ি শুষে নিয়ে তাকে ভগবানের ওপর ভরসা রাখতে বলেন তখন মানুষ কি মনে করে? শুধু কি তাই? আমাদের দেশে স্বচ্ছল বিত্তবান ঘরের ছেলেদেরই আর্থিক সঙ্গতি আছে ডাক্তারি পড়বার। সেই বিদ্যা শিখে তাঁরা কি মানুষের সেবায় নিজেদের শ্রম ও জ্ঞানকে নিয়োগ করেন? সে সেবা ব্যবহার করা হয় মানুষকে আরও শোষণ

করার জন্য। যতটা সম্ভব তাকে নিংড়ে নিয়ে ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদ বাড়াবার জন্য।

হাসপাতালের সঙ্গে যে ডাক্তাররা যুক্ত তাঁদের মোটা টাকা দিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে না দেখালে হাসপাতালে সিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এছাড়া এঁদের অনেকেই খুলে রেখেছেন নার্সিংহোম। সেখানেই রোগীদের যেতে প্ররোচিত করেন তাঁরা। কারণ নিজের নার্সিংহোমে একবার ভরতে পারলে রোগীকে যথেচ্ছ শোষণ করায় কোন বাধা থাকে না।

মনে পড়ে প্রায় বিশ বছর আগেকার একটি ঘটনা। একটি ছোট মফঃস্বল শহরের মহকুমা হাসপাতালে একদিন দুপুরবেলা একটি দুর্ঘটনার এক রোগী নিয়ে এসেছিল তার আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার লোকজন। রোগী ছিল একটি শিশু। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল গুরুতরভাবে।

তখন দুপুরবেলা। হাসপাতালের একমাত্র ইমার্জেন্সি ছাড়া সব বিভাগ বন্ধ হয়ে গেছে। সকালের ডিউটি সেরে ডাক্তাররা বাসায় বা কোয়ার্টারে চলে গেছেন। তাঁদের কাছে জরুরী কল গেল। খেয়ে দেয়ে তাঁরা এলেন তিনটের পর। ততক্ষণে ছেলেটি মারা গেছে।

পাড়ার লোকজন রেগে ডাক্তার নার্সকে মেরে, হাসপাতাল ভাঙচুর করে তাদের ক্ষোভ জানিয়ে চলে গেল। প্রতিবাদে শুরু হল ডাক্তারদের কর্মবিরতি। এই অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য মহকুমা শাসক ডাকলেন এক নাগরিক সভা।

সেই সভায় বড় ব্যবসাদার, প্রবীন উকিল, অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তরা সবাই এই কাজকে তীব্র ধিক্কার দিয়ে দেশটা যে অরাজকতার পথে যাচ্ছে এবং একালের তরুণরা যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে সেটা প্রমাণ করার প্রতিযোগিতা শুরু করলেন।

এই কোরাস গানের মাঝখানে উঠে দাঁড়ালেন শহরের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে এক তরুণ কমিউনিষ্ট কর্মী। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন—"দেখুন, হাসপাতাল ভাঙচুর করা বা ডাক্তারদের মারধোর করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। এই প্রশ্নে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু আমি বলব দোষটা কি শুধু যারা ডাক্তরদের মেরেছে তাদের? এর তো আর একটা দিকও আছে। যাদের বাড়ীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল তারাই বা তাদের ঘরের ছেলে-মেয়েরাই ডাক্তারি পড়ার বা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। কিন্তু এই বিদ্যা শিখে এসে তাঁরা কি সবচেয়ে কম পারিশ্রমিকে মানুষের সেবায় নিজেদের জ্ঞানকে নিয়োজিত করেন? আমাদের এই ছোট্ট শহরের এমাথা থেকে ওমাথা যেতে

রিক্সা ভাড়া লাগে একটাকা। এই শহরে একজন প্রাইভেট ডাক্তারের চেম্বার ফি প্রথমদিন দু টাকা, বাড়ী আনলে পাঁচ টাকা। আর হাসপাতালের ডাক্তারদের চেম্বার ফি দশ টাকা, বাড়ীতে কল দিলে পঁচিশ টাকা। আমাদের এই ছোট্ট শহরের বেশিরভাগই হলেন গরীব মানুষ। তরকারি বিক্রি করে, রিক্সা চালিয়ে, বিড়ি বেঁধে, গামছা ফেরি করে, সামান্য পুঁজি নিয়ে ধানচালের কেনা-বেচা করে দিন গুজরান করেন।

ডাক্তারের কাছে মানুষ যায় চরম অসহায় অবস্থায়—যখন মৃত্যু এসে দাঁড়ায় তখন। সে হাসপাতালের ডাক্তারদের পঁচিশ টাকা ফি দেয় কেন? সে জানে এই টাকা দিয়ে ডাক্তারবাবুকে বাড়ীতে আনলে প্রয়োজনে হাসপাতালে একটা সিট পাওয়া যাবে, যা কোন প্রাইভেট ডাক্তারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সে বোঝে এটা এক ধরনের ঘুষ। আবার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরাও মনে মনে এটা বোঝেন। তাঁর হাতে যদি হাসপাতালে ভর্তি করার সুযোগ না থাকে তাহলে কেউ তাঁর কাছে আসত না। সম্পর্কটা যখন এইরকম, যেখানে কেউ পাঁচ-এর জায়গায় পঁচিশটাকা ফি দিয়ে কি মোটা টাকা খরচ করে নার্সিংহোমে ভর্তি করে তখন সে তার রোগীর প্রতি এতটুকু অযত্ন সহ্য করবে কেন? মাছ কিনতে গিয়ে মেছুনি যদি ন্যায্য দাম নিয়ে পচা মাছ দেয় আপনি সহ্য করেন? রিক্সাওয়ালা যদি ভাড়া নিয়ে আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে না দেয় তাকে ছেড়ে দেন আপনি? তেমনি আপনি যখন রোগীর কাছে মোটা টাকা নিচ্ছেন তখন সে-ও আপনার কাজ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে। না পেলে পেটাবে, অপমান করবে। তাকে বন্ধ করা যাবে কি করে? শোষণও করবেন আবার সম্মানও চাইবেন দুটো তো একসঙ্গে হয় না।"

সভায় গরীব মানুষ ছিল কম। তারা 'ঠিক' 'ঠিক' বলে হাততালি দিয়ে বক্তাকে সমর্থন করল। আর ভদ্রলোকেরা সরাসরি এই ধরনের সমালোচনায় একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ল। বিব্রত হয়ে কেউ মাথা চুলকাতে লাগল, কেউ ফ্যালফ্যাল করে আশেপাশের সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। একজন ডাক্তার এর জোরাল প্রতিবাদ করতে উঠে যুক্তি হারিয়ে এলোমেলো কথা বলতে শুরু করলেন। নমঃ নমঃ করে সভা শেষ হল।

(চলবে)

অভ্যন্তরের সাপ ও 'তমস'

কিন্নর রায়

আমাদের, যাঁদের জন্ম পঞ্চাশের শুরু বা মাঝামাঝি, তাঁদের কাছে এই পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার তেমন কোনো রক্তাক্ত স্মৃতি নেই। বছরখানেক আগে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে হঠাৎ ভেসে আসা 'দাঙ্গা'-র হাওয়া দেখেছিলাম 'সুবর্ণরেখা'-র বারান্দা থেকে। বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি প্রশ্নে কারা যেন এখানেও ক্ষতস্থানে খোঁচা দিয়েছিল। ফলপট্টিতে আগুন ধোঁয়া, ট্রাম-বাসের থেমে যাওয়া। আর 'সুবর্ণরেখা'র নিচে স্পোর্টস-সরঞ্জামের দোকান থেকে কারা যেন হাতে হাতে হকি স্টিক নিয়ে যাচ্ছিল এলাকা-কে 'রক্ষা' করার জন্যে। দোকানের মালিক বিপন্ন মুখে হকি স্টিক লুটের ব্যাপারে প্রশ্ন করে এই 'রক্ষা' বিষয়ক উত্তরটিই পেয়েছিলেন।

তখন শেষ বিকেল। কিছু মানুষ রৈ-রৈ করে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে হ্যারিসন রোডের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। আবার তাড়া খেয়ে কিংবা হয়ত আতঙ্কেই ফিরে আসছিল মানুষের ঢেউ। পটাপট দোকানের ঝাঁপ নেমে যাচ্ছিল। বই, ফটোর দোকান, খাবারের দোকান—কেউ-ই বিশ্বাস রাখতে পারছিলেন না।

ব্যাপারটা আর বেশি দূর এগোয় নি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রশাসন, পুলিশ। দাঙ্গা বাধানোর যে ষড়যন্ত্রকারী, বেনো জল সরে গিয়েছিল। একটু রাতে অন্য এক প্রকাশক বন্ধুর দোকান থেকে বেরিয়ে হেঁটে ধর্মতলা যাওয়ার সময় মেডিকেল কলেজের সামনে রাস্তার ওপর ভাঙা বাঁশের টুকরো, ইট এবং হয়ত বা রক্তের ছিটেও চোখে পড়েছিল। সেই প্রায় ফাঁকা রাস্তায় নিঅন আলোর সর। তার ভেতরই ভাঙা বাঁশের টুকরো, ইট এবং হয়ত বা রক্তের বিভ্রমেও মনে হয়েছিল—এ পাপ আমার। এ পাপ তোমার। আর সেই নিস্তরঙ্গ কলকাতার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা

গান্ধী যেদিন নিহত হলেন, সেদিনের শেষ বিকেলের কলকাতা। পি জি হাসপাতালের সামনে মোটর বাইকে তিনরঙা পতাকা লাগানো দাঙ্গাকারী। হাজরা কালীঘাটে ভাঙা শিখ রেস্টুরেন্ট। টালীগঞ্জ ব্রিজের নিচে জলন্ত ট্যাক্সি। আমি এবং আমার স্ত্রী সেই দাঙ্গা পেরিয়ে অনেক মানুষের সঙ্গে ঘরে ফিরছিলাম।

দাঙ্গা তো আমাদের কাছে সাহিত্যের পাঠ, সেলুলয়েড চিত্র বা ক্যানভাসে, তুলিতে। যদিও মীরাটে সরকারি হিসেবে (গত মে মাসে ঘটে যাওয়া দাঙ্গায়) মারা যান ১২২ জন মানুষ। সাম্প্রদায়িক হনন-পর্বে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে পুলিশ-প্রশাসন। এবং আমরা, বিবেক-চৈতন্য ও বুদ্ধি দিয়ে এক কবন্ধ নেতৃত্বের উন্মাদ নৃত্য দেখি। যে নৃত্য ও নাট্য আমাদের একুশ-শতকের 'কমপিউটার এজ'-এ পৌঁছে দেয়ার 'খুড়োর কল'টি সর্বদাই সামনে ঝুলিয়ে রাখে। মীরাটের দাঙ্গায় সরকারি হিসেবে পরে আরও মৃত্যু-ভার বাড়ে। তারও আগে হায়দরাবাদে বা এলাহাবাদে দাঙ্গার বিষবৃক্ষটি সমতলে রোপণ করে শাসকগোষ্ঠী। সংবাদ মাধ্যম আমাদের সামনে বয়ে আনে হননের অনুপুঙ্খ বিবরণ, রক্তের গন্ধ, বারুদ আর পোড়া ঘর-বাড়ির গন্ধ, বিপন্ন মানুষের হাহাকার।

পঞ্চাশের গোড়ায় বা মাঝামাঝি জমানো আমাদের এই বাঙালি স্মৃতিতে তো অনেক বেশি রক্তাক্ত ছবি সত্তরের যুবমেধ। বাড়ির পাশে, দেয়ালে দাঁড় করিয়ে যে কোনো যুব-প্রাণকেই শহিদ অথবা শ্রেণীশত্রুর মর্যাদা দেয়া। বরানগর, কাশীপুর, বারাসাত, কোন্নগরের গণহত্যা আজও আমাদের বিবেককে লজ্জা দেয়। লজ্জা দেন 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়া কবি, সাংবাদিক সরোজ দত্ত, আমাদের সামনে তাঁকে সরকারি ভাবে 'নিহত' বলার প্রমাণটুকুও লোপ করার চেষ্টা হয়।

পাশাপাশি আমাদের পাশের রাজ্য বিহারে হরিজন বস্তিতে আগুন যেন বা আমাদের প্রাত্যহিকীর অঙ্গ হয়ে যায়। আগুন, ধর্ষণ, লুট, হত্যা—পাল্টা হত্যা—সবই নিয়মিত, ধারাবাহিক।

ইদানীং টি. ভি-তে 'তমস' সিরিয়ালটি দেখতে দেখতে (তমস শেষ হয়েছে শনিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি) অনেকেই ফিরে যেতে পেরেছিলেন সেই দেশভাঙার, বিশ্বাসভঙ্গের দিনগুলিতে। গোবিন্দ নিহালনি এবং ভীষম সাহানির যুগ্ম অবদানে নাথু, কার্মো, শুয়োর মারা, মুরগী জবাই, ধ্বংস. হত্যা, দাঙ্গা এবং

'ও রাব্বা' নামের থিম মিউজিকটি আমাদের পরিচিত হয়ে ওঠে। আমরা পশ্চিমের সেই হত্যালীলা এবং তার আয়োজন দেখি।

এই দেশটির পূর্বে—এপারে এবং ওপারে, পশ্চিমের মতোই যে ভয়াবহ দাঙ্গার আয়োজন, তার তো তেমন কোনো ছবিই ফুটে উঠল না আমাদের সাহিত্যে। অধিকাংশই হয়ে দাঁড়ালো নস্ট্যালজিক চেতনার ছবি। পূর্ব বাংলার আকাশ, নক্ষত্র, নদী শস্যক্ষেত্র, বসতবাটি এবং মানুষের জন্যে হাহাকার। এমন অভিযোগ করছিলেন আমাদের এক বুদ্ধিজীবী বন্ধু। তাঁর বিশ্লেষণে যেসব বাংলা গল্পকে আমরা দাঙ্গাবিরোধী বলে চিহ্নিত করি, তাও তো মূলত তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার সমর্থনেই—অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, অন্য সম্প্রদায়ের সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষকে বাঁচাচ্ছেন। আর আজ—'বড়' খবরের মাধ্যমগুলিও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, তখনকার সেই ভয়ংকর সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক।

আমাদের বুদ্ধিজীবী বন্ধুটি বাংলা গল্প-উপন্যাসে দাঙ্গা তেমন ভয়াবহভাবে ফুটে না ওঠার জন্যে দায়ী করেছেন পূর্ব ভারতে দেশ ভাগের প্যাটার্নকে। পাঞ্জাবের মতো গ্রামকে গ্রাম ছেড়ে মানুষ চলে যাননি এপার থেকে ওপারে। এবং আসেন নি ওপার থেকে এপারে। এবং তাঁরা পথে যেতে যেতে জড়িয়ে পড়েছেন সংঘর্ষে, রক্তাক্ত হানাহানিতে।

নিহত হতে হতে সংখ্যায় কমেছেন। বাংলা ভাগাভাগিতে মানুষ এসেছেন অনেক বেশি। গেছেন কম। এভাবে শিকড়সুদ্ধু আমূল উপড়ে তাঁদের ছুঁড়ে দেয়া হয়নি অনিশ্চিত অন্ধকারে। বাড়ি বদল হয়েছে, সম্পত্তি বদল হয়েছে। আর আন্দামান, দণ্ডকারণ্য, বা কলকাতার আশেপাশে পূর্ব বাংলার মানুষের যে অনির্দেশ-যাত্রা, তার ছবিই আমাদের সাহিত্যে-সিনেমাতেও।

আমাদের আর একজন বুদ্ধিজীবী বন্ধু বলছিলেন, যে কোনো শিক্ষিত বাঙালির কাছে স্বপ্নের শহর কলকাতা। তিনি সেখানেই শিকড় ছড়িয়ে থাকতে চান। পূর্ববাংলায় এরকম বহু পরিবার ছিল যাঁদের অনেকেই চাকরি বা পড়ার সূত্রে কলকাতায়। আর পশ্চিমে চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে কোনো শিক্ষিত পাঞ্জাবীর কাছে স্বপ্নের শহর লাহোর। ফলে তার বেদনা অন্য কোথাও। অন্য কোনো খানে।

এতো সবই ব্যাখ্যা মাত্র। তবে বিষয়টি যাই হোক না কেন, আজ

চল্লিশ / একচল্লিশ বছর পরে 'তমস' আবার সবাইকে বেশ এক প্রস্থ নেড়ে-চেড়ে দিয়েছে। তাই 'তমস' শুরু হতে না হতেই দুই সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা তাকে আক্রমণ করে। দূরদর্শনে হামলা হয়, মামলা করে বন্ধ করার চক্রান্ত হয় এই মানবিক-দলিলকে।

আসলে আমাদের বুকের গভীরে, চেতনায় ও অবচেতনে সাম্প্রদায়িক যে বিষধর সাপটি ঘুমিয়ে আছে, তাকে চিনিয়ে দেয়ার ফলেই বুঝি এত সোচ্চার হয়ে ওঠে মৌলবাদী শক্তি। আমার বাবা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' দেখেছেন এবং কিছু কিছু ওপারের দাঙ্গাও। বাবার স্মৃতিতে সেই 'আল্লা-হো-আকবর, বন্দেমাতরম' এখনও বিষের পাত্রই।

ছাদে ছাদে ইটের স্তূপ। লাঠি, কাটারি, বঁটি এমন কি হাতা-খুন্তি নিয়ে তৈরি বাড়ির মহিলারাও। পাড়ায় পাড়ায় ভলান্টিয়ার বাহিনী। টহলদার পাঠান আর গোরা পুলিশ। উনোনে গরম জল ফুটছে, ফুটছে। আমরা প্রতিবেশীকে খুন করার জন্যে তৈরি হচ্ছি। প্রতিবেশীর হাত থেকে খুন না হতে চেষ্টা করছি।

কলকাতার ম্যানহোল বুজে গেছে লাশে। নোয়াখালিতে রক্তস্রোত। কারা যেন ক্রমাগত গুজব ছড়াচ্ছে। একটা লাশের বদলে দুটো লাশ। কলকাতার আকাশে শকুনের ডানা ঝাপটানি। শবের বিকৃত গন্ধে ভারি বাতাস। কয়েকদিনের জন্যে হলেও গুণ্ডারাই কলকাতার অধীশ্বর। তাদের কারও নাম মীনা পেশোয়ারি, কারও নাম ও পদবী হিন্দুর। তাতে কিছু আসে যায় না। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেঙে গেছে বিশ্বাসের শেষ সীমানাটুকু। এখন শুধুই অবিশ্বাসের গরল। আতঙ্ক আর আতঙ্ক।

আমার বাবা সরকারি চাকরির নিষেধ, এবং তাঁর পলাতক পুত্রের বিপন্ন জীবনের সমূহ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে সত্তরের গোড়ায় বলতে পারেন—'কাশীপুর-বরানগরের মতো শান্তি কমিটি বা প্রতিরোধ বাহিনী তৈরি হলে আমি তাতে নেই।' তাঁর ছোটখাটো শরীর, দৃঢ় মধ্যবিত্ত মুখের মানচিত্র মুহূর্তে গুণ্ডা ও আধাগুণ্ডাদের আনা 'শান্তিবাহিনী' বা 'প্রতিরোধ বাহিনী' তৈরির প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে। তিনি অক্লেশে চলে যান শিবপুরের বাঁশতলা শ্মশানে, পুলিশের গুলিতে নিহত তাঁরই পুত্র-বন্ধুর সংকারে। ঐ সত্তরেরই কোনো এক বিকেলে। মর্গ থেকে শ্মশান পর্যন্ত সেই ভয়ংকর ভয়াবহতার মধ্যেও তিনি অটল থাকেন। অথচ তাঁকেও দেখি আজও এই আশির শেষ পর্বে

চল্লিশের সেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের প্রশ্নে অত্যন্ত একপেশে, ধর্মান্ধ। তাঁর একটিই কথা—'আমারে বুঝাইও না।'

আমি আমার পূর্বসূরীকে দোষ দিতে পারি না। তাঁর হৃদয়ের স্থায়ী ক্ষতটি থেকে ক্রমাগত রক্তের পতন। সেই স্রোত বেয়েই ভয়ানক সাপটি বুকে হেঁটে আসে। ধীরে। ধীরে!—আমাগো ত্থাশ নাই—এই বোধ আমার পিতৃদেবকে একপেশে করে। তিনি গান্ধী জিন্নাকে সমান ওজনের অপরাধী ভাবেন। নেহরু পরিবার তাঁর কাছে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে ওঠে।

'তমস' হয়ত আমাদের সেই ভেতরের মানুষটিকেই চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। আমরা আবার উন্মুক্ত হই। সোচ্চারে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বলি, 'তমস ভালো'। 'তমস খারাপ'। 'তমস চলুক'। 'তমস বন্ধ হোক।'

আর হয়ত বা দূরদর্শনের কৃপাতেই ভীষম সাহানির 'তমস' উপন্যাসের নামটি জানেন সাধারণ মানুষ। আর অনুবাদ হয় বিভিন্ন ভাষায়, বিক্রি বাড়ে। সেলুলয়েড মাধ্যমে আজও তো এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে সাহিত্যকে। এমন কি সৎ সাহিত্যকেও।

'তমস'-কে আলোচনা করতে গিয়ে কোনো কোনো 'মার্কসবাদী' বুদ্ধিজীবীও বলে ফেলেছেন, 'এই যে দাঙ্গা দেখানো হয়েছে, তা রূপকথার দাঙ্গা'। কেউ কেউ বলেছেন, বর্তমান শিখ-সমস্যা, পাঞ্জাব-প্রসঙ্গ মনে রেখে, পাকিস্তানকে চক্রান্তকারী হিসেবে দেখানোর জন্যেই নাকি তমস-এর নির্মাণ। না হলে কি করেই বা তা দূরদর্শনের আনুকূল্য পায়!

আর আমাদের সামনে তমস তো ইতিহাসই। সেই ইতিহাস যা মানুষকে শিক্ষা দেয়। পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

তমস : যে ইতিহাস এখনও ক্রিয়াশীল

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

ডারউইনের বিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটি ছিল জীবনের রৈখিক অগ্রগতির সূত্র। জীবন চক্রাকারে ঘোরে না, সে এগিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি এবং সমাজ জীবনে বারে বারে অতীতের তিক্ত স্মৃতি সত্তা হয়ে ওঠে, সত্তা ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠার ভয় জেগে ওঠে। প্রতিনিয়ত মনে হয় সমগ্র ভারতবর্ষ যেন এক ভুলভুলাইয়া আর দেশবাসী যেন বারে বারে একই বন্ধ দরজায় ফিরে আসে। সেই একই ভুল। অনেক হাঁটাচলার পর আবার সেই একই বৃত্তের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা।

সামান্য কয়েকবছর আগে গোপাল হালদারের প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি অসম্পূর্ণ তালিকাকে সম্পূর্ণ করার তাগিদে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গিয়েছিলাম। যেখানে সজনীকান্ত দাস 'পরিচয়' পত্রিকার ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলি দান করে গেছেন। নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার পুরণো সংখ্যাগুলো পড়ার অসম্ভব টান অনুভব করেছিলাম ঠিক যেমন তেঁতলে বিলাসের মত জেলেদের মাছের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা এবং সমুদ্র গভীরভাবে টানে। আসলে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং তৎকালীন রাজনীতি তথা জীবনের টানাপোড়েন যেভাবে সাহিত্যে উঠে এসেছে তা জানার একটা ঐতিহাসিক দায় মনের মধ্যে কাজ করছিল। সেই ঐতিহাসিকতার দায় থেকেই 'পরিচয়' ১৯৪৬-এর শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত তৎকালীন কম্যুনিস্ট যুবক সমরেশ বসুর 'আদাব' পড়েছিলাম।

কিন্তু গোবিন্দ নিহালনির 'তমস' প্রমাণ করে দিল যে আমার সেদিনের সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ভুল ছিল। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা, বাবরী মসজিদ কিংবা রামজন্মভুমির ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ধর্মীয় গোঁড়াপন্থীদের নিত্যদিনের ক্রিয়াকর্ম একথা স্পষ্ট করে তুলছে যে 'আদাব'এর পটভূমি আজও থেকে গেছে, দুঃস্বপ্নের দিন এখনও শেষ হয়নি। যে 'পরিচয়' ১৯৪৬—১৯৮৮ এই বত্রিশ তেত্রিশ বছরের সময়কাল অতিক্রম করে একটু দূষণমুক্ত সমাজব্যবস্থায় খানিক সুস্থ শ্বাস নিতে পারত তাকে আলোচনা করতে হচ্ছে '৪৬-'৪৭-এর তমস এবং তাকে হেঁটে যেতে হচ্ছে

'৮৮-এর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। যে ফিল্মকে বন্ধ করার জন্য কোর্টে কেস হয়, দূরদর্শনের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং ভাঙচুর হয়, পরিচালককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় এবং পুলিশ নিয়ে হাঁটতে হয় তা শুধু '৪৬-৪৭ সালকেই চিত্রিত করে না, '৮৭-'৮৮ কেও স্পষ্ট করে তোলে। আর এ কারণেই 'তমস' একটি ফিল্ম হিসেবে নিরলম্ব দাঁড়িয়ে থাকে না, তা হয়ে ওঠে এক দীর্ঘ আন্দোলনের, এক সুদীর্ঘ মুক্ত চেতনার একটি উজ্জ্বল ফসল। এ কারণেই জরুরী হয়ে ওঠে '৪৬-এর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দলিলকে তুলে ধরার—

What are the fundamental causes of the communal outbreak in Calcutta and other cities? Calcutta exhibited all that is most rotten, most diseases, putrefying and reactionary in our social and political life the appeal to religion in order to divide Indians; to revivalism in order to split the common people; to racialism in order to prove the superiority of one people over another and to perpetuate conflict among them; to commualism in order to consolidate outmoded caste and religious differences- these are the traditional weapons which exploiters use to dominate and enslave the common people···

এই একই ঘোষণার শেষ অংশে রয়েছে—

What in our eyes, is the most alarming and the serious aspect of the present situation is the fact that the leaders of our main political parties, instead of seeing through this imperialist game, are preparing to carry out this fratricidal policy. What would be more humiliating and degrading than Congress and League leaders jointly and seperately asking the British Viceroy and the British Governor to send British military force to restore peace? Is this the consumation of the great freedom movement led by Congress and League?

ভীষ্ম সাহানীর একটি উপন্যাস এবং দুটি ছোট গল্প অবলম্বনে গোবিন্দ

নিহালনীর যে দূরদর্শন চিত্র 'তমস' তার ইতিহাস খুঁজতে আমাদের ইতিহাসে হেঁটে যেতেই হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখার্জী, বিষ্ণু দে, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, কৃষাণ চন্দর, কাইফি আজমি, যশপাল, মুলকরাজ আনন্দ ইত্যাদি ৩৮জন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর সেদিনের ভাবনার যে উপরোক্ত দলিল তা ভীষ্ম সাহানী এবং গোবিন্দ নিহালনীর যৌথ উদ্যোগের পথকে চিহ্নিত করেছে এবং 'তমস' হয়ে উঠেছে মানবতার একটি মহামূল্যবান দলিল। যাঁরা নিহালনীর বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ এনেছে উপরোক্ত দলিল তাদের ইতিহাসবোধকেই প্রশ্ন করে। নাকি এটা একটি সচেতন প্রচার এবং প্রয়াস নিজেদের বিকৃত মুখকে ইতিহাসের আয়নায় নতুন করে ভেসে উঠতে দেখে অথবা সেই অন্ধকার দুঃস্বপ্নের দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনার পথে 'তমস' আলোর পথ দেখিয়ে, সেই অন্ধকারেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে? দেশভাগের পূর্ব ও পশ্চিম সীমারেখা নয়, দেশভাগের সক্রিয়শক্তিগুলিকে তুলে ধরেছেন গোবিন্দ নিহালনী এবং এই কারণেই 'তমস' ঐতিহাসিকতার শেকড় ধরে বর্তমানের শাখায় চলে আসে। অতীত ও সমকাল এক সূত্রে বাঁধা হয়ে যায়। আর এভাবেই 'পরিচয়' গোবিন্দ নিহালনীর 'তমস' এর দর্শক থাকতে পারে না, সে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে হয়ে ওঠে 'তমস'এর একটি কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ যা সাম্প্রদায়িকতার সঠিক উৎস সন্ধানে হেঁটে যায়, সম্প্রদায় নয় মানুষের স্বার্থে সম্প্রীতির জন্য লড়াই করে। ১৯৪৬-এর 'আদাব'এর লেখক সমরেশ বসু জীবনের শেষে কম্যুনিস্টদের প্রতি নানান অভিযোগ সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর ভয়ংকর দিনগুলোতে যাঁরা কিছুমাত্র সাম্প্রদায়িকতাহীন মানবিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির-ই লোক হন'।

এই মানবিক গাথার নায়ক চামার নাথুর শুয়োর মারা দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। হিন্দু-দলপতি নাথুকে দিয়ে শুয়োর মারিয়ে মসজিদের সামনে ফেলে দিয়ে আসে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত জালালবাদ শহরের গায়ে আঁচ লাগে। এই আগুনই একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তার মানুষজন এবং সম্পদকে রসদ করে নিয়ে। দীর্ঘক্ষণ ক্যামেরাকে নাথু এবং শুয়োরের ওপর ধরে রেখেছিলেন নিহালনী সামগ্রিক ফিল্মের কাঠামোয় শুয়োর মারার ঘটনাটি কেন্দ্রবিন্দু বলেই। শুয়োরটি হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক হত্যা-কাণ্ডের প্রতীক। অথবা সমস্ত বিষয়টিকে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে নাথু কিংবা সমস্ত মানুষ হয়ে ওঠে নিরীহ পশুটির মত অসহায়,

সাম্প্রদায়িক চক্রের হাতে। নাথুর হাতের যে ঢিল বা অস্ত্র তা আসলে সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র এবং সে অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় সাধারণ মানুষের হাত দিয়েই। আর সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠে অসহায় পশুটির চেয়ে অনেক বেশী অসহায়তায়। প্রাণ দেয়। আর দক্ষ যাদুকরের মত সাম্প্রদায়িক দলপতিরা পেছন থেকে অদৃশ্য হাত নাড়াচাড়া করে। এক আশ্চর্য তীর্যকতায় পরিচালক পশুটিকে একটি প্রতীক হিশাবে তুলে ধরেন ঠিক যেমন সমরেশ বসুর 'পাড়' গল্পে গর্ভবতী শুয়োরীটি পশুত্বের স্তর থেকে উঠে এসে পুরুষ ও মেয়েটির খাসিক আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং কিছুটা মানবিকতারও ভাগ পেয়ে যায়। অথবা প্রকৃতির প্রতিকূলতায় পশু এবং মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে অস্তিত্বের প্রশ্নে এবং জীবনের বহুমুখিন বিকাশ সত্বেও একতার সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। আর এই পশু ও মানুষ দুটির বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে পৌরসভা এবং সোনার মাকড়ি পরা মানুষটি। পশু ও শ্রেণী-বিভক্ত মানুষ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরে আমাদের নিয়ে যান সমরেশ। এ ভাবেই 'তমস' ফিল্মে শুয়োরটিও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে। সমস্ত ফিল্মটি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শুয়োরটির এবং নাথুর আতঙ্ক এবং আতঙ্কের সামগ্রিক চেহারার মধ্যে শুয়োর ও নাথুর আলাদা কোন চেহারা থাকে না, তা হয়ে ওঠে সমস্ত সাধারণ মানুষের আতঙ্ক।

নাথু ও নাথুর স্ত্রী কারমোর মত হাজার হাজার গৃহহারা মানুষ এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে ঝলসে যায়। সমস্ত ফিল্ম জুড়ে এই নিরীহ বিপন্ন মানুষের ভাঙাচোরা মুখ। এই অসহয়তার শিকার কংগ্রেস নেতা বক্শিজি এবং বেপরোয়া কর্মী জার্নেল সিংএর মত মানুষেরাও। আর সাম্প্রদায়িকতার আগুন যাদের হাতে তারাও কাজ করে যায় গোপনে, ছিনিমিনি খেলে মানুষের জীবন নিয়ে। গোঁড়া হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি যেমন কিশোর রণবীরকে কট্টর হিন্দু-সাম্প্রদায়িক শক্তির দোসর হিসেবে গড়ে তোলে, তেমনি শাহনাওয়াজও হিন্দু চাকরটাকে অকারণে অকস্মাৎ আঘাত করে। এই সঙ্গেই ফুঠে উঠেছে ইংরেজ শাসকের চরিত্র, আপাত নৈর্ব্যক্তিকতার পেছনে যেখানে এই ধ্বংসলীলাকে একধরণের পৃষ্টপোষকতা করা হয়। এখানেই আমরা খুঁজে পাই রাজনীতির নানা মানুষদের এবং তাদের ভাবনাচিন্তাও।

এর পরেই ঘোষিত হয় বেতারে দেশভাগের খবর। জার্নেল সিং-এর মত যারা মেনে নিতে পারেনি তাদের খুন হতে হয়। আর জ্বলন্ত শহর ছেড়ে মানুষ পালাতে থাকে। জ্বলতে থাকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাড়ি ঘর। এর মধ্যেই খুঁজে পাই সর্দারণীর মুসলমান স্কুল শিক্ষককে বাঁচানোর

প্রয়াস। ঠিক যেন ধূ ধূ মরুভূমির মাঝে এক ছোট্ট মরুদ্যান। হাজায় হাজার অসহায় মানুষের এই বাস্তুহীন, আশ্রয়হীন পথহাঁটা এবং এর মাঝে জীবন-মৃত্যুর নিষ্ঠুর খেলা আমাদের তথাকথিত মানবিকতার গৌরব এবং স্বাধীনতার আনন্দকে পরিহাস করে। এই নিষ্ঠুর পথচলার শেষে শরণার্থী শিবিরে নাথুর বৌ কারমো খুঁজে পায় স্বামীর মৃতদেহ। অন্ধকার নেমে আসে তার চোখে। এই অন্ধকারের মাঝে ফুটে ওঠে শিশুর কান্না—কারমোর পেটের বাচ্চা। এই এই ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ ছাড়া আমরা কি ই বা ভাবতে পারি।

হয়ত দেশের পশ্চিম সীমান্ত নয় কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে '৪০-এর দশকে 'পরিচয়' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা যে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন তার সঙ্গে 'তমস' এর শিল্পগত ভাবান্তরও মূলবক্তব্যে বিশেষ কোন ফারাক নেই। সেই অর্থে 'পরিচয়' 'তমস'-এর বলিষ্ঠ বিবেকও। 'পরিচয়'-এর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিরন্তর যে সংগ্রাম তা যে ব্যর্থ হয়নি, 'অদ্দাব' যে পশ্চিমবাংলার মানুষের ভাবনার গভীরে স্থান পেয়েছে তা পশ্চিমবংগ সরকারের 'তমস'এর পরিচালক, লেখক, এবং মূল দুই শিল্পীর সম্বর্দ্ধনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। এল. কে. আদবানি কিংবা সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শুনেছি উত্তেজিত এবং সেটাই স্বাভাবিক।

'তমস' দেখতে দেখতে বারবার আমাদের ফিরে যেতে হয় 'পরিচয়' এর '৪০ এর দশকে কারণ মানবিকতার পক্ষে আমাদের উজ্জ্বল ইতিহাসকে আমরা সেখানেই গভীর ভাবে খুঁজে পাই। এই '৮৮ সালে ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতা যে ভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে '৪০ এর দশকের 'পরিচয়' আমাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করুক।

একই সময়ের দুটি কবিতা

'শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজের প্রবর্তন দে'জ পাবলিশিং-এর এক সাধু উদ্যোগ, সন্দেহ নেই। সংশয়টা অন্যত্র। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র বদলে 'নির্বাচিত কবিতা' কি সৎ অর্থে আরো গ্রহণীয় হত না পাঠকমহলে? 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'? দু-মলাটের মাঝখানে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ফসলের এত অজস্র ও বিপুল সমারোহ! একটু খটকা লাগে বোধ হয়। প্রশ্ন আরো কিছু: কবিদের নিজস্ব নির্বাচনেই কি এই 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পরিকল্পনা, নাকি প্রকাশকের উদ্যমের সামিল হতে গিয়ে এই অন্তর্ভুক্তির দুর্বলতা? তাছাড়া, 'শ্রেষ্ঠ' এই সাময়িক তকমা ছাপিয়েও কি 'শ্রেষ্ঠতর' কবিতার জন্য জীবনব্যাপী এক যন্ত্রণাময় আর্তি আর অপেক্ষায় সহিষ্ণু থাকতে হয় না কোনো কবিকে? যা কিছু লেখা হয়ে উঠল তাই কি শ্রেষ্ঠ, নাকি অলিখিত আগামী কবিতাগুলোই শ্রেষ্ঠতর, অন্তত কবিতার জগতে, কবির হাতে? এরই মধ্যে আশ্বাসের কথা, সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত দুজন কবির ভূমিকা পর্বে কিন্তু তেমন ঘোষণাই মুদ্রিত হতে দেখছি। দিব্যেন্দু পালিত লিখছেন; 'যা লিখতে চেয়েছি আর যেভাবে, তা ঠিকঠাক পেরে না ওঠার অভিমান থেকেই আবার জন্ম নিয়েছে নতুন করে লেখার চেষ্টা। সেই চেষ্টা এখনো চলেছে'; আর কবিতা সিংহের বক্তব্য: 'কবির উত্তরণ কেবল একই কবিতার নব নব লিখলেই হয় না, হয় নিজেকে অতিক্রমের মধ্য দিয়ে।' তাহলে দুজনের অকপট স্বীকৃতির সূত্রে এই সিদ্ধান্তই মানতে হল যে, এই পর্যায়ে গ্রন্থস্থ তাঁদের যা কিছু কবিতা, সে সবই জীবদ্দশায় এ-যাবৎ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে চিহ্নিত ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ-সব প্রশ্ন ও সংশয়কে ছাপিয়ে অবশ্যমান্য সত্যটা হল, 'শ্রেষ্ঠ' হোক, 'নির্বাচিত' হোক, সৎপ্রয়াসী এই সিরিজের কল্যাণে আমরা কবিতাপ্রেমী পাঠকরা এক একজন প্রতিষ্ঠিত কবির চারিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, মেজাজ ও আঙ্গিককুশলতার একটা সম্যক নিটোল পরিচয় যে লাভ করছি, সে প্রাপ্তিও বড় কম নয়। এবং সেখানেই সম্ভবত এই পরিকল্পনার তাৎপর্য আর সাফল্য।

ভিড়ে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মত কবি নন দিব্যেন্দু পালিত, বরং সে-সবের

বিপরীত এক মেরুতেই তাঁর অবস্থান, সুস্থির স্থিতি। তাঁর নিজস্ব জবানীতে, 'কবিতার ভিতর-মহলে' প্রায় সুদীর্ঘ তিরিশ বছর তাঁর আনাগোনা। আর ১৯৭০-এ প্রকাশিত প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে'-র থেকে ১৯৮৬-র যে ফসল—'নির্বাসন, নয় 'নির্বাচন', কম-বেশি ষোলো-সতেরো বছরের ব্যাপ্তিতে গোটা পাঁচেক গ্রন্থের প্রকাশ,—আর যাই হোক—তাঁকে অজস্রপ্রসূ বলে চিহ্নিত করার পক্ষে সুনিশ্চিতভাবেই অপ্রতুল। কথাসাহিত্যিক হিসেবে ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার বলেও তাঁর অন্যতর একটা পরিচয় ও খ্যাতি আছে, এবং লক্ষ্যণীয়, সেখানেও তিনি বাণিজ্যিক মোহের কাছে সহজে বিক্রীত হয়ে যান নি। সাংবাদিকতা ও কথাসাহিত্যের জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও কবিতাকে এই যে তিনি একটা মিতব্যয়ী মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য : 'এক সঙ্গে চলার মধ্যেও থেকে যায় / আলাদা হবার সম্ভাবনা।' লেখেন কম, ভাবান বেশি, তাই অল্পায়তনী কবিতায় তাঁর কুশলী স্বতস্ফূর্তি বুঝি অধিকতর স্পষ্ট। পরিমিত বাকসংযমে স্থির বিশ্বাস রাখেন তিনি, স্বল্প উচ্চারণে দানা বেঁধে ওটে তাঁর অভিজ্ঞতা, সততা আর আত্মস্থ মগ্নতা,

তোমার মৃত্যু ঘিরে আমাদের জন্মদিন হয়
তুমি চলে যাও একে-একে
এতো মালা সুগন্ধের কোনোটিই স্পর্শ করো না

('তোমার মৃত্যু ঘিরে')

নিজের মধ্যে আমি দেখতে পাই
নিজের আদল। আর পারম্পর্য রেখে
স্বস্তিহীন ঘুরতে ঘুরতে
ঘুরতে ঘুরতে
এক একদিন চমকে উঠি ('অবনত বারুদ')

চতুর্দিকের কোলাহলের মধ্যে হাত বদল হতে হতে
এক-একটা দিন
ক্রমশ চলে যাচ্ছে গাঢ় অবগাহনের ভিতর।
হরিধ্বনি তেমন জোরালো নয়—
যদিও শবযাত্রীর সংখ্যা হাতে গোনা যায় না

('তোমাদের দেবার মত')

দুঃস্থ সময় ও জীবনযাপনের অবিরল কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে মেনে নিতে পারেন তিনি, এইভাবে, এবং মুহূর্তে দুর্লভ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে দেখি তাঁকে,—অতলান্ত অবচেতনের গভীরে এই ডুব দেওয়া, চমকে ওঠা নিজের দিকেই তাকিয়ে, ছুঁয়ে যাওয়া জন্মমৃত্যুর রহস্যকে।

এতগুলো কবিতা দু-মলাটের আশ্রয়ে গ্রন্থস্থ হলে বোঝা যায়, কবিতার রসদের জন্য, উপকরণ সংগ্রহে কিংবা উপজীব্য নির্মাণে কোন্ কোন্ বিষয়ভাবনা একজন কবির কাছে প্রিয়তম, কিসে আক্রান্ত হবার সুবাদে গাঢ় গভীরতা তাঁর উচ্চারণ গালায়, অনুভবে, ভঙ্গিতে; কোন্ বিশেষ শব্দে, শব্দ-অনুষঙ্গে তাঁর সহজাত দুর্বলতা? কোন্ প্রতিমায় সর্বাধিক সমর্পিত তাঁর চেতনার বিভিন্ন স্তর। সম্পর্কের ভাঙচুর, অবক্ষয়িত মূল্যবোধের বিপর্যয়, সামাজিক বিশ্বাসের কাঠামোয় চিড়-খাওয়া রদবদল ও স্মৃতি-অন্বেষণ—এসব পর্যবেক্ষণেই আবর্তিত তাঁর কবিতার বিষয়, প্রিয়তম ভাবনা, প্রতিমার প্রয়োগ: 'একটি মানুষ ধীরে / ভেঙে ভেঙে যায়' ('ভেঙে ভেঙে যায়'), কিংবা, 'এসব মানুষ আমি দেখেছি অনেকদিন দেখেছি ঘরের / ভিতরে দেয়াল উঠে চারটি দেয়াল দেয় ভেঙে' ('এ-সব মানুষ আমি দেখেছি'), অথবা, 'দূরত্ব এক-একভাবে গড়ে দেয় মানুষের সময়, শিবির—/ নিজস্ব কিংবা ফ্লাটবাড়ি' ('মানুষ')। সময়ের ব্যবধানের বদলে যাচ্ছে মানুষের কথার মানে, গৃহ মানে এখন 'স্কাইস্ক্রেপার', শান্তি প্রতিষ্ঠা মানে 'ঠাণ্ডালড়াই', মৃত্যু আর মৃত্যুর অভিনয়ে পার্থক্য বোঝার শ্রেষ্ঠ জায়গা এখন 'মর্গ', নিজের মুখের রূপান্তরে সবচেয়ে বিস্মিত আজ মানুষ। দিব্যেন্দুর উপন্যাসগুলোর দিকে চোখ ফেরালে বোঝা যায় (নামগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে: 'ঘরবাড়ি', 'অহংকার' 'সন্ধিক্ষণ', 'সম্পর্ক', 'সহযোদ্ধা' ইত্যাদি), বিপর্যস্ত মানবিক মূল্যবোধের আর্তনাদ সেখানেও। এবং নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে ছুঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে, ঠিক এই কারণেই তাঁর কবিতায় পরিপ্রেক্ষিতের আড়ালে কেন বারে বারে উচ্চারিত হয় কিছু প্রিয় শব্দগুচ্ছ,—'দেয়াল', 'ঘর', 'বাড়ি', 'ধুলো', 'সুখ' আর 'দুঃখ'—প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবনযাপনের অনিবার্য অনেক আলেখ্য,

'দেয়ালের প্রতি এতো ভালোবাসা কখনো ছিল না' —'কে!'
'অনেক উঁচুতে উঠে আমরা ঘরের গল্প করি' —'কোঅপারেটিভ'
'একটি একাকী লোক বাড়ি যায়—
বাড়ি যেতে যেতে
বাড়ি বিষয়ক তার সমস্ত ভাবনা

খুঁটে খায়' —'বাড়ি'

'শিশুর আদুর গায়ে বহুরূপী ভবিষ্যের ধুলো !' —হঠাৎ একেকদিন';

'যদি দুখ হয় তাকে একা রেখো বুকে।
যদি সুখ হয় তার সুগন্ধ ছড়িয়ে দিও—যেন
বেড়াতে এসেছো একা ভোরবেলা অচেনা বাগানে'

—উড়োচিঠি'.

সংবেদনী গভীরতায় উত্তীর্ণ কিছু কবিতায় চোখ আটকে যায়। 'ব্যক্তিগত', 'পরীক্ষা', 'এইভাবে', 'তোমার চোখের জল', 'আটটি অসুখী লোক', 'ফুটবল', 'ভারতবর্ষ', 'মনে রেখো', 'আর যখন কেউ', 'রোগিনী যা পায়'—ইত্যাদি কবিতাবলী আপাতসরল প্রকাশপদ্ধতি পেছনে ফেলে মনবিন্যাসে সুঠাম শোভন হয়ে ওঠে, মিতবাক উপলব্ধিতে গাঢ় হয়ে উঠে এই সত্য জ্ঞাপন করে যে, এই কবি শব্দের নিজস্ব প্রয়োগে অব্যর্থ, অনুভবে ও চিত্রকল্পে অমোঘ। এবং উপলক্ষ্যবিশেষে একই যাত্রায় মিল ও ছন্দমনস্ক হলেও তিনি কতখানি নির্ভুল-ভাবে সার্থক, সে পরিচয়ও মুদ্রিত আছে সংকলনের অজস্র কবিতায়, যার মধ্যে উচ্চারণীয় অন্তত তিনটি দৃষ্টান্ত—'প্রত্যাবর্তন', 'রোদ্দুরই সব ঘাম শুষে নেয়' ও 'কোনো তরুণ কবিকে'।

অনুচ্চকণ্ঠ দিব্যেন্দু পালিতের পাশে কবিতা সিংহের কবিতার জগত নিঃসন্দেহ কিছুটা উচ্চবাক, শব্দবহুল, আড়ম্বরে-আভরণে সজ্জিত। দিব্যেন্দুর মত তিনিও উপন্যাস ও ছোটগল্পের কুশলী শিল্পী, কবিতার মাধ্যম ছাড়াও সাহিত্যের অন্য দু-চারটে শাখায় তাঁর সব্যসাচিতার সাক্ষী হতে পেরেছি আমরা এ-যাবৎ। এবং অনায়াসে এ-সত্যের উন্মোচন ঘটেছে আমাদের কাছে যে, নারীর স্বকীয় চেতনা ও অনুভবকে সাম্প্রতিক পটপ্রেক্ষায় ও সামাজিক বিন্যাসে বড় আশ্চর্য নিপুণতায় তিনি মুদ্রিত করতে চেয়েছেন, তাঁর কথাসাহিত্যে যেমন, তাঁর কবিতার শরীরেও তেমনি। সর্বাংশে সবসময়ে যে সফল হয়েছেন, তা হয়ত নয়, তবে আন্তরিকতার মূলধনও এখানে প্রণিধানযোগ্য : 'এতদিন তার,—চোখের কোটরে শুধু গাঢ় ভয় ছিল / বড় অন্ধ, অসহায় ভয় / গভীর সন্ত্রাস ছিল সংকোচ বেদনা / নিজের আজন্ম পাপ জন্ম অস্পৃশ্যতা···' ('ভাঙা রমণীর ক্রোধে')। তার এই সমাজবোধ থেকে উৎপন্ন নারীচেতনার মধ্যে আলাদা এক মাত্রা যুক্ত হতে দেখছি যখন তা একাত্ম হয়ে যাচ্ছে নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে। অনিবার্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের উদ্ধার সম্ভবত আমার বক্তব্যের পক্ষে সহায়ক হবে,

১. কার্তিক ঋতুর নাম, শীত এক ঋতুমতী নারী ! —শুদ্ধ অস্পৃশ্যতা
২. শরীরে ভেঙেছে শীত বোঁটা-ভাঙা বাসনা-নির্বাস —শীত
৩ সূর্যাস্তেরও পরে, হিমরাত্রে নারী জ্বলে সে গূঢ় উৎসারে —সূর্যস্পর্শ্যা
৪. সেই থেকে, সেই ক্ষণপ্রভার জন্য অপেক্ষা
কখন বালিকা হয়ে এসে
সে আমার বেড়া বেঁধে দেবে ! —ক্ষণপ্রভার জন্য অপেক্ষা
৫ তুমি
মৃত্তিকার রমণীশরীর নেমে যাও
জলের ভিতরে —জলের পুতুল
৬. বৃষ্টি আমাকে ঘেরো
আঁধারের ঘনিষ্ঠ আদলে ঘেরো
গর্ভে রক্ষা করো, যেন ভ্রূণাকারে পেয়েছ আমাকে
—বৃষ্টি আমাকে ঘিরে থাকো

এইসব নজিরের পাশাপাশি কবিতা সিংহের কবিতা পাঠের মুহূর্তে অন্যতর জিজ্ঞাসাও উঁকি দেয় সংবেদী পাঠকের মনে। শব্দের মাত্রাজ্ঞানে বেপরোয়া মানসিকতা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু বেসামাল নাটকীয়তা ও পুরনোপন্থী ভঙ্গিমা কি কখনো কখনো কবিতার সংবেদনায় ক্ষতের সৃষ্টি করে না ? পূর্বে উদ্ধৃত 'ভাঙা রমণীর ক্রোধ'-র ঠিক পরবর্তী কবিতা ('পৃথিবী দেখে না') থেকেই উদ্ধার করছি কিছু পঙ্‌ক্তি, যা সম্ভবত ঠিক এই প্রশ্নের মুখোমুখিই দাঁড় করিয়ে দেবে তাঁর পাঠককে ; 'যে ভাবে অনন্তকাল হাসে বৃহন্নলা / যে ভাবে রমণীসমা ছুঁড়ে দাও কৌতুকের মত / ঘোরতর পরিহাস ক্রূর দিব্যছলা / ভেঙে দাও সভ্যতাকে মাড়াও ব্যবসা, ওরা / তোমার বিধ্বংসী তেজ বাণিজ্য বোঝে না / গঠনের মধ্যে চুর ভাঙনের সংকেত বোঝে না / নিজের ভিতরে তুমি একা কাঁদো / বড় অশ্রুহীন ; ইত্যাদি। যুগপৎ প্রশ্ন হল, উদ্ধৃত সমাপ্তিক ছত্রে অর্থবহ বাঙময়তা সঞ্চারে যাঁর এতটা সামর্থ্য, তিনি কেন অতিরিক্ত শব্দের স্রোতে অকারণে ভেসে যাবেন ঠিক এর আগের মুহূর্তেই, এবং এই এতখানি কৃত্রিমতাসর্বস্ব রীতির জোয়ারে ? শব্দশাসনে কবিতা কোন্ স্তরে উন্নীত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত কুড়িয়ে পাচ্ছি আবার এই কবিরই দক্ষ হাতে, প্রয়াত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিবেদিত একটি স্মরণ কবিতায় : 'তাঁর বুকে এ কোনো নতুন যন্ত্রণা নয় / জন্মতিল জড়ুল মুদ্রাদোষের মত / এ-তো আজন্ম / কবি এখন একে বুকে করেই বাড়ি ফিরবেন / যেমন এসেছিলেন ('কবির অসুখ')। চিত্রকল্পের

কি অব্যর্থ অবতারণা, গদ্যের চালে কি অপূর্ব জীবন্ত কবিতা। এই অদ্ভুত স্ব-বিরোধিতাই কি তবে কবিতা সিংহের পরিচয়পত্র? না হলে শব্দবাহুল্যে ঝংকৃত প্রগল্‌ভ কিছু উচ্চারণের পাশাপাশিই তিনি কেমন করে পেশ করতে পারেন খণ্ড অনুভবের এমন সব স্থির চিত্রমালা—'রোদ্দুরে কেবল আজ রোদ্দুর রয়েছে,' 'বাতাসে একেলা যায় গর্জনের বীজ', 'একা, এই শব্দটির ঘোর উচ্চারণ', 'দুঃখ কি সেলাই ফ্রেমে অশ্রুর কারুকাজ শুধু?' 'অস্ত যাবার আগে ডেকে দেয় আর এক সূর্যকে!' 'আমার অহংকারে আমি একা', 'নিজেকে দেখাবে যদি দৃশ্যের মতন এক দৃশ্য হয়ে যাও।' উপলক্ষ্যবিশেষে ছন্দ-মিলের দক্ষতায় তিনি কতটা কুশলী, সেজন্য অন্তত তিনটি কবিতা—'এই তো এলাম', 'সে' এবং 'একল্য আছি'—উল্লেখের দাবি রাখে। 'অতর্কিতে'-র সঙ্গে 'সমর্পিতে'-র মিল কিংবা 'অনাসক্তি'-র সঙ্গে চত্তির'-এর, প্রয়োগ-মুন্সিয়ানায় চমৎকার উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

তিনটি কবিতাগ্রন্থ ও একটি প্রস্তাবিত

কাব্যগ্রন্থের শেষে সংযোজিত তাঁর দুটি কাব্যনাটক—'পৃথিবীর পুরোনো গল্প' ও 'দুজনে মিলে কবিতা'—গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, সন্দেহ নেই; এবং বলা যায়, এই বিরল মাধ্যমটিতেই যেন তিনি সহজতর, স্বমেজাজে স্বাভাবিক। আর 'হরিনাবৈরী'-র শেষ চারটি কবিতায় বড় ঐকান্তিক আন্তরিকতায় তিনি জীবন্ত করে রেখে গেলেন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের চার ব্যক্তিত্বকে, যাঁরা হলেন দেবব্রত বিশ্বাস, কেয়া চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী ও রাজলক্ষ্মী দেবী।

আমাদের কবিতাগ্রন্থের জগতে প্রচ্ছদশিল্পে পূর্ণেন্দু পত্রী একটি অপ্রতিরোধ্য, অবিরল নাম। এই দুটি গ্রন্থেও তাঁর শৈল্পিক ভাবনা অব্যাহত। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য এদের মুদ্রণসৌকর্য ও পরিকল্পনা-পারিপাট্য।

দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা—দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮৭। কুড়ি টাকা।

কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা—দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮৮। কুড়ি টাকা।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দুই তরুণের গল্প

বাংলা ছোটগল্প-সাম্রাজ্যে আশির দশকে, এ যাবৎ যারা পাদপ্রদীপে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও কিন্নর রায় উল্লেখের দাবি রাখেন, কিছু স্বকীয় ভাবনায়, উপস্থাপনায় ও আঙ্গিকের জোরেই।

উল্লেখিত গ্রন্থ দুইটি, সভাব, স্ব স্ব লেখকের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম গল্প- সংকলন।

ঝড়েশ্বরের গল্পে নিম্নবঙ্গের অপ্রত্যন্ত অঞ্চল—ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা ওপারে হলদিয়া জুড়ে নদী পারঘাটা হাট মাঠ ময়দান সমুদ্র গঞ্জের খ-ণ্ডবিখণ্ড জীবন আশ্রয় পায়। পণ্য-প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের চোয়ানো প্রভাবে গ্রামীণ জীবনেরও যে কিছু বদল ঘটছে, অপ্রকট শ্লথ হলেও, সে সবই তাঁর গল্পের বিষয় হলেও, সে সবই তাঁর গল্পের বিষয় সম্পাতে ধরা পড়ে।

সমুদ্রে মেশিন বোট নামে, নৌকা ডিঙির সাহায্যে মাছ মারার সাবেক প্রথা অচল হয়ে যায়। যতীন বেকার। 'মেশিন বোট তো সব মাছ ছেঁচে নিচ্ছে, ডিঙি তো পাত্তা পাইছেনি। কত আর পাল্লা দিবে?' কালচক্রের ছোবলে পরাস্ত যতীনের আয়ত্তে ইঙ্গিত সমস্যা ধরা দেয় না। সমস্যা নীতি স্থখ? '…কালো চেহারার গোলগাল সন্ধ্যা। লালচে ছাপা সাড়িতে লাল ব্লাউজ।…পুরুষ্টু শরীর। বুক ঝাঁপিয়ে যৌবন।' ('খড় কুটো)

অথবা 'লিঙ্করোড' গল্পটি—ফেরিঘাটে খেয়া পার করা লতিফ। কিন্তু লঞ্চ চালু হওয়ায় নৌকায় 'সারাদিনে কেউ ওপারের প্যাসেঞ্জার নেই। সব গিলে নিচ্ছে পাশের লঞ্চটা…'

লতিফ নৌকা হাত বদল করে চলে আসে ফলতা ফ্রি ট্রেড জোনে। সেখানে নাকি 'যাওয়ায় টাকা উড়তেছে'। কিন্তু সেখানে এসে দেখে 'কোথায় তোমার টাকা? তার আবার ওড়াওড়ি। এতো দেখি গেরামের লোকের সঙ্গে কামড়া কামড়ি।' কন্ট্রাক্টর ঘোষ বাবুর কাছে কাজের প্রার্থনা জানালে ঘোষ বাবু খেঁকিয়ে ওঠেন, আমি কি ফ্রি ট্রেড জোনের বড় কর্তা?'

অবশেষে লতিফ কামড়াকামড়িতে যোগ দেয়। গ্রামের মানুষদের উস্কে দিয়ে নিজের স্বার্থ কায়েম করে। ঘোষ বাবু বাধ্য হয়ে অবৈধ যুক্তিতে আসেন লতিফের সঙ্গে—'ঘোষ বাবু কাঁধে হাত রেখে বলল, কাজ করে কি পাবে? টাকা? আমি দিয়ে দিচ্ছি…স শাচেক নিয়ে বাচ্চাকাচ্চা খাওয়াও। গোলমালটা থামাও।'

মাঝি লতিফ এভাবে রূপান্তরিত হয় ফেরেববাজে।

অনেক সময় টান টান সংযমী বাক্য বিন্যাসে পরিবেশ রচনায় মগ্ন, যখন ঘটনার উতোর চাপানে পাঠককে মোহগ্রস্ত করার কৌশল নেই, এমন কি গল্পের চরিত্র যখন গৌণ। বিবরণকে গল্পের খাঁচায় বাঁধার জন্য যে কয়টা নারী-পুরুষ একান্ত না তুলে আনলে নয়, সে কয়টাই তিনি আনেন। তার বিবরণের পথ বেয়ে পাঠক পৌঁছে যায় এক ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিবেশের অন্তর্গতে। এমন একটি গল্প 'পাতালের মুখ'।

এ গল্পে অর্জুনের চোখে রুখা শুখা ঝলসা খরাগ্রস্ত একটা গাঁ-প্রান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুনের পিপাসা মেটানোর কাতরতা—'তৃষ্ণার্ত অর্জুনের পিপাসাটা তীব্র লয়ে ওঠে। রোদ্দুরে পুয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম কপালে। চিক-চিকিয়ে টল টল করে। আঙুলে ঘাম মুছেই চমকে ওঠে।—ইস এতখানি জল নষ্ট করলুম! জিবে দিলেই হত!...একটু টান টান দাঁড়ায় অর্জুন। রদ্দুরে ঝলসে আরো কয়েক ফোঁটা ঘামের জন্য।'

খরায় পোড়া প্রকৃতির একটা বিশ্বাসযোগ্য চিত্র উঠে আসে এ গল্পে।

'যাত্রীনিবাস' গল্পে জিতেন্দ্র মঠের তরুণ 'বাবাজী' সমাজ-সংস্কারের প্রতি আপাতনিস্পৃহ দিবোদাসের দৃষ্টিতে লেখক গাঁ-গঞ্জ পারঘাটা পান্থনিবাস দেবাশ্রয়ে নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট যে জীবনের ধারাপ্রবাহ, তারই কিছু টুকরো টুকরো চিত্র সংযোজনে একটি নিটোল গল্প গাঁথেন।

ঝড়েশ্বরের গল্পের একটা বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর গল্পের বিষয় আমাদের চেনা-জানা পারিপার্শ্বের মধ্যে বিচরণ করতে করতে পাঠকের মনে এক রকম অনুভূতি আখর টেনে দিতে পারে। উপমাটা অনেকটা অন্ধকার আকাশ পটে নিঃশব্দে তারা খসার শুভ্র দাগের মতোই। সমারোহহীন অথচ স্পষ্ট, যা অনুভবের মূলে নাড়া দিতে সমর্থ হয়।

২.

কিন্নর রায়ের গল্প সংকলনের প্রথম তিনটি গল্প ভারতের বিশাল হিন্দী ভাষা অঞ্চলে সনাতন জাতপাত প্রথা ভিত্তিক শোষণ ও বঞ্চনার পটভূমিতে। নিম্নবর্গী হীনমন্য হরিজন, চামার, দোসাদ, ধোবিয়া হচ্ছে আধুনিক 'গণতন্ত্র' নামক রাষ্ট্রীয় অন্তকাঠামোয় ভূমিকাবিহীন ঠুঁটো পুতুল। 'তারা ভারতবর্ষের এই বিশাল রাজনৈতিক দাবার ছকে বড়ে মাত্র'।

গল্প তিনটি হল: 'রথযাত্রা', 'ভোজ' ও 'পরচারক'।

'ভোজ' গল্পে দ্বারভাঙ্গা জেলার সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে দেশজ নিয়ম-

বিধি এবং পঙক্তি ভোজে জাতভিত্তিক মর্যাদাদানের খুঁটিনাটি বিবরণ বাড়তি মাত্রা দিয়েছে।

'জমিদার ধনিকলাল মিশ্রর মা মারা গেছে সত্তর বছরে। আজ তার শরাধ্‌—শ্রাদ্ধ।···আট গামছা—আট গাঁওয়ের মানুষ নেমন্তন্ন পেয়েছে শ্রাদ্ধে।'

চামারটৌলি ও নিম্নবর্গীয় পাড়ায় নিমন্ত্রণ করার রেওয়াজ এরকম—'টৌলির বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডেকে নাও সরপঞ্চ বা মুখিয়াকে। তারপর তাকেই বলে দেওয়া—তোরা যাবি, ফলনা দিন, ফলনা বাবুর বাড়ির ভোজ।'

এমন তুচ্ছ তাচ্ছিলো নিমন্ত্রণও মহার্ঘজ্ঞানে রক্ষা করতে যায় চামার টৌলির মোতি রাম, ছেলে মালখন, মেয়ে লালপরী।

ভোজে প্রথম খেতে বসে 'বামহনরা', তারপর ঠাকুর—ছত্রীরা, তারপর আহীররা, সব শেষে ডাক পড়ে 'অচ্ছুতিয়া'—চামার হরিজনদের। খাবারের আয়োজন অপরিমেয় অঢেল—'পুরি কচৌরি সবজি বুনিয়ার লাড্ডু খাজা··· ভুখা নাঙা মানুষেরা বহুদিন এমন খাবার পায় নি।' সকলে খায় পেটপুরে। 'এরপরই শুরু হয় সেই পুরনো খেলা'। মালিক ধনিকলাল পয়সার থলি নিয়ে গোগ্রাসী মানুষগুলোর সামনে ঘুরে বেড়ায় আর বলে, 'এক কচৌরি এক চৌআন্নি'। অর্থাৎ বাড়তি একটা কচুরি খেলে হাতে হাতে নগদ চারআনা প্রাপ্তি। দাম ওঠে পঞ্চাশ পয়সায়—একটা লাড্ডু দু-টাকায়।

'গরিব গুরিয়া' মানুষগুলো রাজকীয় খাবার আর পয়সার লোভে যেন বাহুগ্রাসে সমচ্ছরের খাওয়া পেটে পুরে নিতে চায়। ষাট বছরের মোতিও। 'গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পথে জনতিনেক মানুষ রাস্তায় পড়েও মারা যায়।' মারা যায় মোতিও।

'ভোরবেলা ধনিকলাল ঘুম থেকে উঠে খবর পায় তিনজন চামার ও একটি দোসাদ ভোজ খেয়ে মারা গেছে। তার মুখে হাসি ফোটে না। মনে পড়ে, ওর ঠাকুমার শ্রাদ্ধে পয়সা নিয়ে খেতে খেতে এগারজন মানুষ প্রায় পাতের ওপরই বমি করতে করতে মারা গেছিল। সেখানে আট গামমা ভোজে মাত্র চারজনের মৃত্যু···'

গল্পটা এখানেই শেষ হওয়া, আমার মনে হয়, বাঞ্ছনীয় ছিল। বাড়তি একটা অনুচ্ছেদ এবং গল্পের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দল, এম এল এ ইত্যাদি টুকরো প্রসঙ্গ না আনলেও চলত, যা মনে হয় বিষয়বাহুল্য, এবং যা হয়ত বা গল্পের ধ্রুপদী মেজাজ অংশত ব্যাহত করেছে। সমকালীনতার মিশেল দেওয়ার জন্যই যদি এসব আনা হয়ে থাকে, তাহলেও বলতে হয়, উল্লেখিত প্রসঙ্গ বাদ

দিয়েও গল্পটি অবহেলিত মানবতার প্রতি বঞ্চনার চিরায়ত সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যেতে পারত (প্রেমচন্দ-র 'কাফন' স্মরণে রেখেই)।

কিন্নর রায়ের এটি পাঠক মনকে ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো একটি গল্প।

'কিচ্ছু সংশয়' গল্পে সাসপেকটেড রেক্টাল ক্যানসারের রোগী; প্রৌঢ়, দৈনিক বাংলা কাগজের হোমরা চোমরা উমানাথের নস্টালজিয়ার শৈশব, কমিউনিস্ট সংস্রব, দেশের বাড়ি, বিষয়মুখীন সাংবাসিকতা, রাজনীতি দেশ-বহির্দেশ···। উমানাথের অনুস্মৃতি'-তে নানা বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপন। উমানাথের ভাবনার প্রসারতা বহু ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ত, যা গল্পের বুনন অংশত শিথিল করে দেয় না কি ?

'চক্রব্যূহ' গল্পে গায়ত্রীর মাতৃস্নেহের কেন্দ্রিকতায় কিন্নর সমসময়কে ধরতে সচেষ্ট। এ গল্পে স্বদেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক বেদনাদায়ক অথচ নিষ্ফল আত্মজিজ্ঞাসা, চালানি সংস্কৃতির প্রভাবে বিনষ্ট সমাজ, প্রশাসনিক ক্লীবত্বের নিপুণ চিত্রণ।

কিন্নর রায়ের গল্পের একটি দুর্বলতা, আমার নগণ্য উপলব্ধিতে যা মনে হয়েছে (অবশ্যই পাঠক হিসাবে), তা হল, তাঁর গল্পের বিষয়গত উপাদানের বাড়তি উপস্থাপন অনেক সময় গল্পের কাঠামো নড়বড়ে করে দিয়েছে। গল্পের বাঁধুনি হয়ে পড়েছে শিথিল। অথচ তাঁর গল্পের বিষয়গত উপাদানে নতুনতর ভাবনা ও দিক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে আরো সংযম আশা করা যায় নাকি ?

ঝড়েশ্বরের ও কিন্নর উভয়েই তাঁদের গল্পে কিছু উপমাশ্রয়ী বা রূপকল্পিত বাক্যের ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'দৈত্যের মতো একখানা হেভি রোলার, ফেলা মাটিতে গুট গুট করে হাঁটছে আট-ন মেসে পোয়াক্তির গতরে' (ঝড়েশ্বর : 'লিঙ্ক রোডা'); 'গাড়ির কাচে রোদমাখা ছায়া, অফসেটে ছাপা ছবি হয়ে ফুটে থাকে' (কিন্নর : 'আমি তুমি আমরা'); 'ভাতের পাতলা ফ্যানের মতো ভোরের আলো' (ঝড়েশ্বর : 'কাঠকুটো'); 'কিছু অর্থের বিনিময়ে জলদানের পুণ্য জমা হয় স্বর্গযাত্রার রেকারিং অ্যাকাউন্টে (কিন্নর : ছবির উল্টো দিকে') ইত্যাদি।

এই ধরনের বাক্য বিন্যাস গদ্য চর্চার একটি অংশ, এবং তা গল্পের ভাবব্যঞ্জনা গভীরতর করে।

সোমনাথ ঘোষ কৃত কিন্নর রায়ের গল্প সংকলনের প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন।

যাত্রীনিবাস : ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সংবাদ। ৫৭/২ ডি, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭৩। ১৫ টাকা

রথযাত্রা : কিন্নর রায়। প্রমা প্রকাশনী ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ কলকাতা ১৭। ১৪ টাকা

কেশব দাশ

একটি সংকলন, সমগ্রতার বোধে দীপ্ত

এতদিনের ইতঃস্তত ছড়ানো ছেটানো, বিক্ষিপ্ত চেহারাটার জায়গায়, আমাদের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন যখন একটা ঐক্যবদ্ধ, সর্বভারতীয় চেহারা নিতে শুরু করল, সেই শুরুর দিনে ১৯৩৬-এ, লখনৌ হয়ে উঠেছিল সমাজের নানা অংশের মুক্তিকামী মানুষের, অখণ্ড ভারতবর্ষের, আক্ষরিক অর্থেই এক সম্মিলনস্থল বা অভ্যর্থনানগরী। প্রগতি লেখক সংঘ বা ছাত্র ফেডারেশন, যে কোনও সংগঠনের, ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালেই, লখনৌ, এক অপরিহার্য উচ্চারণে পরিণত হয়েছে গত বাহান্ন বছর ধরে। যে কোনও ফিরে দেখাতেই এমন অপরিহার্যতা অর্জন করে নেওয়ায়, আমাদের মত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের লখনৌ-এর প্রতি একটা আগ্রহ ও দুর্বলতা থেকেই যায়। সেই দুর্বলতা যতটা ব্যক্তিগত, ততটাই ইতিহাসগত। কারণ, লখনৌ আমাদের কাছে পরিচিত এক ভিন্ন ইতিহাসের সূত্রে, যে-ইতিহাস এমন এক সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলনের, একমাত্র যে-সমাজে ব্যক্তির প্রকৃত মুক্তি সম্ভবপর। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্বর্ণজয়ন্তীতে, বছরদুয়েক আগে, আমাদেরই ঘনিষ্ঠ কোনও কোনও ছাত্রবন্ধু বা সাহিত্যকর্মী লখনৌ যেতে পেরেছিলেন, সর্বভারতীয় সম্মিলনের উপলক্ষে। ফলে, নতুন ভারত রচনার আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে লখনৌ-এর এক নিরবচ্ছিন্ন যোগ, অনস্বীকার্য, থেকে যায়।

আন্দোলনের নানান স্তর পেরিয়ে এসে, ভুলভ্রান্তি সাফল্য ব্যর্থতাকে ডিঙিয়ে আন্দোলনকে আবার সংহত করে তুলতে চাই যাঁরা, বর্তমানকে বানিয়ে তুলতে চাই পরিবর্তমান, কর্মে ও ভাবনায়, সংগঠনে, তাঁদের শুধু বর্তমানকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না বলেই আমাদেরই এক সংঘবদ্ধ নিরুপায় সাধ হয় ইতিহাসের কাছে নতজানু হবার। কিম্বা, ইতিহাস-ই আমাদের তার কাছে নতজানু করে তোলে। ছিয়াশিতে, নানা দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ওই যে লখনৌতে সমাবেশ গড়ে তোলা, সেও তেমনই এক উপলক্ষ।

এতকথা মনের মধ্যে এল, লখনৌ-এর বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির আয়োজনে যে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা, সাতাশিতে, তার রজতজয়ন্তী বর্ষে দিলীপ বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত, 'নাট্যোৎসব রজতজয়ন্তী সংকলন'টি হাতে নিয়ে। সংস্কৃতি আন্দোলন, বিশেষ করে নাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রবাসী সংগঠক ও ব্যক্তিত্ব হিসেবে দিলীপ বিশ্বাসের

দীর্ঘদিনের পরিচিতি আছে। তাঁর সংস্কৃতি চর্চাও দীর্ঘদিনের। অভিজ্ঞতার সেই দৈর্ঘ্য থেকে, এরকম এক উপলক্ষে, একটি সংকলন বার করার মধ্যে নতুন কোনও কৃতিত্ব নেই। কিন্তু দিলীপবাবু তাঁর এই সংকলনটিতে এই পর্যায়ের সমস্ত সংকলনের মান ও গুরুত্বকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছেন। এবং তা লক্ষনৌতে বসেই। তাঁর সেই প্রশ্নাতীত অতিক্রমণ ও নতুন এক নিরিখ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে, অসামান্য ইতিহাসবোধ ও সামাজিক-নান্দনিক দায়বোধের কারণে। সম্পাদকীয় অংশে তিনি জানিয়েছেন যে, প্রতি বছরই নাট্যোৎসব উপলক্ষে কিছু নাট্যরচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এবারের পরিকল্পনা স্বতন্ত্র। এবারে সমকালীন লেখকদের রচনার বদলে কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনাকে প্রকাশের জন্য বেছে নিয়েছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে চল্লিশের দশকে নাট্যক্ষেত্রে যে ধারার সূচনা হয়েছিল, বিচিত্র চিন্তাসংঘাত ও পরিবর্তন পরিণতির মধ্য দিয়ে সেদিনের নাট্যভাবনা প্রবাহিত হয়েছিল, সেই সময়ের স্পষ্ট দাগ ও জীবন্ত রূপকে পাঠকদের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই রচনাগুলির সংকলনপ্রয়াস বলে দিলীপবাবু জানান। সবকটি রচনাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭—স্বাধীনতাপরবর্তী প্রথম দশকে নতুন সাহিত্য, পরিচয়, চতুরঙ্গ, নাট্য-লোক, গণনাট্য, পাদপ্রদীপ ও বহুরূপী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সংস্কৃতি আন্দোলনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কারণেই দিলীপ বিশ্বাসের কাছে সংস্কৃতির নানামুখী দায়পালন, সাফল্য-ব্যর্থতা সমগ্রতায় বিচার্য হয়ে উঠেছে। চল্লিশের দশকে নাট্যধারায় যে নতুনত্বের শুরু, সেই উন্মাদনার কালের স্বল্পস্থায়িত্ব যে শিল্প ও সমাজসংগঠনের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতার নিরিখে স্বাভাবিক ছিল, এটা তাঁর অভিজ্ঞতার নির্যাস। পাশাপাশি, এটাও তাঁর উপলব্ধি যে, কোনো পরি-স্থিতির ব্যাখ্যা একটি মাত্র উপাদানের ভেতর খুঁজে বেড়ানো অবৈজ্ঞানিক। এই সামগ্রিকতার বোধ থেকেই তিনি নির্বাচন করতে পারেন এই রজত-জয়ন্তী সংকলনের কিছু রচনা, আর্থিক প্রতিকূলতা ও স্থান-অকুলানের সমস্যা কাটিয়ে যে কটিকে তিনি শেষ অবধি ছাপিয়ে উঠতে পারেন। এই সংকলনটি হাতে নিয়ে এক স্থির, অনুসন্ধিৎসু ইতিহাসবোধ টের পাওয়া যায়, যা অবশ্যই প্রচ্ছন্ন। সেই ইতিহাসবোধ থেকেই একটি নাট্যরচনার সংকলন গড়ে তোলার অবকাশে তিনি পুরনো পত্রপত্রিকার পাতা থেকে খুঁটে আনেন এমন একটি রচনা, যার প্রাসঙ্গিকতা এই সংকলনে প্রতিষ্ঠিত হয় সময় ও বোধসাপেক্ষ অথচ নান্দনিক সমগ্রতা বোধের মাত্রায়। সূচীপত্র ধরেই উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত', সলিল চৌধুরীর 'সুর-সৃষ্টি সম্পর্কে'

ঋত্বিক ঘটকের 'আমাদের দৃষ্টিতে বাস্তববাদী ধারা', হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'উদয়শঙ্কর', চিদানন্দ দাশগুপ্তের 'পথের পাঁচালী'-র মত রচনা জায়গা পেয়েছে নাট্যজগতের দিকপালদের এমন সমস্ত রচনার পাশে যাতে স্পষ্টতই বুঝে নেওয়া সম্ভব হয় যে সংকলনটির উদ্দেশ্য কেবল নাট্যভাবনার বিবর্তন-পরিবর্তনকেই তুলে ধরা নয়, আরও অনেক বেশি কিছু। কারণ, এমন একটি কালপর্ব থেকে রচনাগুলো সংকলিত যখন আমাদের সংস্কৃতিতে এক নতুন বাতাবরণ, নতুন জোয়ার, আমাদের এতকালের সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে ভিন্নমাত্রিক সংযোজন ও সম্প্রসারণের কাল, আমাদের ছায়াছবির ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বনের যুগের শুরু। মানুষকে তার শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ইওরোপনিরপেক্ষতায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টার শুরু, মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে মুক্তিদানের সময়পর্ব। নন্দনের সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে এই যে জোয়ার, সৃজনকর্মের এক অসম্ভব অনুপ্রেরণা হিসেবে যে দর্শণ এবরের অন্তরালে ক্রিয়াশীল থেকেছে সেই দশকে, সেই দর্শণের সমগ্রতা, সমগ্রতার দর্শণ দিয়েই দিলীপবাবু গড়ে তুলতে চেয়েছেন সংকলিত রচনাসমূহের ভেতরকার নিহিত ঐক্যসূত্রটি। ফলে এ কোনও দুষ্প্রাপ্য লেখাসমূহের সংকলিত পুনর্মুদ্রণ নয়, সমগ্রতার বোধদীপ্ত এক অনবদ্য সংকলন। যার সূত্রে আমরা সেই সময়কার সংস্কৃতির নানাবিধ মত মতান্তরের নাগাল পেয়ে যাই অনায়াসে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের মত অথবা রক্তকরবী বিষয়ে উৎপল দত্তের মত, কত সহজে আমাদের কাছে দু'মলাটের ভেতর উপহার দেন দিলীপবাবু। একদিকে তন্নিষ্ঠ গবেষক, আন্দোলনের ইতিহাসের ওপর পলকহীন পর্যবেক্ষক অন্যদিকে দায়বদ্ধ নন্দনকর্মী, এই দুই সত্তার মিলনেই এই সংকলনের সম্পাদনাকর্মটি এত দূরদর্শী হয়ে উঠতে পেরেছে। তুলসী লাহিড়ীর 'গণনাট্য ও যাত্রাভিনয়'-এর মত রচনাও যাঁর কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, তাঁর কাছেই তো শিক্ষণীয়, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যেকার নিহিত যোগ ও জটিলতা। প্রতিটি রচনাই ফিরে দেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতেই এই সংকলন তাতে তুলে নেওয়া উচিত সকলের, পরম মমতায় ও শ্রদ্ধায়। 'নাটোৎসবে'-এর রজতজয়ন্তীর মত তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সংকলনকেও ইতিহাসের সাথে জুড়ে দেওয়া যায়, দিলীপ বিশ্বাসের সম্পাদিত সংকলনটি হাতে না এলে তা অবিশ্বাস্য মনে হত। 'নাট্যোৎসব'-এর সার্থকতা সেখানেই, সেকথা ভাবতে পারে। অনেক ভাবনার ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দিতে পারে, সঠিকের দিকে নিয়ে যেতে চাইতে পারে। এমন সংকলন-ই দৃষ্টান্ত। সংকলনটির বহুলপ্রচার কামনা করা ছাড়া হায়, আমাদেরও অক্ষম অস্তিত্ব। এবং সে প্রচার, আমাদেরই সকলের স্বার্থে।

নাট্যোৎসব। রজতজয়ন্তী সংকলন। বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি, লখনৌ। অক্টোবর-ডিসেম্বর, সাতাশি। সম্পাদনা : দিলীপ বিশ্বাস। ছয় টাকা।

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

সমরেশ বসু

গত ১৩ মার্চ বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান লেখক সমরেশ বসু প্রয়াত হয়েছেন।

ঢাকার রাজনগরে ১৯২৪-এর ১১ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। স্কুলে পড়তে পড়তে চলে আসেন নৈহাটিতে বড়দা মন্মথনাথের বাসায়। ভাঁটো হয়ে ভেসে যান জীবনস্রোতে, লেখা ছবি আঁকা গান গাওয়া নাটক করার পাশাপাশি অস্তিত্বটুকুকে টিকিয়ে রাখার কঠোর সংগ্রামে। আঠারো বছরের যুবক বিবাহ করেছেন বাইশ বছরের গৌরীদেবীকে, দুটাকা ভাড়ার বস্তির ঘরে থাকা, ডিম ও আনাজপাতি বেচা, জগদ্দলের সত্যভূষণ দাশগুপ্তের প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসা, সংগঠন গড়া, নিজের হাতে পোস্টার লেখা এসবেরই ভেতর দিয়ে তৈরি হতে থাকে ভাবী লেখকের রসদ অভিযান। জুট মিলে যোগদান, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিশেবে আত্মনিয়োগের পথ ধরে ৪৯-এ পৌঁছে যান কারাগারে। এর পরপরই লেখা 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস, যার শুরু বন্দীদশায়। অবশ্য তার তিন বছর আগেই ১৯৪৬-এ পরিচয়-এ বেরিয়ে গেছে তাঁর অসামান্য গল্প 'আদাব'। এরপর এখানেই কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'নয়নপুরের মাটি' ও আরও কয়েকটি সাড়াজাগানো গল্প।

'বি টি রোডের ধারে', 'শ্রীমতা কাফে' 'গঙ্গা' শীর্ষক উপন্যাসগুলি এবং 'মরশুমের একদিন' গল্প-সংকলন সমরেশকে খ্যাতির উজ্জ্বলতায় পৌঁছে দেয়। বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা দু হাত বাড়িয়ে দেয় তাঁর দিকে। বিতর্কিত 'বিবর' ও 'প্রজাপতি' লেখার পর্বে সমরেশেরই কথায় তাঁর 'আঁতুড়ঘর' পরিচয়-এর সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্কের ছেদ ঘটে। এই সময় দিয়েই তাঁর দ্বিতীয় সত্তা কালকূট-এর আত্মপ্রকাশ 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে-র মাধ্যমে।

এই প্রথায় শক্তিমান লেখককে পরিচয়-এর প্রয়াত সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্ব থেকে আবার ফিরিয়ে আনেন। সেই থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসর পরিচয়-এর শারদীয় সংখ্যায় একটি করে অসামান্য গল্প লিখে গেছেন তিনি। লিখেছেন 'খিঁচাকবলা সমাচার' (কয়েকটি পর্যায়ে), 'নিষিদ্ধ ছিদ্র,' 'মরেছে প্যালগা ফরশা'র মত গল্প যেগুলি বাঙালি পাঠককে আর একবার 'আদাব' ও 'পাড়ি'-র সমরেশকে পরিণততর রূপে আরেকবার দারুণভাবে মনে করিয়ে দিয়ে যায়।

সর্বক্ষণের লেখক ও অশান্ত জীবনচারী সমরেশের স্মৃতিতে পরিচয় আর্ত।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

PARICHAYA MARCH 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265

একগুচ্ছ কাব্যনাট্য

রাম বসু

রাম বসু শুধু আমাদের সময়ের একজন প্রধান কবিই নন কাব্যনাট্যের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার-ও বটে। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি কাব্যনাট্য-রচনার ধারাবাহিক প্রবাহে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন স্মরণীয় থেকে উত্তুঙ্গ অনুভূতির শিখরে। এগুলি একই সঙ্গে আমাদের সহৃদয় হৃদয়ের সংবাদই উপহার দেয় না, মানসলোকের আলোয় বস্তুতে বস্তুমাত্রিক করে তুলে ধরে। এই সব কাব্যনাট্য থেকে সুনির্বাচিত কয়েকটি রচনা নিয়ে প্রকাশিত হল এই অনন্য সংকলনটি।

দাম : চল্লিশ টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় / ৪-৩ বি, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩৯,৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

সম্পাদনা দপ্তর ॥ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

দাম : তিন টাকা

পরিচয়

৫৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৮৮ চৈত্র ১৩৯৪

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতাগুচ্ছ

আলোচনা

স্মৃতিকথা

পুস্তক সমালোচনা

চিত্রোপাধ্যায়

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ অমিতাভ দাশগুপ্ত ১২১ প্রেমেন্দ্র মিত্র
তপোবিজয় ঘোষ ১২২

প্রচ্ছদ

সুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২ প্রকাশের সময়ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—রঞ্জন ধর, ভারতীয়, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪ প্রকাশক— ঐ ঐ

৫ সম্পাদক—অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৭

৬ পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি, আই, টি, বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। স্নীলকুমার বসু, ১৭/এল, মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণকুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১/৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯। ১১। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১১। বিনয় ঘোষ (মৃত) ৪৭/৩, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২। ১২। সত্যজিৎ রায়, ফ্ল্যাট-৮, ১।১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, (মৃত), ৪৮ ৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯/এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬। ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২/বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', ৫২ গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত) পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯/১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবেদিতা দাশ (মৃত) ৫৩/বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩/সি পঞ্চানন তলা রোড, কলকাতা-১৯। ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলকাতা-২০। ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬,

নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা-১৩। ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩।ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লি। ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বসু (মৃত) ২০০এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯।এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০। ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি, বি, সি, রোড, জলপাইগুড়ি। ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত) ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি, ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০। ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকা, বাঙলাদেশ। ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১।এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬। ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। ৪২। দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১২।১, ব্লক-ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩। ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২। ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্লাট-বি সি-৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬। ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা-৬। ৪৬। বিশ্বা মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্লাট-২, ১৬, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৬। ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২।

আমি রঞ্জন ধর এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

স্বাঃ রঞ্জন ধর

২১-৩-৮৮

শ্রীচৈতন্য ও লোকায়ত উত্তরাধিকার

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

লোকায়ত উত্তরাধিকারের ইতিহাস উপেক্ষা করে, শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শ ও কর্মধারার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপলব্ধি বা চৈতন্য-আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াসে যে যুগপৎ সত্যনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা সুপ্রশস্ত তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। পাঁচশত বৎসরের জন্মজয়ন্তী লগ্নে আমরা অন্তত বিশেষভাবে এই সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছি যে, শ্রীচৈতন্য ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছিলেন যুগ-জীবন-ধারার সমষ্টিগত ঐতিহ্যে। তাই তাঁর স্বরূপ সন্ধানে শুধু মাত্র জীবনীগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থাদি ও বৈষ্ণবীয় সাম্প্রদায়িক প্রাতিষ্ঠানিকতায় নিবিষ্ট হওয়া সঠিক নয়, লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোকায়ত ঐতিহ্যের বহুব্যাপ্ত ধারায় অন্বিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

চৈতন্যদেবের জীবন সাধনা ও ধর্মান্দোলন কোন আকস্মিক কার্য-কারণ সম্পর্কবিহীন ঘটনা নয়। চৈতন্যান্দোলনে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তি-প্রতিভা সর্বব্যাপী ভূমিকা গ্রহণ করলেও এই আন্দোলন একান্তভাবে ব্যক্তি-অভিপ্রায় জাত নয়, তদানীন্তন সমাজ বাস্তবতার মধ্যেই তার বীজ নিহিত। প্রবহমান বঙ্গ-ভারতীয় ঐতিহ্য এবং তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার পটভূমি ও ধর্মান্দোলনের বাতাবরণে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছে। সর্বজনগ্রাহ্য সমন্বিত ধর্মচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ চৈতন্য-ধর্মান্দোলনের আবির্ভাবের পটভূমি হিসাবে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—

১. সর্বভারতীয় স্তরে সন্ত আন্দোলনজাত উদার ভক্তিধর্মের আলোড়ন।

২. ভেদাভেদহীন সাম্যবাদ-নির্ভর ইসলামধর্ম ও সূফীবাদের প্রভাব।

৩ জীবন নির্ভর মানবতাবাদী আদিম-লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের বিবর্তিত ধারাবাহিকতা।

মধ্যযুগে সর্বভারতীয় স্তরে মানবতাভিত্তিক ও ভক্তিবাদনির্ভর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সবিশেষ প্রসার ঘটেছিল। শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত ভক্তি

সাধনার ধারা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ধারা, সম্ভবত আর্যবহির্ভূত জনসমাজে এর মূল উৎস নিহিত। আর্যরা ছিলেন মূলত তত্ত্বানুসন্ধানী জ্ঞানমার্গের অনুগামী। উপনিষদে ভক্তিধর্মের যে বীজ তা পরবর্তীকালে বিভিন্নরূপে প্রসারিত হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা প্রচলিত ভক্তিসাধনার ধারার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে যায়। ভক্তিবাদী ধর্মাদর্শের লৌকিক ধারার সাথে পূর্বাপর মানবতাবাদ বিশেষভাবে মিশ্রিত ছিল। রামানন্দ, কবীর, দাদু, নামদেব প্রভৃতি সন্ত-আন্দোলনের নেতাগণ সকলেই ছিলেন সেই শ্রেণীর সাধক যাঁদের সকলেরই ভাবাদর্শের মূল সুর ছিল—জাতিসাম্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সন্ত আন্দোলনের প্রভাবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব থেকেই সর্বভারতীয় স্তরে ধর্ম উদারতার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে ছিল বহিরাগত মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের একেশ্বরবাদের উদারতা ও সুফী-আউলিয়াদের প্রেমাদর্শ এবং অন্যদিকে ছিল ভারতীয় সাধু-সন্ত প্রচারিত উদার মানবতার ধর্ম। সর্বভারতীয় স্তরে এই সব সাধু-সন্তগণ সমাজের সর্বস্তর থেকে শিষ্য গ্রহণ করেছেন এবং মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করেছেন—শাস্ত্রীয় ধর্মাচারবিরোধী সংস্কার মুক্তি, বর্ণাশ্রম বন্ধন মুক্তি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, জাতিসাম্য এবং সামাজিক আচারের অর্থহীন বন্ধন মোচনের বাণী। সর্বভারতীয় স্তরে সাধু-সন্ত প্রচারিত আদর্শের অনুরূপ মানবতানির্ভর জীবনবাদী ধর্মাদর্শের প্রবাহ বাংলার লোকায়ত সমাজে ছিল বহু ব্যাপ্ত, যার মূল প্রোথিত ছিল স্থানীয় জনজাতির জীবনচর্যার ধারায় এবং যার প্রকাশ ঘটেছে সহজিয়া ধর্ম-সাধনার সুবিপুল ঐতিহ্যে। ইসলামী সাম্য-চেতনার উদারতা, সর্বভারতীয় স্তরে সাধু-সন্ত প্রচারিত উদার ভক্তিধর্ম এবং বঙ্গভূমিতে প্রসারিত জীবনাভিমুখী লোকায়ত-ধর্ম—এই ত্রিবিধ ধর্মাদর্শের উত্তরাধিকার অঙ্গীকার করেই বলিষ্ঠ মানবতার বাণী নিয়ে শ্রীচৈতন্য বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে উদার ধর্মান্দোলনের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, বঙ্গদেশে তারই এক নবতর রূপ প্রকটিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের ধর্মাদর্শ ও কর্মধারায়।

চৈতন্য সমকালীন বাংলায় স্মৃতি-পুরাণশাসিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিধি-নিষেধের নিগড়, জাতি-বর্ণভেদ প্রথার নির্মমতা, অস্পৃশ্যতার জ্বালা, সামাজিক কু-প্রথাদির বিড়ম্বনা ও মুসলমান শাসনের নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিতে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল জর্জরিত। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, প্রশাসনের ব্যাভিচার এবং উচ্চবর্ণের মানুষ ও রাজপুরুষদের

যথেচ্ছাচার তখন প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। তখন ধর্মের অবস্থা ছিল আরো খারাপ। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে ধরেছিল ভাঙন। তন্ত্রাচারের ব্যাভিচার ও স্মৃতি-পুরাণের যান্ত্রিকতায় সমাজজীবন ছিল সন্ত্রস্ত। নানারূপ ধর্ম শ্রেণীগত বিভাগ ও উপবিভাগের প্রমত্ততা এবং সামাজিক কু-প্রথার প্রতিক্রিয়ায় সমাজজীবনে ছিল সংহতির অভাব। এই সময় মুসলমান ধর্ম ও সুফী-দরবেশদের কর্মপ্রচেষ্টা মানব স্বীকৃতির উদার ভাবাদর্শের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল নতুন পটভূমি, যার সঙ্গে ছিল লোকায়ত জীবন চেতনার অন্তর্নিহিত সাযুজ্য। সমষ্টিগত জীবনাচার নির্ভর আদিম ও লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সংহতি বোধ এবং শ্রেণীক বর্ণ বিভক্ত সমাজের প্রতিবাদী চেতনার ভিত্তিভূমিতে গড়ে উঠেছে মানবতা-নির্ভর প্রেম-ভক্তিবাদের ধারা। অভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সমভূমিতে অবস্থানগত জনজাতির সহজাত চেতনাই হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ধর্মী প্রেম-ভক্তিবাদে আস্থা এবং মোল্লা-পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধিতার উৎস। এই পথেই উচ্চধর্ম-নিরপেক্ষ লোকায়ত সমন্বয়ধর্মী ধর্মাদর্শের প্রসার ঘটেছে বিভিন্নভাবে এবং এই পটভূমিতেই সংস্কারমুক্ত ধর্মান্দোলনের প্রভাবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হয়েছে। মোটের উপর বলা যায়—একদিকে উৎপাদন ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, সামন্ততন্ত্রনির্ভর আর্থ-সামাজিক অবরুদ্ধতা ও স্মার্ত ধর্মানুশাসনের নির্মমতা জনিত নেতিবাচক পরিস্থিতি এবং বিপরীতক্রমে উদার ভক্তিধর্মের আলোড়ন, সুফী-ইসলামীয় সাম্যচেতনা ও জীবনাভিমুখী দেশজ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের অস্তিবাচক প্রবাহের দ্বান্দ্বিক পটভূমিতেই যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তৎপ্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল।

বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমিতে চৈতন্যদেব স্বীয় জীবনাদর্শ ও ভাবধারায় বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনাকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করে প্রকাশ করলেন মানবিকতার বৃহত্তর পটভূমিকায়। তিনি প্রেমভক্তির ধর্মভাবে জাত-পাতের সীমা ভেঙে দিলেন, তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীকে দিলেন মানুষের মর্যাদা, স্মৃতি-পুরাণ শাসিত ধর্মের সংকীর্ণতা পরিহার, জাত-পাতহীন উদার মানবিকতার প্রসার, প্রথাসিদ্ধ ধর্ম থেকে জীবন-নির্ভর ধর্মের প্রবর্তনা, হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম সাধনার প্রচলন, ধর্মাচরণে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রদান, আদিবাসী ও লৌকিক উপাদানাদির সংমিশ্রণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য এক নব ধর্মান্দোলন ও সমাজ-সংস্কার

আন্দোলন প্রবর্তন করেন। চৈতন্যদেবের নব ধর্মান্দোলনের বৈশিষ্ট্য প্রধানত চারটি—

(১) স্মৃতি-পুরাণ শাসিত ধর্মের সংকীর্ণতা পরিহার

(২) প্রথাসিদ্ধ ধর্ম থেকে জীবন-নির্ভর ধর্মের প্রাধান্য প্রদান

(৩) হিন্দু-মুসলমান ও জাত-পাতহীন যুক্ত সাধনার পথ প্রশস্ত করণ—

(৪) মহৎ ঐতিহ্য এবং আদিবাসী ও লৌকিক ঐতিহ্যের উপাদানাদির মিলন-মিশ্রণ সম্পাদন

মূলত এই চতুর্বিধ ধারাকে অবলম্বন করেই শ্রীচৈতন্য মানবতা নির্ভর ধর্মাদর্শে সমস্ত সংকীর্ণতার বেড়া ভেঙে সৃষ্টি করলেন ধর্মের গণমুখীনতা ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।

চৈতন্যদেব স্বীয় জীবন সাধনায় গ্রাম-নগর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শাস্ত্র-লৌকিক উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, জাতি-উপজাতি, পুরুষ-নারী প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে উঠেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তৎকালীন সমাজে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের দিকে দৃষ্টি নিয়োগ করেন নি এবং শেষ পর্যন্ত ভক্তি-ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনে সর্বতোমুখী সামাজিক গতিশীলতা সঞ্চারেও সক্ষম হন নি। ভাবাবেগে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সংকীর্তন ও নামধর্মের দ্বারা প্রেমধর্মের আবহে সকলের সমানাধিকার প্রদান করলেও, চৈতন্যদেব সর্বতোভাবে বর্ণ-ভেদ বা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভাঙার আন্দোলন করেন নি। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুত্বের সংকীর্ণতা তুচ্ছ জ্ঞান করলেও বৃহত্তর জনসমাজকে সর্ব সংকীর্ণতা পরিহারে উদ্‌বুদ্ধ করেন নি। কাজী-দলনে অগ্রসর হলেও সামগ্রিক ভাবে রাজশক্তি বা সামন্তপ্রভু শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন সচেতন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। নীলাচলের শেষ পর্যায়ের জীবনধারায় শ্রীচৈতন্য বহুলাংশে জনজীবনের সচল সামাজিক ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরিমণ্ডলে হয়েছিলেন একপ্রকার নির্বাসিত। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীচৈতন্য সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও শেষ পর্যন্ত অলৌকিক লীলা মাহাত্ম্যে তা নিঃশোষিত হয়েছে। তাই তাঁর আবির্ভাব লগ্নের মহৎপ্রতিশ্রুতি উচ্চধর্মের পরিধিতে পরিণামে কোন সমাজগত বৃহৎ সার্থকতা সৃষ্টি করে নি, যা বাস্তবজীবন ও ভাবজগতের পূর্ণ-জাগরণকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। লীলাচল লীলার পর্যায়ে তাঁর স্বকীয় প্রচেষ্টায় উজ্জীবিত ধর্মান্দোলনে গতিশীলতার তাৎপর্য বহুলাংশে অবলুপ্ত হয়—পরবর্তী অধ্যায়ে গোস্বামী মহান্তদের ভিন্নমুখী প্রয়াসে যার পূর্ণ সমাধি ঘটে।

চৈতন্য সমসাময়িক কাল থেকেই তাঁর প্রবর্তিত ভাব ধারায় নানারূপ স্খলন-পতন বিচ্যুতি-বিকৃতি আত্মপ্রকাশ করে। নানাভাবে বিধি নিষেধ আনুষ্ঠানিকতা ও কৃতা-কৃত্যর রুদ্ধতা দেখা দেয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রীয় সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি পুরাণের আবহে গড়ে উঠল বৈষ্ণব শাস্ত্রে গ্রন্থ এবং ক্রমান্বয়ে বৈষ্ণবধর্ম হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িক ভাবে সংকীর্ণ ও গণ্ডিবদ্ধ ধর্ম, মূলত যা ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় সমর্পিত। চৈতন্য আন্দোলনের এই রক্ষণশীল পরিণতি খুবই মর্মান্তিক। চৈতন্য আন্দোলনের ধারা ও বৈষ্ণব সমাজ কালক্রমে নব্যস্মৃতির অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রবর্তিত উদারপন্থা বহুলাংশে নিষ্ফল হয়ে যায়। চৈতন্যোত্তর কালে স্মৃতি-পুরাণ ও মঠ মহান্ত নির্ভর বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতার অতিরেকে চৈতন্য আন্দোলনের জনমুখী আবেদন বহুলাংশে জীবনবিমুখতায় নির্বাসিত হয়। অবশ্য চৈতন্য আন্দোলন চৈতন্যোত্তর কালে গতিশীল রূপ নেয় নিত্যানন্দ বীরভদ্র জাহ্নবাদেবীর ধারায় এবং লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ প্রবাহে। চৈতন্যদেবের মানবিকতা নির্ভর গতিশীল ধর্ম-চৈতনার সঙ্গে লোকায়ত ঐতিহ্যের সহজ সাযুজ্যের সূত্রেই, শ্রীচৈতন্য লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারে স্বতঃস্ফূর্তরূপে স্বীকৃত ও পূজিত।

চৈতন্যপ্রভাবিত সামাজিক শক্তির উৎসার উচ্চসমাজের ও উচ্চ-ধর্মাদর্শের প্রভাবে সঙ্কুচিত হলেও, সমাজের ব্যাপক লোকায়ত স্তরে তা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যার সুদূর প্রসারী রূপ লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায় ও জনসমাজের মধ্যে অদ্যাপি লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি প্রসারিত হলেও, বাংলার ব্যাপকতর লোক-সমাজে ও লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে চৈতন্যদেব উদার মানবতাবাদের এবং দেহাচার-যোগাচার নির্ভর সহজিয়া সাধনার পরিপূরক রূপেই বিবেচিত হন। ক্ষেত্রানুসন্ধানে লব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে মনে হয় লোকায়তধর্মে শ্রীচৈতন্যের স্বীকৃতির মুখ্য দিক দুটি—

শ্রীচৈতন্য / লোকায়তধর্ম

- ধর্মাদর্শ বা জীবনাচারগতদিক
  - ↓ উদারমানবতা
  - জাতপাতহীনতা
- সাধনতন্ত্ব বা সাধন পদ্ধতিগত দিক
  - ↓ রাগানুগা প্রেমভক্তি
  - দেহসাধনার ধারা

ধর্মচেতনা ও ভাবাদর্শগত এবং সাধনতত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতিগত সাযুজ্যের মাধ্যমেই শ্রীচৈতন্য ও লোকায়তধর্ম সম্প্রদায় সমূহ পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত এই প্রচলিত বিশ্বাস। বাংলার লোকায়ত ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং চৈতন্যজীবন ও সাধনার মধ্যে অন্তর্গত সুমহান আত্মীয়তা ছিল বলেই পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের নিকট পরমতত্ত্বরূপে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীচৈতন্য হয়েছেন বিশেষ-বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক বা মহান নেতা।

২

চৈতন্যদেবের সর্বজনীন প্রেমভক্তির আকর্ষণে প্রচলিত অবৈদিক-অপৌরাণিক লোকায়ত সাধক সম্প্রদায়গণ ভক্তিধর্মের প্রকাশ্য আশ্রয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অবকাশ পান এবং নিজেদের প্রসারিত করেন যুগোপযোগীরূপে। চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনে, বিশেষত প্রেমভক্তির সাধনা ও নগরকীর্তনের প্রভাবে, উচ্চ-নীচ ও সর্বপর্যায়ের মানুষ একত্রে মিলিত হল—ভেঙে গেল শুচি-অশুচির ভেদরেখা। এর ফলে স্মার্ত সমাজ শাসিত ও পুরোহিত-পণ্ডিত নিয়ন্ত্রিত ধর্মাচারের ক্ষেত্রে প্রসারিত হল একপ্রকার উদারতা এবং নিপীড়িত নিম্নপর্যায়ের মানুষের মধ্যে জাগরিত হল এক আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস পরবর্তী অধ্যায়ে বৃহত্তর সামাজিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগলাভে বঞ্চিত হলো মুখ্যত শিষ্য সমাজ ও উচ্চবংশ সম্ভূত চৈতন্য পরিকরদের অভিজাত ধর্মমুখীনতা ও গোস্বামী নির্ভর শাস্ত্রানুগত্যের অতিরেকে। অবশ্য পরবর্তীকালে এই সংকীর্ণতা বহুলাংশে মুক্ত হয়—নিত্যানন্দ প্রভুর প্রয়াসে, বীরভদ্র-জাহ্নবাদেবীর মাধ্যমে এবং লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের সজীব সক্রিয়তায়।

সাধনতত্ত্বগত বা সাধনপদ্ধতিগত দিক থেকে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহ শ্রীচৈতন্যের রাগানুগা প্রেমভক্তি ও দেহসাধনার মধ্যে অভিন্নতা আরোপ করে থাকেন। বর্তমান লেখকের বিশ্বাস বাঙালীর দেহনির্ভর সাধনা সুপ্রাচীন ও আদিম উৎসজাত লৌকিক সাধনার ধারা। কোন সমাজের যৌনাচার—দেহাচার মূলক আদিম জাদুবিশ্বাসজাত কৃত্যাদির অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে বাংলার দেহসাধনার ভিত্তি, কালক্রমে যা সাংখ্যযোগ-তন্ত্রাচারের মাধ্যমে অধ্যাত্মসাধনার স্থিতিশীল শাস্ত্রীয়রূপ পরিগ্রহ করে। আত্ম সাধনে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর আনুগত্যে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন, প্রকৃতি সহযোগে

প্রেমরসলীলা সাধনেরই ইংগিতবহ অন্তরঙ্গ গূঢ় সাধনা তথা গুপ্ত দেহসাধনার নির্দেশক বলে লোকায়ত সাধকগণ মনে করেন এবং এই সূত্রে বিশেষভাবে রায়রামানন্দর সক্রিয়তা ও সার্বভৌমকন্যা যাটীদেবীর সেবানুগত্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাঁরা মনে করেন—

টলে জীব অটলে ঈশ্বর।
টলা টলে গৌরাঙ্গ নির্ভর॥

লোকায়ত বিশ্বাসে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যর রাধা-কৃষ্ণের মিলিতরূপ বা রসরাজ-মহাভাব তত্ত্ব এবং অন্তরঙ্গ পরিকর আনুগত্যে অন্তর সাধনতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বর সমগোত্রীয়। এই বিশিষ্ট অর্থেই শ্রীচৈতন্য লোকায়ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিকট "রসের করণে সিদ্ধ" "রসিক পাগল" বা "মহাবাউল" রূপে স্বীকৃত—

তিন প্রভুর কর্ম রসিক শিরোমণি।
রসের করণে সিদ্ধ বাউল আপনি॥

মোটের উপর ভাবাদর্শগত ও সাধনতত্ত্বগত উভয় দিক থেকেই শ্রীচৈতন্য লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের নিকট বিশেষভাবে পূজা। লোকায়ত সাধক সম্প্রদায় গভীরভাবে বিশ্বাস করেন অথর্ববেদের ধারা রক্ষা করে মহাপ্রভু রায়রামানন্দের মাধ্যমে দেহসাধনার যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিরূপণ করেছেন এবং জাত-পাতহীন উদার মানবতাবাদী ধর্মপ্রচার করেছেন, তাই গৌরলীলার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এবং তাই যথাযথ অর্থে "বিশুদ্ধ গৌরীয় ধর্ম" (গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নয় বা বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম নয়)। এই গৌরীয় ধর্মাদর্শ লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের ধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে পরবর্তীকালে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মৃতিধার্য যে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহ চৈতন্য প্রভাবে প্রভাবিত হলেও, একান্তরূপে চৈতন্যপ্রভাব জাত নয়। লোকায়ত ঐতিহ্যের স্বকীয় ধারাতেই তার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিধৃত।

পরিবর্তিত অবস্থায় চৈতন্যপ্রবর্তিত উদার মানবতা ও সাম্যবোধে ভাঙনের কালে, গৌরীয় ভাবধারায় প্রভাবিত এবং মনুষ্যত্বের মহিমাবোধে জাগ্রত সাধারণ জনসমাজ আর উচ্চ সমাজ বা ধর্মের নিকট আত্মবলি ছিল না; তারা লোকায়ত ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ প্রবাহে বিকশিত করল প্রবর্তক কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধর্ম সাধনার সমন্বয় জাত লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায় (গৌণ ধর্ম সম্প্রদায় নয়)। এইভাবে চৈতন্য প্রবর্তিত মানবতা ও প্রেমধর্মের প্রভাবে একদা জাগ্রত লোকায়ত সমাজ, মূলত লোকধর্ম ও উৎসব-অনুষ্ঠানের ভিত্তি ভূমিতে হিন্দু মুসলমান বৈষ্ণব ধর্মমতের সমন্বয়ে গড়ে তুললো নতুন নতুন ধর্মীয় উপসম্প্রদায়

(অপসম্প্রদায় নয়)। লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায় সমূহকে "গৌণ বৈষ্ণবীয় ধর্ম" "বৈষ্ণবতা থেকে চুঁইয়ে পড়া···আধা বৈষ্ণব গোষ্ঠী" "বীরভক্তের অনেক লালিত সন্তান" বা "ছোট ছোট বৈষ্ণবীর ধর্ম গোষ্ঠী", হিসাবে গণ্য করা সর্বতো সঠিক নয়। এই সব সম্প্রদায় বিশুদ্ধ অর্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ "বৈষ্ণবীয়" হলে পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে নিশ্চয় গণ্য হত না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় কিংবদন্তীর সূত্রে এই সব সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের মধ্যে নিজেদের সংযুক্ত করলেও চৈতন্যধর্ম বা বৈষ্ণবীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে নিজেদের যথাযথ অর্থে যুক্ত রেখেছেন এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না, অন্তত বর্তমান লেখক তা প্রত্যক্ষ করেন নি। এদের ধর্ম সাধনায় চৈতন্যদেব অবশ্য মান্য, কিন্তু তিনি বৈষ্ণবীয় বা চৈতন্যধর্মের 'ত্রিতত্ত্বানুসারী" সচিদানন্দ বিগ্রহ নন বা "একটা Concept" মাত্র নন। লোকায়ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীচৈতন্য মানব কল্যাণকামী যুগপুরুষ ও সিদ্ধ সাধক রূপেই মূলত স্বীকৃত শব্দ এবং লোকায়ত সহজ সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বে বিশিষ্ট প্রতীকরূপে সুচিহ্নিত। সহজিয়া সাধনা ও লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্যদেবের অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গটি বিতর্কমূলক বিষয় হলেও, এর দ্বারা বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বরূপই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবিষ্ট না হয়েও বলা যায় যে, লোকায়ত ধর্মসাধনার ঐতিহ্য চৈতন্য-বৈষ্ণব প্রভাবজাত নয়, তা লোকায়ত বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যের উৎসজাত, যার মধ্যে আদিম-লৌকিক ক্রমানুবর্তনের ধারা (Primi-ive-Folk Continuism) প্রবাহমান। বলা বাহুল্য যুগ-পরিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুগতধারার বিশেষ পর্যায়ে তার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের সক্রিয়তা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা শ্রীচৈতন্য যে ধর্মান্দোলন ও সমাজসংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন কালের আবর্তে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অসম্পূর্ণ-তার মধ্যে চৈতন্যদেবের যে রহস্যময় তিরোধান বাংলার সমাজ ও ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে তা এক বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা। লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু হয় নি। লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায় সমূহ "শ্রুতিপ্রোক্ত বিমৃত্যুত্ব" তত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও মনে করেন চৈতন্যদেব নীলাচলে অন্তর্ধান করেছিলেন এবং অসমাপ্ত কার্য সম্পাদনের জন্য নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন বাংলার লোকসমাজে লৌকিক অবতার হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেবের অন্তলীলা-রহস্য এই ব্যাপারে লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়কে প্রেরণা দিয়েছে তাঁদের প্রবর্তক গুরুকে নীলাচলে অপ্রকট মহাপ্রভুর পরবর্তী প্রকটরূপ হিসাবে

গণ্য করতে, এই অর্থেই বংলার লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহ তাঁদের আদি-প্রবর্তক ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে অভিন্ন আরোপ করেন। এই সূত্রেই লোক-সমাজে প্রবর্তকগণকে কেন্দ্র করে চৈতন্যআনুগত্যে নানারূপ কিংবদন্তীমূলক কাহিনী বা "মীথ" গড়ে উঠেছে। "Myth—Symbol and Religion" তত্ত্বের ভিত্তিভূমিতে যার অন্যতম প্রধান প্রতীকাত্মক প্রতিরূপ—শ্রীচৈতন্য।

লোকায়তধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের এই সম্পর্ক—সূত্রকে ঠিক "Sanskritization" বা "Hinduization" তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে হয় না (এই সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী ধারণা আমি প্রত্যাহার করছি)। লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রানুসন্ধান ও গবেষণাকর্ম পরিচালনার পূর্বে আমাদের মনে হয়েছিল যে জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থেকেই নিম্নসমাজের উপসম্প্রদায়গুলি নিজ-নিজ প্রবর্তককে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু গত দুই দশকের ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ তথ্য ও আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বগতরূপ বিশ্লেষণে মনে হয় পূর্ববর্তী ধারণা ভুল। লোক-সমাজে চৈতন্যদেব নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের ত্রাণকর্তারূপে স্বতঃস্বীকৃত নেতা এবং সেই কারণে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তকরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বীকৃত ও বন্দিত হন। লোকায়ত সমাজে যথার্থ অর্থে শ্রীচৈতন্য বিশিষ্ট চেতনা বা "concept" অথবা কল্পিত বিষয়ক ধারণা বা দার্শনিক তত্ত্বমাত্র নন। তিনি মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ এবং প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ, নিপীড়িত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, সার্থক যুগপুরুষ (পরমপুরুষ নয়) ; এবং এই অর্থেই শ্রীচৈতন্য মানবতাবাদী লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের আদি ও অকৃত্রিম নেতারূপে স্বীকৃত।

লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের নিকট শ্রীচৈতন্য বিশিষ্ট অবস্থানগত ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করে চৈতন্য আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র চৈতন্যজীবনীগ্রন্থের উপর নির্ভর করে চৈতন্য আন্দোলনের উত্থান-পতনের ইতিহাস পাঠের চেষ্টা যেমন অবাস্তব, তেমনি গোস্বামী-মহান্তদের ভাবধারাকে অবলম্বন করে চৈতন্য আন্দোলনের পূর্ণান্বিত প্রবাহের গতি-প্রকৃতির ধারা অনুধাবনের প্রচেষ্টাও অসার্থক। চৈতন্য ধর্মান্দোলনের ইতিহাস অনুশীলনে যেমন চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ এবং পরবর্তীকালের গোস্বামীগণের মনন বা মহান্ত-গুরুদের কার্যকলাপ সমূহ অবশ্য স্মরণীয়, তেমন অনিবার্য প্রয়োজনীয় বিষয় বাংলার লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের চৈতন্য আনুগত্যে

ধর্মসাধনা ও কর্মধারার পরিচয় পাঠ। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে বাংলার লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের পর্যালোচনায়, কেবলমাত্র নদীয়া কেন্দ্রিক ধর্মগোষ্ঠীর আলোচনা সঠিক নয়। শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনের গতিশীল রূপ ও ইতিহাস সন্ধানে আগ্রহী প্রকৃত গবেষককে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে বৃহৎ বঙ্গের মানচিত্রে এবং মুদ্রিত গ্রন্থের বাইরে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। চৈতন্যোত্তর ধর্মান্দোলনের ইতিহাস অনুধাবনে, নদীয়া বা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি, বাংলার পূর্ব প্রত্যন্ত খাল-বিল অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের লোকায়ত সমাজ ও ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কেও অনুসন্ধানী হওয়া প্রয়োজন। এদিক থেকে বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে আলোচনার সুবিধার্থে, চৈতন্য আন্দোলনের লোকায়ত উত্তরাধিকারের গতিশীলতা অনুধাবনে বিশেষ রূপে নিম্নলিখিত তিনটি ধারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়—
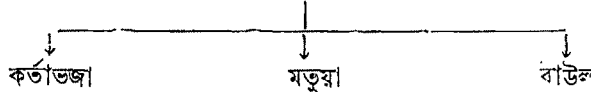
উদ্ভব ইতিহাসের সূত্রে কর্তাভজা পশ্চিমবঙ্গ এবং মতুয়া পূর্ববঙ্গের মধ্যে যুক্ত থাকলেও কালক্রমে এই সম্প্রদায়দ্বয়ের বহু শাখা প্রশাখাশ্রয়ী বিস্তার ঘটেছে উভয়বঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ব্যাপক জনসমাজে (দেশবিভাগের পর মতুয়াগণ সর্বভারতে ব্যাপ্ত হয়ে গেছেন)। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকায় কর্তাভজা, পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় মতুয়া এবং উভয়বঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বাউলের তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান শ্রীচৈতন্যের লোকায়ত উত্তরাধিকারের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সবিশেষ সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়।

৩

চৈতন্যসংশ্লিষ্ট বাংলার লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কর্তাভজা সম্প্রদায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, উদারমানবতাবাদী কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক হিসাবে আউলচাঁদের নাম করা হয়। এই ধর্মসম্প্রদায় ও আউলচাঁদ সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রচলিত বিশ্বাস নীলাচলে অপ্রকট হবার পর চৈতন্যদেব দীর্ঘকাল আত্মগোপনের পরে আউলচাঁদ রূপে প্রকটিত হয়ে এই কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। বলা হয়—

> কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, আউলচন্দ্র তিনেই এক, একেই তিন।
> গৌরচাঁদ, আউলচাঁদ, দুলালচাঁদ তিনেই এক, একেই তিন॥

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আইন পুস্তক স্বরূপ "ভাবের গীত" ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি এবং ক্ষেত্র গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মায়াবী গৃহস্থ নয়, 'ফকির গৃহস্থ' তথা গৃহীসাধক। জীবন পদ্ধতিগত দিক দিয়ে এই সম্প্রদায় মূলত "মানুষভজনা" বা পুরুষ প্রকৃতির মিলনজাত সহজিয়া জীবনমার্গের অনুসারী। দেহকেন্দ্রিক এবং যোগাচার ভিত্তিক সাধন পদ্ধতিতে কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রাণায়াম বা দলের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁদের সাধনায় সাধারণভাবে মূর্তিপূজা বা প্রচলিত পূজোপকরণের দরকার হয় না। হিন্দু-মুসলমান ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এরা মিলিত ভাবে সাধন-ভজন করেন এবং "লোকমধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরু মধ্যে একাচার" —এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বাৎসরিক দোলমেলায় নিত্যধাম ঘোষপাড়ায় (নদীয়া) মিলিত হওয়া এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পংক্তি ভোজন করা এদের বিশেষ প্রথা। যথার্থ অর্থে কর্তাভজা ও তার শাখা-উপশাখা শ্রেণীর ধর্মসম্প্রদায়গুলির সাথে বৈষ্ণব ধর্মের আনুষ্ঠানিক সংযোগ পরিলক্ষিত হয় না। চৈতন্যদেবের প্রতিশ্রুত মানব মাহাত্ম্যমূলক সহজসাধনার ধারা অবলম্বন করেই কর্তাভজা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এই প্রচলিত বিশ্বাস।

বাংলার প্রচলিত ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে অনালোচিত ও উপেক্ষিত একটি ধর্মসম্প্রদায় মতুয়া, ধর্মীয়-সামাজিক বৈষ্ণব থেকে মূলত নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মুক্তি ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অঙ্গহিসাবে মতুয়া ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে শ্রীশ্রী হরিচাঁদঠাকুর ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীশ্রী গুরুচাঁদঠাকুরের নেতৃত্বে।

ক্ষেত্রগবেষণালব্ধ তথ্য ও মতুয়াধর্মের শাস্ত্রীয় আকর গ্রন্থাদির সূত্রে দেখা যায় মতুয়া ধর্ম দর্শনে শ্রীশ্রীহরিচাঁদঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবেরই নবরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ঐতিহ্যজাত—

"মায়াপুরী জন্মে হরি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে।
লীলাকরে গুপ্ত বৃন্দাবন নবদ্বীপে॥
বুঝিয়া দেখিলে এই সেই সেই ভাব।
সফলা ভাষায় ওড়াকান্দি লীলাসব॥
....
এই রূপে লীলা করে গোলোকের সাক্ষী
জগত পতির খেলা বুঝিবারে নারি।
....

প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন অবনীতে॥

(শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, ১ম সংস্করণ ১৩২৩, পৃঃ-১২৪)

মোটের উপর মতুয়াধর্ম দার্শনিকতায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, গোরাচাঁদ এবং শ্রীশ্রী হরিগুরুচাঁদ অভিন্ন সত্তা হিসাবে পরিগণিত হন। সার্বিকভেদ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষের সামগ্রিক আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার তথা নিপীড়িত জন-সমাজের মুক্তি সংগ্রামের ধর্ম—মতুয়াধর্ম। তাই সমগ্র দিকবিচার করে বলা যায়—মতুয়াধর্ম কেবলমাত্র বর্ণহিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিবাদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ধর্মান্দোলন নয়, তা নিম্নসমাজের নিপীড়িত মানুষের সার্বিক গণজাগরণের তথা মুক্তি সংগ্রামের ধর্ম। ১৮৮১ খ্রী. দত্ত ডাঙায় (খুলনা জেলা, অধুনা বাংলাদেশ) গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া ধর্মান্দোলনের পতাকাতলে যে গণসমাবেশ হয়েছিল, তা ছিল শ্রমজীবী নমশূদ্র সমাজ তথা শ্রেণী-বর্ণ বিভক্ত সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত মানুষের গণজাগরণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বিভিন্ন সময় মতুয়া ধর্মান্দোলনকে কেন্দ্র করে নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক কর্ম-প্রচেষ্টা সংগঠিত হয়। মতুয়া ধারায় রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে—ধর্মগ্রন্থ, সাধনসংগীত, নাটক, জীবনীগ্রন্থ, প্রবন্ধ, কবিগান, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি। যে অর্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে ষোড়শ শতকের নবজাগরণের নেতা বা রাজা রামমোহন রায়কে উনিশ শতকের নবজাগরণের নেতা বলে অভিহিত করা হয়, সেই অর্থে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বাংলার অবহেলিত লোকায়ত সমাজের সব জাগরণের অগ্রদূত বলা যায়। বাংলার যুগসঙ্কটের ঐতিহাসিক লগ্নে, চৈতন্য-দেবের উদার মানবতাবাদী ধর্মান্দোলনের বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ হয়েই হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের আবির্ভাব তথা মতুয়া ধর্মান্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার জন্য এবং বৈষ্ণবের "কুটি-নাটি" "খণ্ডন" করার জন্যই, চৈতন্যদেব পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীহরিচাঁদরূপে অবতীর্ণ হন এবং হরি-গুরুচাঁদ লীলায় শূদ্ররূপে অবদমিত ও নীচু জাতিবলে নির্যাতিত নিম্নবর্ণের নমশূদ্রকুলকে মানবিক মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করেন।

চৈতন্যদেব ও লোকায়ত উত্তরাধিকার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বাউল প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে বিচার্য। লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায় বা সহজিয়া সাধকদের নিকট চৈতন্যতত্ত্ব বহুলাংশে বাউলতত্ত্বেরই পরিপূরক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই এই ভ্রান্ত

ধারণার নিরসন হওয়া প্রয়োজন যে বাউলের উদ্ভব চৈতন্যোত্তর কালের ঘটনা নয়, ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ তথ্য, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ও অন্যান্য পুঁথি-পত্রের দৃষ্টান্তে আমাদের মনে হয় বাউলের উৎপত্তি চৈতন্যোত্তর সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা নয়, "বাউল" পূর্ব প্রচলিত দেহ সাধনার লোকায়ত ঐতিহ্যজাত প্রত্যয়।

ইতিহাসগত, ভাবে বাউল সাধনা চৈতন্য পূর্ববর্তী হলেও, বাউল সাধকগণ-বিশিষ্ট অর্থে চৈতন্যদেবকে বাউল সাধকদের ধারায়, তথা 'ব' স্রোতের ধারায় বিশেষরূপে গণ্য ও মান্য করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বাতুল, আকুল, বাউর বা বাউরা, বলী বাওয়ালী, বাঞ্চল বা বাজুল, আউলিয়া বা আউল্যা, বায়ু প্রভৃতি শব্দ থেকে সম্ভবত 'বাউল' শব্দটির উদ্ভব হয়নি এবং তার সাধন প্রত্যয়গত অর্থ উন্মত্ত, বিহ্বল, পাগল বা আত্মহারা নয়। ক্ষেত্র গবেষণা ও গুহ্য সাধকগণের দীর্ঘ সাহচর্যের ভিত্তিতে বলা যায় বুৎপত্তিগত অর্থে বাউল কোন সম্প্রদায়বাচক শব্দ নয়, গুহ্য সাধন মার্গের এক বিশিষ্ট স্তর বাউল। ব-সাধনায় সিদ্ধিলাভকারী তথা "ব" সাধনার "উল" বা সন্ধানলাভে সক্ষম সাধকগণই গুহ্য সাধনার পরিভাষায় বাউল ['ব সাধনায় উল্ হয়েছে যার=বাউল]। বাউল ধর্ম বলা বাহুল্য চৈতন্য-বৈষ্ণব প্রভাব জাত নয়, তা দেহাচার-যোগাচার-যৌনাচারমূলক আদিম লৌকিক কৃত্যাদির পথ ধরে বিবর্তিত, সহজিয়া অভিধায় বিশিষ্টার্থে যা "বিবর্তবিলাস"। পুরুষ-প্রকৃতির মিলনজাত রজ-বীজের ক্রিয়া বা রসের ভিয়ানে বিবর্ত বিলাসের সাধনাই 'ব'—সাধনা বা সহজিয়া সাধনা। 'ব' সাধনায় সিদ্ধ হওয়াই বাউল সাধনার লক্ষ্য, যার মূল অভিপ্রায়—সহজ আনন্দলাভ। তন্ত্র বা বজ্রযানে যা "বজ্রোলীসিদ্ধি" লোকায়ত স্তরে সাধনমার্গে তা-ই যোনী সাধনা বা যোগ মিলন ক্রিয়াচার মুখ্য বায় সাধনা ও বিন্দুসাধনার সিদ্ধিজনিত "ব-সিদ্ধি বজ্রযানে যিনি বজ্রসত্তাকে উপলব্ধি করেন তিনি স্বয়ং "বজ্রসত্ত" হন। আর লোকায়ত সাধনায় যিনি 'ব' সাধনায় উল বা সন্ধান প্রাপ্ত হন তিনিই হন 'বাউল'।

বাউলগণ স্বকীয় সাধনমার্গের বিশিষ্ট ধারণা ও "ত্রি তত্ত্বের" অনুগামীরূপেই চৈতন্যদেবকে "মহাবাউল" রূপে গণ্য ও মান্য করেন। তাঁদের ধারণায় শ্রীচৈতন্য নীলাচল লীলায় রাধাসুলভ ভাবোন্মাদনায় ও চিন্ময় প্রকৃতির মর্ম-সাধনায় 'ব' সাধনার চরম পরিণতি তথা রাগানুরাগাভক্তির পরমোৎকর্ষ অবস্থা আস্বাদন করেছেন। রাগানুরাগে সাধনমার্গে সিদ্ধ পুরুষের নিকট পুরুষ বা প্রকৃতির ভিন্ন প্রত্যয় থাকে না। রাগানুরাগার সাধনমার্গের পরমোৎকর্ষ অবস্থাতেই শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত সত্তা তথা রস-কৃতি বা রজ-বীজের

"গক্রিড়ীসাম্য" জনিত অটল অবস্থায় উন্নীত হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ মিলন জাত দিব্যসত্বা বা রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত সত্বার প্রকাশ ঘটেছিল—এই প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে সাধন মার্গের গুহ্যতত্বে শ্রীচৈতন্য পরম তত্ত্বরূপে স্বীকৃত। বাউলের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত রূপদেহ মধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব বা দিব্যসত্বা। বৌদ্ধসহজিয়া মতে যা শূন্যতা ও করুণার এবং হিন্দুতন্ত্রে শিবশক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির মিলনজাত অভেদত্ব বোধ তথা মহাসুখজাত "মহামুদ্রা"—সেই মহামুদ্রায় স্থিত বাউলই "মহাবাউল" বা "একক বাউল"। এই অর্থেই শ্রীচৈতন্য বাউল সাধকগণের নিকট "মহাবাউল" বা "একক বাউল" হিসাবে স্বীকৃত। সহজিয়াও বাউল সাধনার পরিভাষায় চৈতন্যতত্বে বাকী প্রসঙ্গ তথা প্রকৃতিভজন তত্ত্ব, রাধাভাব দ্যুতির প্রসঙ্গ তথা পুরুষ-প্রকৃতি একাত্মতত্ত্ব এবং দেহ সাধনার শিক্ষাপ্রসঙ্গ তথা "বিবর্তবিলাসতত্ত্ব"—এই ত্রিতত্ত্বের মিলিতরূপ প্রত্যক্ষ করা হয় এবং 'ব' স্রোতের সিদ্ধসাধক "মহাবাউল" রূপে চৈতন্যদেবকে গণ্য ও মান্য করা হয়।

বাংলার প্রচলিত লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে উপরে বর্ণিত তিনটি প্রতিনিধিস্থানীয় (কর্তাভজা—মতুয়া—বাউল) ধারায় শ্রীচৈতন্যর যে লোকায়ত উত্তরাধিকারের বিশেষ অবস্থান প্রত্যক্ষ করা যায়, তা কমবেশি বাংলার সমগ্র লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সামাকেই সম্ভবত প্রযোজ্য। চৈতন্যদেবের মানবমাহাত্ম্য মূলক সহজসাধনা ও প্রেম ভক্তির সর্বজনীন আদর্শ আশ্রয় করেই লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়সমূহ শ্রীচৈতন্যকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। চৈতন্যদেবের ধর্মাদর্শ ও ধর্মান্দোলনের লৌকিক ও উদার আবেদনের মধ্যে নিজেদের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করেই লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়সমূহ চৈতন্য-দেবকে অবলম্বন করেছিল। লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে আজও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদহীন সাধারণ মানুষের মিলন-মিশ্রণের সাধনা, আধ্যাত্মিকসাম্য ও জীবনবাদের উদার সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করা যায়, যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং আধ্যাত্মিকতা ও জীবনবাস্তবতা পরস্পরের পরিপোষক। শুধু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে নয়, এই সমস্ত লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলি অনেক ক্ষেত্রে যে আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক সংগ্রামে সংগঠিতভাবে এগিয়ে এসেছে এ তথ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলি চৈতন্যদেবের মানবতা নির্ভর দেববাদকে তত্ত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ করেন নি, সংগঠনে ও কর্ম-ধারায় তাঁকে স্বীকার ও প্রসারিত করেছেন। চৈতন্য আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে বলা যায়, যে সমাজের উচ্চস্তরে চৈতন্যের প্রভাব মহান্ত গোস্বামীদের

সিদ্ধান্তে সামাজিক শক্তি স্ফূর্তি লাভ না করলেও, লোকায়ত সমাজের প্রসারিত ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব বৃহত্তর সামাজিক শক্তিতে মূর্ত ও পর্যবসিত হয়েছিল। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও ফলশ্রুতি লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় ও গোষ্ঠীসমূহের প্রবাহে, এমনকি আদিবাসী জনজাতির ধারায়, অদ্যাপি লক্ষ্য করা যায়। প্রকাশ থাকে যে, শুধুমাত্র ধর্মান্দোলনগত দিক থেকে নয়, সর্বজনীন সংস্কৃতির জাগরণের দিক থেকে শ্রীচৈতন্যের কৃতি লোকসমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। অভিজাত মার্গ সংস্কৃতির পাশাপাশি "লোককৃতি" (ফোকলোর) বা লোকসংস্কৃতির বহু বিচিত্র ধারায় শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্মের সজীব প্রেরণা ও প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

শুধুমাত্র লোকধর্ম বা লোকায়তধর্ম সম্প্রদায়গত দিক থেকে নয়, লোকসমাজে চৈতন্যদেবের বহুবিস্তারী প্রভাবের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় বাংলার লোক-সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল বিবিধ শাখা-প্রশাখায় শ্রীচৈতন্য রেনেশাঁর প্রভাব যেমন একদিকে উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, বৈষ্ণব পদাবলী, উচ্চাঙ্গ-কীর্তন রীতি, মন্দির স্থাপত্য, জীবনীগ্রন্থাদিতে দেখা যায়, তেমন তার প্রতি-রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, লোকসংস্কৃতির বিচিত্র প্রকাশে। বাংলার লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকনাট্য প্রভৃতির সৃষ্টিশীল ধারায় চৈতন্য প্রসঙ্গ নানাভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। চৈতন্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার লোকসমাজ চৈতন্য জীবন ও সাধনার নিদর্শনকে তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অঙ্গীভূত করে সৃষ্টি করেছে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র সম্ভার। চর্যাপদ বৈষ্ণব-শাক্ত পদাবলীর পাশাপাশি লোকায়ত ধর্ম—সাধনা নির্ভর যে লৌকিক পদাবলীর ধারা লক্ষ্য করা যায়, তার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য (দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লৌকিক পদাবলীর যথাযথ মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি আজও করা হয় নি।) এদিক থেকে মহুয়াগীত, ভোকের গীত, বাউল ও সাধন সংগীতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে চৈতন্য ধর্মান্দোলনের অন্যতম প্রধান পরিচায়ক কীর্তনের ও শ্রীঘোষের প্রবর্তনায় যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্য লোকসংস্কৃতির পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছিলেন, জনসংযোগ সাধন ও গণ আন্দোলন সৃষ্টির জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে। এই সূত্রে কীর্তনে লৌকিক ঐতিহ্যজাত মাদলের ব্যবহার থেকে শ্রীখোলের প্রবর্তনা এবং আদিবাসী গোষ্ঠীগত নৃত্য-গীতি ধারা থেকে কীর্তনের সনৃত্য সংগীতরীতি প্রচলনের ইতিহাস বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মহৎ প্রতিভাধর সার্থক যুগপুরুষ

ছিলেন বলেই শ্রীচৈতন্য জীবন ও কর্মধারায় জাতীয় ঐতিহ্যের মহৎ ও ক্ষুদ্র ঐতিহ্যকে (Great tradition and little tradition) সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রেই তিনি লোকসংস্কৃতির পরম্পরাগত সৃষ্টিশীল প্রবাহে সঞ্চারিত করেছিলেন স্বীয় উত্তরাধিকারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা।

৪

লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোকে মনে হয়—শ্রীচৈতন্যের অভিষ্ট মৌল ভাবাদর্শ ও মানবতাবাদী সংস্কার প্রয়াস সমাজের উচ্চস্তরে বা স্মার্ত ধর্মের প্রকোষ্ঠে লালিত হয়নি—তা প্রতিপালিত হয়েছে লোকায়ত সমাজের মুক্তাভালে। লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কিত দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার সূত্রে মনে হয় শ্রীচৈতন্যের বিদ্রোহের বাণী গোস্বামী প্রণীত ও প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে সংগঠিত হয়নি, তা মূর্ত হয়ে উঠেছে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের কর্মধারায়। সেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং আধ্যাত্মিকতা ও জীবন বাস্তবতা পারস্পরিক পরিপূরকতায় সমুজ্জ্বল। পূর্বাপর অবস্থা পর্যালোচনায় এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে, কালক্রমে মূল বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যের উদার আদর্শ বহুলাংশে স্তিমিত এবং মঠ-মোহান্ত কেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক ধারায় চৈতন্য আন্দোলন স্থূল প্রাতিষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ হলেও, তাঁর উদ্দীপনাময় উপস্থিতি সতত সক্রিয় থেকেছে লোকায়ত উত্তরাধিকারে, যেখানে ধর্মান্দোলন বহুলাংশে কর্মমুখীন সামাজিক তাৎপর্যে সক্রিয় ও কার্যকর রূপে পরিগ্রহ করেছে শত সীমাবদ্ধতা সত্বেও। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস শাস্ত্রশাসিত বৈষ্ণব সমাজে উচ্চবর্ণ ও পণ্ডিত—গোস্বামীগণের প্রভাবে হিন্দুয়ানার রক্ষণশীলতার ক্রমাধিপত্য প্রাপ্ত হলেও বৃহত্তর জনসমাজে চৈতন্য আন্দোলনের অন্তর্হিত তাৎপর্য সম্প্রসারিত ও কার্যকররূপ পরিগ্রহ করেছিল—নিত্যানন্দপ্রবাহ ও লোকায়ত উত্তরাধিকারে। দুঃখের বিষয় লোকায়ত উত্তরাধিকারের বলিষ্ঠ দিকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত থেকেছে বা ভুলভাবে উত্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই সত্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে ঐতিহাসিক ও সমাজ-পরিপার্শ্বিকগত কার্যকারণ সম্পর্কের প্রভাবে চৈতন্যদেবের জীবনসাধনা ও ধর্মান্দোলন একমুখীন সমরৈখিক ধারায় প্রবাহিত হয়নি, তেমন তার প্রকৃতি ও প্রভাবের প্রতিরূপও সর্বস্তরে সমান নয়। স্তরানুসারে শ্রীচৈতন্য ধর্মান্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণের লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের পদ্ধতি বিস্তার অভিমুখীন হয়ে চতুর্বিধ ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়—

১. প্রারম্ভিক পর্যায়ে—পণ্ডিতমণ্ডলী ও অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ

২. মধ্যবর্তী অধ্যায়ে—সামাজিকভাবে সক্রিয় এবং ব্যাপকগণমুখীনতায় উদ্দীপ্ত

৩. মোহান্ত গোস্বামী প্রভাবিত স্তরে—শাস্ত্র ও উচ্চাভিমুখী আদর্শে সমুন্নত এবং জীবন বিচ্ছিন্ন দার্শনিক তত্ত্বমুখীনতাও আনুষ্ঠানিকতায় আচ্ছন্ন।

৪. লোকায়ত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে—পূর্বাপর জনজীবন-আশ্রয়ী এবং কমবেশি সামাজিক সক্রিয়তায় উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত।

উপযুক্ত চতুর্বিধ ধারার বস্তুমুখীন বিশ্লেষণের মাধ্যমে চৈতন্যজীবন ও ধর্মান্দোলনের বিচিত্রমুখী গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

এ তত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত যে উদার মানবতা নির্ভর প্রতিবাদী ধর্মান্দোলন ও সমাজ সংস্কারের নেতারূপে আবির্ভূত হলেও, শ্রীচৈতন্য শেষ-পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়েছিলেন ভাবোন্মাদ সাধকরূপে এবং ভক্ত-গোস্বামীবৃন্দের সচেতন প্রয়াসজাত তত্ত্বদার্শনিকতায় পরিগণিত হয়েছিলেন রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ রসরাজ-মহাভাবজাত পরম তত্ত্বরূপে। এইভাবে প্রকৃত চৈতন্যের স্বকীয় সত্তা বহুলাংশে আচ্ছন্ন হলেও, ব্যাপকতর তাৎপর্যে তা অবলুপ্ত হয় নি, বস্তুমুখী ইতিহাসের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যের ভাবান্তর বা রূপান্তর যে পথে বা রূপেই সাধিত হোক না কেন, তাঁর একান্ত মনোবাসনা যে শেষ পর্যন্ত ছিল বৃহত্তর জনমুখীনতায় সমর্পিত, তার বিশিষ্ট প্রমাণ অন্ত্যলীলায় নিত্যানন্দের প্রতি উক্তি বা প্রত্যাদেশের মধ্যে সুস্পষ্ট—

শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপপ্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাবো প্রেম সুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুণিধর্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তি রস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে!
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া করো গিয়া সভার মোচন॥

(চৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য—পঞ্চম অধ্যায়)

নীলাচললীলায় শ্রীচৈতন্য জ্ঞান-কর্ম ত্যাগ করে ও ভক্তিমার্গে একান্ত রূপে আত্মসমর্পণ করে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হলেও যে আ-চণ্ডাল দ্বিজ ভক্তি-প্রেম প্রদানের ও উদারমানবতার বাণী প্রচারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুত হন নি, তার প্রমাণ নিত্যানন্দর প্রতি উপরে বর্ণিত উক্তি। শ্রীবাস অঙ্গনে অভিষেককালে স্ত্রী-শূদ্র-চণ্ডাল সকলকে ধর্ম দানের যে মহান ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল, তা প্রতিপালনে স্বীয় অক্ষমতার কথা স্মরণে রেখেই সম্ভবত মহাপ্রভু প্রভু নিত্যানন্দকে যোগ্য উত্তরাধিকার নির্বাচন করে যথাযথ উপদেশ বা অনুরোধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য পরবর্তী অধ্যায় নিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীচৈতন্য উদ্বোধিত ধর্মাদর্শের উদার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন এবং ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে একাত্ম করে এক বিশেষ "সামাজিক-ধর্মীয়-সাম্যবাদ" প্রচার করেছিলেন, যার বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল—নিত্যানন্দর গণ, বীরভদ্র ও জাহ্নবা দেবীর কর্মপ্রয়াস এবং লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের সামগ্রিক প্রাণবন্ত প্রচেষ্টায়। শ্রীচৈতন্যর মানবতা নির্ভর গতিশীল ধর্মচেতনার মহৎ ধারণা একদিকে ক্ষেত্রবিশেষে ষড়গোস্বামী ও শাস্ত্র-পুরাণের প্রভাবে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হলেও, অন্যদিকে তা বৃহত্তর লোকায়ত ধারায় পরিব্যাপ্ত হয়—নিত্যানন্দ-বীরভদ্র-জাহ্নবাদেবীর গণমুখীন কর্মপ্রয়াসে। এই প্রয়াসের উত্তরাধিকার সতত সংরক্ষিত বা প্রতিপাদিত নিশ্চয় হয় নি (অনেক ক্ষেত্রে—বিচ্যুতি-বিকৃতি বা কদাচার জনিত স্খলন দেখা দিয়েছে।) কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার বিবর্তিত সজীবপ্রবাহ লোকায়ত ধর্ম সাধনা ও সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য আন্দোলনের সর্বজনীন আলোড়ন লোকায়ত ধর্মের সমাজ তত্ত্বগত ধারায় ক্রমসম্প্রসারিত রূপ পরিগ্রহ করেছে চৈতন্যোত্তর লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলির সচল প্রবাহে। তাই ব্যাপক অর্থে বলা যায়—নিত্যানন্দ প্রভুকে বাদ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব ও কর্মধারার পরিচয় পাঠ যেমন অসম্ভব, তেমন বীরভদ্র-জাহ্নবীদেবী ও লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের ইতিহাস পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রবর্তিত ভাবাদর্শ ও কর্মপ্রবাহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন অবাস্তব। গণনায়ক শ্রীচৈতন্যর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তাই যুগপৎ নিত্যানন্দ-বীরভদ্র-জাহ্নবা দেবীর ধারা অনুশীলন এবং বাংলার লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের ইতিহাস অনুধাবন একান্ত অনিবার্য।

---

* ডঃ সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত "গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্যদেব" গ্রন্থে (যন্ত্রস্থ) বর্তমান প্রবন্ধের পূর্ণরূপ দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক: পরিচয়।

রবীন্দ্র-চিত্র ভাবনার স্বরূপ সন্ধানে

জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানা

একসময় কবি বলেছিলেন—"ছবি হল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে।" সত্তরের কোঠায় এসে কবি ছবি আঁকা শুরু করলেন—প্রায় ১০ থেকে ১১ বছর এক নাগাড়ে হাজার দুই আড়াই ছবি এঁকে হঠাৎ একদিন রং-তুলি গুটিয়ে নিলেন। যেন ছবির মধ্যে তাঁর যা বলার ছিল তা বলা হয়ে গেল। কিন্তু ঐ কটা বছরে তিনি যা আঁকলেন তাকে "অগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরণের" সঙ্গে তুলনা করলেন—অবনীন্দ্রনাথ। তিনি আরও বললেন যে—কবি চিত্র জগতে একটা "ওলট পালট" কাণ্ড ঘটিয়ে গেলেন। সুভো ঠাকুরের মতে—'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি যদি নোবেল পুরস্কার পেয়ে থাকেন তবে চিত্র শিল্পের জন্য তাঁর আরও বড়ো মাপের পুরস্কার পাওয়া উচিত। কেউ বলেন—শিল্পজগতে তিনি অনন্য, কারও মতে—তিনি ছবি আঁকার প্রথা পদ্ধতির ধার ধারতেন না বলে কখনো উৎরেছেন, আবার কখনো পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। কেউ কেউ আবার বলেন যে—তাঁর কাব্যের জগৎ আর ছবির জগৎ পরস্পর বিপরীতধর্মী।

কবির 'শেষ বয়সের প্রিয়াকে নিয়ে গবেষকদের অন্তহীন জিজ্ঞাসা। এগুলিরই উত্তর খুঁজতে গিয়ে এই নিবন্ধের অবতারণা। কবির ছবিকে চিনতে গিয়ে আমাদের মনে অন্তত কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে—(১) কবি হঠাৎ শেষ বয়সে ছবির প্রেমে পড়লেন কেন? (২) সমসাময়িক কোন পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের ছায়া তাঁর ছবির মধ্যে পড়েছে কী? (৩) তাঁর ছবির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছে কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে—প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে—কবির ছবির রাজ্যে আবির্ভাবের মধ্যে কোন আকস্মিকতা ছিল বলে মনে হয় না। সেকালের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের অন্যতম পীঠস্থান। সেখানে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীতের সঙ্গে চিত্রশিল্পেরও বিশেষ চর্চা ছিল। কবিতা লিখতে লিখতে কাটাকুটি করা এবং কাটাকুটিগুলোকে একটা বিশেষ চিত্ররূপ দেওয়া ছিল কবির খেলা। তাছাড়া ছবি আঁকার প্রবৃত্তি মানুষের প্রকাশ মাধ্যমের অঙ্গ। ভাষা আবিষ্কারের অনেক আগেই মানুষের সৌন্দর্য

ভাবনার প্রকাশ ছবির মাধ্যমেই ঘটেছিল। অতএব, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ভাবনা যে একসময় ছবিকেও আশ্রয় করবে এতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না।

জীবনের শেষ পর্যায়ের আগে রবীন্দ্রনাথ রং-তুলি না ধরলেও তিনি যে ছবির সমঝদার এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এ বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না। শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা এবং তৎকালীন খ্যাতনামা শিল্পাচার্যদের হাতে কলাভবনের দায়িত্ব অর্পণ তার চিত্র-প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। কলাভবনে চিত্র-সম্বন্ধে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরিও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া, বিদেশে ভ্রমণকালে বিভিন্নদেশের কলাচর্চার সঙ্গে যে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়েছিল, এ বিষয়েও সংশয় থাকতে পারে না। এ সবই হোল ফসল ফলাবার আগে জমি তৈরির প্রয়াস। অতএব, পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ তিনি রং-তুলির রাজ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন—একথা কেমন করে বলা যায়! একে বরং দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত অভীপ্সার প্রকাশ বলাই ভালো। তাই বলি যে—শুরুটা বিনা নোটিশে হলেও পটভূমি আগে থেকেই তৈরি ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হোল : দীর্ঘকাল ধরে যে বাসনা অন্তরের গভীরে লালিত-পালিত হতে চলেছিল তাকে প্রকাশ করার ইচ্ছা হল কেন? বিশেষত জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সাহস এবং আগ্রহ কেন জাগল? এ সম্পর্কে তিনটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে :—(এক) এক-ধরনের অতৃপ্তি বা অপূর্ণতার বোধ; (দুই) ভারতীয় চিত্রভাবনার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিত্রের নব আন্দোলনের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভারতীয় চিত্ররীতির সংস্কার সাধন; (তিন) তাঁর নিজের সৃষ্ট সাহিত্য এবং সঙ্গীতের স্থায়ী মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয়।

প্রথম কারণ সম্পর্কে বলা যায় যে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমৃদ্ধ চিন্তাধারাকে ব্যক্ত করার জন্য কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, সাংকেতিক নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি নানা মাধ্যমকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বিশ্বের কোন কবি সাহিত্যিককে সম্ভবত আত্মপ্রকাশের জন্য এতগুলি মাধ্যমে ব্যবহার করতে দেখা যায় নি। প্রশ্ন জাগে আমাদের কবি কেন এতগুলি মাধ্যমের সাহায্য নিয়েছিলেন? সম্ভবত এক ধরনের অতৃপ্তির বেদনা তাঁকে নিয়ত তাড়া করে বেড়াত। এই অতৃপ্তি বা অপূর্ণতার বোধ-এর জন্য একই ভাবনাকে উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। একটা ভাবনার পূর্ণরূপকে ধরার জন্য তাঁর

এই প্রয়াস। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"। সেই ভূমাকে, সেই পরম পূর্ণকে না পেলে তৃপ্তি কোথায়! সে যেন অধরা। সে কবিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ধরা দিচ্ছে না। তাকে ধরতেই নানা ফাঁদ। কবি তাই শেষ জীবনে তাকে নতুন ফাঁদে জড়াতে চাইলেন। আর সেই ফাঁদ হল তাঁর ছবি যা তাঁর জীবনের গতিপথকে ভিন্ন খাতে বইয়ে নিয়ে গেল। এক নতুন খেলায় তিনি মাতলেন, নতুন রসে অবগাহন করলেন।

চিত্রজগতে আসবার দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে তৎকালীন ভারতীয় চিত্রজগতের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তখনকার ভারতীয় জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিকতার জোয়ার চলছিল। সবকিছুর মধ্যে ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়ার এক সুতীব্র আবেগ চিন্তানায়কদের পেয়ে বসেছিল। সেই ভাবধারার বাহকরূপে সেকালের অধিকাংশ চিত্রশিল্পীই প্রাচীন ভারতের কোন না কোন ধারাকে অবলম্বন করে ছবি আঁকছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ দরবারি ও কাংড়া রীতি, নন্দলাল অজন্তা রীতি এবং যামিনী রায় লোক শিল্পকে উপজীব্য করে ছবি এঁকে চলেছিলেন। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ ছিল না। ভারতীয় কলা-রসিকরা যখন দেশীয় ঐতিহ্য অন্বেষণে মত্ত তখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছিল পাশ্চাত্য শিল্পভাবনার দিকে। তিনি বলেছিলেন—'গগন, তোমরা কবে ঘর থেকে একবার শিল্পজগতে বেরিয়ে লড়বে?" পাশ্চাত্যের শিল্প আন্দোলন-এর পরিচয় পেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে—দেশীয় ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ছে। নতুন চিন্তাভাবনা দ্বারা একে পুষ্ট করা দরকার।

সৌন্দর্যের একটা নতুন মাত্রা তিনি খুঁজে পেলেন। যা দৃষ্টিনন্দন তাই-ই কেবল সুন্দর নয়। পাশ্চাত্যের এই ভাবনার সঙ্গে ভারতীয় রীতির সমন্বয় না ঘটালে ভারতীয় চিত্রজগৎ-এর অগ্রগতি সম্ভব হবে না। কিন্তু কবি দেখলেন যে কেউই ঠিক ঐভাবে চিন্তা করছে না। তাই অনেকটা বাধ্য হয়ে ভারতীয় চিত্রজগতে নতুন মাত্রা যোগ করার ব্রত নিয়ে রং-তুলি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এজন্য কোন বিশেষ ট্রেইনিং নেওয়ার অবকাশ হল না। তিনি বুঝলেন—তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব প্রায় সমাগত। তাঁর জীবদ্দশাতেই যদি নব পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটান না যায় তবে হয়ত ভারত চর্বিত-চর্বণ করেই দিন কাটিয়ে দেবে। এই আশঙ্কার তীব্রতা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে নয়, প্রাচ্যের কাঠামোতে পাশ্চাত্যের নতুন

রূপারোপের ভাবনা তাঁর চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। তিনি চিত্রজগতে প্রবেশ করেছিলেন, একটা বিশেষ mission নিয়ে। কিন্তু সংশয় ছিল—তাঁর এই mission পূর্ণ হবে কি? পাছে মৃত্যুদূত বিনা পরোয়ানায় হাজির হয়ে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়—এই অজানা আশঙ্কায় সম্ভবত তিনি অস্বাভাবিক দ্রুততার ছবি আঁকতে শুরু করে দিলেন। মাত্র কয়েক বছরের সযত্ন প্রয়াসে কয়েক হাজার ছবি এঁকে রং-তুলি রেখে দিলেন। হয়তো ভাবলেন—তাঁর যা করার ছিল তা শেষ হয়েছে! এইভাবে চিত্রজগতে একটা আলোড়ন তুলে ভারতীয় শিল্প-জগতের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

ছবির জগতে প্রবেশের কারণ খুঁজতে গিয়ে তৃতীয় পর্বে আমরা কবির নিজস্ব চিন্তা ভাবনার অবতারণা করে এই প্রসঙ্গের ছেদ টানব। দীর্ঘকাল সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে অভিপ্রকাশ-এর পর কবির মনে এদের স্থায়ী মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় জেগেছিল। এক সময় তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম হল ভাষা, যা দেশ কালের সীমাকে ডিঙোতে পারে না। এক ভাষার সাহিত্য রস ভাষান্তরিত হলে তেমন করে উপভোগ্য হয় না। তার "রস মরে যায়"। আবার "এককালে যে সাহিত্য নিয়ে হৈচৈ হয়, পরবর্তিকালে তাকে ছেলেমানুষী বলে ত্যাগ করা হয়ে থাকে। ছবির এক হিসেবে স্থায়িত্ব অনেক বেশি। চোখের দেখা, ভাষার দেখার তফাৎ এখানেই। শিল্পী তাদের সৃষ্টি রেখে যায়। যুগ যুগ ধরে লোকেরা দেখে। আর আমার বেলায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই তা ধূলিসাৎ হবে। তাই এক সময়ে ভাবি এত কেন লিখেছি জীবনে! দু'চার কথা লিখলেই হোত।" তিনি আরও বলেছেন—"এই টলমলে অবস্থায় ছোটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের—গান আর ছবি।" এক সময় কবি বলেছিলেন যে—আমার সাহিত্য কালের গহ্বরে লোপ পেতে পারে কিন্তু আমার গান চিরন্তন হয়ে কানে বাজবে। কিন্তু পরে এই গানের স্থায়ী মূল্য সম্পর্কেও কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে। গান সম্পর্কে বলছেন—"স্থায়ী হয়তো বা, কিন্তু universal বলি কী করে? আমাদের গান তো অন্য জাতির প্রাণ স্পর্শ করতে পারে না।" সাহিত্য এবং সংগীতের স্থায়ী মূল্য সম্পর্কে এক ধরনের সংশয় যে কবিকে ছবির রাজ্যে টেনে এনেছে একথা বোধহয় নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এখন আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ঐ সময় ইউরোপে

গতানুগতিক চিত্ররীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ছবি সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনার সূচনা হয়েছিল। সনাতন রীতিকে ভেঙেচুরে নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে ছবিকে প্রতিষ্ঠা করার যে সব আন্দোলন ইউরোপে দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে ইম্‌প্রেশনিজম্‌ এবং এক্সপ্রেশনিজম্‌ (Impressionism & Expressionism)-এর কথা আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। কারণ রবীন্দ্রনাথের উপর এই দুটি আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে গবেষকরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। এই সব নব্য আন্দোলন শুরুর আগে অন্যান্য দেশের মত ইউরোপেও নির্দিষ্ট পূর্ব পরিকল্পনা-ভিত্তিক নয়ন মনোহর বাস্তবানুগ ছবি আঁকার রীতি প্রচলিত ছিল।

ইম্‌প্রেশনিস্টরা বললেন যে—পূর্বপরিকল্পনা ভিত্তিক ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে ছবি সত্য হয়ে ওঠে না। শাশ্বত বা চিরন্তন বলে কিছু নাই। সবই পরিবর্তনশীল। ছবির কাজ হল এই পরিবর্তনশীলতা বা প্রতিভাসকে ধরা। আমরা দেখি বস্তুর রং-কে। রং-এর উৎস হল আলো। এই আলোই বস্তুকে দেখায়। আলোর বা রং-এর পরিবর্তনে বস্তুর রূপেরও পরিবর্তন হয়। এঁরা তাই রং-এর মাধ্যমে ধরতে চাইলেন বস্তুর রূপকে। একটা রং-এর উপর আর একটা রং চড়ালে তাদের পারস্পরিক এফেক্ট কী হতে পারে তারই গবেষণায় এঁরা মেতে উঠলেন। অতিসাধারণ দৃশ্য রং-এর ব্যবহারে কেমন করে অসাধারণ সুন্দর বা সত্য হয়ে ওঠে তা এঁরা দেখালেন।

গবেষকদের মতে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ইম্‌প্রেশনিস্ট এবং পোষ্ট-ইম্‌প্রেশনিস্টদের আন্দোলনের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক ছবিতে খুব চড়া রং ব্যবহার করেছেন। একটা রং-এর উপর আর একটা রং চড়ালে তার কি এফেক্ট হয় তা সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে পরের রং-টি ব্যবহার করতেন। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন পূর্ব-পরিকল্পনা থাকত না। হাতের কাছে যে রং পেতেন তাকেই ব্যবহার করতেন। প্রতিটি ছবিই ছিল তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট। শোনা যায়, তিনি নাকি ছবির সঙ্গে কথা কইতেন—"কী নেবে! লাল? বেশ, তাই নাও।" বলে খানিকটা লাল রং লেপে দিলেন। এইভাবে আঁকতে আঁকতে ছবি একটা বিশেষ রূপ পেয়ে যেত। কী আঁকবেন, সে সম্পর্কে পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই আঁকতে আঁকতে ছবি যেখানে পৌঁছাতে চায় তাকে সেখানে পৌঁছে দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ। এইভাবে আলো বা রং-এর ব্যবহারে বস্তুর দৃষ্টরূপের কিছু পরিবর্তন ঘটে যেত। গবেষকরা

একেই বস্তুর অবভাস বলে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথের উপর ইম্‌প্রেশনিস্টদের প্রভাবের কথা বলে থাকেন।

কেউ কেউ আবার তাঁর উপর এক্সপ্রেশনিজম্‌-এর প্রভাবের কথা বলে থাকেন। এক্সপ্রেশনিজম্‌ হল শিল্পসম্বন্ধীয় বিশেষ এক মনোভঙ্গী। নির্বস্তুক-ভাবকে যে শিল্পে শিল্পীত বস্তুর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং যে শিল্পে ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে শিল্প গঠনের উপাদান সমূহ ব্যবহারের ভঙ্গীর উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাই-ই এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্প নামে অভিহিত হতে পারে (প্রণবরঞ্জন রায় বিশ্বকোষ—সাক্ষরতা প্রকাশন)। বস্তুর যথাযথ উপস্থাপনে যে হেতু বস্তুর বা ঘটনার বিবরণই প্রাধান্য পায় সে-হেতু আবেগের বিশুদ্ধতা ক্ষুন্ন হয়। তাই রং ও রেখার সাহায্যে নির্বস্তুক আবেগকে বস্তুরূপের মাধ্যমে আভাসিত করাই ছবির দাবি। এতে বস্তুর নয়নমনোহরতা ক্ষুন্ন হলেও ব্যক্তির আবেগ ও ধারণার একটি রূপবন্ধ ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রসংঙ্গে এক্সপ্রেশনিস্টদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এক্সপ্রেসনিজম্‌ বলতে এক ধরনের আর্তমানসিকতার অভিব্যক্তি বোঝায়।" সমস্যা-জর্জর মৃত্যু-ভয়ে ভীত, বিচ্ছিন্ন, একক মানুষের গোপন যন্ত্রণা, হতাশা, নৈরাশ্য ইত্যাদির অভিব্যক্তি তাঁদের ছবির উপজীব্য।

অনেকের মতে এক্সপ্রেশনিস্টদের উপরোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রতিকৃতির অনেকগুলিকেই স্বাভাবিকভাবে দৃষ্ট মানুষের অবয়ব বলে গণ্য করা চলে না। তার বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে দেখা যাক। রিয়ালিস্টিক ছবি তো অনেকেই আঁকছেন। আসলে সাধারণভাবে প্রকৃতির নয়নলোভন রূপকে যথাযথভাবে ছবির ফ্রেমে ধরে রাখা শিল্পীদের অন্যতম প্রয়াস। সেই আদিম কাল থেকে মানুষ প্রকৃতিকে জীবন্ত করে চিত্রিত করার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু এই সনাতন রীতিকে কবি ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতিকে ধরতে চেয়েছিলেন নিজের আয়নায়। কোন ব্যক্তিকে যখন আমরা দেখি তখন আমরা একটা বিশেষ আবেগের মধ্যে দিয়ে দেখি। যে মানুষটার প্রতি আমার রাগ বা ঘৃণা আছে তাকে দেখতে গিয়ে তার স্বাভাবিক অবয়বের একধরণের বিকৃতি যে আমি প্রত্যক্ষ করব এতে আশ্চর্যের কী আছে? কথায় বলে—'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।' 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ তাঁর আত্মকথায় বলছেন—"সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তাপে বেঁকেচুরে গিয়েছে।" এই ভাব-

রূপকে চিত্ররূপ দিতে গেলে রং-এ ও রেখায় সন্দীপের যে অবয়ব বেরিয়ে আসবে, তাই হবে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি যাকে এক্সপ্রেশনিস্ট্ আর্ট বলা যাবে। রবীন্দ্রনাথের ছবি তাই তথাকথিত 'আনরিয়েলিস্টিক' হলেও একে 'সত্য' বলতে দ্বিধা কোথায়? ছবিতে কবির আবেগের রং তথাকথিত স্বাভাবিকতাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে একটি নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করছে। শিল্পের ক্ষেত্রে এর মূল্য কি কম?

কবির ছবিতে বিষণ্ণতা, রহস্যময়তা—যাকে এক্সপ্রেশনিস্টদের 'আর্ত-মানসিকতা' বলা হয় তারও সাক্ষ্য মেলে। একে কেউ কেউ তাঁর শেষ বয়সের ক্লান্তির ফসল বলে মনে করে থাকেন। তৎকালীন আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম, শরীরে বার্ধক্যের অবসাদ, শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশংকা এবং সর্বোপরি একের পর এক আত্মীয় হারানোর বেদনা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তাই তাঁর চেতনার রং-এ বিশ্বজগতের অন্ধকারময় ও বেদনার্ত দিনগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আর রং ও তুলিতে ঘটেছিল এরই প্রকাশ। হয়তো এজন্যই কবি শেষ বয়সে ছবির জগতে এক্সপ্রেশনিস্ট আর্টকে বেছে নিয়েছিলেন।

উপরোক্ত বক্তব্যের যাথার্থ্যকে অস্বীকার না করেও বলা যায় যে বিশ্বকবির ছবিকে কোন একটি বা দুটি ধারার প্রকাশ বলে গণ্য করা বোধহয় ঠিক হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে—তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক ছবি এঁকেছিলেন। কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যেমন অনেক মাধ্যম গ্রহণ করেছেন, ছবির ক্ষেত্রেও তিনি অনেক রকমের এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন। তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের ছবি যেমন এঁকেছেন, তেমনি জগতের আনন্দরূপকে ধরে রাখারও কম চেষ্টা করেন নি। 'জগতের আনন্দ যজ্ঞের নিমন্ত্রণও কবি উপেক্ষা করতে পারেন নি।

কোন কোন চিন্তাবিদ কবির সাহিত্য জগতের সঙ্গে চিত্রজগতের মৌলিক পার্থক্যের কথা বলে থাকেন। এঁদের মতে রবীন্দ্র সাহিত্য জগৎ এক আলোকিত আনন্দময় জগৎ, কিন্তু রবীন্দ্র চিত্র জগৎ যেন ঠিক এর উল্টোপিঠ। ছবির জগৎ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরানন্দময় জগৎ। সৌকুমার্য, লালিত্য বা লাবণ্য যদি তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হয় তবে কুশ্রীতা, রূঢ়তা বা স্থূলতা হবে তাঁর চিত্রের প্রধান উপজীব্য। তাঁদের মতে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সুরুচিসম্পন্ন পরিশীলিত মনের অভ্যন্তরে এক ধরনের অতৃপ্ত বিদ্রোহ যেন ছবির জগতে প্রকাশলাভ করে তৃপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্র চিত্র সম্পর্কে

এধরনের চিন্তা যে তাঁর কয়েকটি ছবির উপর ভিত্তি করে এক ধরনের ত্বরিত-সিদ্ধান্ত—একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জগতের মত চিত্রজগতের বৈচিত্র্যের কথা মনে রাখলে এধরনের বক্তব্যকে বাড়াবাড়ি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কবির অনেক ছবিতে বিষাদ এবং আপাত কুশ্রীতার প্রকাশ থাকলেও সব ছবি সম্পর্কে এ যুক্তি খাটেনা। আর প্রচলিত অর্থে যা কুশ্রীতা শিল্পীর দৃষ্টিতে তা 'সত্য' এবং তার মধ্যে একটা 'রস' আছে। কারণ 'রস' ছাড়া কোন সৃষ্টিই হতে পারে না। আবার 'রস' মানেই আনন্দ। আমাদের কাছে যা বিষাদ, করুণ, নিরানন্দময়, শিল্পীর চোখ তার মধ্যেই খুঁজে পায় অফুরাণ আনন্দের উৎস। তিনি করুণ, বিষণ্ণ, বিকৃত মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি যেমন এঁকেছেন, তেমনি সুদর্শন বালক, যুবা ও সৌম্যকান্তি বৃদ্ধের মুখাবয়বও এঁকেছেন। এছাড়া লাবণ্যময়ী নারী মুখশ্রীর ছবিও যে তাঁর তুলি থেকে বেরোয় নি, এমন কথা বলা চলে না। অতএব, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ কেবল কুশ্রীতা ও বিষাদের প্রতীক—একথা মেনে নেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ 'অবচেতনের শিল্পী'—এমন কথা অনেকের মত সাম্প্রতিক কালের খ্যাতনামা শিল্পী গণেশ পাইনও মনে করেন (যুগান্তর-রবিবারের সাময়িকী—৮ই মে, ১৯৮৩)। 'অবচেতনের শিল্পী' কথার অর্থ কী? ফ্রয়েডের 'অবচেতন তত্ত্বের' মূল কথা হল—মানুষের মনের অনেক অসামাজিক, অতৃপ্ত কামনা, বিশেষত যৌন কামনা যুক্তিবাদী চেতন-মন নানা কারণে স্বাভাবিক জীবন-চর্যার মধ্যে প্রকাশ করতে পারে না। চেতন মন এই সব অপূর্ণ কামনাকে দমন ক'রে রাখে। এইসব অবদমিত কামনা চেতন মন থেকে নির্বাসিত হলেও অবচেতনের অতলে গহ্বরে আশ্রয় পায়। সেখানেই তারা লালিত পালিত হতে থাকে এবং যুক্তিবাদী চেতনার বেড়াজালকে ডিঙিয়ে আলোর রাজ্যে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। হঠাৎ চেতনার কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঐ অবদমিত ইচ্ছা চোরা পথে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের চিত্র জগৎ কি এই অবদমিত ইচ্ছার (যাকে ফ্রয়েড 'লিবিডো' বলেছেন) প্রকাশ? জানা গেছে রবীন্দ্রনাথ নাকি একটি মাত্র নুড্ ছবি এঁকেছিলেন। এই একটি ছবির মাধ্যমে কি তাঁর repressed sex desire পূরণ হয়ে গিয়েছিল? তাছাড়া, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী যুক্তি মনের শিথিলতা ছাড়া অবদমিত ইচ্ছা প্রকাশলাভ করতে পারে না—এটাই যদি সত্যি হয়, তবে কি বলতে হবে ছবি আঁকতে গিয়ে কবির যুক্তিবাদী মন ছুটি নিয়েছিল? তাঁর লেখায় আবেগের প্রকাশ

থাকলেও যুক্তিকে ডিঙিয়ে যাওয়ার প্রয়াস প্রায় কোথাও দেখা যায় না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কথায় বা কাজে কোথাও যুক্তির অভাব ঘটেছে এমন অপবাদ কেউই দিতে পারবেন না। তাঁর পরিমিতিবোধ ছিল প্রখর। আবার ছবির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনেক বেশি সচেতন ও সতর্ক। তাঁর নিজের কথাতেই আসা যাক—"প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই।" আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। কারণ সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার।" এই পরিমিতিবোধ বা সংযম সম্পর্কে সচেতন সতর্কতা কি অবদমিত ইচ্ছার অসতর্ক প্রকাশ হ'তে পারে? তাই রবীন্দ্রনাথের ছবিকে 'অবচেতনের প্রকাশ' না বলে 'সমৃদ্ধ স্মৃতির প্রকাশ' বলাই বোধ হয় বেশি যুক্তিযুক্ত। শিল্প চেতনার স্তরকে না ছুঁয়ে প্রকাশ পেতে পারে কি? এসম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :—"জীবনের নানা পর্বে দেখা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্মরণীয় সূর্যোদয়, করুণ সূর্যাস্ত, জল, স্থল, আকাশ, মানুষ, মনুষ্যেতর জীব—স্মৃতির জগৎ থেকে এসব তুলির মুখে ফুটে উঠেছে।" কবি নিজেই বলেছেন—"নারীমুখের ছবি আঁকতে গেলে তাঁর বৌঠানের চোখ দুটি মনে পড়ে যায়। হয়তো বা তুলির ছোঁয়ায় ফুটেও ওঠে।" তাই শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে—সৃষ্টি মাত্রই চেতনার স্তর বেয়ে আসতে বাধ্য। কবি নিজেও বলেছেন—"প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে হয়ে গিয়ে তারপরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তার সংগে আমার ব্যবহার।" অতএব, রবীন্দ্রনাথের ছবিকে 'অবচেতন থেকে উঠে আসা'—না বলে 'স্মৃতির মালমশলার নান্দনিক উপস্থাপনা বলাই বোধ হয় শ্রেয়।

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছে কি না—এই প্রসঙ্গের আলোচনা করে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানব। কেউ বলেন—তিনি "আনাড়ী শিল্পী।' কারণ শিল্প ব্যাকরণের তিনি ধার ধারতেন না। রং-তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ কোন কোনটা ছবির পর্যায়ে উঠে এসেছে। আবার যে গৌরাঙ্গ বাবু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে—তিনি রিয়ালিস্টিক ছবি আঁকতে জানতেন না—সেই গৌরাঙ্গ বাবুই বলেছেন যে—"তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) ছবি দেখে মনে হয় তিনি মানুষের, প্রকৃতির, পশুপাখীর গতি-প্রকৃতি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ধরে রাখতে পারতেন। নইলে 'ডোডোপাখীর' অসাধারণ ছবিটি আঁকতে পারতেন না। শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গবাবুর সিদ্ধান্ত হল— "তিনি অননুকরণীয়। এমন আনাড়ী, এমন সমৃদ্ধ শিল্পী আধুনিক ভারতবর্ষে ঐ একজনই। তাঁর কোন ধারাবাহিকতা নেই।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির মধ্যে প্রচলিত সৌন্দর্যবোধকে ভেঙেছেন—একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ছবির বিশেষ কয়েকটি ছাঁদ গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আঁকা মানুষের প্রতিকৃতিগুলো যেন বাঁকা চোরা। মেয়েদের মুখের মধ্যে এক ধরণের ডিমের ছাঁদ আছে। গলা লম্বা, অনেকটা মরালের মত। ছবিতে পুরু ঠোঁট থ্যাবড়া নাকের প্রাধান্য রয়েছে। চিকন পালিশ দিয়ে ছবিকে মাজা-ঘষা করার তাগিদ নেই। আঁকতে আঁকতে রং বুলাতে বুলাতে যেখানে 'ছবি হয়ে উঠেছে, সেখানেই ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক জীবজন্তু বা প্রাণীর ছবি এঁকেছেন, দৃশ্য-চিত্রও কম আঁকেন নি। চড়া রং-এর ব্যবহার তাঁর ছবির আর একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক ছবির মধ্যে বিষাদময়তার প্রকাশ থাকলেও জীবন্ত বা প্রাণবন্ত ছবির সংখ্যাও কম নয়। কবি বলেছেন—"সুন্দরকে প্রকাশ করাই রস সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়।…ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য এক-তলা ওয়ালা। এর মধ্যে সদর অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোঠায় মনের দান যখন মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে তখন এর মহল বেড়ে যায়, তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না।…তাকে চিনে নেবার জন্য অনুশীলন দরকার হয়।" কবি বলেছেন—"বিধাতার তুলিতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর করার দরকার বোধ করেন না।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সাহসী শিল্পী। তাঁর দেখা আর পাঁচজনের দেখা নয়। তাঁর দেখা হল 'হওয়া' বা 'সত্য দেখা'। সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সত্তাকে দেখা বা জানা।

রবীন্দ্র চিত্রজগতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এই সত্যদর্শন প্রয়োজন। এর জন্য অনেক শিক্ষা এবং অনুশীলন দরকার। এই প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবীর লেখা একটি মন্তব্য উল্লেখ করে আমাদের অনুসন্ধানের সমাপ্তি টানব। তিনি লিখছেন—প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী দেখে আঁন্দ্রে জিদ বলেছিলেন—"ডঃ টেগোর, আমরা এখন যা সবে মাত্র ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের এইসব বিচিত্র আর্ট আন্দোলনের তলায় তলায় যে নূতনকে পাওয়ার চেষ্টা লুকানো র'য়েছে, আপনি কী ক'রে তা চোখের সামনে ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে কতো বড় তা হয়তো এখন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হ'বে না,—সংস্কৃতির উৎকর্ষের সংগে সংগে মানুষের চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হ'বে ততই তারা বুঝতে পারবে।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা)

একই মাটি জল একই নীলাকাশ

তরুণ পাইন

ঊনিশশো পঞ্চাশে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙলার ইতিহাসঃ আদিপর্ব' প্রকাশের মধ্য দিয়ে যথাযথ রূপ পায় এযাবৎকালের বাঙলার ইতিহাস চর্চার ধারা। যদিও এর আগেই, ১৯৪৩ ও ৪৮-এ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় এক লেখক-মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-খণ্ডের 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল'। সমবায়িক এই উদ্যোগ থেকে আমরা চিনতে পারছি বাংলার ইতিহাসের রচনাকারদের, জানতে বুঝতে পারছি কীভাবে ইতিহাস-সাহিত্য নির্মিত হচ্ছে সাহিত্যের ইতিহাসের থেকে আরো বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত তথ্য ও পদ্ধতিতে। বহু আকাঙ্ক্ষিত এই দু-খণ্ডের বাংলার ইতিহাস বিদ্বান ও পণ্ডিত মহলে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হওয়ার পক্ষে প্রয়োজন ছিল মাতৃভাষায় স্বদেশ-ইতিহাস— নীহাররঞ্জনের গবেষণা আমাদেরকে দেয় সেই প্রত্যাশিত পূর্ণতা। বলা যায়, মাতৃভাষায় চর্চিত ইতিহাস-সাহিত্যের বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর মধ্য দিয়ে।

প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য যে সম্মিলিত উদ্যোগ, ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তির সমাহার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' (১৯১০) ছাড়া তেমন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় নি। গত শতকের একেবারে শেষের দিকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠার (১৮৯৪) সঙ্গে অবশ্য-শর্ত হিসেবে ইতিহাস চর্চা জড়িয়ে থাকলেও, সে ছিল বাংলার সাহিত্যচর্চার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর অন্যতম। বাঙালির এ সমস্ত নিজস্ব উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) পেয়েছে শতবর্ষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ; আগেরই মতো সেখানেও চলছিল প্রাচীন ভারত অনুসন্ধান ও পুরাতত্ত্ব, মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, দস্তুর নিয়ে ইতিহাসের উপকরণের গবেষণা। ১৭৮৪, ১৮৯৪ বা সর্বাধুনিক ১৯১০-এর পরেও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো চল্লিশটি বছর একটি পূর্ণতর ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের জন্য।[১] ১৯৫০-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ্', সঙ্গে ত্রৈমাসিক পর্বে পত্রিকা 'ইতিহাস'। লক্ষ্য করলে দেখবো 'বরেন্দ্র' শব্দটি আঞ্চলিকতা থেকে মুক্তি

পেয়ে 'বঙ্গীয়' শব্দের সহযোগিতায় চলে আসে যেমন, সেভাবেই আবার 'ঐতিহাসিক চিত্র' এই শব্দগুচ্ছের পরিসমাপ্তি ঘটল নির্দিষ্টভাবে বিষয়টির একটি মাত্র নামে।

ইতিহাস অর্থে পুরাণ-বিবৃতি, তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার, রাজা-বাদশার পতন-উত্থানের কাহিনী বা ঘটনার ক্রমান্বয়িক বিবরণ—প্রচলিত এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক সময় লেগেছে আমাদের। এমনকি আকর-সূত্র হিসেবে যে লিখিত ইতিহাস বা ইতিহাসকেন্দ্রিক তথ্য পাওয়া যায়, সন্দেহ থাকে তাদের বিভিন্ন পাঠে, লিপিকরের প্রমাদে, সে সমস্তের মধ্যেকার ঐতিহাসিক সত্য। ভারতীয় দর্শন আলোচনা করার কালে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যখন লক্ষ্য করেন: '...the active intervention in philosophical matters by forces not strictly philosophical'[১]—সে সময়ে দর্শনের ইতিহাস সমস্যার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অন্বিত হয়ে যায় সামগ্রিক ভারত ইতিহাস-জিজ্ঞাসা। কোনো ব্যতিক্রম নয় বাংলার ইতিহাসচর্চাও, বরং বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করেছে আরেক জটিলতা। প্রবোধচন্দ্র সেনের ভাবনা এক্ষেত্রে এক জরুরি সূত্রের কাজ করে আমাদের কাছে: 'একদিকে রাঢ় বরেন্দ্র বঙ্গ প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগ জনিত আঞ্চলিকতা, অন্যদিকে বংশ গোত্র গাঁই মেল কাপ প্রভৃতি সামাজিক বিচ্ছেদ এবং তৃতীয়তঃ শিব রাধাকৃষ্ণ চণ্ডী মনসা প্রভৃতি পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতা নিয়ে ধর্মের দ্বন্দ্ব, এসবের ফলে বাংলার লোকসমাজ বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। অঞ্চল সমাজ ও ধর্মগত বিচ্ছেদ চেতনাকে অতিক্রম করে সমলক্ষ্যগত জাতীয় ঐক্যগুলো দেখা দিতে পারে নি।'[২] ফলে বাংলার ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মাশ্রিত সামাজিক ইতিহাসের এক জটিল বহুমুখী সম্পর্কের বিন্যাস।

নির্দিষ্টভাবে ইতিহাস-চেতনার লক্ষ্যে আমাদের নিয়ে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র, সচেতন ও প্রত্যক্ষ উচ্চারণে স্মরণ করিয়ে দেন এক সঙ্ঘবদ্ধ জিজ্ঞাসায়, উদ্যোগে শুরু করতে হবে আমাদের ইতিহাসচর্চা। সমগ্র সাহিত্যচর্চার নিরিখে ইতিহাস সাহিত্যের লক্ষণীয় অপুষ্টি ও অভাব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল: '... সামগ্রিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত... যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত...মনুষ্য কেহ নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তি বর্ণনে প্রয়োজন নাই।'[৪] ভাবনাশ্রয়ী এই উক্তিকে বঙ্কিমের ইতিহাস-

মানস এমন স্পষ্ট, সরাসরি ও বস্তুনিষ্ঠ যে তাঁর সমকালে অক্ষয়কুমার দত্ত ছাড়া অন্য কারো মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

বৃটিশ-অধিকৃত ভারতে লিখিত ইতিহাসের চর্চা আগেকার তুলনায় পরিমাণে বেশি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে শুরু হলেও সে ছিল এক নির্দিষ্ট ইতিহাস-দর্শনের চর্চা। এতদিনকার ভারত-ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চা বৃটিশ প্রশাসনিক-ইতিহাসকারদের আলোচনায় চলে আসে আরেক প্রতিকল্পে। হিন্দু-মুসলমান অথচ বৃটিশ—এই তিন নির্দিষ্ট পর্বে ভারত-ইতিহাসের ভাগ করে বৃটিশ প্রশাসনিক ইতিহাসের যুক্তিক্রম বিন্যস্ত হলো। 'বৃটিশ' চর্চিত ভারত ইতিহাসের যুক্তিক্রম ও পদ্ধতি এই প্রতিকল্প ইতিহাসতত্ত্বেরই যুক্তিক্রম; পাল্টা যুক্তিতে বিকল্প ইতিহাসতত্ত্বের বাস্তব উপলব্ধি ছিল দীর্ঘকাল অনুপলব্ধ। অন্যদিকে চোখ ফেরালে দেখতে পাবো, বাংলার ইতিহাস-সাহিত্য ক্রমশ গড়ে উঠছিলে বাংলার সাহিত্যের মধ্যে। নির্দিষ্টভাবে ইতিহাস বলতে কী বোঝায় এমন চেতনা তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকলেও জাতি-অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করতে এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করে উপজীব্য বিষয়টির আধারে বিবৃত করতে ভুল হয় নি তাঁদের। যদিও যে-সামান্য ইতিহাস এ-সমস্তের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, তাঁদের মূল বাঁধুনি ইতিহাসের চেয়ে অনেক-বেশি সাহিত্যগত।

প্রবোধচন্দ্র সেনের সিদ্ধান্তকে যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে বুঝতে পারবো কেন ইতিহাস-সাহিত্য তৈরি হয় না দীর্ঘ দিন: বিশ্বাসে-মননে জীবনযাপনে সর্বাত্মক আঞ্চলিকতা এবং সেই আঞ্চলিকতাকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের মতো বিশ্বাসের সাহিত্য রচিত করে আত্মতৃপ্ত থাকতে চেয়েছে মানুষ। সার্বিক আত্মবিস্তারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সাহিত্য যে-জগৎকে মূর্ত করে তুলেছে তার প্রতি জিজ্ঞাসাহীন বিশ্বাসে চলমান বর্তমানের যুক্তির সঙ্গে বিচার করাকে মনে করেছে চূড়ান্ত নাস্তিকের ধর্ম। 'ব্যক্তিমানব-অভিজ্ঞতা যেমন দেশে বেড়ে জাতি-অভিজ্ঞতা হয়, তেমনি কালে প্রবাহিত হয়ে নাম ধারণ করে সংস্কৃতি। জাতি-অভিজ্ঞতা কালপ্রবাহে বাহিত হয়ে ইতিহাসে ধৃত হয়ে, ইতিহাস-চেতনা দ্বারা হয় তা পুনরুজ্জীবিত'—কিন্তু এই সম্মিলিত প্রজ্ঞার অভাবই অনেকদিন আমাদের আবদ্ধ করে রাখে ক্ষুদ্রতর, অপরিসর গণ্ডিতে, অনেক দেরিও হয়ে যায় ইতিহাস জানতে, আত্মানুসন্ধানে। এছাড়া আরো একটি কারণ হতে পারে সহজে লভ্য ফারসিতে লেখা ইতিহাস বা ঐতিহাসিক আখ্যান। ফারসিতে যখন কাজ চলে যাচ্ছে, তখন কী প্রয়োজন মাতৃভাষায়

ইতিহাস রচনার। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন হয়ে চলেছে ফারসিতে ইংরেজি অনুবাদের কাজ বা সরাসরি ফারসিতে রচনা। ইংরেজিতে রচনা তো ছিলই। অর্থাৎ সমাজে দ্বিভাষিক স্তর প্রচলিত থাকায় হয় ইংরেজি-অনুবাদের কাজ বা সরাসরি ফারসিতে রচনা। সমাজের বাকি জীবন ব্যাপ্ত, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তো নিরক্ষর; লোকগাথা, কথকতা শুনতেই অভ্যস্ত তারা; ফলে এ ধরনের সমাজে বাংলার ইতিহাসচর্চা ছিল একপ্রকার অসম্ভাবিত। তৃতীয় এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমাদেরকে ধরিয়ে দেন প্রবোধচন্দ্র: 'অঞ্চল সমাজ ও ধর্মগত বিচ্ছেদ চেতনাকে অতিক্রম করে সমলক্ষ্যগত জাতীয় ঐক্যচেতনা' দেখা না দেওয়ায় বা অনুভূত না হওয়ায় ইতিহাস-সাহিত্যের চর্চা আরো বিলম্বিত হয়েছে। বাংলার ইতিহাসে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন সমলক্ষ্যগত চেতনা সম্ভূত হয়ে দেখা দেয় কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ'-র সময়ে। দেখব যে; এই সময়কাল থেকেই বাংলার ইতিহাসচর্চা নানা পথবাহী হয়ে পড়ে, যার পরিপূর্ণতার কাল বলতে আমরা বলতে চাইছি 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রকাশনাকে।

'বাঙালীর ইতিহাস'-এর প্রেক্ষাপটে ছিল হাণ্টার-রচিত 'অ্যানালস্ অফ রুরাল বেঙ্গল' (১৮৬৮)। একথা বলার কারণ যে হাণ্টার-পূর্ব বাংলা বা ভারত ইতিহাসচর্চা ছিল জেমস মিল, ভ্যান্সিটার্ট বা ইউটিলিটিরিয়ান দর্শনাক্রান্ত রচনায় বা তৎকালীন গেজেটিয়ারগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। হাণ্টারই বৃটিশ প্রশাসনিক ইতিহাসকারদের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, যিনি আমাদের নিয়ে যান ইতিহাসের উৎসে—জনপদ, জনজীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার জগতে। এযাবৎকালের বৃটিশ-ভারত ইতিহাসচর্চা ভিন্ন এক মাত্রা পায় হাণ্টারের সময়কালীন গেজেটিয়ারগুলোতে। প্রয়োজন দেশের ইতিহাসের, জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের জটিল ও বহুমুখী বিন্যাসের সম্পর্কে জানা; হাণ্টারের ইতিহাস ভাবনা তাই ভিন্নপথ বেছে নেয়, পালটে দিয়েছিল বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক-ইতিহাসকারদের তত্ত্ব। বঙ্কিম ছিলেন হাণ্টারিয় ইতিহাসতত্ত্বের ভাবুক। যখন তিনি বলেন, বাংলার ইতিহাস নেই, ইতিহাসহীন জাতির দুর্দশা অপরিসীম, সে সময়ে আমরা মিলিয়ে পড়তে পারি 'অ্যানালস'-এর গোড়ার পাতাগুলো; যেখানে হাণ্টার নিজে লক্ষ্য করেছেন, লক্ষ্য করিয়ে দেন আমাদের যে, ইংল্যাণ্ডে যেখানে ক্ষুদ্র গ্রাম, জনপদ, এমনকি মৌজারও ইতিহাস লিখিত-

ভাবে আছে, সেখানে উপমহাদেশ ভারতে লিখিত ইতিহাসচর্চার একান্ত অভাব, নেই তার জনজীবনের প্রভৃত কথা। শুধুমাত্র উপকরণের অভাবে লেখার সমস্যা হিসেবে কথাগুলোকে নিলে এর মধ্যেকার প্রকৃত অর্থ অনেকটাই খণ্ডিত হয়ে পড়বে—সে সমস্যা তো তাঁর হয়েইছিল—কিন্তু তার চেয়েও যে-বড়ো সত্যের দিকে তিনি আমাদের নিয়ে আসেন, সে হলো নির্দিষ্ট এক ঐতিহাসিক সময়ে অতিবাহিত মানুষের জীবনযাপনের বৃত্তান্তে। এক অর্থে, নীহাররঞ্জনের শুরু হয়েছিল এই হাণ্টার-লক্ষিত পথে। অবশ্যই 'বাঙালীর ইতিহাস' আরো গভীর ও ব্যাপকতর অর্থে হাণ্টারিয় ইতিহাস-দর্শনকে সরিয়ে দিয়ে সামগ্রিক ইতিহাস রচনার মূল লক্ষ্যে নিয়ে আসে People's History-র সংজ্ঞা ও ধারণাকে।[৬]

বঙ্গভঙ্গের আগে পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে-ঘটনাকে আশ্রয় করে সবাই একলক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারে। বঙ্গভঙ্গ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস পুরোপুরিই সম্পৃক্ত ছিল সার্বিক ভারত-ইতিহাস চর্চার মধ্যে। আমরা দেখেছি যে এই ঘটনার পরে পরেই তার স্বাধিকারের জন্য, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য, উত্তরাধিকারের জন্য বাঙালি জাতি হিসেবে মুখর হয়ে উঠছে ইতিহাস-জিজ্ঞাসায়। বাঙালির জীবনযাত্রায়, মানসিকতায় এই অভূতপূর্ব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা জাতিকে সম্মিলিত করতে পেরেছিল এক লক্ষ্যে।[৭] বিক্ষিপ্ত আধারে চর্চিত এতদিনকার ইতিহাস-সাহিত্য এক নির্দিষ্ট পথের সন্ধানী হয়ে পড়ল এখন থেকে। গ্রন্থকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চা, যা এতদিন প্রায় উপেক্ষিত ছিল বা প্রয়োজনীয় মনে হয়নি, সমাজে সে-ঐতিহাসিকতা অনুভূত হওয়ায় গদ্যসাহিত্য নির্দিষ্ট মান খুঁজে পায় বিশিষ্টতার মধ্যে। লক্ষ্য করলে দেখব, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গদ্য বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। একথা বলার কারণ, বাঙলার ইতিহাসের অনেক গ্রন্থ বা তথ্য, আগে-পরে, রচিত হয়েছে পদ্যছন্দে। এর পেছনের কারণ হিসেবে মনে করা অমূলক নয়—পদ্যের স্মরণযোগ্যতা ও মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবার বিশেষ ক্ষমতাকে। মঙ্গলকাব্যগুলো, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যচরিতামৃত বা বৈষ্ণব পদকর্তাদের কাব্যগুলো কিংবা কথকতাও ছিল এক্ষেত্রের উদাহরণ-স্বরূপ। ফলে পয়ার-আশ্রিত বাংলার ইতিহাস বা ইতিহাসের অংশবিশেষ রচিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এছাড়া সামগ্রিক সাহিত্যের নির্দিষ্ট শৈলী হিসেবে পদ্যকে ধাতস্থ করে নিতে সময় লেগেছে আমাদের। ফারসি বা সংস্কৃত গদ্য বা পরবর্তী সময়ে ইংরেজিতে শিক্ষিত

শ্রেণীর ঐকান্তিক নির্ভরতার ফলে বৈশেষিকতার মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যকেন্দ্রিক শৈলী তৈরি হতে পারে না অনেকদিন পর্যন্ত, এমনকি বর্তমানেও পরিভাষাগত বিভিন্নতা লক্ষণীয়।... যে-সময় থেকে বাংলার ইতিহাস নির্দিষ্টভাবে মাতৃভাষায় চর্চিত হচ্ছে, সেই বঙ্গভঙ্গের কালে পূর্ণতা ঘটেছে বাংলা গদ্যেরও। ভাষাকে তাই সুপ্রযুক্ত করে উদ্দীষ্ট বিষয়ের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হতে থাকে গদ্যের বিশিষ্ট রূপ—ইতিহাস, দর্শন, প্রযুক্তি-বিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি কেন্দ্র করে।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্ব ও উপস্থিতি বাংলার ইতিহাসে এত প্রত্যক্ষ ও প্রকট যে অনেক সময়ে মূলধারা বলে ভুল হয়। আলোচনা অনেক সময় এমন নিরালম্ব হয়ে পড়ে যে আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের অস্তিত্বকে, এমনকি সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পুরোপুরি হারিয়ে যায় নৃতত্ত্বের যুক্তি, সম্পর্কের পারম্পর্য। সম্পর্কের যে-জটিলতা লক্ষ্য করা যায় বাংলার ইতিহাসে, গোপাল হালদার সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন সে-কথার। সমাজবিজ্ঞান-সম্মত বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস লিখতে বসে,—আসলে যা হয়ে যায় 'রূপরেখা'—মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি সে-সমস্ত সমস্যার: 'সাহিত্য হিসাবে, বাঙলা সাহিত্য কেন,—কোনো সাহিত্যই মধ্যযুগীয় সামাজিক পরিবেশ ও মতাদর্শ কাটিয়ে উঠতে না পারলে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় না। আমাদের দেশের সাহিত্যে এই মধ্যযুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, এই হল প্রথম বাধা। কাজেই খ্রীষ্টীয় প্রায় ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত রচিত বাঙলা সাহিত্যে বারো আনি আলোচনাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনা, পূজা-অর্চা, নিয়ম-নীতি, ধ্যান-ধারণা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিচার-বৃত্তান্ত। অর্থাৎ এ হচ্ছে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণা, সাহিত্যিক বিচারের পক্ষে তা একটা বাধা হয়ে ওঠে। অথচ সাংস্কৃতিক বিষয়ের কার্যকারণ যথার্থরূপে বুঝতে হলে জীবনযাত্রার মূল সত্য জানা চাই; এবং সামাজিক বিন্যাসের মূল তথ্য না জানা থাকলে সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ অসম্ভব। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের সেই সব মূল তথ্য এখনো অনাবিষ্কৃত—এইটি দ্বিতীয় বাধা। এই জন্যই আমরা বরং অতীতের সাহিত্য থেকে বুঝতে চাই অতীতের সামাজিক অবস্থা। উপরতলা দেখে অনুমান করে নিতে চাই ভিত্তিভূমির বিন্যাস। এরূপ অনুমান কিছু কিছু সত্যও হতে পারে, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন এটি হল সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসার বিপরীত মার্গ। জীবন-যাত্রার গোড়ার কথা আগে জানতে হয়, তবেই বোঝা সম্ভব সাহিত্যে তার প্রতিফলন কতটা

পড়েছে প্রত্যক্ষ, কতটা পরোক্ষ ;—কতটা পড়েছে সৃষ্টির মৌলিক নিয়মে অনুরঞ্জিত হয়ে, কতটা পড়েছে ব্যক্তিমানসের মধ্য দিয়ে কুব্জ হয়ে বা ন্যুব্জ হয়ে।[৮] উনিশশো চুয়ান্ন সালের এই ভাবনার আধুনিকতা থাকে তখনই, যখন দেখি বর্তমান সময়ে বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্য-ইতিহাস আলোচনায় এ-সমস্ত প্রশ্ন বেশ কিছুটা জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে।

যে-ক'টি ধারায় বাংলার ইতিহাসচর্চা বিভাজিত হয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জেলা ইতিহাসচর্চা। মাতৃভাষায় জেলা-ইতিহাসচর্চায় ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা জরুরি যে, এ সমস্তের অধিকাংশ, প্রায় সম্পূর্ণটিই রচিত হয়েছিল স্বকৃত উদ্যোগে এবং লেখকরা ছিলেন, আধুনিক অর্থে, শাস্ত্রে অদীক্ষিত। শুধুমাত্র স্থির লক্ষ্যের দিকে নিষ্ঠা, অবিচলিত উদ্যোগ ও অবমাননা থেকে আত্ম-উদ্ধারের ব্রত তাঁদের বৃত করেছিল স্বদেশের ইতিহাস-সাধনায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদারের অর্থ-সাহায্য পাওয়া গেলেও, যে-বিপুল সংখ্যক জেলা-ইতিহাস লেখা হয়েছিল মাতৃভাষায় তা অধিকাংশই লেখকদের নিজ অর্থে প্রকাশিত। তথ্যগত ত্রুটি, পদ্ধতির অসাম্য বা মূল্যায়ন নির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টিকোণে আবদ্ধ থাকলেও, প্রাথমিক পর্বের এ সমস্ত জেলা-ইতিহাসকাররাই প্রকৃত পথিকৃৎ-এর সম্মানের যোগ্য। বৃটিশদের জেলা-গেজেটিয়ার্স পরিকল্পনাটি আকর-প্রেরণা হলেও মাতৃভাষায় জেলা-ইতিহাসচর্চা মূল প্রকল্পটির পাশাপাশি বিপ্রতীপক্রমে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এক সমার্থক 'প্রতিকল্প'। একই সঙ্গে আমাদের ভাবতে হবে বৃটিশ ভারতে স্কুলপাঠ্য বাংলা ইতিহাস বইগুলো। স্কুলপাঠ্য বইগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন আমাদের এযাবৎকালের ইতিহাস আলোচনায় প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষিত। অথচ, বিদ্যাসাগর, সঞ্জীবচন্দ্রের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইগুলোর সঙ্গে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) রচিত হয়েছিল প্রাথমিক পাঠ্য হিসেবেই। এ-সমস্ত মূল, শাখা, উপশাখায় প্রবাহিত হয়ে বাংলার ইতিহাস পেয়েছে এক পূর্ণাঙ্গ রূপ। ইতিহাসচর্চাও বর্তমানে নির্দিষ্ট শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে বৈশেষিকতার মধ্যে দিয়ে পরিগ্রহণ করেছে এক সম্পূর্ণ শৃঙ্খলায়।

সাতচল্লিশের পরে আকাশে-মাটিতে-জলে গণ্ডি পড়ে, ফলে বাংলার খণ্ডিত সত্তাকে মেনে না নিলে ইতিহাসচর্চাও খণ্ডিত হয়ে পড়তে বাধ্য। যদিও এ-পার্থক্যরেখা সাতচল্লিশ-পূর্ব বাংলাতেও ছিল। 'নীলদর্পণে'র তোরাপ জনমানসে বিদ্রোহী চেতনার দ্যোতক হলেও বাঙালি-মুসলমানরা ছিল বুঝি-বা অন্যকোনো

এক সমান্তরাল কক্ষে। 'মুসলমানি-বাংলা'-কে আশ্রয় করে একই ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছিল 'আমরা ও তাহারা'-দের পৃথক সংস্কৃতি, ভাব-ভাবনা। ইংরেজি শিক্ষাকে যেভাবে নিতে পেরেছিল বাঙালি-হিন্দুরা, সে-রীতির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও উদ্যোগহীনতা অনেকটা পিছিয়ে দেয় বাঙালি-মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে। বিদেশী নিয়ম রীতির প্রতিবাদস্বরূপ সাময়িক কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নয়, বাঙালি-মুসলমান যেন অনেকটাই আত্মতৃপ্ত ছিল ইসলামি ও মুঘল সংস্কৃতি, জীবনচর্চার অতীত গৌরবে। অথচ বাঙালি-মুসলমানদের মূলযোগ ছিল না মুঘলদের সঙ্গে—কি সংস্কৃতিগত বিচারে, কি নৃতাত্ত্বিক বিচারে। মুর্শিদাবাদ বা ঢাকার নবাবদের সঙ্গে ছিল না তার আত্মিক যোগ। এ-সমস্ত ভিন্নতা থাকা সত্বেও বাঙালি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল হিন্দু-মুসলমানে, ধর্মাশ্রিত এই বিভাজন ঘটে গিয়েছিল সাতচল্লিশের অনেক আগেই।[৯]

ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর দুর্বিষহ অনেক রাত্রি কেটেছে বাঙালির জীবনে। আসলে এরপর বেশ কয়েকবছরের ইতিহাস-ই পুরোপুরি রাত্রির! সীমান্ত পার হয়ে চলেছে এপারের বাঙালি-মুসলমানরা, মেঘনা-পদ্মা-শীতলক্ষাকে পেছনে ফেলে ইছামতীর অন্যপারে আসছে হিন্দু-বাঙালিরা: অগণন মানুষ—মৃত্যু-পথযাত্রী, নবজাতকও! 'টোটাল এক্সোডাস্'—বাংলার ইতিহাস ফের একবার জটিল থেকে জটিলতর হলো। 'দেখা গেল, পূর্ববাংলা তার রাষ্ট্রীয় শরিক পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন; আর রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন ভারতীয় প্রদেশ পশ্চিমবাংলার থেকে—যে অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ববাংলা দীর্ঘকাল ধরে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে এসেছে।'[১০] এই বিচ্ছিন্নতা এতো ব্যাপ্ত যে স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তরকালে বাংলার ইতিহাসচর্চার ধারাও হয়ে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন; অথচ এই দুটি ধারার সম্পর্কের মধ্যে কোন সমন্বয় নয়, একটা বস্তুনিষ্ঠ সাযুজ্যের সন্ধান করতে না পারলে, পাশাপাশি রেখে বিচার করতে না পারলে, মূল্যনির্দেশ করতে ব্যর্থ হলে বাংলার ইতিহাসভাবনাও হয়ে পড়বে অসম্পূর্ণ।

কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১), মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩), ঢাকা মাদ্রাসা (১৮৭৪), মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৮), সমাজ সম্মিলনী (১৮৭৯), ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩), মহামেডান লিটারেরি একাডেমি (১৮৯৩), সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৯০০), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১)—কলকাতা ও ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এ-সমস্ত সরকারী-বেসরকারী সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান

সম্প্রদায় খুঁজে পেতে চেয়েছিল তাদের স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য। বঙ্গভঙ্গের ফলে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল বাংলায়, তার সূত্র ধরেই ঐদিনই (১৬ অক্টোবর ১৯০৫) ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্-র উদ্যোগে শুরু হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'—যার উদ্দেশ্য ছিল নতুন প্রদেশের অস্তিত্ব ও স্বার্থরক্ষার আন্দোলন করা। এরকম আরো বিভিন্ন সংগঠন, পত্রিকার মধ্যদিয়ে ক্রমশ নির্মিত হচ্ছিল বাঙালি মুসলমানের ভাবজগৎ। দেশভাগের সময় সময় বিশেষ করে, এমনকি তার কিছুকাল আগে থেকেই বাঙালি মুসলমানরা তার চিন্তার সঠিক আশ্রয় খুঁজে পেল যেন পাকিস্তান-ভুক্তির মধ্যে! একদিকে মুসলমান অর্থাৎ ঐস্লামিক ঐতিহ্য, অন্য-দিকে 'মুসলমানী' সত্তায় বাঙালি ও সেই কেন্দ্রিকতায় 'বাংলার' (!) নিজস্ব অস্তিত্ব—এই দ্বৈতসত্তা পালিত হবে আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে সেদিন (১৯৪২) দুটি সাহিত্য সংগঠন গড়ে ওঠে—ঢাকায় 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং কলকাতায় 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। মহামেডান, মুসলমান বা বাঙালি মুসলমান শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হলো 'পূর্ব-পাকিস্তান'। একই সঙ্গে আরেকটু যদি তলিয়ে ভাবি আমরা তাহলে দেখব বাঙালি মুসলমান আশ্রয় করতে চাইছে এমন একটি প্রদেশকে যে প্রদেশের ভৌগোলিক-ভাষাগত-ও অপরাপর সংস্কৃতি, এমনকি রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে যার কোনো বন্ধন নেই। 'রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম-কারী এক বিশ্বব্যাপী ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হবার চেতনা থেকে পরিচালিত হয়েছিলেন বলে বাঙালি মুসলমানেরা দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তি ও ঘটনা, ভাব ও বস্তু, স্থান ও ভাষাকে মুসলমানের নিজস্ব বলে নির্ণয় করেছিলেন এবং সেদিকে তাকিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ চিত্তে, অব্যক্ত আকুলতা আর বিশেষ গর্ব ও অধিকার-বোধ নিয়ে।'[১১]

স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ব ও পশ্চিম—দুই ভাগে বিভাজ্য ইতিহাসের ধারা রাজনৈতিক কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশ ভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িত হয়ে পড়ার ফলে সার্বিক ইতিহাসচর্চার পরিমাণ বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে, যদিও এ সমস্ত গবেষণার মধ্যেই বাংলার ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখব দেশভাগের পরেও মননে-চিন্তায়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের একমাত্র আগ্রহ হয়ে উঠতে পারত ওপারের বাঙালিদের জীবন-যাপনের বৃত্তান্ত। বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সার্বিক ভারতীয় হয়ে ওঠার

তাগিদে দীর্ঘদিনের নিজস্বতাকে সরিয়ে দিচ্ছিল ক্রমশ দূরে, অথচ নিজস্বতার মধ্য দিয়েই মিলতে পারত ভারতীয় সত্তার সঙ্গে, হয়ে উঠতে পারত প্রকৃত আন্তর্জাতিক! ভাষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক শক্তির ক্রমপ্রসারমান প্রয়োগে ঐপারের বাঙালিরা আক্রান্ত, অথচ একুশে ফেব্রুয়ারির খবর জানতে পারি না আমরা দীর্ঘদিন। এপারের বাঙালিরা স্বতন্ত্রতায় জাহির করতে পারছে কিনা নিজেদের, সে প্রশ্ন সাধারণ্যে উচ্চারিত বহুবার, বহুবছর ধরেই। অথচ ব্যাপারটা এমন নয় যে ইতিহাসচর্চারও ঐতিহাসিক কালসীমা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে দুই বাংলার ক্ষেত্রে যে সাতচল্লিশের ওদিকে যাবো না আমরা কেউই! স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তরকালে কাজ করে যেন এমনই এক ভাবনা, ফলে বাংলার ইতিহাসের লক্ষ্য হয়ে যায় উপলক্ষ্যস্বরূপ, জটিলতা তাই বহুধাবিস্তৃত।

বাংলার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা মেনে নিতে পারি বদরুদ্দীন উমরের ভাবনাশ্রয়ী সংজ্ঞাকে : 'বাংলাদেশের যে কোন অংশে যারা মোটামুটি স্থায়িভাবে বসবাস করে, বাংলাভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশের আর্থিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে, তারাই বাঙালী।'[১২] এই বাংলার ইতিহাসচর্চাই হতে পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। বহু ধারা, উপধারায় বিস্তৃত এই পথে ইতিহাসচর্চাকারীকে মনে রাখতে হবে বাস্তব সম্পর্কের, অবস্থার কথা : 'লেখকরা যখন মুসলমানের ধর্মীয় পার্বণ কি সামাজিক উৎসবের পরিচয় দেন, যখন পীরমুরিদের বিশেষ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেন, যখন রাগের মাথায় তালাক দেওয়া স্ত্রীকে আবার বিয়ে করার সমস্যা তুলে ধরেন, মারী মন্বন্তরের সময়ে কাঞ্চনের অভাবের কথা যখন বলেন, তখন তাঁরা জীবনযাত্রার এমন একটা দিকের পরিচয় দেন, ধর্মীয় বিশিষ্টতার ছাপ যেখানে স্পষ্ট। কিন্তু বন্যার করাল তরঙ্গ, ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল আঘাত বা জলোচ্ছ্বাসের আকস্মিক আবির্ভাব যখন জীবনকে বিপর্যস্ত করে, তখন মুসলমান-অমুসলমানকে পৃথক করে নেওয়া খুব কঠিন হয়। তেমনি, যে মাঝি তার নৌকার সঙ্গে একাত্ম, যে-কৃষাণ তার জমির সঙ্গে বাঁধা, জঠর-যন্ত্রণায় যে-নারী লালসার শিকার, তাঁর ধর্মপরিচয় লেখকের পক্ষে খুব প্রাসঙ্গিক নয়।'[১৩] যে যন্ত্রণাদীর্ণ পথে আমাদের নৈমিত্তিক জীবনযাপন ইতিহাসকার তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ইতিহাসের বাস্তব অবস্থাকে যুক্তির নিষ্ঠায়, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে, মননের ঔদার্যে যদি আমরা বিচার করে নিতে পারি, তাহলে হয়ত একদিন সম্মিলিত কণ্ঠে বলতে পারব :

'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে'—

প্রসঙ্গক্রমে :

মাতৃভাষায় চর্চিত বাংলার ইতিহাসের এক গ্রন্থপঞ্জি বা বিস্তারিত বিবরণী তৈরি করার প্রয়োজন,—এমন এক ভাবনা বেশ কয়েকবছর আগে মাথায় আসে। প্রস্তাবটি সরাসরি জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বরুণ দে-কে, তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রশ্রয়ে বেশ কিছুটা কাজ এগিয়েও যায়, কিন্তু বইপত্র, সাময়িক পত্রিকার যথাযথ সংস্থান করতে না পারায় ভাঁটা পড়ে নিজের উৎসাহে। যদিও ভাবনাটি এখনও পরিত্যক্ত হয় নি। এই কাজের সুযোগে বেশকিছু বই, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়ার সৌভাগ্য হয়, বর্তমানে তারই এক সার-সংকলনের চেষ্টা মাত্র করা হয়েছে। কোনো মতামত আছে বলে যদি পাঠকের মনে হয়, তাহলে সে সমস্তের অসঙ্গতি, অপূর্ণতার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী নিজে। বিভিন্ন আলোচনায়, তথ্যে উপকৃত হয়েছি যাঁদের কাছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও বন্ধু শ্রীঅমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য।

এসঙ্গেই উল্লেখ করতে চাই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-এর 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮-গ্রন্থপঞ্জিটি। সাহিত্য বিষয়ে হলেও আদর্শ গ্রন্থপঞ্জির রূপ কী রকম হওয়া উচিত তার জন্য অবশ্য দ্রষ্টব্য। 'ইতিহাস গ্রন্থপঞ্জী'—বাংলার ইতিহাসের একটি সংক্ষেপিত গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ('বাংলা সাহিত্য সমিতি') পত্রিকা 'পাণ্ডুলিপি'-র পঞ্চম খণ্ড, ১৩৮২ [১৯৭৫]-র পৃষ্ঠা ৯৭-১৯২-তে। সংকলক ছিলেন আলী আহ্‌মদ, পাণ্ডুলিপিবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই লেখায় আলীসাহেব জানিয়েছেন ১৯৪৭ পরবর্তী সংকলক হলেন বাংলা একাডেমী, ঢাকার গ্রন্থাগারিক সামসুল হক সাহেব। সে-তথ্য ব্যক্তিগতভাবে দেখতে পাই নি এখনও পর্যন্ত। এছাড়া লক্ষ্য করি, বাংলার ইতিহাস ভাবনায় কেমন করে ভাবিত হয়ে পড়েন আমাদের কালের উপন্যাসকার অসীম রায়। অবশ্যই উপন্যাসের প্রেক্ষিত আলাদা, কিন্তু 'কচ ও দেবযানী' (১৯৮২)-তে গল্পের মুখ্য চরিত্র বাংলাদেশ বিষয়ে গবেষণার জন্য ঢাকা যায় তার বাবার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রেরণায়।

সূত্র উল্লেখ :

১. বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা জড়িয়ে থাকলেও পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকেন্দ্র হয়ে উঠতে

পারে নি পরে। বরং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ প্রকাশিত হয়ে চলেছিল বা চলেছে মননসমৃদ্ধ গবেষণাপত্র ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে। 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' পরবর্তী সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে।

২. Debiprasad Chattopadhyaya. **What is living and what is dead in Indian Philosophy**, 2nd ed, New Delhi : PPH, 1977, p. [viii]।

৩. প্রবোধচন্দ্র সেন। বাংলার ইতিহাস-সাধনা। কলকাতা : জেনারেল প্রিণ্টার্স···, ১৩৬০, পৃ ৯।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' শিরোনামে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর গ্রন্থ সমীক্ষা করেন 'বঙ্গদর্শন', ১২৮১-র মাঘ সংখ্যায়। দ্রষ্টব্য : বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড। কলকাতা : সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩, পৃ ৪১৫।

৫ ওয়াহিদুল হক। চেতনাধারায় এসো। ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৫, পৃ ১৯।

৬ এক্ষেত্রে এক বিস্তৃত ইতিহাস চেতনার লক্ষ্যে নিয়ে আসেন ওয়াহিদুল হক, তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে ঐ একই শিরোনামের প্রবন্ধে :

'চর্চাসাপেক্ষ গ্রন্থনির্ভর বিষয়মুখী ইতিহাস-চেতনা কোনদিনই তার [বাঙালির] ছিল না। কিন্তু শ্রদ্ধা তার ছিল নিজের অতীতের প্রতি, যদিও তা অনেক সময়ই ছিল হয়তো বিভ্রান্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসের আলো যাও সে ফেললে অতীতে, উঠে এল বুঝি রিভাইভ্যালিস্ট জঞ্জালসর্বস্ব অসত্য ও পরিণতিতে যা সমাজ-শত্রু। উপমহাদেশীয় স্বাধীনতা অর্জনের ধাক্কায় সে জঞ্জাল সরে গিয়ে প্রকৃত ইতিহাসের প্রকৃত চেতনা দিয়ে জাতির চিত্ত দীপ্ত এবং অযুত বৎসরের অভিজ্ঞতা নিষিক্ত হতে পারত। ভারতে একদিকে কোশাম্বী থেকে দেবীপ্রসাদ প্রমুখের প্রগাঢ় মার্কসীয় বিশ্লেষণা অপর দিকে পূর্ব-ধারণার সকল সত্যাপলাপী আরোপ-বিরোধী রোমিলা-রমেশ দম্পতি এবং রবীন্দ্র-নির্দেশিত সমন্বয়ী মহানতায় ভারত জিজ্ঞাসার সার্থক গ্যাগারিন নীহাররঞ্জন—সকলে মিলে রিভাইভ্যালিস্ট জঞ্জালমুক্ত এক ইতিহাসচেতনা গড়বার নিশ্চিত সূচনা করেছেন' (পৃ-১৪)।

৭. ১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ'-র পরে একমাত্র তুলনীয় হতে পারে ওপারের 'বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলন।

৮ গোপাল হালদার। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা : এ মুখার্জী···, ১৩৮০, পৃ [৭-৮]।

৯ দেখব যে, গোপাল হালদার লিখেছেন এমন কথা : 'ধর্মগত পার্থক্য সত্বেও বাঙালী মুসলমান বাঙালী। মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর সম্পর্ক ভারতের অন্য প্রান্তের হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের মত নয়। কারণ, এখানে তারা সকলেই শুধু একই (বাঙলা-ভাষা) ভাষা-ভাষী নয়, একই জীবনযাত্রারও অধিকারী ছিল'। পরে আরো নির্দিষ্ট করে বলছেন তিনি ; 'সমগ্রভাবে দেখলে বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ঘটনাই এইটি :—একই জাতির অঙ্গীভূত হয়েও বাঙালী হিন্দুর ও বাঙালী মুসলমানের এই অসম বিকাশ। বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রধান প্রতিষ্ঠা হিন্দুর ; মুসলমান সেখানে প্রতিষ্ঠাহীন অনেকাংশে আত্মবিস্মৃতি, তার সৃষ্টি-প্রতিভা এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত। ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জাগরণে এজন্য হিন্দুত্বের রঙ ক্রমেই বেশি করে লাগল (বিশেষ করে 'প্রকাশের পর্বে'), আর ক্রমেই বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে ভেদরেখা গভীর হয়ে উঠতে থাকল।' পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড। ৩য় সংস্করণ। ১৩৮১, পৃ ২৪-২৯। 'মুসলমানের ভাগ্যবিপর্যয়' উপ-শিরোনামে বিন্যস্ত।

১০. আনিসুজ্জামান। স্বরূপের সন্ধানে। ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬। পৃ ৭৭।

১১. আনিসুজ্জামান। পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৮০।

১২ বদরুদ্দিন উমর। 'সংস্কৃতির সংকট', আনিসুজ্জামানের উদ্ধৃত প্রবন্ধে উল্লিখিত, পৃ ৯২-তে।

১৩ আনিসুজ্জামান। পূর্বোক্ত, পৃ ১০২।

রাণীগঞ্জের বাজারে

অমর মিত্র

ভর সন্ধেয় উঠোনের বাইরে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকায় বিলাস। সামনে এসে দেখল সরস্বতীর বর, তার মরা খুড়ো ভূধর ক্ষেত্রপালের জামাই। হু হু বাতাসে চটপটি খাচ্ছে যেন লোকটা। দাঁড়াতে পারছেনা থির হয়ে। বিলাস মনে মনে বিপদের আঁচ পেল। খুড়ো মরেছে মাসাধিক কাল। ক্রিয়াকম্মো শেষ। এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেল লোকটা। সে তো খবর পাঠায়নি।

—কি ব্যাপার? না', চেনার ভান করল বিলাস ক্ষেত্রপাল।

—ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতেও লোকটা হাসল, সমন্ধি, আমি অজিত, অজিত খানদার বটেক।

হাওয়া ছেড়েছে আজ খুব। কাল কেন, আজ দুপুর পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার ছিলনা। বিকেল নাগাদ সেই পাতলা মেঘের চাদর আকাশের গা থেকে সরে যেতেই উত্তরের পাহাড় জেগে উঠেছে যেন। গোটা দেশের উত্তরে যেমন হিমালয়, এই এলাকার উত্তরে তেমনি বিহারীনাথ পাহাড়। সেই পাহাড়ই পাঠায় শীতের হাওয়া, হাওয়ার সঙ্গে বোধহয় এই লোকটাকেও পাঠিয়েছে। বিলাসের ভয় হলো ওই গা জ্বালানো হাসি দেখে। ভয়ের জন্য শীত, সে মাথা মুড়ি দিল খদ্দরের মোটা চাদরে, তারপর লোকটাকে এড়িয়ে উঠোনে পা দিল। ওকে আমল দেয়। ঠিক হবে কিনা বউকে জিজ্ঞেস করা দরকার। বউকে সে খুব মানে।

সমন্ধি দাদা? আবার পিছন থেকে ডাক শুনে বিলাস, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো লোকটার দিকে, কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কে বটে তুমি?

লোকটা থতমত খেয়েছে এহেন প্রশ্নে, শালা-সমন্ধি যদি না চেনে তো কোন শালা চিনবে। জামাই-সমন্ধিতে তো আঠায় আঠায় সম্পর্কো, সে তাই কোন রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আঁজ্ঞে, আমি ই ঘরের জামাই বটেক, অজিত খানদার।

বলতে বলতে সে পকেট থেকে বিড়ি বার ক'রে রাণীগঞ্জে কেনা গ্যাস লাইটারে ধরাতে গিয়ে দেখল তা খ্যাচাকল হয়ে গেছে। গ্যাস নেই, না

থাকুক, বিড়ি পকেটে ঢুকিয়ে সে বিড়বিড়িয়ে বলল, 'তুমার খুড়ো, মোর শ্বশুর মরি গেল। একটা খপরও দিলেনা, এটা কি ন্যায্য হলো ?'

বিলাস বুঝল লোকটা সম্পর্কো নিয়েই এসেছে। সম্পর্কের সুতো ধ'রে ধ'রে পা ঝুলিয়ে বসল তার দাওয়ায়। ন্যায্য অন্যায্য বিচার ও করছে, এ সময়ে নিজের বউকে দরকার, সে কি বলে শোনা যাক। মাথা তার খুব ঠাণ্ডা, এই শীতেও তা কষ্ট ক'রে গরম করবেনা। সম্পত্তির সীমানা বাড়ানো কি সোজা কথা। সে হাঁক মারল, ইদিকে আসো দেখি, কে এসে কি বলতে লেগেছে ?

অন্ধকারে বিলাসের বউ সব দেখছিল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। এবার বেরিয়ে এসে হাতছানি দিল স্বামীকে। বিলাস টপ্ ক'রে লাফ দিল দাওয়ায়, তারপর বউ সমেত ঘরে। বাইরে শীত অন্ধকারে ব'সে অজিত খানদার বুঝল তার শ্বশুর মরার পর এভিটেতে মশার উৎপাত বেড়েছে। সে চটাস চটাস ক'রে হাত চালাতে লাগল। এই ঠাণ্ডায় বিড়ি নাধরালেই নয়, কিন্তু রানীগঞ্জের এমন হাল যে কাগজকলের সঙ্গে গ্যাস লাইটারও বন্ধ। বন্ধ অনেকদিন, পকেটে একটা দেশলাইও থাকে, আজ ভুল ক'রে নেই।

বিলাস ঘর থেকে বেরিয়ে গলা চড়ালো, সমন্ধী কিসের, মোর তো বুন নাই।

—কেনে সরস্বতী, তুমার খুড়ার মেয়্যা। অজিত ঘুরে তাকালো।

—উসব মানিনা, উ ক্ষেতরোপাল ঘরের কেউ নয়, যম।

অজিত খানদার এবার নিশ্চুপ। শীতের আকাশের দিকে তাকায়। আলোর ফুল ফুটছে একটি একটি ক'রে ঈশ্বরের বাগানে। তার শ্বশুর ভূধর ক্ষেত্রপাল অমন একটি ফুল হয়ে গেছে ঠিক। ভূধরের মৃত্যু সংবাদ তিনদিন আগে সে শুনেছে লোকমুখে! তারপর একরাত্রে চোখের জল ফেলেছে, অন্য দুই রাত্রি জেগে ভেবেছে। ভাবার পর আজ সকালে বেরিয়ে বিকেলে পৌঁছেছে। কিন্তু বিলাসের বউ ও বিলাসের মত সেই, বিকেলে তাকে না চেনার ভান ক'রে উঠোনে পা রাখতে দেয়নি। তখন মনে কষ্ট পেলেও ভেবেছিল সমন্ধীর বউ দুষ্টা মেয়েমানুষ, ক্ষেত্রপাল রক্তের কেউ নয়, ফিরুক বিলাস। এখন দেখছে এর গায়েও সেই মেয়েমানুষের গন্ধ। স্বামী স্ত্রীতে মিলমিশ হয়েছে খুব।

অজিতকে চুপ করে থাকতে দেখে বিলাস জিজ্ঞেস করল, থাকা হবে নাকি ?

—রাতে আর কুথাকেযাই বলো।

—কিন্তু সে ভিটা তো আর নাই।

ভূধর ক্ষেত্র পালের ভিটের কথা বলল বিলাস। সত্যই বলল। বিকেলেই

তা নজরে এসেছিল তার। এ ভিটের একশো হাত তফাতে ছিল ভূধর ক্ষেত্রপালের ঘর। তা নেই। উধাও হওয়া ভিটে দেখে বিকেলেই ভূধরের জামাই স্পষ্ট বুঝেছিল শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ চন্দ্রসূর্যের মতই মিথ্যে নয়।

—কি হলো ভিটা? অস্ফুট কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল।

—মরা মানুষের ভিটা মানে গেহস্তের অকল্যাণ, উত্থেনে মোর পরিবার গাঁদাফুল ফুটাইছে, ফুলবাগান হবেক।

বিলাস জবাব দিল খুব জোরে যাতে তার পরিবারের কানেও যায় কথাটা। তারপর কি মনে ক'রে বলল, 'থাকতি পারো আজ, কিন্তু কাল সকালেই যেন মোর পরিবার অবিশ্যি চায়না যে তুমি থাকো। তবে কিনা রাত হঁই গেছে, আমি একটু রিক্স নিই না হয়, আর, হঁ্যা ভুমার সঙ্গে কিন্তু ন্যায্য কোন সম্পক্কো মোদের নাই, ইটা মনে রেখো।'

অজিত শেষের কথাগুলো শুনল না। সে অন্ধকারে দেখছিল ক'দিন আগেও যেখানে বুড়ো ভূধর ক্ষেত্রপাল থাকত, সে আকাশের ফুল হয়ে যেতে, ভিটেটিও যেন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে ওই আকাশের দেশে। অর্ধেকের বেশি চাঁদ শীতের সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না নামিয়েছে। চাঁদের আলো পড়তে যেন শীতও কমল একটু। সে নেমে গেল উঠোনে। সেই পুরাতন ভিটেটি এখন খণ্ড প্রান্তর, ধু ধু। পোতার চিহ্ন রয়েছে। তার উপরে এলোমেলো গাঁদার চারা গুটি কয়। মুখে হাসি এল ক্ষীণ, এর নাম বাগান নয়, আগান, ঝোপ, সাপের বাসস্থান হবে শীত গেলে। পোতাপার হয়ে ভিটে শেষ। তার পিছন থেকে আরম্ভ হয়েছে ধানী মাঠ, বাইদভূমি, তা পেরিয়ে পাথরের স্তূপ, শীতে ঠাণ্ডা হচ্ছে। ধানকাটা শেষ। ভূধর ক্ষেত্রপালের জমিতে এবার ধান হলো কেমন? বুড়ো কি ধান দেখে মরেছে? জিজ্ঞেস করতে সাহস হলোনা তার। সে তাকিয়ে দেখল পোতার উপরে খোলস ছেড়ে গেছে সাপে। ইঁদুর মাটি ছড়িয়েছে চতুর্দিকে।

গাঁদা গাছে সিরসির করছে হিম জ্যোৎস্না, এ ব্যতীত সব থমথমে।

শীত করছিল তার। তাই সে ফিরে এল দাওয়ায়। সেখানে তার সমন্ধী আর সমন্ধী বউ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে। এক কোনে হেরিকেন দপ্‌ দপ্‌ করছে।

—চিমনিটায় কালি পড়ে যাবে। অজিত আঙুল তুলে দেখাল।

—ওটায় কালি পড়ে। বিলাস বলল।

—কেনে?

—অভ্যেস, তা তুমি এলে কেনে হঠাৎ?

—কিয়া কম্মো।

—সরতো শেষ, তাছাড়া শেষকালে তো তুমার শউরও ছিলনা সে মানুষ।

অজিতের মুখ জ্যোৎস্নার উল্টোদিকে থাকায় অন্ধকার। সে অন্ধকার মুখেই দেখল বিলাসের মাথা কামানো। নেড়ামাথায় হাতবুলোতে বুলোতে বিলাস ক্ষেত্রপাল জানান দিচ্ছিল যে ভূধর ক্ষেত্রপালের সঙ্গে সুতো তাঁর বাঁধা ছিল একমাত্র, আর কারোর নয়। তবু অজিত চেষ্টা করল, বিড়বিড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, মরার সময় কষ্ট হইছিল শউর মশায়ের?'

—না, কষ্ট হবে কেনে, আমি ছিলাম ওই কাঁথায় ব'সে, যেখেনে মরল।

কথাটা বলল বিলাসের বউ। সন্ধের পর এই প্রথমকার গলা শুনল অজিত। সে এখন সেই ঘোমটার ভিতরের মুখ দেখবার চেষ্টা করল, তাই আবার জিজ্ঞেস করল। সরস্বতীর নাম করছিল?

—ছিঃ! ঘোমটা ন'ড়ে উঠল যেন ঘেন্নায়, নায় করলে কি আর এমন দেবতার মত সোন্দর মরণ হ'তো?

ব'লেই বিলাসের বউ পা দাপিয়ে হেরিকেনের সামনে বসল, কালি পড়া কাঁচের দিকে তাকিয়ে রীতিমত চোপা করতে লাগল, 'সন্ধেবেলায় মড়ামানুষ নিয়ে কথা, গেরস্তের যত সব্বোনাশের ধান্ধা, বিয়ে করে সমসার পাতো না, চোখে তো খিদে আছে বেশ দেখছি।'

কথাটায় একেবারে মুষড়ে পড়ল অজিত থানদার। তার লজ্জা করতে লাগল। সামনে যে বিলাস ক্ষেত্রপাল দাঁড়িয়ে। ওর বউয়ে জলজ্যান্ত মিথ্যেবাদী একথা কি ও জানে। তার মনে তো কোন পাপচিন্তা ঢোকেনি। একথা বোঝাবে কি ক'রে? এখনই গিয়ে কি সমন্ধীর পরিবারকে প্রণাম ঠুকে আসবে। সম্পর্কে কে বড় বটে।

॥ ২ ॥

খাওয়ার পর রাত্তিরে বিলাস এল অজিতের ঘরে। এ ঘরটিতে ধানের বস্তা, পুরনো কুমড়ো, নতুন লাউ, নতুন বিলাতি অর্থ্যাৎ টম্যাটোর সঙ্গে অজিতকে ঠেসে দিয়েছে বিলাসের বউ একটা খাটিয়া ঢুকিয়ে। তার উপরে ব'সে অজিত বিড়ি টানছে। নতুন একটা দেশলাইও দিয়েছে গেরস্তের বউ।

ঘরে ঢুকে বিলাস জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে আর বিড়ি লাগবে?

—আঁজ্ঞে না, আছে।

বিলাস খাটিয়ার এককোণে বসতে বসতে বলল, 'জমিজমায় দিন চলা দায়, তা তুমার কারখানা কি খুলল ?

অজিত তার সমন্ধীর প্রথম কথায় উদ্বিগ্ন এবং সতর্ক হলে, দ্বিতীয় কথায় মাথা নাড়ল। কারখানা সেই কবে থেকে বন্ধ। বছর তিন হয়ে গেল। সে এখন আর খোঁজ নেয় না, যদিও রাণীগঞ্জে যায় প্রায়ই। গঙ্গাজলঘাটিতে একবিঘে পৈতৃক জমিতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ক্ষেতমজুরিও করে। বড় অভাবে চলছে।

—সংসার পাতো আবার, মেয়া চাও, দিচ্ছি, পণও দিবে তারা।

বুকটা কাঁপল অজিত থানদারের। সে হলো মৃত ভূধর ক্ষেত্রপালের সাধের জামাই। ভূধর তাকে ঘরজামাই করতে চেয়েছিল। সে রাজী হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে সব। ভূধর বলেছিল, 'বিটিরে লিয়ে যাচ্ছো, ম মরা বিটি, উহাকে কষ্ট দিয়োনা হে জামাই।'

—আপুনি রাণীগঞ্জোতে গিয়া দেখবেন।

—তা হয় না, কলের দেশে মু চাষা লোক, ধন্দ লেগে যাবে চোখে, ধুঁয়া, শব্দ, ইসব সহ্য হবেক নাই।

পরে ভূধর ক্ষেত্রপাল তার হাত ধরেছিল, 'বরং তুই ইথানে থাক জামাই, মেরে জমিন রইছে পাঁচ বিঘা, ভিটা দশ কাঠা, চাষবাস কর, নাতিপুতি হউক।

জামাই অজিত থানদার মাথা নেড়েছিল, 'তা হয় না বাপ, আমি আবার কলে কাজ করা মানুষ, চাষবাসে মন ভরে না, ভুলি গিছি, আর আমার মা বুন থাকে জি-ঘাটিতে, বউ লিয়ে ঘরজামাই হবো, তা ভাল দেখাবে না, আমি রাণীগঞ্জোতে যাই।'

—মা বুন লিয়ে আয় ইথানে। অনুনয় করেছিল ভূধর ক্ষেত্রপাল।

—নাগো, জমিন তুমি চষো, মোর লোভ নাই, ইবছর খরা, উবছর ধানে পোকা, ধান মরছে বছর বছর, ইসব কলকারখানায় নাই, কাগজকলে খরা নাই হে বাপ, মাস গেলে নগদ পয়সা।

বুড়ো ক্ষেত্রপাল অবশ্য জেনে গেছে কাগজ কলেও খরা হয়। ভয়ঙ্কর খরা। তাতে সব পুড়ে যায়। কলের চাকা বন্ধ মানে কলের দেশে মড়ক লাগা প্রায়। সেই শোকেই বোধহয় বুড়ো মরল। এখন তার জামাই মরছে অন্যভাবে।

—শুনো অজিত, তুমি বরং বিয়ে ক'রে লাও, না করলে তুমি মরবে ঠিক।

অজিত থানদারের কানের কাছে বসে বিলাস ক্ষেত্রপাল সুপরামর্শ দিচ্ছিল। অজিত মাথা নাড়ছিল ক্রমাগত, 'তা হয় না সমন্ধী, তুমার বউ মানে বউ দিদি যা ভেবেছে তা ঠিক নয়, আমি বেশ আছি।'

উহুঁ, মাথা নাড়ল বিলাস, 'মোর পরিবার ভুল ত্থাখে নাই, ভুলভাবে নাই।'

—তাহলে আমি বরং চলে যাই, তুমার বউ আমার সম্পর্কে বড়, ইসব কি বলছ সমন্ধী, আমি কি তেমন?

হাসল বিলাস, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, কিন্তু মোর পরিবার তো যেমন তেমন মেয়ে মানুষ লয় যে মিথ্যা বলবে, তুমার চোখে সে লেশ্চয় কিছু দেখেছে।

অজিত বোবা হয়ে গেল একথায়। বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এই জমকা শীতে যাবে কোথায়? সে কলে কাজ করা লোক, তঞ্চকতা করার বুদ্ধি নেই। তার মানে লাগছিল খুব।

বিলাস এবার কথাটা একটু ঘুরিয়ে দিল, তুমার বুদ্ধি কম, সেইজন্যই ইদ্দশা হইছে, আমি কি বলছি যে মোর পরিবারের উপর তুমার নজর, না আমার বউ সেকথা বলেছে, আসলে তুমার যে একটা বিয়ের দরকার, মেয়্যামানুষ দরকার সে কথাই সে জানতে পেরেছে তুমার চোখে।

অজিত বাঁচল যেন। বুকের দমবন্ধ ভাবটা কাটল তার, সে হেসে বলল, 'ন্যাগো, সে দরকার নাই, আর ও পথে নয়।'

কি ক'রে যাবে ওপথে। সে যে ভূধর ক্ষেত্রপালের জামাই। তাকে কত ভালবাসত বুড়ো। সেই কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর তার হাত ধরে বুড়ো কেঁদে ফেলেছিল, 'জামাই, উ মোর বিটি লয়, যম, কলবন্ধ হ'তে তুই ওরে লিয়ে ইখানে চলে আসলিনে কেনে বাপ?'

আসা হয়নি। জি-ঘাটি অর্থাৎ গঙ্গাজলঘাটিতেও যেতে পারত মা-বোনের কাছে বউ নিয়ে, তাও যায়নি। আশা ছিল কলের চাকা ঘুরবে। এসব ভাবতে তার ভাল লাগছেনা, সে তাই বিলাসকে জিজ্ঞেস করল, জমিন তুমার তো পাঁচ বিঘা, তাই না?

'না, তার ডবল,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় বিলাস, 'এসব সংসারের খবর তুমার কি দরকার, যা বলছি তাই কর।'

—উঠলে কেনে, বসো। অজিত ডাকল বিলাসকে।

বিলাস নেভা বিড়িটা ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণে টম্যাটোর গাদার উপর, তারপর দরজার দিকে পা তুলে কুমড়ো টপকে এগোল, না যাই, জাড় লাগছে।

—বসোনা।

—না, মোর পরিবার জেগে রয়েছে, তার জাড় কাটবেনা আমি না গেলে।

একটু বসো। অজিত আবার ডাকল।

—উহুঁ, বউ বলেছিল তাই আসছিলাম, তার চেনা মেয়্যা আছে, ই গাঁয়েরই, যদি তুমি বিয়ে করো, ভাবো রাত্তিরটা, আর হ্যাঁ, যদি মনে করো ওসবে দরকার নাই তো ভোরের বাসে চলে যেও, একটা ডিংলা লিয়ে যেও বরং, ঘরে শেকল মেরে বাস ধ'রো, মোদের ডাকতে হবেক নাই।

ডিংলা হলো এদেশী কুমড়ো। অজিত বুঝল বিলাসের অবস্থা ভাল হয়েছে। ভূধরের জমিও তো সে ভোগ করছে। না হ'লে কুমড়ো দেবার লোক তো বিলাস নয়। এ নিশ্চয়ই ভূধরের জমির ফসল।

দরজার বাইরে দাওয়াতে চাঁদের আলো। সেই আলোয় চমিতে বিলাসের বউকে দেখা গেল! তার পরামর্শেই, তো বিলাস এঘরে ঢুকেছিল। আড়াল থেকে সেও শুনছিল সব কথা।

—মোরা দুজনা দোর বন্ধ করছি হে থানদার, তুমি বরং জেগে জেগে পাহারা দাও।

খিলখিল করে হাসল স্বামীর কথায় তার বউ। তখন অজিত থানদার ভাবছিল তার তো পাহারা দেয়ারই কথা। সে পাহারাই দেবে ভূধর ক্ষেত্রপালের ছেড়ে যাওয়া সংসার, জোতজমি।

॥ ৩ ॥

সকালে দরজা খুলে আগে বউ, পিছনে বিলাস, একসঙ্গে বেরিয়ে এল দুজনে, দেখল দাওয়ায় বসে অজিত থানদার বিড়ি ফুঁকছে, চোখ দুটি লাল, রাতে ঘুমোয়নি বোধহয়। খুব ভেবেছে, তার মানে মত বদলেছে। সে তাই বউকে টপকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হলো যাওনি যে, বিয়ে করার ইচ্ছে হইছে তাহলি ?'

মাথা দোলায় অজিত থানদার, না ওপথে আর নয়।

—তবে যে রঁইছো ? বিলাসের আক্কেল গুড়ুম।

—রহি গেলাম। অজিতের চোখে-মুখে নির্লিপ্ত ভাব।

বিলাস বুঝল অজিত থানদারের উদ্দেশ্য খারাপ। নরম হয়েছিল বলে চেপে বসতে চাইছে। একে রাখা মানে বিপদ দরজা খুলে ঘরে ঢোকানো। সে বউ এর দিকে তাকায়, তার চোখমুখও কঠিন হয়ে উঠেছে। সুতরাং সে হাঁটুভাঙা অজিতের সামনে নিচু হয়ে বলল, 'আর থাকা হবেক নাই, ঘরে সুমত্ত বউ রইছে আমার, তুমার বেপার তো সুবিধের লয় দেখছি।'

অজিত তখন দাওয়া থেকে উঠোনে নামল। সকালের রোদ খোলা উঠোনে যেন শীত তাড়াতেই বসেছে। রোদের সঙ্গে অজিতও বসল, বসে গলা তুলল, 'ভিটা ভাঙা কিন্তু গ্যায্য হয় নাই।'

—সে কথা বলার তুমি কে হে? বিলাসের গলা উঠল, মেজাজ তিরিক্ষি হলো।

—মোর শউরের ভিটে তো বটেক, সব গাপ করি নিলে সমন্ধী, তুমার জমিন যে উবল হইছে, তা কেনে হইছে?

বিলাস বুঝল এবার ঠিক লাইনেই গেছে অজিত থানদার। সে বিপন্ন মুখে পরিবারকে দেখল পরিবার তাকে বলল, উটাকে তাড়াও।

—কেমনে? বিলাস বউকে জিজ্ঞেস করে।

জবাব না দিয়ে বিলাসের বউ কোমরে হাত দিয়ে উঠোনে নামল, ভিটা থেকে বার হই যাও?

রণরঙ্গিণীমূর্তি। রাগে ফোঁসফোঁস করছে বউ, আর বউ এর পিছনে বিলাস ক্ষেত্রপাল। অজিত রোদে বসে কিন্তু মাথা গরম করল না। অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'আমি শউর মশায়ের সম্পত্তিগুলান দিখে লিবো, ফসল তুমরা খাচ্ছো খাও, চাষ করো, তাও মানি লিবো, মুর তো সে সমথ নাই।'

বিলাসের বউ বুকের আঁচল টানল, চোখ কপালে তুলল, 'ছি? তুমার এত লোভ! কি দিষ্টি গো মানুষটার, তাড়াও শিগগীর।'

তখন অজিত থানদান উঠল, উঠে বলল, 'আমি প্রধানের কাছে যাই।'

—কেনে? বিলাসের চোখে ভয় ঢুকেছে।

—সম্পত্তি গুলান উদ্ধার করতি হবেক, ভিটা গেল, জমিনও যাবে নাকি, আর হাঁ উখানে আমি ফের ভিটা তুলব।

অজিত থানদার বেরোতেই বিলাস বুঝল বিপদ আসন্ন। খুড়োর জামাই আটঘাঁট বেঁধেই এসেছে। মৃত ভূধর ক্ষেত্রপালের জমি তো কম নয়। ধানী জমি পাঁচ বিঘে, বাস্তু দশকাঠা, তাতে এখন গাঁদার চারা। ফুলচারা করার বুদ্ধিটা দিয়েছে তার নিজের বউ। সেও এ ঘটনায় হতচকিতা। জমায়েত যদি ডাকে, কি হবেক? বিলাস ফিসফিস করছিল।

বউ বলল, ভাঙা ভিটায় ফুলচারা বসাইছি, মোর খুড়াশাউর মরি স্বর্গে গেছেন, তাঁর ভিটায় যদি ফুলচাষ হয় তো তিনি সুখী হবেন ঠিক!

আহা ন্যায্য কথা। কথাটা মনে ধরেছে সবার। বুড়ো ভূধর ক্ষেত্রপাল বড় মনোকষ্ট নিয়ে মরেছে। তার ভিটে রেখে তো লাভ নেই। ওখানে ফুল ফুটলে তার ভিতরে বসে থাকবে ভূধরের আত্মা। ঠিক করেছে বিলাসের বউ।

সন্ধেয় সমাজ বসেছে বিলাসের উঠোনে। সমাজেই হচ্ছে এসব কথা। হ্যাজাকবিড়ির খরচ অজিত খানদারের। আগুন দেবে বিলাসের বউ। অজিতের পকেটে গ্যাস ফুরোন রানীগঞ্জ বাজারের লাইটার। ভাঙাপোতায় বসে আপন মনে লাইটার খচখচ করছিল আর কথা শুনছিল। গাঁয়ের মুরুব্বিরা সব টুপি চাদর মুড়ি হয়ে উঠোনে চাক বেঁধে আছে।

অজিত বলল, ফুল চাষ এই উঠোনে হউক, আমি উখানে ঘর তুলব।

—ঘর তুলে কি হবেক? জিজ্ঞাসা এক মুরুব্বির।

—আসব যাব, থাকব, ইতো আমার শউর ঘর, থাকার হক আছে।

…জমিনও লিবে নাকি? আবার জিজ্ঞেস করল সেই মুরুব্বি।

—ইখন সমন্ধী চযুক, লিবার হলে নিবো, তবে চাষের তো জানিনা কিছু, আমি সমন্ধীর সঙ্গে কলহে যাবো না।

বাহ্। এ কথা তো খারাপ নয়। এ ওর সঙ্গে মত বিনিময় করতে লাগল অন্ধকার আলোয় বসে। তা দেখছিল বিলাস আর তার বউ দাওয়ায় বসে। তাদের দুজনের মুখে হ্যাজাকের আলো জ্যোৎসার মায়া তৈরি করেছে। বিলাসের কানে ওর বউ ফিস্‌ফিস্ করল। বুদ্ধি দিল বিলাসকে। না দিয়ে উপায় আছে। অজিত খানদার যে ভিটেয় ঢুকে পড়ার তাল করেছে। আগে ঢুকবে, পরে জমিও নেবে ঠিক। খুব শাহেন্‌শা লোক।

বিলাস বলল, সবই বুঝলাম তো, কিন্তু ও কেনে ভূধর ক্ষেতরো পালের জমিন পাবেক, মোর খুড়ার জমিতে হক আমাকের, ও কেনে ঘোঁট পাকাচ্ছে?

সকলে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। বিলাস এবার কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা তুলতে চাইছে। অজিত এসেছে ভূধরের জামাই হয়ে। ভূধরের একটিই সন্তান, সে হলো ওর মেয়ে সরস্বতী। সুন্দরী গৌরী সরস্বতী। তার স্বামী এই অজিত। মেয়ের অধিকার বাপের সম্পত্তিতে। সেই অধিকারেই তো অজিতের আগমন।

বিলাস বলল, ক্ষেতরোপালের মেয়্যা কি ওর বউ, ও বলুক।

সকলে নড়ে বসল। ঘটনা তাদের কিছু কিছু শোনা উড়োমানুষের মুখে।

অজিত তো এ গাঁয়ে বহুকাল আসেনি। শ্বশুরের কাছে দুএকবার রাতে আসলেও ভোরে কেটে পড়েছে। তাই সরস্বতীর দশা সবাই জানেনা তেমন করে। সরস্বতীকে ও বিয়ে করে রানীগঞ্জে নিয়ে গেছিল একথা জানা, কিন্তু তারপর? অজিত জবাব দিক। সে তো আকাশের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে বসে আছে। বড় অহঙ্কারী ওর ভঙ্গী। এক মুরুব্বি কি মনে করে আকাশে চোখ মেলতে দেখল জ্যোৎস্না ধোয়া নভমণ্ডলে পেঁজা তুলোর পথ এঁকে চলে যাচ্ছে জেটবিমান। সে দেখতে দেখতেই হাঁক মারল, কি হে বলো।

—আজ্ঞে বিয়ের খবর তো সবাই জানে। অজিত উপরে চোখ রেখেই নির্লিপ্ত স্বরে বলল।

অজিত থানদারের এই আশ্চর্য নির্লিপ্ত অহঙ্কারে সকলে থ মেরে যায়। গাঢ় স্তব্ধতা নেমে আসে উঠোনে। পলাশ গাছটা জ্যোৎস্না অন্ধকারে দুচারটে পাতা ঝরিয়ে দিলেও তা জানতে পারল না কেউ, এক মুরুব্বির পুরনো মাফলারে পলাশ পাতা আটকে গিয়ে থিরথির করতে লাগল। সে জানল না অন্ধকারে তাকে গাছের মত দেখাচ্ছে। আকাশপথে নিঃশব্দে জেটবিমান তখন ভূমণ্ডলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গেছে। বিলাসের বউ মুখ খুলল।

—কিন্তু সে বউ কুথায়, নিয়ে আসুক, দিবো সম্পত্তি।

তা ঠিক, প্রধান মহাশয় মাথা দুলালেন, থানদার বউ নিয়ে এস।

—সে আসবে, ইখন তার সম্পত্তিটা আলাদা করে দিন। অজিত মাথা নামাল আকাশ থেকে, কথাটা বলে উত্তরের আশায় জমায়েতের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—আসবে! বিলাসের বউ এবার নেমে এল উঠোনে, কবে আসবে হে, শুনুন গো, বউ-ই মরদরে ছাড়ি পলাইছে, এটাই হলো সত্য কথা।

কথা যেমন শোনাল বিলাসের বউ, তেমনি এসে দাঁড়াল জমায়েতের খুব কাছে। তার বয়স বেশি নয়। যুবতী এবং প্রখরা। জোর গলায় নিজের কথার দাম তুলতে চাইল সে।

'ওকথা তুমি বলোনা হে বউদিদি', বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে অজিত থানদার, 'আমি থানদার বংশ, মানে ঘা দিয়োনা হে।'

থানদার মানে থানাদার, চৌকিদার বংশ। পাঁচপুরুষ আগে কাশীপুর রাজার বসানো চৌকিদার তারা। দুচার ঘর খুঁজলে পোশাক-পত্তর, লাঠি-সড়কি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কাশীপুর হলো পুরুলিয়া জেলায়। এ

মালভূমে সে রাজবংশের সম্মান যেমন, তেমনি সম্মান তার বসানো প্রজার। ন্যায্য বলেছে অজিত। রাজা নাই, প্রজা নাই, কিন্তু বংশের মান যাবে কোথায়? মুরুব্বি গ্রামবুড়োদের চোখে পুরোনদিন হিমের মত ঝরে পড়ে।

—কিন্তু যে থানদার বউ রাখতে পারে না, সে কিসের থানদার, মোদের মেয়্যা তো ক্ষেত্ররো পাল বংশের বটেক, ক্ষেত্ররো পালরে পাহারা দিয়া, চৌকি দিয়া থানদারের কাজ লয়? বিলাসের বউ কথাটা বলে হাঁপায় যেন।

কথাটায় ধার ছিল। কথাটায় বিষ ছিল। শুধু বিষ নয়, কথাটায় মোহ ছিল। সেই ধারে বিষে মোহে জড়িয়ে পড়ল সবাই। এ হলো মেয়েমানুষের গুণ। এককথায় সবাই কাত। সতিকথাই তো বলেছে বিলাস ক্ষেত্র পালের বউ। ক্ষেত্রের অধিকারী যে সেই হলো ক্ষেত্রপাল, এককালে রাজার বসানো চাষী তারা। ক্ষেত্রপালকে রক্ষা করাও তো থানদারের কাজ, অথচ ক্ষেত্র পালের মেয়েকে রক্ষা করতে পারল না অজিত। তবে সে কিসের মান দেখায়, কিসের গৌরব করে।

মুখ নিচু করে বসে আছে অজিত। কথা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে তার। কি বলবে? বুক ভার হয়ে গেছে। ভূধর ক্ষেত্রপালকে বলেছিল, জমিনে খরা হয়, রানীগঞ্জের কলে তা হয়না গো, হপ্তা গেলে মাস গেলে টাকা। কি হলো কি? একবছর খরা হলেও পরের বছরের আশায় জমি ধরে থাকে ক্ষেত্রপাল। কিন্তু কাগজকল যখন নিষ্ফলা হয়, বন্ধ হয়, খরায় পোড়ে—! বুক ধকধক করতে থাকে অজিতের। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল সরস্বতীর। কল বন্ধ হলেও ছাড়তে চায়নি রানীগঞ্জের রোশনাই।

অজিত বলেছিল, চল তুরে রেখে আসি তুর বাপের ঘরে, কল বন্ধ থার কি?

সরস্বতী মাথা নেড়েছিল, উঁহু, কল খুলবে ঠিক, আর ছ্যাখো কয়লা খাদানে কাজ জুটে কিনা?

খাদানে ঘুরল সে। কিন্তু জুটল না কিছু। বরং সরস্বতী পাল্লায় পড়ল এক খাদান বাবুর, কয়লা দালালের। গাঁ থেকে যে গঞ্জে যায় সে আর গাঁয়ে ফিরতে চায় না, কয়লা মেখে কালি হবে, রঙ পোড়াবে তবুও না। ক্ষেত্রপালের মেয়েকে ফুঁসলে নিয়ে গেল কয়লার লোক। কোথা থেকে যে কোথায় গেল সরস্বতী, তার খোঁজ পেল না সে।

—সে বউ নাই, থাকে না তুর সঙ্গে। বিলাসের বউ আবার গলা তুলল।

—তবু সে আমার বিয়ে করা বউ। অজিত কোনরকমে বলল।

—কিন্তু এখন তো অন্যলোকের ঘরে। বিলাস বলল।

—তারে তো বিয়ে করেনি, দেখেছে কেউ ? অনুচ্চ গলায় একথাটি বলে অজিত থানদার মুখ লুকোল।

এতক্ষণে প্রধান কথা বললেন, সবই তো বুঝা গেল, কিন্তু যার জন্য জমিন, তারেই যদি না রাখতে পারো, তো জমিন রাখবে কি করে হে ?

কথাটা বলে প্রধান সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর চোখে চোখে কথা বললেন বিলাসের বউ এর সঙ্গে। হাসলেন ঠোঁটের কোণে, সে হাসি লুকিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গিয়ে আশ্রয় নিল বিলাসের বউএর ঠোঁটে। প্রশ্রয় পেলেন প্রধান বিলাস ক্ষেত্রপালের বউএর চোখে। দামীকথা বেরিয়েছে তাঁর মুখ থেকে।

—কিন্তু সরস্বতী তো তার বাপের জমিন পাবেক। অজিত শেষ চেষ্টা করল।

—সে পরে বুঝা যাবে, ভূধর খুড়া মলো আর তুমি সম্পত্তির লোভে শকুন এলে, একি মানষের কাজ হলো, খুড়োর জন্য আমি মাথার চুল ফেলিনি ?

বিলাসের কথায় পাঁচজনে রাগী চোখে অজিত থানদারের দিকে তাকায়। বিলাসের বউও তীব্রদৃষ্টিতে বিদ্ধ করল ক্ষেত্রপাল ঘরের জামাইকে। অজিত থানদার এতগুলি চোখের আক্রমণ সহ্য করতে পারছিল না। কল ভাঙা পোতায় হাঁটু ভেঙে। সব তার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সহানুভূতির আশায় এসেছিল, কিন্তু তার ছিটেফোঁটাও নেই কারোর চোখে। জমিজমা এমনই বস্তু। কিন্তু সে তো জমির ফসল চাইছে না, বলছে শ্বশুরের ভিটেয় বসবে, সম্পত্তিটা তার অর্থাৎ সরস্বতীর, এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকবে। জমিজমায় তার মায়া নেই, সে কাগজকলের লোক, এসেছে অন্য এক মায়ায় ভর করে।

অজিত ফিসফিস করে করল, ক্ষেতরোপালের মেয়েরেই থানদায় এখনো ভালবাসে হে।

তার কথায় সকলে হো হো করে হাসল। বিলাসের বউ শরীর উপচে হাসি বারিয়ে দিল ওঠোনে, 'মরণ ! সব সম্পত্তি লিবার ছল, আসলটা রাখতে পারলো না, এখন জমিনে এসে মাথা ঠুকছ্যা, ভালবাসা ধুয়ে খাও, দিষ্টি আমি বুঝিনা।'

অজিত মুখ তুললো আকাশে। সরস্বতী তাকে গ্রহণ করেনি, সে তাকে করেছিল। সরস্বতী তাকে ছেড়ে গেল, কিন্তু সে তো ছাড়েনি। এ যে কেমন করে হলো ? ক্ষেত্রপালের মেয়ে আসল ভুলে নকলের হাতে গিয়ে পড়ল।

অজিত ভিটের মাটি দুহাতের মুঠোয় ভাঙতে লাগল। গুঁড়িয়ে দিতে লাগল বসে বসে। তার চোখ থেকে হিমের ফোটা পড়ল মাটিতে। ভূধর ক্ষেত্রপালও আন্দাজ করেনি তার সারাজীবনের কষ্ট করা সম্পত্তি মাটি অন্য-লোকের কব্জায় চলে যাবে মরার একমাসের মধ্যে। থানদারের থানাদারি গেল যেমন রানীগঞ্জের বাজারে, তেমনি ক্ষেত্রপালের ক্ষেত্র গেল ওই বাজার থেকে এই গাঁ দেশে।

সম্পত্তি তো ছল। কাগজকল যদি খোলে সে আবার ফিরে যাবে রানীগঞ্জে। কাজ খুঁজছে প্রাণপণে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই ভিটেতে তাকে থাকতে হবে। সম্পত্তি, বাপের ভিটে, আর বুড়ো বাপের টান তো আছে ক্ষেত্রপালের মেয়ের মনে। সে তো জানে না বাপ মরে গেছে। জানলে ও ছুটে আসবে ঠিক। আজ না হোক, কালতো সরস্বতীকে ফিরতেই হবে এদেশে। কয়লার মোহ কাটলেই ফিরবে। এই থানদার সেই কারণেই তো এল এখানে। সরস্বতীর জন্য সে ভূধর ক্ষেত্রপালের সম্পত্তি আগলে বসে থাকতে চায়। এই ভাঙা ভিটেয় বসে সে যে ক্ষেত্রপালের মেয়ের গন্ধ টের পাচ্ছে তা বোঝাবে তাকে? সামনের মাথাগুলোকে তার মনে হচ্ছিল কয়লার চাঙড়, কয়লার পাহাড়। ওরা কি হীরে দেখেছে কখনো? রানীগঞ্জের গ্যাসলাইটারটা পকেট থেকে বার করে সে অন্ধকারে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে।

বাজার বসে রানীগঞ্জে দিনে রাতে! সেই বাজারে বউ গেল। বাজার এল গাঁ দেশে। সেই বাজারে ক্ষেত্র গেল। বিলাসের বউএর বুদ্ধি খুব। তাই মধ্যরাতে থানদারের ঘরে একটা অবিবাহিতা যুবতী মেয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে শিকল তুলে যখন চিৎকার করতে আরম্ভ করল, তখন অজিত কিন্তু স্বপ্নের ভিতরে ছিল। যে স্বপ্নে স্বপ্নে সে এখানে এসেছে ক্ষেত্রপালের মেয়ের আশায়, যে স্বপ্নে স্বপ্নে সে ভাবে আজ বাদে কাল কাগজকল খুলবে, প্রায় সেইরকম, অন্য কিছু নয়। হট্টগোলে তার স্বপ্ন কয়লার মত ভেঙেচুরে পড়তে লাগল অন্ধকারে।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

কিছু না-করার চেয়ে ক্ষুণ্ণ করা ভালো

শহিদের মূর্তি, তার দৃপ্ত মুখ, বাঁ হাতে পতাকা
ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ, নিচে,
পরণে পাঞ্জাবী ধুতি, দুপায়ে চপ্পল।
অগা পুলিশের মারে যার প্রাণ গিয়েছে একদা
অমর করেছে তাকে মার্বেল পাথর,
মার্বেল পাথরে কাটা ভাস্কর্য, বিশাল। এই হয়।

ও-পাশে শস্যের মাঠ শুকনো ও অপেক্ষমাণ—
মূর্তিটার কাছে যাই,
শিল্প ও দেশাত্মবোধ যুগপৎ আক্রমণ করে,
মনে পড়ে গান্ধীজীর কথা।
লোকে বলে, আমরা তাঁকে পুরোটা বুঝি না,
বাঙালীবিদ্বেষী বলে নিন্দা করে গোপনে অনেকে।
শিল্পবোধ কতখানি খসে গেলে মানুষ বিপ্লবী হয়, আমি তো জেনেছি,
তা হলেও
সংগ্রামী পেনসন পায়, বিপ্লবী পাথর হয় ভাগ্য ভালো হলে।

শহিদের গুলফ থেকে একটু নিচে পাথরে আঁচড়
বাংলা দুটি শব্দ : ... ... চোখে পড়ে,
অশ্লীল ও সংগ্রামবোধক ওই শব্দ কেউ উৎকীর্ণ করেছে।
আমার কৌতুকবোধ হয়

ছি ছি রুচি কোথায় নেমেছে
না-ভেবে বুঝতে চাই, প্রজনন বিষয়ক এমন করুণ ঠাট্টা
এখানেই কেন,
শহিদের মূর্তি দেখে রিরংসা জাগ্রত হয় কখনো শুনি নি।

আসলে তা নয়। মনে হয়
কোনোদিন কোনো হতভাগা এসে বসেছিল মূর্তিটার কাছে
জীবন বা মৃত্যু যাকে উত্তাপ দিল না,
শিয়ালের পুচ্ছের মতন
ভারী ও ভরাট
থরথরে ধানের গুচ্ছ যে কখনো মুঠোয় ধরে নি,
যে কখনো শিশুর কাঁথায় হাত রাখে নি সকালে।
নিমুখা কুক্কুর, যার ডাক নেই,
তার সামনে অমরতা, মার্বেল ভাস্কর্য আর উড্ডীন পতাকা
স্ববিরোধ!
হা-হা শব্দে হতভাগা হেসেছে সেদিন, বোঝা যায়
অথচ ভেঙে যে ফেলবে, তত শক্তি শরীরে ছিল না,
সুতরাং
যা ছিল সংগত আর স্বাভাবিক, তার পক্ষে,
সেটুকু করেই চলে গেছে
কিছু না-করার চেয়ে ক্ষুণ্ণ করা ভালো, এই ভেবে।

একদিন আমি তাকে খুঁজে বার করবো, দেখে নিয়ো।

ওর হাতে নরম ফাঁসের দড়ি

টিয়ার খাঁচার সামনে বৃদ্ধ বসে আছে।
ব্যস্ত রাজপথ
বহমান জনস্রোত, বহিয়া যেতেছে সুসময়।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মানুষ

এই পথ দিয়ে কত চলে গেছে লাল-শাদা ঘোড়ার ফিটনে,
হাঁ-করা জাঁতির মতো কত পাখি
উড়ে গেছে সুসংবাদ আনার ইচ্ছায়,
মার্সিডিস ঘিরে কত নেচেছে পুলিশ,
কত-না টিয়ারগ্যাস ফেটেছে দুপাশে অকারণ।
সব ছবি ধুয়ে মুছে, রাজার সহিস হেন,
কাত হয়ে শুয়ে আছে সামনে রাজপথ।

লাল ঠোঁট দিয়ে টিয়া একটি খাম আচমকা তুলুক
ওর মধ্যে সব লেখা আছে
ওইটুকু প্রশিক্ষণ, বাকিটা ব্যবসা—
বহিয়া যেতেছে সুসময়।
ভীতু মানুষেরা আয় চুপিচুপি,
রোজই আসে তারা, শুনে নেয়ঃ
'বিপর্যয় কেটে যাবে, অনেক বৈভব হবে শেষে',
'আত্মনিষ্ঠ হও কিন্তু শত্রু চিনে রাখো',
কবিতার মতো করে লেখা।

কয়েকটি লেফাফা আর খাঁচায় সামান্য পাখি, এই মঞ্চ
সামনে রাজপথ
ধার ঘেঁষে সবজান্তা বৃদ্ধ বসে আছে।
ওর হাতে নরম ফাঁসের দড়ি জীবনে জড়ানো
ওর উদ্ভাসিত মুখে স্তোক
এর চোখে কবির চোখের মতো হিংসা প্রতারণা।

আনন্দিত

মানুষ, আমার ভাই, হাসো দেখি
অম্লান ফুলের মতো হাসো

রোদ্দুরের মতো হাসো, বালুতটে
আছাড়ি-পিছাড়ি খাওয়া সমুদ্র-শিশুর মতো
প্রাণ খুলে উলঙ্গ শরীরে
সর্বাঙ্গ উজাড় করে হেসে ওঠো, বলো
আনন্দ রয়েছে।

যদি কিছু না-ই বলো, অন্তত বুঝিয়ে দাও
এই হাসি মুখের ব্যাদান নয়, দাঁত-প্রদর্শনী নয়,
ক্ষমাভিক্ষা, তোষামোদ, করুণাসিঞ্চন
এসব দুর্গন্ধ-মুক্ত ;
তৎপর, উদ্দেশ্যহীন এই হাসি,
মানুষই প্রথম নিজে যা শিখেছে প্রকৃতির ক্রিয়াকাণ্ড দেখে।

মানুষ, আমার ভাই
এ-জীবন ব্যর্থ নয়, ঘ্রাণ নিয়ে দেখ,
পবিত্র অব্যর্থ এই চরাচর পরিচ্ছন্ন রাখো, বাধা আছে,
প্রসন্ন মুখের সামনে আবিলতা, হিংসা ঝরে যাবে।

রাজভবনের সামনে

রাজভবনের সামনে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা হল।
মধ্যরাত, পলাশরঙের দুঃস্থ আলো,
জনহীন লোকালয়, হাহাকার করছে নীরবতা।

"আপনাকে বন্দনা করি, এরকম ইচ্ছে ছিল প্রভু
তা আর হল না।"

"আমি তো কবেই সূর্য ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছি আকাশে,
তারপর কী হল কে জানে।"

"আপনার নিয়মে বিশ্ব চলে দেখি,
পাতাপল্লবিত বৃক্ষ যতদূর বাহিরে ছড়ানো
ভিতরে ছড়ানো ততটাই,
আপনি যদি ছন্দ ভেঙে দেন
আমরা মারা যাবো।"

"অভিযোজনের থেকে অন্বয়ে মিলন, জগতের
এ-ছাড়া নিয়ম কিছু নেই,
পিছনে সংঘর্ষ আর সম্মুখে ভরসা,
সকলেই
পূর্ণতা পাবার জন্য বদ্ধপরিকর, শরীরের
সমস্ত অঙ্গার ফেলে চিন্তিত মানুষ দেখে
পূর্ণতার অর্থ অবসান।
কতবার এল প্রাণ পৃথিবীতে, নষ্ট হয়ে গেল নিজে নিজে।"

ঈশ্বর বললেন শেষে :
"আমি সব দেখি আর ভাবি
পূর্ণতার কাছাকাছি এসে কি মানুষ রক্ষা পাবে ?"

হে মহাদূষণ

আমি বলি, তোমাদের হাতে
কবিতার মৃত্যু হল। উনিশশো সত্তরসাল
কিংবা কাছাকাছি
কোনো এক হল্লোড়ের রাতে।
তারপর থেকে শুধু কোলাহল, মিথ্যে মাতামাতি,
পাখির পালক পরে নেচেছে তৈলপ,

হুল্লোড়ের ইতিহাস
সচিত্র প্রতিবেদন
অমর হয়েছে বাংলা ঠোঙার কাগজে।

আমার প্রত্যাশা ছিল, একদিন নিটোল বধির
মগ্নতার কাছে যাওয়া যাবে।
নগ্ন দেহ, মুণ্ডিত মস্তক;
ব্রাহ্মণের উপবীত—আস্ফালন আছে ভেবে ফেলেছি কার্নিশে;
আমাদের কৃত্য ছিল, ব্যর্থতার বিশ্বরূপ না দেখেই
মহাপ্রস্থানের আয়োজন—
তার পরিবর্তে কেন শুনি:
কবিতার শবাধার দুলতে দুলতে সম্মুখে চলেছে
পিছনে পিছনে
যা কিছু কবিতা নয়, শ্লোক নয়, অচর-অক্ষর
শুকনো খই রাস্তায় লাফায়
দু-পাঁচ পয়সার ঢেলা ঠং করে বাজে।
মিথ্ না, মিথ্যের মুঠো ভরে নাচে প্রশান্ত ভিখারী।

আধিদৈবিক

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য

রাত গড়িয়ে রাত বাড়ে। একটানা কান খাড়া রাখায় কানের পাতা ধরে। ঠায় অনেকক্ষণ—অথচ একটি বার, একটি বারের জন্যও কি ডেকে উঠতে পারে না? একটি শিয়াল, একটি লক্ষ্মী পেঁচা, কিম্বা অন্তত একটা খট্টাস? একটা ঘুমে কাতর বনি পাখি? অযথা কুকুরেরা চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে।

ওদিকে আখ-মাড়াই-এর ফলে হৈ-হল্লা—ফুটন্ত গুড়ের গন্ধ ভেসে আসে। সাঁওতাল পাড়ার কলাগাছে তীর-বেঁধা পর্ব শেষ। এখন বিজয়ীকে নিয়ে এক দফা মত্ততা—কে বিঁধতে পেরেছে কলাগাছের ওপারে বসানো চালের পিঠটিতে একটি তীর! সে পাবে একটি নতুন ধুতি, এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া—সেটি কিনে রাখা পাড়ার যৌথ পয়সায়। সম্ভবত সেই কারণেই কুকুরেরা উত্তেজনায় এতখানি ফেটে পড়তে চাইছে।

'নাঃ।'—শ্বাস ছাড়ে পুষ্কর। বাতাস জমে জমে বুকটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে তার। কাঁকড়ার মতো বুদবুদ তোলে দুঠোঁটের ফাঁকে—চিড়বিড় করে। এতক্ষণে পুষ্কর গিরি ভয় পায়। আটবট্টি বছরের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। এখনো, এই এতো রাত পর্যন্ত একটি 'সার'ও ডেকে উঠলো না।

সারটি ডেকে উঠলেই 'সেই খুটি'-র চারপাশে গোল হয়ে সাত বার কিম্বা তিনবার জল-ছিটিয়ে ঘোরা। শঙ্খ ও কাঁসরের শব্দে 'তাঁকে' অভ্যর্থনা জানানো—তারপর লক্ষ্মীর পুজো। ব্রাহ্মণ সত্য ঠাকুর আচমন সেরে পুজো করবে, থলে থেকে চশমাটি বের করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়বে—অগতির গতি তুমি ওমা নারায়ণী। করুণা করহ মাতা জগত-জননী॥ তারপর গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে উঠে যাবে আর এক যজমানের খামারে। পুষ্করের সম্পদ ফুলে ফেঁপে ঢোল হোক—'শ্রীং' নাম জপতে জপতে শাঁখ আলু, আখের কুচি, মর্তমান কলা আর পোয়া পাঁচেক চাল থলেয় ভরবে—পুণ্যের হাত বুঝি পুষ্করের মাথায় ছোঁয়াবে। ভক্তিভরে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে দেবে-দ্বিজে প্রণাম সারবে পুষ্কর। এ তার প্রতি বছরের এক মহান সাধ। কিন্তু যে সব তো সার ডাকলে ঘন।

পৌষ সংক্রান্তির ঠান্ডায় পুষ্করের শরীরের ভোলটিকে ঘিরে হিম লেগেট বসে। মাথায় তার হনুমান টুপি। গায়ে তুষের চাদর—তার ভিতরের খদ্দরের মোটা ফতুয়া। রাত পুয়োলেই মাঘের পয়লা। মাঘে শীত বাঘ। এ সব মানবে কেন ঠান্ডা। পুষ্কর দেবতার নাম করতে করতে ঠান্ডায় কাঁপতে থাকে —বাঁধানো দাঁতগুলি ঠক্ ঠক্ বাজে।

তাহলে কি সার ধরা হবে না আজ!

তাঁকে ধরতে না পারলে পুজো হবে কেমন করে! আর পুজো না হলে……

না, এ সব ভাবাও—

ভাবতে ভাবতে গায়ে যেন জ্বর আসে পুষ্করের। এত পয়সা এত সম্পত্তি—আর টিকিয়ে রাখার জন্যই তো দৈবের কৃপা দরকার। কৃপা না পেলে এত সব থাকবে কেন?

পুষ্কর ভয় পায়।

পিছন দিকটাতে 'পত্‌লিমাড়া' খড়ের গাদার ওপাশে খস্ খস্ শব্দ শুনে চমকে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে তার মেজোর ছোটটি দৌড়ে এসে কিছু বলে—

পুষ্কর তখন ভুতের ভয় পায়। বার বছরে বাপ মরলে, তের বছর থেকেই বিধবা মায়ের সঙ্গে পায়ে পায়ে তাল রেখেছে যে পুষ্কর। তার বাপের নামে পৃথ্বীবল্লভের বন্দোবস্ত দেওয়া সম্পত্তি আগলে আসছে যে পুষ্কর, সেই আজ ভুত দেখে। নাতিটা তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে নাকি ইতিহাস মাস্টারের ভুত দেখেছে। নাতিকে ধমকায় পুষ্কর। তুই থাম্‌ত—লে লে লে কান খাড়া রাখ—

বলে বটে সে, কিন্তু দেবতার নাম নেয় মুখে—ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃনিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ—

ভুত পেত্নীর ভয়ে কাঠ হলে এতসবের নজরদারি করতে পারত কেন সে? সাহসী ছিল বলেই না—

না পুষ্কর ভয় পাবে না।

নিমাই হাজরা—লোকে তাকে বলত ইতিহাস হাজরা। ভদ্রকালী হাইস্কুলে ইতিহাস পড়াত। ভগবানপুর থানার লোক। আটষট্টির বন্যায় ভগবানপুর পটাশপুর ভেসে গেলে, গ্রাজুয়েট নিমাইকে নিজেই ডেকে এনে স্কুলের

মাস্টারিতে ঢুকিয়েছিল সে—সেই শালা কি না শেষে পিছনে বাঁশ দিয়ে—

গত বছর বর্ষার দিনে পাকুড়শনীর পোলের ধারে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কে বা কারা যেন মেরে ফেলেছে নিমাইকে। লোকে বলে পুষ্করের কাজ। নারাণগড় থানা বলে, কোনো প্রমাণ নাই। পুষ্কর বলে পার্টির ভিতর দলাদলি, দুনেতার ক্ষমতার দখল নিয়ে—থানা বলে, না। তারও কোনো প্রমাণ নাই।

পুষ্করের নাতিটা আজ সেই নিতাই-এর ভূত দেখেছে—

হ্যাঁ রে গঁডা কি দেখলু? পুষ্কর কৌতূহলী।

—ইতিহাস মাস্টারের ভূত।

—দূর—

—হ্যাঁ গো দাদু। মাস্টার মোকে ডাকল—

—চুপ কর। সার ডাকে কিনা শুন—

গঁড়াটাকে খুব ভালবাসত নিমাই।

অমর্ষিতে তিনটি তাঁত ঘর আছে পুষ্করের। প্রত্যেকটিতে পঁচিশটি করে তাঁত চলে—সেখানেই পুষ্করের সঙ্গে নিমাই-এর আলাপ। পুষ্করের বাড়িতে থেকে তার নাতি নাতনিগুলিকে পড়াতো নিমাই। চারবেলা খেত। স্কুলে পড়ত আর তারপরই পার্টি ফার্টির কাজ নিয়ে—

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর গায়ের চারপাশে ক্রমশ হিম বেড়েই চলে। ওপর দিকে মুখ তুললেই অগুনতি নক্ষত্র।

২

চাষের কাজ ব্যবসার কাজ ছেলেপুলেরাই সামলায় পুষ্করের। অধিকাংশ দিনেই সে এখন শয্যাশায়ী—তবে আপদে বিপদে সমস্যায় পড়লে ছেলেপুলেরা পরামর্শ চাইতে ছুটে আসে তার কাছে। বাইরে না বেরোলেও পৌষসংক্রান্তির খামার পুজোর দিনটিতে পুষ্কর নিজে খামার আগলে বসে থাকে। মা লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায় যেন। নিজেই সার ধরে—বসে থেকে বামুনের পুজো দেখে—বামুনের সঙ্গে মন্ত্র আওড়ায়—এতো সম্পদের উৎস খোঁজে। গুণীজনদের প্রতি শ্রদ্ধায় আবেগে কাতর হয়ে পড়ে। গলায় শ্লেষ্মা জমে জটপাকাতে শুরু করে।

হান্দোল রাজগড়ের প্রতিষ্ঠাতা গোপবংশীয় রাজা গন্ধর্ব শ্রী চন্দন পাল—লোকে বলে ঝাড়ি সুলতান। তাঁদেরই দাপটে রাজত্ব করা শেষ বংশধর পৃথ্বীবল্লভ। এঁরই কাছ থেকে ষৎ সামান্য কর-আড়াইশো বিঘা জমি বন্দোবস্ত পায় পুষ্করের ঠাকুর্দা হেমেন গিরি। ৺হেমচন্দ্র গিরি। ভক্তিতে কপালে জোড়া হাত ঠেকায় পুষ্কর। আহ্-হা-হা—পুষ্করের বাড়ির কোঠায় উঠলে দিনের বেলা পরিষ্কার হাঁদোল গড়ের কাঁটা-বাঁশের ঝাড় দেখা যায়। মারাঠাদের তীরের ফলা ঠেকাতেই নাকি রাজপ্রাসাদের চারপাশে এই রকম কাঁটা-বাঁশের ঝাড় বসানো। যার প্রতিটি কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে জমিদারদের প্রতিপত্তির কথা প্রবাদ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই রাজবাড়ির পাশ দিয়েই মহাপ্রভু দক্ষিণে যাত্রা করেছিলেন। এড়ায়ে মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে। দাঁতন এড়ায়ে ডেরা জলেশ্বরে পড়ে। কেলেঘাই-এর পাড়ে বিনাইগড়ে বিনাই বাঈজীর নাচঘর। সেখানে এখন চোর ডাকাতের মস্ত আড্ডা। দুপুর রোদে ঝিঁঝির ডাকে যেন নাচুনে বাঈজীর ঘুঙুরের শব্দ পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণীর দরজা ডিঙিয়ে ব্রহ্মাণীর মন্দিরে বসলে ভক্তিতে প্রাণটি শীতল হয়ে আসে। অদূরেই দিঘির পাড়ে নবরত্নের মন্দির। আজ পুষ্করের এত সব তো এঁদেরই দয়ায়। সে তখন বিনয়ী হয়। স্মৃতি বড় বিষাক্ত বিষয়। চমকে ওঠে পুষ্কর! কান খাড়া করে। সার ডাকলো কি?—ওরে ও গঁড়া সার কি—

না। লোধা পাড়ার বাচ্চারা 'মেনি' নাচাতে এসেছে বিজয় পালের খামারে। খড়ের তৈরি পুতুল। নাচিয়ে ভিক্ষা নেবে—চাল মুড়ি আর পুরপিঠে।

ভাবনায় ভাবনা বাড়ে—পুষ্কর দম নেয়। বানের জলের মতো কথাগুলি সময়গুলি ভেসে ভেসে উজিয়ে আসে। স্মরণ করলে এক ধরনের গা-জ্বালানো মজা আসে। যৌবনের দিনগুলি যেন ফিরে পেয়ে উত্তেজিত হতে ভাল লাগে। রাজা রাজড়াদের দাপট আর নেই—এখন হান্দোলের জমিদারের থেকে পুষ্কর গিরিকে লোকে চেনে বেশি। সে কি আর এমনি এমনিই!

তাই তো ভয় পুষ্করের। টিকিয়ে রাখার ভয়। দেবতার ভয়। উনিশ হাজার তিনশো নিরানব্বই টাকা এগারো আনা চারপাই রাজস্বে যে বাহাত্তর মৌজা নানকর এবং দেবোত্তর সম্পত্তি সতেরোশো তিরানব্বই সালে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয় নারায়ণ গড়ের রাজা কৃষ্ণবল্লভকে, তারই ছিটে ফোঁটা নিয়ে আজ পুষ্কর শালবনিতে শিন্দার ঝাড়গ্রামে তিনটি মস্ত কাঠের গুদাম

করেছে। গড়বেতায় কোল্ডস্টোর খুলেছে—ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, দাসপুর গড়বেতার সমস্ত চাষির আলু থাকে পুষ্করের কোল্ড স্টোরে। তাছাড়া অমর্ষিতে তাঁত, সবং আর বেল্কীর হাটে মাদুরের আড়ৎ। এককালে সবং-এর তেইশটি গ্রাম ঘুরে ঘুরে মাদুর কাঠির বাড়ি কিনতো ঠিকেয়। তারপর সে-গুলি চিরে রোদে শুকিয়ে আড়তে আনত। এখন আর কাঠি নয়, তৈরি মাদুরের কারবার তার। এ ছাড়াও ময়নায় পাটের ক্ষেত, মহিষাদল মেচেদায় পানের আড়ৎ, হলদিয়া কোলাঘাটে বাড়ির কনট্রাক্টরি—একটা গেলে একটা থাকে, আর একটা গেলে আর একটা আসে। এসব সত্ত্বেও ভদ্রানীর মন্দিরে নিত্যপুজোটি টিকিয়ে রাখতে অবহেলা করেনি সে। বাপের শিখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতেই বামুন রেখেছে মন্দিরে। বৈশাখ মাসে ব্রহ্মাণীর মন্দিরে পাঁঠাটি পাঠিয়ে দিতে ভোলে না। চৈত্রে তিলদায় তিলেশ্বরের গাজনে পুজোটি পাঠিয়ে দিতে ভোলে না বলেই না, আজ এতো ভয়!

অমঙ্গলের আশঙ্কায় হ্যারিকেনের আবছা আলোয় হাত বাড়ালেই পিছনের অন্ধকারের চাপে ভুতের ভয় পায় পুষ্কর। খামারে বাচ্চাগুলি অযথা আড়ষ্ট হয়। কেবল মাথার ওপর শীতের মস্ত আকাশ বিছানো থাকে।

ঠাণ্ডায় হাঁফিয়ে ওঠে সে। সময়ের জন্য কষ্ট পায়। নিমাই-এর জন্য আফশোষ করে। সার-এর ডাকের জন্য সতর্ক থাকে। কুকুর চেঁচালে তার কারণ খোঁজে। খামারে সেই খুঁটির চতুর্দিকে চালের গুঁড়ি দিয়ে আলপনা দেওয়া লক্ষ্মীর পা-গুলিকে আগলে রাখে—বাচ্চারা যেন মাড়িয়ে না দেয়। সে সব শুনবে কেন বজ্জাতের ঝাড়েরা। ঠিক যেখানটিতে মই আঁকা রয়েছে, সেখানে সিঁড়ির রেখায় রেখায় পা রেখে বজ্জাতি শুরু করেছে।

কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট নাতনিটাকে তাড়াতে চেষ্টা করে পুষ্কর। কাশির দাপটে আবার ফিরে এসে বসে। অধৈর্যে ঘন ঘন হাই তোলে। মশা মারে।

দূরের কোন একটি গ্রাম থেকেও কি একটি শিয়াল হুক্কা হুয়া করে উঠতে পারে না? হরিহরপুর হরনানাথি, রামচন্দ্রপুর পায়রাচালি, শঙ্করগুড়ি নাঝিরেখাল, বাগডিহাটি লালে লাল। সেই বাগডিহাতে বসেও তো যে কোন একটি গ্রামের আঁটা থেকে একটি শিয়াল ডেকে উঠতে পারে! কেলেঘাই-এর বেনা ঝোপ কাশঝোপ থেকেও কি ডেকে উঠতে পারে না? এতগুলি ঘরের চালের মাথায়, গাছের ডগায় একটাও কি লক্ষ্মীপেঁচা বসে নেই। দোফসলী

ধানের ক্ষেতের বিষ খাওয়া কাঁকড়া খেয়ে মরে হেজে গেছে যেন সব শিয়ালের দল। পুষ্করের এলাকা থেকে শিয়াল ঝেটিয়ে বিদেয় হয়েছে, লক্ষ্মী পেঁচা দূরে পালিয়ে গেছে, ভূত দেখেছে পুষ্করের নাতিটা আজ, চাষা ভুতো গরীব-গুবোরা তার ছেলেদের মুখের ওপর কথা বলে, শালাদের ভূতে পেয়েছে, ইতিহাস মাস্টারের ভূত।

এতক্ষণে পুষ্করের মাথাটি গরম হয়। মন খারাপে বুকটা তার ভারি হয়। আতঙ্কে আর উত্তেজনায় ছটফট করে। বাচ্চা কাচ্চাদের ছোটা দৌড়ায় নাচানাচিতে অস্বস্তি বোধ করে। বিরক্ত হয়ে ঝাকরিয়ে ওঠে—তরা চুপ করবি—

বাচ্চাদের মত অসহায় হয়ে যেন নেতিয়ে পড়ে পুষ্কর গিরি।

৩

ধানের দেবী লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মীর আরাধনা যত্ন করতে হয় অঘ্রাণ-পৌষে, পৌষের গোড়ার দিকে ক্ষেত থেকে সমস্ত ধান উঠে গেলে, শেষ খেপটিতে ঠাকুর তোলা হয়। ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে ক্ষেতের একটি কোণে একটি ধানের ঝাড় রেখে দেওয়া হয়—ধান তোলার শেষ খেপে সেটির পুজো করে সিঁদুর ও গাঁদা ফুলে সাজিয়ে সমূলে তুলে আনা হয়। বাড়ির বৌ ঝি ছেলেপুলেরা শাঁখ বাজিয়ে বাজিয়ে বাড়িতে আনে—খামারে ধানের গাদার ওপর তুলে রাখে। তারপর পৌষ সংক্রান্তির দিন সারাদিন ধরে বৌ-মেয়েরা চালের 'পিঠালি' দিয়ে গোবরের 'ছোঁচ' দেওয়া খামারটিকে আলপনায় সাজিয়ে তোলে। লক্ষ্মীর পা আঁকে, ঝুড়িসের পুআ মান আঁকে। লাঙল, গরু মই আঁকে। আর গাদা থেকে ঠাকুরটিকে নামিয়ে সেই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেয়। কলাপাতা আমপাতা কলা দিয়ে ঘট বসানো হয় ধানের ওপর। মান ভর্তি ধান রাখা হয়। উকুন তাড়া এই লাঙল সব খুঁটিটির চারপাশে জড় করে সাজিয়ে রাখা হয়।

তারপর সন্ধ্যে হলেই খামার জেগে বসার পালা, সার ধরা—আঁটা থেকে, দূরের পুকুর থেকে, খালপাড় থেকে একটি শিয়াল হুক্কা হুয়া ডেকে উঠলেই ঘটির জল ছিটিয়ে ঠাকুরের চারপাশে গোল হয়ে সাতবার নিদেনপক্ষে তিনবার ঘোরা। কমপক্ষে তিনবার সার ধরলে, তবেই না ঠাকুরের পুজো। শিয়াল হল গে বড় সার, মেজ সার লক্ষ্মী পেঁচা, ছোট সার খট্টাস, বাজ পাখি।

তার একটি ও আজ এখনো ডেকে উঠছে না। অপেক্ষায় পুষ্করের খামারে রাত বাড়ে। চিন্তায় দুর্ভাবনায় বুদ্ধ পুষ্কর ছটপট করে। ছোট বয়স থেকেই এই সার ধরবার কম্মোটি সে নিজে করে এসেছে—বাচ্চাকাচ্চার কানকে বিশ্বাস করে না। নিজে শিয়ালের ডাকটি পেঁচার ডাকটি কানে শুনে তারপর জল নিয়ে দৌড়ায়। অথচ আজ—এই এতো রাত পর্যন্ত।

নিমাই হাজরা ছিল পুষ্করের শত্রু। লোধা ভূমিজ যত সব ছোটলোক মুনিসগুলোকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সে। পুষ্করের কাজ বন্ধ করে দিত, রেট বাঁধত। সেই নিমাই মরে যাওয়ায় তার ভূতটা এখন যখন তখন অন্ধকার পেলেই বাচ্চাকাচ্চাদের ধরে টানাটানি করে। এতদিন এসব নিয়ে মাথা না ঘামালে ও, আজ দেশের হালচাল দেখে মাঝে মধ্যে ভয় পেয়ে যায় পুষ্কর। আজ সার না ডেকে যেন সেই অনিয়মের কথাই পুষ্করকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে। পুষ্কর বাপ ঠাকুর্দাকে স্মরণ করে।

তারপর পেচ্ছাবের বেগ চেপে এলে খড়ের গাদার ওপারে বাঁশঝাড় ডিঙিয়ে তাল গাছের গোড়াটিতে গিয়ে বসে। শীতের দিনে সাপখোপের ভয় নেই। অন্ধকারে বসে বটে পুষ্কর, কিন্তু হঠাৎই সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসে।

খামারে পেতে রাখা মাদুরটিতে যেন শুয়েই পড়ে পুষ্কর—হাঁফাতে থাকে—দম বন্ধ হয়ে আসে।

পুষ্করের কাছে ছুটে আসে সকলে। তার সেবা করতে চায়। খেঁক শিয়ালের মত খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে পুষ্কর তাদের তাড়িয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পর সুস্থ হলে উঠে বসে বটে সে। কিন্তু বুকটা হাল্কা করতে একটা বড় করে নিঃশ্বাস ও ছাড়তে হয় তাকে।

মনের কোঠাটিতে ধাপে ধাপে অসন্তোষ জমা হয় অন্ধকারে। মগজের প্রত্যেকটি সিঁড়ি নিঃঝুম, ঘন ঠান্ডায় জমাট। সেখানে সাবধানে অতি যত্নে পা চালিয়ে না এগোলেই বিপদ।

কি দেখেছে পুষ্কর গিরি?

কি দেখেছে—কেন তার শরীরটি আস্তে আস্তে বাজপড়া তালগাছের মাথার মতো অচেতন হয়ে আসে, তা সে ঠাউরে উঠতে পারে না। হাতের মোটা মোটা ঢেঁড়সের মতো আঙুলগুলি এখনো শক্ত সবল। মটকালে মচ্ মচ্ ভাঙে, আওয়াজ তোলে, তবুও রোদে মাদুর কাঠি বিছানোর মত হ্যারিকেনের আলোয় আঙুলগুলি বিছিয়ে ধরে পুষ্কর…

কোথাও পাপ পুণ্য লুকিয়ে রয়েছে কি এখানে, যাদুকরের ক্ষমতার মত? বুকটি ক্রমশ ভারি হয় পুষ্করের··· পুষ্করের কণ্ঠের ঝাঁঝে মিইয়ে পড়েছিল কি। ইতিহাসের তেজালো প্রাণটি? পড়েনি বলেই না, পুষ্করের কব্জিটা কাঁচা ভেল্কি বাঁশের মত তাজা টক্‌টকে হয়ে উঠেছিল!

—গিরি বাবু আপনি?

—হ্যাঁ রে শালা আমি।

—এই অন্ধকারে এত রাতে একলা কি করেন গ?

—এমনি তোর তরেই

চলেন না মোর সাইকেলে

—না। দেখুনি আমার হাতে কদাল?

—সেটা তো দেখছি—

—তবে?

—কি?

—গুমা মৌজার সাড়ে চার বিঘা জলজমি মদন পালের নামে পড়চা লিখানোর ফন্দিটা কি তোর?

—কেন বলেন তো?

—কেন? শালা! এই দ্যাখ—

সঙ্গে সঙ্গেই কার্তিকের শেষের গর্ভবতী ধান জমির কোলে দুটুকরো নিমাই হাজরা।

তা সে তো দুবছর আগের কথা—মায়ের গর্ভে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিমাইকে সে। তার জন্য এত দিনে, এই দুবছর বাদে—সেই জন্যই কি পুষ্কর আজ দু'বছর একটানা দশটি দিনের জন্যেও উঠে বসতে পারেন না? আরো যত্নে আরো আস্তে পা চালায় মগজের ঠান্ডা অন্ধকারে—সেখানে বাঁশ-ঝাড়ের পাতা থেকে পৌষের হিম জল হয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে। সেই জন্যই কি আজ রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত একটি সার ও ডেকে ওঠেনি? কি করে চটে নিমাই এর ভুতটি? শিয়াল গুলোর গলা টিপে ধরেছে? মানুষের দলকে পেছনে পেছনে নিয়ে ঘুরলেও শিয়ালকে বাগ মানাবে কেমন করে নিমাই?

তা যদি না হয়, তবে ডেকে ওঠেনি কেন সত্যি সত্যিই একটা শিয়াল—একটা পেঁচা?

ঠান্ডায় পুষ্করের গলার ভিতরটিতে সর্দি দুই-এর মত জমে বসে কন্ঠ-টিকে বন্ধ করে দেয়। পুষ্কর কান খাড়া রেখে গলা ঘড় ঘড় করে। বুকের সাঁই সাঁই ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ শোনে। চাদরের ওপর ভুট্-কম্বল একখানা গায়ে জড়িয়ে নেয় সে। সে নয়। তার বড় বউমা ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ছেষট্টির কার্তিকে যে লোকটি মানুষকে মায়ের গর্ভে ঢুকিয়ে দেয়—আটষট্টির পৌষ সংক্রান্তিতে পুর পিঠের ধুমে গর্ত থেকে একটি শিয়ালকে টেনে বের করতে পারে না কি?

পুষ্করের ইচ্ছে করে কোদাল নিয়ে এক্ষুনি যে যায় কেলেঘাই এর কাম-ঝোপের ধারে। তারপর কোপ বসিয়ে কোপ বসিয়ে শিয়ালগুলির গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে তাদের একটার পর একটাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর পিছনে লাথি মেরে মেরে হুক্কা হুয়া ডাকায়।

যুগের হের ফেরে পুষ্করের টিকে থাকবার টিকে রাখবার পথটিতে এত এত বাব্‌লা কাঁটা কালকুল কাঁটা শিয়াফল বিছিয়ে দিলে কে? একলা ইতিহাস মাস্টারের সে সাধ্যি ছিল কি?

এতোক্ষণে পুষ্কর তার মাথার ওপর বিছানো গাছের ডালপালা—অন্ধকার—হিম—নারকোলগুড়ের পাকানো গন্ধ—এক ঝুড়ি নক্ষত্র—সবকিছুতেই বদলে যাওয়া সময়টির ভিতর অতীতের ভুত দেখে, আরো ভয়ে ক্রমশ জড় সড় হয়ে কুঁকড়ে যেন বাচ্চা ছেলের মত বড় বউমার কোলটিতে আশ্রয় পেতে চায়। যা দেখল সে এইমাত্র!

না, মগজের অন্ধকারে আঙুল চালালে এক্ষুনিই না অজ্ঞান হয়ে যায় পুষ্করের মগজটি! যা আছে থাক্—!

ঘোরের টানে চিড় বিড় করে কেবল সে—

কেলেঘাই এর পাড়ে ভাগাড়ে শকুনেরা ডানা ঝাপটায়। বিকট শব্দ করে। পুষ্করের এতো দিন খাড়া রাখা যত্নের কান দুটি ধারে ধারে অবস হয়ে আসে। ভাগাড়ে মরা গরু পড়েছে।

বলাই বলে, ডাক্তার ডাকব বাবা?

ইঙ্গিতে না করে পুষ্কর।

একমাত্র কানাই ছাড়া সব সন্তানগুলিই এখন পুষ্করের মাদুরের চারপাশে জড় হয়েছে। কানাই আলুর মরশুমে ব্যস্ত—তাই সে আসতে পারেনি। এই ঠান্ডায়, এই অসময়ে, এই শুভদিনে—নাঃ—পুষ্করের ছেলে বোরা

উৎকন্ঠায় বরফের মত জমে যেতে থাকে—একচুল সম্পত্তিও ভাগ বাটোয়ারা যে করে রাখেনি পুষ্কর—

—কাইগো—ও বড় বাবু, সার ধরেছ ?

সত্যঠাকুর বাঁ কাঁধে থলে ঝুলিয়ে ডান হাতে লন্ঠন দুলিয়ে হাজির।

পুষ্করের নাতি নাতনিরাই খবরটি জানিয়ে দেয় বামুনকে—না মোদের খামারে সার ডাকেনি ?'

অবস্থাটি বুঝতে পুষ্করের কাছে আসে সত্য ঠাকুর। পুষ্কর গিরি চার চারটি গ্রামের ভিতর সব চেয়ে বড় যজমান তার! 'এখন সার ধরনি তুমি ?'—আমি যে তিনটা গেরাম সারে আইলি গ —'

—না হে, সার আর ডাকল কাই—উঠে বসে পুষ্কর।

'বাবা তুমি উঠে চল, দাওয়ায় বস। সার ডাকলে বাচ্চারা ডাকবে তোমাকে—বলাই এর কথায় চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্কর—'তরা থামবি—অযথা ব্যস্ত হউ কেন ?'

রান্না ঘরে পিঠেগুলি সামলাতে বউরা একে একে উঠে যায় সেদিকে। বাচ্চাগুলির অধিকাংশই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যে থেকে পিঠে খেয়ে খেয়ে পেটগুলি তাদের জালার মতন ফুলে উঠেছে।

সাঁওতাল পাড়ায় কুকুরেরা চেঁচিয়েই চলেছে। মাদল ধামসা বুয়াং এর শব্দ ছড়িয়ে থাকে।

লোধা পাড়ার বাচ্চাগুলি মেনি নাচাতে পুষ্করের খামারে উজিয়ে আসে—বাঁ হাতে খড়ের পুতুল, ডান হাতে ছড়ি—লাচ মেনি লাচরে, গিরি ঘরের খামারে······

পুষ্কর ঝাকরিয়ে ওঠে। যেন তেড়ে মারতে চায় তাদের। চেঁচাতে না বলে। বাচ্চাগুলি যেন কুকড়িয়ে যায়—ভয়ে পাওয়া কুকুরের মত।

কম্বলটি আরো ভালো করে গায়ে জড়িয়ে স্থির হয়ে বসে পুষ্কর। দৃশ্যটি—যেটি দেখে সে এতদিনে ভয় পেয়েছে, সেটি বোঝবার চেষ্টা করে। কি দেখেছে সে ? ভেবে ভেবেও বুঝতে না পেরে, পুষ্কর আরো ব্যস্ত হয়ে ওঠে—বাইরে তা ধরা পড়ে না। কিছুটা চেঁচালে, কিছুটা হাসলে যেন মগজটি তার সরল হতো এতোক্ষণ।

বৃদ্ধ পুষ্কর চেষ্টা করে কান দুটি পরিষ্কার রাখতে।

ঠাকুরের সামনে গায়ে মাথায় চাদর জড়িয়ে সত্য ঠাকুর বসে থাকে

অপেক্ষায়। রাত বাড়ে। ঠান্ডা জাঁকিয়ে বসে।

এক সময় পুষ্কর তার ক্লান্ত ঘুমে পাওয়া চোখের পাতাদুটি মাথার ওপর আকাশে মেলে ধরে। সেখানে প্রতিটি নক্ষত্রের জ্যোতিতে তার শ্রম-স্মৃতি লোভ স্বার্থ মিলে মিলে একাকার। সেগুলি যেন পাখির মত ডানা মেলে অজস্র আলোর বিন্দু গুলিকে আড়াল করতে চায়। অবশেষে পুষ্করের চোখের পাতাগুলির ওপর ক্রমশঃ অন্ধকার ঝরে ঝরে পড়ে কুয়াশার মত। দীর্ঘ সময়ের ক্লান্তিহীন আত্মময়তা প্রাণ হারিয়ে প্রেতের মত পুষ্করের চারপাশে ছায়া হয়ে ঘোরে ফেরে। অন্ধকার গাছপালা থেকে প্রাণীরা সে সবের সঙ্গে তাল রেখে সময় বদলের অশুভ ইঙ্গিত আনে। ব্যর্থতায় হতাশায় পুষ্কর আর একটি মুহূর্তের জন্যও সাহসের, ধৈর্যের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। অসহায় পুষ্কর তার জেদের গাম্ভীর্যের ভয়াবহ মৃত রূপ দেখে চমকে ঠিকরে ওঠে—কিছুক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যটি তার চারপাশে নখ মেলে চুল মেলে তার মস্তিষ্কের কোণে কোণে কাকের হাঁ এর মত লাল বিরক্তি অসুখ ও বিভীষিকা তৈরী করে রাখে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়া এই সময়টিকে, নিজেকে, তার সন্তানদের সংসারকে আর কিছু দিতে পারে না তাই। আতঙ্কিত পুষ্কর বটু নন্দীর খামারের শাঁখের শব্দ শুনে তিরন্দাজের লক্ষ্যের মত, হাত দুটিকে গোল করে কানের পাতার ওপর বসিয়ে রেখে শেষ কিছু শোনবার অপেক্ষায় থাকে। ক্রমশঃ ক্রোধ ও হিংসা এই দুটি জৈবিক শক্তি তার মাথায় এলোপাথাড়ি খুর চালিয়ে যায়—তার যাবতীয় কর্ম অপকর্মের সমর্থনে শেষ বারের মতো পুষ্কর পায়ের গাঁট ও হাতের আঙুল গুলিকে সক্রিয় রাখতে চেষ্টা করে।

তারপর একদল কুকুরের একটানা চিৎকারে পুষ্কর উঠে দাঁড়ায়। না, তার বেঁচে থাকা অবস্থায় তার ক্ষমতার অবহেলা করে—ভূত প্রেত দেবতা দৈত্য দানো কোনো শক্তির কাছেই মাথা নীচু করবেনা সে।

কুকুর ডেকেছে মানেই তার আগে নিশ্চয়ই শিয়াল ডেকেছে।

শিয়াল ডাকলেই কুকুর ডাকে।

সারের রাজা শিয়াল।

বড় সার ধরতে পুষ্কর জলের ঘটি হাতে নেয়—চেঁচিয়ে ওঠে—লে-লে-লে ধর ধর—বড় সার ডাকছে অ্যাতক্ষণে, শাঁখ বাজা……

পুষ্কর সেই খুঁটির চতুর্দিকে জল ছড়িয়ে ঘুরতে থাকে। মাঝ পথেই

থমকে দাঁড়ায় পুষ্কর—ভয়ে মাথা ঘুরিয়ে যায় তার—তবুও পা দুটি খাড়া রাখতে চেষ্টা করে—একসময় আর টাল সামলাতে পারে না—আঁতকে ওঠে। ভূত !……

নিকানো খামারে টাটকা গোবর আর আলপনার চাল পিঠালির গন্ধে লুটিয়ে পড়লে, ধান ভর্তি মানটি কেবল তার পায়ে লেগে উল্টে পড়ে লক্ষ্মীর ঘটের সামনে। পুষ্করের গোঁ গোঁ শব্দ শুনে, তার মুখ থেকে শাদা ফেনা বেরতে দেখে পুষ্করের ঝাড়-গুষ্টি তখন ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।

টানা-হেঁচড়ায় হ্যারিকেনের আলোটি নিভে গেলে, পুষ্করের ওপর আকাশের শরীরের যাবতীয় আলো অন্ধকার উপুড় হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের আলোকে শরিয়তী বিধান

সেখ বাকের আলি

"ইউনিফরম সিভিল কোড বিল" পার্লামেন্টে আসছে অনতিবিলম্বে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে চাউরও হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ রূপ। এবং তাই নিয়ে উপর মহলের বাগ বিতণ্ডাও শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝেই। অবশ্যই বর্তমানে তার স্বর অত্যন্ত মৃদু ক্ষণস্থায়ী।

"হিন্দু কোড বিল" গ্রহণের সময়েও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গিয়েছিল আলোড়ন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে শুরু হয়েছিল মন কষাকষি তাই নিয়ে। তবুও জিতেছিল প্রগতিশীল ধ্যান ধারণাই। নেহেরুর কংগ্রেসী সংসদ সদস্যদের বিবেক-ভোট প্রদানের স্বাধীনতা দানের পরিপ্রেক্ষিত বিলের আইনে পরিণত হতে পেরেছিল।

হালে শাহবানুর খোরপোষ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় নিয়েও ঝড় উঠেছিল দেশে। এমন কি সেই ঝোড়ো হাওয়া দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আছড়ে পড়েছিল বিদেশের মাটিতেও বর্তমানে সেই ঝড়ের দাপট স্তিমিত হয়েছে ঠিকই তবে তা কেটে যায় নি একেবারে। যদিও সেই ঐতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম মহিলা (বিবাহ বিচ্ছিন্না) আইন! ইতিহাসের চাকাকে উল্টোদিকে ঘোরানোর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র উক্ত আইন। আজ হোক কাল হোক দৃষ্টিরোধকারী ধূম্রজাল কেটে যাবেই যাবে।

ভারতবর্ষের যে কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলেই ঝড় ওঠে। সে খুবই স্বাভাবিক। দেশে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আইন ও প্রথার হেরফের ঘটার উপক্রম হলেই মনুষ্যসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে তা নিয়ে। কারণ তার পিছনে কাজ করে ধর্মীয় প্রভাব কাটিয়ে ওঠা তো ভারতীয়দের পক্ষে বড়ই কঠিন। যদিও ভারতবর্ষের মাটিতে অধর্মীয় কাজ কারবারে বাড় বাড়ন্ত খুবই। এখানেই শিশু খাদ্যে, ওষুধে ভেজাল দেওয়া হয়। খাদ্য-শস্য গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি তাও হয় এই ধর্মপ্রবণ দেশেই। ধর্মের জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে

মানুষের রক্তে হোলি খেলতে আনন্দ পায় এই দেশের মানুষই। সর্বোপরি দেশটাও ভাগ হয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করেই। এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা আইন করেছি "বিবিকে তালাক" দিলেও দিতে হবে না তাকে (তালাক প্রাপ্তকে) আজীবন খোরপোষ। এবং শেষ কথা, রূপ কানোয়ারকে জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরতে দেখে সতীমাতা কি জয় বলে ধর্ম ধ্বজা ওড়াই আকাশে। এবং সেই ধর্মধ্বজা উড্ডীয়মান রাখতে প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হই সতী মাতা কি পবিত্র মন্দির এই আমরাই।

"ইউনিফরম সিভিল কোড" অর্থাৎ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্যে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে একই আইন। লুপ্ত হবে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন দেশ থেকে।

"ইউনিফরম সিভিল কোড" বিল আসরে অবতীর্ণ হলে অবশ্যই দেশে দেখা দেবে আলোড়ন। মুসলিম সম্প্রদায় হল ভারতে সংখ্যালঘু (বৃহত্তম) এবং তাদের ধর্ম যেহেতু বহিরাগত তাই তাদের মানসিক পরিস্থিতি হবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষুব্ধ। খৃস্টান, পারসীক সম্প্রদায়ের জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে যেহেতু তারা ভারতীয় জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ তাই তাদের চিৎকার শ্রুতিগোচর হবে না বা কর্ণপাত করবে না কেউ তাতে।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের "ইউনিফরম সিভিল কোড" গ্রহণে অনিচ্ছা এবং শরিয়তী বিধানের প্রতি মুসলিমদের দুর্বলতার অন্য কারণ হল, তাদের ব্যক্তিগত আইন "কোরানিক"। যেহেতু পবিত্র কোরান ঈশ্বরের (আল্লার) প্রত্যাদেশ, তাই তা অপরিবর্তনীয়। কোন মানুষ তথা সরকারের তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তারা মানতে নারাজ। সর্বোপরি সরকার কর্তৃক শরিয়তী বিধানে হস্তক্ষেপ করা হলে তা হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ইসলাম ধর্মের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ। এবং "ইউনিফরম সিভিল কোড" বিলকে আইন হিসাবে গ্রহণ কালে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভের তুঙ্গে ওঠার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। বর্তমানে প্রচলিত ওয়াকফ আইন গৃহীত হবার সময় ভারতবর্ষের তৎকালীন তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ অবতীর্ণ হয়েছিলেন আসরে। ১৯২৮ সালে জিন্না পূর্বোক্ত ওয়াকফ আইন গ্রহণকে মনে রেখেই তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা প্রোগ্রামের মধ্যে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছিলেন, সেকথাও ভুললে চলবে না যে রাজনীতিকরা

সব সময়ই ওৎ পেতে আছে একটা ছুতোনোর জন্যে যাতে তারা আসর গরম করে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে সক্ষম হয়।

শাহবানু মোকদ্দমার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়। এবং মুসলিম মহিলা (বিবাহ বিচ্ছিন্না) আইনের পরবর্তী সময় এখন। আবার "ইউনিফরম সিভিল কোডের" জাতীয় আসরে অবতীর্ণ হবার পূর্ববর্তী সময়ও বটে অর্থাৎ বিশেষ এই সন্ধিক্ষণে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের উৎপত্তি এবং তা ভারতবর্ষে বিধিবন্ধ হওয়া ইতিহাসের আলোকে দেখা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিকতা হবে না।

সারা পৃথিবীর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন পবিত্র কোরান হল ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। এবং শরিয়তী বিধানগুলি চয়ন করা হয়েছে মূলত পবিত্র কোরান থেকেই। হাদিশের সাহায্যেও তৈরি করা হয়েছে আইনের কিছু কিছু ধারা। হাদিশ হল পয়গম্বর মহম্মদের (সঃ) উদভূত সমস্যার মোকাবেলা করা এবং দৈনন্দিন পার্থিব কর্মের সংকলন গ্রন্থ। তাহলে শরিয়তী বিধান দাঁড়াচ্ছে, ঈশ্বরের বাণী এবং তৎকালীন নব্য মুসলিমদের সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা পয়গম্বর মহম্মদ মুসলমানদের উচিৎ পয়গম্বরদের নাম পাঠকালে বা উচ্চারণকালের তাঁদের উদ্দেশ্যে দরুদ শরীফ পাঠ করা নির্দেশ থাক আর না থাক। যেভাবে সমাধান করেছিলেন তার সংকলন। কোরান ও হাদিশকে প্রধান অবলম্বন করে মুসলিম শাস্ত্রকারগণ যে আইন রচনা করেছিলেন তাই হল বর্তমানে প্রচলিত শরিয়তী বিধান।

সকল ধর্মগ্রন্থই পার্থিব বিচারের ঊর্ধ্বে। মুসলিম ব্যক্তিগত আইন যার ভিত্তি মূলত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও তৎকালে উদভূত সমস্যা সমাধানে পয়গম্বরের কর্তৃক প্রদত্ত বিধি সকল। অতএব তাও মানুষের হস্তক্ষেপের বাইরে এবং অপরিবর্তনীয়। কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যদি যুগের প্রয়োজনের তাগিদেই সেই স্বর্গীয় বিধির পরিবর্তন ঘটাতে চায়, তাহলে তা নিশ্চয় গর্হিত কাজ। কিন্তু যদি তা না হয়? অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন যদি যতটা কোরানিক, তার অনেক অনেক বেশি পরিমাণে মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের, তাদের চাটুকার শাস্ত্রকারদের ইচ্ছাপ্রসূত হয়, তাহলে? মনে রাখতে হবে ইসলামী আইন তথা শরিয়তী বিধান মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত ছিল। (বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্র নায়কগণ ধর্মকে কি ভাবে আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে লক্ষ্য করলেই অতীতের রাষ্ট্রনায়কদের কর্মপন্থা

অনুধাবন করা সহজ হবে।)

প্রথমেই বলি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের কথা। তিনি একজন বিদ্রোহী তৎকালীন মক্কায় প্রচলিত ধর্মীয় ও সমাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছিলেন বিদ্রোহ। স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কার ইতিহাস সগতভাবে তা সে 'কু' বা 'সু' হোক মান্যকারীরা নিশ্চয় বরদাস্ত করবে না ঐতিহ্যপালনে বাধা প্রদানকারীকে। অথচ পয়গম্বর তাই করেছিলেন। আজ তাঁকে আমরা প্রগতিশীল বলতে পারছি, কিন্তু পয়গম্বরকে সবচেয়ে স্নেহকারী আবুতালিবও পারেন নি তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় আদর্শ গ্রহণ করতে। পয়গম্বরের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যে তাঁর অপর এক পিতৃব্য আবুলাহাব তো অভিশপ্ত মানুষে পরিণত হয়েছে। পবিত্র কোরানের সুরালাহাব বহন করছে তার প্রমাণ। তাঁর আগে একই প্রকার বাধা পেয়েছিল নিগৃহীত মোজেস এবং যীশু/আধুনিক কালের সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর দৃষ্টি ফেললে সেই একই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। রাজা রামমোহনের 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ কিংবা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধেও হিমালয় সদৃশ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালীন সমাজের মুরুব্বিরা। তাহলে এটাই যুগে যুগে সত্য যে, পয়গম্বর হোক সমাজ সংস্কার হোক, বা প্রগতিশীল রাষ্ট্রনায়ক হোক প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে যুগপোযোগী ও মাননিক করতে গেলে বাধা আসবেই। এবং সে বাধা আসবে না আকাশ থেকে, আসবে তা সমসাময়িক সমাজ থেকে, সমাজের উঁচুতলার ব্যক্তিপ্রবরদের তীব্র বিরোধিতাজনিত কারণেই।

হজরতমহম্মদ ঐশী পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করার পর তিনি শিশু ইসলামিক সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রধান রূপে পরিগণিত হন। সামাজিক ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে পয়গম্বর মহম্মদ খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রায়শই সম্মুখীন হতেন এমন অনেক সমস্যার যার সমাধানের নির্দেশ তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল অজানা। তাৎক্ষণিক উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলা করতেন তখন তিনি 'জ্ঞানের' দ্বারা। কারণ যে কোরান পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে তার প্রথম শব্দই হল "পাঠকর" (সুরাআলাক)। অর্থাৎ 'জ্ঞান লাভ কর'। সমগ্র কোরানের মূল উদ্দেশ্য হল "জ্ঞানের" প্রতি আহ্বান। আল্লাহ পবিত্র কোরান মারফৎ মানুষকে বার বার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এবং সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই মানব-মানবীর তথা জীবজগতের মঙ্গলার্থে ঘোষিত।

মোয়াদকে ইয়েমনের গভর্ণর নিযুক্ত করার প্রাক্‌কালে পয়গম্বর কর্ত্তৃক তাঁর ইন্টারভিউ গ্রহনকালেও তিনি অত্যন্ত প্রীত হন যখন মোয়াদ জানায় যে, কোন সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত কোরানে না পাওয়া গেলে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই সমস্যার মোকাবেলা করবেন তিনি। এর থেকেই প্রমানিত হয় তিনি (পয়গম্বর) কিরকম বাস্তবজ্ঞান ব্যক্তি ছিলেন।

পয়গম্বরের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। অতএব খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল পয়গম্বরের উত্তরসূরী কে? হজরত মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের মনের অবস্থার আঁচ পেয়েছিলেন। তবুও তিনি তাঁর উত্তরসূরীর নাম ঘোষনা করেন নি। তাঁর ইচ্ছা হয় তো এই ছিল, ইসলাম, ধর্মানুসারীরা পবিত্র কোরান এবং জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়ে নেতা নির্বাচন করবে। এই জন্যেই তিনি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের বলেছিলেন তোমাদের জন্যে রইল কোরান, জ্ঞান আর বিবেক। তিনি পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছিলেন তাঁর শিষ্যদের এই বলে যে, পবিত্র কোরান ছাড়া ধর্মের নামে বা তাঁর কোন কিছু না লিখে রাখতে। তবুও ইসলামী সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষিত আছে হাদিশ। হাদিশ সম্পর্কে যথাস্থানে আমরা আলোচনা করব। তার আগে কোরান সম্পর্কে আমাদের কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

পবিত্র কোরান

পবিত্র কোরান হল ইসলাম ধর্মানুসারীদের ধর্মগ্রন্থ। এবং মুসলিম সমাজের মানুষজন জানে যে, তাদের ব্যক্তিগত আইনের বিধি-বিধানগুলিই অধিকাংশই চয়ন করা হয়েছে ধর্মপুস্তক পবিত্র কোরান থেকেই।

কোরানে সর্বমোট ৬০০০ বাক্যের মধ্যে মোটামুটি ৮০টি বাক্য ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কিত। অবশ্য আরও ১২০টি বাক্য আইনের কিছু কিছু ইঙ্গিত বহন করে। তবুও ঐ ৮০টিই প্রধান, অতএব ৮০টি কিংবা বৃহত্তম দৃষ্টিতে মোট ২০০টি আইন সম্পর্কিত বাক্যের উপর নির্ভর করেই প্রধানতঃ খুলাফায়ে রাশেদীনগন রাজকার্য এবং পারিবারিক সমস্যার মোকাবিলা করতেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন পয়গম্বরের সাক্ষাৎ শিষ্য। সেই হেতু নতুন কোন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতেন তারা পয়গম্বরের দৈনন্দিন জাগতিক ক্রিয়াকর্মকে

অনুসরণ করেও। কিন্তু তা কখনই কোরানের নির্দ্দেশের বিরোধী হত না। উপরন্তু খলিফা ও সাধারণ জনধাধারণ উভয়েই ছিলেন পয়গম্বরের সমসাময়িক। ফলে খলিফায়ে রাসেদীনগণও পারতেন না ইচ্ছাপ্রসূত কোন কর্মপ্রণালীকে পয়গম্বরের কৃতকর্ম বলে চালিয়ে দিতে যা পরবর্তীকালে ঘটত হামেশাই।

মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হল হাদীশ শরীফ। আগেই বলেছি হাদিশ হল পয়গম্বরের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনা প্রেক্ষাপটে কৃতকর্ম বিশেষ। তাঁর ঐ কৃতকর্মেরই সংকলন হল হাদীশ শরীফ। হাদীশ বর্ণনা করেছিলেন পয়গম্বরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ এবং শিষ্যের শিষ্যরা। এবং হাদীশ সংগ্রহের কাজ চলেছিল ৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ পয়গম্বরের পরলোকগমনের পরবর্তী ২৮৪ বছর ধরে।

প্রথম হাদীশ সংগ্রাহকদের অন্যতম হলেন হাসান আলবসরী (মৃত্যু ৭২৮ খৃঃ) এবং আমীর-বিন-শারাহিল (মৃত্যু ৭২৮ খৃঃ)। উক্ত সংগ্রহাকদের হাদীশের উপর নির্ভর করে সে সময় মুসলিম আইনের বৃহদাংশ সৃষ্টি হয়েছিল। আইন স্রষ্টাদের অন্যতম প্রধান হলেন ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭ খৃঃ) এই আবু হানিফা কর্তৃক সৃষ্ট আইন মোতাবেক ভারতীয় সুন্নী মুসলমানগণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বর্তমানে।

শাসন ব্যবস্থার প্রধান্যের সাথে সাথে ধর্মীয় জগতের প্রাধান্য লাভের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতেই হাদিশের বহুলাংশ সৃষ্টি ও সংগ্রহ হয়েছিল। ধর্মীয় প্রাধান্য লাভের তাগিদেই উমাইয়া রাজ-পুরুষগণের উৎসাহে এক শ্রেণীর চাটুকার বুদ্ধিজীবি দামাস্কে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এমন কি পয়গম্বরের আত্মীয়-স্বজন সহ অনেক সাহাবীত্ত (সাক্ষাৎ শিষ্য) পদমর্যাদা এবং আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে বসবাস করতে এলেন দামাস্কে। এবং ঐ সমস্ত বুদ্ধিজীবি ও সাহাবীগণ এক সময় রাজপুরুষদের চাটুকারে পরিণত হয়ে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিধি-বিধান হেতু অনেক ইচ্ছাপ্রসূত, মনগড়া হাদিশ বর্ণনা করেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের খুশী করতে এবং নিজ স্বার্থকে চরিতার্থ করতে কত লোক বিভিন্ন সাহাবীদের নামে বা সাহাবীদের বর্ণনা বলে ইচ্ছাপূরক হাদিশ সংগ্রহ করেছিলেন তা সত্যিই ভাববার বিষয় এখন। তার চেয়েও বড় কথা আজকের দিনে তথাকথিত ধর্মীয় পণ্ডিতগণ প্রচলিত হাদীশের উল্লেখ করে এবং তার উপরই নির্ভরশীল হয়ে ইসলামের নামে, শরিয়তের নামে দুনিয়া

গরম করে।

হাদিশ সম্পর্কে আলোচনা উঠলে এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা "সিয়াসিত্তাহ" হাদীশের কথা পাড়েন। তাঁদের মতে এই "সিয়াসিত্তাহ" হাদিশগুলি নির্ভেজাল। তা নাকি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঝাড়াই বাছাইয়ের পর গ্রহণ করেছে ইসলামী দুনিয়া।

সিয়াসিত্তাহ হাদিশগুলি বর্ণনাকারীর মুখ থেকে শ্রোতার শ্রোতা তস্য শ্রোতা মারফৎ সংগৃহীত হয়েছিল। এবং মুসলিম বিধান রচনাকালে এই হাদিশগুলির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন পণ্ডিতগন।

সিয়াশিত্তাহ হাদিশ সংগ্রাহকরা হলেন মহম্মদ বিন ইসমাইল বোখারী (৮১০-৮৭১ খ্রীঃ) মুসলিম বিন আল কুরাইশী (৮২০-৮৭৫ খ্রীঃ) আবু দাউদ (৮১৮-৮৮৮ খ্রীঃ) আবু ঈশা আল তিরমিজী (৮২৪-৯২ খ্রীঃ) আবু আব্দুর রহমান নিসাঈ (৮২৯-৮৬ খ্রীঃ) উপরিউক্ত হাদিশ সংগ্রামকদের হাদিশ গুলিকেই একসঙ্গে বলা হয় সিয়াসিওাহ। দেখা যাচ্ছে ঐ "সিয়াসিওাহ" হাদিশ সংগ্রাহকদের কর্মকাল শুরু হয়েছে আবু হানিফার মৃত্যুর পর (৭৬৫ খ্রীঃ) এবং আব্বাস বংশীয় রাজপুরুষদের শাসনামলে তাদের উৎসাহে, নির্দ্দেশে ও অর্থানুকুল্যে। মনে রাখা দরকার এই আব্বাসীরাই নির্দেশজারী করেছিল ভবিষ্যতে মুসলিম বিধান তথা কোরান হাদিশের আর যেন ব্যাখ্যা করা হয়, বা নতুন কোন আইনও যেন বিরচিত হয়। সেই নির্দ্দেশই আজও আমরা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর চোখ ঢাকা কলুর বলদের মতন।

হাদীশ সম্পর্কে বলা শেষ করব বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবীর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি তাঁর "এ স্টাডি অফ্ হিষ্টরীতে" লিখছেন—মনমত শাস্ত্র রচনা করিয়ে নিতে উমাইয়া বা আব্বাসীয় রাজপুরুষগণ কেউই পিছিয়ে ছিলেন না। তারা এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল যে, হজরতের হাদিশ অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। তাই মদীনা থেকে তারা নিয়ে আসে শাস্ত্রকারদের বাগদাদে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রেখে ইসলামকে ব্যাবহার করেছিল। আর ঐ শাস্ত্রকারদের পোষ মানিয়েছিল শাসকগোষ্ঠী।"

আলোচনা করব এবার আমরা মুসলিম আইনের সৃষ্টি নিয়ে।

আগেই বলা হয়েছে আবু হানিফা হলেন সুন্নী মজহারের প্রথম আইন বিশারদ এবং আইনের স্রষ্টা। তাঁর বিরচিত আইনই তামাম সুন্নী দুনিয়ায় অত্যন্ত সম্মানের মর্যাদা পেয়ে থাকে বর্তমানে।

আবু হানিফা প্রায় ছয় লক্ষ ফতোয়া জারী করেছিলেন। মজার ব্যাপার হল, তাঁর ফতোয়াগুলি মক্কা বা মদীনায় গৃহীত হয় নি তখন। কারন এই ইমাম হানিফা উমাইয়া রাজপুরুষদের অর্থানুকূল্যে শাস্ত্র রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর কৃতকর্ম এতই গর্হিত ছিল যে, আব্বাসীয় খালিফা আল মনসুর তাঁকে বন্দী করেন এবং বন্দীদশায় তাঁর মৃত্যুও হয়।

তাঁর প্রদত্ত ফতোয়াগুলি পূর্বোক্ত 'সিয়াসিত্তাহ' নয়, হাসান আল বসরী এবং আমীর বিন শারাহিল কর্তৃক সংগৃহীত হাদিশের উপর নির্ভরশীল ছিল। অথচ পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত 'সিয়াসিত্তাহ' হাদীশই প্রকৃত হাদীশ বলে গৃহীত হয়েছে। তাহলে তাঁর ফতোয়াগুলি—যে গুলির দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হই তা যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় কি? যদি ধরে নিই আবু হানিফা বিরচিত আইনগুলি সঠিক, তাহলে তার পূর্ববর্তী সময়ে সংগীত হাদীশ গুলিও নির্ভেজাল। তাই যদি হয় তাহলে "সিয়াসিত্তাহ"র পূর্ববর্তী হাদিশগুলির কেন মূল্য দেওয়া হয় না? পক্ষান্তরে সিয়াসিত্তাহ হাদিশগুলির মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে আবু হানিফার দেওয়া ফতোয়াগুলির মূল্য থাকে কতটুকু? সন্দেহের উর্ধে ছিল না তাঁর প্রদত্ত ফতোয়াগুলি বলেই কি মক্কা মদীনার শাস্ত্র বিশারদগণ গ্রহণ করেন নি সেগুলি? আরও মনে রাখা প্রয়োজন আবু হানিফা বিরচিত মুসলিম বিধান কোনদিনই মুসলিম সমাজ গ্রহন করত কিনা বলা শক্ত যদি না তাঁর শিষ্য আবু ইউসুফ আব্বাসীয় খালিফা হারুন অর রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) প্রধান কাজীর পদ অলংকৃত করতেন। প্রধান কাজীর পদে থাকাকালীন আবুইউসুফ গুরুর মতগুলিকে মুসলিম জাহানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান এবং সেগুলি তিনি 'কিতাব উল খারাজ' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

হানাফী মতের দ্বিতীয় আইন স্রষ্টা হলেন মদীনা নিবাসী আবদুল্লামালিক বিন আনাস (৭১৩-৭৯৫ খ্রঃ)। তিনি তাঁর সময়ের প্রচলিত হাদিশগুলি নির্বিচারে অবলম্বন করেছিলেন মুসলিম বিধান সৃষ্টির প্রাক্কালে। আলমুয়াত্তার নামক পুস্তকে তিনি প্রায় ১৭০০টি হাদিশ সন্নিবেশিত করেন। এঁরই শিষ্য ইয়াহিয়া আসমাদী আন্দুল সিয়ায় শাসকের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। মালিকের শিষ্য ও তাঁর প্রদত্ত আইন দ্বারা মুসলিম সম্প্রদায়ের যাঁরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন তাঁদের বলা হয় "মালেকী"।

ইসলামী আইনের প্রাথমিক পর্বের আইন স্রষ্টাদের তৃতীয় ইমাম হলেন

মহম্মদ বিন ইদরিশ আল শাফেরী (৭৭৬-৮৩০ খ্রঃ)। জন্মস্থান গাজা হলেও কর্মস্থল ছিল তাঁর বাগদাদ। চিন্তার দিক থেকে ইনি ছিলেন মুক্তমনা এবং প্রগতিশীল। সে সময় যে সমস্ত দেশ মুসলিম শাসকবর্গ জয় করেছিলেন তাদের উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপর। তাঁর শিষ্যদের এবং তাঁর আইন অনুসারীরা বর্তমানে শাফেরী বলে পরিচিত। ইনিই "কিয়াস" (যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন) মতবাদের স্রষ্টা। এঁর বিখ্যাত পুস্তক "কিতাব-উল-আমন"। ইজিপ্ট, হেজাজ, দক্ষিণ আরব, পূর্ব আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার সুন্নী মুসলিম সম্প্রদায় শাফেয় ঘরানার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের মুসলিমগণও এই ঘরানায় বিশ্বাসী। ভারতে ডিসলুসন অব মুসলিম ম্যারেজ এ্যাক্ট, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয় এই শাফেরী মতবাদের প্রভাবেই। উক্ত আইনের দৌলতেই মুসলিম স্ত্রী আদালত মারফৎ স্বামীকে তালাক দেবার অধিকার অর্জন করেছে।

চতুর্থ ইমাম ছিলেন ইমাম হানবল (৭৮০-৮৫৫ খৃঃ)। ইনি ইমাম শাফেয়ীর শিষ্য ছিলেন। এঁর মতবাদের অনুসরনকারীদের বলা হয় হানবলী। দুঃখের বিষয় শাফেয়ীর ব্যক্তির শিষ্য হয়েও তিনি বাছবিছার না করে নিজে হাদীশের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত বেশী মাত্রায়। নিজ জীবদ্দশায় প্রায় আশি হাজার হাদিশ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। ফতোয়া জারী করার সময় হাদিশের উপরই নির্ভর করতেন খুব বেশী। ঠিক এই সময়েই আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খৃঃ) ছিলেন খলিফা। এঁরই প্ররোচনায় হানবল ঘোষণা করেছিলেন খলিফা হল আল্লার প্রতিনিধি। সেই হেতু তাঁর কোন অন্যায় করেন না। অতএব তাদের বিরুদ্ধাচরনকরা অন্যায় ও মহা পাপ। উপরিউক্ত ঘোষণার প্রতিদান হিসাবে খলিফা আল মুনতাশির (৮৬১-৬২ খৃঃ) খলিফা আল মুসতাইল (৮৬২-৬৬ খৃঃ) খলিফা আল মুতাদ্দিদ (৮৯২-৯০২ খৃঃ) সকল শাসকগনই তাঁর মতবাদকে সমর্থন করে তাঁকে নিয়ে লোফালুফি করতে থাকে। তিনি প্রগতি বিরোধী একের পর এক মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত মতবাদের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরন করার ফলেই ইবনে জারীর আল তাবারীর (৮৩৭-৯২৩ খৃঃ) ঘোর শত্রুতে পরিণত হয় ইমাম হানবলের মতানুসারীরা। প্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়, এই ইবনে জারীর পুসতক হল "জামী আল বয়ান ফি তফসীর আল কোরান" যা

পৃথিবীতে আজও কোরানের আদর্শ ভাষ্য ও টীকা বলে সম্মাদৃত।

অত্যন্ত অল্প পরিসারে প্রগতি পরিপন্থি দু'একজন শাসক ও বুদ্ধি জীবির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রসঙ্গ ক্রমে।

প্রগতি বিরোধী কার্য চরমে ওঠে খালিফা আল মুস্তানজিদের (রাজত্বকাল ১১৬০-৭০ খৃঃ) আমলে। তিনিই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ইবনে সিনার (৯৮০-১০৩৭ খৃঃ) দার্শনিক গ্রন্থাদি এবং ইবন আল হাইসেমের (৯৬৫-১০৩৯ খৃঃ) জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকাদি। এই সময়ই বুদ্ধিজীবি আবদুল হাসান আল আশারী (৮৭৪-৯৩৬ খৃঃ) আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে লিখিত তার কুখ্যাত গ্রন্থ "মাকালভ আল ইসলামিন" সেলজুক শাসকগনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রগতিবাদীদের রুখে দিতে। আশারীর শিষ্য ছিলেন ইবন আশারীর (১১০৬-১১৭৬ খৃঃ) যিনি ঘোষণা করেছিলেন "ধর্মকে ধারন করতে হবে রক্ষনশীলতা দিয়ে, কোন প্রশ্ন না করেই।" ইমামদের সম্পর্কে বলেছিলেন, ইমামদের বিরুদ্ধাচরন করা এবং তাদের ঘোষিত নীতি না মান্য করা গর্হিততম অন্যায় ও পাপ।

কোরান ও হাদীশ ছাড়া আর যে দুটি নীতির উপর মুসলিম ব্যক্তিগত আইন দাঁড়িয়ে আছে তা হল ইজমা ও 'কিয়াস'। যদিও ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট আইনের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

হাদিশের পরবর্তী মুসলিম আইনের ভিত্তি হল ইজমা। ইজমা হল কোন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মুসলিম শাস্ত্রকারদের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন। অর্থাৎ কোন সমস্যার সমাধান যদি কোরানে বা হাদিশে না পাওয়া যায় তাহলেই এই ইজমার সাহায্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে কোন বাধা নেই। শাস্ত্রকারদের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হলেও তা ছিল শাসক গোষ্ঠীর অধীনে চাকুরীজীবি কাজী বা বুদ্ধি জীবিদের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত বিশেষ। অতএব শাস্ত্রকারদের ইজমার সাহায্যে আইন প্রনয়ন কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে নয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা হত শাসককুলের মানসিক ধারাকে অনুসরন করে।

কিয়াস পদ্ধতি হল উদ্ভূত সমস্যার সমাধান উপরিউক্ত কোরান হাদিশ ও ইজমার দ্বারা সম্ভব না হলে, বিচার বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা যখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাই হল কিয়াস। কিয়াস মতবাদের জনক হলেন ইমাম শাফেয়ী। পবিত্র কোরান ও এই কিয়াসের (জ্ঞান ও বিবেক) দ্বারা পরিচালিত হয়ে

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের রায় ছিল শাহবানুর খোরপোষ সংক্রান্ত মোকদ্দমায়

মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ই "শেখ-উল-ইসলাম" "মুহতাসিব" নামক পদ সৃষ্টি করে জন্ম দিয়েছিল রাজভক্ত শাস্ত্রবিদদের। এই "শেখ উল ইসলাম" পদের বলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষনশীল বুদ্ধিজীবিরা একের পর এক ফতোয়া দিতে থাকে এবং সেগুলিকে শাসকশ্রেণীর সহায়তায় তারা কার্যকারী করে তোলে। এইভাবে বেতনভোগী "ইমাম" মৌলভী "কাজী" শেখ-উল ইসলাম এবং "মুহতাসিব" শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে এবং ফতোয়া দিয়ে ইসলাম ধর্মকে এবং তার জাগতিক ক্রিয়াকর্মকে করে তোলে অনেক ক্ষেত্রেই অমানবিক। শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয়ে উপরিউক্ত শাস্ত্রকারদের মুখের কথাই একসময় শাস্ত্রে পরিণত হয়। ফলে ন্যায়বাদী, যুক্তিবাদী, উদার এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সমন্বিত মুসলিমরা ক্রমশঃই বেপাত্তা হয়ে যেতে থাকে। এই হল মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত হাল-হকীকৎ।

সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ধরেই ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করেছে ভারতবর্ষে। ভারতের সিন্ধু প্রদেশে এবং সমুদ্রপোকূলবর্ত্তী অঞ্চলেই ইসলাম ঠাঁই করে নেয় প্রথমে। তারপর বিভিন্ন কারণে এদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ভারতে এসেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ভোলে নি। এদেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েও পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি অনেকাংশেই বজায় রেখে পারিবারিক, সামাজিক জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। মোগল সম্রাট ঔরংজেব প্রথম হানাফী সুন্নী ঘরানার আইন কানুন মোতাবেক এদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে সচেষ্ট হন। এবং তাঁরই নির্দ্দেশে ফতোয়া-ই আলমগীরী সংকলিত হয়েছিল সর্বপ্রথম।

ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনাধীনে আসে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে।

১৭৬৫ খৃঃ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে। ১৮৩৫ খৃঃ কোম্পানী স্বনামে মুদ্রা চালু করে। আর ১৮৬৪ খৃঃ মুসলিম শাসনের প্রতীক কাজীর বিচারের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ভারতবর্ষের মাটি থেকে মুসলির রাজকে বিদায় জানায় বৃটিশরা। কিন্তু এদেশে হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ের পারিবারিক বিরোধগুলি ফয়সালা হতে থাকে হিন্দু এবং মুসলিম

ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধি অনুসারেই। এবং এই উদ্দেশ্যেই মুসলিমদের শাস্ত্রের বিধিগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করার জন্যে 'হেদায়া' যা হানাফী সুন্নীদের প্রামানিক আইন গ্রন্থ বলা হয়, ফরাসী থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন চার্লস হ্যামিলটন সাহেব। চার্লস হ্যামিলটন সাহেব ঐ কাজ করেন ওয়ারেণ হেস্টিংস সাহেবের আদেশে। দ্বাদশ শতাব্দীতে হেদায়া আরবী ভাষায় সংকলন করেন পারসী ভাষায় ঐ পুস্তক অনুবাদ করেন পারসী ভাষায় উক্ত পুস্তক। বেইলী সাহেবের বেইলী ডাইজেস্ট (Bailee Digest) এর ১ম খণ্ড হল ফতোয়া আলমগিরীর ইংরাজী অনুবাদ এবং দ্বিতীয় খণ্ড হল শিয়া আইন সংক্রান্ত। শিয়া আইনের প্রধানতম এবং বিশ্বস্ত শাস্ত্র শারায়া-উল-ইসলাম'। এম কুইরী সর্বপ্রথম উক্ত শাস্ত্র ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মে ইসলামী হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের পারিবারিক আইন যে এক ছিল না সে-কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মান্তরিত মুসলিমগন পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রীতি-নীতিগুলি ত্যাগ করে তারা ইসলামের শিয়া বা সুন্নী কোন মতকেই মেনে নেয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খোজা কুচি মেমন, হালাই মেমন, সুন্নী বোহরা এবং মোলাসালাম গিয়াসিয়া সম্প্রদায়গন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুদের রীতিনীতিই মেনে চলত। দক্ষিণ ভারতের মোপালা সম্প্রদায়ও মাতৃতান্ত্রিক (মরু-মাক্ষ্যায়তান) নিয়মই মেনে চলত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বিবাহে মুসলিম মেয়েদের ইদ্দতকাল পর্যবেক্ষণের কোন নিয়মনীতি মেনে চলতে হত না। মধ্যভারতের মুসলিম নারীদের পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে ছিল না কোন অধিকার। আবার কুচি মেমন এবং খোজা সম্প্রদায়ের মুসলিমরা তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিজ ইচ্ছামত উইল করতে পারত যা মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বিরোধী।

উপরিউক্ত জনগোষ্ঠী ধর্মে ইসলামী অথচ পারিবারিক বা সমাজিক আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথাগত রীতিনীতি ভিন্ন হওয়ায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাগুলি সমাধান কল্পে ১৯১৮ সালের মহিলা সাকসেসন এ্যাক্ট, ১৯২৮ মাপিলা উইলস এ্যাক্ট, ১৯২০ ও ১৯৩৮ সালে কুচি মেমন এ্যাক্ট, ১৯৩৫, সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এ্যাক্ট প্রভৃতি আইন বিধিবন্ধ হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত আইন গৃহীত হয়েছিল সে সব আইনের বিলোপ ঘটিয়ে ১৯৩৭ খৃঃ ৭ই

অক্টোবর যে আইন (ACT XXVI OF 1937) গৃহীত হয় তাই হল বর্তমানে শরিয়তী বিধান। বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে গৃহীত ব্যক্তিগত আইন কিন্তু কোন সময়েই প্রাগুক্ত ইমামদের রচিত বিশেষ করে ইমাম হানিফা রচিত আইনের বিরোধিতা তো করে নি বটেই এমনকি তা কতটা মানবিক, যুগপোযোগী এবং প্রগতিশীল তাও বিচার করে দেখার সাহস হয় নি। ইসলামী আদর্শের যা অতি অবশ্যই পরিপন্থি। এখন সময় হয়েছে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে দেবে মুসলিম (ভারতীয়) সম্প্রদায়, না প্রগতিশীল ধন্যা-ধারনায় উদবুদ্ধ হয়ে তাঁরা এগিয়ে যাবে যুযোগযোগী ও মানবিক আইন রচনার জন্যে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে সঠিক পথ ধরতে হবে। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়কে কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়লেই হারিয়ে যাবে অন্ধকারে

নিবন্ধটি লিখতে তথ্যের জন্য আমি সাহায্য নিয়েছি মুখ্যত হরফ প্রকাশনীর কোরান শরীফ, হিস্ট্রী অব দি এ্যারাবস ফিলিপ কে হিট্টীং, দি স্পিরিট অব ইসলাম-সৈয়দ আমীর আলী, হরফ প্রকাশীনীন আল হাদীশ, বিশ্বনবী-গোলাম মোস্তাপ্রে (অষ্টম সংস্করন) মহঃ হিদায়তুল্লা সম্পাদিত (অষ্টাদশ সংস্করন) প্রথম খণ্ড সৈয়দ আবদুল হালিম, বোখারী শরীফ (বাংলা) ১ম খণ্ড ৭ম সংস্করন হামিদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা মুসলিম খালিদ রসিদ। এছাড়াও যে সমস্ত পুস্তক পত্র পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি প্রগতি প্রকাশনের (মস্কো) সোভিয়েত দেশে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ জিয়াউদ্দিন খান ইবনে ঈশান বাবা খান, সিরাতুল মুস্তাকীমের (ইমাম গজ্জুলী) বঙ্গানুবাদ অনুবাদক মহিউদ্দিন খান, দেশঃ ৫৩ বর্ষ ৬ ও ২১ সংখ্যা সাপ্তাহিক মীযান ২৭/২৮ সংখ্যা, পরিবর্তন বর্ষ অষ্টম সংখ্যা-৪৯।

স্বপ্নটুকু বেঁচে থাক

সৌরি ঘটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, বুর্জোয়া সমাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে টাকার মূল্যে নামিয়ে আনে। এতদিন পরে আমাদের সমাজে তারই প্রতিফলন। তাই আজ অতীতের মূল্যবোধ, মানবতাবোধ, সম্মানবোধ সব ভেঙেই যাচ্ছে চোখের সামনে।

ধরা যাক শিক্ষকদের কথা। এককালে সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন শিক্ষকরা। তখন তাঁরা ভাল বেতন পেতেন না, বেশবাসে চাকচিক্য ছিল না, পায়ে থাকত ছেঁড়া জুতো, তবু তাঁদের প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা ছিল অতি নিন্দনীয় আচরণ। লোকে তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন এজন্যে যে তাঁরা বাড়ীর সন্তান-সন্ততিদের মানুষ করেন, তাদের বিদ্যা দান করেন। সে কালের শিক্ষকদের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে কালিদাস রায়ের সেই কবিতায়—

বর্ষে বর্ষে দলে দলে
আসে বিদ্যা মঠতলে
চলে যায় তারা কলরবে
কৈশরের কিশলয়
পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে॥

কৈশরের কিশলয়কে তাঁরা পর্ণে পরিণত করতেন। সেদিন শিক্ষকতা ছিল একটা সাধনা, শিক্ষকদের দান ছিল নিঃস্বার্থ, তাদের সম্মান ছিল গগনচুম্বী।

আর আজ। ছাত্র ও অভিভাবকদের কাছে শিক্ষক সমাজের এক বড় অংশ হলেন সবচেয়ে অশ্রদ্ধেয় মানুষ। কারণ একটাই। সেটা হল পুলিশ বিভাগের মতই বহু শিক্ষক হয়ে গেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত।

দুদশজন আদর্শনিষ্ঠকে বাদ দিলে এমন বহু শিক্ষক আছেন যাঁরা বেতন যা পান তার দশ গুণ রোজগার করেন প্রাইভেট পড়িয়ে। আর তাঁদের কাছে

প্রাইভেট না পড়লে ক্লাসে ভাল রেজাল্ট করা কোন ছাত্রের পক্ষে অসম্ভব। এই সব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের কোন সীমা-পরিসীমা আছে কি? নিজের ছাত্রদের প্রশ্ন বলে দেওয়া, খাতা দেখতে পক্ষপাতিত্ব, পরীক্ষার হলে গিয়ে উত্তর বলে দেওয়া, এমনি আরও কত কি? আর সব অভিযোগই মিথ্যা নয়। এঁদের এই কাজের ফলে সমগ্র শিক্ষকসমাজ তাঁদের সম্মানের আসনটি খুইয়ে বসে আছেন।

তেমনি বিপরীতে যদি ছাত্রদের কথা ধরা যায় তো তার চিত্র আরও ভয়াবহ।

অতীতে, সমগ্র স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার দিকে ছাত্র আন্দোলন ছিল ভবিষ্যতের দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী তৈরী করার আতুর ঘর। বিপ্লবী চেতনার প্রথম দীক্ষা হত তাদের এইখানে। এখানেই হত তাদের মানুষকে ভালবাসতে শেখার হাতে খড়ি। ভবিষ্যতে একজন সচেতন নাগরিক হতে হলে সে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠা দরকার তার প্রথমপাঠ তারা এখান থেকেই গ্রহণ করত।

আমাদের দেশে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের বহু গৌরবজ্জ্বল সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। সেইসব ঘটনার তুলনায় দেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসও কম উজ্জ্বল নয়। কম রক্ত তারা ঢালে নি স্বদেশী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে। পরাধীন ভারতে এক একটা আন্দোলনের জোয়ারে শত শত ছাত্র লেখাপড়া ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছে। ইংরেজের বেত খেয়েছে, কারাবরণ করেছে, গুলি খেয়েছে, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে কত ছাত্রই না চিরজীবনের জন্য ঘর-বাড়ী, আত্মীয় পরিজন ছেড়ে চলে গিয়েছে কারখানায়, গ্রামে—বিপ্লবের জন্য শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করতে। তাদের অনেকের এই নিঃশব্দ আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় বড় বড় করে লেখা নেই। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'কি দিলাম তারে
জানে না তো কেউ
ধুলায় রহিল ঢাকা।'

আজ আমরা শ্রমিক কৃষকের মিছিলে অনাগত ভবিষ্যতের যে পদধ্বনি শুনি তার পিছনে এইসব নিষ্ঠাবান ছাত্রদের অবদান কম নয়। এক কথায় বলা যায় সেদিন তারাই ছিল সবকিছু প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক আন্দোলনের

বর্শা ফলক।

কিন্তু আজ? কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের অফিসগুলো হল নতুন প্রজন্মকে দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়ার আখড়া। টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষায় অবৈধ উপায়ে পাশ করিয়ে দেওয়া প্রভৃতি প্রচেষ্টার জন্য ইউনিয়নকে মোটা টাকা দেওয়া কোথাও কোথাও একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি ছাত্রদের টোকাটুকি করতে সাহায্য করাও যেন এদের একটা নৈতিক কর্তব্য। এই সঙ্গে জড়িত এক শ্রেণীর অধ্যাপক শিক্ষক বিদ্যায়তনের কর্মচারী সবাই। এ একটা চক্র।

এরা বাৎসরিক উৎসবে অপসংস্কৃতি আমদানি করে হৈ হুল্লা করে, বিদ্যালয়ে ঘটা করে পূজা অর্চনা হয়, আলোকসজ্জা মন্ডপ নির্মাণে মোটা টাকা খরচ হয়।

চিত্রতারকার আদলে প্রতিমা গড়া, মদ্যপান, বেলেল্লাপনা, সবই চলে। আর চলে এইসব অনুষ্ঠানের নামে ইউনিয়নের মোটা টাকা তছরূপ।

গ্রাম দেশে কৃষকদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে। সেটা হল জমিতে কাজ করতে গিয়ে বাবা ছেলে দুজনকেই হুঁকো খেতে হয়। কিন্তু বাবার সামনে ছেলের হুঁকো খাওয়া অশোভন। তাই সে মুখ ঘুরিয়ে খায়। একে বলা হয় বুড়ো আঙুলের আড়াল দিয়ে হুঁকো খাওয়া।

তেমনি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে এই যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে এটা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকার, শিক্ষক সমাজের অজানা নয়। কিন্তু সবাই এ ব্যাপারে যেন হিমালয়ের যোগীর মত উদাসীন। দেখেও দেখেন না, শুনেও শোনেন না, বুঝেও বোঝেন না। সবারই এক কথা, এ সব নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কি লাভ? অকারণ হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। তার চেয়ে যে যা ইচ্ছে করুক। কোন ঝামেলা না হলেই হল।

রেনেশাঁর যুগে সমাজের প্রথম হিরো ছাত্ররা। মধ্যযুগের সামাজিক অচলায়তনের দুর্গে তারাই প্রথম আঘাত হেনে সদর্পে ঘোষণা করল—'মানি না এসব কুসংস্কার।'

আবার কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার যুগেও মানুষের সামনে বীরের ভূমিকায় এগিয়ে এল ছাত্ররা। তারাই সোচ্চারে বলল—'চাই সাম্য। চাই অর্থনৈতিক শোষণের অবসান। চাই শোষিত মানুষের, শ্রমিক কৃষকের রাজত্ব।'

তাদের সেই বজ্র গর্জন ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনিত। আজও প্রেরণার উৎস খুঁজতে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করতে হয়।

কিন্তু এখন? মানুষ কি চোখে দেখে ছাত্রসমাজকে? কি অবদানের স্বাক্ষর তাঁরা রেখে যাচ্ছেন ইতিহাসের পাতায়?

সে জন্যেই প্রবাদে বলে অন্ধকার রাতে পেঁচারাই আকাশের রাজা।

ইংরেজ যে বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করে গিয়েছে, তাদের পরিবারের এবং শ্রমিক, কৃষক ও দরিদ্র মানুষদের ঘরের সামান্য সংখ্যক ও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষগুলির সংসারের লেখাপড়া শেখা ছেলে মেয়েদের একটা বড় অংশ সরকারি, বেসরকারি অফিস, কোর্ট-কাছারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসন বাস্তবে এরাই চালায়। লোকে এক কথায় এদের বলে কেরাণী।

সমাজের লেখাপড়া জানা ছেলেদের এই বাহিনীর কি ভূমিকা প্রশাসন পরিচালনায়।

অনেকদিন আগে এলাহাবাদের জনৈক বিচারপতি পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন 'এরা হল সমাজের সবচেয়ে সংগঠিত গুণ্ডা বাহিনী।'

বিনা দ্বিধায় এই কেরাণী স্কুল সম্পর্কে ঐ মন্তব্যকেই একটু ঘুরিয়ে ব্যবহার করা যায় 'এরা হল দুর্নীতিবাদীদের সবচেয়ে বড় সংঘটিত বাহিনী।'

যেখানে অফিস আদালত, সেখানেই সাধারণ মানুষকে কাজের জন্য তাকে ঘুষ দিতে হবে। না দিলে তার অবস্থা কৃপাপ্রার্থী ভিক্ষুকের মত। তার ফাইল নড়বে না, কোথাও চাপা পড়ে থাকবে, প্রতি পদে পদে তাকে অপমানিত হতে হবে। তার এক ঘন্টার কাজ একশো দিনেও সমাধা হবে না।

গরীব মানুষ প্রশাসনকে ভয় করে। এড়িয়ে চলে। জানে কোন কাজে প্রশাসনের কাছে যাওয়া মানেই হয়রানি আর টাকার শ্রাদ্ধ।

এই কেরাণী স্কুলের বড় অংশ অনেক দেরী করে অফিসে আসেন, কেউ চেয়ারে বসে ঢোলেন, কেউ ঘর সংসারের গল্প করেন, কেউ বিপ্লব বা কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার মহান কর্তব্য নিয়ে ছুটোছুটি করেন। মেয়েদের কেউ শীত কালে উল বোনেন, ঘরে কি রেঁধেছেন তার গল্প করেন। এমনি করতে করতে দিন কেটে যায়। এর মাঝে দু একটি ফাইল হয়ত একটু নড়াচড়া করে। আর সেটাই ছুটে বেড়ায় যখন ঘুষের টাকা পকেটে ঢোকে।

অথচ এঁরা সবাই সাধারণ পরিবারের সন্তান। পাড়ায় এরা যত প্রগতিশীল তার চেয়েও বড় এঁদের বিপ্লবী কথাবার্তা। অফিসে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি ও

অধিকার রক্ষার দাবীতে এরা ভীষণ সোচ্চার। কিন্তু যখন মানুষের কাজ করে দেওয়ার প্রশ্ন আসে তখন সৎ পথে এদের নড়ানো শিবেরও অসাধ্য।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সেটা ১৯৫৬ সাল। ডি, ভি, সি হওয়ার পর সেবারই প্রথম বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে প্রবল বান হয়েছে। সে সব অঞ্চলে কস্মিন কালে জল ওঠে নি সে সব এলাকা ভেসে গিয়েছে। ফসল, গাছপালা, মরা গরু মোষ পচে দুর্গন্ধে গ্রাম গুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত নরক।

এমনি দিনে সে সব গ্রামে পানীয় জলের কোন উৎস নেই তার জন্যে সরকার থেকে বিনা মূল্যে কিছু টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হল। সহর থেকে অনেক দূরে একটি ক্ষেত মজুর গ্রামের জন্য একটি টিউবওয়েল এস, ডি, ওকে বলে মঞ্জুর করালাম। তারপর সংশ্লিষ্ট কেরাণীকে সেই আদেশটি দিয়ে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দোকান থেকে পাইপ পাওয়ার পারমিট দিতে বলে অন্য কাজে চলে গেলাম।

সন্ধ্যা বেলা কৃষক সমিতি অফিসে ফিরে দেখি গ্রামবাসীরা মুখ চুন করে বসে আছে।

কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে তারা বলল—'কেরাণীবাবু পঞ্চাশ টাকা ঘুষ চেয়েছে। নইলে পারমিট দেবে না।'

কথাটা শুনেই রক্ত মাথার উঠে গেল। সারাদিনের পরিশ্রান্ত শরীর রাগে ঠকঠক করে কাঁপাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলে এস, ডি, ও কে বললাম—'দেখুন এরা হল নিঃস্ব ক্ষেতমজুর। পঞ্চাশ টাকা কেন এদের কারো ঘরে পঞ্চাশটা পয়সা নেই। মোমবাতির সাহায্যে বেঁচে আছে কোন রকমে। ঐ লোকটা যদি পশু হত তাহলেও বোধহয় এদের কাছে পয়সা চাইত না। কাল আমি ওকে অফিস থেকে টের বের করে পেটাবু। দরকার হলে আপনি আমায় গ্রেপ্তার করতে পারেন। ঐ সব চাষীদের ওপর গুলি চালাতে পারেন যা ইচ্ছে হয় করবেন।'

এস, ডি, ও ফোনে বললেন 'রাগবেন না। দেখছি'!

পরের দিন বেলা এগারটার মধ্যে কৃষকরা পারমিট পেয়ে গেল।

এ ঘটনা সেখানেই মিটে গেল।

এরপর প্রায় বিশ বাইশ বছর পরের কথা। পথ দিয়ে একটি মিছিল চলেছে। তাতে একজন সামনে শ্লোগান দিচ্ছে 'ছাঁটাইয়ের করলে নাম, বাংলা করব ভিয়েৎনাম।'

চেয়ে দেখি সেই কেরাণী। এতদিনে প্রায় বৃদ্ধ হয়েছেন। আকাশে দারুণ ঘুষি ছুড়ছেন আর 'ভিয়েৎনাম করব' বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন।

সেদিন রেগে পাগল হয়েছিলাম, আজ হেসে ফেললাম। মনে মনে ভাবলাম—'ভাগ্য আমাদের দেশে ভিয়েৎনাম হচ্ছে না। যদি এই লোকগুলোর হাত দিয়ে ভিয়েৎনাম হত তাহলে মানুষের কি সর্বনাশই না হত।'

আজও এই ধরণের অফিস কর্মীদের সভা সমাবেশ দেখলে ঘটনাটি আমার মনে পড়ে, ভুলতে চাই, কিন্তু পারি না।

আমাদের দেশের বহু গ্রামেই পানীয় জল নেই। বহুদূরের নদী থেকে এদের পানীয় জল সংগ্রহের প্রানান্তকর প্রচেষ্টা দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন গ্রামের মেয়েরা যখন এইভাবে একটু তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করে তখন পানীয় জলের সঙ্গে তাদের চোখের জল মিশে একাকার হয়ে যায়।

সমাজের চিরকালের বঞ্চিত এই মানুষগুলির কাছে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করে দিতে যারা ঘুষ চায়, সামান্য কৃষি ঋণ কি বন্যা রিলিফ দিতে গিয়ে যারা বাঁ হাত পাতে তারা যত বিপ্লবীয়ানা দেখাক, বিচারের চোখে তারা শুধু ধিক্কারের পাত্র।

এদের কত সমাবেশ হয়, তাতে কত দাবি দাওয়ার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অধিকার রক্ষার কথা ওঠে। কিন্তু এই দীর্ঘজীবনে কোনদিন তো শুনলাম না যে এরা সম্মেলনে দাঁড়িয়ে শপথ নিচ্ছে, আমরা শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক, নিঃস্ব মানুষদের কাজগুলো দ্রুত করে দেব। এদের কাছে আমরা ঘুষ নেব না। একজন সারাক্ষণের কর্মী গ্রামে, বস্তিতে পড়ে থেকে এই শ্রেণীদের সে ভাবে সেবা করে আমরা অফিসে থেকে সেই মনোভাব নিয়ে তাদের সেবা করব।

কোনদিন এ দাবী এদের মুখে কেউ শোনে নি। অথচ এই নিরক্ষরের দেশে এরা হল শিক্ষিত মানুষদের একটা বিরাট অংশ।

হয়ত কেউ প্রশ্ন করবেন তাহলে সমাজে ভাল বলে কিছু নেই। শিক্ষক, ছাত্র, কেরাণী, বিজ্ঞানী, ডাক্তার সবাই অধঃপতনে গেছে। পচে গেছে সমাজটা। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

না তা নয়। মানব সমাজে কোন কালে এমন দিন আসে নি বা আসবে না যেদিন সবাই খারাপ হবে বা সবাই ভাল হবে। হিমালয় পাহাড়ের সাধুর রাজত্বও কোনদিন হবে না। আবার চোরের রাজত্বও কোন কালে হবে না।

এমন কি যে সাম্যবাদী সমাজের আমরা স্বপ্ন দেখি সেখানে সেখানেও অল্প
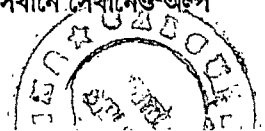
কিছু খারাপ লোক থাকবে। আবার হিটলারের বন্দী শিবিরেও দু একজন ভাল লোক ছিল যারা জুলিয়াস ফুচিককে গোপনে কাগজ কলম এনে দিয়েছিল। তাতেই সম্ভব হয়েছিল 'নোটস ফ্রম দি গ্যালোজ'—লেখা।

মূল কথাটা হল শোষক শ্রেণীর শাসিত প্রতিটি দেশে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আর সংঘর্ষ চলে শোষক আর শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শের মধ্যে। বিচার করতে হয় এর মধ্যে কোন হাওয়াটি প্রবল, কে কার ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে। আজ আমাদের দেশে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের হাওয়া প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। তাই এত অবক্ষয়। এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শের হাওয়া।

দেশে বস্তুবাদী বিজ্ঞানী কি নেই? আছেন। আছেন নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক, ছাত্র, কেরাণী, অজস্র সৎ সাধারণ মানুষ। তাই তো জীবনের সুস্থ মূল্যবোধগুলি আজও বেঁচে আছে। আজও গ্রামে, শহরে, কলে কারখানায় অজস্র মানুষ বুর্জোয়া অবক্ষয় রোধ করার জন্য জীবন পণ সংগ্রাম করছেন। সেই সংগ্রামগুলিই তো হল একালের আলোকবর্তিকা।

কিন্তু তবু যতখানি হওয়া উচিত ততখানি হচ্ছে না। যা হচ্ছে তাও যেন মন ভরাতে পারছে না। তাই এত প্রশ্ন, এত সংশয়, এত সমালোচনা।

—বৃষ্টি অঝোরে ঝরে চলেছে। চুপ করে বসে বসে ভাবছি, কবি দিনেশ দাস রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

তোমার পায়ের পাতা
সবখানে পাতা—
কোনখানে রাখব প্রণাম।

আজকে মানুষের অবস্থাও অনেকটা এই রকম। কোনখানে সে রাখবে বিশ্বাস, কাকে সে আঁকড়ে ধরবে তা বুঝতে পারছে না। যেখানে হাত বাড়াচ্ছে সেখানেই যে গলদ, সেখানেই যে ফাঁকি।

অবক্ষয়ের এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশে, জীবনের সুস্থতাকে ধর্মান্ধতা যৌনতা ও দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নতুন জীবনের ঘণ্টাধ্বনি শোনবার জন্য তার কান উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে সে অপেক্ষা করে আছে কখন আসবে সেই আহ্বান যা শুনে সব ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সমাজ পরিবর্তনে মহাযজ্ঞে। তার একটাই জিজ্ঞাসা, কবে আসবে সেই শুভক্ষণ। (চলবে)

গৌতম দাশগুপ্তের কবিতা

বারুদসংহিতা

সন্ধ্যায় গাছটির নীচে রোজ এসে দাঁড়ায় মেয়েটি
কেমন আকুল করা প্রণয়-বারুদ গন্ধ
ভরা চারদিক

মাছ আনবে বলেছিলে
অথচ নিজেই তুমি হিম চিতলের মতো
চলে গেছো তুহিন স্টোরেজে

আমার আকাঙ্ক্ষা-প্রেম-কাম
উথলে উঠলো আর গন্ধকের ধোঁয়া
চেটে পুটে নিয়ে শেষ সন্ধ্যা রেখে গেছে
কেঁদো না লক্ষ্মী মেয়ে
শীতের বিষাদ সন্ধ্যা
দুঃখই বাড়াবে

বরং বসন্তে এসো
সন্ধ্যা ও গাছের আয়রণে
তেজস্বিনী হয়ে লিখো
বারুদসংহিতা।

শ্রাবণ

মন উদাস রয়ে গেল
এই বৃষ্টিহীন দিনে
মেঘ দিক চক্রবালে
যাবে পুবে না দক্ষিণে।

শ্রাবণ শ্রাবণকেই বলে
গগন না হোক এলোকেশী
তার রুদ্র তামার বরণ
আমি ভাসি নয়নজলে।

ওঁৎ পেতে

তোমার হাতের দিকে ছুটে যাচ্ছি
সিলভার প্রিন্স ব্লেড
নতুন আনকোরা ভোরবেলায়
এক পোঁচে ফুটে উঠলো
সূর্য-চন্দ্র-তারা
উঠানে ছৌ নাচ
জীবন লাফাচ্ছে আহা
ডেকচিতে উদ্ধত শিঙ্গিমাছ
লনের ছায়ায় ওঁৎ পেতে বিচ্ছেদ
আলো-অন্ধ অন্ধ-আলো
মধ্যে সেই তামস হাইফেন।

হাস্নাহানা

বাড়ীর পাশের বেলগাছে
একটি সুন্দর বেল আছে
আমি তাকে সকালে সন্ধ্যায়
লাজুক নয়ন নিয়ে দেখি
সেও বোঝে নয়নের জ্বালা
কেন যে লুব্ধ চাঁদ হাসে
সুচেতনা দুলল বাতাসে
আমি বল্কল দিয়ে তার
শরীরে চাঁদের আলো মুছি
ছুঁয়ো না আমিষ গন্ধ নিয়ে

বেল হাসে মরকতকুচি
বেল তুমি কিছুই জানো না
রাত কাটে সাপের ধর্ষণে
আমিই মরবিড হাস্নাহানা
বেল হাসে সাপের নয়নে।

বিবর্তন

আঁধার ফাটিয়ে সাদা ফেনা
হাওয়ার শন্শন্ ঝাউগাছে
ঘরের ভিতরে আছি জ্বরে
একা নই জলভাণ্ড আছে

বিকারে দেখলাম সেই জলে
লাস্যে হাস্যে মাতাহারি
দেখালো অন্তর্বাস খুলে
দুবুক পদ্ম মহামারী

ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে বলি
বরং মরন ভালো ছিল
নিকেলের পরী উড়ে আসে
অ্যামিবা নতুন জন্ম নিল।

সঞ্জীবনী

এখন রোলার ঘুরছে পীচে
মাটিকে সাপটিয়ে ক্ষুধ টার
পেল না প্রতিমা চারা-ফুল
গনগনে রোদে কাঁপে হাত

কোদাল কোথায় নিয়ে যাবে
পাঁচের দুপাশে কৃষ্ণচূড়া
হন্তারক হয়ে যদি চাও
সেও দেবে করাল বিছুটি

সৌজন্য মেনে প্রাকৃতিক
পাঁকের সংসারে মিশে যাও
পদ্ম বেঁচে জলেরই গরলে
সঞ্জীবনী তার কাছে নাও।

অমরেশ বিশ্বাসের কবিতা

ফেরা

দশ পা হেঁটে গেলে
ব্যথায় টনটন হাত-বুকে চাপা শ্বাসকষ্ট;
এসব কেন হয় তা জানতে
বেলভিউ ক্লিনিক-এর শাদা ঘর
দুধশাদা চাদরে শুয়ে পাড়
হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে
শাদামুকুট মাথায় মেয়েরা
ঘোরাঘুরি করে।

আমার ভাইপো বুবুন
শাদা টুলে বসে শাদা হয়ে থাকে
সে তো শাদা ক্যানভাসে আঁকে ছবি
রঙ লাগায় হরেকরকম।
কাকার শাদা মুখ
ধুসর নদীর মতো দেহ
তাকে কষ্ট দেয়।

ট্যাক্সির মিটারে চোখ না রেখে
বাড়ি ফেরে, সঙ্গে থাকে কাকা।

চলে যাব

ঠোঁট-ভাঙা হাসি—
'ভালো হয়ে যাবে'
এই কথা বলে
আমাকে শুশ্রূষায় ধুয়ে দিল সে।

কেবল ই, সি, জি,-তে ধরা পড়ে না
বুকে জমা বিপজ্জনক মেঘ।
আজ নয়, কবে কারা যেন
তিলে তিলে নির্মাণ করেছে।

কেউ আসে কেউ চিঠি দেয়
হারিয়ে গিয়েছে বা কেউ
অন্য কোনো বুকের আড়ালে—
এই সব কিছু জমে জমে
বেদনার বাদামী পাহাড়

অন্তরীণ হয়ে আছি ডাক্তারি নির্দেশে
পুষ্পিত জীবনের লোভে
আজও উত্তেজনা;
প্রকৃত জ্যোস্নায় অন্তত একবার স্নান হলে
শান্ত চলে যাব।

কারাগার

বাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে গেলে
অন্য এক বাড়ি এসে ঢুকে পড়ে বুকে।
স্মৃতি এসে হুটহাট খুলে ফেলে
জং-ধরা জানালা কপাট।

কার্ণিশের কাকের ডাক
পাকে পাকে জড়ায় নিঃসঙ্গতা
পাশের টিউবওয়েলে বুঝি কেউ জল তোলে
কখনও কাপড় কাচার শব্দ—
আছড়ায় সঙ্গিহীন আমাকে।

নিজস্ব ঘর তখন যন্ত্রণার কারগার
হাহাকার সেণ্ট্রি সেজে দীর্ঘ করিডোরে।

খেলা

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে কণার প্রস্ফুটন
বিষের চেয়েও রূপের মেলা, কন্টে কত নকশা ফোটে
তাই দেখতে দিন চলে যায়
বেলা
কাজ হয় না, পড়েই থাকে,—পড়ে থাক-না
নীরব-সিঁথি-বনের মধ্যে যাবো
বনের মধ্যে পদ্ম আছে, পদ্ম ছুঁয়ে রূপ-বালিকা
রাত্তিরে তার চুল খুলবে, বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেবে
আত্মপীড়ন বিবেক-দাহ নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ
খেলা।

কনসেনট্রেশান ক্যাম্প যাবো না কোনদিন

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

২১

অশ্বদৌড় ও প্রান্তবদলের সীমারেখা থেকে একদিন যারা
শষ্যবপনের পদ্ধতি শিখিয়েছিল
সুঁড়িখানা, চন্দ্রাতপ, যুদ্ধাস্ত্রের সমূহ পতন, উত্তরীয়
কিছুরই বিকল্প নেই
এখনও সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে
এরাই ছড়িয়ে দেয় বাষ্প, স্বেদ, বিষমশলার ঝুড়ি
নামায় থাম, চিতা, কীর্তিমান রক্তের মশক

২২

পাদুকার চল ঃ দড়ি-ধরে-থাকা হাতের ছাপ
গুণ্তির সময় সযত্নে বেছে-নেওয়া
ফাঁকের ঝলক
ভারী জুতোর পাটাতন

তারও আগে, রথের চাকায় মণ্ডপাকিয়েযাওয়া
বাধ্যত সিংহ, কিংবা হারপুনের মুখে
কার্থেজের রপ্তানীজাত ক্রুশে—বিষ্ঠায়—

শকুন উড়ছে। গলে-গলে পড়ছে শহর আলাদিন,
বিবিধ প্রক্রিয়ার ভঙ্গীবদল…

যারা ভুলতে চায়, তাদের কে বোঝাবে!

২৩

যারা ভুলতে চায়, তাদের কুষ্ঠের দাগ মেলায় না কোনদিন
গাঁটাকাটা হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়
চোলাই ও বুড়িদেব জোগানদার
কাচের জানলার অর্কিড, ত্রিমূর্তি

দু'বছরের নেশা
এ-সবই জন্মান্তরে ঘুরে-ফিরে আসে

মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে স্বর্ণসীতা
জল নেই
ক্ষুরচাটাদের ঝোলানো লাসের পেটে ময়াল
দাঁড় পাকিয়ে পড়ে আছে

এইবার শীত

২৪
কেউ তো চটের ফেঁসো, পেন্সিলের শিস
এ-ও পায় নি
পনীর,—যা কাগজের টুকরো⋯কাটলেও
রক্তচিহ্ন ফোটে না

তবু

কেউ অন্তত ভান ক'রেও কবিত্ব বজায় রেখেছে
কেউবা স্মৃতিতে⋯অম্লজানের ফসিল, করাত
ফুটন্ত তেলের কেঃ স্প্রিং

তবু
হুঁকে ঝোলানো চেটোর রস, তামার পাঁচন
মধ্যরাতে আচমকা হননদৃশ্য দেখে
দশ বছর, বেআইনে আরো দশ
কাগজের নির্দিষ্ট কলামটি না-পড়ায়
সান্ধ্যভাষণে হুল্লোর⋯
রাত ভেঙে পড়বে

জুঁই

একান্ত ব্যক্তিগত

গৌতম হাজরা

যদি কোনদিন তৃষ্ণার আগুনে জ্বলে উঠি আমি
সেদিন শ্বেত পাথরের টেবিলে রেখে দিয়ো
লাল আপেল আর ছুরি
আমি সেই আপেলে আমূল ছুরি বসিয়ে বুঝে নেব
রক্তের ঘ্রাণ !

ঘ্রাণের মধ্যে অনেকদিন বারুদের গন্ধ পাইনি। তাই
শুকনো পাতা মাড়িয়ে যতবার হেঁটে গেছি
ততবার মসমস্ শব্দে আমার বুকের পাঁজর
খসে গেছে
তবু কেউ আকস্মিক গর্জনে অরণ্য কাঁপায়নি…

এখন রংছুটের ভিড়ে অচোখ আটকে আছে
রাঙিন কাগজ আর রাংতার মুকুরে
তাই রক্তের দাগ নিয়েও চাবুকের দাগ নিয়েও
বোবা পৃথিবী স্পর্শকাতরতার এবং ভ্রূণের ভেতর দিয়ে
আরও নীরব হচ্ছে বেজম্মা মানুষের গান আর
গোপন সন্ত্রাসে

হুঙ্কার

স্বপন চন্দ

দাউ দাউ জ্বলছে দিন
মধ্যাহ্নের খরতাপে পুড়ছে মাটি
ঘাস লতা পাতা এবং জীবন।

মধ্যদিন কি অবাধ্য পায়ে পায়ে
হেঁটে যায়—
সে এক যুবক;
কাঁধে এক ঝুলন্ত ঝোলা
দুনিয়াজোড়া বইয়ের বাজারে;
ছুটন্ত অশ্বের চেয়েও দুরন্ত সব।

দূরের মানুষ কাছে ডাকছে

'দুনিয়াটাকে জানতে হলে
নতুন খবর শুনতে হলে
রঙীন ভাবে গড়তে হলে—
বই কিনুন
বই পড়ুন।'

সব মানুষের কাছে পাছে
কোন খবর পৌছুতে না হয়ে যায় দেরী—
তাইতো তাড়া এত।
মধ্যদিনে যুবক চলছে
নতুন দিনের নতুন কথা
সবার কাছে পৌঁছুনো চায়।

অরণ্য কাণ্ড

অচিন্ত্য বিশ্বাস

যার শরীরে দুলিয়েছিলাম অলঙ্কারের মোহিনীঅট্টম,
সর্বাপেক্ষা পরাণপ্রিয় তার কথাতে ঘুরেছি ভুল পথে
মায়ামারীচ—ঘুরেছি ভুল পথে

কেনবা তোর শরীর থেকে এড়িয়ে পড়ে সমস্ত হেম
দিগন্তময় সকল অলঙ্কার
ছায়া মরীচ—তোমার ছলের মাত্রা বহুতর
এবং আমার শঙ্কা ছিল ঠিক
লাঙ্গলে ছিল জন্ম তোর তোকেই জানি সোনার ক্ষেত
বরফিকাটা ঈষৎ অবণত
কেনবা এই ছলনাজাল কেনবা এই অসম্ভব ক্লিন্ন পরিণতি

সমস্ত সাংসদ বসেন পূর্বঘাটে ঋষ্যমূক পর্বতের ঘেরে
পর্বতের সানুদেশে বসেন বিচারপতি
রটেছে যেন রনোম্মাদ ঘটেছে যেন কিছু
ঋষ্যমূক পর্বতের জাম্বুবান লম্ববান ছায়ায় আলাপিত
দিগন্তময় অলঙ্কার ছড়িয়ে আছে অভিজ্ঞান তার
যার শরীরে ভালবাসার ফুটিয়েছিলাম মোহিনীঅট্টমু
লাঙ্গলে তার জন্ম হয়েছিল

উল্কি

অনির্ব্বাণ দত্ত

ব্রহ্মদেশের একটি প্রাচীন বিশ্বাস :
শরীরে সূচ বিঁধিয়ে উল্কি আঁকালে
মনের সমস্ত আশাই পূর্ণ হয় !
উল্কির গুণে
সাপে কামড়ায় না, অসুখ করে না—
শরীরে আঘাতও লাগে না কখনো।

কারো হাত, কারোর বুক, কারুর তাই
সারা শরীর জুড়েই আঁকা থাকে
উল্কি—

ফুল পাখি লতা, কিংবা
ভয়ঙ্কর সব ছবির নানা রঙ উল্কি।

আমার বুকেও একটা নীল উল্কি আঁকা আছে—
কটি মাত্র রেখায় ধরা একটি মুখ।

নীল শিরা-উপশিরার মতো
সে কেবল আমার হৃদয়ে আঁকিবুকি কেটেই চলেছে,
বুকের নীচে···হৃদ্‌পিণ্ড ছাপিয়ে
দশ আঙুলের দশ নখে চেপে বসা
তোলপাড় কাণ্ড এখন উল্কির শরীরে।

প্রাচীন বিশ্বাস যে কত মিথ্যাই হয়!

ওই একটিমাত্র উল্কির জন্যেই
আমার অসুখ,
ক্ষতগুলির গড়িয়ে যাওয়া—চুঁইয়ে পড়া ব্যথা,
অসংখ্য সাপের সারা শরীর পেঁচিয়ে ধরার কষ্ট—
আর সারাদিন সারারাত···প্রত্যেক প্রহর প্রত্যেক অনুচ্ছেদ জুড়েই
উল্কির রক্তপাতহীন যন্ত্রণা।

যদি না

পার্থ বসু

ছিলি তুই ছিঁচকাদুনে,
হয়েছিস মিচকেপানা।
গালে ফিচফিচকে হাসি
চকরাবকরা জামার
বেশ চেকনাই দিয়েছে—

কে তোকে লাই দিয়েছে ?

শুধু কি ইচিকদানাই
নিয়ে তোর ধানাই পানাই ?
দানারও উপর দানা
বেশ তো আমদানি হয়,
ফের যেই রেস্ত ফতুর
নেতাদের পকেট খালি।

তবু যে পুষছে তোকে ?
নেতা কি হন্দ বোকা ?
আসলে নেতাই চতুর,
আসলে এটাই কেতা—
ছাপোষা চামচা পোষা
আপোষে আঙুল চোষে।

নেতা কি এমনি বাঁচে ?
যদি না চামচা নাচে ?

ঋকমন্ত্রে

সুধানাথ চট্টোপাধ্যায়

ঋকমন্ত্রে জেগে ওঠে নাভি
উষাস্পর্শে নারীদের মুখ মনে পড়ে
নরম ঘাসের কাছে নতজানু হয়ে আছি
নতজানু হয়ে যাচ্ছি পালকের সুখ ভেবে ভেবে
দেখে যাচ্ছি পরিশ্রমী জীবনের কল
যন্ত্রহীন এ এমন বাঁচা
যার তরে ডুবে যায় সাধের মাস্তুল
শকটের পথ বেয়ে চলে আসে হরেক শকট
ধুলো ওড়ে, পাতা ওড়ে,

উড়ে যায় বালির প্রাসাদ
নিদ্রাহীন বাঘের কামনা
নখর শানিয়ে চলে পেশল বিশ্বাসে

দুহাতে আঁকড়ে আছি দ্বীপের বালুকা
জলরাশি বেয়ে আর আসে না স্বপ্নের নাও
যতো অদূরে নৌকার ফেরী নিয়ে যায়
আমার স্বজন

উষাস্পর্শে প্রিয়তমা নারীর মুখ মনে পড়ে
ঋকমন্ত্রে জেগে ওঠে নাভি।

রাঙচিতার বেড়া-ঘেরা

ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঙচিতার বেড়া ঘেড়া
একটুকরো জমি
স্বপ্ন আটকে থাকে সেখানেই
বসবাসের তোড়জোড় চলে।

ঘুমের মধ্যে উঠে আসে
ছিমছাম ছোট বাড়ি
পতপত রঙীন পর্দা
পেলমেটের বাঁধন ছিঁড়ে ওড়ে
সবুজ রঙ দরজা-জানালার।

ছাদে ঝলমলে স্টিলের ফ্রেমের
কাঁচঘর
ডিভানে ছড়ানো বই
কাগজ-কলম

বর্ষার আগমনে খোঁড়াখুঁড়ি
জায়গাটা এখন ব্যাঙাচি
এবং শুককীটের দখলে।

ইদ্যানিং মাদকের নেশার মতোই
নিজস্ব বাড়ীর নেশায়
ঝিম মেরে থাকে সে।

সন্তানের মতোই প্রিয় নিজস্ব ঘরদোর।

বীজ উপ্ত হলো না

মণিপদ্ম দত্ত

দেখে এলাম এমন নারীদেহ
ভরদুপুরে। থাকে না সন্দেহ—
সজ্জিত বুক গুরুজঘন গা
কিন্তু স্পর্শ করলে কাঁপছে না!

প্রথম থেকেই ছিলাম ভয়ঙ্কর
ছুটে গেলাম সঙ্গী প্রবল জ্বর
নারী আমায় সবই মেলে দিলো
কিন্তু স্পর্শে কেঁপে উঠলো না!
আমি আমায় তীব্র পিষে নিজে
ছড়িয়ে দিলাম লক্ষ লক্ষ বীজে
নামলো জ্বর, ক্লান্ত হলো দেহ
কিন্তু সে বীজ উপ্ত হলো না!

অমন নিটোল বিলাসিনীর নাচে
ছন্ন কণা মাতে না উৎসবে
সূর্য নাচে পশ্চিমে গৌরবে
একটুখানি বর্ষা এলো না!

পুস্তক সমালোচনা

কবিতার নন্দন

সব বিদ্যারই উদ্দেশ্য তত্ত্ব প্রয়োগ ও প্রয়োগবিচারের কয়েকটি ব্যাপার আছে। কেন পড়ছি বিশেষ বিদ্যা তা প্রথমে জানতে হয় তার পর ঢুকতে হয় সেই বিশেষ বিদ্যার তত্ত্বে এবং তার বিচার বিশ্লেষণে, তার পরে আয়ত্ত বিদ্যার প্রয়োগ করে সেই প্রয়োগ ত্রুটিহীন কি না সঙ্গত কি না তার বিচারে নামতে হয়। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং কথাটিতে বিনয় শব্দের অর্থ নম্রতা শুধু নয় যা বিশেষ শৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায় এমন ইঙ্গিতও আছে। সব বিদ্যাই বিশেষ শৃঙ্খলার আকাঙ্ক্ষা করে।

কবিতা সাহিত্যের সেই শাখা যা শৈশবাবধি পড়ে এলেও তার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে অবহিত হই না। শৈশবকাল থেকে আহৃত অভ্যাসে কবিতার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে অবহেলা জন্মে এবং মনে করি এ বিদ্যাতেও যে কোনও সাহিত্য পাঠকের আজন্ম অধিকার। কার্যত দেখা যায় অদীক্ষিত ব্যক্তির কাছে কবিতা তার মর্মদ্বার খোলে না। বন্ধ সেই দুয়ারের বাইরে হাত বুলিয়ে ফিরে এসে তাতেই সন্তুষ্ট থাকি কেউ কেউ, কেউ বা বন্ধদ্বারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে কবিতাকারকে নিন্দাভাজন করে তোলে। এই আমাদের অভিজ্ঞতা।

কবিতাপাঠ ও তার আস্বাদন প্রক্রিয়াও একটি বিদ্যা যা ক্রমান্বয়ে সাধনার দ্বারা অনুশীলনের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। এ তত্ত্ব সম্পর্কে সবাই সমান অবহিত নন। সুতরাং দীক্ষিত পাঠকের একটা কর্তব্য আছে তা হল কবিতাকে পৃথক বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। আজন্ম কবিতা পড়লেও অদীক্ষিত পাঠকের কাছে কবিতার কোনও তাৎপর্য থাকে না—সুতরাং কবিতা বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে হবে। কবিতা লিখতে কাউকে শেখানো যায় কি না সেটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু উপভোগ করা ও বিচার করার পদ্ধতি আয়ত্ত করাটা দীক্ষা শিক্ষা অনুশীলন প্রয়োগ ও প্রয়োগ বিচারের নিরন্তর পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার।

চঞ্চলকুমার ব্রহ্মের: 'কবিতা উপভোগ ও মূল্যায়ণ' গ্রন্থটি এই জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কবিতা উপভোগ করার

পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করা। এই উদ্দেশ্যে যে এতাবৎ কাল ধরে পৃথক গ্রন্থ রচিত হয় নি তা নয়। তবে সে-সব বইতে শুদ্ধ উপাদান বিশ্লেষণের চাইতে কবি ও কবিতার ইতিহাস, কবিতার বিষয় ভঙ্গি ও ঝোঁকের পরিবর্তন অথবা কবি ব্যক্তিত্বের রূপান্তরের কাহিনীই বেশি জোর পেয়েছে। কখনও এমন গ্রন্থ পেয়েছি যাতে কোনও কবির ব্যবহৃত ভাষা উপমালোক প্রকাশের গূঢ় ভঙ্গি ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে কিন্তু বিশেষ কোনও কবি ধরে নয় শুধু কবিতাকে সমগ্রত বুঝতে হলে যে ধরণের বই লেখা উচিত তা লেখা হয় নি। জিজ্ঞাসুর অভাব ছিল না কিন্তু অভাব ছিল শেখাবার মত বইয়ের। চঞ্চলকুমার এই অভাব পূরণ করলেন। কবিতাজিজ্ঞাসুরা অন্তত একটি পথ পেলেন গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে।

প্রাচীন কালে কবিতা বুঝবার জন্য শিখতে হত অলঙ্কার ছন্দ। আর এক ধাপ এগিয়ে কেউ বা কাব্যরস আস্বাদনের জন্য রসতত্ত্ব শিখতেন। জগন্নাথের রসগঙ্গাধর বা কুন্তকের বক্রোক্তি জীবিত বা বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পন সে কালের কাব্যতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পাঠ্য ছিল। অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের ব্যাখ্যাত রসাভি-ব্যক্তিবাদ নিয়েও কাব্য বিচার চলত। সে সব সমালোচনার একটি বিশেষত্ব এই যে তা তত্ত্ব হিসাবে সিদ্ধ। কিন্তু এই তত্ত্বকে অবলম্বনে করে সমগ্রত কাব্য বিশ্লেষণের কোনও রীতি, কবিতা উপভোগের কোনও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

আধুনিক বাংলা কবিতার নির্মোকবদল ঘটেছে এ শতাব্দীর এ দু তিনটি দশকের পর থেকেই। মধ্যযুগ থেকে এ যুগে আসতে ঊনবিংশশতাব্দীতে আর একবার এই নির্মোকবদলের জন্য বিহ্বলতা বোধ করেছিলাম। এখন পরিবর্তিত নির্মোক ও মর্মের স্বরূপ অনুধাবন করে কবিতার মৌল উপকরণ গুলিকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এই গ্রন্থটি সেই শৃংখলাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে বলে গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

কবিতার উপভোগ ও মূল্যায়ণ গ্রন্থটি পাঠ করতে করতেই বোঝা যায় যে গ্রন্থকারকে মনে মনে লড়তে হয়েছে সেই সব সমালোচকদের বিরুদ্ধে যাঁরা ইতোপূর্বে আধুনিক কাব্যের মূল্যায়নে নিরত ছিলেন—যাঁরা কবিতায় হয় কবির পটভূমিকাকে বুঝতে চান না নয় ঘোষিত মূল্যবোধকে খুঁজে নিতে চান। এ সবের আগে কবিতার যে জৈব সত্তা ভাবনা বা উপমা বা রূপকল্পের বীজ-রূপ থেকে বিকশিত হয়ে ওঠে সেটাকে খুঁজে নিয়ে নির্মিতির যথার্থতা বা

উপবেগগ্রাহ্যতা পরিমাপ করতে হয়। এই মূল প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে গ্রন্থকার যাত্রা সুরু করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত পটভূমিকা বা কবিতায় ঘোষিত মূল্যবোধের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির প্রশ্ন গৌন। কবিতার মনন অনুভূতি কবিতার চিত্রকল্প কবিতার ভাষা কবিতার ধ্বনি মিল ও ছন্দোস্পন্দ এবং রূপ-বন্ধ—এই রকম কয়েকটি অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে। গ্রন্থকারের আলোচনার প্রতিষ্ঠা ভূমি এবং উপাদানগুলির বিশ্লেষণ অবশ্যই নূতন আবিষ্কৃত তথ্য নয় এবং সে রকম দাবীও তিনি করেন নি। তাঁর কৃতিত্ব এই যে সমস্ত উপাদান এক জায়গায় করে তিনি মধুসূদন থেকে শুরু করে আধুনিক কবিদের অজস্র রচনার উল্লেখ করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ-পন্থার নির্দেশ করেছেন।

তাঁর বিশ্লেষণের সঙ্গে সর্বাংশ একমত হওয়া যায় না। মতপার্থক্য হতেই পারে। কিন্তু মতপার্থক্যের অবকাশ তত্বত যতটা নয় তার চাইতে বেশি উদাহরণ-চয়নে। এই গ্রন্থের সমালোচনায় জনৈক সমালোচক গ্রন্থকার ব্যবহৃত 'পোয়েটিক ডিকশন' কথাটি নিয়ে গ্রন্থকারকে আক্রমণ করেছিলেন। সেই সমালোচকের মতে যে কোনও কবির ব্যবহৃত নিজস্ব ভাষা পোয়েটিক ডিকশন। এটা কিন্তু ঠিক নয়। গ্রন্থকার ঠিক অর্থেই এই পরিভাষার ব্যবহার করেছেন—কবিতার যে ভাষাবন্ধ গদ্যের ভাষাবন্ধ থেকে পৃথক্ হয়ে আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করে তাই পোয়েটিক ডিকশন।

এই জন্যই বলছি তত্বত গ্রন্থকার ঠিক পথেই চলেছেন। কিন্তু আপত্তি ওঠে উদাহরণ চয়নে। যেমন মধুসূদনের কাব্যভাষা কাব্যভাষা নয় এ রকম সেকেলে পন্ডিতদের মতানুসারী বক্তব্যও চয়ন করেছেন তিনি। মাইকেল যে মহাকবি এটা আমাদের 'দুর্মরতম কুসংস্কার' এই জাতীয় বুদ্ধদেবীয় হঠোক্তি বা কিশোর বয়সে করা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যার সম্পূর্ণ খন্ডন পরিণত রবীন্দ্রনাথ নিজেই করে গিয়েছিলেন—সেই সব মত আঁকড়ে ধরার মধ্যে একটা 'নতুন কিছু কর' জাতীয় অভিমান আছে। অথচ এ-সব মত পুরানো এবং পরিত্যক্ত। কবি ও কবিতা বুঝবার প্রাথমিক শর্ত যে সহৃদয়তা এখানে সেই শর্ত পূরণ হয় নি। মধুসূদন যে কাব্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা কাব্য ভাষা হয় নি কারণ তার মধ্যে একঘেয়েমি আছে এটা যুক্তি হতে পারে না। দেখতে হয় কাব্যবন্ধের প্রকৃতি কি। সে অর্থে মিলটনের Paradise Lost এমন কি রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ কবিতা 'পুরস্কার' এর মধ্যেও কি একঘেয়েমি নেই ?

মনোহরণ ছন্দ সত্ত্বেও দৈর্ঘ্যের জন্য আগত এই একঘেয়েমি কাব্যপ্রতিভার অভাব নয়, কাব্যবন্ধগত ত্রুটি বলেই গণ্য করা উচিত।

যে মধুসূদন কথ্যভঙ্গিকে আয়ত্ত করার উপাদান হিসাবে পয়ার ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন তার মধ্যে বহমানতার সঞ্চার করে—যাঁর সমস্ত প্রকাশভঙ্গির মধ্যে এক আশ্চর্য প্রাণশক্তির ইশারা কখনও গীতলতা বা নাট্যোচিত অভিমান প্রকাশী ক্লাসিকতা—সেই মধুসূদনের কাব্যভাষায় কখনও শব্দযোজনায় অসফলতার জন্য (তা নামধাতুর কোনও কোনও প্রয়োগের বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের কোনও কোনও ব্যবহারের জন্য) তাঁর কাব্যভাষা যে কাব্যভাষাই নয় এরকম সিদ্ধান্ত কবিতা-উপভোগের জন্য বাঞ্ছিত সংবেদনশীলতার অভাবই সূচনা করে। আসলে এটা অভাব নয়, কারণ গ্রন্থকার অন্যত্র সংবেদনশীলতার প্রকাশ দেখিয়েছেন, এক্ষেত্রে অধৈর্যই এই জাতীয় সিদ্ধান্তে তাঁকে নিয়ে যায়।

এই অধৈর্য কখনও কখনও দেখা গেছে ব্যাখ্যান কার্যের মধ্যে। কারও কারও ব্যবহৃত চিত্রকল্পের অর্থহীনতা নিয়ে তিনি সোৎসাহে তর্কের শরযোজনা করেছেন কিন্তু যথেষ্ট ধৈর্য-সহকারে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেন নি। তখন মনে হয় যে তাঁর নিরিখটি ব্যক্তিক পছন্দ-অপছন্দের উপর সময় সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যৌক্তিকতার উপর নয়। এই অধীরতার ঝোঁক এতটাই পেয়ে বসে তাঁকে যে এমন উদাহরণ সংগ্রহ করেন যেগুলি নিছক সংলাপ নিছক আদেশ অনুরোধ প্রকাশ করছে (পৃঃ ১০৪) অথচ সমগ্র কাব্যদেহে ওই ধরণের অগীতল গাদ্যিক আদেশ কখনও কখনও যে থীমের প্রয়োজনে চলে আসে তা বুঝবার মত ধীরতা তিনি দেখান না। এমন দাবী কেউ কখনও করেন নি যে মধুসূদন তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষায় সর্বত্র পীড়াহীন একঘেয়েমিহীন সফলতা অর্জন করেছেন কিন্তু তাঁর সিদ্ধি যেখানে সেখানে আমরা সচকিত হয়েছিলাম—

সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল
আত্মবিস্মৃতিতে হায় অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।

এ সব ক্ষেত্রে কাব্যভাষার চমৎকারিত্ব গ্রন্থকারের নজর এড়িয়ে গেল!

শুধু মধুসূদনকে নিয়েই এতটা বলা গেল। অন্য উদাহরণ টেনে আনলে তর্কজালই বিস্তৃত হত।

ছন্দো স্পন্দ নিয়েও তাঁর উক্তি 'কবিতার বিধৃত ভাবনা-অনুভূতি অভিজ্ঞতারই স্পন্দন' এটা কাব্যিক উপলব্ধি হতে পারে কিন্তু ছন্দ শাস্ত্রসম্মত নয়। ছন্দ শাস্ত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবী করে তা মন নয় কান। শব্দের ধ্বনি ও বিরতি তার উচ্চারণ ও স্তব্ধতার ক্রমিক নিয়মিত ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে জেগে ওঠা ঢেউ বা স্পন্দনই ছন্দোস্পন্দ। ছন্দোস্পন্দ অর্থের বহিরাকরণে অভিজ্ঞতার বা অনুভূতির স্পন্দনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চমৎকারিত্ব অর্জন করতে পারে কিন্তু নিজে তা কানের দাবির পূরণ করে আগে। কখনও অর্থ তার গৌরব হারালেও ছন্দোস্পন্দ নিখুঁত থেকে যায় কাঁটাহীন ঘড়ি সময় নির্দেশ না করেও যেমন চলতে পারে। দোষ বর্তায় কাঁটাদুটির অভাবাত্মক ঘটনাটিতে, নিয়মিত ধ্বনির উৎপত্তিতে নয়। এই দুটি জিনিস মিলিত হলে তবেই ঘড়ি সময় নির্দেশক হতে পারে। পৃথক্ শব্দের মধ্যে ছন্দোস্পন্দের গুণাবলী কেউ মাপে না।

কিন্তু এরকম ত্রুটি গ্রন্থের গৌরব হরণ করে না বরং আর একটু ধৈর্যশীল মাজাঘষার প্রয়োজন সূচিত করে। একথা মনে রাখতে হবে, কবিতার উপভোগ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতির যে সূত্রাবলির সন্ধান চঞ্চলকুমার এই গ্রন্থে দিয়েছেন তা সর্বঘাতসহ না হলেও তা কবিতার রূপ ও আত্মার অনুধাবনে পাঠকের চিন্তার ও মননের ক্ষেত্রে এক চাবিকাঠি ধরিয়ে দেয়। সে চাবি নূতন না হলেও অব্যবহৃত। বস্তুত এই জন্যেই চঞ্চলকুমারের এই বই পাঠকেরা পড়ে নড়ে চড়ে বসবেন কখনও তাঁর সিদ্ধান্তে খুশি হবেন কখনও বা অস্বীকার করতে উৎসাহী হবেন-কিন্তু কেউ উপেক্ষা করতে পারবেন না। এটাই গ্রন্থকারের মহত্তম পুরস্কার।

প্রশান্ত দাশগুপ্ত

কবিতা উপভোগ ও মূল্যায়ন। চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম। চল্লিশ টাকা

জীবন-যুদ্ধের একজন রূপকার

প্রগতিশীল সাহিত্যমহলে চিত্ত ঘোষাল একটি পরিচিত নাম। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের কাছে চিত্তবাবু সত্যিই কি খুব বেশি পরিচিত? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের বাংলাবিভাগের একজন ভালো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: চিত্ত ঘোষালের লেখা পড়েছ? সে দুপাশে মাথা নেড়েছিল। বাংলাসাহিত্যের নিয়মিত পাঠক বলে দাবী করেন এমন আর একজন তরুণী বলেছিলেন: তিনি নাম শুনেছেন, দু'একটা গল্পও চোখে পড়েছে, কিন্তু পড়া হয়ে ওঠে নি। অথচ মফঃস্বল শহর থেকে লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন এমন দুই তরুণকে প্রশ্ন করতেই তাঁরা একবাক্যে জবাব দিলেন যে, চিত্তবাবুর গল্প-উপন্যাস দুই-ই তাঁরা পড়েছেন এবং ভালো লেগেছে। একটু বাজিয়ে দেখলাম, তাঁরা মোটেই অসত্য বলছেন না। বুঝলাম, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে চিত্তবাবুর পাঠক কারা!

চিত্ত ঘোষাল নবীন কথাসাহিত্যিক নন। গল্প লিখছেন তিনদশক ও অধিক কাল ধরে। এমনকি তাঁর বর্তমান 'ক্ষুধা ও অন্যান্য গল্প' সংকলনেও ১৯৬৩ সালে লেখা একটি গল্প স্থান পেয়েছে। এর প্রধান কারণ বোধহয় লেখকের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা বেশ কয়েকটি হলেও গল্প সংকলনের সংখ্যা মাত্র দুটি। সাধারণত 'পরিচয়,' 'সত্যযুগ,' 'সারস্বত,' 'চতুষ্কোণ,' 'উত্তরকাল,' 'লেখা ও রেখা,' 'গল্পগুচ্ছ' প্রভৃতি প্রগতিশীল ও বামপন্থী সাহিত্য পত্রিকা ও অন্যান্য লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনেই চিত্তবাবুর অধিক সংখ্যক গল্প প্রকাশিত। প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর কোন লেখা প্রকাশিত হয়নি বলেই জানি।

চিত্তবাবু সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ লেখক। শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রাম, সামাজিক অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনা ও মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ তাঁর গল্পগুলিতে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। অথচ তার জন্য প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই চিত্তবাবুর গল্প প্রচারসর্বস্ব হয়ে তো ওঠেই নি, বরঞ্চ আশ্চর্য প্রত্যয়সিদ্ধ এক শিল্পিত আবেগেই সেগুলো উদ্ভাসিত। গল্পগুলো পড়লেই বোঝা যায়, লেখক শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাতে বা সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করতে, যা আজ কাল প্রায়শই দেখা যাচ্ছে, মোটেই অভ্যস্ত নন। চিত্তবাবু নিশ্চিতরূপেই জানেন তিনি কী জন্য

লিখছেন এবং কাদের জন্য লিখছেন।

আঠারোটি গল্প নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি সংকলিত। ১৯৬৩ সালের গল্পটি বাদ দিলে অন্য সবগুলো গল্পই ১৯৬৮ সালের মধ্যে রচিত। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এই সময়কালটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আটষট্টি থেকে বাহাত্তর, বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর এবং সাতাত্তরের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে এই যুগকালটিকে পৃথক করা যায়। কিন্তু গল্পকার এই আধা-ধনতান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এমন কিছু চিরন্তন সমস্যা ও সংকট তাঁর গল্পে চিত্রিত করেছেন যা আটষট্টিতে যেমন সত্য, তেমনি সত্য অষ্টআশিতেও। চিত্তবাবুর প্রয়াস এখানেই সার্থক।

সংকলনের প্রথম গল্প 'ক্ষুধা'। পুরুষশাসিত যৌথ পরিবারে আজও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার আমাদের মা-বোন-বউ। মলিনা তাদেরই প্রতিনিধি। ক্ষিধের যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেও তাকে মুখ বুজে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে যেতে হয়, দেহ-মন তথা সমগ্র অস্তিত্ব দিয়েই পালন করতে হয় তার ভূমিকা। বিনিময়ে সে পায় না এতটুকু স্নেহ-মায়া বা ভালোবাসা। তারপর একদিন সে নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুঁড়ে, পথের ধুলোয়। সেখানে অতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে মলিনাকে মরতে হয় তিল তিল করে। স্বভাবতই প্রথম গল্পটিই পাঠকের সামনে উপস্থিত হয় সুস্পষ্ট অভিযোগ নিয়ে। প্রশ্ন তোলে কেন এমন হয়? একার পাপ? বেশ বড় এই গল্পটিকে অবশ্য একটা উপন্যাসের আকারও দেওয়া যেতে পারতো।

মানবসম্পর্কের রহস্যময়তা ও মনুষ্যত্ববোধের একটি উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে 'মহিমরঞ্জন ও তদীয় কতিপয় উত্তরপুরুষ' গল্পটিতে। অসহায় বৃদ্ধ ঠাকুদাকে যে বখে যাওয়া নাতি গৃহাঙ্গনে নিয়ত অসম্মান ও অগ্রাহ্য করে, সেই বটুকই সিনেমার হলের লাইনে কতিপয় মাস্তানের হাত থেকে দাদুর সম্মান রক্ষার জন্য আহত বাঘের মতো রুখে দাঁড়ায়। জীবনের নানাবিধ চাপে বেঁকে যাওয়া নাতির কাঁধে ভর দিয়ে বৃদ্ধ মহিমরঞ্জন জীবনের অর্থ নতুনভাবে খুঁজে পান। গল্পটি সত্যিই মনকে স্পর্শ করে। এরকমই আরেকটি আত্মিক সম্পর্কের অসাধারণ গল্প 'দৌড়'। এক দরিদ্র অসহায় পিতা এবং এর প্রতিভাময়ী বালিকাকন্যার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং জীবনসংগ্রামের মধুর অথচ করুণ ছবি এই গল্পে প্রতিভাসিত।

মানুষের মধ্যে যে শাশ্বত মানবিকতা সামাজিক নিষ্পেষণেও সুপ্ত থাকে,

হঠাৎ কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে তা জাগ্রত হয়ে ওঠে। 'একটি অপকীর্তি' গল্পে তরুণ আর এক বখে যাওয়া মাস্তান। চোঙা প্যান্ট, চকরা-বকরা হাওয়াই শার্ট, নকল সাপের চামড়ার বেল্ট কোমরে, মুখে টকাটক খিস্তি, মেয়েদের পেছনে লাগাই যার কাজ, সেই তরুণই একদিন রক্তাক্ত হয় এক পথ চলতি তরুণীর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য। এর ব্যাখ্যা একটাই অর্থাৎ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ ; লেখক এই পরম সত্যেই আস্থাশীল।

অবশ্য সকল লুম্পেনই যে এরকম, এমনটা তো নয়। বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরে সংগঠিত মাস্তানীর বীভৎস ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাও লেখকের আছে। তারই বিরুদ্ধে ঘৃণা আর সুস্পষ্ট প্রতিবাদ তাঁর 'মরণ, হে মরণ' এবং 'বাঘের খেলা' গল্পদুটি।

বস্তুত চিত্তবাবুর অধিকাংশ গল্পেই মনুষ্যত্ব, মানুষের শুভবুদ্ধি ও সংগ্রামী চেতনার প্রতি আস্থা প্রতিভাত। এ রকম একটি অনন্য গল্প 'সংবাদ'। এক সাংবাদিক দেশবিখ্যাত এক নেতার ছবি তুলতে সভাস্থলে এসেছেন। সাংবাদিকটি গোপন সূত্রে খবর পেয়েছেন যে ওই নেতা সভাস্থলেই উগ্রপন্থীদের গুলিতে প্রাণ হারাবেন। সাংবাদিক ভদ্রলোক প্রস্তুত। এই ঘটনার ছবি তোলা তাঁর ভবিষ্যৎ সাংবাদিক জীবনে এনে দেবে যশ প্রতিপত্তি ও সম্পদ। গুপ্তঘাতক গোপনে তার রিভল্বারের নল নিশানা করলো নেতার দিকে। সাংবাদিকও ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। এই সেই নেতা যিনি প্রতিমুহূর্তে সাংবাদিকদের, বিশেষ করে তাঁকে অপমান করেন। সুতরাং কীসের সহানুভূতি? গুপ্তঘাতক রিভল্বারের ট্রিগারে চাপ দিলো। কিন্তু কী যে ঘটে গেল সাংবাদিকের মনে। শেষ মুহূর্তে ক্যামেরা ফেলে সাংবাদিক লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লেন নেতার সামনে। উগ্রপন্থীর গুলিতে নিহত হলেন সেই সাংবাদিক। সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে নিজেই সংবাদ হয়ে গেলেন তিনি। নিঃসন্দেহে গল্পটিকে সংকলনের শ্রেষ্ঠতম আখ্যা দেওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী হলো ধনতান্ত্রিক সমাজের সেই অংশ, যাদের মধ্যে বহুবিধ মানবিক গুণাবলী প্রচ্ছন্ন থাকলেও বিভিন্ন সময়ে প্রকট হয়ে ওঠে তাদের মানসিক পচন ও পঙ্কিলতা। পেটি বুর্জোয়া মূল্যবোধের নগ্নগাত্রে সুতীব্র কষাঘাত হেনে লেখক রচনা করেছেন কয়েকটি গল্প। 'একজন গোঁয়ার মানুষের গল্প,' 'বয়সের কথা,' 'মানুষ হতেছে যারা,' 'ত্রৈলোক্যবাবু কি অবসর গ্রহণ করলেন'—গল্পগুলো পাঠ করলে আমরা যেন শাদা কাগজ ও কালো কালির

দর্পণে নিজেদের প্রতিবিম্বই খুঁজে পাই।

সমালোচনা-আত্মসমালোচনা সত্ত্বেও চিত্তবাবুর প্রতিটি গল্প থেকে আশাবাদের সুরই কিন্তু স্বতোৎসারিত। জীবনযুদ্ধের একজন সৎ রূপকার চিত্তবাবু। কোনো অস্পষ্টতা, ধোঁয়াশা বা বিমূর্ততার ছলনা তাঁর গল্পে খুঁজে পাওয়া যায় না। 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা কলাকৈবল্যবাদ ধরণের নেতিবাচক ধারণাকে তিনি যে স্পষ্টতই অস্বীকার করেন তা তাঁর গল্পগুলোতে প্রতীয়মান। একদিকে সকল প্রকার অন্যায়-বৈষম্য ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে লেখকের তীক্ষ্ন শ্লেষ ও ঘৃণা, অপরদিকে মানুষের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও তাঁদের সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনই চিত্তবাবুর গল্পগুলোকে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে দীপ্যমান করে তুলেছে।

একটু অন্য ধরণের গল্প 'ধ্বস'-এ অসহায়, নিরাশ্রয় ও সন্ত্রস্ত একদল মানুষের ছবি এঁকে গল্পকার তাদের অনুভূতিকে ভাষা দিলেন, "...কিন্তু মানুষগুলি এইবার আতঙ্কিত হল না, খোলা মাঠে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা দাঁড়ালো, সম্ভাব্য আক্রমণের দিকে লক্ষ্য করে তারা নির্ভীক ভ্রূকুটি হানল, মানুষ আরেকবার অনির্বচনীয় মানুষী মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কারণ তারা নিঃসন্দেহে জেনেছে রিলিফ আসবে না।"

এই জেগে ওঠা, মাথা তুলে রুখে দাঁড়ানো মানুষের প্রতিবাদী সত্তাই চিত্ত ঘোষালের গল্প গুলোতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সব গল্পই সমান আকর্ষণীয় ও সার্থক এমন নয়। কিন্তু এই সংকলনের বেশীর ভাগ গল্পই পাঠকদের সুচেতনাকে স্পর্শ করতে, মনকে ভাবাতে পেয়েছে। গল্পকারের সার্থকতা এখানেই। তবে সংকলনটিতে চিত্তবাবুর সব ক'টি গল্পের পটভূমিই হলো নগর। লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ও বেশীর ভাগ গল্পেই দেখি নাগরিক জীবন প্রতিফলিত। গ্রামীন জীবন বা কৃষক সমাজ তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত। এটা কি লেখকের সীমাবদ্ধতা, না স্বেচ্ছাকৃত অপারগতা ?

গল্পের রচনারীতি, ভাষা ও শব্দ প্রয়োগে চিত্তবাবুর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহু জটিলবাক্যের সমাহারে গঠিত বর্ণনা প্রধানবাক্য সমূহ বেশ প্রলম্বিত। অথচ ছোট গল্পের সৌন্দর্য তার সরলতা ও সংক্ষিপ্ত বাক্যগঠনে। তীব্র স্যাটায়ার ও স্বগতোক্তির মতো টুকরো টুকরো মন্তব্যের মধ্য দিয়ে গল্পকার অনেক সময়েই কাহিনীরই একটি চরিত্রে রূপান্তরিত হন। অনেক ক্ষেত্রে গল্পের চরিত্রগুলো কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো

সক্রিয়তা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। তখন তারা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণতই গল্পকারের উপর নির্ভরশীল। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে তিনি চরিত্রগুলোকে যেভাবে চালনা করছেন, তারা সে ভাবেই চলছে। এতে চরিত্রগুলোকে যেমন কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকে, তেমনি গল্পকেও কেমন যেন বানানো মনে হয়। নিঃসন্দেহে ভালো গল্পের এটা একটা বড় ত্রুটি।

তবে গ্রন্থটি পাঠ করে আমাদেরও সংকলনের শেষ গল্প 'লখাই পাহাড়ের কাব্য'-র নির্যাতিত, বঞ্চিত ও ক্রুদ্ধ মজুরদের সঙ্গে একত্রে গলা মিলিয়ে ঘোষণা করতে হচ্ছে হয়—'সাবধান, কাজ চলিতেছে।' এর থেকে বড় সার্থকতা গল্পকারের আর কী-ই বা থাকতে পারে!

সুস্নাত দাশ

ক্ষুধা ও অন্যান্য গল্প : চিত্ত ঘোষাল। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১ বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬। পঁচিশ টাকা।

সৃষ্টিশীলতা ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন

অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ এবং বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তারই যদি সাহিত্যের অন্যতম শর্ত হয়, তবে তার প্রকাশভঙ্গিটি নিঃসন্দেহে লেখকের নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও অন্তর্লীন ব্যক্তিত্ব-অনুযায়ী পৃথক হতে বাধ্য। এই ব্যক্তিত্ব বা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখকের দেখার চোখটি বদলে যেতে থাকে। অভিজ্ঞতার অতল থেকে মুক্তো খোঁজার প্রয়াসে কেউ ডুব দিতে পারেন নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে গভীরে, কেউ আবার একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করেই ছড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর লেখনীর দিগন্ত। কোনো ছকবাঁধা পদ্ধতি এখানে নেই, সত্য অনুসন্ধানের কাজে এই পদ্ধতিটি মুখ্য বিচার্য নয়। শেষ পর্যন্ত আমরা কোন্ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হলাম, সাহিত্য আলোচনার সেটাই প্রধান বিচার্য। আলোচনার জন্য এখানে আমরা যে দুজন লেখককে বেছে নিয়েছি, তাদের চিন্তার গতিপথটি মূলত এই দুটি খাতেই প্রবাহিত। অনিল ঘড়াই একই বিষয়কে কেন্দ্র করে বাস্তবতার গভীরে ডুব দেন, হয়তো এই কারণেই তাঁর বৈচিত্র্য কম। আশিস মন্ডল আবার গল্পের বিষয়কে ক্রমশ ছড়িয়ে দিতে চান পাঠকের চেতনায়। হয়তো সেই কারণেই তাঁর লেখার গঠনশৈথিল্য চোখে পড়ে। কিন্তু দুজনেই যে তাদের অভিজ্ঞতায় সৎ থাকতে চেয়েছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

নবীন প্রজন্মের একজন সম্ভাবনাময় গল্পকার অনিল ঘড়াই। আলোচিত গ্রন্থ 'আগুন' তাঁর প্রকাশিত তৃতীয় গল্পগ্রন্থ। এর আগের দুটি গ্রন্থে তিনি যে সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থটি তাকে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এখানে গল্প আছে মোট নটি। প্রতিটি গল্পেই অনিল এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যেখানে তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীটি চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। সুখের বিষয়, সামাজিক বাস্তবতার যে ধারাটি বাংলা ছোট গল্পে প্রধান চালকের ভূমিকায়, অনিল তাঁর থেকে নিজেকে বিছিন্ন করেননি। সেই সূত্র ধরেই সেখানে যেমন আসে গ্রামবাংলার অবহেলিত মানুষজনের কথা, আবার নিঃসঙ্গ শহরের সেই মেয়েটি, যার পায়ের তলায় কোনো জমি নেই, তার কথাও সহজে চলে আসে। 'ক্ষুধা', 'পশু' অথবা 'আগুন' গল্পগুলিতে তাই সরাসরি উঠে আসে পাগলা দাশু, অসহায় গোবরা অথবা পুনিয়ার কথা। সর্বস্বহারা এই সব মানুষগুলো লেখকের কলমে আশ্চর্য মানবিক হয়ে ওঠে। এটাই অনিলের গল্পের মূল প্রবণতা। এই সব মানুষগুলোর প্রতি তাঁর সহানুভূতির শেষ নেই। অভিজ্ঞতায় তিনি তাদের জীবনযাপনকে যে ভাবে দেখেছেন, তাই যেন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির দৌলতে পরশপাথর হয়ে যায়। 'খন্ডিত শরীরের গন্ধ' বা 'গন্ধ' গল্প দুটি শহরের সেই চাপাপড়া মানুষের দৈনিক গ্লানিময় জীবনের কথা। এক আশ্চর্য ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগী আমরা, মূল্য বোধকে ভাসিয়ে শুধু টিঁকে থাকাই যাদের জীবনের প্রধান কথা। রিপোর্টাজের ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে 'কলকাতার বর্ষা ও আলৌকিক ঘোড়া' গল্পটি। সেখানেও তিনি যেন মূল্যবোধের ভাঙনকে তাঁর কলম দিয়েই রোধ করতে চান। এটাই অনিল ঘড়াইয়ের লেখার প্রধান শক্তি। আবার হয়তো এই কারণেই তাঁর অভিজ্ঞতাকে কিছুটা সীমাবদ্ধ মনে হয়। গল্পগ্রন্থটি পড়া হলে নিজের মনেই একধরণের অভিযোগ ওঠে, কেন অনিল শুধুমাত্র আবর্তিত হচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে? প্রবহমান এই জীবনের অন্য দিকগুলিও কেন তার গল্পে একইভাবে আসছে না? সম্ভাবনাময় একজন তরুণ লেখকের কাছে এই দাবী তো আমরা করতেই পারি।

'ঈশ্বরের 'মেষশাবক' আশিস মন্ডলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এর আগে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে তিনি এমন একজন মানুষকে মুখ্য চরিত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন, জীবনকে যে দেখে সন্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে। কালিদাস, এই যুবক, একান্নবর্তী পরিবারের ছোট ছেলে, অবিবাহিত,

কোনো কাজ করে না, কিন্তু জীবিকার জন্য তাঁর না ভাবলেও চলে। পৈত্রিক কিছু সম্পত্তির দৌলতে একটি জীবন চলে যেতে পারে। নিঃসন্দেহে চরিত্র হিশেবে নতুন। এই কালিদাসের প্রেক্ষিতে লেখক তাঁর চারপাশের জগতের লোভ, নীচতা ও ভন্ডামীকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত দাদা অথবা বৌদিদের তার প্রতি একটা সহানুভূতি আছে, কিন্তু কালিদাসকে তারা ভয় করে। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে আশে পাশের মানুষজনের ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কালিদাস অধিকাংশ বিষয়ে উদাসীন হলেও, তাঁর মধ্যে একটি মানবিক হৃদয় আছে। যে কারণেই সে অন্যের বিপদে অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে সেই বিপদগ্রস্থ মানুষটি, যিনি এতোদিন কালিদাসকে অবজ্ঞা করতেন, সেই মুহূর্ত থেকে নিজের অজ্ঞতাকে অনুভব করেন। কিন্তু এমন একজন মানুষকে সযত্নে রক্ষা করতে আমাদের সমাজ কি উপযুক্ত? তাই শেষ পর্যন্ত গুন্ডাদের হাত থেকে তরুণী শিপ্রাকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হয় কালিদাসের। মৃত্যুর বিনিময়ে সে অন্যদের নিজের সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে যায়।

এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় উপন্যাসটির সর্বাঙ্গ জুড়ে আছে। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা এমন চরিত্রের সন্ধান পাই? লেখক এখানে একটি বিচিত্র চরিত্রের প্রতিফলকে সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কখনো কখনো এই চরিত্রায়ণ প্রায় ইউটোপিয়ার পর্যায়ে চলে যায়। তবে লেখকের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের মনে রাখতেই হবে। এখানে তিনি অভিজ্ঞতার গভীরে ডুব দেয়ার বদলে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে ক্রমশ পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। এই কারনেই সম্ভবতঃ উপন্যাসটির গঠনে কিছু শৈথিল্য আছে। এবং এই শৈথিল্যকে কাটাতে তাঁর কাব্যময় ভাষা বিশেষ সাহায্য করেনি। ভাষার ঋজুতা এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করতে পারত। তবে অনিল ঘড়াই এবং আশিষ মন্ডল, দুজনেই প্রতিষ্ঠানিক ছায়ার বাইরে গিয়ে, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেই সৃষ্টি করতে চাইছেন। তাঁদের সম্ভাবনার দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতেই হবে।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

আগুন। অনিল ঘড়াই। কবিতীর্থ, কলিকাতা। ১৬ টাকা

ঈশ্বরের মেষশাবক। আশিষ মন্ডল। পরিবেশক ঃ

দে বুক স্টোর, কলিকাতা ১৮ টাকা

শ্যামলকান্তি ঘোষ

তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে সমাপ্তির পথে। যাঁরা 'পরিচয়' পত্রিকার উদ্যোক্তা, পালক, যাঁরা মেধা, প্রেম ও অস্তিত্বের একটা বড় অংশ দিয়ে ডাঁটো করে তুলেছেন কাগজটিকে, শ্যামলকান্তি ঘোষ তাঁদেরই একজন।

এই সুপ্রবীণ পরিচয়পন্থী ২১ এপ্রিলে লোকান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা অধ্যায় বস্তুত শেষ হল।

পরিচয়-এর একেবারে গোড়ার পর্ব থেকে যুক্ত শ্যামলকান্তি ছিলেন সুপণ্ডিত, অসামান্য রসবোধসম্পন্ন ও দায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'নাইরোবি থেকে রবি' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নতুন মেজাজ এনে দিয়েছিল। সুদূর আফ্রিকা থেকে দেশের মাটিতে ফিরে আসা, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভ, একটা বিশেষ কালপর্বের অভিজ্ঞতা ও চৈতন্যকে মনণ ও হৃদয় দিয়ে অনুভব করা—এসব কিছুই স্বর্ণস্বাক্ষর রেখে গেছে তাঁর ঐ আদৃত গ্রন্থটিতে।

তবে তাঁকে আমরা অর্থাৎ পরিচয় এর উত্তর পর্বের কর্মীরা বিশেষভাবে পেয়েছি পত্রিকার প্রথম আড়াই দশকের অনর্গল ভাষ্যকার হিসেবে। শ্রদ্ধেয় হিরণকুমার সান্যালের পাশাপাশি তিনি তাঁর স্মৃতির ডায়েরির ধারাবাহিক উচ্চারণের ভেতর দিয়ে রচনা করে গেছেন পরিচয়-এর অন্দরমহলের মানুষজন ও সংস্কৃতিচর্চার এমনকি ব্যক্তিগত উপলব্ধির-ও অনন্য ইতিহাস। পরিচয় এবং সহযোগী দু-একটি পত্রিকায় রহস্যমধুর অথচ আন্তরিক ভঙ্গিতে দক্ষ কথকের মত ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচয়-এর জোয়ার ভাঁটার পর্ব থেকে পর্বান্তর, রেখা চিত্র এঁকেছেন সেইসব প্রধান মনীষার, যাঁরা আমাদের বুদ্ধির শৈল্পিক চেতনার ও শুদ্ধ অনুভূতির জগতকে রাজকীয় ভাবে শাসন করেছেন। পরিচয় পত্রিকায় বছরের পর বছর প্রকাশিত তাঁর 'পরিচয়ের আড্ডা' যা অতীতকে চিরায়তের অমরতায় পাঠকদের কাছে বেঁধে রেখেছে। যে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত তিনি ও হিরণকুমার সান্যাল করেছিলেন, সেই ধারাবাহিকতাকে যদি বহতা রাখতে পারেন কোনো নতুন কালের ভগীরথ তাহলেই এঁদের কাজের যথাযথ মর্যাদা ও পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'কল্লোল'-'কালিকলম'-এর শেষ-কবি চলে গেলেন গত ৩রা মে ১৯৮৮ তে। তিনি তাঁর সঠিক জন্ম-তারিখ জানতেন না ; এমন কি সঠিক জন্ম-সাল নিয়েও সন্দেহমুক্ত ছিলেন না। তাঁর কল্লোলীয় কালের অন্তরঙ্গ বন্ধু বুদ্ধদেব বসু তাঁর জন্ম সাল ১৯০৪ উল্লেখ করেছেন An Acre of Green Grass (1948) গ্রন্থে। এই হিসেবে কবির মৃত্যু পরিণত বয়সে, সমস্ত কর্ম ও প্রাপ্তির স্বস্তির সমাপ্তিতে। এ মৃত্যু নিয়ে বেদনা থাকলেও, মহাকালের অবিচার জনিত আক্ষেপ নেই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও এত দীর্ঘজীবন লাভ করেন নি।

কল্লোলে প্রেমেন্দ্র এসেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিপর্যস্ত মূল্যবোধকে অঙ্গীকার করেই। তবু তাঁর কাব্যসাহিত্যে রুশবিপ্লবের কিছু প্রভাব এবং ম্যাক্সিম গোর্কির সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের কিছু উপাদান জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে এসে সঞ্চিত হয়েছিল। জীবনের পাঠশালায় পাঠগ্রহণের জন্য তিনি নুট হামসুনের সঙ্গে গোর্কিকেও নির্বাচন করেছিলেন এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-কথিত 'ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার' মধ্যে নিজের মত করে একটি সামঞ্জস্য স্থাপনেরও চেষ্ঠা করেছিলেন। তাই বুদ্ধদেবের মত সবেগে এ-কথা তিনি ঘোষণা করেন নি যে, যৌবনের সর্বোত্তম সার্থকতা শুধু 'উপবাসী শৃঙ্গার কামনা' এবং 'রমণী-রমণ রণে' নিত্য পরাজয় ভিক্ষার মধ্যেই অথবা গল্প-সাহিত্যে বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে নরনারীকে সমর্পন করে ফ্রয়েডীয় যৌনবিকলনতত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক চর্চা করেই নিজেকে নিঃশেষিত করেন নি তিনি ; বরং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের পর তাঁর কবি-কণ্ঠেই আমরা সেই সাহসী কথা শুনেছি যেখানে তিনি নিজেকে ব্রাত্যজনের কবি মুটে মজুর ইতরের ভাষ্যকার বলে ঘোষণা করেছেন। এরই সম্প্রসারিত সূত্রে পরবর্তীকালে তিনি অ্যামেরিকার মানবতাবাদী প্রগতিশীল কবি হুইটম্যানের কবিতার অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন।

শ্রেণীসংগ্রাম বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল না নিশ্চয়ই—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক রূপে তিনি পেয়েছিলেন এক বিশিষ্ট মানবতা-বোধ, এবং সেই বোধের গভীরে নিয়তই উচ্চারিত হয়েছে নির্যাতিত মানুষের জন্য কিছু আক্ষেপ, কিছু বেদনা, কিছু-বা ক্ষুব্ধ

প্রতিবাদও। এই কারণেই কল্লোলের অন্যান্য কবির মত উগ্র বিরোধিতা দিয়ে তিনি তাঁর কবিজীবন শুরু করেন নি, 'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর/আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো/যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে'; বরং সারা জীবনই তিনি, সেই 'প্রথমা' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে 'সম্রাট' 'ফেরারি ফৌজ' 'সাগর থেকে ফেরা' 'হরিণ চিতা চিল' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে অন্তঃসঞ্চারী রেখেছেন তাঁর মগ্নচেতন্যে এবং এই কারণেই নানা অস্থিরতা, অবক্ষয় ভ্রষ্টতা ও ইতস্তত পদচারণা সত্ত্বেও সামাজিক শুভ, মঙ্গল ও কল্যাণের আদর্শ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কখনোই ছিন্নমূল হন নি। তাই হুইটম্যানের সঙ্গেও মনের গাঁটছড়া বাঁধা পড়েছিল তাঁর অনায়াসেই।

যৌবনের প্রারম্ভেই ঢাকা থেকে একটি চিঠিতে তিনি বন্ধু অচিন্ত্যকুমারকে লিখেছিলেন, 'মানুষের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস? সেই আদিম পাশব ক্ষুধা—হিংসা, বিষ আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পশু ওৎ পেতে আছে।" কিন্তু এই মানব-বিরোধী অবিশ্বাসী আত্মদর্শন প্রেমেন্দ্রের সত্যকারের রূপ নয়, এ তাঁর ক্লিষ্ট আর্ত বহির্সত্তার ক্ষণিক উদ্‌ভ্রান্তি। পরের চিঠিতেই প্রেমেন্দ্র তাই প্রসন্ন আনন্দে উন্মুখ হয়ে উঠেছে প্রাপ্তির প্রাচুর্যে—'খোঁড়া হয়ে জন্মাই নি, অন্ধ হয়ে জন্মাই নি, বিকৃত হয়ে জন্মাই নি—মার কোল পেলাম, বন্ধুর বুক পেলাম, নারীর হৃদয় পেলাম, তা যতটুকু কালের জন্যই হোক না—আকাশ দেখেছি, সাগরের সঙ্গীত শুনেছি, আমার চোখের সামনে ঋতুর মিছিল গেছে বার বার, অন্ধকারে তারা ফুটেছে, ঝড় হেঁকে গেছে, বৃষ্টি পড়েছে, চিকুর খেলেছে,—কত লীলা, কত রহস্য, কত বিস্ময়! তবে জীবনদেবতাকে কেন না প্রণাম করব ভাই। কেন না বলব ধন্য আমি, নমো নমো হে জীবনদেবতা।"

জীবনের প্রতি এই আসক্ত অস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং তারই নৈরাশ্যিক পরিণাম জীবনের অপচয় ও অবক্ষয়ে বেদনাবোধ প্রেমেন্দ্র-কাব্যের মূল সুর তাঁর কথাসাহিত্যের। তাঁর উপন্যাস 'মিছিল' ও 'পাঁক' গল্পগ্রন্থ 'বেনামীবন্দর' 'পুতুল ও প্রতিমা' 'মৃত্তিকা' 'ধূলিধূসর' ও 'মহানগর' কল্পনা-বিলাসের বাষ্পজড়িত রচনা নয়! অনেক পরিমাণেই নিরাবেগ, বুদ্ধিদীপ্ত, বাস্তবের খর রৌদ্রের কিরণসম্পাতে শুষ্ক ও দগ্ধ অথচ অন্তঃস্রোতা মানবীয় রসে মমতা-সমৃদ্ধ রচনা। যৌন-বিকৃতির অন্তরালেও সেখানে কাজ করেছে সুস্থ

জীবন-জিজ্ঞাসা, তাঁর সমাজ-সমালোচনা। ফলে কল্লোলীয়-ধারা থেকে স্বভাবেই কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র হয়ে গেছেন প্রেমেন্দ্র। বিশেষতঃ ছোটগল্পে অর্জন করেছেন সে-সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঈর্ষণীয় সাফল্য।

ঐতিহ্যলগ্ন সুস্থ জীবনের শিকড়াশ্রয়ী মনোভঙ্গির জন্যই উৎকেন্দ্রিকতার এই নষ্ট প্রতিবেশে যথেষ্ট আধুনিক বলে বিবেচিত হন নি প্রেমেন্দ্র। আধুনিক কাব্যের অনেক শিষ্ট আলোচক সযত্নে বর্জন করেছেন তাঁকে তাঁদের মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থ থেকে। অথচ এ নির্বাসন কবির প্রাপ্য ছিল না। অন্যদিকে প্রেমেন্দ্রের সহযাত্রী বন্ধু বুদ্ধদেব কবিতাকে নিরবলম্ব আকাশের ফুল ভেবে এবং কবির সমাজজিজ্ঞাসা ও হিউম্যানিজমকে অবান্তর সাব্যস্ত করে ঈষৎ কঠোরভাবেই কটাক্ষ করেছেন যুগপৎ প্রেমেন্দ্র ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে একত্রে জড়িয়ে—'Premendra once Permitted himself to declare that he was a poet of the 'coolie and the lowly' and Subhas burst upon us with the avowal that he had cast his lot with 'workers and Peasants'; This has been unfortunate, for this has inposed official robes on their two robes differing slightly in colour, but eventually eclipsing".

প্রেমেন্দ্রর যেখানে শক্তির উৎস সেই মানবিক জীবনবোধের দুর্গেই সুকৌশলে আঘাত চেয়েছেন বুদ্ধদেব! আবার সুভাষের সঙ্গে একই বন্ধনীভুক্ত করে প্রকারান্তরে এটাও প্রমাণ করেছেন যে, দুই কবি (দুস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও) কোথাও একটা বিশ্বাসের ভূমি খুঁজে পেয়েছেন যা কল্লোলীয় কোলাহলের সমগোত্রীয় নয়।

প্রেমেন্দ্র-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে আরো স্মরণ করি যে, মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে গঠিত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক সংগঠন 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (১৯৩৬) -এর বঙ্গীয় শাখার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন তিনি অন্তর-তাগিদ থেকেই। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'প্রগতি' নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁরও রচনা স্থান পেয়েছিল। এই সংগঠনের বার্ষিক সভাগুলিতেও নিয়মিত উপস্থিত থেকেছেন তিনি, আলোচনায় অংশও নিয়েছেন। ১৯৪২ সালে সোমেন চন্দের হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্ত-বর্বরতার পরিবেশে বাংলাদেশে গঠিত হয়েছিল 'ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। প্রেমেন্দ্রকে পাওয়া গেছে সেখানেও।

১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত ঐ সংঘের রাজ্য সম্মেলনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এই সম্মেলন থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সভাপতি এবং গোলাম কুদ্দুস ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে যুগ্ম সম্পাদক করে সংঘের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছিল। স্মরণযোগ্য যে, এই বছরই বহু প্রতিষ্ঠিত কবি-শিল্পী 'ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' পরিত্যাগ করে প্রগতি-বিরোধী বিকল্প-শিবির 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' গড়ে তোলেন। এর সভাপতি হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সহ-সভাপতি ও অন্যান্য পদে থাকেন প্রিয়রঞ্জন সেন, হুমায়ুন কবীর, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বাধীনতা পূর্বকালে তাতে যোগ দেন নি। পূর্বোক্ত সম্মেলনের সভাপতি রূপে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের মধ্য থেকে মানবতার সেই ঘোর-দুর্দিনে তিনি বলেছিলেন, "অন্য সাহিত্য সভাগুলির তুলনায় এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সাহিত্যকরা জনগণের সম্পর্কে আসেন, দেশের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হন, তাঁদের কি কর্তব্য, তাঁরা কি দিতে পারেন তা জেনে যান। এইজন্য তিনিও এই সভায় এসেছেন। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্নভাবে মাথা তুলেছে, শিল্পীরাও বাধা দিয়েছে। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীর স্বধর্ম।..." ['জনযুদ্ধ' পত্রিকার রিপোর্ট থেকে, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৪৪]।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানেই মহৎ শিল্পী। তাঁর পরিণত প্রয়াণেও আমরা তাই শোকতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

তপোবিজয় ঘোষ

PARICHAYA APRIL 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩৯/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

সম্পাদনা দপ্তর ॥ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা:৭০০ ০০৭

দাম : তিন টাকা

চিন্মোহন সেহানবীশ স্মরণ সংখ্যা

পরিচয়

ক্রোড়পত্র ঃ সমর সেন
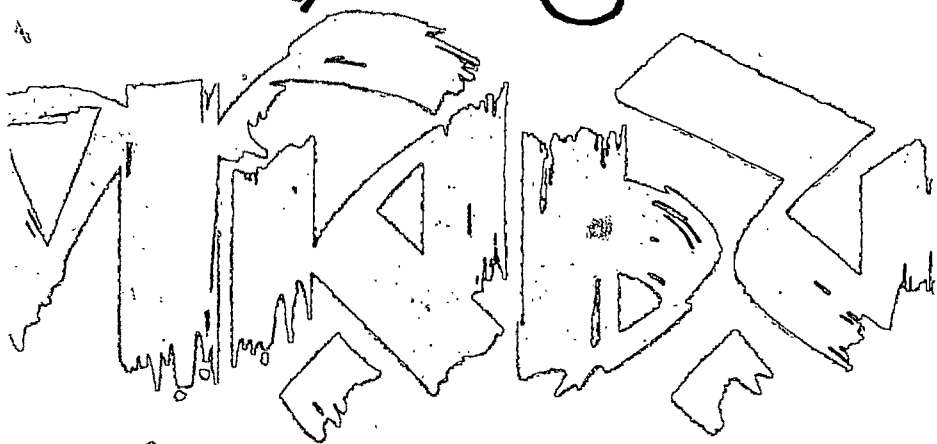
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের নতুন

সংবিধান

বরিস তোপোরনিন

অনুবাদক : নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

দাম : ২০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় / ৪-৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

খাপছাড়া

'সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে'
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।'

ছড়াজাতীয় নানা ছন্দে রচিত সরস কবিতাগুলি সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য—কতকগুলি কবিতার রস ছোটো ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি সম্ভোগ করতে না পারলেও সেগুলির ধ্বনি তাদেরও আনন্দ দেবে।

প্রতিটি কবিতার সঙ্গে কবি-অঙ্কিত শতাধিক স্কেচ এবং রঙিন চিত্রের রস সকলেই উপভোগ করতে পারবেন। মূল্য ৫০·০০ টাকা

প্রহাসিনী

জীবনটা যখন (১৩৪৫) কখনো গভীর অধ্যাত্ম ভাবে সমাহিত কিংবা বিদায়ের করুণ রসে সিক্ত তখনই "মাঝে মাঝে এসে পড়ে ক্ষ্যাপা ধূমকেতু।" তার পর "ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।"

প্রহাসিনীর কবিতাগুলি সেই নির্মল কৌতুকের বিদ্যুচ্ছটায় উদ্ভাসিত। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, ভিন্ন রসের কবিতা সংকলন। মূল্য ১৬·০০ টাকা

রাজা ও রানী

রবীন্দ্ররচনার কবিকৃত পাঠ-সংস্কারের আনুপূর্বিক ইতিহাস পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে বিধৃত। রাজা ও রানী বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ ছাড়া পরিশিষ্টে নাটকটির সংক্ষেপীকৃত পাঠ 'ভৈরবের বলি'র নাট্যরূপান্তরের বিবরণ সংবলিত। পাঠান্তর-সংকলন সম্পাদন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কৃত। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ও রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-সংবলিত। মূল্য ২০·০০ টাকা

চিত্রাঙ্গদা

পাঠপঞ্জীকৃত ও পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প দ্বারা পরিকল্পিত পাঠান্তর-সংবলিত গ্রন্থমালার এটি পঞ্চম গ্রন্থ। বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ে 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরেজি ভাষান্তর। Chitra-রচনাকালীন পরিবর্তনের তালিকা সংযোজিত।

ড. অশ্রুকুমার শিকদার কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত ও শোভন প্রচ্ছদে মণ্ডিত। মূল্য ২৫·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয়: ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র: ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন

বহু জাতি, সম্প্রদায় ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত দেশ। আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবার জন্য নানা বিভেদকামী শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সুতরাং জাতিগত ভাষা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক সমস্যা এবং বৈষম্য তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোগের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এই সকল সমস্যা যাতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করে সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক

কবিগুরুর ১২৭তম জন্মদিনে
হাওড়া পুরসভার শ্রদ্ধার্ঘ

পঁচিশে বৈশাখ

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

—রবীন্দ্রনাথ

(ভারতবর্ষের ইতিহাস : ১৩০৯)

আই সি এ ২০৭৪/৮৮

চিন্মোহন সেহানবীশ : ইতিহাসের আলো-আঁধারে

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

১৯২৮ সাল। রাণীগঞ্জ স্কুলে পড়ি তখন। বলা হল আমাকে সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে একটা রচনা লিখতে। অর্থাৎ ওরা আমাদের অতিথি—ওদের অভ্যর্থনা করাটা যুক্তিযুক্ত—এটা হবে আমার রচনার মেজাজ। কিন্তু ঘটল উল্টো। এবং তারই সাথে আমার রাজনীতিতে হাতে খড়ি। সাইমন কমিশন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে পড়লাম নানা পত্র পত্রিকা—দেখলাম সব কাগজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আমাদের দেশ—তার ভালমন্দ আমরা বুঝবো—তোমরা কে? অতএব রচনা তো লিখলাম না; উল্টে ৩ রা ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটে অংশ নিলাম। শুধু মাস্টারদের অনুরোধে পিকেটটা বাদ দিলাম।

চিনুদা বলছেন আর আমি শুনছি। জীবনের গোধুলি বেলায় তিনি স্মরণ করছিলেন তাঁর কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি। এবং সে সূত্রে উন্মোচিত বহু ঘটনায় সমৃদ্ধ ও অসংখ্য মানুষের কলরবে মুখরিত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক-একটি পর্ব। প্রসঙ্গত চিনুদার বলার গুণে মনে হচ্ছিল ঘটনাগুলি সবেমাত্র কালই ঘটেছে। সে এক অভিজ্ঞতা। চিনুদা যদি আত্ম-জীবনী লিখে যেতেন, তা হত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ। কারণ তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বাঁকের সঙ্গে ওতপ্রোত স্বদেশ ও কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের এক

একটি অধ্যায়। তাই এই নিবন্ধটি একই সঙ্গে চিনুদা ও আরো অনেকের কাহিনী।

চিনুদা বলে চলেছেন : জাতপাতের সমস্যা অনেক আগেই চুকে গেছে। পিতামহ বিপিনমোহন সেহানবীশ রংপুরের তুষভাণ্ডারের ফিউডাল পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ম্যাও সে তুং-এর ভাষায় আমার সামন্ততান্ত্রিক লেজ আগেই খসে পড়েছে। স্কুলে পড়ার সময় মা শিখিয়েছিলেন—তুমি মানুষ—তুমি ভারতবাসী। এছাড়া তোমার আর কোন পরিচয় নেই। আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাব-পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছি। কাজেই অন্যদের বেলায় যেসব জিনিস ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্যে লড়াই করতে হয়—আমার বেলায় তা করতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথই পরিচয় করালেন রাশিয়ার সাথে। ১৯৩০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' বেরুতে থাকে প্রবাসীতে চিঠির আকারে। 'মডার্ন রিভিয়ু'তে তার তর্জমা বেরুত ইংরেজিতে। সেটা অচিরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তিনবন্ধু মিলে 'রাশিয়ার চিঠি'-কে ভিত্তি করে পাঠচক্রের আয়োজন করেছিলুম।

ক্রমশ আবর্তে জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। তিন দিক থেকে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছেন। দেশের চালমান রাজনীতির তিনটি তরঙ্গ সমানে তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছে।

তিনি বলছেন : মামা যদিও ডেপুটি মেজিস্ট্রেট তবুও বাড়িতে চরখা ঘুরছে সমানে। সুতোকেটে সেই সুতো খাদি প্রতিষ্ঠানে জমা দিতুম। মাপও জানতাম, কতখানি সুতোয় একটা জামা বা কাপড় হতে পারে।

ভাই অজয় ঘোষ, ভগত সিং-এর সহকর্মী—ধরা পড়ে গেছে। সুতরাং ঘটনাটা আমায় প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে।

আবার ১৯২৮-এর ৩০শে ডিসেম্বর—যেদিন দশ টাকার টিকিট কেটে পার্কসার্কাসের কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে ঢুকি—ঠিক সে সময় ঢুকছে বঙ্কিমবাবু-রাধারমণ, জটাধারী বাবার নেতৃত্বে বিরাট শ্রমিক মিছিল। সেই মিছিলের ধাক্কায় আমি একেবারে ডায়াসের কাছে চলে গেলাম।

তারই সঙ্গে মনে পড়ে এক বৃহত্তম শোভাযাত্রার কথা। ১৯২৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। যতীন দাসের মরদেহ কলকাতায় এল। বড় বড় নেতাদের সামনে রেখে সেদিন হাজার হাজার তরুণ রাজপথে নেমেছিল।

তেমনি এক স্মরণীয় সভার কথা মনে পড়ে। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে হিজলী জেলে গুলি চালনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের সভা। মনুমেণ্টের

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ। ফর্শা রঙ সেদিন জ্বরে লাল। একটা খবরের কাগজ নিয়ে জে. এম সেনগুপ্ত তাঁকে হাওয়া করছিলেন।

নানা ঘটনা দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ১৯৩০ সাল সমস্ত গৌরবচ্ছটা নিয়ে চিন্মোহনের সামনে উদ্ভাসিত।

তিনি বলছেন : কাগজে বেরুচ্ছে গান্ধিজির ডাণ্ডি অভিযানের খবর। আজ এত মাইল এলেন—কাল এত মাইল যাবেন।

আবার বোনের বিয়েতে মিহিজাম যাচ্ছি, ট্রেনে কাগজ পড়লাম—লেখা ধন্য চট্টগ্রাম। ৩০শে এপ্রিল চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা অস্ত্রগার দখল করেছে। আমার মামার বাড়ি চট্টগ্রাম। আমায় প্রবলভাবে নাড়া দিল ঘটনাটা। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতাদের নাম আমার শোনা বড়দের মুখ থেকে।

আমার চোখে এই তিন ধারার ফারাকটা বড় নয়—বড় এদের ঐক্য। একই লক্ষ্যের দিকে যে এই তিনটি স্রোতই ধেয়ে চলেছে। আমারটা তাই typical case।

ইতিমধ্যে ভগত সিং-এর ফাঁসি হয়ে গেছে। গান্ধিজি ফাঁসি রদ করতে পারলেন না। করাচি কংগ্রেসে নওজোয়ানরা গান্ধিজিকে কাল পতাকা দেখাল। চিন্মোহনের সমর্থন নওজোয়ানদের দিকে। একটা লেখাও তাঁর চোখে পড়ল—প্রবাসী-র পাতায়। গোপাল হালদারের লেখা—'নওজোয়ানের রাষ্ট্র চাই'। পুরানো ধ্যানধারণা দিয়ে হবেনা—নওজোয়ানদের পথ নতুন পথ। সে পথে যেতে হবে। লেখাটায় সাম্যবাদী চিন্তা অস্ফুট আকারে উঁকি দিচ্ছে। এটা তাঁরও চিন্তা।

তাঁর চোখের সামনে ঘটল ঐতিহাসিক গাড়োয়ান ধর্মঘট। পাঁচজন গাড়োয়ান মারা গেল। নেতাদের মধ্যে চিনলেন শুধু বঙ্কিম মুখার্জীকে। তাঁর মনে হল—যাক শুধু রাশিয়ায় নয়, এদেশেও হচ্ছে কিছু। কিন্তু মনে তাঁর সংশয়ের খোঁচা। কে কমিউনিস্ট? এম. এন. রায়! সৌম্যেন ঠাকুর! অথবা লাহিড়ী মুজ্জাফ্ফর আমেদ।

চিনুদা বলছেন : এসময় এক অসাধারণ লোকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটে। তখন সেণ্টপলস্ কলেজের হোষ্টেলে থাকতাম। সেখানে দেখা ক্রিস্টোফার আর্করয়েড নামে একজন মিশনারি সাহেবের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে প্রথম পড়ি মার্কসের বই Wage Labour Capital আর Price and Profit। আর্করয়েড সাহেব আবার পাশ্চাত্য সঙ্গীতও ভাল বুঝতেন। এদিকে বিষ্ণু দে এবং ধূর্জটীপ্রসাদও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুগামী। তাঁদেরো

আর্করয়েডের কাছে যাওয়া আসা ছিল। আর্করয়েডের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি যখন 'Red Clergyman' প্রবন্ধটা লিখি—লেখাটার সূত্রে তখন বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আর্করয়েড সাহেব আমায় পথ দেখালেন। হ্যাঁ, এম এন রায়ের নাম আছে বটে। সৌম্যেন ঠাকুরের আছে গ্র্যামার। তবে যদি কাজ করতে চাও—তাহলে লাহিড়ী মুজাফ্ফরের কাছে যাও।

১৯৩৪ সালে এলাহবাদ হয়ে কানপুর গেলাম। উপলক্ষ একটা বিয়ে। অজয় তখন ছাড়া পেয়েছে। সেখানে অজয়ের বোন প্রতিমা ঘোষ (যাকে প্রথম মেয়ে মার্কসিষ্ট বলা চলে) আমাকে এভরিম্যান নিউ সিরিজের মার্কসের ক্যাপিটেল বইখানা পড়তে দিল। অজয়ের সঙ্গে সারারাত কথা বললাম। ফেরার সময় অজয় দিল লাহিড়ীকে দেবার জন্যে একটা চিঠি। আরো বলল, চিঠিটা সাবধানে নিয়ে যেতে হবে। ঠিকই বলেছিল। পথেই আমার বাক্স প্যাটরা পুলিশ সার্চ করল। কিন্তু চিঠি খোয়া যায়নি—যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। এটাই আমার জীবনে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির কাজ।

চিনুদা বলছেন: ১৯৩৭ সালে হালিম আমায় পার্টিসভ্য হতে বলেন। কিন্তু আমি ইতস্তত করি পরিবারের মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু হালিম বলেন, ইতিমধ্যে যা করেছেন—তাতেও যথেষ্ট ধরা পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাহলেও সভ্যপদ নিই আমি ১৯৩৯ সালে। বিলেত ফেরত কমিউনিস্টরাও ঐ বছর আমার বাড়িতেই প্রথম জড়ো হয়—জ্যোতি বোস, ভূপেশ গুপ্ত, নিখিল চক্রবর্তী, মনি বিশ্বাস ও সুব্রত নাগ।

চিনুদার মতে ১৯৩৬ সাল একটি স্মরণীয় বছর। আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ—কিছুদিন নৈরাশ্য। কিন্তু সেই নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দেশের মানুষ আবার জেগে উঠেছে। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে নেহরু সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্য হাজির করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সপক্ষে আর দেশের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি সমর্থন জানালেন নেহরু। কংগ্রেসকে চাঙা করার জন্যে Collective affiliation-এর কথাও তিনি বললেন।

আবার ঐবছরই গঠিত হয় নিখিল ভারত কৃষক সভা, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেসন ও প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন। কমিউনিস্টরা উদ্যোগী ভূমিকা নিল সংগঠনগুলিতে। কিন্তু কমিউনিস্টদের আওতার বাইরে রয়ে গেল দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন। সেটা সর্দার প্যাটেল ও তার চেলাদের হাতে চলে গেল।

চিনুদা বলছেন : ১৯৩৭ সালে গঠিত হয় কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। সে-সব জায়গায় পার্টি আধা প্রকাশ্যে কাজ করতে থাকে। বাংলাদেশে তা হলনা। কংগ্রেসের জমিদার নেতারা—তুলসী গোঁসাই ও কিরণশংকর ইত্যাদি ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশন করল না। কারণ তারা জমিদারি প্রথা বিলোপ চায়না।

১৯৩৮ সনে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ বোস উল্লেখ করেন। সে-সময় আমাদের সমস্ত সত্তা জুড়ে রয়েছে স্পেন। আমরা রালফক্স, কর্নফোর্থ ও কডওয়েলের আত্মদানের খবরে একেবারে অভিভূত। আনন্দবাজার পত্রিকার রোববারের পাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এক বছরের জন্যে। স্বয়ং সত্যেন মজুমদার হচ্ছেন কাগজের সম্পাদক —তাঁকে ঘিরে অরুণ মিত্র, সুকুমার মিত্র, নৃপেন চক্রবর্তী, বিজন ভট্টচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টচার্য আর বিনয় ঘোষ। এঁরা সবাই রোববারের পাতায় লিখতেন। তাঁদের নাম দিয়েছিলুম আমরা 'অনামী চক্র'। সে-সময় কংগ্রেসের মধ্যেও নতুন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয় এবং চিনে পাঠান হয় মেডিকেল মিশন। পার্টির-ও legal কাগজ বেরুল—মামুদ জাফর, ভরদ্বাজ আর যোশীর সম্পাদনায় 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'। তার শিরোনামায় লেখা হল : 'Communists greet Haripura Congress', 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর পাতায় যোশী আর জে, পি-র যৌথ বিবৃতিও প্রকাশিত হয়।

এদিকে আমরা কজনে মিলে 'অগ্রণী' বার করেছি। মাসিক পত্রিকাটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আমি ছাড়া দেবকুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল রায় ও বীরেন মজুমদার। তখন দুটো বই আমাদের সবাইকে নাড়া দিয়েছিল—রোমাঁ রোলাঁর I will not rest' এবং বার্ণালের 'Social functions of Science'। 'অগ্রণী' বই দুখানকে সামনে তুলে ধরে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমাদের তখন কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। 'পরিচয়'-এর পাতায় আব্দুল ওদুদের 'পথ ও পাথেয়' বইখানা রিভিয়ু করলাম। এসময়ে সরোজ দত্তের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। তাছাড়া এলেন পল্টু চ্যাটার্জী ও কাটু বোস—এরা সব আমার বন্ধু। এরাও লিখত। কডওয়েলের আত্মদানে অভিভূত সরোজ দত্ত লিখল, 'অসি ও মসী' নামে কবিতা। সমর সেনের 'In defence of decadence' লেখাটাকে সরোজ দত্ত তীব্র সমালোচনা করল। বুদ্ধদেবকেও ছেড়ে কথা বলল না—যদিও ১৯৩৭ সালে 'প্রগতি লেখক সংঘের' সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন

সুধীন দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। সরোজ দত্ত বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ্য করে 'অগ্রণীতে' লিখলেন : বৃহন্নলা ছিন্ন কর ছদ্মবেশ।

চিনুদা বলছেন : ১৯৩৯— যুদ্ধ লাগল। যুদ্ধের আগে যুদ্ধবিরোধী প্রচার সহজ। কিন্তু যুদ্ধের সময় অনায়াস সাধ্য নয়। 'অগ্রণী' বেরুল—'সম্পাদকীয়' জায়গাটা ক্রস চিহ্ন দেওয়া ফাঁকা। দুমাস পর 'অগ্রণী' উঠে গেল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ১৯৩৯-এর ২রা অক্টোবর বোম্বের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। বিশ্বের প্রথম যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘটে ৯০ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। সেসময়ের শ্লোগান

ইয়ে লড়াই সাম্রাটশাহী
হাম না দেঙ্গে এক পাই
না এক পাই—না এক ভাই।

কংগ্রেস তখন দ্বিধাগ্রস্ত। কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে উঠল যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের বর্শাফলক। আমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার। এটা খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। তারপর এল ১৯৪১-এর ২২শে জুন। সোভিয়েত আক্রান্ত হলে, পলিট ব্যুরোর বিবৃতি বেরুল—লালফৌজ নাৎসী বাহিনীর চেয়ে শতকরা দুশ ভাগ শক্তিশালী। অতএব চিন্তার কিছু নেই। এম এন রায়-এর আগেই যুদ্ধকে সমর্থন করার লাইনে চলে গেছেন। নেহরুও বলছেন—নতুন করে ভাবতে হবে। রুশ রণাঙ্গনের খবরাখবর দেখে আমরাও দম মেরে গেছি। জার্মানবাহিনী যে একেবারে লেনিনগ্রাদের দরজায়! নিশ্চিন্ত হই কি করে? ৭ই ডিসেম্বর ঘটল পার্ল হার্বার। নেহরু আবার বললেন—যেখানে রাশিয়া আর চিন জড়িত—সে-যুদ্ধে আমরা উদাসীন থাকতে পারিনা। এদিকে জেলের কমরেডরা furiously আলোচনা করছে। অজয়, ডাঙ্গে ও বি-টি জেল থেকে চিঠি পাঠাল। যোশী-অধিকারী আলোচনার জন্যে র‍্যাঙ্কের কাছে release করে দিল। সমস্ত ভাষায় চিঠিখানি অনুবাদ করে সমস্ত কমরেডকে আলোচনায় টানার ব্যবস্থা হয়। দশ দিনের মধ্যে আলোচনা করে মতামত দিতে হবে। তখন বোধ হয় পার্টির সদস্য সংখ্যা বার হাজার। আমাদের ইউনিট জেল দলিলের পক্ষে ঝুঁকল।

১৯৪১ এর ডিসেম্বরে সি, সি সিদ্ধান্তে পৌছুল—এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। কিন্তু কথাটা বলব কি করে? ঠিক হল প্রথমে পাটনায় A, I, S, F Conference-এ বলা হবে। হীরেন মুখার্জী আর ইফতিকার ছাত্র সম্মেলনে পার্টির নতুন লাইনে বক্তৃতা করলেন।

১৯৪২ এর জানুয়ারি থেকে আমরা উজানে চলতে লাগলাম। কংগ্রেস ও লীগের পর তৃতীয় শক্তি আমরা—অথচ হয়ে গেলাম অপাঙক্তেয়। চরম প্রতিকূল অবস্থায় পার্টি কিন্তু totally united। বাইরে isolated অথচ পার্টি united। পার্টি কমরেডদের মা বাবা ও পরিবারের লোকজনদেরো পার্টি দরদীতে পরিণত করার কৃতিত্ব একমাত্র যোশীর। শীত আসছে। পার্টির অভাবী কমরেডদের জন্যে যোশী পুলওভার বানাবার ভার দিল বাবলি মাসী, সুব্রতর মা আর রেণুর মাকে। তারাও খুশি, তারাও পার্টির কাজ করছে। এভাবে পার্টিকে expand করার outlook যোশীর পর আর কেউ দেখায়নি :

চিনুদার মতে 'জনযুদ্ধের' পর্বে পার্টির দুটো বড় ভুল :

ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের basic Stand crrect। কিন্তু সুভাষ বোসকে নিয়ে কার্টুন ইত্যাদি আঁকা গুরুতর ভুল।

দ্বিতীয়ত আগস্ট আন্দোলনকে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন বলাটা একটা major mistake। It was never a fascist movement—এটা nationalist movement। এই ইস্যুতে ননীগোপাল মুখার্জী, উদয়ভানু ঘোষ ও রবি মিশ্র পার্টি ছেড়ে দিল। পরে তারা আবার পার্টিতে ফিরে আসে।

চিনুদার ভাষায়, সেসময় আমরা প্রায় No Stinke—No Struggle-এর লাইনে চলে গেলাম। স্টালিন-গ্রাদের যুদ্ধের পর যখন গোটা মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল—তখন আমাদের লাইন অন্যরকম হওয়া উচিৎ ছিল। একে তো Peoplis war line তারপর আবার পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার—Congress minded people এর সঙ্গে পার্টির দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে গেল।

চিনুদার জিজ্ঞাসা : Post war period-এ আমাদের চেয়ে better কেউ কিছু করেছে কি? বোম্বাইয়ের নৌ বিদ্রোহ, পুন্নাপ্রা-ভায়ালার, দেশীয় রাজ্যের প্রজা বিদ্রোহ—সর্বত্র আমরা। আমাদের একঘরে করে রাখার চেষ্টা তার ফলে ব্যর্থ। ২৯শে জুলাইয়ের কলকাতা দেখে মনে হল আমরা power-এর কাছে পৌঁছে গেছি।

কিন্তু দাঙ্গা আমাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটাল। We were taken by Surprise—কত quickly যে কলকাতার মানুষ Communal হয়ে যেতে পারে! আমাদের ধারণা ছিল যে Hindu middle class nationalist—কিন্তু Communalism তাকে Sway করে নিয়ে গেল। Practically আমরা কাউকে বাঁচাতে পারলাম না। সামান্য যেটুকু চেষ্টা হয়েছিল—তা

করেছিল কমিউনিস্ট আর gennine গান্ধিপন্থীর। তবুও আমরা কজন—আমি সুধীর বোস আর ফণী দত্ত মিলে পাগলের মত এক খোলা সিডানে চড়ে—হিন্দু মুসলমান এক হও বলে রাজাবাজার পর্যন্ত গিয়েছিলুম। গাড়িতে ছিল কংগ্রেস আর লিগের পতাকা। স্নেহাংশু তখন মিলিটারি পোষাকে রিভলবার হাতে rescue করতে বেরিয়েছিল। স্নেহাংশু আমাদের দেখে বলল—আপনারা কি পাগল? আপনারা যে খুন হয়ে যাবেন।

কলকাতা কার্যত হিন্দুস্থান পাকিস্তানে বিভক্ত। এই অবস্থা চলল পাক্কা এক বছর। চিনুদা বলছেন: ১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্ট শোনা গেল রায়ট নাকি থেমে গেছে। সত্যি কিনা যাচাই করার জন্যে আমি আর সরোজ দত্ত পাগলের মতো পায়ে হেঁটে সারা কলকাতা ঘুরেছি। প্রথমে ভয় করছিল—পরে ভয় উড়ে গিয়ে এল স্বস্তি—এক অদ্ভুত আনন্দ। হাঁটতে হাঁটতে এলাম রাজাবাজারের কাছাকাছি। একদিকে গড়পাড়—বিষ্টু ঘোষের আখড়া—হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের দুর্গ। অপরদিকে রাজাবাজার মুসলমান গুণ্ডা অধ্যুষিত সাংঘাতিক জায়গা, গিয়ে দেখি দুপক্ষই তোরণ বানাচ্ছে। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান দুটি ডোমিনিয়নের জন্ম হচ্ছে। মাঝখানে খানিকটা জায়গা—No man's land দুপক্ষেই বোমা নিয়ে সতর্ক সশস্ত্র। এক মনে তারা কাজ করে চলেছে। হঠাৎ রাজাবাজারের দিক থেকে এক মুসলমান ছেলে No man's land-এর এদিকে ক্রমে চেঁচিয়ে বলল—একটা হাতুড়ি দিতে পারেন? আমাদের একটা হাতুড়ি দরকার। গড়পাড়ের দিক থেকে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল—এই নিন হাতুড়ি। হাতুড়িটা ছুঁড়ে দিল।

মুহূর্তে উবে গেল সব ভয় সন্দেহ অবিশ্বাস। যে বোমা তারা একে অপরকে মারবার জন্যে এসেছিল—সেসব ফাটিয়ে তারা celebrate করল। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে হিন্দু মুসলমান মিলে কলকাতা আবার হেসে উঠল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল এবং তারই সঙ্গে সমাপ্ত চিন্মোহন সেহানবীশের রাজনৈতিক জীবনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

যেরকম দেখেছি

সন্ধ্যা দে

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক প্রবাদপুরুষ চিন্মোহন সেহানবীশ। বহুদিন ধরে বিভিন্ন গুণীজনের মুখে তাঁর সম্পর্কে নানা কথা শুনেছি। দূর থেকে এই কিংবদন্তী-প্রতিম মানুষটিকে দু-একবার দেখারও সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর জীবনের একেবারে পড়ন্তবেলায় একান্ত নিজের প্রয়োজনে যখন বেশ কয়েকবার তাঁর মুখোমুখি হলাম তখনই তাঁর সত্য পরিচয় আমাকে সম্পূর্ণ আপ্লুত করে দিল।

আমি গ্রুপ থিয়েটার নাট্য আন্দোলনের একজন নগণ্য পদাতিক। এই আন্দোলন সম্পর্কে সামান্য কিছু গবেষণা করার চেষ্টা করছি। সেই উপলক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে গণনাট্য আন্দোলনের প্রসঙ্গ। চল্লিশের প্রগতি আন্দোলনের বেগবান প্রবাহকে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছিলেন, চিনুদা-তো তাঁদেরই একজন। ফলে তাঁকে বাদ দিয়ে সেই পর্বের কথা লেখা অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়।

১৯৮৭-র ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম চিনুদার বাড়িতে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে যাই। আমার মত একজন নগণ্য ও অপরিচিত মেয়েকে তিনি যে ভাবে সেদিন সম্ভাষণ করেছিলেন তা আমার কাছে আজও এক দুর্লভ মর্যাদার সামগ্রী হয়ে আছে। সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, শালীনতার আর এক নামই পৌরুষ।

অন্তত বার তিরিশ আমি চিনুদা-কে সাক্ষাৎকারে পেয়েছি। তিনি তখন খুবই অসুস্থ, মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে পড়েন। আমার এই ধারাবাহিক সাক্ষাৎ গ্রহণে চিনুদা-র একমাত্র উত্তর ছিল অমলিন হাসি ও বিপুল প্রশ্রয়। উমাদি কখনো কখনো আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতেন। আমার ক্ষোভ হত। কিন্তু মাত্র তিনমাসের মধ্যে চিনুদা চলে যাওয়ায় প্রমাণ করে দেয় যে উমাদির উদ্বেগের শিকড় ছিল কতটা গভীরে।

টেপরেকর্ডারে সাক্ষাৎকার নিতাম। অনুচ্চ গলায় ধীরে ধীরে অথচ কি সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতেন চিনুদা। প্রত্যেকটি শব্দ যেন ছুঁয়ে উচ্চারণ করতেন। চল্লিশের দিনগুলির কথা বলতে বলতে কখন তিনি তাঁর বইয়ের আলমারি ঘেরা ঘর থেকে উধাও হয়ে সেই সময়ের সঙ্গে মিশে যেতেন, তা বুঝে উঠতে পারতাম না।

চিনুদা আমাকে বেশ কয়েকদিন 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। আপত্তি করলেও শুনতেন না। একদিন হঠাৎই 'তুমি' বলতে শুরু করলেন। আমি যে কখন তাঁর কাছের মেয়ে হয়ে গেছি, সেই অনুভবের গোপন পুলকটুকুর কথা অবশ্য তাঁকে কখনো জানাইনি।

বলতে বলতে কত কথা তাঁর গলায় ভিড় করে আসত। প্রগতি লেখক-সংঘের প্রতিষ্ঠা। কলকাতা অধিবেশন। সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ড ও ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা। গণনাট্যসংঘের জন্ম। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সেই আন্দোলনের ব্যক্তিত্বেরা উঠে আসতেন তাঁর কথায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ মৃত্যুলীলার চিত্রকর জয়নাল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীর ছবি আঁকার ইতিহাসকে বাস্তব করে তুলতেন তিনি। দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র সম্পর্কে চিনুদার মূল্যায়নের কথা অবশ্য ইতি পূর্বে 'পরিচয়' ও 'বহুরূপীতে'-তে আলোচিত হয়েছে।

খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও যখন আলোচনা করতেন তিনি তখনও সরস ও উপভোগ্য ভঙ্গিতেই তা করতেন। তাঁর রসবোধের কোনো তুলনা ছিল না। তাঁর কাছে গিয়েই প্রথম বুঝতে পারি, এই রসবোধটুকু না থাকলে কেউ সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না।

এহেন চিনুদাকে প্রায় শিশুর মত কুণ্ঠিত ও বিব্রত দেখেছিলাম একদিন। বিখ্যাত আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষকে নিয়ে একদিন তাঁর কিছু ছবি তুলতে

গিয়েছিলাম। চিনুদার সেদিন শরীর খুব খারাপ, মাঝে মাঝে কাঁপছিলেন। তবুও নিমাই ঘোষকে তিনি ফটো তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে চিনুদা আমার ভেতর ও বাইরেটা অনেকখানি পাল্টে দিয়ে গেছেন। মানুষ আর জীবনকে বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার উপলব্ধি দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে আমি বুঝেছি, আত্মমর্যাদা একজন শিল্পীর কাছে কতখানি জরুরি।

কারো কাছে সুপারিশ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। আমার কাজে নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম। জানতাম, তিনি চিনুদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন এ-বিষয়ে সসংকোচে চিনুদার কিছু সাহায্য চাইলাম। কারণ শম্ভু মিত্রের মত অতবড় ব্যক্তিত্বের সামনে সরাসরি গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস আমার সত্যিই ছিল না।

কিন্তু সেই সাহস আমাকে জুগিয়েছিলেন চিনুদা। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নির্ভয়ে আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনেতা ও পরিচালকের দুর্গের সিং-দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে। একদিন সত্যি সত্যি ইষ্টমন্ত্রের মত চিনুদার কথা স্মরণ করে একা একাই শম্ভু মিত্রের চারতলার নতুন ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাই। বাংলা নাটকের অধিনায়ক সেদিন নাট্যআন্দোলনের একান্ত তরুণ কর্মী—আমাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং প্রায় দু-ঘণ্টা দু-জনে কথাবার্তা বলেছিলাম। শুধু নাটকের কথা নয়, আমি কি খাই, কি পড়ি, কেমনভাবে থাকি এসব খুঁটিনাটিও স্নেহশীল পিতার মমতায় জানতে চেয়েছিলেন। এই বিরল সৌভাগ্য অর্জনের জোর আমি পেয়েছিলাম চিনুদার কাছ থেকে। তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই।

আমার স্মৃতিতে চিনুদা

সৌরি ঘটক

চিনুদা আর নেই।

তাঁর বাসাটি, জীবিতকালে সেটি সর্বদা নানাজনের পদশব্দে ক্ষণেক্ষণে সচকিত হয়ে উঠত, সেটি এখন নীরবতার অবগুণ্ঠনে ঢাকা।

তাঁর সাক্ষাৎকারীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, বিদেশী অভ্যাগত, রাজনৈতিক নেতা, সমাজের নানাস্তরের মানুষ প্রতিদিন কত বিভিন্ন প্রয়োজনে যে তাঁর কাছে যেতেন তার কোন হিসাব ছিল না।

সকলের চাহিদাই মেটাতে হত তাঁকে। তিনি ছিলেন সবার আপনজন, তাঁর দুয়ার সকলের জন্য ছিল অবারিত।

আজ সেই মৌন গৃহটি যেন পরিচিতজনদের ডেকে বলে ঃ

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি ভারমুক্ত সে এখানে নেই।"

চিনুদার ব্যক্তিগত পরিচয়ের পরিধি এত বিস্তৃত যে তা পরিমাপ করা কঠিন। তাঁর বাল্যজীবন ছিল, ছিল কৈশোর, যৌবন, সাংসারিক জীবনের পরিচিত জনেরা; ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, আর ছিল সেই চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল সেলের সম্পাদক হওয়ার পর থেকে এই দীর্ঘকাল ধরে সাংস্কৃতিক জগতের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ। এছাড়া রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে উচ্চতম রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ।

এইসব মিলেমিশে পরিচিতজনের এক বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে ছড়িয়ে ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ নামে ব্যক্তিটি এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব।

তাই যে কোনো একজনের পক্ষে তাঁর সম্পর্কে সব কথা বলা সম্ভব নয়। দীর্ঘ জীবনের নানা পর্যায়ে পরিচিতজনেরা নানারূপে দেখেছেন তাঁকে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেইসব খণ্ডচিত্রের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব চিন্মোহন সেহানবীশ সমগ্রকে।

পরবর্তী জীবনে চিনুদার সঙ্গে আমার কিছুটা যোগাযোগ ছিল। হয়ত অন্য অনেকের তুলনায় সেটা খুবই কম। কিন্তু তবু ছিল। কারণ একটাই। চিনুদা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতা। ফ্রন্ট যেদিন গড়ে ওঠে সেদিন তিনি ছিলেন এর ভারপ্রাপ্ত পার্টিসেলের সম্পাদক। তারপর পদ থাক আর নাই থাক তিনি রয়ে গিয়েছিলেন এর স্বাভাবিক নেতা। এমনকি কমিউনিস্ট আন্দোলন বহুধা বিভক্ত হওয়ার পরও সব অংশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছেও তিনি নেতা থেকে গিয়েছিলেন। যে মানুষ এভাবে না চেয়ে পায় তার চরিত্রে কোথাও এমন একটা কিছু থাকে যা ব্যাখ্যা করা যায় না।

চিনুদাকে আমি প্রথম দেখি ১৯৫০ সালে দমদম জেলে। ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে চিনুদা অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। আর আমি দমদম জেলে। ১৯৫০ সালে বন্দীদের যে প্রথম দলকে বকসা শিবিরে পাঠানো হল চিনুদা তাদের মধ্যে অন্যতম। বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে হাসিমারা, সেখান থেকে গাড়িতে বকসা। যাওয়ার আগের দিন প্রেসিডেন্সি থেকে ওঁদের দমদম জেলে আনা হল। কারা এলেন দেখতে গিয়ে চিনুদাকে দেখলাম। তবে কোন পরিচয় তখন হয়নি। কারণ সময়ের স্বল্পতা ও বাইরে ও সেইসঙ্গে জেলের ভেতরেও পরিস্থিতি তখন খুবই উত্তেজনাপূর্ণ।

আবার একবছর পরে অন্যান্যদের সঙ্গে আমি যখন বকসা গেলাম তখন চিনুদারা হেবিয়াস কর্পাস করে হাইকোর্টের আদেশে ছাড়া পেয়ে গেছেন।

পরবর্তীকালে আলাপ পরিচয় হলেও খুব বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয় নি। কারণ চিনুদার কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা, আর আমি কাজ করতাম জেলায়। ফলে, দূর থেকে খানিকটা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতাম তাঁকে।

আমি কলকাতা আসার পর প্রয়োজনে, অনেক সময় অপ্রয়োজনেও

চিনুদার কাছে বারবার গেছি। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে যে মানুষটি রসিক মানুষ। আজকাল রসিক মানুষের সাক্ষাৎ তো বড় একটা পাওয়া যায় না। শব্দটাই ক্রমশ অপ্রচলিত হতে হতে মৃত শব্দে পরিণত হচ্ছে। এমন যুগে একজন সত্যিকারের রসিক মানুষের সান্নিধ্যে এলে মন চমকে ওঠে বইকি। ঘরোয়া কথাবার্তায়, আড্ডায় কত মজার মজার গল্প যে তিনি বলতেন তার রস আমার মত অনেকেই উপভোগ করেছেন। সীমান্ত প্রদেশে সেই অহিংস পাঠানের গুলি করার গল্প, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা পাঠের আসরে হাবুলদার (হিরণকুমার সান্যালের) গল্প, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'যতদিন চলে চালিয়ে যাও', বিজনদার উপন্যাস পড়ার আসরে কবিতার চিরকূট চালাচালির মজার ঘটনা, ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে মানিকবাবুর 'হারানের নাতজামাই' শুনে 'কিছু হয় নি'—বলে ননী ভৌমিকের আস্তিন গুটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠা প্রভৃতি সরস গল্পগুলো যাঁরা চিনুদার মুখে একবার শুনেছেন তাঁদের পক্ষে তা সারাজীবনে ভোলা কঠিন।

কিন্তু শুধু রসিক মানুষ বললে চিনুদা সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। এটা যেন সমুদ্রের ওপরের হাল্কা ঢেউ। গভীরে মানুষটি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী, তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি, তিনি ছিলেন যেন তথ্যের রাজা; ইতিহাসে বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বৈদগ্ধ ছিল প্রশ্নাতীত, আর রবীন্দ্রচর্চা যেন মিশে ছিল তাঁর রক্তের সঙ্গে।

অনেকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে: কালান্তর পত্রিকায় টেলিপ্রিণ্টারে খবর এসেছে অন্য প্রদেশের কোন শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি বা গবেষক কোন পুরস্কার পেয়েছেন বা মারা গেছেন। দৈনিক পত্রিকার তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে তখনই ফোন করেছি চিনুদাকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়েছি—'হ্যাঁ উনি…' বলে ফোনে জানিয়েছেন যা প্রয়োজন। কিম্বা বলেছেন—'দাঁড়ান। অমুকের কাছে একবার ফোন করে জেনে নিই। আপনি ফোন ছেড়ে দিন। আমি পরে করছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোন করে জানিয়েছেন সব কিছু।

সারাজীবনের সঞ্চিত জ্ঞানকে মৃত্যুর কয়েকবছর আগে থেকে তিনি যেন উজাড় করে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পঃ বঙ্গ সরকারের উদ্যোগে "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের" যে সচিত্র ইতিহাস রচনা করা হয়েছে সেটা সম্পাদনা

করতে চিনুদা অসুস্থ শরীরে যা পরিশ্রম করেছেন তা তুলনাহীন। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের এমন একটি অজানা অধ্যায়কে ইতিহাসের আলোর সামনে তুলে ধরেছেন যা এতদিন এত মানুষের রবীন্দ্র গবেষণাতেও অনাবিষ্কৃত ছিল।

'৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে'—গ্রন্থে নথীবদ্ধ করে গেছেন প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম যুগের ইতিহাস। এছাড়া তাঁর অজস্র রচনা ছড়িয়ে আছে নানা পত্র-পত্রিকার পাতায়।

আপশোষের কথা হল—বড় দেরি করে কাজ শুরু করেছিলেন চিনুদা। ফলে শতদলের কয়েকটিমাত্র পাপড়ি খোলা হল। বাকিগুলি মেলে ধরবার আগেই চিনুদা চলে গেলেন।

চিনুদা ও আমি দুজনেরই প্রথম আনুগত্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে। ফলে পার্টির ভাবনা-চিন্তা বিচারে দুজনের কখনও মতের মিল হয়েছে, কখনও হয় নি। কিন্তু সে সব বড় কথা নয়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম একটি বিশেষ গুণের জন্য।

ঘরে-বাইরে খুব কম মানুষই এই বিরল গুণের অধিকারী। সেটি হল কোনো বিষয়ে পরামর্শ বা সাহায্যের জন্য গেলে সমস্ত মতান্তর, তিক্ততা, বিরোধকে পাশে ঠেলে দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার কথা মনে পড়ে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চিনুদা ছিলেন পার্টির কালচারাল ফ্রন্টের দায়িত্বে। এর কাজ পরিচালনা নিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে আমার তীব্র মত পার্থক্য হল। আলোচনা করতে করতে দুজনেই কঠিন হয়ে গেলাম। কথা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে আমি বললাম "তাহলে আসি।"

চিনুদা সংক্ষেপে বললেন—"আসুন"।

মনে হল যেন সাময়িক বিচ্ছেদ হয়ে গেল চিনুদার সঙ্গে।

ঘটনাটি ঘটল চিনুদার বাড়িতে সকালবেলা। সেদিনই দুপুরে আমার হঠাৎ দরকার হল একটি গল্প ইংরাজিতে অনুবাদ করার। কাকে দিয়ে করাব সারাদিনে ভেবে না পেয়ে শেষে সন্ধ্যায় ফোন করলাম চিনুদাকে। আমার ভয় ছিল সকালের ঐ মতপার্থক্যের পর চিনুদা কি সাহায্য করবেন?

কিন্তু চিনুদার মনে ওসবের কোন চিহ্ন নেই। বললেন: 'অনুবাদ ভাল করে সুব্রত। সে এখন দিল্লিতে। তার কাছে পাঠাবেন?'

আমি বললাম ঃ "তাঁর সঙ্গে আমার তো তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। এক আপনি যদি পাঠান।"

চিনুদা বললেন,—'ঠিক আছে। কাল সকালে আসুন।'

পরদিন সকালে দুটো গল্প দিয়ে এলাম। চিনুদাই পাঠালেন এবং অনুবাদ করিয়ে এনে আমায় দিলেন।

মনের এই প্রশস্ততাই চিনুদাকে সবার কাছে প্রিয় করতে পেরেছিল। এরই জোরে তিনি ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পসংঘের মঞ্চে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সকলকে সমবেত করতে পেরেছিলেন। তাই তারাশঙ্কর বাবু তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাস উৎসর্গ করেছিলেন "ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক সংঘের সম্পাদক, আমার কমরেড শ্রীমান চিন্মোহন সেহানবিশকে।"

মনে পড়ে একদিন আমি বলেছিলাম—"চিনুদা আমি ব্রাহ্মদের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান দেখি নি। সম্ভব হলে একবার দেখাবেন তো।"

কথাটা স্মরণে রেখেছিলেন চিনুদা। একবার কোন করে নিয়ে গেলেন সমাজের এক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে। বলেছিলেন, একবার মাঘোৎসবে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তা আর হল না।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ সাধারণ সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ ছিলেন চিনুদার পিসতুতো ভাই। তাঁর পিসেমশায় ছিলেন এক বিচিত্র ধরনের মানুষ। মিহিজামের প্রচণ্ড গরমে ছাদে ছেলেদের নীল ডাউন করিয়ে নিজে মাথায় ভিজে তোয়ালে চাপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আবার অজয় ঘোষ ও তাঁর ভাইয়েরা ছিলেন তেমনি দুর্দান্ত। এইসব ঘটনা নিয়ে সাপ্তাহিক কালান্তরের কিশোর পাতার জন্য চিনুদাকে অনুরোধ করেছিলাম একটি ধারাবাহিক রচনা শুরু করতে, যার নাম হবে 'অজয় ঘোষের ছেলেবেলা।'

মাত্র একদিন চিনুদা বললেন, আমি লিখে নিলাম। তারপর আমি হঠাৎ হয়ে পড়লাম গুরুতর অসুস্থ। শয্যাশায়ী অবস্থায় অন্যের হাত দিয়ে পেলাম চিনুদার পাঠান বই '৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে।'

তার কিছুদিন পরে পেলাম শেষ খবর, চিনুদা আর নেই।

আগেই বলেছি চিনুদা ছিলেন বাংলা দেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহজাত নেতা। অথচ কাজের ক্ষেত্রে এই নেতার ভূমিকা কি ছিল? চিনুদার নিজের কথাতেই বলি—"শুনে হয়তো অবাক হবেন যে গান

বা অভিনয় থেকে আমার অবস্থান কয়েক যোজন দূরে হলেও কি করে জানি সময়ের গুণে আমিও হয়েছিলাম আই. পি টি -এর ফাউণ্ডার মেম্বার। আমার ভূমিকা ছিল স্টেজ বাঁধার, অভিনেতাদের চা, পান যোগানোর, টিকিট বিক্রির, শ্রোতাদের কেমন লাগল জিজ্ঞেস করার এবং সাধারণভাবে হৈচৈ করে বেড়ানোর। এজন্য কিন্তু আমার মনে কোন হীনমন্যতা ছিল না যে আমি শিল্পী নই। আসল কথা একটা বড় যৌথ কর্মকাণ্ডের আমরা সবাই ছিলাম অংশীদার—তা সে বটুক-জর্জের মতো প্রথম শ্রেণীর শিল্পীই হোক, আর আমার মত তল্পিবাহকই হোক।" (৪৬ নং—পৃ ২০২)

এটা কোন কথার কথা নয়। চিনুদার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি ছিল আক্ষরিক অর্থে সত্যি। মনে আছে, ১৯৭৭ সালে যখন কলকাতায় 'সারা ভারত লেখক সেমিনার' হয় তখন কি নীরবে সব দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি চিনুদা করে গেছেন।

কাজ শুরু করার টাকা নেই। একজনের কাছে ফোন করলেন ও চিঠি লিখে দিলেন। কাজ শুরু করার মত টাকা পাওয়া গেল। তারপর সম্মেলনের শেষে প্রতিনিধিদের কলকাতার দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখাতে হবে। ঐ বয়সে তাদের গাইড হলেন চিনুদা। যদিও আমাদের কাছে চিনুদার যাওয়াটা ছিল অত্যন্ত সঙ্কোচের ব্যাপার। একালে এই মানসিকতার নেতা ক্রমশই বিরল হয়ে আসছেন। কারণ ইতিহাসের সেই প্রেক্ষাপটের বদল হয়ে গেছে।

চিনুদা নিজে ছিলেন বড় গবেষক। কিন্তু বোধহয় জেনে যান নি যে একালের চোখে সেই যুগের সঙ্গে তাঁর মত চরিত্রের মানুষেরাও গবেষণার বিষয় হয়ে গেছেন।

চিনুদা

অনুরাধা রায়

চিনুদাকে চিনেছি ওঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর। ১৯৮২ সাল নাগাদ চল্লিশের দশকের প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন নিয়ে গবেষণা সুরু করি। অনিবার্য ভাবেই গিয়ে পড়লাম চিনুদার কাছে। তারপর থেকে কতবার যে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হেঁটে গিয়ে শরৎ ব্যানার্জী রোডের সেই ছোট্ট ফ্ল্যাট-টাতে গিয়ে পৌঁছেছি, হিশেব রাখিনি।

আজ লিখতে বসে যে চিনুদাকে মনে পড়ছে তিনি শুধু প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের চিনুদা নন, তিনি পাঁচবছর ধরে চেনা-জানা এক আশ্চর্য মানুষ। আশ্চর্য কেন? কারণ কতরকম জিনিশকে যে তিনি নিজের মধ্যে অনায়াসে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। সক্রিয় কমিউনিস্ট রাজনীতি ও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সুগভীর আগ্রহ; খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির খণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা, ছিন্নের সঙ্গে বন্ধুত্ব, বিক্ষিপ্তের প্রতি স্নেহ; মার্কসীয় চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাস ও রবীন্দ্রদর্শনে অনুরাগ; অগাধ পাণ্ডিত্য ও চটুল রসিকতা করার ক্ষমতা; প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকা ও পাড়ার কুকুর বেড়ালদের সেবা করা; জেলে মার খাওয়া ও ভারত ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জিতলে মাঝরাতে আনন্দ-উৎসবে যোগ-দেওয়া—এই এত কিছুর সমন্বয়ে যে জিনিশটা দাঁড়িয়েছিল সেটা কিন্তু নড়বড়ে নয় মোটেই, রীতিমত দৃঢ় সংহত—একটি-ই মানুষ—জীবন প্রেমিক ও জীবনরসিক। তারওপর মানুষটি নিতান্ত সাধা-

সিধা ; নেই এতটুকু আত্মাভিমান। সত্যি ভারি অবাক লাগত আমার চিনুদাকে দেখে। আর বেশ একটা জুড়িয়ে যাবার অনুভূতি হত ওঁর কাছে গেলে। কারণ এমন সম্পূর্ণ সুন্দর সমন্বয়ের ফলে ওঁর মধ্যে ছিল একটা দুর্লভ স্নিগ্ধতা। সেটাকেই খুব প্রত্যক্ষ ভাবে ধরতে পেরেছি যখন সেটা রূপ পেয়েছে আমার প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহে।

প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনকে জানা ও বোঝার ব্যাপারে চিনুদার অমূল্য সাহায্য পেয়েছি বলাই বাহুল্য। কেউ কোন বিষয়ে সাহায্য চাইলে তার জন্য যথাসাধ্য করাই চিনুদার স্বভাব। তিনি আন্দোলন সংক্রান্ত অনেক বইপত্র সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যে কাজটা বোধহয় তিনি ছাড়া আর মাত্র একজনই করেছেন—সুধী প্রধান। আমি সেইসব বইপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতাম। আর সেইসব তথ্যকে ভাল ভাবে বুঝতে সাহায্য করতে ওঁর স্মৃতি ও মুক্তচিন্তা, যা আত্মসমালোচনাতেও কুণ্ঠিত হত না। চিনুদার কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে তথ্যের অন্যান্য উৎসেও গেছি। তাঁর চিঠি নিয়ে দেখা করেছি কত লোকের সঙ্গে। আন্দোলন বহুদিন ভেঙে গেলেও, অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হলেও, চিনুদার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এটা যে আমাকে কত বড় সুবিধে করে দিয়েছিল, বলতে পারি না। তাছাড়া কতবার ওঁর বাড়ি গিয়েই দেখা পেয়েছি এমন লোকজনের যাঁরা একসময় প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নানা প্রয়োজনে অনেক পর্বতই তো আসতেন মহম্মদের কাছে!

এরই মধ্যে কবে জানি না চিনুদা 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে সুরু করেছেন আমাকে। আমিও 'চিনুদা' ডেকেছি। প্রথম প্রথম যখন কলিং বেল বাজিয়ে "চিন্মোহনবাবু আছেন?" জিগ্যেস করতাম, পিচকুনও নিশ্চয় 'ঘেউ ঘেউ' করে দৌড়ে আসতে আসতেই খুব খানিকটা হেসে নিত মনে মনে। ঐ লোকটিকে খুব কম লোকই চিন্মোহনবাবু বা শ্রীসেহানবীশ বলেন। ওঁকে ওগুলো মোটেই মানায় না। পরে জেনেছি, সম্পর্কে আমার এক ঠাকুমা, বহুবছর আগে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় আম কুড়োনো ইত্যাদি কাজে ওঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন, তিনিও ওঁকে চিনুদা বলেন। আমার বাবা মার সঙ্গে আলাপ হবার পর তাঁরাও ওঁকে 'চিনুদা'ই বলেছেন। বাড়িতে আমরা মজা করে বলতাম 'তিন জেনারেশনের চিনুদা'।

একবার খুব একচোট টাইফয়েডে ভুগলাম। অনেকদিন যেতে পারিনি চিনুদার কাছে। একদিন বিকেলে উমাদি আমাদের সল্ট লেকের বাড়ীতে এসে হাজির! অনেক কষ্টে বাড়ী খুজে বের করেছেন। বললেন, চিনুদা খুব

ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—"মেয়েটা এতদিন ধরে ডুব দিল কেন? একটা খোঁজ করা দরকার।" এরপর থেকেই বন্ধুত্বটা পারিবারিক হয়ে গেল।

সেদিন উমাদি, বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। পরে একদিন ওঁরা সবাই মিলে এসে অনেকক্ষণ ছিলেন—চিনুদা, উমাদি, নিরঞ্জনবাবু। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চিনুদার গল্প করার সাবলীল ক্ষমতা আমার বাড়ির সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। প্রথমেই তো চিনুদার একটা কথায় সবাই যাকে বলে 'বোল্ড আউট'। আমার বাবা সেইসময় কুকুর প্রতিপালন নিয়ে একটা বই লিখছিলেন বাংলায়। এ ব্যাপারে চিনুদাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। হঠাৎ কথায় কথায় চিনুদা বলে উঠলেন, "বাংলায় বই লিখছেন, ভাল কথাই। কিন্তু কুকুররা বুঝতে পারবে কি? ওরা তো সব ইংলিশ মিডিয়াম।"

কুকুরের কথা যখন উঠেই পড়ল, আর একটু বলে নিই এ বিষয়। পরিচয়ের সিরিয়াস লেখকরা হয়ত চিনুদার কুকুর প্রেম বা পশু-প্রেম নিয়ে বেশি লিখবেন না, কিন্তু এটা চিনুদা-চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পিচকুন নামে 'বঙ্গজ' কুকুরটির কথা তো বলেইছি, চিনুদা যার পিসেমশাই ছিলেন। এক সময় মিয়াওমোহন সেহানবীশ নামে একটি বেড়ালও পুষেছেন চিনুদা। ইনি প্রতি রাত্রে টম-ক্যাটিং করার জন্যে বাড়ির বাইরে যেতেন। যত শীতই হোক, যত বর্ষাই হোক, জানলার একটা পাল্লা তাই খুলে রাখতে হত। চিনুদা সজাগ থাকতেন। মাঝরাত্তিরে বাড়ি ফিরে বেড়াল মশারি আঁচড়ালে তিনি তাকে বিছানায় তুলে নিতেন। পিচকুনের মা-বাবা, ভাই বোন, কাকা-মামার দল ওঁদের বাড়ির আশেপাশেই বাস করে। সকালে চিনুদা হাঁটতে বেরোলে তারাও ওঁর সঙ্গে যেত বিস্কুটের দোকান পর্যন্ত। সেখানে প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিল একটি করে বিস্কুট। তাছাড়া প্রতিবেশী ডঃ সমর রায়চৌধুরীর খরগোশের ঘা হয়েছে, ওষুধ দিয়েছেন। রাস্তার কোন কুকুরের মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাকেও সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছেন। এসব কাজে চিনুদার সক্রিয় সহযোগী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

আমি ওঁদের বাড়িতে গেলে, ওঁরা যখন আমার বাবা-মা বোনের কথা জিগ্যেস করতেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কুকুর-টিঙ্কুর কথা জিগ্যেস করতেও ভুলতেন না। আর আমি ছিলাম ওঁদের পিচকুনের অনুরাধাদিদি। চিনুদার সঙ্গে আমার প্রথম সংযোগ সূত্রটি যদি হয় প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন, তাহলে দ্বিতীয়টি অবশ্যই পশু-প্রেম।

তবে প্রথমেই যে কথাটি বলছিলাম, সর্বোপরি আকর্ষণ ছিল সব কিছু

মেলানো ব্যক্তিত্বটি। সেই টানেই কতবার যে গেছি ঐ বাড়িতে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়, মজার গল্পে, অতীতের স্মৃতিচারণায়, সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথাবার্তায় চিনুদা সমৃদ্ধ করেছেন শ্রোতাদের সময়। বেলা হয়েছে। সারদা চান-খাওয়ার প্রচ্ছন্ন তাগাদা নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অসুস্থ মানুষ, অনিয়ম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু চিনুদার সেসব মাথাব্যথা নেই। বরঞ্চ আমার দিকে তাকিয়েই সঙ্কুচিত হয়ে বলেছেন। "ইস, তোমার দেরি হয়ে গেল তো?"

কিন্তু যখন 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' এর — কাজ চলছে, প্রতিদিন দশটার সময় চিনুদা বেরিয়ে যান সম্পাদনার কাজে। অবশ্য তাঁকে নিতে গাড়ি আসে। কোনদিন যদি গাড়ি না এসে পৌছায়, চিনুদা যাবেন না বা দেরি করবেন? মোটেই না। অসুস্থ মানুষ নিজেই ঠাঠা রোদ্দুরে বেরিয়ে পড়েন ট্যাক্সি ডাকতে। কাজে কোন গাফিলতি নেই।

চিনুদা বিদ্যাসাগর পুরস্কার পাবার পরে যেদিন গেছি, সমবেত সম্বর্ধনা গ্রহণ করেছেন হাসিমুখে—কোন ভারিক্কি চালে নয়, হালকা একটা রসিকতার মধ্য দিয়ে—"একটা আনন্দের ব্যাপার হয়েছে বটে আমার পক্ষে। এই প্রথম দেখলাম খবরের কাগজে আমার নামটা ঠিকমত ছাপা হল। 'চিন্ময়', 'স্নেহানবীশ' ঐসব দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম এতদিন।"

কিন্তু সম্বর্ধনা যদি আসে সিল্কের কাপড়ের টুকরো হয়ে, তবে চিনুদা রীতিমত বিব্রত। কারা যেন সভা-টভা করে ওঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে ও উপহার দিয়েছে একটুকরো দামী সিল্ক। তা নিয়ে মহা সমস্যা দাঁড়াল। উনি তো মোটা সুতীর পাঞ্জাবীর বেশি জীবনে কিছুই পরেননি, বিয়ের দিনেও নয়। কি করা যায় তাহলে সিল্কটি নিয়ে? শেষপর্যন্ত নিরঞ্জনবাবু ও উমাদি উৎসাহিত হয়ে বললেন, ওঁরা যথাক্রমে শার্ট আর ব্লাউজ বানাবেন ওটা দিয়ে। সমস্যা মিটল।

গল্প বলিয়ে চিনুদা প্রবাদপুরুষ। সকলেই ওঁর এই পরিচয়টা জানেন। কতরকম যে গল্প ছিল তাঁর ভাণ্ডারে—নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ গল্প, অগাধ পড়াশোনার ফলে পাওয়া গল্প। ক-একটি গল্প অন্তত পুনরাবৃত্তির লোভ সামলাতে পারছি না; যদিও জানি আরো অনেকেই সেগুলি শুনেছেন ওঁর মুখে।

মস্কো শান্তি সম্মেলনে গেছেন চিনুদা। সেখানে সংস্কৃতি জগতের রথী মহারথীদের সমাবেশ। অধিবেশন সুরু হবে। সভাপতি নির্বাচন হয়ে গেছে।

বোধহয় জনাদশেক সভাপতি। এদের প্রত্যেকেরই এমন নাম ডাক যে কাউকেই বাদ দেওয়া সম্ভব ছিল না। সভাপতিরা ডায়াসের ওপর জড়ো হয়েছেন। কিন্তু প্রতিভাবান লোকের স্বভাবধর্ম হেতুই বোধহয়, কিছুতেই সুশৃঙ্খলভাবে সভা পরিচালনা করা যাচ্ছে না। ডায়াসের ওপর যাঁর যা খুশি করে চলছেন। কেউ বা চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে পা তুলে দিয়ে খোসগল্প জুড়েছেন পিঠ ফেরানো আছে দর্শকের দিকে। শেষে দর্শকের একজন অধৈর্য হয়ে বললেন, "এক কাজ করুন। সভাপতিরা সব নীচে নেমে আসুন, আর আমরা দর্শকেরা ডায়াসের ওপর গিয়ে বসি। তাতে হয়ত তবু সভা সুরু করা যাবে।" তখন সভাপতিরা লজ্জিত হলেন। নাজিম হিকমত হাল ধরলেন। মাইকে কড়া ঘোষণা করলেন, "অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার সুরু করতেই হবে। যেহেতু সময় কম, বক্তারা কেউ দশ মিনিটের বেশি বলতে পারবে না। প্রথমে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি জঁা পল সার্ত্রকে।" সার্ত্র সেই সময় সংস্কৃতি জগতের মধ্যমণি। সকলেই প্রতিবাদ করলেন, "সার্ত্রকে দশ মিনিটের বেশি সময় দেওয়া হোক।" সার্ত্র কিন্তু মাইকের সামনে উঠে এসে বললেন, "কেউ যদি তার বক্তব্য বিষয়টা ভাল জানে তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তা' বলতে পারে। আমার দশ মিনিটের বেশি সময় দরকার হবে না।" তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন সাত মিনিটে। এবং অসাধারণ সেই বক্তৃতা।

সব সময় যে মহৎ বৃহৎ ব্যক্তি ও ঘটনার কথাই হত তা নয়, সাধারণ গল্পও করতেন। সাধারণ হয়েও অসাধারণ। একদিন যেমন ছাপার ভুল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক উদাহরণটি দিলেন চিনুদাই। স্বাধীনতা পত্রিকার অফিসে বসে আছেন চিনুদা ও বন্ধু সরোজ দত্ত। হঠাৎ উদভ্রান্তের মত দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। অত্যন্ত উস্কোখুস্কো চেহারা। চিনুদাকে নাকের সামনে আগের দিনের 'স্বাধীনতা' টা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "কি করেছেন মশাই আপনারা? এই যে মৃতদেহের ছবি ছাপিয়ে তলায় ক্যাপশন দিয়েছেন 'পুলিশের গুলিতে কমরেড অমুকচন্দ্র অমুক নিহত', জানেন এই অমুকচন্দ্র অমুক হল আমার নাম? আমি হচ্ছি এই ছবির ফটোগ্রাফার। জানেন, আমার মা কাগজ পড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। চিনুদা তো বিপাকে পড়লেন। সত্যি খুব ভুল হয়ে গেছে। ভাবলেন, ভদ্রলোককে বলবেন—"খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার মাকে গিয়ে বলুন, আপনি তো জলজ্যান্ত বেঁচেই আছেন। সুতরাং তিনি যেন আবার খাওয়া দাওয়া করেন।" কিন্তু চিনুদা মনে মনে কথাটা গুছিয়ে

নেবার আগেই সরোজ দত্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ফটোগ্রাফারকে "যাই বলুন আপনি। ছবির মুখটার সাথে কিন্তু আপনার মুখের প্রচণ্ড মিল আছে। হ্যাঁ, আমি তো স্পষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছি।" স্বভাবতই এরপর ফটোগ্রাফার ভদ্রলোককে সামলানো দুঃসাধ্য হল। কোনরকমে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করে চিনুদা সরোজ দত্তকে বলেন, "আজ লোকটা আপনাকে খুন করে গেলেও বোধহয় ওঁর ফাঁসি হত না। কারণ এরকম কি যেন একটা আইন আছে যে প্রভোকেশনের যথেষ্ট কারণ প্রমাণ করতে পারলে একজন মানুষ সাতটা খুন করেও রেহাই পেতে পারে।"

একদিন কথা হচ্ছিল, পুরোনো আমলের থেকে ইদানীং ভারতীয় ক্রিকেটে ফিল্ডিং অনেক বেশি পোক্ত। চিনুদা বললেন, অনেকদিন আগে একবার মাঠে গিয়েছিলাম খেলা দেখতে। কার্তিক বোস সেযুগের ভাল ক্রিকেটার, কিন্তু ফিল্ডিং-এ কাঁচা। একটা ক্যাচ উঠেছে, বোসের সেটা ধরার কথা। এমন ভাবে দৌড়োতে লাগলেন তিনি যে চিনুদার পাশ থেকে এক দর্শক মন্তব্য করল, "ভাখ ভাখ, কার্তিক বোসকে ক্যাচে তাড়া করেছে।"

নিজের গল্পও করতেন। তবে নিজের সম্পর্কে ভাল কিছু বলা কখনোই না। আত্মসমালোচনা প্রসঙ্গে বলতেন বা মজা করে বলতেন। কোনদিন কারোর প্রশংসা পেয়েছেন বা কোনদিন অমুক বাহাদুরির কাজটা করেছেন—এমন কোন কথা কখনোই শুনি নি। কমিউনিস্ট রাজনীতি করার অপরাধে যখন গ্রেপ্তার হলেন চিনুদা, সেই প্রথম তাঁর ছবি তোলা হল জেলে রেকর্ড রাখার জন্য। জেলে গিয়েও এঁদের ভয়ডর ছিল না। বদবুদ্ধি কিছুই কমেনি। চিনুদা জেলারকে ভালমানুষ মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, "এক কপি ছবি পাব তো?" বিরক্ত 'না' উত্তর এল প্রত্যাশিতভাবেই। এবার চিনুদার প্রশ্ন, "আচ্ছা তাহলে বিয়ে করব যখন তখন অন্তত এক কপি দেবেন তো? যানেন তো বিয়ের সময় ছবি লাগে?" এবারেও ভালমানুষের মত মুখ। এবং ইতিপূর্বেই তিনি বিয়ে করেছেন। পুলিশ সেটা জানত না।

প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন প্রসঙ্গে তো অনেক গল্প শুনেছি। তার ফলে আন্দোলনটাকে শুধু জানি নি, অনুভব করেছি। একটা গল্প বলি। ১৯৪৮-৫০ সালের প্রচণ্ড রবীন্দ্রবিরোধিতার যুগ। চিনুদা তখন জেলে। খুব তীব্র রবীন্দ্রবিরোধী বক্তৃতা দিয়ে পরমুহূর্তেই কোন কমরেড প্রস্তাব করেছেন, "ভাল লাগছে না, আসুন একটা রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যাক।" শুনে চিনুদা রাগে ফেটে পড়েছেন। নিজে তিনি সেই সময় পার্টির প্রতি আনুগত্য

ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আজন্ম অনুরাগের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। চিৎকার করে বলেছেন, "ভণ্ডামির একটা সীমা থাকা উচিত।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'যখন যেখানে' বইটিতে লিখেছিলেন, ক্যাম্পে যখন ওঁরা সবাই একসঙ্গে বন্দী ছিলেন, হৈচৈ আড্ডায় সময় কাটত যাকে বলে নরক গুলজার। পড়াশোনা করা প্রায় অসম্ভব ছিল সেই আবহাওয়ায়। এদিকে চিনুদার তো পড়াশোনা না করলে চলবে না। সুতরাং তিনি করতেন কি, এক একটি মজার গল্প বলতেন। সকলে দশ মিনিট ধরে হাসতে থাকত। সেই অবসরে তিনি দ্রুতগতিতে অনেকটা পড়ে নিতেন। চিনুদার ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

১৯৮৬র সেপ্টেম্বর মাসে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি শিক্ষকতার কাজে। পূজোর ছুটিতে কলকাতা গেলে ওঁদের বাড়ি গিয়েছি। অনেক গল্প হয়েছিল, বিশেষ করে আমার নতুন কর্মস্থল সম্পর্কে। ডিসেম্বর মাসে নিরঞ্জন বাবুর মৃত্যুর খবর পেলাম। অবিশ্বাস্য! চিনুদার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও হয়ে উঠল না—শীতের ছুটিতে হল না, ইস্টারের ছুটিতে হল না। চিঠিপত্রে অবশ্য যোগাযোগ ছিল। আমি লিখেছিলাম, নকশালবাড়ির গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ১৯৬৭-র আন্দোলনটাকে বোঝবার চেষ্টায়। চিনুদার উত্তর পেলাম। সেটাই ওঁর শেষ চিঠি। ছোট ছোট অক্ষরগুলো কেঁপে গেছে। লিখেছেন, শরীর ভেঙে গেছে। বুঝতে পারলাম, মন ভেঙে গেছে। শেষে লিখেছেন, "অনেক গল্প তোমার কাছ থেকে শোনার আছে। ডাক্তারও বলেছেন; অনেক বকবক করেছেন। এবার শুধু শুনুন। তাই বসে আছি তোমার উত্তরবঙ্গের অভিজ্ঞতার গল্প শোনার জন্য।" (১৯শে মার্চ, ৮৭)। গরমের ছুটিতে সদ্য বাড়ি ফিরেছি। যাব যাব ভাবছি ওঁর কাছে। একদিন সকালে কাগজ খুলে দেখলাম, চিনুদা আর ১৯ নং শরৎ ব্যানার্জী রোডে আমার গল্প শোনার জন্য বসে নেই। অনেকদিন চিনুদার সঙ্গে দেখা করতে না পেরে যে খারাপ লাগছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল, সেটা চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

ক্রোড়পত্র

সমর সেন

সমর সেন : তির্যক ও সরল

আশীষ মজুমদার

সমর সেন বাবুবৃত্তান্ত নামক আত্মজীবনীতে নিজের কবিতাচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে ; 'আমার কবিতা রচনার আয়ু অবশ্য বারোবছর—১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমার ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত। প্রথম বই 'কয়েকটি কবিতা' বের করি ১৯৩৭-এ স্বর্ণপদক বেচে, উৎসর্গ করি মুজফ্‌ফর আহমদকে। আমার কবিখ্যাতির একটা কারণ—ইংরেজিতে ভালো-ছাত্র ছিলাম। 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা করেন বুদ্ধদেব বাবু, বিষ্ণুবাবু এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যথাক্রমে কবিতা, পরিচয় ও অমৃতবাজার পত্রিকায়। ১৯৪০ এ প্রকাশিত হয় গ্রহণ, ১৯৪২ এ নানাকথা, ১৯৪৩ এ খোলা চিঠি, ১৯৪৪এ তিনপুরুষ ও ১৯৫৪য় সমর সেনের কবিতা (সিগনেট প্রেস)। 'পরে কয়েকটি টুকিটাকি কবিতা লিখেছি (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।'

এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নির্মোহ বাক্য লিখে সমর সেন কিন্তু সমকাল এবং ভবিষ্যৎকে অনেক কথাই জানিয়ে দিয়ে গেছেন। জানাতে পেরেছেন যে, কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল, ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলেন, সেই সূত্রে একটা স্বর্ণপদক লাভও ঘটেছিল আর কবিতার প্রতি আকর্ষণ এতটাই বেশি ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক বেচে কবিতার বই ছেপেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—কবিখ্যাতির সঙ্গে প্রায়শই জড়িত থাকে কবিতাতিরিক্ত কিছু।

সমর সেনের কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় তখনও, তাঁর জীবিতাবস্থায়, এবং এখনও, তাঁর মৃত্যুর পরে এই প্রবণতা প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাঁর চেহারা, কার্জনপার্কে খোলা তলোয়ারের মতো শুয়ে থাকা, তুখোড় আক্রমণাত্মক বাগবৈদগ্ধ্য, খোঁচা দেওয়া চিঠিপত্র…শেষ জীবনে শ্রদ্ধেয় আপোষহীন সাংবাদিকতা এইসব ছড়িয়ে যায় তাঁর কাব্য আলোচনায়। কবির ব্যক্তিত্ব তাঁর কবিতা বোঝার পক্ষে বেশ খানিকটা জরুরি, কিন্তু কেবল ব্যক্তিত্বের আলোয় কবিতা বিচারে বিপদ থেকে যায়, কবি হিসাবে তাঁর ভূমিকা বিবেচনায় বিভ্রম ঘটে।

সমর সেনের গদ্যকবিতার আঙ্গিকে যে সদর্থক নতুনত্ব ছিল, সে বিষয়ে বিষ্ণু দে দৃষ্টিআকর্ষণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের আলগা মন্তব্যেও তার স্বীকৃতি ছিল। দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লেদ, ভণ্ডামি, সুযোগসন্ধান এমন নির্মম নির্মোহ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্ধ করাটা প্রায় সকলকেই সচকিত করেছিল। কবিতার স্মার্ট-স্লিম রীতির সঙ্গে সেই বিদ্রূপাত্মক বক্তব্য এমন হরগৌরী সম্বন্ধে অন্বিত হয়ে যায় যে, বাঙলা কবিতার জগতে আবির্ভাবমাত্রই তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন সম্মানিত আসন—রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসু ধূর্জটিপ্রসাদের মতো কবি ও সমালোচকদের প্রশংসা সদ্য আবির্ভূত কবির শ্লাঘনীয় কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু বোধহয় সেই প্রাপ্তি তাঁকে আবদ্ধ করে দেয় স্ব-উদ্ভাবিত বৃত্তে। তির্যক হওয়ার দায়িত্ব বোধ করতে থাকেন তিনি, তাই পরবর্তীকালে বিষয়ের টানেও যখন প্রয়োজন হয় উদ্দীপিত উচ্চারণের—তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তাঁর কবিতা। ৪০-এর পরে লেখা কবিতাতে বিপ্লবে উন্মুখ হয়ে ওঠার আবেগ ক্বচিৎ-কদাচিৎ কবিতা হয়ে ওঠে উপলব্ধি ও উচ্চারণের দ্বৈধতার জন্য। আর, তির্যক বক্রোক্তি ব্যঙ্গের চমক তো চমক থাকে না, যদি তা নিরন্তর উচ্চারিত হতে থাকে। 'মনের' সেই 'উকুন বাছা' শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের পক্ষেই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গমুখর কবি সমর সেন এইসব বুঝেই শেষ পর্যন্ত নীরব হয়ে যান।

অথচ সমর সেনের উচ্চারণে সেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠার টান প্রথম দিকের কবিতাতেও প্রয়োজন মতো এনেছিলেন তিনি। মননজাত কবিতার সাধনা করতে গিয়ে আবেগবর্জিত হতে হবে এমন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না তাঁর। একটি 'বেকার প্রেমিক-'এ যখন তিনি কাটা কাটা আটলাইনে বেকারজীবনের ক্লেদ পরিবেশনের পর মদির মধ্যরাত্রে বলে ওঠেন 'মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,/

পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো / হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।' তখন 'আনো'-র পর কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার না করে পরেই আবার 'হানো'— ক্রিয়াপদের ব্যবহার পংক্তিটিকে আবেগদীপ্ত করে তোলে। দুটো পর পর অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের অবস্থান উদ্যত দিনের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন হয়ে ওঠে যেন। কবিতাটি বাঙলা ভাষায় রচিত কতিপয় উৎকৃষ্ট কবিতার অন্যতম হয়ে ওঠে এই বৈপরীত্যের টেনশনে।

সমর সেন অবক্ষয়ের ছবি এঁকে নেতির মার্গে প্রগতির যাত্রা শুরু করেছিলেন। 'আমরা নরকে আছি'—সেই জ্ঞানটা তো প্রাথমিকভাবে জরুরি। আত্মসচেতনতার সেই বর্ষায় যে বাঙালী কবিরা এলিয়টকে মান্য বলে মনে করেছিলেন সমর সেন তাঁদের একজন। তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা, প্রতীক্ষাও আবিষ্কৃত যে হতে পারে তা ইদানীংকার অনেক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

৪০-এর পরে লেখা কবিতায় প্রতীক্ষা ও পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুলতাই প্রধান হয়ে উঠেছে—কোথাও কোথাও দীপ্ত দান্ত ইমেজে ও উচ্চারণে

নিরুদ্দেশ কত বেকার,
বহুদিন বেকার, তবু মুখে তোমার গান
তোমার সবুজ ধান, অবিরাম জল
অসংখ্য বর্বর পাহাড়।
আমার দেশে দুধারে ধূসর মাঠ,
মধ্যে উদ্দাম নদী,
ঝড় বৃষ্টি ; বিদ্যুতে চেরে আকাশ,
অন্তরীক্ষের আগুন ধীরে ধীরে শেষ হবে
নীলপদ্ম হবে নিঃসঙ্গ আকাশ।

কিন্তু সর্বত্র নয়। কখনো কখনো কবিতা নয়, সোজাসুজি ঘোষণাই লিখে ফেলেন। আবার ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রবণতাটাও ফিরে আসে—বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপনের পার্থক্য লক্ষ্য করে নিজের মধ্যে, পারিপার্শ্বিকে। '৯ই আগস্ট, ১৯৪৫'-এ দেশের রাজনীতিতে ঘেন্না প্রকাশ পায় এই ভাবে 'এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা'।

আত্মধিক্কার আত্মকরুণা থেকে মুক্তি হল না—হয়তো তীব্র সচেতনতার কারণেই। আর আত্মকরুণা মাত্র সম্বল করে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসও হল ব্যাহত।

সমর সেনের প্রথম মুদ্রিত কবিতায় প্রেমের আবেগ বিধুরতার টান স্পষ্ট। 'আমাকে কেন ছেড়ে যাও। মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়?' আরও অনেক কবিতাই আছে প্রেমের বা প্রেমিকার আগমনের প্রতীক্ষায় প্রগাঢ়। 'মেঘদূত' কবিতায় প্রথম এ ব্যাপারে ধাক্কা আছে, স্বার্থপর প্রেমের মিলনের বিলাস সেখানে আক্রান্ত 'হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও, কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে কিন্তু তারপরও পাওয়া যায় স্মৃতিবিধুর প্রেমের দীর্ঘশ্বাস। প্রেমও ভালোবাসার, কামনার আশ্চর্য উজ্জ্বল ছবি আছে একটি মেয়ে কবিতায়, স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক, রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম, / আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস; / আমাদের দুর্বল ভীরু, অন্তরে / সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।'

এই কবিতা থেকেই সমর সেনের প্রেম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির আভাস মেলে। পরবর্তিকালে অনেক কবিতাতেই প্রেম, যৌনসম্পর্ক সমর সেনের রসনায় পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। দুর্বলভীরু মধ্যবিত্ত জীবনে প্রেমের উজ্জ্বল বাসনা নেই, আছে প্রেমের বিকার। তাই সদর্থক প্রেমের স্বীকৃতি তাঁর কবিতায় লুপ্ত হয়ে গেল—কুসুমের কারাগার, মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি চাইছিলেন বারবার। আসলে রোম্যান্টিক মোহ, ভাবালুতা, শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস আক্রান্ত হয়েছে। একসঙ্গে রাত্রে শোবার দুর্লভ সুযোগ বলে ব্যঙ্গ করেছেন এই সমাজের প্রেমের আকৃতিকে। তারপর থেকে চীনে গণিকা, গণিকার কোলাহল, দেবনখরে লোলচর্ম নিতম্বিনী, লম্পটের পদধ্বনি মধুরাতির রভস, পাণ্ডু, অগ্নিবর্ণ, ফিরিঙ্গি যুবতীর নরম উদ্ধত বুক, স্ফীত উদ্ধত নরম বুক, পেস্তাচেরা চোখ মেলে নারীধর্ষণের ইতিহাস, শেষহীন পড়া—এইসব প্রসঙ্গে আকীর্ণ হয়ে আছে সমর সেনের কবিতা।

ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রেমের বিকার ও তাকে ব্যঙ্গে বিদ্ধ করার প্রবণতা বিষ্ণু দের একসময়ের কবিতায় লক্ষ্যণীয়ভাবে আছে—প্রেমের নাগরিক চতুরালি তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছে বহু কবিতায়। কিন্তু প্রেমকে, যৌনকামনাকেও সদর্থক ভূমিকায় দেখতে চাওয়ার বিস্তারে পৌঁছেছিলেন তিনি। নারীর শরীরের সৌন্দর্য কেবল বিকৃত কামনার বস্তুই যে নয়, ভালোবাসার আধার—এমন উপলব্ধিতে পৌঁছতেই হয় আত্মসচেতনতারই দায়ে। কিন্তু সমর সেনের কবিতায় প্রেমকে বিকৃতির ক্লেদ থেকে উদ্ধার পেতে দেখা গেল না। শেষদিকের কবিতাতে সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন কবি আন্তরিকভাবে কিন্তু তখনও নারীর শারীর বা প্রেম সম্পর্কে তেমন উপলব্ধি

নেই 'যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে।' শুধু দুটি পংক্তি খুঁজে পাওয়া যায়

এখানে মন্থর ঠাটে
প্রাণের অখণ্ড প্রতিজ্ঞা উদ্ধত স্তনে
হাল্কা হাতে সব্জি বেচে শ্যামল মেয়েরা
কিংবা,
কিন্তু আগামীকাল আসুক ঘর ফিরতি মজুরের গানে
কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়

এমন পংক্তি রচনার পরবর্তী সম্ভাবনা কবি স্তব্ধ হয়ে বিনষ্ট করে দিলেন—এটাই আক্ষেপ।

সমর সেন ঃ মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়

অভীক মজুমদার

ষাটের দশকের 'কৃত্তিবাসের'[১] পাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সমর সেন' নামক একটি কবিতায় 'হাতের অক্ষরগুলো সোজা হবার আগেই', কৃশ শ্বেতভল্লুকীর উদরস্থানের উষ্ণতা সন্ধানী সমরবাবুর ক্রমনিম্নগামী বিবর্তনের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনেছিলেন। কার্জনপার্কের নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে শায়িত এই ঋজু কবিকে দেখে যে আশাব্যঞ্জক অনুভূতি তাঁর হয়েছিল, সময়ের হাতে সে কবিকে নিহত হতে দেখে বিপন্ন বোধ করেছিলেন সুনীল। সেই ধিক্কারের, সেই ক্ষিপ্ত হতাশার প্রকাশভঙ্গীই ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে তেত্রিশ পংক্তির এই কবিতায়। পরবর্তিকালে অবশ্য সুনীলবাবুর কোনো কাব্যগ্রন্থেই খুঁজে পাওয়া যায় না এই কবিতা, এমন কি কাব্যসংগ্রহেও এর অনুপস্থিতি বেশ বিস্ময়কর। মনে হয়, নেহাৎ একটা সাময়িক উত্তেজনাই ঐ কবিতার প্রেরণা, এইরকম ভেবে পরবর্তিকালে কবিতাটিকে উপেক্ষা করেছেন তিনি। কিন্তু খুব সম্প্রতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমর সেন স্মৃতিসভায়[২] কৃত্তিবাস পত্রিকার আর একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি নবনীতা দেবসেন একটু মেয়েলী উষ্মাতেই যখন সমর সেনের কবিতা লেখা ছেড়ে 'ইংরাজীতে বিপ্লবী কাগজ' সম্পাদনাকে অর্থহীন পরিণতি হিশেবে চিহ্নিত করতে চান, তখন মনে হয় একটা বিশেষ সময়ের, একটা বিশেষ অংশের দৃষ্টিভঙ্গী প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এঁদের সমালোচনার আড়ালে। একদা 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট'-এ ওডওয়ার্ড টমসন[৩]

যে কবির তুটি কবিতার অনুবাদসহ দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন সে সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি হিশেবে, সেই সমর সেনের কৃশকায় কাব্যগ্রন্থগুলি পরবর্তিকালে অনায়াসে হারিয়ে গেল অন্যান্য নিকৃষ্টতর কবিদের চীৎকৃত নাটকীয়তা আর পর্বতপ্রমাণ রচনাবলীর দাপটে। হয়তো কবিতার জগৎ থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে খুব তাড়াতাড়ি তিনি অনালোচ্য হয়ে উঠেছিলেন; কবি সমর সেন-কে বিস্মৃত হওয়া সহজতর হয়েছিল। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেনি সুধীন্দ্রনাথ বা নজরুলের ক্ষেত্রে, যদিও শেষ বছরগুলিতে তাঁদেরও কলম ছিল স্তব্ধ। কিন্তু কবিতা লেখা কেন হঠাৎ থামিয়ে দিলেন সমর সেন?

সমর সেন নিজে ভাবতেন, 'কবিতা অনেকটা নাটকীয় স্বগতোক্তির মত, কিন্তু কাব্যবিচারে আমরা নাটকের কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করি কিংবা অস্বীকার করি। পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভরতা অস্বীকার করা অসম্ভব। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা, মেনে নেওয়া স্বাধীনতার সূত্রপাত।'[৪] নাটকীয়তা এবং পরিবেশের প্রভাবকে যে কবি ভেবেছিলেন আধুনিক কবির কাব্যরচনার প্রেক্ষিত হিশেবে, তাঁর কবিতার অন্তিম লগ্নে হয়তো একটু মনোযোগী হলেই লক্ষ করা যাবে এই নাটকীয়তা এবং পরিবেশ সচেতনতা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। 'বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, মালাবারে, উত্তর বিহারে, যারা লড়ে ইউগোস্লাভিয়ার বন্ধুর মারাঠি পাহাড়ে। রাশিয়ার রক্ত-মাটিতে, বেদনাহলুদ চীনে, ফ্রান্সের ফিনিক্স প্রান্তরে, আমারি আত্মীয় তারা। / ওরা যেখানে প্রাণ নেয়, সেখানে প্রাণের স্বাক্ষর, / যেখানে ওরা প্রাণ দেয় সেখানে জীবন অমর।' (লোকের হাটে / ১৯৪৪-৪৬)

কিন্তু উদ্ধৃত পংক্তিগুলিকে কবিতা হিশেবে স্বীকার করতে আমরা একটু কুণ্ঠিত হই। রিল্‌কে প্রসঙ্গক্রমে একদা জানিয়েছিলেন যে, 'Art is a movement contrary to nature। কিন্তু প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর চেতনার নিয়ন্ত্রণ শেষপর্যন্ত যদি নীরস কিছু তথ্যই পরিবেশন করে শুধু, যদি তা কেবল পরিণত হয় সংবাদপত্রের হেডলাইনের পুনরাবৃত্তিতে তাহলে একটু নিরাশই হতে হয় আমাদের। মনে হয়, রিলকের অভিপ্রায় হয়ত শেষপর্যন্ত অনুপলব্ধই থেকে গেছে। বহুদিন আগে শিলার তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন খুব প্রয়োজনীয় একটি কথা, 'তুমি যে লিখতে পারছো না, তার কারণ তোমার কল্পনাকে বাধা দিচ্ছে তোমার মনন (intellect)।' সৃষ্টিশীল মনের ওপর মাত্রাতিরিক্ত মননের প্রহরা শেষপর্যন্ত সৃষ্টিকে ব্যাহত করে। অতিরিক্ত মননসচেতন সেই কবির কবিতা হয়ে ওঠে তথ্যের পাহাড়। সেই পাহাড়

থেকে যে ক্ষীণ কবিত্ব বিচ্ছুরিত হয়, শেষ পর্যন্ত তাকে মনে হয় নাটকের চীৎকৃত সংলাপ। কিন্তু সমর সেন পরিবেশের প্রভাবকে আত্মীকরণ না করে বরং যেন এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে পড়ছিলেন ধীরে ধীরে। তাঁর শেষ পর্বের রচনায় এমন বহু পংক্তিই রয়েছে যাকে সহজেই ব্যবহার করা যেত নাটকের সংলাপে। এই প্রাণহীন নিস্তরঙ্গ শব্দগুচ্ছে নাটকীয়তার আবেশ আরো যেন ক্ষুণ্ণ করে এর কাব্যময়তা। 'কাব্য বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থান কাল পাত্রের মুখাপেক্ষী, এবং মাঝে মাঝে সমাজের মুখ বদলানোর কাজে সাহায্য করতে পারে'[৫] এই মতবাদের রচয়িতা তাঁর নিজের শেষপর্বের রচনা সম্পর্কে লিখছেন 'তারপর ১৯৪১-র ২২শে জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি জনযুদ্ধে পরিণত হল। ব্যাপারটা ছকে ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল! ছক ঠিক হবার পর সব ঠিক। নবীন উদ্দীপনায় কবিতা লেখা চলল। দিল্লীতে কলেজে পড়াবার সময় সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৪-র জুন মাসে মিত্রশক্তিরা ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলাতে বিবেক হালকা হয়ে গেল, সরকারি চাকরি নিয়ে রেডিও-র সংবাদ-বিভাগে ঢুকলাম। সংবাদের চাপে, দেশের দাঙ্গাহাঙ্গামায় আস্তে আস্তে কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে এল—ছক মেলানো কঠিন হয়ে পড়ছিল।'[৬]

সমস্ত উদ্ধৃতিতে হঠাৎ 'ছক' শব্দের ব্যবহার একমুহূর্তে স্পষ্টতর করে দেয় সমর সেনের তৎকালীন অভিপ্রায়। বোঝা যায়, কেন তাঁর কবিতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে তার স্বকীয়তা, কেন বন্ধ্যা হয়ে ওঠে তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী। মননের এই ছক এই তথ্য আর সমাজ চেতনার দায়ভার নিয়ে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে শব্দের কঙ্কাল। তিনি ঢুকে পড়েন অজান্তে এক শব্দের খাঁচায়, যার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় কলমকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

অথচ কি বিপুল দার্ঢ্য, কি নিঃসীম প্রত্যয় নিহিত ছিল তাঁর প্রথম যৌবনের কবিতায়। সময়ের চাপে বিহ্বল এই জন্ম—রোমান্টিকের থেঁতো স্বপ্নের যন্ত্রণা, কী তীক্ষ্ণ শ্লেষে, কী শাণিত তির্যকতায় আপ্লুত করে দেয় আমাদের। আমাদের সযত্ন লালিত নিরপেক্ষতার মুখোশ, নিষ্ক্রিয়তার বিভিন্ন চটুল ওজরকে চুরমার করে দেয় চাবুকের মত তাঁর এক একটি শব্দ। বাহুল্যবর্জনের জন্য এত কঠোর সংযমের অভ্যাস অন্য কোনো কবির কবিতাতেই চোখে পড়ে না। অতিকথনের ভারে ক্লান্ত বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী সত্তা, সমর সেন।

২

কিন্তু সুনীল বা নবনীতার ক্ষোভ? সমর সেনের প্রতি তাঁদের এই অভিমান, এই আক্রমণ কি কেবলই আশাহত পাঠকের বেদনার নির্যাস? নাকি কোনো ভিন্ন কারণেই সমর সেন 'হাতের অক্ষরগুলো সোজা' নয় এমন এক নাবালক কবি হিশেবে অভিহিত হন? আমরা জানি মননের প্রহরা থেকে কবিতাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে চাইছিলেন 'কৃত্তিবাস' কবিগোষ্ঠী। তাই হয়ত সমর সেনের মনন সম্পৃক্ত কবিতার অস্তিত্ব তাঁদের কাছে ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর। যেন তেন প্রকারেণ সমর সেনকে উপেক্ষা করতে, অস্বীকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। আমূলের টিন দেখে কবিতায় 'আমূল' শব্দের ব্যবহার কিম্বা 'বুড়ো বয়সে চুরি করে কনডেন্স মিল্ক খাওয়ার মত' কেবল ধ্বনিমাধুর্যের লোভে 'পবন-পদবী' শব্দকে কবিতায় নিয়ে আসা[৭] সমরবাবুর কবিতার বিপ্রতীপ এক প্রচেষ্টা। মননহীন শব্দচর্চার এই উন্মাদনায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখে ফেলেন 'ভ্রান্তি' জাতীয় কবিতা। কিন্তু কোনো কোনো কবিতায় এই ধরনের শৈলী সার্থক হয়ে উঠলেও শেষপর্যন্ত আজ আমরা বুঝতে পারি যে মুক্তি ঐ পথে নেই। আজকে এই 'কৃত্তিবাস' কবিগোষ্ঠীর কবিদের কবিতা, মননের রক্তাল্পতার কি ভয়ঙ্কর শস্তা আর ফাঁপা হয়ে পড়েছে—মননহীনতাকে লালন করতে করতে, তাঁরাও ক্রমাগত উপহার দিয়ে চলেছেন কিছু 'ম্যাজিনো লাইন।'

এই অভ্যাসের দাসত্ব, আত্মনির্মাণে ডায়লেকটিক্সের অভাব শুধু তাঁদের কবিতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এমন নয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার নির্জীবতার ওপরও এর প্রভাব অপরিসীম। সমর সেন আর 'কৃত্তিবাস' দাঁড়িয়ে থাকে পরস্পরবিরোধী দুই বিসম মেরুতে, দুই চরম কাব্যতত্ত্বের আঙিনায়। মনন আর অন্তঃপ্রেরণার মিলন যে সম্ভব, আর এই মিলনের মাধ্যমেই ঘটতে পারে নিষ্প্রাণ বাংলা কবিতার রেজারেকশন, সেই সত্যটাই আড়ালে চলে যাচ্ছে ক্রমশ।

৩

'সমর সেনের কবিতা'য় আমরা লক্ষ্য করি সুস্পষ্ট ৬টি পর্যায় বিভাজন। এই সচেতন পর্যায় বিভাগ প্রমাণ করে যে সমর সেন নিজে তাঁর কবিতার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন পুরোমাত্রায়। কিন্তু, ১৯৩৭-৪০ এই সময় সীমার অন্তর্গত কবিতাগুলির পরে দেখা যায় খুব সুস্পষ্টভাবে পাল্টে যাচ্ছে

তাঁর কবিতার ধাঁচ, তাঁর প্রকাশভঙ্গী। তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে আসছে 'আনে যারা নাগরিয়া ঘরে ঘরে / সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা / তাদের মিতালি খুঁজি' ধরনের একমাত্রিক দীন উচ্চারণ। আরও অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য এই যে, সমর সেনের প্রথমদিককার কবিতায় 'কলকাতা' শহর একটা বড় স্থান নিয়েছিল। 'খিদিরপুর ডক'; 'কিম্বা 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' বা 'কালীঘাট ব্রীজ' চকিতে একান্ত কলকাতাবাসিদের মনে তৈরি করতে পারত নতুন আর বিশেষ অনুভূতি। কিন্তু পরবর্তী দিনগুলিতে প্রথমে দিল্লি ও পরে রাশিয়া প্রবাসের ফলে হারিয়ে যেতে লাগল। এই ধরনের বিশেষ নগরের অ্যালিউশান। 'চাঁদনী চকে শিস্ দেয় এ. আর. পি. সর্দার' ছাড়া পরবর্তিকালের কোনো কবিতাতেই খুঁজে পাওয়া যায় না একান্তভাবে দিল্লি শহরকে, আসে না রুশ কোনো শহরের অনুষঙ্গ। বিশেষভাবে কলকাতা তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অভিঘাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কলকাতা-কেন্দ্রিক এই বিশেষ চিত্রকল্পের ব্যবহার সমসাময়িক কোনো কবির রচনাতেই এত নৈপুণ্যে ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে হারিয়ে যেতে লাগল এই ধরনের উপমার প্রধাবন। তবু, যে তির্যক, শ্লেষাত্মক জীবনদৃষ্টির চিহ্ন তাঁর প্রথম যুগের কবিতায়, যে কল্পনা আর মনীষার সম্মিলিত উচ্ছ্বাস; সেই ব্যতিক্রমী প্রত্যয়েই আজও আমরা খুঁজে পাই আশ্রয়:

'এখানে কি কোনোদিন বসন্ত নামবে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত ?
আর কোনোদিন কি মুছে যাবে
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি এক মেয়ের প্রেম।
উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ।'

(চার অধ্যায়)

৪

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সমরবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশভঙ্গি বহুবছর পরে আবার খুঁজে পেলেন 'সমর সেনের কবিতা'-র শেষ কবিতা 'জন্মদিনে'-র মধ্যে। আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা এই কবিতায় যেন তিনি ঘোষণা করেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিবৃত্ত। কাব্যজগত থেকে যে তিনি সরে যাবেন এক ব্যর্থতাবোধে, হতাশায়, কবিতাটির শেষাংশে যেন তারই পূর্ব ঘোষণা।

এই কবিতাতে পৌঁছে অনেকটা স্বীকারোক্তির মত তিনি চিহ্নিত করে তার কাব্যপ্রেরণায় প্রাণবন্তগুলিকে। সেখানেও আবার আমরা শুনতে পাই 'বাগবাজারী রকে আড্ডার মৌতাত, / বালিগঞ্জের লপেটা চাল, / আর ডালহাউসীর আর ক্লাইভ স্ট্রিটের হীরক প্রলাপ, / ডকে জাহাজের বিদেশী ডাক /'-এর কথা। বুঝতে পারি আমরা, দিল্লি বা সুদূর রুশদেশ নয়, সমরবাবুর কবিতার স্থিতি এবং মুক্তি কলকাতাকে কেন্দ্র করেই। এই নগরে পুর্নবার ফিরে আসার পর যদি তিনি চেষ্টা করতেন কবিতা লেখার, অনুমান হয়, হয়ত আমরা আবার লাভ করতাম তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, দ্যুতিময় উচ্চারণ। কিন্তু সে আশা ফলপ্রসূ হয়নি। পরবর্তী জীবনে নেহাত-ই বান্ধবীদের 'আদেশে বা অনুরোধে' কিম্বা তাঁদের সঙ্গে 'বাজি ফেলে' লেখা[৮] টুকরো কবিতাকটি ছাড়া আমাদের প্রাপ্তির ভাণ্ডার শূন্য।

আজ শোকের দিন। কবিতা থেকে সরে গেলেও আমাদের কাছে সমর সেনের শারীরিক অস্তিত্বটাই ছিল অনেক স্বস্তির। আজ এই শূন্যতার দিনে, যন্ত্রণার দিনেও মনে পড়ে মৃত্যু নিয়ে তাঁর শাণিত বিদ্রুপ :

'মৃত্যুর পরে সব শেষ।
কিছু আহা-উহু, বেশি
দুর্নাম
চেলারা নতুন গুরুকে
করে প্রণাম,
বিধবার ঠোঁটে থাকে পানের রেশ।'

(উড়ো খৈ : ৪)

সূত্র :

১। কৃত্তিবাস। দশম সংকলন। ১৩৬৫।
২। নভেম্বর। ১৯৮৭
৩। প্রেমেন্দ্র মিত্র। সমর সেন প্রসঙ্গে দু-একটি কথা। অনুষ্টুপ। 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৮।
৪। বাংলা কবিতা—সমর সেন। কবিতা পত্রিকা। বৈশাখ ১৩৪৫। বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা।
৫। তদেব।
৬। উড়ো খৈ : ৪। সমর সেন। ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৭। বাবু বৃত্তান্ত।
৭। একটি কবিতা লেখা—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি।
৮। ভূমিকা। বাবু বৃত্তান্ত—সমর সেন।

কারাবাসে তিন বছর

অবনী লাহিড়ী

৩১ বছর পর লেখা এই স্মৃতিচারণে অনেক কথা স্মরণে নেই ও অনেক ঘটনা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভুল হয়ে থাকে তার জন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল। অনেকে ধরা পড়ে দমদম, আলিপুর, প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হলেন। আমরা যারা গা ঢাকা দিতে পারলাম তারা নানা ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে গ্রামে, গঞ্জে, শ্রমিক বস্তিতে ছড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু বেশি দিন নয়। ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি আমিও পুলিশের বেড়াজালে ধরা পড়ি।

প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকতেই পুরনো সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে কি সাদর অভ্যর্থনা। জেল গেট থেকে ভেতরে ঢুকেই একটি পুকুর, তার তিনদিক ঘিরে বন্দীদের ওয়ার্ডগুলো। এক একটি ওয়ার্ডে ২৫ থেকে ৩০ জন বন্দীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট ৮টি ওয়ার্ডের ৭টিই কমিউনিস্ট বন্দীদের বাসস্থান। ২০ নং ওয়ার্ডে আমার থাকার জায়গা ঠিক হল। পাশেই ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে দরজার সামনেই তিনটি লোহার খাট। কমরেড চিন্মোহন, সুনীল বোস (কাটু) আর ঋষি ব্যানার্জি। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ১৮ নং ওয়ার্ডের এই কোণায় গল্পের আসর জমত। চিন্মোহনের গল্পের যেমন অফুরন্ত

ভাণ্ডার ছিল তেমনি গল্প বলার ক্ষমতাও ছিল। জেলখানায় গতানুগতিকতার আবহাওয়ায় মনের গুমট ভাবটা হাল্কা করে দিতে চিন্মোহনের গল্পের জুড়ি ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠল ১৮ নং ওয়ার্ডের কোণাটার সঙ্গে।

কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলল না। মাস কয়েকের মধ্যেই জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোলমাল শুরু হল। নভেম্বরের মাঝামঝি এই গোলমাল মুখোমুখি সংঘর্ষের রূপ নিল। জেলকমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজবন্দীদের ওয়ার্ডের ভিতর জেলরক্ষীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। ওয়ার্ডে ওঠার মুখে সিঁড়িতে ব্যারিকেড তৈরি হল। শোবার খাট, পড়ার টেবিল দিয়ে। ওয়ার্ডে ঢোকার প্রধান ২টি সিড়ির একটির মুখে ব্যারিকেড রক্ষা করছিল যাঁরা, তাদের নেতৃত্বে ছিলেন চিন্মোহন। শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী এই মানুষটি যে ব্যারিকেডের সংগ্রামে এমনি করে আগুনের মত জ্বলে উঠতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। সশস্ত্র রক্ষীদের নিচে থেকে উপরে উঠে আসার প্রচেষ্টা বারে বারে ব্যাহত হল। জেলকর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা বোধহয় আগেই আন্দাজ করেছিল। দেখতে দেখতে বাইরে থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে পৌঁছল। চিন্মোহনের দলটি তখনও ১৮ নং ওয়ার্ডের সিঁড়ির ব্যারিকেড রক্ষা করছে। কিন্তু আক্রমণ এলো অন্যদিক থেকে। ওপরের ওয়ার্ডের খোলা জানলা দিয়ে কাঁদুনে গ্যাসের শেল বৃষ্টি হতে লাগল। প্রায় ২০০ বন্দী রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। অনেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। বন্দী ওয়ার্ডের চার দেওয়ালের মধ্যে কাঁদুনে গ্যাসের কি মারাত্মক ফল আগে তা কেউ ভাবতে পারেনি। প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়তেই ব্যারিকেড সরিয়ে সশস্ত্র বাহিনী ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকে এল।

কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রত্যেককে আলাদা সেলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পাঁচিল ঘেরা প্রাঙ্গনে এই একক সেলগুলি। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথে কারারক্ষী ও সাধারণ কয়েদীদের আক্রমণ শুরু হল। একজনের পর একজন সেলে ঢুকছে—রক্তাক্ত, ছিন্ন পরিধেয়, খুঁড়িয়ে হাঁটছে। চিন্মোহনকে নিয়ে এল আমার পাশের সেলে। আসার পথে লাঠির আঘাতটা পড়েছিল মেরুদণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায়। বহু বছর পর সেই আঘাতের জের প্রকাশ পেয়েছিল—ওঁকে সামনে খানিকটা ঝুঁকে চলাফেরা করতে হত শেষের দেখতে দেখতে solitary সেলগুলো ভরে গেল। অনেকেই আহত। আমাদের সেলের সারির শেষ দিকে ছিলেন

জেলকমিটির সম্পাদক ট্রামশ্রমিকনেতা কালী ব্যানার্জি। তার পাশে অধ্যাপক কবি পারভেজ শাহেদি। বন্ধ সেলের ভিতরেই ঠিক হয়ে গেল অনির্দিষ্টকাল অনশন ধর্মঘট। নাম মনে নেই কে যেন বললেন এবার একটা গান হোক। সব রুদ্ধ সেলগুলো থেকে একসঙ্গে আওয়াজ উঠল "জাগো জাগো সর্বহারা, অনশনবন্দী ক্রীতদাস শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া। উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।"

সেইদিন থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু হল। প্রথম কয়েকদিন রান্না করা অনেক রকমের খাবার জিনিশ পাত্রভরে সেলের সামনে রেখে দেওয়া হত কর্তৃপক্ষের আদেশে। বলাবাহুল্য কোন কমিউনিস্ট বন্দী সে খাবার স্পর্শ করত না। অনশনের তের দিনের দিন শুরু হল জোর করে খাওয়ানো। একে একে সেলগুলো খোলা হত ও সঙ্গে সঙ্গে ৫৬ জন যমদূতের মত কারারক্ষী অনশনরত বন্দীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধরাশায়ী করত। তখন ওদের সঙ্গী ডাক্তাররা নাকের ভিতর দিয়ে রবারের নল ঢুকিয়ে দিতেন এবং দূরে রাখা বালতি থেকে তরল খাদ্য একটা বড় ফানেলের সাহায্যে ঐ নল দিয়ে বন্দীর পাকস্থলিতে ঢেলে দিতেন। চিন্মোহন আমার পাশের সেলেই ছিলেন। মনে পড়ে কি অবিচল সংকল্প নিয়ে প্রতিদিন তাঁকে ঐ কারারক্ষীদের সঙ্গে লড়তে দেখেছি। সেই মৃদুভাষী মানুষটি আবার এই সংগ্রামের সামনের সারিতে সহযোদ্ধা। তখনকার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রাজবন্দীদের কাউকে না খেয়ে মরতে দেব না। শুধু তাদের দাবির সমর্থনে জেলের বাইরে যে মেয়েরা শোভাযাত্রা করে বেরিয়েছিল তাদের ৪ জন নেত্রী স্থানীয়কে তাঁর সশস্ত্রবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল। ৫৩ দিন পর কংগ্রেসী সরকার আমাদের দাবি মোটামুটি মেনে নিলে অনশন প্রত্যাহার করা হয়। জেলের মহিলা ওয়ার্ডে মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন যাঁরা একইসঙ্গে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন তাঁরাও অনশন প্রত্যাহার করেন। কিন্তু দিন পনেরর মধ্যে খবর পাওয়া গেল যে প্রেসিডেন্সী ও দমদম জেল থেকে বেছে বেছে প্রায় ১০০ জন বন্দীকে ভুটানসীমান্তে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বক্সা দুর্গে স্থানান্তরিত করা হবে। সরকার বোধহয় ভেবেছিলেন রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকারের দাবিতে বারে বারে যে সংগ্রাম হচ্ছে তার প্রতিকার একমাত্র লোকালয়ের বাইরে জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা এই দুর্গে এই নির্বাসন যেখান থেকে বন্দীদের প্রতিবাদের কোন খবরই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের কাছে এসে পৌঁছাবে না। বৃটিশ আমলেও এই লক্ষ্য

নিয়েই ১৯৩০ সালে বক্সার সীমান্ত দুর্গকে বন্দীশিবিরে রূপান্তরিত করা হয়।

যাহোক আমরা খবর পেলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুশকিলে পড়েছেন। গোয়েন্দাবিভাগ জানিয়েছে যে কমিউনিস্ট বন্দীদের বক্সা দুর্গে স্থানান্তরের পথে পথে বিহার অথবা নেপাল সীমান্তে বন্দীবাহী ট্রেনটি আক্রান্ত হতে পারে বন্দীদের ছিনিয়ে নেবার জন্য। তবে কি এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবে ?

১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারি মাস—তখন আমরা দমদম সেলুলার জেলে। সন্ধের পরেই যার যার সেলে অসতেই দরজায় তালাবন্ধ হয়ে গেল। রোজকার মত আমরা সান্ধ্যপড়াশুনায় মন দেবার ব্যবস্থা করছি এর মধ্যে যন্ত্রী এসে সেলের তালা খুলে জানাল জেল গেটে তলব পরেছে এমনই যেতে হবে। একে একে সবাই জমা হল জেল গেটে। সেখানে দেখা চিন্মোহনের সঙ্গে। তাঁকেও আনা হয়েছে। সবাই আশ্চর্য হলাম জেলগেটে কবি পারভেজ শাহেদিকে দেখে। মাঝে মাঝেই তিনি বলতেন যে তার দৃঢ়বিশ্বাস সামনের মাসেই তাকে ছেড়ে দেবে কারণ সরকার বুঝতে পেরেছে যে তাঁকে মিছিমিছি ধরে এনেছে। মুক্তি দেওয়ার বদলে তিনি এখন বক্সা জেলে সহযাত্রী আর বক্সা জেলে তাঁকে থাকতে হয়েছিল জেলখানা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। দমদম জেল থেকে এয়ারপোর্টে পৌছে বুঝলাম যে আমাদের আকাশপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় সবারই সেই প্রথম আকাশপথে ভ্রমণ।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আসাম এবং ডুয়ার্সে অনেকগুলি এয়ারপোর্ট তৈরি হয়েছিল সৈন্য চলাচলের জন্য। তার একটি ডুয়ার্সের হাসিমারা চা বাগানের পাশে। আমাদের নিয়ে ডাকোটা বিমানটি যখন হাসিমারা পৌছল তখন সকাল ১০টা। হাসিমারা থেকে বক্সা দুর্গ প্রায় ১০।১২ কিলোমিটার। ডুয়ার্সে রাজাভাতখাওয়া থেকে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা উঠেছে পাহাড়ের দিকে। কবে কোথাকার রাজা ভাত খাওয়ার জন্য কেন এই ঘনজঙ্গলে এসেছিলেন জানিনা। কিন্তু সেদিনকার রাজার বন্দীদের ওখানে খাওয়া জুটলোনা। প্রায় ৫০জন বন্দীর মধ্যে নীরদ চক্রবর্তী, সতীশ পাকড়াশির মত বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল। কমরেড সেহানবিশ ছাত্র কমরেড দের সঙ্গে প্রায় মার্চ করে জেলের দরজায় যখন পৌছলেন তখন বিকাল। দীর্ঘ ৫ বছর পর রাজবন্দীদের জন্য আবার বক্সা দুর্গের দরজা খুলবে। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে এই জেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫০-এ স্বাধীন ভারতের প্রথম অধ্যায়ে কমিউনিস্ট বন্দীদের স্বাগত জানাতে

আবার সেই দরজা খুলল। কমরেড সেহানবীশ বললেন আমরা এই জেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান করব। প্রাচীন কমিউনিস্ট কমরেড নীরদ চক্রবর্তী কারাগার উদ্বোধন করলেন। কর্তৃপক্ষ কোন বাধা দিলেন না। আমাদের থাকার জায়গা হল যে ব্যারাকে তার পিছনেই দুর্গপ্রাচীর মোড় নিয়েছে; বাইরে মাথার উপরে সশস্ত্র সেন্টিবক্স। পরবর্তী ২ বছর ঐ ব্যারাকে আমাদের একসঙ্গে কেটেছে।

দমদম জেল থেকে পরের ব্যাচগুলোতে অনেকে এলেন—আবদুর রেজ্জাক খান, কৃষ্ণপদ ঘোষ, নরেশ দাশগুপ্ত, অবনী মুখার্জি, শিবশঙ্কর মিত্র, মহম্মদ ইলিয়াস, কবি সুভাষ মুখার্জি, অজিত গাঙ্গুলি, যামিনী সাহা প্রভৃতি। দেখতে দেখতে জেলের সব ব্যারাকগুলো ভরে গেল।

কমরেড সেহানবীশকে কোনদিন উত্তেজিত হতে বা রাগ করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সব রাজনৈতিক আলোচনায় যেমন তাঁর অংশগ্রহণ চোখে পড়ত তেমনি খাঁ সাহের একাদশের সাথে সতীশ পাকড়াশি একাদশের ফুটবল খেলায় তাঁকে কারাপ্রাচীরে ঠিক বাইরের সমতল জায়গায় সারামাঠ দৌড়ে বেড়াতে দেখা যেত। বন্দীদের মধ্যে যাঁরা—আমাদের হিসাবে ভাল খেলতেন যেমন ডাঃ মনোরঞ্জন রক্ষিত, নৃপেন ব্যানার্জি, কৌস্তুভ মুখার্জি, প্রশান্ত শূর, খগেন রায়চৌধুরী—এদের কারো থেকেই কমরেড সেহানবীশের উৎসাহ কম ছিল না। আবার যখন রান্নাঘরের দায়িত্ব পড়ত কয়েকজনের উপর তারমধ্যে কমরেড সেহানবীশ থাকলে—তাঁকে দেখা যেত কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে খাঁ সাহেবের তত্ত্বাবধানে রান্নাঘরে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

১৯৫১ সাল নিঃসন্দেহে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি সংকট মুহূর্ত। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ২য় পার্টি কংগ্রেসে বিপুল সমর্থন নিয়ে শোষিত জনগণের ক্ষমতা দখলের যে পথনির্দেশ গৃহীত হয়েছিল শাসকশ্রেণীর নির্মম আঘাতে সে পথ তখন অবরুদ্ধ। শ্রমিক, কৃষক জনতাকে সংগঠিত করে এগিয়ে যাওয়ার পথ সন্ধানে সবাই মগ্ন। নেতৃস্থানীয় অনেকেই অজ্ঞাতবাসে, অনেকে কারারুদ্ধ। গভীর মতভেদের ঢেউ জেলখানাতে এসে পৌঁছেছে—রাশিয়ার পথে না চীনের পথে? সশস্ত্র সংগ্রাম না সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ? আলোচনা চলছে ব্যারাকে ব্যারাকে, কারাগারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে গভীর বিশ্লেষণের এই চেষ্টা কখনও কখনও মত-সংঘর্ষে পরিণত হয়ে রাজনৈতিক তাপমাত্রার বিপজ্জনক ঊর্ধ্বগতি ঘটিয়েছে। কিন্তু এই সংকট মুহূর্তে যাঁদের কখনও উত্তেজিত হতে দেখিনি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে

কমরেড় সেহানবীশের নাম। গল্প বলার তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল তাই বিষয়বস্তু এবং বলার ভঙ্গী সবাইকে এত আকর্ষণ করত। বহুবার শোনা গল্প "হরধনুভঙ্গ" অথবা 'বাঘের সর্ট জাম্প প্র্যাকটিশ' অথবা 'পাত্রের পেঁয়াজ খাওয়ার গল্প' বারে বারে শোনা সত্বেও আবার শুনতে কারও আপত্তি ছিল না।

মতাদর্শে অবিচল অথচ সর্বক্ষণ অনুসন্ধিৎসু মন, বিপ্লবী দৃঢ়তা অথচ কমিউনিস্ট মানবতাবোধ স্বল্পভাষী এই মানুষটিকে বয়সের সীমারেখা পেরিয়ে ছোটবড় সবাইএর কাছে এত প্রিয় করে তুলেছিল।

বৈশাখের রুদ্রদাহ থেকে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্য

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শিরোনামটি প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশেরই একটি লেখা থেকে নেওয়া। লেখাটির নাম 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম'। এই পরিচয় পত্রিকাতেই ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত হয়। আসলে এটি একটি অভিভাষণ। বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ অধিবেশনে পড়বার জন্য প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। তখন জ্‌দানভ-তত্ত্বের খুবই রমরমা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবিলম্বে বিনা শর্তে কৃষক-মজুরদের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই নাকি তাদের মন বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ হবে এবং নতুন বিপ্লবী সাহিত্যের বনিয়াদও রচিত হবে তাতেই। এই অতিবামপন্থী যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে গারোদির প্রতিবাদ তৎকালীন প্রগতি শিবিরের লেখকদের অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও জ্‌দানভ তত্ত্বেরই অনুকূলে। শ্রী সেহানবীশের রচনাটির শেষাংশে সেই একই তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল, "যেটা প্রথমে করবার সেটা হল প্রত্যেক শিল্পীকে সাহিত্যিককে যুক্ত হতে হবে মজুর-কিষাণ-আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে। সৈনিক হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর কথা উঠবে কাজ ভাগাভাগির, বিচার হবে নতুন ফসল ভালো না মন্দ, খতিয়ে দেখা যাবে লাভক্ষতি। ইতিমধ্যে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে।'

এই মতবাদ যে তিনি চিরকাল আঁকড়ে ধরে থাকেন নি তার প্রমাণেরও অভাব নেই। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত '৪৬ নম্বর একটি আন্দোলন প্রসঙ্গে' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এই প্রবন্ধটি সম্পর্কেই লেখকের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি শোনা যায়, 'এখানে যে মত প্রকাশিত হয়েছে তাকে আজ আমি ভ্রান্ত ও আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করি।' কিন্তু দ্বিধা বোধহয় প্রবন্ধটি রচনার সময়েও ছিল। তাই 'রাবীন্দ্রিক' চিন্মোহন সেহানবীশ সেই চরম সংকট-মুহূর্তেও ঘোষণা করতে পারেন, 'বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।' তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি কখনোই এই ভরসাটি হারান নি।

অথচ এমন নয় যে তিনি দূর থেকে সমসাময়িক কালের ঘাত-প্রতিঘাতকে লক্ষ্য করে গেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, প্রগতি লেখক সংঘ, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, শান্তি সংসদ, গণনাট্য সংঘ এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টি—সব কিছুই তাঁর আত্মার অতি নিকট আত্মীয়। এছাড়া রণদিভে পর্বে তিনি নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে দীর্ঘকাল কারাবাস করেছেন, জেলে দীর্ঘকাল অনশন ধর্ম-ঘটেও ছিল তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। সমকালীন কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনা কখনো তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সোভিয়েতের তিনি গভীর অনুরাগী কিন্তু চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতিও তিনি সতর্ক দৃষ্টি দেন। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে পিকিং-এ সমগ্র চীনের লেখক ও শিল্পীদের যে সম্মেলন হয়েছিল তার কার্যবিবরণী সম্পর্কে পরিচয়ের পাতাতে তিনি যে কেবল বিস্তৃত আলোচনা করেন তাই নয়, এ সম্পর্কে মাও-সে-তুঙের নির্দেশকেই তিনি বহুমান্য করে নেন। তিনিও বিশ্বাস করতে থাকেন, 'জনসাধারণের সংস্কৃতির অর্থ কৃষকের সংস্কৃতির মান উঁচু করা।' আর এই জন্যই বোধ হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে পল্লীকবি, কবিয়াল, দোতারাবাদক প্রভৃতিকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোতে তাঁর অপরিসীম উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এমন কি পার্কসার্কাসে রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত শান্তিমেলাতেও তাই ভারতবিখ্যাত গায়ক ও বাদকদের পাশাপাশি লোক-কবি লোক-গায়কদের সমান গুরুত্ব থাকে। কারণ এর দ্বারাই গ্রাম ও শহরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠতর করা যায়। মোট-কথা বিপ্লবোত্তর চীনের নতুন সাহিত্য এবং নতুন সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি তখন তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। সানন্দে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, 'জনসাধারণের সঙ্গে

লেখক শিল্পীর সত্যকার একাত্মতা এতদিন পরে সর্বজনবোধ্য সাহিত্য ও জাতীয় ভাষার সমস্যার সমাধান করেছে। সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে নূতন বক্তব্য।' (একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে)

কিন্তু তারপরেই চীনের সাংস্কৃতিক জগতে যেন পিছু হটার পালা। সেখানে সুরু হল সাংস্কৃতিক-বিপ্লব। প্রলেটকাল্ট পর্বের কাণ্ডকারখানা বা ঠাণ্ডাযুদ্ধের সূচনা পর্বে প্রচারিত জ্‌দানভ তত্ত্বের গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার সঙ্গে এর অনেক মিল। এই উন্মত্ত সংস্কৃতিনীতি শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশের মার্কসবাদ এবং মানবতাবাদের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিমূলেই যেন আঘাত হেনেছিল। এ কেবল বৈশাখের রুদ্রদাহ, আষাঢ়ের স্নিগ্ধতার কোন চিহ্নই এখানে নেই। অথচ, এই উভয়ের মিলনেই তো সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশ ও সার্থকতা। বিপ্লবোত্তর চীনের নতুন সাহিত্যনীতি সাহিত্য ও জনসাধারণ এবং সাহিত্য ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করেছিল। এরই পাশাপাশি আবার জাতীয় এবং লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছিল। 'রুদ্ধদ্বার নীতি'কে বর্জন করে সেখানে গ্রহণ করা হয়েছিল খোলা দরজার নীতি'। চীনের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং ইউরোপের মনীষীবৃন্দ সেখানে তখন সাদরে ও সশ্রদ্ধায় গৃহীত। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উন্মত্ততায় শেকস্‌পীয়ার-তলস্তয়-রঁলা, বেঠোভেন-মোজার্ট-বাখ সব লাঞ্ছিত ও নির্বাসিত হলেন, এবং রেডগার্ডদের হাতে দেশী ও বিদেশী রাজপুরুষেরা হতে লাগলেন অপমানিত। আর এইভাবে সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল ভিত্তিভূমিটিই আক্রান্ত হল। আর তাই বেদনাকাতর চিত্তে শ্রীযুক্ত সেহানবীশকে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হয়, 'এই অপপ্রয়াস যুক্তিবিরোধী, মানবতাবিরোধী ও তাই মার্কসবাদ বিরোধীও, তা বলাই বাহুল্য।' (ফুল ও আগাছা)

এই ধরনের রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্ধ গোঁড়ামির পরিচায়ক এবং তা সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী বলেই এর প্রতি লেখকের প্রবল আপত্তি। তাঁর কাছে মার্কস এবং এঙ্গেলসের শেকসপীয়ার-প্রীতি, বছরে বছরে ইসকাইলাস পাঠ, Critique of Political Economy-র ভূমিকায় মার্কসের গ্রীক নাটকের কালজয়ী আকর্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য, লেনিনের তলস্তয়কে 'মহৎ শিল্পী' বলে ঘোষণা করা—এইসব অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। লেনিনের এই সিদ্ধান্তেই তাঁর গভীর আস্থা 'Proletarian culture must be the result of the natural development of the stores of knowledge which mankind has accumulated under the yoke of capitalist society, landlord

society and bureaucratic society.' কিন্তু চিন্মোহন সেহানবীশ এখানেই থামেন নি। অকারণ নিন্দা বা কুৎসায় কোনদিনই তিনি আগ্রহী নন। এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে সার্থক রবীন্দ্রশিষ্য। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতায় উল্লসিত বোধ করার তাঁর কোন কারণ ছিল না। বরং এর ফলে সমাজতন্ত্রের শত্রুশিবিরে উল্লাসের বান-ডাকায় তিনি বেদনাকাতর। সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে এব্যাপারে তাঁকে বারবার বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেছে। আর এই ধরনের ব্যর্থতার মূল উৎস সন্ধানও মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর তখন অবশ্য কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে যখন স্তালিনের অন্তিম-পর্বের অনেক অনাচার ও রক্তাক্ত প্রতিহিংসার কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তখনই নানাপ্রশ্ন অনেকের মনে উঠতে আরম্ভ করে। তৎকালীন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তোগলিয়াত্তির মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর জবানবন্দীতে জানা গেছে যে 'ব্যক্তি-পূজার ম্যাজিক সূত্র দিয়ে সব অনর্থের ব্যাখ্যা' তিনি শেষপর্যন্ত মেনে নিতে পারেন নি। শ্রীযুক্ত সেহানবীশও যে তা খোলা মনে মেনে নেন নি এই 'ফুল ও আগাছা' প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। ব্যক্তিপূজা তখন নিশ্চয় ছিল এবং তার ফলাফলও যে খুবই হানিকর হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে বারবার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভুল হবে কেন? কেনই বা শিল্পসাহিত্য বা সংস্কৃতি বিচারের মাপকাঠিটি খুশীমত ছোট বড় করা হবে? এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে একটি দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে তাঁকে উপনীত হতে দেখা যায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রায় একমাত্র লক্ষ্যই হয়ে উঠেছে উৎপাদনযন্ত্রের উপরে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা এবং তার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। সন্দেহ নেই এরই ওপর বেশী জোর পড়া উচিত। "কিন্তু ঐ প্রধান প্রাথমিক দায়গুলি বাদে জীবনের অন্যান্য দিকের প্রতি প্রায় নিস্পৃহ থাকার সঙ্গে মার্কসবাদের অখণ্ড চৈতন্যের ধারণার বা সমগ্রতাবোধের সঙ্গতি কোথায়?" (ঐ)

প্রশ্নটি অত্যন্ত পুরনো, এখনও এর কোন্ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি। বোঝাই যায় আরও দীর্ঘকাল ধরে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যেতে হবে। কিন্তু যে মার্কসবাদীর মনে এই প্রশ্ন উপযুক্ত সময়ে উপস্থাপিত হয় তিনি প্রকৃতই মুক্তমনা। আবার মার্কসবাদের মূল প্রবক্তাদের রচনার মধ্য থেকেই এই ধরনের একপেশে ভ্রান্তির উৎস সন্ধানেও তাঁকে উদগ্রীব হতে দেখা গেছে।

ব্লককে লেখা এঙ্গেলসের একটি চিঠি এই প্রসঙ্গে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। চিঠিটির অংশবিশেষ তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হতে দেখা গেছে— "Marx and I are ourselves partly to blame for the fact that the younger people sometimes lay more stress on the economic side than is due to it. We had to emphasize the main principle vis-a-vis our adverseries, who denied it, and we had not always the time, the place or the opportunity to give their due to the other elements involved in the interaction." এই 'other elements'-কে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে গেলে সহজসরলীকরণের পথ গ্রহণ করতে হয়। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তির হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের হাতে এলে মানসিক অসম্পূর্ণতা বা দৈন্য সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে এই ধরনের একপেশে ধারণার মোহে তখন আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সেহানবীশ কেবল মার্কস বা এঙ্গেলসের বক্তব্যই তুলে ধরেন নি অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেও ফিরে গেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে চরকা নিয়ে বিতর্কের সময় রবীন্দ্রনাথও আমাদের স্বরাজসাধনার একটি প্রচণ্ড ফাঁকির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। আগে স্বাধীনতা, তারপরে স্বদেশের সাধনা এই তত্ত্ব হাস্যকর, কারণ স্বাধীনতালাভের যোগ্য হতে গেলে মানুষকে অন্তরে পূর্ণ হতে হবে—"স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যকভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। তাদের একটিকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে উঠে।" (স্বরাজসাধন, কালান্তর)

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই হোক, প্রগতি শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাই হোক অথবা অর্থনীতিবাদ-নির্ভর শিল্পসাহিত্য বিষয়ক আলোচনার প্রসঙ্গেই হোক শ্রীযুক্ত সেহানবীশের বারবার এইভাবে রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই। মার্কসবাদ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং উদ্বোধনের পথের সন্ধান দেয়, খণ্ডের সাধনা বা মানবতার বিকৃতির সাধনা তার নয়। আর রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই পরিপূর্ণ মানবতার উপাসক। আমাদের জীবনের

স্মরণ ঃ চিনুদা

কার্তিক লাহিড়ী

স্মৃতি সততই সুখের, তার রোমন্থনও।

স্মৃতি বিশ্বাসঘাতক তবু, তার এলাকা বিরাট, হর্ম্যও বিশাল, সেই হর্ম্যে অসংখ্য কুঠরি অজস্র অলিন্দ আলো আঁধারিময়, ছায়াচ্ছন্ন তার অলি-গলি, সেই কুঠরি অলিন্দ অলি-গলির কোনটা আগে কোনটা পরে তার হদিশ মেলা ভার খুব, হয়ত আগের কোঠায় এই মুহূর্তে জমা আছে দশবছরের স্বপ্ন, পরমুহূর্তে সেখানে জমে যায় পনেরো বছরের অন্ধকার।

বা একই খোপে জমা থাকে এর ওর তার নানা কথা টুকরো টুকরো হাজার খান হয়ে, একটা তুলতে গিয়ে আরেকটা ছুঁয়ে ফেললেই—ব্যস্, কথা নেই আর, তার ঢাকনা খুললে পিলপিল করে বেরিয়ে পড়ে এটা ওটা সেটা, একে ছেড়ে ওকে ধরতে গেলে আসলটাই ধরা হয় না তবু।

আর বেনোজল তো হামেশাই ঢুকে পড়তে পারে তার দর দালানে, তাই স্মৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করলে সাপ ব্যাঙ হয়ে যাবে আম হতে পারে জামরুল, যেটা জানতে ধরতে চাইছি সেটা লাপাত্তা হয়ে যায় কোথায় তখন, তার তল্লাসে জাঁদরেল গোয়েন্দা লাগালেও তার কিনারা করতে পারবে কিনা সন্দেহ, প্রচণ্ড মনোচিকিৎসক হার মেনে যাবেন সেই তদন্তে…

আর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হলে তো কথাই নেই, তখন এ ওর ঘাড়ে পড়ে একেবারে মিথ্যেবাদী করে দিতে পারে একজনকে, স্মৃতির টান এড়ানো যায়

না অথচ, সে টানবেই কারণ টানাই তার মর্জি তার ধর্ম। তখন উপায় থাকে না আর···

নামতেই হয় সিঁড়ি বেয়ে তায় মণিকোঠায়, সে কোঠার ঝলসানো আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও খুঁজতে হয় তাকে তবু

যে চোখের সামনে নেই, একদা ছিল অথচ

চিন্মোহন সেহানবীশ আমাদের কাছে চিনুদা ছিলেন স্পষ্টভাবে বেশ।

'পরিচয়' অফিসে কী তাঁর বাড়িতে মজা করে বেশ বলছিলেন—ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উপাধি সেহানবীশ শুনে বললেন, ইংরেজিতে, আই মেট্ ওয়ান্ সেহানবীশ ইন্ বার্মা, আর ইউ দ্যাট্ সেহানবীশ? চিন্মোহন হেসে উত্তরে বললেন। তিনি আমার বাবা ছিলেন

তা শুনে ভূপেন দত্ত মশাইয়ের সে কী হাসি!

তো চিনুদাকে প্রথম কোথায় দেখি, তাঁর সঙ্গে কী করে পরিচিত হই—এ-সব মনে থাকার কথা নয় আজ, কত জায়গায় দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে—বাড়িতে, পরিচয়ে, মনীষায়, মাঠে—বোধহয় ট্রামে কখনো হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায়।

কথাও হয়েছে কত—ঝুড়িঝুড়ি, কত বিষয়ে—তবে রাজনীতি নিয়ে মোটেই নয়, তা খেয়াল আছে খুব, বেশীর ভাগ তাঁর কাজের মানে লেখার বিষয়ে, কী করছেন বা কী ভাবছেন তা নিয়ে বা জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের লেখালিখির কথা···বোধহয় রবীন্দ্রনাথ, প্রগতি লেখক শিল্পী সঙ্ঘ, কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, জাতীয় আন্দোলন—এ সবই ছিল তাঁর উৎসাহের মূল বিন্দু, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও ৪৬ নম্বর প্রধান হয়ত।

তখন রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষের উৎসব শেষ হয়েছে, পার্ক-সার্কাস ময়দানের বিরাট মেলাও শেষ, স্বাভাবিক ভাবে অত বড় কাজের পর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ার কথা, কিন্তু মানুষটা হচ্ছেন চিনুদা, তাঁর শ্রান্তি নেই যেন। জোগাড় করছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা খুঁটি-নাটি তথ্য ও খবর, কোথাও কী হচ্ছে না হচ্ছে তার বিবরণ।

আমি চলে এসেছি জলপাইগুড়ি ছেড়ে আগরতলায়, এক গরমের ছুটিতে দেখা হতেই বললেন—তোমাদের ওখানে রবীন্দ্রনাথের উপর একটা ভালো সংকলন গ্রন্থ বেরিয়েছে, সেটা কি করে পাওয়া যায়?

বইটিকে তাঁকে জোগাড় করে দেবো বলতে চিনুদা ভারি খুশি হলেন। মনে হলো—তিনি যেন জীবনের একটা অমূল্য জিনিস সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন,,

অথচ বইটি জোগাড় করতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হলো। এক বন্ধুর সাহায্যে 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' বইটি জোগাড় করে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম শেষমেশ।

শরৎ ব্যানার্জি রোডে তাঁর বাড়িতে মধ্যে মধ্যে নানা বৈঠক বসতো। কলকাতায় থাকলে তাতে যোগ দিতে চেষ্টা করতাম, কোনো কোনো সভায় প্রবন্ধ পাঠ হতো। তেমন এক বৈঠকে অধ্যাপক সুশোভন সরকার শুধু উপস্থিত-ই ছিলেন না। বেশ উষ্ণ আলোচনায় অংশ নিতে দ্বিধা করেন নি তখন, হায়! তিনিও নেই আর···

আগরতলা চলে যাবার পর চিনুদার সঙ্গে যোগাযোগ কিছু কমে আসে, তখন কলকাতায় আমার অবস্থান খুব একটা বেশি দিনের জন্য হতো না, তবু ওই মধ্যে দেখা হতো তাঁর সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ, আর তাঁর সেই হাসি আর প্রশ্ন, কেমন আছো, কি লিখছো? এর মধ্যে আমি 'অরণি' পত্রিকার উপর কাজ শুরু করি এক্ষণ-সম্পাদক নির্মাল্য আচার্যের অনুরোধে, সেই কাজের সূত্রে চিনুদার কাছে বারবার যেতে হয়েছে—গণ্ডা গণ্ডা প্রশ্ন করেছি, সমস্যা রেখেছি তাঁর সামনে সময় অসময়ে, কিন্তু তাঁকে কোনো সময় বেজার হতে দেখিনি। শান্তভাবে হাসি মুখে বলে গেছেন কথা, আশ্চর্য তাঁর স্মরণ-শক্তি খুঁটিনাটি বিষয়ে, আর সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া তো যেন চিনুদার অন্য এক নাম। আমাকে 'অগ্রণী'-র উপর কাজ করতে বলেছিলেন। তাঁর কাছে প্রথমদিককার অগ্রণী'-র ফাইলও ছিল, তিনি তখুনি তাক থেকে পেড়ে দেখাতে চান, আমি নিরস্ত করি তাঁকে।

কথা দিয়েছিলাম 'অগ্রণী'-র উপর কাজ করবো বলে, কিন্তু আজ অব্দি সে কথা রাখতে পারি নি, হয়ত রাখ্তে পারবো কিনা সন্দেহ।

চিনুদার কথা মনে পড়লে একজন অক্লান্ত কর্মীর ছবি-ই প্রথমে ভেসে ওঠে চোখের উপর, মনের পর্দায়—আমরা আজকাল কথার ফানুস হয়ে উঠেছি—সংগঠনের কাজকে হেয় চোখে দেখি, যেন সৃষ্টিশীল লেখক বা বুদ্ধিজীবীদের জন্য সে-কাজ বরাদ্দ নয়। তা করবে তার চেয়ে নীচের থাকের মানুষ-জন।

এ মনোভাবের বিরাট প্রতিবাদ ছিলেন বোধহয় চিনুদা, তিনি কর্মী হবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীও ছিলেন, আর তাই দেখি—কাজকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য তিনি আপ্রাণ খেটে গেছেন মৃত্যুর দরজায় এসেও, তবে এটা দেখেছি—চিনুদা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেন নি কোনোদিনও। বরাবর নেপথ্যে থেকে গেছেন, আর উদ্বুদ্ধ করেছেন সকলকে নানা কাজে লেগে যেতে,

এভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখা প্রচারের যুগে—বিরল ঘটনা খুবই···তাঁর কিছু কিছু ইচ্ছা ও কাজ শেষ হয় নি, এ-বিষয়ে উদ্বেগও লক্ষ্য করেছি অনেক সময়, ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা বলেছেন মধ্যে মধ্যে, ভেঙে পড়েন নি তবু।

কিন্তু হঠাৎ ঝুম্ করে চলে যাবেন, ভাবতে পারি নি কখনো, রবীন্দ্রনাথ বা প্রগতিশীল শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু জানার থাকলে তাঁর কথাই মনে পড়তো প্রথমে, এই তো সেদিন রমেন্দ্র বর্মণ গিয়েছিলেন 'জনযুদ্ধ'-র উপর কাজ করবেন বলে চিনুদার কাছে, একটা চিঠি দিয়েছিলাম মাত্র, চিনুদা তাঁকে কীভাবে সাহায্য করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না যেন ঐ ভগ্নস্বাস্থ্যের মধ্যেও, দিল্লির "অজয় ভবনে'-ও যাতে রমেন্দ্র কাজ করতে পারেন, তার জন্য চিঠিও দিয়েছিলেন তাঁকে।

ছেলেটি এ-সব শুনে খুশি হয়েছিলাম দারুণ, মাত্র একটা চিঠি, আর কাজ করবে শুধু এইটুকু জেনে! ভাবা যায়! তেমন খুশি হই নি বহুদিন···

আজ চিনুদা নেই, সেই খুশির কথা জানাবার উপায় নেই তাঁকে আর কোনো···তবু তাঁকে মনে করতে পারছি। মনে রাখতে পারছি, এটাই বলে দিচ্ছে—চিনুদারা শারীরিক ভাবে অনুপস্থিত থাকলেও তাঁদের আবেগ ছড়িয়ে আছে আমাদের মধ্যে খুব, সেই আবেগ ভোলা মুশকিল···

অপূরণীয় ক্ষতি

ভানুদেব দত্ত

ম্যাকসিম গোর্কি একবার পুশকিন সম্পর্কে বলেছিলেন, "The Colossus Pushkin, our supreme pride and the fullest expression of Russia's spiritual strength." চিনুদার মারা যাওয়ার খবর পাওয়ামাত্রই কেন জানি না কথা ক'টি মনে পড়ল। বিশেষ করে আদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধ, সততা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতির ক্রমিক অবক্ষয় এবং আত্মপ্রচার, এ্যাডহকিজম্ ও ও আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব মনোভাবের দৃষ্টিকটু আধিক্য—সবটা মিলিয়ে যে একটা পরিমণ্ডল তৈরী হচ্ছে, সেখানে তাঁর মৃত্যুতে যেন একটা মহাউজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটে গেল। এ ক্ষতি কেবল কমিউনিস্ট পার্টির নয়, পরন্তু এ ক্ষতি সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের এবং এর বাইরে সাহিত্য, সংস্কৃতি, মৈত্রী ও শান্তি আন্দোলনেরও।

সত্যি, চিনুদা ছিলেন বড় মাপের একজন মানুষ, ঠিক যেন কলোসাসের মত এক বিরাট মূর্তি। একটা জাগর স্বপ্ন নিয়ে তিনি সুদীর্ঘকাল সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্রে নব নব সৃষ্টির সলতে জ্বালিয়ে মানবমুক্তির বন্ধুর পথ পরিক্রমা করেছিলেন সমস্ত রকম সংকীর্ণতা পরিহার করে। পার্টির অভ্যন্তরে মৃণালের বাহু রেখে দিগন্তবিস্তৃত শতদল মেলে দিয়েছিলেন। বলা চলে, পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল ও সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আত্মিকশক্তির পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সুতরাং তাঁর মৃত্যুজনিত এই বিরাট

শূন্যতা বহুদিন ধরেই যে সকলের কাছে অনুভূত হবে—একথা জোর করেই বলা যায়।

চিনুদার অবদান সম্পর্কে লেখার দায়িত্ব তাঁর সমসাময়িকদের। আর তাঁর পরের প্রজন্মদের এই কাজে হাত দেওয়ার আগে সতর্কভাবে ভেবে দেখতে হবে সে কাজে তাঁদের যোগ্যতা আছে কি না। তাঁদের কাছে এটা একটা গবেষণার ক্ষেত্র হতে পারে। কিন্তু একটা কথা বুঝি, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষণীয় যা পেলাম, তার তুলনা মেলা ভার।

চিনুদার মৃত্যুর দূরপ্রসারী অভিঘাত বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিকতার বিচারে কত ক্ষতির মুখে যে পড়ল কত সংগঠন তা বলে শেষ করা যায় না। কোন সংগঠনের তিনি ছিলেন সভাপতি, আবার কোনটার সহ-সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি বা কার্যকরী সমিতির সদস্য। এই সব সংগঠন চিনুদাকে হারিয়ে কেবল পদশূন্য হয়ে পড়ল তাই নয়, হয়ে পড়ল অভিভাবকশূন্যও। বিভিন্ন সংগঠনের লোকজনেরা যেমন তাঁর কাছে গেছেন নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়ে, তেমনি তিনিও তাঁদের সকলকে কাছে ডেকেছেন ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। কথাটা ঠিক, তিনি ছিলেন সকলের "মনের আশ্রয়।"

তবু আমাদের দীনতার বোধহয় শেষ নেই, তাই আমরা ভাবি, তিনি বোধহয় কেবল লেখকদের, বা শান্তি-মৈত্রী-সংগঠনের বা বিশেষ কোন সংস্কৃতি সংগঠনেরই। এই প্রচেষ্টা তিনি নিজেও তাঁর জীবদ্দশায় কোনদিন করেন নি। তিনি মনে করতেন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ার ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংগঠনের নিজস্ব একটা ভূমিকা রয়েছে যার যোগফলেই সম্ভব সত্যিকার গণচেতনার উন্মেষ ঘটানোর বিরাট কর্মকাণ্ড। তাই তিনি প্রত্যেকটি সংগঠনে নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রেখেছিলেন এবং কোনটার প্রতিও কোন একদিনের জন্যও উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেন নি। আজকের পরিস্থিতিতে গণচেতনার উচ্চমাত্রায় ও গুণগত উন্মেষের ক্ষেত্রে তাঁর এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিযুক্ত মনোভাবকে সংশোধন করুক।

এত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ কত সহজ করে, সাবলীল ভঙ্গীতে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারতেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসজ্ঞ। মানুষকে অনেকক্ষণ সম্মোহিত করে নিজের কাছে ধরে রাখার এক অসাধারণ গুণ তাঁর ছিল। কোন কিছু বলা বা আলোচনা করার সময়, তিনি তাঁর অফুরন্ত তথ্যভাণ্ডার থেকে সবই উজাড় করে দিতেন খুবই উপভোগ্যভাবে। একটা ঘটনা, সালটা ১৯৭৯, উল্টাডাঙ্গায় কমিউনিস্ট পার্টির

রাজ্যসম্মেলন চলছে। শেষ দিনে সম্মেলন শুরুর আগে বিদায়ী রাজ্যপরিষদের সভা চলছিল। সভাটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়িয়ে এত দীর্ঘতর হচ্ছিল যে, সম্মেলনে সভার প্রতিনিধিরা সকলে অধীর হয়ে উঠছিলেন। বারবার তাঁরা আসছিলেন, ফিরে যাচ্ছিলেন এবং সভা শেষ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। প্রতিনিধিদের ঐ অবস্থা দেখে বিশ্বনাথ মুখার্জী চিনুদাকে রাজ্যপষিষদের সভা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। দেখা গেল, এই সভা তারপরেও দু-ঘণ্টা নিরুপদ্রবে চলেছিল আর এই সময়টায় চিনুদা প্রতিনিধিদের মধ্যে বসে ক্লান্তিহীন ভাবে তাঁর অফুরন্ত তথ্যভাণ্ডার থেকে একের পর এক ঘটনার উল্লেখ করে চলেছিলেন—সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত থাকলেন চিনুদার কাছে। রসাল গল্পের সঙ্গে অসংখ্য তথ্য পরিবেশন—এরই সাহায্যে জয় করলেন সকলকে।

এই ভাবে সকলকে একই জায়গায় আনার এক দুর্লভ গুণ ছিল তাঁর। তিনি কেবল সমাজের জড়তাকেই দূর করার কাজে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন, তা নয়, ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অর্গলবদ্ধ চিন্তা ও কথাকে প্রকাশ করানোর জন্য এবং সমস্ত রকম জড়তা দূর করার জন্য পরম বন্ধুর মত সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কারো কখনও আড়ষ্টতা এসেছে—এমন কথা শোনা যায় নি।

চিনুদার সব লেখাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁর লেখা মোটামুটি তিনটি ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে। এই তিনটি ক্ষেত্র হল—সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক, ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক-বিষয়ক এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক। একজন নিরলস গবেষকের মত তিনি এই সব কাজ করেছেন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। অন্ধকার অতীতের বুক চিরে মানবচিন্তা ও সংহতির আলোকজ্জল দিকগুলিকে আত্তীকরণ ও পরিমার্জন করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করার জন্য। বস্তুনিষ্ঠভাবে আত্মস্থ করেছেন অতীতের ইতিবাচক উপাদানগুলিকে।

প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে যদিও তিনি নেপাল মজুমদারের ছয় খণ্ডে 'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' ও সুধীপ্রধানের তিন খণ্ডে সংকলিত 'Marxist Cultural Movement in India' বইগুলিকে উচ্চ মূল্য দিতেন; তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে চিনুদার সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক অজস্র লেখা সেই আন্দোলনের ক্ষেত্রকে উর্বর করেছে, গতিকে করেছে বেগবান এবং লক্ষ্যকে করেছে সুনির্দিষ্ট।

'রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী' বইটি ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক বিষয়ক একটি গবেষণাগ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য তিনি সোভিয়েতল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার পেয়েছিলেন। বইটিতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা এবং পামির ও হিন্দুকুশ পেরিয়ে বহু বিপ্লবীর বিপ্লবতীর্থে আসার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি দিককেও তিনি উদ্ভাসিত করেছেন, যেদিক তাঁর আগে এমন পরিশ্রম সহকারে কেউ করেছেন কি না বা করলেও এমন প্রত্যয়সিদ্ধভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন কিনা জানা নেই।

জনগণই যে ইতিহাসের স্রষ্টা এই প্রত্যয় তাঁর ছিল বলেই শ্রমিকের চিন্তা, কৃষকের চিন্তা, সব কিছু লিখে রাখতেন বা অন্যকে টেপ করে রাখতে বলতেন, যাতে ছোট ছোট ঘটনা কিভাবে ইতিহাসের মহা প্রবাহ রচনা করেছে বা করে চলেছে তা দেখানো সম্ভব হয়। আর এ-কাজে তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস্বী। ইতিহাস রচনার কাজে সমস্ত রকম সংকীর্ণতা পরিহার করেই বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবদানে নয়টি ধারার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।' এই কাজে সমস্ত জীবনব্যাপী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য সংগ্রহ করেছেন উপকরণ। এই বিষয়ে কলকাতা যুবকেন্দ্রে স্থায়ী প্রদর্শনীতে তাঁর অবদানই সর্বাধিক।

একই রকম ভাবে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত'-বইটিতে চিনুদার অবদান ছিল সব চাইতে বেশি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী রচনার কাজে এগুলি প্রভূত অবদান রাখবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' বইটির প্রকাশনায় তাঁর আনন্দ হয়েছিল সর্বাধিক—শিশুর মত সকলকে দেখাতেন সেই বই, তার চিত্র স গ্রহ, বলতেন এই সংগ্রহের উৎস এবং আরো কত কি! বইটি প্রকাশ হল ২৮ অক্টোবর, ১৯৮৬। বছরও কাটল না, সাত মাসের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন। যেন, মৃত্যুকে তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন এই বইটি প্রকাশনা পর্যন্ত।

চিনুদার সঙ্গে কথা বলে কতই না আনন্দ পেতেন সকলে। একটা কথা আমি খুবই মানি যে, গুণের ভারে মানুষ সাধারণত বিনয়ী হয়। আর এই বিনয় ছিল তাঁর চারিত্রিক দিকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। লোকে তাঁর কাছে আসতেন জানতে ও শিখতে। লোকের আসাটা আরো বেশি হওয়ার কারণ ছিল যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, রসজ্ঞ এবং সহযোগী মনোভাবাপন্ন। তাঁর সঙ্গে কোন বিষয়বস্তুর উপর আলোচনায় যদি কেউ একমত না হতেন,

তাহলেও তাঁর বিনয়ভাব সকলকে প্রীত করত। জোর করে কোনমত চাপিয়ে দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন তিনি। ধৈর্যশীল চিনুদা নির্দিষ্ট কোন আলোচ্য বিষয়ে অপরপক্ষের চিন্তা-ভাবনাকে যতখানি মর্যাদা দেওয়া যায়, তা দিতেন এবং নিজের মত তাতে সংযোজিত করতেন যতটা সম্ভব কম। এক সাক্ষাতে অন্যকে নিজের চিন্তার অবস্থানে আনতে হবে এই প্রচেষ্টা তিনি কোনদিন করেননি। ফলে, যারা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে যেতেন, তাঁরা অন্ততঃ অস্তিত্ব-সংকটের গ্লানিকর মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রাপ্তির আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠতেন।

চিনুদা যে কাজই করেছেন, সেটা খুঁটিয়ে করেছেন। সেই কারণে কমিউনিস্ট পার্টির বাইরের লোকেরাও তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব তাঁকে অজাতশত্রু করে তুলেছিল। কিন্তু খারাপ লাগত অন্য একটা কথা ভেবে। যাঁরা চিনুদার কাছে যেতেন, তাঁদের মধ্যে অনেককেই দেখেছি তাঁকে খণ্ডিতভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি জনগণের স্বার্থের সংগ্রামে নিজের প্রতিভাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন মানুষকেও দেখেছি যারা জনগণের স্বার্থের সংগ্রামে উদাসীন থেকে চিনুদার কাছে ছুটে গেছেন তাঁর প্রতিভার ছিটেফোঁটা গ্রহণ করতে। তাঁর জীবনের চরম ও পরম সত্য "কেবল ইতিহাস চর্চা করে নয়, ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেই ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে" এই কথা থেকে নিজেদের দূরে রেখে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ ও উপকার গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি কোনরকম সংকীর্ণতার আবর্তে নিজেকে না জড়িয়ে সকলকে অযাচিত সাহায্য দিতে কোনদিন কোন কার্পণ্য করেন নি। তাঁদের হয়ত জানা নেই, কমিউনিস্টরা পারে এইভাবে সাহায্য দিতে। আত্মপ্রচারে পরাঙ্মুখ চিনুদা "আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজে" এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সব কাজে লিপ্ত থেকেছেন।

এই রকমের এক মহান গুণের ঐতিহ্যসম্পন্ন মানুষ, আমাদের 'মনের আশ্রয়', 'আমাদের অভিভাবক' ১৯মে চলে গেলেন, রেখে গেলেন মূল্যবান অজস্র সৃষ্টির রত্নরাজি যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সমস্ত জীবন ধরে। সামনে চলার পথে সমবেতভাবে আমাদের এগোবার প্রয়োজন যখন সবচাইতে বেশি, সেসময় তাঁর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতির সৃষ্টি করলেও, বাস্তবকে আমাদের মেনে নিতে হবে ভবিষ্যতের পথকে উজ্জ্বল করার প্রত্যয় নিয়ে।

"এমন একান্ত করে চাওয়া—এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া—সেও সেই মত।"

চিন্মোহন সেহানবীশ

কয়েকটি রচনা

চিন্মোহন সেহানবীশ-সংগৃহীত কয়েকজন বিশ্বমনীষীর স্বাক্ষর

বিশ্ব-মনীষীসঙ্গমে

অসাধারণদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। কেমন দেখতে, কেমন কথা বলেন, কেমন মানুষ তাঁরা, তাঁদের ব্যক্তিত্ব হিমালয় চুড়োর মতো দুরধিগম্য, না গেঁয়ো নদীটির মতো সহজসাধনলভ্য? মনে মনে হয়তো বা কারো ধ্যানমূর্তিও গড়ে ওঠে নিজের অজানতে যা নিতান্তই মনগড়া। অথচ অসাধারণ মানুষও যে পুরোপুরি বেখাপ্পা বা ভুঁইফোড় নন, সাধারণ ও বাস্তবের সঙ্গেও যে তাঁদের নাড়ীর যোগ আছে এমন কথা যে আমরা মোটেই জানি না তা-ও নয়। তবু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে সাধারণ মানুষের কাছে।

গত জুন মাসের শেষে হেলসিঙ্কি শহরে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয়ে গেল তাতে এই দুর্নিবার প্রলোভন নিবৃত্তির একটা সুযোগ জুটে গিয়েছিল আমার কপালে। তার কথাই লিখতে বসেছি। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা ফাঁদা দরকার।

এ যুগের যুদ্ধ যে কত বড় সর্বনাশ তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সব দেশের মানুষ হাড়েহাড়ে বুঝতে শুরু করে। আর কোনো গতিকে টিকে থাকা মাত্র নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির আলোয় উজ্জ্বল, বাঁচার মতো বাঁচার সমস্যা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান সারা পৃথিবীর সেই জ্ঞানী-গুণীরা বিশেষ করেই উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ভেবে। তাই

ফ্যাসিস্ট দানবের আবির্ভাবে আর এক দফা ঢালাও খুনোখুনি আবার যখন আসন্ন হয়ে ওঠে সেই তিরিশের আমলে রলাঁ ও বারবুসের দরাজ ডাক শোনা গেল—ফ্যাসিজ্‌ম ও যুদ্ধের তাণ্ডবকে রুখবার জন্যে দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীরা একজোট হও। তাঁদের আহ্বানে ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত হল ব্রাসেলসে বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বশান্তি সম্মেলন ও প্যারিসে সংস্কৃতি-রক্ষা সম্মেলন।*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্ষান্ত হতে না হতেই ফের যখন ভীষণতর এক যুদ্ধের মহড়া হিসেবে ঠাণ্ডাযুদ্ধ শুরু হল তখন ১৯৪৯ সালে পোল্যাণ্ডের ব্রাসলাও শহরে আহূত হয় বুদ্ধিজীবীদের এক যুদ্ধ-বিরোধী সম্মেলন। হিরোশিমা, নাগাসাকির পরে স্বভাবতই এবারকার সম্মেলনের পরিসর ছিল রলাঁ-বারবুসের সম্মেলনের থেকে অনেকখানি প্রশস্ততর। বিশেষ করে সোবিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে বহু বুদ্ধিজীবী যোগ দিলেন এ-সম্মেলনে। শুধু তাই নয়। কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে বুদ্ধিজীবীদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে সর্বমানবের এক প্রবল ও ব্যাপক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে না পারলে পারমাণবিক সর্বনাশকে

---

* আমাদের দেশও যে সেদিন রলাঁ-বারবুসের ডাকে সাড়া দিয়েছিল এ-কথা আজ আমরা সগর্বে স্মরণ করতে পারি। ভারতের পক্ষ থেকে ঐ দুই সম্মেলনে একটি ইস্তাহার পাঠানো হয়। তাতে ছিল :

"...উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পীগণের, এবং সংস্কৃতির প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।...আমরা এই সুযোগে আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই ; যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নাই।"

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এই ইস্তাহারের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুনশি প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জওহরলাল নেহরু, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি, আর এটি সেদিন স্বাক্ষরিত হয়েছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগেই।

ঠেকানো যাবে না। তাই উদ্ভব হল বিশ্বশান্তি সংসদ মারফত বিশ্বশান্তি আন্দোলনের। এর বিস্তৃততর পরিসরের মধ্যে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা হল সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শান্তি সংগ্রামকে।

এই চেষ্টাই আরো এক ধাপ উঁচুতে উঠল হেলসিঙ্কি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে। কারণ বিশ্বশান্তি সংসদ এ-সম্মেলনের আহ্বায়ক হলেও এটা শুধু এ সংগঠনেরই সম্মেলন নয়। বিশ্বশান্তি সংসদের বাইরেও যে-সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে শান্তির পোষকতা করছেন অথচ বিভিন্ন কারণে সংসদের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত থাকতে যাঁরা নারাজ তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় এই সম্মেলনে। তাঁদের শুধু যে যৌথভাবে এ-সম্মেলনের কর্মপদ্ধতি স্থির করার ও খোলাখুলি নিজ নিজ মত ব্যক্ত করার অধিকার দেওয়া হল তাই নয়, পরিষ্কার করে এ-আশ্বাসও দেওয়া হল যে এ-সম্মেলনে যোগ দেওয়ার মানেই বিশ্বশান্তি সংসদের নীতি বা লক্ষ্য সম্পর্কে একমত হওয়া নয়, এমনকি এ-সম্মেলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পালনও কারো উপরে বাধ্যতামূলক হবে না যদি না তিনি স্বেচ্ছায় তা মেনে নেন। অর্থাৎ আজকের দিনে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মরণ-বাঁচনের প্রশ্নে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত অভিমানকে দূরে সরিয়ে রাখতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন হেলসিঙ্কি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা।

হেলসিঙ্কির এই সুমহান শান্তিযজ্ঞে সাক্ষাৎ মিলল সারা পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ১৬৪০ জন প্রতিনিধি, ৯২ জন অতিথি ও ১০৯ জন দর্শকের। এঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, রাজনীতিবিদ; শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, শিল্পী, লেখক, ধর্মযাজক, শিক্ষক, সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক, আইনবিদ অর্থাৎ দল-মত-ধর্ম-বৃত্তি-শ্রেণী-নির্বিশেষে সবরকমের মানুষ। সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্রতে এঁরা সকলেই ছিলেন একাগ্র। সেদিক থেকে, জাগ্রত বিশ্বজনমতের প্রতিভূ হিসেবে এঁরা সকলেই নিশ্চয়ই স্মরণীয়। তবু শান্তিতীর্থের এই মহা সমাবেশ থেকে বাছাই করে তাঁদের কথাই এখানে বলব যাঁরা হচ্ছেন সংস্কৃতি-জগতে সত্যই অনন্যসাধারণ।

গোড়াতেই মনে পড়ছে অধ্যাপক জোলিও-কুরির কথা। দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিক হিসেবে তাঁর নাম আজ দুনিয়ার কে না জানেন? ইতিহাসখ্যাত কুরি-পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাও সকলেরই সুপরিচিত। হেলসিঙ্কিতে কিন্তু তাঁকে আমরা দেখলাম অন্য ভূমিকায়—হয়তো বর্তমান জগতের ব্যাপকতম ও মহত্তম আন্দোলনের নেতা হিসেবে।

২২শে জুন, বিশ্বশান্তি সম্মেলনের উদ্বোধনের দিন। চমৎকার মানানসই শাদা জোব্বা গায়ে আফ্রিকার বলিষ্ঠ কালো মানুষ; আপাদমস্তক কুচকুচে কালো আলখাল্লা পরা, কণ্ঠে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রতীক ঝোলানো অর্থডক্স গ্রীক চার্চের সন্ন্যাসী; মাথার চাদরের উপর দড়ির বিনুনি আঁটা ঢিলে জামা পরা আরব, লাল সবুজ কালো উজ্জ্বল জমকালো জামা গায়ে, অদ্ভুত ধরনের টুপি মাথায় কাম্বোডিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণী; গেরুয়া আলখাল্লা জড়ানো, মুণ্ডিতকেশ সিংহলের বৌদ্ধভিক্ষু—অবাক চোখে পৃথিবীর সব কটি কোণা থেকে সমাগত বিচিত্র মানুষের সমারোহ দেখে দেখে আমরা তখন অভিভূত। এমন সময় প্রবল করতালিবির্ষণের মধ্য দিয়ে পথ কেটে সভাপতি-মণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট আসনের দিকে দ্রুত এগোতে দেখা গেল অধ্যাপক জোলিও-কুরিকে। সুতীক্ষ্ণ, একহারা চেহারার মধ্যে গোড়াতেই নজরে পড়ল তাঁর খড়্গনাসা ও একজোড়া উজ্জ্বল চোখ। তাঁর আশ্চর্য কর্মতৎপরতার কথা আগেই শুনেছিলাম। এখানেও দেখলাম এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর বিশ্রাম নেই। উর্ধ্বশ্বাসে লিখছেন, অজস্র লোকের সঙ্গে আলাপ করছেন, কখনো গভীর চিন্তায় মগ্ন, কখনো বা দ্রুতপদক্ষেপে তিনি কোথায় জানি চলেছেন।

এমনই এক দ্রুতধাবমান অবস্থায় প্রায় পথ আটকে এই কর্মব্যস্ত মানুষটিকে একদিন ধরলাম। বেশ কিছুটা বেপরোয়াভাবে জানালাম ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। শুনে মুহূর্তের জন্যে একটু যেন তাকে বিপন্ন বোধ হল। তিনি দু-চারটে সৌজন্যের কথা বললেন বিব্রত-ভাবে। তারপরেই হাসতে হাসতে তিনি পালটা কসরতে আমার বেড়াজাল ভেদ করে অনায়াসে বেরিয়ে গেলেন এই বলে—"বেশ তো নিশ্চয়ই সম্মেলনের কোনো না কোনো কমিশন মিটিং-এ ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে ভালো করে পরিচয়ের সুযোগ মিলবে।" বেকুব বনে আমি মনে মনে স্থির করলাম আর একদিন ধরব।

অধ্যাপক জোলিও-কুরির উদ্বোধনী বক্তৃতার কথা কখনও ভুলব না। যেমন আন্তর্জাতিক ঘটনা-পরম্পরার উপরে অনায়াস আধিপত্য তেমনই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা, তেমনই আবার দুরূহ শান্তি সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভ সম্পর্কে প্রবল বিশ্বাস। তিনি যখন বললেন:

"জনমত জিনিসটাকে জরুরী বিবেচনা করা হলেও বড় বেশিদিন সেটা নিষ্ক্রিয় বলেই গণ্য হয়েছে। তার পরামর্শ না নিয়েই মতামতকে গড়েপিটে

তৈরি করে নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত মানিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু বিশ্বের জনমত আজ এমন এক সক্রিয় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ঐ সব সিদ্ধান্ত চালু করার সময়েই তার প্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে। এ-কথা সব সরকারই স্বীকার করেন।”...

তখন আমরা সকলেই শান্তি আন্দোলনের সেই প্রচ্ছন্ন অথচ প্রবল শক্তির কথা স্মরণ করলাম যার দাপটে গত কয়েক বছরে দু-দুটো লড়াইএর আগুন নিভেছে, এক পক্ষের প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চতুঃশক্তি প্রধানদের বৈঠকও সম্ভব হচ্ছে আর চীন-মার্কিনও জল খেতে চলেছে একঘাটে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এখনও যে নানা বিপত্তির চোরাবালি রয়েছে সে কথা জানিয়ে তিনি যখন এই শান্ত অথচ বলিষ্ঠ কথাগুলি দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন :

“আমরা আজ যে ব্রত গ্রহণ করছি তার উদ্‌যাপনের পথের নানা বাধাবিপত্তি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। আমাদের দায়িত্ব যে কত বেশি তা আমরা সবাই অনুভব করছি। যাঁরা আমাদের পরে বিশ্বাস রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতঘ্নতা করব না।”

তখন হলের সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে উঠে প্রবল হাততালি দিয়ে উঠল ওই আত্মপ্রত্যয়ের সুরে।

দুর্ভাগ্যক্রমে অধ্যাপক জোলিও-কুরি সম্মেলনের নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক হাতিয়ার কমিশনে কয়েকদিন যোগ দেবার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ডাক্তারদের পরামর্শে প্যারিসে ফিরে যান। তাই অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে আর একবার তাঁকে ভালো করে ধরবার বাসনা আমার এ-যাত্রা অপূর্ণ রয়ে গেল।

এ আপশোস কিন্তু বেশ কিছুটা মিটোতে পেরেছিলাম বিখ্যাত তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে। তাঁর প্রসঙ্গে জমানো কথাটা বিশেষ করেই লাগসই কারণ অমন অফুরন্ত প্রাণশক্তিসমৃদ্ধ, মজলিশি মানুষ আর দুটি হয় না। কিন্তু তাঁর বর্ণনা দেওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের উপলক্ষটা একটু বলে নি।

হেলসিঙ্কিতে আমরা ছিলাম একটি ছাত্রদের হোস্টেলে। আমাদের খেতে যেতে হত সামনেরই একটি ক্যানটিনে। সম্মেলনের জন্য সমাগত নানা দেশের যে-সব প্রতিনিধি কাছাকাছি থাকতেন তাঁরা সবাই এখানে সারি বেঁধে

দাঁড়িয়ে পছন্দমতো খাবার তুলে নিতেন নিজের নিজের প্লেটে। ঐ সারিতে দাঁড়াতে আমার খুব মজা লাগত। কারণ, বলা যায় না, আপনার পেছনেই হয়তো প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন জনগণতান্ত্রিক চীনা রিপাব্লিকের প্রবীণ সহ-সভাপতি কুও মো-জো আর সামনে আছেন হয়তো উত্তর কোরিয়ায় যাঁর স্থান কিম ইল সেনের পরেই, সেই পাক দেন-আই। এই খাবার সারিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজ কত মানুষের সঙ্গে আলাপ জমত!

একদিন সারিতে আমার ঠিক আগেই ছিলেন খাটো করে চুল ছাঁটা, মস্ত চওড়া কাঁধ, খুবরি-কাটা কাপড়ের কোট পরা এক সায়েব। আমি শুনলাম তিনি কাকে জানি বোঝাচ্ছেন এই সময়ে তাঁর দেশ নিউজিল্যাণ্ডের আবহাওয়া কি রকম। তারপর অন্যদিকে ফিরে একজন চীনা প্রতিনিধিকে দেখে তিনি মহা উৎসাহে তাঁর সঙ্গে অনর্গল চীনা ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। গোড়ায় কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। সায়েবকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি গণতান্ত্রিক চীনের বিদেশী বন্ধু, রিউই অ্যালি?' উত্তরে মাথা নেড়ে সায়েব জানালেন আমি ঠিক ধরেছি, কিন্তু তারপর পালটা প্রশ্ন করলেন কেমন করে আমি জানলাম। আমি বললাম, অমন অনর্গল চীনা বলতে পারেন এমন নিউজিল্যাণ্ডার হয়তো আরো দু-চারজন আছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যেও বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন সম্ভবত শুধু রিউই অ্যালিই। এবার সায়েব খুশি হয়ে আমার বুদ্ধির তারিফ করতে করতে তাঁর খাবার টেবিলে আমায় টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে নানা কথা উঠল। তাঁর বইএর কথা, চীন, নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের কথা (চীনে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের সভ্য ডাঃ বিজয় বসুর কথা তিনি বিশেষ করে জানতে চাইলেন)। কথায় কথায় তাঁরই কাছে শুনলাম যে নাজিম হিকমত নাকি এসেছেন, সম্ভবত এই ঘরেই হয়তো কোথাও তিনি আছেন আর তারপর আমার প্রবল কৌতূহল দেখে খাবার ছেড়ে উঠে বললেন, 'চলো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।' এধার ওধার খুঁজে নাজিম হিকমতের টেবিলে গিয়ে রিউই অ্যালি আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার বড় আগ্রহ এঁর।' হতবাক হয়ে অর্থহীন প্রশ্ন করলাম আমি, 'আপনিই নাজিম হিকমত?' কবি বুকে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে জানালেন ঠিক ধরেছি। তারপর দৌড়ে গিয়ে একজন দোভাষী ডেকে আনলেন, কারণ কবি ফরাসি বলেন, ইংরেজি জানেন না।

আসলে নাজিম হিকমতকে দেখে হতবাক হওয়ার কারণ আছে। হিকমত অত্যন্ত সুপুরুষ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। ইওরোপীয়দের মতো গায়ের রং। নিখুঁত মুখশ্রী ছাপিয়ে ফুরতিতে উজ্জ্বল একজোড়া চঞ্চল নীল চোখ। আর সবার উপরে পাঁচ মিনিটের আলাপেই নজরে পড়ে তাঁর প্রবল প্রাণশক্তি। আমি যখন জানালাম যে আমাদের দেশে তাঁর খ্যাতির প্রসার ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর আমাদের বাংলা দেশে তাঁর কবিতার বইএর অনুবাদ হয়েছে তখন খুশির চোটে তিনি এমন কষে আমার হাত টিপলেন যে আঙুলগুলো মড়মড় করে উঠল। তারপর বললেন একটি হলদে মলাটের বই তিনি কিছুদিন আগে পেয়েছিলেন, সম্ভবত সেটাই তাঁর বইএর বাঙলা তর্জমা। 'কিন্তু বলো দেখি তোমাদের দেশে কি লেখা হচ্ছে।'

হিকমতের কথাবার্তা হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি এমন প্রাণোচ্ছল ও মজলিশি যে নিমেষের মধ্যে অন্য মানুষেরও জড়তা বা ভয়ডর কেটে যায়। তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। আমি পাঁচ মিনিটের আলাপের পরই তাঁর কাছে 'পরিচয়'-এর জন্য কবিতা দাবি করলাম, কিন্তু অপ্রকাশিত কবিতা হওয়া চাই। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, 'নিশ্চয়, একটা রুবাই দেব, তুর্কি রুবাই।' চীন ভ্রমণের সময়ে একটি পাথরের তৈরি জাহাজ দেখে লেখা চার লাইনের কবিতাটি এই সংখ্যা পরিচয়-এই [আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬২] অন্যত্র ছাপা হয়েছে। রোমান হরফে তুর্কি ভাষায় কবিতাটি লিখে তাঁর তুর্কি বন্ধু ও দোভাষীর সাহায্যে তিনি সেটিকে ইংরেজিতে তর্জমা করিয়ে দিলেন।

প্রশ্রয় পেয়ে আমি একদিন একটা চরম দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম। ভাবলাম নাজিম হিকমত তো এককথায় একটা কবিতা দিলেন। এর একটা ঠিকমতো প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। সুভাষের 'সুন্দর' কবিতাটি আমার ভারি পছন্দ। স্থির করলাম তর্জমা করে কবিকে ঐটেই দেব। বিজ্ঞবুদ্ধি বারবার বাধা দিল। কবিতা তর্জমা শুধু কবিই করতে পারে। তর্জমাকারের দু-ভাষার সমান দখল থাকা আবশ্যিক—আর সব থেকে গোড়ার কথা কবিতাটি পুরোপুরি মনে আছে কিনা জানি না—শুধু তার ইমেজগুলোই মাথায় নাচছে। কিন্তু হিকমতের সংক্রামক বেপরোয়াপানা তখন আমায় পেয়ে বসেছে। মন থেকে যতটা উদ্ধার করা যায় তাই তর্জমা করে পা বাড়ালাম কবির ঘরের দিকে।

কবি কাজ করছেন। টেবিলের পরে স্তূপাকার কাগজপত্র। পাশে দোভাষী তুর্কি বন্ধুও কাজে ব্যস্ত। এমন সময় মূর্তিমান বিঘ্নের মতো আমি

টুকে জানালাম, 'কবিকে বলো, পাঁচ মিনিট সময় চাই।' হিকমত চোখ তুলে, ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'পাঁচ মিনিট কেন?' আমি বললাম, 'কবিতা শোনাবার জন্য।' আমার কথাটা ভাষান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবি এক কাণ্ড করলেন। হাত দিয়ে সমস্ত কাগজপত্র দূরে হটিয়ে, মৌজ করে বসে বললেন, 'For poetry not five minutes, but eternity.'

কবিতা পড়ছি, দোভাষী বন্ধু তুর্কিতে তর্জমা করছেন—হিকমত মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন আর তুর্কিতে কি যেন সব বলছেন। কবিতা শেষ হওয়ার পর দোভাষী-বন্ধু বললেন, 'মহৎ কবিতা এটি।' আমি জানতে চাইলাম এটা কার মত, তাঁর না হিকমতের? দোভাষী বললেন, 'আমি হিকমতের কথারই তর্জমা করলাম। তবে আমিও নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে একমত।' তারপর বললেন, 'হিকমত আপনার কাছে একটা অনুমতি চাইছেন—আপনার এ-কবিতা তুর্কিতে ও সম্ভব হলে রুশে অনুবাদের অনুমতি।' আমি বললাম, 'হিকমত অনুবাদ করতে চাইছেন এতে আর কথা কি! তবে কবিকে বলো এ-কবিতাটি আমার নয়, সুভাষের অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদকের।' শুনে হিকমত আবার বুকে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'তবে তো এখানে আনন্দের সঙ্গে কর্তব্যপালনের মিল হয়ে যাবে। তিনি তাঁর ভাষায় আমার কবিতা তর্জমা করেছেন, আমি আমার ভাষায় তাঁর কবিতা অনুবাদ করব।'

বিশ্বশান্তি সম্মেলনের অধিবেশন হচ্ছিল যে বিরাট হলে তার বিভিন্ন জায়গায় নানা দেশের প্রতিনিধিরা বসতেন আপন আপন দেশের নামলেখা সাইনবোর্ডের পিছনে। আমাদের সামনের সারিতে ছিলেন চীনেরা, পিছনে ইন্দোনেশিয়ানরা, পাশে জাপানি ও তাঁদের সামনে সোবিয়েত প্রতিনিধিরা। আমার কাজ ছিল অধিবেশন শুরু হওয়ার ঠিক আগেই বা শেষ হওয়ার ঠিক পরেই ঘুরে ঘুরে নানা মানুষের সঙ্গে আলাপ করার—big game hunting এর শখও যে ছিল না মনে মনে এমন নয়। সোবিয়েত প্রতিনিধিদের সামনে গিয়ে একদিন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অধ্যাপক গুবের ও অধ্যাপক আবল্টিন বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে গতবার আমাদের দেশে এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে সেই সূত্রে কিছুটা পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। অধ্যাপক গুবের সোবিয়েতের প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদের পরিচালক। আবল্টিন একাধারে অর্থনীতিবিদ ও প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত। এঁরা চিনতে পেরে সোবিয়েতের কয়েকজন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে

দিলেন। সেই সুযোগে আমি অন্যদেরও নাগাল পেয়ে গেলাম। এর মধ্যে তিখনভ-কে কলকাতায় আগেই দেখেছিলাম। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তিনি এবারে ছিলেন সোবিয়েত প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা। আগের আলাপের কথা মনে করিয়ে দিতে তিখনভ খুশি হয়ে উঠলেন—জানতে চাইলেন বাঙলা দেশের প্রগতি সাহিত্যের বর্তমান হালচাল।

ভান্দা ভাসিলেভ্স্কার সঙ্গে পরিচয় হল সাংস্কৃতিক লেনদেন কমিশনের সভায়। সোবিয়েত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে তিনি সেখানে বক্তৃতা দিতে উঠলে আমি জানতে পারলাম যে তিনিই 'রামধনু'র লেখিকা। মাঝারি বয়স, লম্বা, অনুভূতি-প্রবণ চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁকে বললাম, আপনার ও বই যুদ্ধের সময়ে বাঙলা দেশে বিশেষ করেই জনপ্রিয় ছিল ও তার একাধিক বাঙলা সংস্করণের শেষ সংস্করণ বেরিয়েছে যুদ্ধের পরে। আমাদের ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদক, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ঐ বই অনুবাদ করেছেন। এ-ও জানালাম যে তাঁর পরবর্তী বই 'Just Love'ও বাঙলা তর্জমায় প্রকাশিত হয়েছে। শুনে ভান্দা ভাসিলেভ্স্কা খুশি হয়ে বললেন 'রামধনু'র কথা তিনি জানতেন কিন্তু 'Just Love'-এর অনুবাদ বেরিয়েছে এটা তাঁর জানা ছিল না।

তাঁর স্বামী বিখ্যাত উক্রেনিয়ান নাট্যকার, আলেকজাণ্ডার কর্নিচুক-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ভান্দা ভাসিলেভ্স্কাই। কর্নিচুক খুবই সুপুরুষ—মনে রাখার মতো তাঁর চেহারা। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সোবিয়েত প্রতিনিধিদের তরফ থেকে তিনিই প্রথম সম্মেলনের সামনে বক্তৃতা করলেন। সেখানে তিনি সোবিয়েতের শান্তি নীতি, বিশেষ করে নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক অস্ত্র বর্জন সম্পর্কে সোবিয়েতের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন চমৎকারভাবে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে তিনি কিছুদিন আগে যে দিল্লীতে এসেছিলেন তার উল্লেখ করলেন ও আপশোস জানালেন কলকাতায় আসতে না পারায়।

কন্স্তান্তিন ফেদিনকে গিয়ে বললাম—'আপনার লেখা Early Joys ও No Ordinary Summer আমি পড়েছি জেলে—লম্বা অনশন ধর্মঘট চালাতে চালাতে। আপনার বই সেদিন আমায় শক্তি দিয়েছিল প্রচ্ছন্নভাবে—চড়া গলায় কড়া কথা বলে নয়। বিশেষ করে টলস্টয়ের মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর রুশদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আপনার বর্ণনা কোনো দিন আমি ভুলতে পারব না।'

একেবারে পুরোদস্তুর বুদ্ধিজীবী চেহারা ফেদিনের। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত

মুখে উজ্জ্বল চোখদুটি সাধারণত ফুরতিতে ভরপুর। আমার কথা শুনে কিন্তু তিনি খুবই বিচলিত মনে হল। অন্য সোবিয়েত প্রতিনিধিদের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় তিনি বললেন, 'জানো এই ভারতীয় প্রতিনিধি জেলে অনশন ধর্মঘট চালাতে চালাতে আমার বই পড়েছেন।' বুঝলাম ব্যাপারটা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

ফেদিনের লেখা সত্যিই আমার খুব ভালো লাগে।

ফাদিয়েভ্‌কে ধরলাম ফিনল্যাণ্ডের লেখক ও শিল্পীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদেশী লেখক ও শিল্পীদের এক সম্বর্ধনা-সভায়। একজন ভারতীয় প্রতিনিধি বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে কেন জানি ফাদিয়েভ্‌কে দেখলে তাঁর Sir Gallahadএর কথা মনে পড়ে—সেই "My strength is as the strength of ten because my heart is pure"। সত্যিই আশ্চর্য দৃঢ়তাব্যঞ্জক অপাপবিদ্ধ চেহারা ফাদিয়েভের। তবে The Nineteen ও Young Guardএর লেখক সে দৃঢ়তা অর্জন করেছেন বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের আগুনে পুড়ে এতে সন্দেহ নেই। কথাও বলেন তিনি সুদৃঢ়ভাবে অথচ খেলো উত্তেজনা বাদ দিয়ে। সোবিয়েত লেখক সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতার এই ধরনটা নজরে পড়ার মতো।

যদি বলি ইলিয়া এরেনবুর্গ ঠিক তাঁর ছবির মতো দেখতে—তাহলে কি বুঝতে অসুবিধে হবে? সত্যিই কিন্তু তাই। এরেনবুর্গ সভাপতিমণ্ডলীর আসনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভারতীয় বন্ধুদের ডেকে দেখালাম—'ঐ দেখো এরেনবুর্গ।' তারাও তখনই চিনতে পারলেন যশস্বী লেখককে।

এরেনবুর্গ খুবই বুড়ো হয়ে গেছেন তাঁর ৬১।৬২ বছর বয়সের হিসেবে। এদিক ওদিক না তাকিয়ে আনমনাভাবে তিনি যখন মস্ত ব্যাগ হাতে করে চলতে থাকেন তখন তাঁর সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া চেহারা দেখতে বেশ খারাপ লাগে। মাথার উপর একরাশ শাদা চুল কিছুটা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। মুখও বড় বেশি রেখাঙ্কিত। শুনলাম তিনি অসুস্থ, প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। হয়তো অসুস্থতার জন্যেই তিনি খুব বেশি কথা বলেন না কারো সঙ্গে। তাই তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ করারই সুযোগ পেয়েছিলাম—বলেছিলাম, 'আমাদের দেশে আপনার খ্যাতি গর্কি বাদে হয়তো আর যে-কোনো সোবিয়েত লেখকের চাইতে বেশি। একবার আপনার আসবার কথা ছিল আমাদের দেশে। কেন এলেন না? আসুন

না একবার।' ক্লান্ত চোখ তুলে এরেনবুর্গ হাসলেন, বললেন, 'ভারতবর্ষ দেখবার সাধ আমার বহুদিনের। জানি না কবে হবে!'

দুবার শুধু সম্মেলনে এরেনবুর্গকে উদ্দীপ্ত হতে দেখেছিলাম। একবার তাঁর বক্তৃতার সময়ে, যে বক্তৃতা ক্রমাগত ব্যাহত হচ্ছিল মুহুর্মুহু হাততালির আওয়াজে ও যা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান জানালেন অক্লান্ত শান্তিসৈনিকের এই অপূর্ব ভাষণকে। মনে পড়ছে তাঁর প্রচণ্ড আন্তরিকতা ও হৃদয়াবেগের কথা যখন "কমিউনিস্টরা কমিউনিজমের চূড়ান্ত বিজয়ে বিশ্বাসী, তাই পশ্চিম ইওরোপীয়দের সামরিক জোট না বেঁধে উপায় নেই"—এ যুক্তিজালকে ছিন্নভিন্ন করে তিনি বললেন :

"...হ্যাঁ, আমরা সোবিয়েতের মানুষরা বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতের মালিক হবে সেই সমাজই যে সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা আর নেই। সমাজবিকাশের কানুন সম্পর্কে আমাদের ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাস। তার মানে কি এই যে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের এই দৃষ্টি কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে আশঙ্কার কারণ? আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম তখন বেশ দায়িত্বশীল লোকদের কাছে থেকে প্রায়ই শুনেছি যে ভবিষ্যতের মালিক হল ব্যক্তিগত ব্যবসা—আমার বা দেশবাসীর কাছে সেকথা আশঙ্কাজনক বোধ হয়নি। আমরা যখন যুদ্ধের বিপদের কথা বলি তখন আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, সার্বভৌম রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করি—ধনতন্ত্রের দর্শনের দিকে নয়। নানা দেশের অধিবাসী ক্যাথলিক ও ব্যাপটিস্টরা বিশ্বাস করেন ভবিষ্যতের মালিক হবে খ্রীষ্টধর্ম, সমাজতন্ত্রীদের দৃঢ়বিশ্বাস যে তাঁদের কাছে যে সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে ধ্যানের ধন, সমাজ তার দিকেই এগিয়ে চলেছে। ক্যাথলিকদের আছে ভ্যাটিকান, ব্যাপটিস্টরা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করে থাকেন, সমাজতন্ত্রীদের রয়েছে আন্তর্জাতিক সংঘ। কিন্তু এ-কথা কেউই বলেন না যে ঐসব প্রতিষ্ঠান বা ঐ ধরনের মতামত শান্তির পক্ষে আশঙ্কাজনক। কোনো কমিউনিস্ট কখনও বলেননি যে কোনো দেশকে সামাজিক বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে রূপান্তরিত করার জন্য লড়াই লাগাতেই হবে। বরঞ্চ সব কমিউনিস্টরা জোর গলায় বলেছেন ও বলেই চলেছেন যে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংসকারী যুদ্ধ সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে হানিকর।"

এরেনবুর্গকে দ্বিতীয়বার বিচলিত হতে দেখলাম জাঁ পল সার্ত্র্-এর বক্তৃতার শেষে। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এরেনবুর্গ বুকে জড়িয়ে ধরলেন ফরাসি
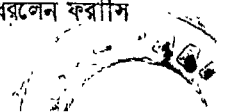
লেখককে আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিলাম পাঁচ মিনিট ধরে। উল্লাসের কারণও ছিল যথেষ্ট। সার্ত্র্-এর মতো বক্তৃতা সত্যই কম শোনা যায়। শুধু মুশকিল হচ্ছে তাঁর বলার ভঙ্গি এত ঠাসা ও সাহিত্যরসাপ্লুত যে অনেক সময় একটা আশ্চর্য বাক্যের নিগূঢ় তাৎপর্য ভালো করে ধরবার আগেই আমাকে দ্বিতীয় আর একটা সমতুল্য বা আরো আশ্চর্য বাক্যের মোকাবিলা করতে করতে হয়রান হতে হচ্ছিল। বোধ করি অনেকের হাল হয়েছিল আমারই মতো। মনে পড়ছে তাঁর বক্তৃতার শেষ অংশটুকু। "শান্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে আপনাকে যদি বাছাই করতে হয় তবে আপনি কী করবেন?" হেলসিঙ্কিতে এক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে যেখানে তিনি বললেন:

"আমরা জানি যে আণবিক যুদ্ধ যদি বা সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস না-ও করে তবু তাতে এতো প্রাণ ও এতো ঐশ্বর্য নষ্ট হবে যে যাঁরা টিকে থাকবেন তাঁদের কপালে অসীম দুর্গতি ছাড়া আর কিছু জুটবে না। আর সে দুর্গতির দাবি হবে ভয়ঙ্কর—বহুবৎসরের হয়তো বা শতাব্দীব্যাপী একনায়কত্ব ছাড়া কি করে মিলবে তার থেকে পরিত্রাণ? যে প্রশংসনীয় কর্মতৎপরতার জন্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি ও সোবিয়েত ইউনিয়ন ন্যায্যতই গর্ববোধ করেন তার ফলাফল থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রগুলি প্রায়ই যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বড়াই করে থাকেন তা তাঁরা হারাবেন। উলটো দিকে যেহেতু শান্তির দাবি হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতা, পারস্পরিক মর্যাদা দান ও সমানে সমানে সহ-অবস্থানের দিকে মুখ ফেরানো তাই আমাদের শান্তির অর্থ শুধু একটিই: সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষের আপন ভাগ্য নির্ধারণের সম্ভাবনা—এককথায় স্বাধীনতা। আমাদের কর্মোদ্যোগের সাধারণ তাৎপর্য আমার কাছে এই: স্বাধীনতার সাহায্যেই আমরা গড়তে চাই শান্তি আর শান্তির মারফতই মানুষকে ফিরিয়ে দিতে চাই স্বাধীনতা।"

ফরাসি প্রতিনিধিমণ্ডলীতে দুটি লোকের অভাব খুবই অনুভব করলাম—পাবলো পিকাসো ও লুই আরাগঁ। জোলিও-কুরি ও জঁা পল সার্ত্র্ ছাড়া সংস্কৃতি-জগতে নামকরাদের মধ্যে ছিলেন ভেরকর্স। তাঁর বই 'Le Silence de la Mer' 'সমুদ্রের মৌন' নামে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন আমাদের একজন বিখ্যাত কবি এ-কথা শুনে তিনি খুশি হলেন, ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ জানালেন ফ্রান্সের জাতীয় লেখক সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

পূর্ব জার্মানির প্রতিনিধিরা ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। এঁদের সঙ্গে

সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে আমরা একদিন একটা ঘরোয়া বৈঠক করেছিলাম। সেখানে স্টেফান হামেলিন নামে এক কবি ও রিনি গ্রেৎস নামে এক ভাস্করের সঙ্গে বেশ আলাপ জমেছিল। তাঁদের কাছে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির অনেক খবর পেলাম। আর এ-ও শুনে আনন্দিত হলাম যে তাঁরা, পূর্ব জার্মানির ৫০ জন প্রতিনিধি—পশ্চিম জার্মানির ১৫০ জন প্রতিনিধির জন্য অপেক্ষা করছেন—তাঁরা হেলসিঙ্কিতে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁরা একত্রে জার্মানির প্রতিনিধি হিসেবে শান্তি সম্মেলনে যোগ দেবেন।

পরে সংস্কৃতি-কমিশনের সভায় একদিন এক বৃদ্ধাকে দেখে মনে হল এঁর ছবি যেন কোথায় দেখেছি। হঠাৎ মনে পড়াতে স্টেফান হামেলিনকে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—"Isn't she Anna Seghers?" উত্তরে স্টেফান বললেন: "Who else can she be?" সত্যিই আনা সেগারস-এর মাথার চুল একেবারে শাদা হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। চিন্তা করার সময়ে তিনি একটার পর একটা সিগারেট টানেন এবং স্টেফান ও অন্যান্য জার্মান প্রতিনিধিদের ব্যবহার থেকে বুঝলাম এই জবরদস্ত নারীটিকে সবাই দস্তুর-মতো সমীহ করে চলেন। আমিও ভয়ে ভয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম। ভারতীয় শুনে কিন্তু তাঁর মনটা বোধহয় ভিজল, হয়তো আরো ভিজল তাঁর Seventh Cross ও Revolt of the Fishermen পড়েছি শুনে। অনেক কথা বললেন—শান্তি সংগ্রামে সংস্কৃতিবিদদের কর্তব্যের কথা। সত্যিই, অসামান্যা নারী ইনি!

অধ্যাপক বারনালের সঙ্গে কিছুদিন আগে কলকাতায় পরিচিত হয়েছিলাম। হেলসিঙ্কিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই সে আলাপটা ঝালিয়ে নিলাম। তারপর থেকে মাঝে মাঝে তিনি আমায় ডেকে কথা বলতেন। একদিনের কথা বলি। অধিবেশন তখনো শুরু হয়নি—লোকজনও বেশি আসেনি। পায়চারি করতে করতে বারনাল বললেন, 'এ-সম্মেলনের কাজ হবে কি জানো? শান্তির স্বপক্ষে ভালো ভালো ঢালাও কথা বলা নয়। সে তো যথেষ্ট হয়েছে—অবশ্য আরও হওয়া উচিত। বিভিন্ন দেশের সরকারকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করার সাধারণ কৌশল নির্ধারণই হবে আমাদের সম্মেলনের প্রধান কাজ।' বলে একটু থেমে বললেন, 'অবশ্য এ ব্যাপারে তোমাদের অনেকখানি সুবিধে রয়েছে। আমাদের কাজ কিন্তু খুবই কঠিন।'

বারনালকে কিছুটা যেন বৃদ্ধ ও অসুস্থ দেখাল।

হাঙ্গেরির বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক জর্জ লুকাচ্-এর সঙ্গে দেখা হল সম্মেলনের হলটির পিছন দিককার চায়ের দোকানটাতে। চায়ের টানে সেখানে ঢুকে দেখি আমাদের শিল্পীবন্ধু রামকুমার একজন সুতীক্ষ্ণ চেহারার বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছেন। কাছে যেতেই রামকুমার আমাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন। মার্কসবাদী লেখকের কর্তব্য সম্পর্কেই আলোচনা করছিলেন লুকাচ। তাঁর 'Studies in European Realism' পড়েছি শুনে বললেন, 'আমার অন্য বইগুলো ইংরিজিতে তর্জমা হয়নি। হলে হয়তো ভালো হত।'

কথায় কথায় তিনি ভালো করে রবীন্দ্রনাথ পড়ার অভিপ্রায় জানালেন।

ফিনল্যাণ্ডের এক লেখক-দম্পতি ও কবি শ্রীমতী সিরকা সেল্‌জার সঙ্গে আলাপ হল। ওঁদের সাহায্যে আমি রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' ও 'গোরা'র এক খণ্ড ও 'নৌকাডুবি'র ফিনিশ তর্জমা সংগ্রহ করি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর জন্য। আর ওঁদের-ই অনুরোধেই আমি ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় লেখক আলেক্সিস কিভির (১৮৩৪-১৮৭২) 'Seven Brothers' বইটি কিনি। এর আগে নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত ঔপন্যাসিক সিলান্‌পা ছাড়া আর কোনো ফিনিশ লেখকের নাম আমি শুনিনি।

যে দুজন আমেরিকানকে দেখবার সাধ ছিল বহুদিন থেকে—সেই পল রোবসন ও হাওয়ার্ড ফাস্টকে মার্কিন সরকার আসতে দেয়নি। তবে সেখান থেকে দর্শক হিসেবে কোনো গতিকে এসে পৌঁছেছিলেন রঙ্গমঞ্চের নামকরা অভিনেত্রী, সেলমা হিল। তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপেই বুঝলাম যে নির্ভীক শান্তিযোদ্ধারা কত ঝুঁকি নিয়ে আজ সংগ্রাম চালাচ্ছেন দেশে দেশে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আধা-পরাধীন দেশগুলি থেকে বেশ কিছু প্রতিনিধি এসেছিলেন। তার মধ্যে কিউবার জাতীয় কবি নিকলাস গিলেন-এর কবিতার সঙ্গে Masses and Mainstream এর দৌলতে আগেই পরিচিত ছিলাম। খুঁজে বের করে পরিচয় হতে দেখলাম ইনি খুব দিলখোলা আলাপী লোক। টেবিলে টেবিলে নানান দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গল্প করে বেড়ানোতে এঁর জুড়ি মেলা ভার। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি থেকে পাবলো নেরুদা আসতে পারেননি এটা একটা মস্ত আপশোসের কথা। তবে ব্রেজিলের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ আমাদো এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও কিছুটা আলাপ হল।

আর একজন বিখ্যাত ব্রেজিলিয়নের সঙ্গেও পরিচয় হল সেই চায়ের দোকানেই। ইনি হলেন জাতিসংঘের Food and Agriculture Orga-

nisation-এর সভাপতি, নামকরা বৈজ্ঞানিক ও গ্রন্থকার যেশু দ্য কাস্ত্রো। পরিচয়ের আগের দিন রাত্রে তাঁকে এক সম্বর্ধনা-সভায় আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পেতে দেখেছিলাম। কাজেই চিনতে অসুবিধে হয়নি, আলাপ শুরু করার বিষয়েরও অভাব ঘটেনি। শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানাতেই উনি উঠে ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমাদের (আমি ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের সম্পাদক, শ্রীকল্যাণ দত্ত) পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েও এসেছিলেন শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসেবে। দ্য কাস্ত্রোর বিখ্যাত বই Geography of Hunger নিয়ে কথা উঠল। সেই সঙ্গে জানতে পারলাম যে আগামী ডিসেম্বর মাসে তিনি এদেশে আসবেন F A O-রই কাজে। কল্যাণ ও আমাকে তিনি বারবার বললেন কলকাতায় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

দ্য কাস্ত্রোর সঙ্গে সে রাত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন বিখ্যাত ওলন্দাজ ফিল্ম-পরিচালক জোরিস ইভেন্স। ইনি আমাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কমিশনে ছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গেও সামান্য আলাপ হল।

সাংস্কৃতিক কমিশনে একদিন এক তরুণ অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিকে খুব উত্তেজিতভাবে বক্তৃতা করতে শুনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম। কারণ বক্তার নাম ঘোষণার সময়ে ঠিক ধরতে পারিনি তিনি কে। তাঁকে গিয়ে প্রশ্ন করলাম: আপনাদের প্রতিনিধিদলে জেমস অলড্রিজ, ফ্র্যাঙ্ক হার্ডি, জ্যাক লিণ্ডসে (অস্ট্রেলিয়ান কবি,—ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতা জ্যাক লিণ্ডসে নন। দ্বিতীয় জন এ-রকম সম্মেলন বড় একটা বাদ না দিলেও কেন জানি এবার আসেননি) বা এরিক ল্যাম্বার্ট কি আছেন? উত্তরে তিনি জানালেন যে প্রথম তিনজন নেই বটে, তবে তিনিই হলেন এরিক ল্যাম্বার্ট। তাঁর 'Twenty thousand Thieves' পড়েছি শুনে খুশি হয়ে তিনি তাঁর দেশের বিখ্যাত মাওরি আদিবাসী চিত্রশিল্পী অ্যালবার্ট নামাৎজিরা-র ছবি দেখাতে নিয়ে গেলেন। সত্যিই আশ্চর্য ল্যাণ্ডস্কেপ! শুনলাম এতবড়ো শিল্পীরও নাকি শহরে এলে শাদা আদমীদের হোটেলে আজও স্থান হয় না, তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হিসেবেই গণ্য নন আর তাঁর ছবি বিক্রির টাকার মালিকও নন তিনি!

কথায় কথায় তাঁর কাছেই শুনলাম যে অস্ট্রেলিয়ার এক কোণে 'মণ্টি বেল্লো' নামের ছোট্ট দ্বীপটিতে আণবিক বোমার পরীক্ষায় এমন সব বিরল জীবজন্তু সমূলে বিনষ্ট হয়েছে যার জুড়ি আর কোথাও মেলার সম্ভাবনা নেই।

চীনা প্রতিনিধিদের মধ্যে হঠাৎ চেনা লোক পেয়ে গেলাম—ইতিহাসের

অধ্যাপক চেন হান-সেং। ভারতবর্ষে দুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কাজেই দেখেই চিনতে পারলেন। ধরে নিয়ে গিয়ে তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁদের প্রতিনিধিদলের প্রাজ্ঞ নেতা, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও কবি কুও মো-জো এবং ঔপন্যাসিক মাওতুন-এর সঙ্গে। এর আগে রোজ ভোরে আমাদের আস্তানার কাছে এই প্রবীণ নেতা ও উত্তর কোরিয়ার মহিয়সী নেত্রী, পাক দেন আই-কে (এঁর সঙ্গে শুধু পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম) ধীরে ধীরে পায়চারি করতে দেখতাম। আলাপের পর দেখলাম অপরূপ স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব এই মানুষটির। কথা বলেন ধীরে ধীরে, যেন পুরোপুরি উপলব্ধির পর বলছেন। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধিদের নেতা হিসাবে তিনি যে বক্তৃতা করেন তা তথ্য-ও-যুক্তিসমৃদ্ধ। আবার সম্মেলনের শেষ ভাষণও তাঁরই। সে ভাষণটি আশ্চর্য কবিত্বময়। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি-প্রসঙ্গে বলা তাঁর কথাগুলি আজ বিশেষ করেই মনে পড়ছে:

"…চীনে লিল্যাকগুচ্ছ উন্মীলিত হয়েছিল সে আজ মাস তিনেক হল। এখানে উত্তর ইওরোপে কিন্তু আজও চলেছে সৌরভ-ও-সৌন্দর্যমন্থর তার পূর্ণ যৌবনের সমারোহ। সব দেশে একই মুহূর্তে একই ফুল প্রস্ফুটিত হবে এ আশা আমরা করতে পারি না। এও পারি না যে একই ফুল বিকশিত হতে থাকবে নানা ঋতুতে। বহু বিচিত্র ফুল একই সঙ্গে পাপড়ি মেলে রয়েছে এমন শ্রীমণ্ডিত সাজানো বাগানের মতো, নানা আমেজের চিন্তায় বিভোর বহু জোট ও চক্রের সমাবেশ আমাদের এই সম্মেলন। আমরা আশা করি এই বাগান ক্রমেই আরো বিস্তীর্ণ হবে আর নানা রকমফের ও বর্ণে বিচিত্র হয়ে উঠবে তার ফুল।"

এরপর যখন তিনি বললেন:

"প্রিয় বন্ধুরা, ড্যাণ্ডেলিয়নের বীজগুলি এখন পরিপক্ক—এবার তারা ছড়িয়ে পড়বে দূরে দূরান্তরে। আবার যখন ফুল ফুটবে তখন পৃথিবীকে তারা মুড়ে দেবে সোনায় সোনায়।"…

তখন তাঁর বাকি কথাগুলো আর শোনা গেল না হাততালি আর উল্লাস-ধ্বনির উন্মত্ততায়।

পরিচয়
১৩৬২, আশ্বিন-কার্তিক

কার জন্য লিখি ?

দু-চার জন এমন একান্ত আত্মকেন্দ্রিক লেখক হয়তো বাংলাদেশেও আছেন যাঁরা এ প্রশ্নের জবাব দেবেন—'ও নিয়ে মাথা ঘামাই না, কেননা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও কথা অবান্তর। লিখি ভরা মনে, আপন খেয়ালে।' আর কিছু লেখক আছেন যাঁদের মাথাব্যথা অতি সংকীর্ণ এক রসিক সমজদার গোষ্ঠীর মন পাওয়া-না-পাওয়া নিয়েই। তার বাইরের বিপুল জনতার নিন্দা প্রশংসায় তাঁদের কিছু এসে যায় না।

এ ধরনের চিন্তার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে, আপন অক্ষমতা গোপনের সাফাই কি না এগুলি—সেকথা না তুলেও বলা চলে যে, এঁরা সমগ্র বাঙালী লেখক সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ লেখকই চান তাঁদের রচনা সবাই পড়ুক, সবাই তার তারিফ করুক। এই ইচ্ছা খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক। 'যশের কাঙালী হয়ে' 'করতালি' আদায়ের ফিকিরের বিরুদ্ধে আমাদের কবি বিদ্রোহ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু সে শুধু ফাঁকা 'কথা গাঁথার' নিষ্ফলতার জ্বালায় জ্বলেই। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি তাঁর 'সুরের অপূর্ণতার', 'নিন্দার কথা' অত অনায়াসেই মানতে পেরেছিলেন।

অবস্থার বিপাকে বাঙালী সাহিত্যিকের এই ব্যাপকতম পাঠকলাভের অতি সুস্থ কামনা আজ কিভাবে বিড়ম্বিত আমরা সবাই জানি। বাঙলা সাহিত্যের সম্ভাব্য পাঠকসমাজ আজ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কৃপায় নিরক্ষর,

নিঃস্ব এবং দ্বিখণ্ডিত। দেশজোড়া নিরক্ষরতা সমুদ্রের বুকে সুশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিতদের যে ছোট্ট দ্বীপটি কোনোগতিকে ভেসে রয়েছে আমাদের লিখিত সাহিত্যের দৌড় বড় জোর তার সীমানার মধ্যেই। তার চারিদিকে ঘিরে আছে যে বিপুল নিরক্ষর ও নামমাত্র শিক্ষিতের সমুদ্র সেখানে পৌঁছতে সাহিত্যের প্রধান বাহন হল শ্রুতি। রামায়ণ, মহাভারত, পুঁথি, পাঁচালি পাঠ, কথকতা, কবিগান, যাত্রা, গম্ভীরা, তর্জা মারফতই একমাত্র সে গণ-সম্রাটের দরবারে প্রবেশ মেলে। অথচ নির্মম ঔপনিবেশিক শোষণ ও গভীর কৃষি-সংকটের দাপটে এগুলিও আজ বিবর্ণ, ম্রিয়মান। ভূমি-ব্যবস্থার আমুল ওলটপালট না ঘটিয়ে কোনো হাতুড়ে প্রক্রিয়ায় এদের পুনরুজ্জীবনও শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়।

বাঙালী লেখকের কাছে তাই 'কার জন্য লিখি'—এই প্রশ্নের জবাব প্রায় বিধিনির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে বোধ হয়। অধিকাংশ কৃষক, মজুর (বাংলা দেশে এঁদের মধ্যে মস্ত একটা অংশ আবার হিন্দী বা অন্য ভাষাভাষী), এমন কি নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিম্নমধ্যবিত্তেরও একটা বড় অংশ আজ লিখিত সাহিত্যের নাগালের বাইরে। অথচ এঁদের মেহনতেই গড়ে ওঠে দেশের সম্পদ। অর্থাৎ সমাজের স্রষ্টিধরেরাই আজ বঞ্চিত মানসস্রষ্টির প্রসাদ থেকে।

এই অমানুষিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্ষেপ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—বলেছেন দেশের সম্পদ যারা স্রষ্টি করে সেই 'সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। ...তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।'

কিন্তু শুধু মহত্তর মানবিকতার আদর্শের দিক দিয়েই নয় এই মারাত্মক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর বৈষয়িক উন্নতির প্রশ্নও সরাসরি জড়িত। কারণ নিরক্ষর দেশে লিখিত সাহিত্যের বাজার যে কত সংকীর্ণ তা এ দেশের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলির তুলনা করলেই ধরা পড়ে। সেই সংকীর্ণ বাজারের জন্য সাহিত্যিক পসরা সাজিয়ে জীবিকা সংস্থানের চেষ্টা যে কত দুর্ঘট তাও বাঙালী সাহিত্যিকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। যাঁরা সাহিত্যস্রষ্টি প্রসঙ্গে স্থূল জীবিকাসংস্থানের প্রশ্নকে অবান্তর মনে করেন তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই—তাঁদের উপেক্ষা করাই ভালো। অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শুধু টিকে থাকার তাগিদেই বাঙালী সাহিত্যিক চান ব্যাপকতর পাঠকসমাজ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকের দরদ সবচেয়ে যেখানে নিবিড় সেই সাহিত্যের

উৎকর্ষ অপকর্ষের প্রশ্নও এই পাঠকসমস্যার সঙ্গে জড়িত। কারণ সমাজের বৈষয়িক সম্পদের স্রষ্টারা মানসসৃষ্টির ন্যূনতম ভাগ থেকেও বঞ্চিত হন যে-ব্যবস্থায় তা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতার উপর ভর করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার দৌড় সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য এবং বাস্তব সংকট যতই ঘনীভূত হবে ততই তা আরো সীমাবদ্ধ হতে থাকবে। উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শনগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে এ সত্যকে খণ্ডন করার চেষ্টাও ভুল হবে, কারণ সে উজ্জ্বলতায় একেবারে চোখ না ঝলসালে আমরা ধরতে পারব তাদেরও সীমাবদ্ধতা (অবশ্য সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সত্যই তা গৌরবোজ্জ্বলও)। তৃতীয়ত ইতিমধ্যে ধনবাদের দুনিয়াজোড়া সংকট এবং এ দেশের কৃষিসংকট আরো গভীর হয়ে দাঁড়ানোয় একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের মধ্যবিত্ত পাঠকভিত্তিতে চিড় ধরেছে তেমনই আবার সমগ্রভাবে সাহিত্যের মানও যে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। প্রগতিশীল বাঙালী লেখকদের অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একথা সত্য কারণ আজও সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের একটি কোণামাত্র পূরণ করছে সে সাহিত্যপ্রয়াস।

অতএব মানবিক, বৈষয়িক এবং সাহিত্যিক কারণেই বাঙালী লেখক চাই। সমাজ-অচলায়তন চুরমার করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশজোড়া নিরক্ষরতা, নিঃস্বতার মধ্যে সে ভরসা কোথায় ?

একথা ঠিক যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিঁড়ে ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-অচলায়তন চুরমার করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশ-জোড়া নিরক্ষরতা হটানো যাবে না আর বাঙালী সাহিত্যিকের কল্পনার দৌড়কেও ছাপিয়ে আবির্ভূত হবে না কোটি কোটি নতুন পাঠক। কিন্তু আগামী দিনের সেই অফুরন্ত সাহিত্য-তৃষ্ণার খোরাক যোগাবেন যে লেখক এখন কি তিনি যেমন লিখছেন তেমনই লিখে চলবেন আর স্বপ্ন দেখবেন ভাবী ঐশ্বর্যের ? না এখন থেকেই, এখনকার প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকবেন আগামী দিনের জন্য ?

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে আজকের বাস্তবের সঙ্গে আগামী দিনের বাস্তবের মৌলিক তফাত ঘটবে আর তাই বাস্তবের প্রতিফলন হিসাবে আজকের সঙ্গে ভাবীদিনের সাহিত্যেরও মস্ত গরমিল থাকবেই। তাছাড়া মজুর কিসান প্রভৃতি বর্তমান সমাজের নিচের তলার বাসিন্দাদের সঙ্গে সাহিত্যিকের পক্ষে সরাসরি যোগ স্থাপন করার সুযোগ সুবিধা আজকের দিনে যতটা

আগামী দিনে তার থেকে অনেক বেশি জুটবে। কারণ মজুর বা কিসানের জীবনের শরিক হওয়ার পথে আজ রাষ্ট্রশক্তি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক ও শ্রেণীগত আচার পর্যন্ত নানা দিককার প্রত্যক্ষ বাধা বর্তমান, বিপ্লবের পরে যার চিহ্নও থাকবে না। বরং তখন রাষ্ট্রের নায়কই হবে প্রধানত মজুর ও কিসানেরা।

বিপ্লবের আগে ও পরের অবস্থার এত গরমিল সত্তেও কি পাঠকসাধারণের প্রতি কর্তব্যের দিক থেকে এই দুই যুগের মধ্যে কোনো মিল পাওয়া সম্ভব?

১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে সারা চীনের লেখক ও শিল্পীদের যে সম্মেলন হয় তার সামনে বিখ্যাত চীনা ঔপন্যাসিক মাও তুন এই প্রসঙ্গে বলেন, "১৯৪২ সালে প্রকাশিত কমরেড মাও সে-তুং-এর 'সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা' কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার সাহিত্য ও শিল্পেরও পথনির্দেশক-নীতি হওয়া উচিত ছিল। ঐ আলোচনায় কমরেড মাও সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (standpoint) ও মনোভাবের (attitude) সমস্যা, লেখক ও শিল্পীদের যথাযথ শিক্ষার সমস্যা এবং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের সমস্যার কথা তুলেছিলেন। কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার সাহিত্য-জগতেও এ সব সমস্যাই বর্তমান ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে কার্যক্ষেত্রে আত্মপরীক্ষা ও আত্মসমালোচনার ব্যাপারে 'আলোচনার' সারতত্ত্ব কাজে লাগানো দূরে থাক ঐ সব এলাকার লেখক শিল্পীরা ঐ 'আলোচনার' বিশদ পর্যালোচনাও করেননি। কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা মুক্ত এলাকার অবস্থা থেকে আলাদা—এই অজুহাতে তাঁদের কেউ কেউ ঐ দলিলটির দিকে এক পলক তাকিয়েই তার সঙ্গে তাঁদের 'নীতিগত মতৈক্য' ঘোষণা করেছিলেন। অন্যেরা মুক্ত এলাকার অভিজ্ঞতার অংশমাত্রের দোহাই পেড়ে শিল্প ও সাহিত্যের মতাদর্শ ও তত্ত্বগত সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কুও মিন-টাং অধ্যুষিত এলাকার সাহিত্য-আন্দোলনের বাস্তব বিশ্লেষণ করেন নি বলে তাঁরা আসলে কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারেন নি। (দি পিপ্‌ল্‌স নিউ লিটারেচার—৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

আমাদের প্রগতিশীল লেখক মহলেও এই দুই রকম ভুলই দেখা যায় (অবশ্য কুও মিন-টাং রাজত্বের সঙ্গে আমাদের অবস্থার পুরোপুরি মিল খোঁজা ভুল হবে। মূল আধা-ঔপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ভিত্তির দিকের মিলের কথাই এখানে ধরা হচ্ছে)। শেষের ঝোঁকটির কথা আগে ধরলে দেখা যাবে যে চীনের মুক্ত এলাকার অভিজ্ঞতা সরাসরি আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করার মনোভাব অনেকের মধ্যে আছে। ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নামক আমার প্রবন্ধে চীনের নজীর এই যান্ত্রিকভাবে টেনে লেখকদের অবিলম্বে কিসান-কর্মী বা ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হিসাবে গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়েছিল—এমনকি তার ফলে যদি সাহিত্যরচনা সাময়িকভাবে বন্ধ হয় তাতেও বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই—এমন কথাও বলা হয়েছিল।

এখানে মাও তুনের ভাষায় আমার ভুল হয়েছিল এই যে, 'মুক্ত এলাকার অভিজ্ঞতার অংশমাত্রের দোহাই পেড়ে শিল্প ও সাহিত্যের মতাদর্শ ও তত্ত্বগত সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের চেষ্টা' হয়েছিল—বাঙলা দেশের 'সাহিত্য আন্দোলনের বাস্তব বিশ্লেষণ' না করায় হাতুড়ে সমাধানই হাজির করা হয়েছিল সমস্যা সমাধানের। চীনের মুক্ত এলাকার মতো অনুকূল অবস্থায় নয় বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঙালী প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে ক'জনের পক্ষে ওভাবে সরাসরি মজুর বা কিসান আন্দোলনে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব—প্রশ্ন শুধু তাইই নয়। ব্যাপক নিরক্ষরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও তাঁদের প্রধান মানসসৃষ্টি হিসাবে বাংলা সাহিত্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথাও মনে রাখা দরকার ছিল। উল্টোদিকে চীনে ৪ঠা মে আন্দোলনের পর থেকে মোটের উপর অন্যান্য শ্রেণীর মতো চীনা বুদ্ধিজীবীদেরও উপর মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের তুলনায় আমাদের দেশে তার অনেক কম প্রভাবের কথা ভুলে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের কাছে অমন ঢালাও আবেদনও ছিল অত্যন্ত অবাস্তব এবং কার্যক্ষেত্রে বিভেদসৃষ্টির প্ররোচক।

কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের কিছু কিছু প্রগতিশীল লেখক বা শিল্পী বন্ধু আমাদের অবস্থা চীনের "মুক্ত এলাকার অবস্থা থেকে আলাদা"—এই অজুহাতে মাও সে-তুং-এর দলিলটির দিকে এক পলক তাকিয়েই তার সঙ্গে তাঁদের 'নীতিগত মতৈক্য' ঘোষণা করেই ক্ষান্ত ছিলেন। আমাদের দেশের "সাহিত্য ও শিল্পেরও পথনির্দেশক নীতি" হিসাবে তাকে কার্যত মানেননি। তা যদি মানতেন তা হলে মাও সে-তুং-এর 'আলোচনায়' "সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (standpoint বা position) ও মনোভাবের (attitude) সমস্যা, লেখক ও শিল্পীদের যথাযথ শিক্ষার সমস্যা এবং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের সমস্যার" যে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা ছিল তাকে শুধু নমো নমো করেই মেনে নিতেন না—তাই নিয়ে আরো মাথা ঘামাতেন।

কারণ মাও সে-তুং যখন বলেন যে, নতুন সাহিত্যের পাঠক হবে মজুর, কিসান, সৈনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণী—বিশেষ করেই প্রথম তিনটি দল—তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে এঁদের জন্য লিখতে হলে ভালো করে এঁদের জানতে হবে—অভ্যস্ত মধ্যবিত্তসুলভ ধ্যানধারণা এবং অনুভূতির রূপান্তর ঘটিয়ে মজুর-কিসান-সৈনিকের ধ্যানধারণা ও অনুভূতির জগতে প্রবেশ করতে হবে। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে আমরা অনেক সময়েই খুব হাল্কা-ভাবে দেখি। তত্ত্বের দিক থেকে যিনি মার্কসবাদকে স্বীকার করেন, তিনি মনে করেন ব্যাপারটা আপনা থেকেই হবে। কিন্তু লিউ শাও-চির লেখা পড়লে বোঝা দায় যে, তিনি এই মূল দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে মার্কসবাদী তত্ত্ব আয়ত্ত করার সমস্যা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছেন যদিও অবশ্যই দুই-এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এমন কথাও লিউ শাও-চি বলেছেন যে মূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যাঁর ঘটেনি তিনি যতবড় তীক্ষ্ণধী সম্পন্নই হোন না কেন তত্ত্ব আয়ত্ত করার ব্যাপারে তাঁর গলতি থেকে যাবে—তত্ত্বকে তিনি বুঝবেন আপন ভ্রান্ত দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়েই। কাজেই এ আশঙ্কার কাটান হিসাবে তত্ত্বচর্চার সঙ্গে হাতেনাতে কাজ করা, 'জীবনে জীবন যোগ করার' প্রশ্ন ওঠে—প্রশ্ন ওঠে তত্ত্বের সঙ্গে কার্যক্রমের সমন্বয়ের। এইজন্যই মাও সে-তুং এই রূপান্তরের জন্য "দীর্ঘদিনের এমনকি কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়ক অগ্নিপরীক্ষার প্রক্রিয়ার" কথা বলেছেন।

মাও সে-তুং তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত ধরে দেখিয়েছেন কিভাবে তাঁর চিন্তার রূপান্তর ঘটেছিল। ছাত্রজীবনে অন্য ছাত্রদের সমানে নিজের মালপত্র কাঁধে বইতে তাঁর লজ্জা হত ভারি। হাত লাগাতে অন্য ছাত্রদের মতোই তাঁরও কুণ্ঠা ছিল অপরিসীম। তাঁর মনে হত ভদ্রলোকেরাই বুঝি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বাকি সবাই বুঝি নোংরা।

তারপর বিপ্লবের কাজে মাও সে-তুং মজুর, কিসান ও সাধারণ সৈনিকদের সাথী হয়ে দাঁড়ালেন—একদিকে মার্কসবাদের জ্ঞানার্জন ও অন্যদিকে বিপ্লবী কার্যক্রমের মধ্যে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তিনি বুঝতে পারলেন যে ধুলো-কাদা তাঁদের কাপড়জামায় লাগলেও আসলে তার তলায় রয়েছে দুনিয়ার সব থেকে সাচ্চা, পরিষ্কার মন আর ধপধপে জামার তলায় অধিকাংশ সময়েই লুকিয়ে থাকে নোংরা, কদর্য পশু।

দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে তাই হাল্কাভাবে দেখা চলে না—শুধু কেতাবের মধ্যে দিয়ে বা বিদগ্ধ আলাপ আলোচনা মারফতও তা ঘটানো সম্ভব নয়। যে লেখক ব্যাপকসমাজ কামনা করেন তাঁকে এই রূপান্তরের জন্য প্রাণপাত করতে হবে।

এই রূপান্তরিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁকে দেখতে হবে সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে যে বিষয়বস্তু জীবনেরই মতো বিপুল, বিচিত্র, জটিল ও অভিনব। মজুর বা কিসানের জীবন নিয়েই যে শুধু সাহিত্য সৃষ্টি হবে তাই নয়—যদিও প্রগতিশীল লেখকের নজর ক্রমশই এই দিকে বেশি বেশি করে ঝুঁকলে তা অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিকই হবে। কিন্তু বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন গোড়ার কথা হল এই রূপান্তরিত দৃষ্টি—যা একদিকে মার্কসবাদী তত্ত্ব অর্জন ও অন্যদিকে গণজীবনের সঙ্গে সংযোগেরই ফল। বলা বাহুল্য এই সংযোগ স্থাপনের কোনো ছককাটা বাঁধাধরা রূপ নেই—আপন শক্তি সামর্থ সুযোগ অনুসারে প্রত্যেককেই এদিকে নজর দিতে হবে। তবে ভাবের ঘরে চুরি করলে কোনো মহৎ কার্য সম্পন্ন হবে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরের পরে লেখকের সামনে আরো একটি জটিল সমস্যা থাকে। সেটি হল প্রকাশভঙ্গির সমস্যা। যে লেখক ও কিসানদের জন্য লিখতে চান স্বভাবতই তাঁকে উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে। ব্যাপারটা শুধু ভাষার নয়। তা ছাড়া মজুরের ভাষা, কিসানের ভাষা, ধনিকের ভাষা বলে আলাদা আলাদা ভাষা নেই—ভাষা একটাই। তবে জীবনযাত্রা ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রকাশভঙ্গির ব্যবধান গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই জটিল, প্যাঁচালো প্রকাশভঙ্গি (যা অত্যন্ত সহজ শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও হতে পারে) অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিতদের কাছে চলে না—তার জন্য দরকার সহজ অথচ গভীর ভাবব্যঞ্জক প্রকাশভঙ্গি। এটা একদিনে আয়ত্ত করার নয়—শুধু গ্রাম্য শব্দ বা উপভাষা ব্যবহারেও তা হয় না। হয়তো প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য কিছুটা আঞ্চলিক বা বৃত্তিগত। যাই হোক আসলে প্রয়োজন মানুষগুলির সঙ্গে গভীর পরিচয়—তাদের শুধু কাজের মধ্যে জানা নয়, তাদের সংসারের মধ্যে, দুঃখকষ্ট আনন্দের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে জানা।

এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষার অনেক অবকাশ আছে। মনে রাখতে হবে টকি-সিনেমা, রেডিও, শখের থিয়েটার মারফত পল্লীবাসীর মধ্যেও শহুরে প্রকাশভঙ্গি অনেকখানিই ঢুকেছে। তাই পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ যা ছিল আজ নিশ্চয়ই তা নেই। তবু জোর করে বলার মতো পরীক্ষা-লব্ধ ফল আমাদের হাতে নেই। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' বা 'ও আমার সোনার বাংলা' শহুরে বা গ্রাম্য মানুষ উভয়েই কান পেতে শোনেন, আপনার জিনিস মনে করেন্ যেমন তাঁরা মনে করেন 'একবার বিদায় দে মা'র গান। কিন্তু বন্ধুবর শ্রীশম্ভু মিত্র যখন জীবনে

প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনার পর পল্লী কবি শ্রীনিবারণ পণ্ডিতের অভিভূত অবস্থার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেন তখন প্রশ্ন জাগে নিবারণবাবুর উপলব্ধির স্তর কি সাধারণ কৃষকের মতো? ঐ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা কি নিরাপদ?

প্রকাশভঙ্গির জটিল সমস্যাকে অনেক সময় বিশেষ কোনো আঙ্গিক ব্যবহারের দ্বারা সমাধানের কথা ভাবা হয়। গ্রাম্য শব্দ বা উপভাষা ব্যবহারের ছড়াছড়ির কথা আগেই বলা হয়েছে। তেমনই পাঁচালি বা ছড়ার ছন্দ, পয়ারের মামুলি প্রয়োগ, কবিতায় সেকেলে শব্দ ব্যবহার প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কেউ কেউ ব্যাপকতম আবেদনের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর বাংলাকে বরবাদ করে প্রাক-রাবীন্দ্রিক ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী, কেউ বা আধুনিকতার নামে অতিরিক্ত বিদেশী শব্দ সম্বলিত মোটের উপর কৃত্রিম এক ভাষা চালাতে চান।

চীনেও ১৯৪০ সালে এই রকম 'জাতীয় আঙ্গিক' নিয়ে এক বিতর্ক চলে। কেউ কেউ জনপ্রিয়তা অর্জনের সমস্যার সহজ সমাধান খুঁজেছিলেন "পুরনো লোককলার আঙ্গিক" গ্রহণের ভিতরে। তাঁরা ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে যে সব নতুন আঙ্গিকের উদ্ভব হয়েছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অন্যেরা নতুন আঙ্গিকের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে তাঁদের সংকীর্ণ পেতি বুর্জোয়া দৃষ্টিই অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা যা রক্ষা করবার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন তা আসলে আঙ্গিক নয়, সেই আঙ্গিকের পিছনকার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বস্তু। ('দি পিপলস নিউ লিটারেচার', —৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)।

সাহিত্য বা শিল্পের জনপ্রিয়তা অর্জনের সমস্যাকে তাই এইভাবে আঙ্গিকের সমস্যার সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়। সেখানে প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে লেখক বা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর।

আমাদের মনে রাখা দরকার বাংলা দেশের মজুর বা কিসানেরা একটা মতাদর্শগত বা সাংস্কৃতিক শূন্যতার মধ্যে বাস করেন না। একদিকে যেমন তাঁদের উপর কবিগান, কথকতা, গম্ভীরা, ঝুমুরের ক্ষীয়মান লোককলার ধারাটি আজও কার্যকরী তেমনই আবার সিনেমা, থিয়েটার, রেডিওও ক্রমশ তাঁদের জগতে প্রভাব বিস্তার করছে। দুই ক্ষেত্রেই সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রধান বাহন হচ্ছে শ্রুতি ও দর্শন, কারণ অক্ষরের সাংকেতিকতার রহস্য দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে আজও উদ্ঘাটিত নয়।

এই হল একদিককার বাস্তব। অন্যদিকে আছে তুলনায় মুষ্টিমেয় কমবেশি শিক্ষিতের দল কার্যত যাঁদের জন্যই বাংলা দেশের লেখক এতাবতকাল সাহিত্যরচনা করে আসছেন। সেই লিখিত সাহিত্য গত দেড়শ বছরে অসামান্য বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের অধিকারী হয়েছে। কাজেই বাঙালী মধ্যবিত্ত লেখক যখন আপন দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটিয়ে অগণিত পাঠকসাধারণের সাদর স্বীকৃতির মধ্যে তাঁদের নবসৃষ্টির সার্থকতা খুঁজবেন তখন তারাও নিশ্চয়ই একটা সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক শূন্যতা থেকে শুরু করবেন না। 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন' করে 'কিসানের জীবনের শরিক' হওয়ার চ্যালেঞ্জ তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন তাঁদের সামনে।

কিন্তু নিরক্ষরতার বাধা ভাঙা যাবে কি করে? পুরোপুরি ভাঙা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে অসম্ভব। কিন্তু বাঙালী লেখকের মানবিক, বৈষয়িক ও সাহিত্যিক সার্থকতার একমাত্র ধ্রুব পথ যদি হয় বর্তমান সংকীর্ণ পাঠকমণ্ডলীকে ছাপিয়ে (তাঁদের বাদ দেওয়ার প্রশ্ন কোনোক্রমে উঠতেই পারে না) এ দেশের মজুর-কিসানের মধ্যে নতুন সমজদার (অনেকসময়েই 'পাঠক' নন) সন্ধানে তবে সে বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে নানা কৌশলে।

সিনেমা আজ জনশিক্ষা বা গণসংস্কৃতির বোধ করি সব থেকে শক্তিশালী বাহন হয়ে দাঁড়ানোর উপক্রম করছে। এর মারফত প্রগতিশীল লেখক ও গান রচয়িতা তাঁদের সৃষ্টিকে বর্তমানের থেকে অনেক ব্যাপকতর সমজদারমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারেন আনুষঙ্গিক বিপদের ঝুঁকি নিয়েই। অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও হয়তো এদিকের পথ কিছুটা আজও খোলা আছে।

কংগ্রেসী সরকারের কৃপায় রেডিওর দরজা কিন্তু প্রগতিশীলদের কাছে প্রায় বন্ধ। এ অব্যবস্থা গা-সওয়া বলে মেনে না নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন করা উচিত একে বাতিল করার জন্য।

রঙ্গমঞ্চ মারফত লেখক আজও তাঁর স্থানটিকে ব্যাপকতর সমজদারের সামনে আনতে পারেন। গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার প্রভৃতি প্রগতিশীল নাট্যসম্প্রদায় মারফত এ কাজ ইতিমধ্যেই কিছুটা চলছে। গণনাট্য সংঘ লোককলার প্রচলিত রূপগুলির সাহায্যে নতুন চিন্তা পরিবেশনের যতটুকু চেষ্টা করছেন তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হয়তো যাত্রার দিকে আরো বেশি নজর দিলে ব্যাপকতর শ্রোতা-দর্শক পাওয়া সম্ভব হবে।

উর্দু ও হিন্দী কবিতার জগতে 'মুশায়রা' ও কবি সম্মেলনের রেওয়াজ

আছে। বাংলাদেশে ঐ রকম কোনো রীতি চালু নেই যদিও রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি একদা জনসভায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত। বন্ধুবর শ্রীশম্ভু মিত্র তো এখনও রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র পর্যন্ত অনেকের কবিতাই আবৃত্তি করে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করেন। অনেকে বিমল ঘোষ ও সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করেন জনসভায়। এই সম্ভাবনাকেই তাই পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত স্থায়ী রূপ দিয়ে। সুকণ্ঠ আবৃত্তিকারেরাই যে শুধু কবিতা আবৃত্তি করবেন তাই নয়, কবিরাও যাতে নিজেদের কবিতা নতুন নতুন শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেন তার ব্যবস্থাও করা উচিত। কারণ সে ক্ষেত্রে ক্রমশ ঐ শ্রোতাদের মুখ কবিতারচনার সময়েও কবির চোখের সামনে ভাসবে—সম্ভব করবে নতুন ধরনের বলিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ কবিতা। অবশ্য 'কবিতা পড়ুন' বলে সম্প্রতি কলকাতার রাস্তায় যে চমকপ্রদ পদ্ধতির কথা কাগজে দেখা গেল তার উদ্ভটত্বের কারণ হচ্ছে যাঁদের কবিতা শোনানোর চেষ্টা হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথাও উদ্যোক্তাদের ছিল না। তাই আচমকা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা শুনিয়ে পথচারীকে শুধু হকচকিয়ে দেওয়াই গেল। দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর না ঘটলে, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ না জাগলে এই রকমই ঘটে আর এধরনের প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় এই সিদ্ধান্ত—'জনসাধারণ বেকুব ও বেরসিক।"

জেলখানায় আমরা একবার কিছু বাঙালী মজুর বন্দীদের সামনে সিমোনভের "রাশিয়ান কোশ্চেন" (বাংলা তর্জমার নামকরণ হয়েছে 'সাংবাদিক') পড়ে শুনিয়েছিলাম। অভিনয় নয়, কেবল চার পাঁচজন সবে রেডিওতে যে ভাবে নাটক পড়ে সেই রকম এক একজন এক একটি চরিত্রের কথা বলেছিলেন। অবশ্য আমরা মাঝে মাঝে পড়া থামিয়ে ছোটোখাটো দু' একটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম আর্ট ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা না করেই। অর্থাৎ নাট্যরসসৃষ্টির জন্য ন্যূনতম মায়াজালই (illusion) বোনা হয়েছিল। তবু প্রায় ৬০ জন মজুর কানখাড়া করে তিন ঘণ্টা শুনলেন অসীম আগ্রহ নিয়ে। একদিনে পড়া শেষ না হওয়ায় বারবার আমাদের কাছে জানতে চাইলেন কাহিনীর কি পরিণতি হল—উত্তেজিত আলোচনা চালালেন নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের কাছে প্রবল অনুযোগ জানালেন এমন ব্যবস্থা আরো না করার জন্য।

প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অনেকেই আজকাল মজুর-কিসানের জীবন

নিয়ে গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। মজুর কিসান শ্রোতাদের কাছে এইভাবে শ্রীসমরেশ বসু বা শ্রীগুণময় মান্নার মতো শক্তিশালী তরুণ লেখকেরা যাতে নিজ নিজ রচনা উপস্থিত করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তা'তে একদিকে যেমন নিরক্ষরতার বাধা পেরিয়ে নতুন নতুন শ্রোতাদের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের পরিচয় ঘটানো যাবে তেমনই আবার যাঁদের জন্য লেখা তাঁদের গ্রহণ-বর্জনের নিরিখে যাচাই করা যাবে নতুন সাহিত্য প্রয়াসের সত্যকার মূল্য।

পরিচয়, ১৩৫৯, পৌষ

মেঘনাদ সাহা

চিনুদার সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানতেন যে সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাসে গভীর অনুরাগী এবং সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও তাত্ত্বিক এই মানুষটির মননের বহুমুখী ধারাগুলির একটি বয়ে চলত তাত্র বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসার খাতে। মেঘনাদ সাহার জীবন, তপস্যা, সৃষ্টি ও জীবনদর্শন সংক্রান্ত রচনাগুচ্ছ তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

বিজ্ঞানী সাহা সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা বহুদিন আগেই শুরু হলেও সময়ের চাপে তা প্রায়ই বাধা পেতো। কয়েকজন অনুজপ্রতিম বন্ধুদের উদ্যোগে 'বারোমাস' পত্রিকার প্রকাশ এবং মেঘনাদ সাহার জীবনী সংক্রান্ত রচনা প্রকাশে উৎসাহ চিনুদাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছিল।

'বারোমাস' পত্রিকার ছয়টি সংখ্যায় চিন্মোহনের এই রচনাপুঞ্জ প্রকাশিত হয়। আমরা সেই রচনাগুলির কয়েকটি নির্বাচিত অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করলাম।

প্রকাশের অনুমতি দিয়ে 'বারোমাস' পরিচালকমণ্ডলী আমাদের বাধিত করেছেন।

সম্পাদক, পরিচয়

উন্মেষ

শুধু সন-তারিখের খুঁটিনাটি, কুলপঞ্জী ও ঘটনা-পরম্পরার নিখুঁত বিবরণেই মানুষের পরিচয় মেলে না। তবে এ-সব বেমালুম বর্জন করেও আবার জীবনীকারের চলার জো নেই। কারণ যে প্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্বের সৌরভে একদিন দেশবাসী বা বিশ্বজন আমোদিত হন, এক পরম শুভলগ্নে বৃন্তহীন পুষ্পের মতো

হঠাৎ তা আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও একটা পূর্বাপর ধারাবাহিকতা, একটা ইতিহাস থাকে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালানোর আগে সকালবেলায় সলতে পাকানোর সেই নিতান্ত ঘরোয়া বৃত্তান্ত, সন-তারিখ-ঘটনা-পরম্পরায় বিধৃত জীবনের আটপৌরে কাহিনীই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার বেদী। বেদীতেই প্রতিমা-ভ্রম অবশ্য হাস্যকর। তবু প্রতিমার জন্য বেদী রচনারও প্রয়োজন পড়ে কিছুটা।

১৮৯৩ সনের ৬ অক্টোবর ঢাকা জেলার অন্তর্গত শেওড়াতলি গ্রামে মেঘনাদ সাহার জন্ম। শোনা যায় সেদিন নাকি ভীষণ দুর্যোগ, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আর তার সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত। প্রবল ঝড়ে আঁতুড়ঘরের চালা গেল উড়ে। মা তখন শিশুপুত্রকে কাপড়ে ঢেকে রাখলেন কোনোমতে। প্রবল দুর্যোগ ও বজ্রপাতের মধ্যে জন্ম বলেই নাকি ঠাকুমা নবজাতকের নামকরণ করেছিলেন 'মেঘনাদ'।

ঢাকা শহরের ত্রিশ মাইল উত্তরে তালেবাদ পরগণা ও বলিয়াড়ি পোস্ট অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত এই শেওড়াতলি গ্রামটি আয়তনে মাঝারি। পাশেই বংশাই নদী দক্ষিণ দিক থেকে গ্রামের পাশ দিয়ে উত্তরমুখো যেতে যেতে একটু পুবে বাঁক নিয়ে ফের আবার চলে গেছে উত্তরে। নদীর ধারে তিন-চার মাইল অন্তর অন্তর এক-একটি গ্রাম। বর্ষাকালে এ তল্লাটের সমস্ত পথঘাট, জমিজমা ডুবে একাকার হয়ে যায় অজস্র বর্ষণে, আর কানায় কানায় ভরে ওঠা নদীর জল পৌঁছে যায় মাটির দেওয়াল আর টিন ও ছিটের বেড়ার বাড়িগুলির দোরগড়া অবধি। তাই গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতেই থাকে শালতি বা ডিঙি নৌকো, হাটে-বাজারে যেতে তাই একমাত্র ভরসা ঐ সময়ে।

মেঘনাদের জন্মকালে শেওড়াতলির অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিলেন দোকানী ব্যবসায়ী, ক্ষুদে জোতদার এবং আধিয়ার। অর্থাৎ ছোটখাটো দোকানপাট চালানো বা আধিয়ারের সাহায্যে জোতজমি চাষ, কিছুটা হয়ত তেজারতি—জীবিকানির্বাহের এই ছিল সনাতন পন্থা। ধর্মবিশ্বাস ও আচরণে গ্রামের অধিকাংশ অমুসলমান পরিবারই ছিল বৈষ্ণব। অশিক্ষা ব্যাপক আকারেই কায়েম ছিল সমগ্র গ্রামজীবনে : নারীদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর; পুরুষদের ভিতরেও শিক্ষার দৌড় সামান্য লেখাপড়া, বড়জোর মামুলী হিসাবপত্র রাখার উপযোগী কিঞ্চিৎ পাটিগণিত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঢাকার দক্ষিণে, বিক্রমপুর অঞ্চল যদি বা তখনই কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল শিক্ষাদীক্ষায়,

বিদ্যার্জনের প্রায় কোনো ব্যবস্থাই তখনো পর্যন্ত চালু হয় নি উত্তরের ঐ অনগ্রসর এলাকায়।

কিন্তু বিপুল সম্ভাবনার অঙ্কুরকে অলক্ষ্যে তিলে-তিলে লালিত করার মতো অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ কতটা পেয়েছিলেন সেদিন মেঘনাদ? জীবিকা সংস্থানের উপায় হিসাবে পিতা জগন্নাথ সাহার একটি ছোট মুদীর দোকান ছিল বলিয়াড়ি বাজারে। চাল ডাল মসলাপাতির পাশাপাশি সেখানে কিছু কিছু মনিহারী সামগ্রীও রাখা হতো খরিদ্দারের জন্যে। হপ্তায় তিন দিন জগন্নাথ মালপত্র কেনাবেচার জন্য পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতেন দশ-পনের মাইল দূরের হাট বাজার গঞ্জগুলিতে। এ-সবের থেকে সামান্য যে আয় হতো তাতে পিতা, মাতা, পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার বৃহৎ পরিবারটির কোনোমতে ভরণপোষণ সম্ভব হতো অনেকটাই মাতা ভুবনেশ্বরীর সুনিপুণ গৃহিণীপনার গুণে।

বৈষয়িক অসচ্ছলতা ছাড়াও আর একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক ছিল সাহা পরিবারের জীবনপথে। বাঙালি হিন্দু সমাজের সুকঠোর 'অনুশাসন অনুসারে সাহারা 'ছোটজাত' হিসাবে গণ্য। সামাজিক মর্যাদায় এ-ভাবে খাটো হওয়ার তাৎপর্য আজ হয়ত আমরা শহরে বাস করে ততটা টের পাই না সচরাচর। কিন্তু রেল-বাস-ট্রামের বৃহৎকাষ্ঠে অথবা শহরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় পানাহারের শ্রীক্ষেত্র পেরিয়ে জাতকর্ম বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মের জগতে প্রবেশ করলেই দেখা যায় যে সেখানে রঘুনন্দনের দাপট আজও কত প্রচণ্ড। এমন কি মেঘনাদ সাহা বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো মনস্বীদের অনন্য-সাধারণ প্রতিভার গুণকীর্তনে যাঁরা প্রকাশ্যে পঞ্চমুখ তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ যখন হঠাৎ একটু গলা নামিয়ে অন্তরঙ্গতার সুরে 'এঁরা ঠিক সে-রকমের সাহা বা শীল নন' বলে ষোড়শ শতাব্দীর দেশাচারের সঙ্গে তাঁদের বিংশ শতাব্দীর সামাজিক বিবেকের রফা করার চেষ্টা করেন, তখন সেই হাস্যকর প্রয়াসের ভিতরেও প্রকট হয়ে ওঠে রঘুনন্দনেরই পরোক্ষ স্বীকৃতি। আর হিন্দু সমাজের বাইরে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মতো সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে এ-ধরনেরই মেকী মনোভাব প্রকাশ পায় যখন কোনো প্রতিভাধর মুসলমানেরই অসামান্য শক্তিকে কোনোমতেই অস্বীকার করতে না পেরে আমরা পরম ঔদার্য ও বদান্যতাভরে বলি—'কী আশ্চর্য! উনি কিন্তু ঠিক আমাদেরই মতো।'

এ সবের থেকে সত্তর বছর আগেকার সুদূর শেওড়াতলির অবস্থা কিছুটা অনুমান করা চলে অনায়াসেই। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে যেটি বিস্ময়কর সেটি হলো সামাজিক অবিচারবোধের চাপ মেঘনাদের ক্ষেত্রে কোনো হীনমন্যতার উদ্রেক

করতে পারে নি শেষ পর্যন্ত, বরঞ্চ উত্তরোত্তর জাগ্রত করেছে তাঁর প্রবল পৌরুষকেই। সে পৌরুষের প্রধান সহায় তাঁর বিশ্লেষণী মন, তাঁর বিজ্ঞান।

আরো একটি কথা ওঠে এ প্রসঙ্গে। হিন্দু সমাজেব এই সনাতন, সুদূরপ্রসারী apartheid ব্যবস্থার সব থেকে মারাত্মক দিক হয়ত এই যে, এ-ব্যবস্থার যাঁরা শিকার তাঁরা ও পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে অভিভূত এর সনাতনত্বের মহিমায়। তার কারণ এমন-এক অশিক্ষা ও সংস্কারবদ্ধ চিন্তার পরিমণ্ডলে এ-ব্যবস্থা আচ্ছন্ন যে তার অবিরাম সংসর্গে মানুষের সহজ, ঋজু ও জীবন্ত মননশক্তিও ক্রমে অসাড় হয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করে। শেওড়াতলির ঐ সাহা পরিবারেও অশিক্ষার প্রকোপ ছিল প্রচণ্ড। পিতা জগন্নাথের বিদ্যা 'শুভঙ্করী' পর্যন্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী ও তিন ভগ্নী সম্পূর্ণ নিরক্ষর, ভায়েদের মধ্যে দ্বিতীয় বিজয়কুমার ও চতুর্থ যুধিষ্ঠিরলালের শিক্ষাও প্রায় সমপর্যায়ের, বড়দাদা জয়নাথের পাঠ এণ্ট্রেন্স প রীক্ষা পর্যন্ত, একমাত্র কনিষ্ঠ কানাইলাল কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করেন মেঘনাদের আগ্রহে ও সহায়তায়। উত্তরকালে চেতলার 'ওরিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস' সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার হয়েছিলেন। ভাইদের মধ্যে কেউই এখন আর জীবিত নেই।

এমন এক পরিবারের তৃতীয় সন্তানের পক্ষে দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিক হওয়া দূরে থাক, আদৌ সুশিক্ষিত হওয়া যে কী আশ্চর্য ব্যাপার—অন্যতর পরিবেশে মানুষ হয়ে আজ হয়ত আমরা অনেকেই তা পুরোপুরি উপলব্ধি করি না। আমরা ভুলে যাই যে চারিদিকে শিক্ষা ও শিক্ষিতের ছড়াছড়ির আবহাওয়ায় কোনো বালকের পক্ষে যেমন অল্প আয়াসেই বিদ্যার্জন সম্ভব, বিপরীত পরিবেশে ঠিক তেমনি তা দুরূহ।

মেঘনাদ যে পরিবারে জন্মেছিলেন তার সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর নিজ পরিবারের তুলনা করলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেঘনাদের স্ত্রী, শ্রীমতী রাধারানীর নামের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো তকমা না থাকলেও তিনি ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুলে পড়েছিলেন এবং সাধারণ ভাবে শিক্ষিতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অজিতকুমার—ডি এসসি পি আর এস 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো' বর্তমানে 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের' অন্যতম অধ্যাপক এবং 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে'র মূল সভাপতি (প্রসঙ্গত এ-দেশে পিতা পুত্র উভয়েই এই গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার —এই একমাত্র দৃষ্টান্ত)। অজিতকুমারের ডক্টরেটের থিসিসের পরীক্ষক

ছিলেন আইরিন-জোলিও-কুরি, ম্যাক্স বর্ন ও এলিস। দ্বিতীয় পুত্র রঞ্জিতকুমার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এম ই ও বর্তমানে বোম্বাইয়ে টাটা জলবিদ্যুৎ সংস্থায় এখন উচ্চপদস্থ কর্ম পরিচালক। কনিষ্ঠ পুত্র প্রসেনজিৎ ভূতত্ত্বের এম্ এসসি, পি এইচ ডি (পেনসিল-ভ্যানিয়া) ও সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সেরামিক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উষারানী পদার্থ বিজ্ঞানের এম. এসসি (স্বামী ডঃ ক্ষুদিরাম সাহা পুণার ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিকাল মেটিরিয়লজির সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করে কিছুদিন হলো অবসর গ্রহণ করেছেন); দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণা চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট (স্বামী ডঃ ধর্মব্রত দাশ, পি এইচ ডি—বরাহনগর জুট মিলের প্রধান রসায়নবিদ হিসাবে কাজের পর অবসর গ্রহণ করেছেন); তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী চিত্রা ইংরেজিসাহিত্যে এম এ, পি এইচ ডি ও লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা (স্বামী ডঃ সুপ্রিয় রায় ভূতত্ত্বের এম এসসি, পি এইচ ডি, ডি এসসি এবং ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো) এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সংঘমিত্রা যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি এ ও এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে দিল্লীর দৌলতবাগ কলেজে অধ্যাপনা করছেন (স্বামী ডঃ মৃণালকান্তি রায় কৃষি বিজ্ঞানের পি এইচ ডি এবং বর্তমানে ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রকৃত জ্ঞানের খুবই মামুলী এক মাপকাঠি—এ-কথা মনে রেখেও লক্ষ করা দরকার যে শিক্ষার মানের দিক থেকে এই দুই পরিবারের ভিতরকার এই বিপুল ব্যবধান রচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে মাত্র এক পুরুষের মধ্যেই।

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন তো ওঠেই না, এমন-কি এ-দেশেরও কোনো খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর সঙ্গে মেঘনাদের তুলনা চলে না এদিক থেকে। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র থেকে শুরু করে হালের তরুণ বিজ্ঞানী পর্যন্ত প্রায় সকলেই সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তান, কেউ কেউ তো রীতিমত 'বড় ঘরের ছেলে'। হয়ত পৈতৃক অসচ্ছলতার মাপ-কাঠিতে একমাত্র রামানুজমের সঙ্গে মেঘনাদের কিছুটা তুলনা চলে—যদিও মনে রাখতে হবে রামানুজমও ব্রাহ্মণ সন্তান!

বাস্তবিক মেঘনাদের শিক্ষালাভের পথ একেবারে গোড়াতেই রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রায় ষোল আনাই। কারণ জগন্নাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়নাথকে

ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়ার পরেও যখন তার ফলে পারিবারিক আয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেল না তখন বিচক্ষণ বিষয়ী মানুষ হিসেবে তিনি স্থির করলেন যে অন্য পুত্রদের আর ইংরেজি শিখিয়ে কোনো লাভ নেই। বরঞ্চ যত শীঘ্র সম্ভব তারা দোকানের কাজকর্ম শিখে রোজগারের চেষ্টা করলে হয়ত সাংসারিক অসচ্ছলতার একটা সুরাহা হলেও হতে পারে।

মেঘনাদকে জগন্নাথ তাই হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই দোকানে বসালেন তাঁকে কাজকর্মে সড়গড় করে তোলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দেখা গেল ছেলের মন নেই দাঁড়ি-পাল্লার দিকে, মন পড়ে রয়েছে বইয়ের পাতায়। ছ-বছরের ছেলে অবশ্য গ্রামের মাইনর স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলেন দোকানদারির সঙ্গে সঙ্গে। তবে সেটা নেহাতই নিয়ম রক্ষার খাতিরে। তালপাতা আর দোয়াত কলম নিয়ে মেঘনাদ সেখানে ভোরবেলায় পড়তে যেতেন সহপাঠিদের সঙ্গে। তবে মা ভুবনেশ্বরী যেদিন ঘুম ভাঙাতে দেরি করতেন ও তার ফলে বয়সে ও মাথায় তার চাইতে বড় সহপাঠিরা ডাকাডাকি করে চলে যেত তাঁকে বাদ দিয়েই, সেদিন আর কারো রক্ষা থাকত না—মেঘনাদ সারাদিন কান্নাকাটি করতেন ইস্কুলে যেতে না পারার আক্ষেপে। পরিবারে তাই ছেলের নতুন নামকরণ হলো—'কাঁদুনে'।

কাঁদুনে ছেলে বুদ্ধির দীপ্তি কিন্তু সেদিন চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল গ্রাম্য মাইনর স্কুলের মাস্টারমশাইদের। এঁদের মধ্যে দুজন, যতীন চক্রবর্তী ও শশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় জগন্নাথ সাহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন তৃতীয় পুত্রের বেলায় তাঁর সিদ্ধান্তকে শিথিল করে আরো কিছুটা অন্তত মেঘনাদকে শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার জন্যে। যতীনবাবু পিতাকে এমন কথাও বললেন যে তাঁর এই ছেলেটির সামনে নাকি রয়েছে বিপুল এক সম্ভাবনা। ঠিক কত বিপুল—শেওড়াতলি মাইনর স্কুলের সেই প্রাজ্ঞ শিক্ষক তা অবশ্য কল্পনাও করতে পারেন নি সেদিন!

বড়দাদা জয়নাথও সম্ভবত তাঁর চাইতে তের বছরের ছোট এই ভাইটির মধ্যে অসামান্যতার লক্ষণ কিছুটা লক্ষ্য করে থাকবেন। শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে একযোগে তিনিও পিতার কাছে আর্জি জানালেন মেঘনাদকে প্রাথমিক স্তরের পরেও কিছুটা পড়তে দেবার জন্যে। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়ার ফলে জয়নাথ ঐ সময়ে এক পাটের আড়তে কাজ করছিলেন মাসিক বিশ টাকা বেতনে। একদিকে রোজগেরে ছেলে, অন্য দিকে গ্রাম্য স্কুলের দু-দুজন সম্মানিত ব্রাহ্মণ

শিক্ষক মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে জগন্নাথের সংকল্প টলল। স্থির হল মেঘনাদকে পড়ানো হবে প্রাথমিক পর্যায়ের পরেও।*

কিন্তু মত যদি বা মিলল, কাছেপিঠে তেমন স্কুল কোথায় পড়ার মতো? শেওড়াতলি থেকে শুরু করে দক্ষিণে ঢাকা শহর পর্যন্ত এই ত্রিশ মাইলের মধ্যে তখন একটিও বিদ্যালয় ছিল না উচ্চ ইংরেজি পর্যায়ের। শেওড়াতলি থেকে ছ মাইল দূরে, শিমুলিয়া গ্রামে অবশ্য একটি মিডল ইংরেজি স্কুলের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু লেখাপড়ার জন্য অতটুকু ছেলের পক্ষে তো রোজ বারো মাইল পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয় পায়ে হেঁটে। সুতরাং কি হবে উপায়? এ-বাধাও শেষ পর্যন্ত দূর হল বড়দাদা জয়নাথের প্রবল আগ্রহের ফলে। শিমুলিয়াবাসী শ্রীঅনন্তকুমার দাশ নামে এক গ্রাম্য ডাক্তারের সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করলেন—মেঘনাদ তাঁর বাড়িতে থাকবেন, খাবেন ও পড়াশুনো চালাবেন, আবার দাশ-পরিবারের গৃহস্থালি কাজকর্মে সাহায্যও করবেন যথাসাধ্য।

তপস্যা

মেঘনাদ স্থির করলেন অতঃপর তিনি বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু তার রসদ জোগাবে কে? জীবিকা সংস্থানের কি ব্যবস্থা হবে? বৃদ্ধ পিতামাতাও তো চেয়ে আছেন কৃতী সন্তানের মুখের দিকে—তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালনেরই বা কি হবে উপায়? এ-সব জটিল প্রশ্ন ভাবছেন আর প্রতিদিন হাটখোলা থেকে শহরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত তিনটে টুইশানির জন্য দু-দুবার সাইকেলে পাড়ি দিচ্ছেন—এ-ভাবে কয়েকমাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। এমন সময় এল এক সুযোগ, কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই। ব্যাপারটি সবিস্তারে বলার অপেক্ষা রাখে নানা কারণে।

১৯০৪ সনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত নতুন আইনে স্থির হয় যে এখন থেকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় আর শুধু পরীক্ষা-গ্রহণ ও ডিগ্রি বিতরণ করেই ক্ষান্ত থাকবে না—তার কাজ হবে উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত আয়োজন, বিশেষ করে

* পরবর্তীকালে শেওড়াতলি মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শ্রীবিপিনবিহারী সরকারকে বহুদিন রাঁচিতে রেখে চিকিৎসা করান মেঘনাদ। অবশেষে 'ক্যানসার' রোগে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৭ সনে।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সরাসরি তার দায়িত্ব গ্রহণ এবং গবেষণাদির যথাযথ পরিচালনা। স্মরণ রাখা দরকার যে প্রথম যে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র কেমব্রিজের মতো বনেদী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তাঁদের অন্যতম, বিখ্যাত আনন্দমোহন বসু মহাশয় এর বহু পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু পরীক্ষাগ্রহণের যন্ত্র করে রাখার বিপক্ষে এবং তাকে শিক্ষাদানের সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। ১৯২২ সনের সমাবর্তন ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ তাঁর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

'An enthusiastic though unsuccessful movement was set-up under the wise leadership of one of our most brilliant graduates, the late Ananda Mohan Bose to approach the government the request that the organization may be transformed into a teaching University. But alas! as has not infrequently happened in the history of institutions, what was then summarily rejected as a paradox, later became an axiomatic truth. ('আমাদের একজন দীপ্তিমান স্নাতক, পরলোকগত আনন্দমোহন বসু এক সোৎসাহ যদিও নিস্ফল আন্দোলন গড়ে তোলেন সরকারের কাছে এই আর্জি জানিয়ে যে, প্রতিষ্ঠানটিকে একটি শিক্ষাদানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হোক। হায়! বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে যে জিনিসটি বিরল নয় তাই ঘটল—তখন যাকে সরাসরি নাকচ করা হয়েছিল স্ববিরোধী বলে পরে তাই হয়ে দাঁড়াল স্বতঃসিদ্ধ')। কিন্তু আইন পাশ হলেও দেখা গেল যে কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ব্যবস্থা কিছুই এগোচ্ছে না দু বছর পরেও। এ-হেন অবস্থায় ১৯০৬ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরলেন আশুতোষ। একাদিক্রমে দীর্ঘ আট বছর উপাচার্য হিসেবে, তার পর সেনেটের সব থেকে প্রভাবশালী সদস্যরূপে এবং আবার ১৯২১ সন থেকে প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি গড়ে তুললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ '…বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণাবিভাগ স্থাপন করেছিলেন—বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই।'—'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'।

সাহিত্য, দর্শন ও আইনের ক্ষেত্রে আশুতোষ মোটের উপর নির্বিঘ্নেই নয়া ব্যবস্থা চালু করার কাজটি সমাধা করলেন। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল বিজ্ঞানের ব্যাপারে। যেই শোনা গেল যে আশুতোষ বিজ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার সুব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজ (University College of Science and Technology) প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন অমনি ইংরেজ শাসকমহলে এক গুরুতর মত পরিবর্তন দেখা গেল। এ-কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অর্থ সাহায্যের আবেদন তাঁরা নাকচ করতে লাগলেন একের পর এক, অথচ আর্টসের তুলনায় বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন স্বভাবতই বেশি ব্যয়সাপেক্ষ। ক্ষুব্ধ হয়ে আশুতোষ বললেন: 'Sympathy has failed us in quarters where we had a right to demand it, and where we confidently reckoned on it'. (অর্থাৎ যে তরফে সহানুভূতি দাবি করার আমাদের অধিকার আছে—যেখানে সহানুভূতি পাব বলে আমরা নিশ্চিত ভরসা করেছিলাম, ঠিক সেইখানেই আমরা হতাশ হয়েছি)।

এ-পর্বের বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী লিখেছেন: 'For reasons of its own, the Government of India of the day, which at an earlier stage, had given unmistakable indications of a desire to help the University to develop into a teaching and research organization, seemed, to all appearences to have lost interest in the further growth of the institution.' —'Hundred Years of the University of Calcutta' p. 188. (তদানীন্তন ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করার অভিপ্রায় এর আগে পর্যন্ত বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলেও, তার নিজস্ব কোনো কারণে এখন ঐ সংস্থাটির ক্রমোন্নতি বিষয়ে সরকার যেন সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। —'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ বছর', পৃ. ১৮৮)।

কিন্তু এই সরকারি নিরুৎসাহ কি সত্যই একটা আকস্মিক, রহস্যজনক ও অহেতুক মত পরিবর্তনের ব্যাপার?

এ-কথা অবশ্য ঠিক যে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার সময়ে কিছু কিছু ইংরেজ রাজপুরুষ, পাদ্রি ও সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার ও ভারততাত্ত্বিক গবেষণার কাজে বিশেষভাবেই সচেষ্ট হয়েছিলেন। উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম

জোনস বা ডেভিড হেয়ারের নাম তাই আমাদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু সাধারণভাবে বলা চলে গোড়ার দিকে শাসকবর্গ ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে একেবারেই বিমুখ ছিলেন। পরে একদিকে কিছু কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয় ও অপেক্ষাকৃত উদারমনা ইংরেজের মিলিত আন্দোলনের ফলে এবং অন্যদিকে সস্তায় দেশী আমলা সংগ্রহের লোভে তাঁরা একটা মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা করেন এ-ব্যাপারে (১৮১৩ সন থেকে সারা ভারতবর্ষের জন্য এই খাতে বরাদ্দ মোট টাকার অঙ্ক নির্ধারিত ছিল বছরে এক লক্ষ টাকা—সে টাকাও পুরো খরচ হতো না বছরের পর বছর)। পরে ১৮৫৭ সনের অভ্যুত্থানের আগুন নিভে এলে পর্যুদস্ত ও বহুলাংশে বিক্ষুব্ধ সামন্তবর্গের পুনরুত্থান প্রচেষ্টা এবং তার চাইতেও বেশি ব্যাপক গণ আন্দোলনের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে একটা পাকা প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে তাঁরা একটি বিশ্বস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে মনস্থ করেন ভারতবাসীদের ভিতরে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন:

'...মহিমময়ী মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসন এদেশে শুরু হলো। তাঁর নামে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হলো, তাতে মিষ্টি কথার ছড়াছড়ি। এ-দেশের উকিল ও শিক্ষিত সমাজ ধরে নিলে এটি তাদের ম্যাগনা কার্টা। ইংলণ্ডের ইতিহাস তাঁদের কণ্ঠস্থ। ভাবলে, সবুরে মেওয়া ফলবে। আগে একদল ইংরেজ বলত এ-দেশের যারা চাকরি করবে না, তাদের শিক্ষার জন্য কোম্পানির ভাবার কি দরকার। ১৮৬১ সালে সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তন করে রাজপ্রতিনিধি ক্যানিং কিন্তু বললেন—এ নীতি ঠিক নয়, এর ফল অত্যন্ত সর্বনেশে ও ক্ষতিকর হতে পারে—হয়তো সিপাহী বিদ্রোহের সময় নানা স্থানের জমিদার ও বর্গাদারদের বিশ্বাসঘাতকতার গল্প তখনো তাঁর মনে তাজা রয়েছে।...এইভাবে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। "সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পিঠপিঠই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।"' (বাংলার শিক্ষাসমস্যা ও আশুতোষ—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭১, পৃ. ৩৫-৩৬)

এ-সবই অবশ্য বিদেশী শাসকদের মনের কথা। কিন্তু ঘটনা-প্রবাহ যে ঠিক ঐ নক্সামাফিক এগোয় নি আর শাসকদের মতলবও যে তাই পুরোপুরি হাসিল হয় নি—তা বলাই বাহুল্য।

ভারতে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি ইংরেজ শাসকবর্গের এই বিমুখতা আরো প্রকট বিজ্ঞানশিক্ষা ও তার আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যাপারে। সেই কবে ১৮২৩ সনে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন:

'...As the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and apparatus'

('এ-দেশীয়দের উন্নতিবিধান যখন গবর্নমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীববিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থানবিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইয়োরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রভাবশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজি শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।'—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৮৫-৮৬)। তার পর দশকের পর দশক কেটে গেল কিন্তু অবস্থা কতটুকু এগোল ?

'উন্নত ও উদার' শিক্ষার বাহন হিসেবেই রামমোহন চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সরকার ইংরেজিকে বাহন করার প্রস্তাবটি মেনে নিলেও, তাঁর প্রস্তাবের মূল কথাটি অর্থাৎ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদিতে সুসজ্জিত প্রতিষ্ঠানে, উপযুক্ত শিক্ষকের পরিচালনায় সারা দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে তাঁরা মোটের উপর উদাসীন রইলেন আগের মতোই। বড় জোর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস শিক্ষার পাশাপাশি দু-চারটি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানশিক্ষার ছিটেফোঁটা লক্ষ করা গেল। অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজে যে-সব ইংরেজ চিকিৎসক, রয়াল ইঞ্জিনীয়ার অথবা সামরিক বা বেসামরিক কর্মচারী হিসেবে ভারতবর্ষে আসতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশের ভূতত্ত্ব ও ভূগোল, পশুপক্ষী ও উদ্ভিদ, রোগমহামারী, এমনকি ভারতবাসীদের বিচিত্র ভাষা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিষয়ক বহু মূল্যবান গবেষণা করে গেছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষিত 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'ও বিজ্ঞানের কোনো কোনো

বিভাগে এদেশে সর্বপ্রথম কিছুটা গবেষণার পত্তন করে, প্রধানত ইংরেজ পণ্ডিতদের সহায়তায়। আর ১৮১৭ সনে রবার্ট মে'র 'অঙ্কপুস্তকং' থেকে শুরু করে উইলিয়াম ইয়েটসের 'পদার্থবিস্থাসার' ও ফার্গুসনের জ্যোতির্বিদ্যা-সম্পর্কিত ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ, মার্শম্যান, পিয়ার্স ও পিয়ার্সনের ভূগোল, জন ম্যাকের 'কিমিয়াবিদ্যাসার' (Principles of Chemistry), লোসন্-সংকলিত ও পিয়ার্স অনুবাদিত 'পশ্বাবলী'-নামক প্রাণীবিজ্ঞানের বই এবং ফেলিক্স কেরীর দুঃসাহসিক বিশ্বকোষ রচনার প্রয়াস ('বিদ্যাহারাবলী') প্রভৃতির মধ্যে বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রাথমিক পাঠ্য রচনার শুভ সংকল্প অবশ্য খুবই স্পষ্ট। এ-সবের মধ্যে মোটের উপর ব্যক্তিগত উদ্যোগই প্রধান। কিন্তু যখনই কথা উঠেছে ভারতীয়দের যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তখনই নানারকম বাধা এসেছে সরকারের তরফ থেকে। যেমন, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : '…অগ্রে এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল না। ইংরাজ ডাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হস্পিটাল এসিস্টাণ্ট প্রেরণ করা আবশ্যক হইত। তাই একদল এদেশীয় "হস্পিটাল এসিস্টাণ্ট" প্রস্তুত করিবার জন্য "মেডিকাল ইনস্টিটিউশন" নামে একটি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রের কতকগুলি ঔষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন উপদেশ দেওয়া হইত মাত্র। ডাক্তার টাইটলার ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। যে ১৮৩৪ সালের কথা বলিতেছি, তখন ডাক্তার রস ঐ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাতে সোডার গুণ সর্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ফলত বোধ হয় তিনি সোডা-তত্ত্ব ব্যতীত অপর পদার্থতত্ত্ব বড় অধিক জানিতেন না। যখন-তখন সোডার মহিমা শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রেরা এমনি বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা তাঁহার নাম 'সোডা' রাখিয়াছিল। নব্যবঙ্গের নেতৃগণ এই 'সোডা'কে লইয়া সর্বদাই কৌতুক করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে 'Soda and his Pupils' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ডঃ টাইটলার একজন প্রাচ্যপক্ষপাতী ও উৎকেন্দ্র লোক ছিলেন। এ-দেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এই কারণে বর্তমান মেডিকাল কলেজ স্থাপনের সময় তিনি বড় বাধা দিয়াছিলেন।…কিন্তু ইংরাজ রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন

দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং এ-দেশীয়দিগকে ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতে লাগিলেন।' পৃ. ১৫৭-৫৮।

১৮৩৫ সনে মেডিকাল কলেজ স্থাপনের এই হলো পৃষ্ঠপট। ঠিক এই রকম বাধা ও বাধাজনিত গড়িমসি লক্ষ করা যায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। গোড়ায় বহুদিন পর্যন্ত ঐ কলেজ তো সরকারি পূর্ত বিভাগেরই অঙ্গ মাত্র ছিল। তার পর ১৮৬৫ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শেষ পর্যন্ত ১৮৮০ সনে শিবপুরে পাকাপাকি স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও বহুদিন পর্যন্ত তার প্রধান ঝোঁক রইল আধুনিক যন্ত্রনির্মাণ বিদ্যা বা তড়িৎ বিজ্ঞানে নয়, একান্তভাবেই পূর্তবিজ্ঞানের দিকেই।

অর্থাৎ ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক ও সত্যকার বিজ্ঞানশিক্ষার পথ ক্রমাগত বিড়ম্বিত হয়েছে সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবে। বহু আন্দোলনের চাপে, ঠেকে ঠেকে, শেষ পর্যন্ত যেটুকু করতে হয়েছে তা স্বভাবতই চাহিদার তুলনায় বরাবরই যৎসামন্য বোধ হয়েছে ভারতীয়দের কাছে।

আর রামমোহন, দ্বারকানাথ ও ডিরোজিওপন্থীগণ (১৮৩৯ সনে 'মেকানিকস ইনস্টিটিউশনের' পত্তন প্রধানত এঁদেরই উদ্যোগে), রাধানাথ ও প্যারীচাঁদ, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার (তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থাদি ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মারফত), কৃষ্ণমোহন, ভূদেব ও রাজেন্দ্রলাল (প্রথমোক্তের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ও শেষোক্তের 'প্রাকৃত ভূগোল' এবং 'বিবিধার্থসংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভে' প্রকাশিত অসংখ্য রচনা মারফত), মহেন্দ্রলাল (তাঁর 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' মারফত), রামেন্দ্রসুন্দর ('জিজ্ঞাসা', 'বিচিত্রজগৎ', 'প্রকৃতি' ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য রচনা মারফত), রবীন্দ্রনাথ ('ভারতী'তে নিয়মিত বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা-প্রকাশ, জগদীশচন্দ্রকে সর্ববিধভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস, 'বিশ্বপরিচয়' রচনা প্রভৃতি মারফত), জগদানন্দ ('প্রকৃতি পরিচয়', 'বৈজ্ঞানিকী', 'প্রাকৃতিকী', 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার', 'গ্রহনক্ষত্র' প্রভৃতি মারফত), জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র—এঁদের কেউ বিজ্ঞান প্রচারে নেমেছেন, কেউ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান-পত্তনে হাত লাগিয়েছেন, কেউ আগ্রহী হয়েছেন মৌলিক গবেষণার কাজে আর তারই মধ্যে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন ব্যাপক, বিজ্ঞানশিক্ষার আদর্শ। 'দিগ্‌দর্শন' 'সমাচারদর্পণ' থেকে শুরু করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'বঙ্গদর্শন' 'ভারতী' পর্যন্ত বহু সাময়িকপত্র

সে আদর্শকেই প্রচার করেছে সাধারণ্যে। জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে ক্রমাগত উঠেছে বিজ্ঞান ও টেকনিকাল শিক্ষার দাবি। স্বদেশীযুগের জাতীয় শিক্ষা অন্দোলনের দৃষ্টিও বহুলাংশে নিবদ্ধ থেকেছে এই দিকেই। জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় টাকা তুলে ও নিজে টাকা ঢেলে জাপান, আমেরিকা ও বৃটেনে ছাত্র পাঠানোর খরচ জুগিয়েছেন ঐ টেকনিকাল শিক্ষার জন্যেই। 'জাতীয়তাবোধ ও ভারতে কারিগরি বিজ্ঞানের প্রসার' প্রবন্ধে ('দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭১, পৃ. ৯১) ডাঃ ত্রিগুণা সেন লিখেছেন: '...যে-সময়ে তদানীন্তন সরকার শিবপুর কলেজে শুধু নিজের স্বার্থের খাতিরে পুর্ত্ত বিজ্ঞানের উপরে ঝোঁক দিয়েছিল, সে-সময়ে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট (১৯২৮ সনে এই ইনস্টিটিউটই রূপান্তরিত হয় 'যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনলজিতে' ওবং ১৯৫৫ সনে পরিণত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে) যন্ত্রনির্মাণ বিজ্ঞান ও তড়িৎ বিজ্ঞান শিক্ষা দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, যাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ স্বাধীন-ভাবে কলকারখানা স্থাপনের ও শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতে পারে।'

আমাদের 'স্বাধীনভাবে কলকারখানা স্থাপন ও শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হওয়া' স্বভাবতই বিদেশী শাসকদের মনঃপূত ছিল না কোনোদিনই। তাই বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারে বেসরকারি তৎপরতার পৃষ্ঠপটে আরো প্রকট হয় ওঠে সরকারের মজ্জাগত বিরূপতা।

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আশুতোষের উচ্চশিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনাকে যে সরকার সেদিন সুনজরে দেখেন নি—এর মধ্যে সত্যই আকস্মিকতা বা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। এমন কি স্বদেশী ও বিপ্লববাদের আবহাওয়ায় 'বাঙালী ছেলে বিজ্ঞানশিক্ষার অপব্যবহার করতে পারে এই আশঙ্কা হয়ত শাসকমহলে ছিল' ('দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭১, পৃ, ৪৬)। কাজেই সরকারের ঔদাসীন্য এবার সরাসরি বিরুদ্ধতার রূপ ধারণ করল—তাঁরা সাফ জানিয়ে দিলেন যে কোনো আর্থিক সহায়তার দায়িত্ব তাঁরা বহন করতে রাজী নন একেবারেই।

এমন এক সংকট মুহূর্তে এগিয়ে এলেন তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ। নগদে ও সম্পত্তিতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা তাঁরা তুলে দিলেন আশুতোষের হাতে (এর পরেও স্যার রাসবিহারী বিভিন্ন দফায় আরো ১৪ লক্ষ টাকা দেন বিশ্ববিদ্যালয়কে) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ফলিত গণিত, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ও

গবেষণার জন্য 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠাকল্পে। তাঁরা দানের শর্ত করলেন এই যে এই 'চেয়ার'গুলির অধিকারী হতে পারবেন শুধু ভারতীয়রাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সানন্দে এ-সর্ত স্বীকার করলেও সরকার যে এতে পুলকিত হলেন না, তা বলাই বাহুল্য। কারণ তাঁদের বিধানে এতাবৎ শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম পর্যায়ের চাকুরিগুলি প্রায় পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিল সাহেবদের জন্যে। জগদীশচন্দ্রের মতো বিজ্ঞানীরও সেখানে স্থান হয়েছিল তিনি ঐ 'সার্ভিসে'র প্রাপ্য বেতনের দুই তৃতীয়াংশের বেশি দাবি করবেন না—শুধু এই শর্তেই। আর প্রফুল্লচন্দ্রের কপালে তো জুটেছিল প্রাদেশিক 'সার্ভিস' যার বেতনের হার ভারতীয় 'সার্ভিসের' অর্ধেকের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে কৃতী ছাত্র, আশুতোষকেও একদা ঐ প্রাদেশিক 'সার্ভিসে' যোগদানেরই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল পরম বদান্যতাভরে।

দেশবাসীর সহানুভূতি ও দানবীর-তারকনাথ ও রাসবিহারীর আর্থিক সহায়তায় আশুতোষ এবার উদ্যোগী হলেন সরকারি অসহযোগের বাধা অতিক্রম করতে। তারকনাথের নামে প্রতিষ্ঠিত রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার 'পালিত চেয়ার' গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানালেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামনকে। আর রাসবিহারীর নামাঙ্কিত ঘোষ অধ্যাপক পদে মনোনীত হলেন ফলিত গণিতে ডঃ গণেশপ্রসাদ, পদার্থবিদ্যায় ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, রসায়নে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে ডঃ শঙ্কর পুরুষোত্তম আয়রকর।

শুধু প্রবীণদেরই নয়, আশুতোষ নবীনদেরও আহ্বান জানালেন বিজ্ঞানের নানা বিভাগে স্নানকোত্তর ক্লাস শুরু করার কাজে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন: '…১৯১৫ সালে নবীন একদল ছাত্র এম. এসসি পাশ করে স্যার আশুতোষকে ধরে বসল; আপনি রসায়ন ছাড়া* গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানেরও

---

* অবস্থাগতিকে ঐ সময়ে শুধু রসায়নবিভাগের কাজই শুরু হয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নায়কতায়। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন: '…আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে সায়েন্স কলেজে যোগদান করলেন। বড় রাস্তার ধারে (সার্কুলার রোড) তিনতলা বাড়ি উঠেছিল। তারমধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র বসবাস করতে লাগলেন একটা ঘরে। দক্ষিণ দিকের অংশে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হলো। ডাঃ প্রফুল্ল মিত্রও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করলেন।' ('বাংলার শিক্ষাসমস্যা ও আশুতোষ', বিজ্ঞানের সংকট, পৃ. ১৬৩-৬৪)

পদার্থবিদ্যা বিভাগের কাজ শুরু হতে কেন দেরি হচ্ছিল তার কারণ একটু পরেই দেখা যাবে।

স্নাতকোত্তর ক্লাস খুলুন—আমরা সাধ্যমত পরিশ্রম করে আপনার এ চেষ্টা সফল করে তুলব। স্যার আশুতোষ মানুষ চিনতেন আর বাংলার নবীন ছাত্রদের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই নানা বাধা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজী করালেন পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের ক্লাস খুলতে' ('বাঙলার শিক্ষাসমস্যা ও আশুতোষ', বিজ্ঞানের সংকট, পৃ-১৬৪)। সেই নবীন ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ যে অগ্রণী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

বিজ্ঞানীর জীবনদর্শন

নতুন তত্ত্ব ছাড়াও মেঘনাদের তপস্যায় উদ্ভব হয় বেশ কিছু নতুন বিজ্ঞানী এবং নতুন বৈজ্ঞানিক সংস্থার। বিদেশ থেকে ফিরে কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটানোর পর ১৯২৩ সালে তিনি যোগ দেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে। সেখানে ও পরে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকারী হিসাবে গবেষণা চালিয়ে কোঠারী, কিচলু, রমেশ মজুমদার, শ্রীবাস্তব, আত্মারাম, তোশনিয়াল, আর কে. সুর, ভার্গব, জি. এল. দুবে, এন. কে. সাহা, কে মজুমদার, কমলেশ মজুমদার, রাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী, অজিতকুমার সাহা প্রভৃতি উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। আবার এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ গড়ে তোলা, 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স' ও 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা এবং পরে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়শন' ও 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকা স্থাপনা, 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্সে'র মতো পুরনো প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ঢেলে সাজানো আর সর্বোপরি প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন অবৈতনিক ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর মৃত্যুর পর যে সংস্থাটি নামাঙ্কিত হয়েছে তাঁরই নামে সেই 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' প্রতিষ্ঠা—এ-সবই সাক্ষ্য দেয় তাঁর সংগঠনী প্রতিভার। এ ছাড়া নদীবিজ্ঞান চর্চার জন্য 'ইণ্ডিয়ান রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এবং আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত বর্ষপঞ্জী প্রচলনের জন্য পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডেরও প্রধান পুরুষ তিনিই।

মেঘনাদের কাছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক সংস্থার সার্থকতা যাচাইয়ের প্রধান মানদণ্ড—দেশ গড়ার কাজে ও-সবের উপযোগিতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র যে তাঁর চাইতে তিন ক্লাস নীচে পড়তেন,

তা আমরা আগেই দেখেছি। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ যখন উত্তরবঙ্গ প্লাবনে ভেসে যায় তখন সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে সংকটত্রাণের জন্য গঠিত হয় 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি'। তাঁর আমন্ত্রণে কমিটির সভাপতি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে রিলিফ কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপিত হলো বিজ্ঞান কলেজে। তরুণেরা সাহায্য নিয়ে দলে দলে ছুটলেন বন্যাক্লিষ্ট গ্রামগুলিতে সুভাষচন্দ্র পরিচালিত সেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মী হিসেবে।

মেঘনাদও সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে প্রচার-সচিব হলেন রিলিফ কমিটির। ঐ সময়েই গান্ধীজি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামকরণ করেন 'Doctor of floods'। একদিক থেকে দেখলে ঐ উপাধি গুরুর মতো শিষ্যেরও প্রাপ্য। প্রচার-সচিব হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের সময়ে তিনি শুধু হৃদয়াবেগে তাড়িত হন নি— তিনি খোলা রেখেছিলেন তাঁর সন্ধানী বৈজ্ঞানিক চোখ। বন্যার কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ তাই 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো আর নদীবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের সূচনাও ঐ সময়েই।

আবার ঐ কর্মসূত্রে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগের ফলে সুভাষচন্দ্র যখন ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে মেঘনাদকে আহ্বান জানালেন 'বঙ্গীয় যুবক সম্মিলনী'র প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে তখন তাঁর ভাষণে মেঘনাদ বললেন: '…আজকাল Back to nature রব উঠেছে।… কারখানার নাম শুনেই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই; শক্তিকে ঠিকভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার জন্য কারখানার দরকার।…বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান।…লেনিনের জীবনে মস্ত বড় একটা আকাঙ্ক্ষা, দেশের সমস্ত কাজ…তাড়িত শক্তিতে হবে।…যান্ত্রিক শক্তির অপব্যবহারকে বিজ্ঞানচর্চার ফল বলে ধরে নেওয়া একটা মস্ত ভুল। আমরা যদি বর্তমানে Back to nature নীতি অবলম্বন করে বৈদিক ঋষিদের মতন জীবন চালাতে আরম্ভ করি এবং যদি ইংরেজ গভর্নমেণ্ট দয়া করে আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেশে ফিরে যান এবং আমেরিকা জাপান যদি আমাদের দয়া করে আক্রমণ নাও করে, তবু আমরা আমাদের স্বাধীনতা রাখতে পারব না।

'দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হলে শুধু 'ত্যাগ' চলবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ, ত্যাগ তাকেই সাজে। অসমর্থ ব্যক্তির ত্যাগ 'অযোগ্যতারই' নামান্তর মাত্র। দেশের যুবকদের আদর্শ—দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হবে।… এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর জন্য ভবিষ্যতে যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামের

উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে।'[১]

এর জন্যই মেঘনাদের তীব্র প্রতিবাদ গান্ধীজির 'চরখা' আন্দোলনে প্রতিফলিত মনোভাবের বিরুদ্ধে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ডঃ অজিতকুমার সাহার কাছে এ প্রসঙ্গে শুনেছি; তাঁদের এলাহাবাদের বাড়িতে যখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এসেছিলেন তখন অজিতকুমরের বয়স বছর দশেক। তিনি সকাল থেকেই শুনছেন তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে আচার্যদেবের তুমুল তর্ক লেগেছে চরখা প্রসঙ্গে। মেঘনাদ বলছেন, গান্ধীজির অবৈজ্ঞানিক মনোভাব তবু বুঝতে পারি কিন্তু আদৌ বুঝি না আপনার মতো প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীর ঐ ব্যাপারে গান্ধীজিকে সমর্থন। প্রফুল্লচন্দ্র উত্তরে চরখার স্বপক্ষে গান্ধীজির যুক্তিগুলি একে একে তুলছেন—'দেশের মানুষের ব্যাপক কর্মহীনতা; বছরে সাত আট মাসের বেশি কৃষকদের জীবিকা থাকে না; পরিবারের সকলেই যদি চরখা চালায় তা হলে কিছুটা সংস্থান হতে পারে',-ইত্যাদি। মেঘনাদ বলছেন, 'চরখাও যন্ত্র, তবে অত্যন্ত সেকেলে ও নিকৃষ্ট ধরনের যন্ত্র। সে ক্ষেত্রে কেন আধুনিক ও উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বহু মানুষের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা একসঙ্গেই করা হবে না?" অজিতকুমার অবাক হয়ে শুনছেন পিতার সঙ্গে পিতার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের উত্তেজিত বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত আচর্যেদেব বললেন, 'তোমার সঙ্গে আর তর্ক করতে পারি না। তার চাইতে গাড়িটা বার করো, একবার নীলরতনের বাড়ি ঘুরে আসি' (প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র, ডঃ নীলরতন ধর তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের প্রধান)। অজিতকুমারের মনে পড়ে, প্রচণ্ড তর্কের মুখে মেঘনাদ গুরুদেবকে জবাব দেন, 'এখন আবার গাড়ি কেন? একটা গরুর গাড়ি ডেকে দিই!' আচার্যদেব হেসে ফেলেন এবং গুরুদেবকে উত্তেজনায় মাথায় অমন কথা বলে ফেলে ঈষৎ অপ্রস্তুত মেঘনাদও যোগ দেন সে হাসিতে।

দেশের দারিদ্র্যমোচনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক শিল্পায়ন এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ—Back to nature বা চরখার সর্বরোগহর মাহাত্ম্যকীর্তনের বিরুদ্ধে মেঘনাদ জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ভাবনা প্রচার শুরু করলেন বক্তৃতায় এবং পত্রপত্রিকা মারফত। এর মধ্যে ১৯৩৮ সালের ১৩ নভেম্বর শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে তিনি যে বক্তৃতা দেন তার ফলাফল বহু দূর গড়ায়। রবীন্দ্রনাথের

---

১ 'জাতীয় উন্নতির উপায়', শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মেঘনাদ রচনা-সংকলন', পৃ. ১৫-২৬।

সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২১ সালে দেশের বাইরে, জার্মানিতে। এবার শান্তিনিকেতনে কবির অনুরোধে তাঁর সেই বক্তৃতাটি ঐ বছর ডিসেম্বর সংখ্যা 'বিশ্বভারতী নিউজে' মূল ইংরাজিতে 'A New Philosophy of Life" নামে প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েকটি ইংরাজি ও বাংলা পত্রিকাতেও সেদিন ওটি প্রকাশিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রক্ষণশীল মহল থেকে শুরু হয় আক্রমণ। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ঐ প্রবন্ধে পরিস্ফুট মেঘনাদের যন্ত্র ও বিজ্ঞানের সহায়তায় দেশের দারিদ্র্যমোচনের অর্থনৈতিক যুক্তিই শুধু নয়, তার বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিও। যেমন, '…যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দুসমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিগর ও স্থপতির স্থান এই সমাজের অতি নিম্নস্তরে এবং হিন্দুসমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোনো যোগাযোগ নাই।…বর্তমানে সমস্ত প্রাচীন ধর্মাত্মক আদর্শই অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কারণ এই-সকল ধর্ম তথা আদর্শ বিশ্বজগতের যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক।'[১] প্রসঙ্গত মেঘনাদ দেখালেন যে বেদ অপৌরুষের নয় ও তাই অভ্রান্তও নয়।

স্বভাবতই রক্ষণশীল সমাজের আঁতে ঘা পড়ে ঐ প্রবন্ধের ফলে। পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীঅনিলবরন রায় প্রমুখ ব্যক্তি মেঘনাদকে তীব্র আক্রমণ করেন তাঁর 'অহিন্দু' মনোভাবের জন্য। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত তাঁর ও শ্রীমোহিনীমোহন দত্তের প্রবন্ধের জবাব মেঘনাদ দেন ঐ পত্রিকার চার সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে।[২] ঐ প্রবন্ধে তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে তিনি তীব্র আক্রমণ করেন রক্ষণশীল মহলের 'সবই ব্যাদে আছে' মনোভাবের।

আরো একটি ঘটনা এর কিছু আগে মেঘনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ১৯৩৮ সালে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রী, কৈলাসনাথ কাটজু একটি দেশলাই কারখানার উদ্বোধনী ভাষণে ঐ ঘটনাকে 'ব্যাপক শিল্পায়নের পথে মস্ত একটি ধাপ' বলে বর্ণনা করেন। ঐ বছরই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। সে-উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে মেঘনাদ

---

১ একটি নূতন জীবনদর্শন, মেঘনাদ রচনা-সংকলন, পৃ. ১১৩-১১৬।

২ শ্রীঅনিলবরণ রায় ও শ্রীমোহিনীমোহন দত্তের দুটি প্রবন্ধ এবং মেঘনাদ সাহার উত্তরের জন্য মেঘনাদ রচনা-সংকলনের পৃ. ১১৭-১৯০ দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত সংবাদপত্রে কাটজুর ভাষণের 'কাটিং' দেখিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন কংগ্রেস কোটি কোটি দেশবাসীর অন্নবস্ত্র আশ্রয় সমস্যা সমাধানের কথা কি ভাবছেন। একটি দেশলাই কারখানা খুলে তাঁরাও কি দেশের ব্যাপক শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখছেন? মেঘনাদের সঙ্গে ঐ আলোচনার ফলেই কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে জন্ম হয় 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি'র।

মেঘনাদ বুঝেছিলেন হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই কংগ্রেসী নেতাদের হাতে আসবে দেশশাসনের ভার। তাই তিনি নিছক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরিকল্পনা কমিটি না গড়ে চেয়েছিলেন জওহরলাল নেহরুর মতো আধুনিক ভাবনার কংগ্রেসী নেতাকে গোড়ার থেকেই ঐ কমিটির সঙ্গে যুক্ত করতে। তাঁরই চেষ্টায় নেহরু শেষ পর্যন্ত সম্মত হন ঐ কমিটির সভাপতি হতে।

এ ব্যাপারেও শান্তিনিকেতনে মেঘনাদের বক্তৃতার পরোক্ষ প্রভাবও লক্ষণীয়। তাঁর সে বক্তৃতার সময়ে শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঐ বক্তৃতার তারিখ ১৯৩৮ সালের ১৩ নভেম্বর। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই (১৯ নভেম্বর ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ নেহরুকে এক চিঠি প্রসঙ্গে লেখেন: '…The other day I have had a long and interesting discussion with Dr. Meghnad Saha about Scientific Planning for Indian Industry; I am convinced about its importance and as you have consented to act as the President of the committe formed by Subhas for the guidance of the congress, I would like to know your views on the matter.'[১]

আবার এ-চিঠির ঠিক ন'দিন পর শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সেক্রেটারি, অনিল চন্দ্র মহাশয় নেহরুকে লেখেন: 'Gurudeva has again written to you today…He has been rather captivated by Dr. Saha's ideas of Rational Planning and he is hoping much from the Committee. He wanted to talk to you, before you took up any other work, lest you, by force of events, got yourself cut off effectively from the Planning Committee's work. That is the chief reason of his anxiety to meet you. He also wants a 'Modernist' to be the

১ 'A Bunch of old Letters', Nehru, p. 295

Congress President for the next year, so that, the report when finished would be warmly accepted by the all India Congress and not just shelved up. In his opinion—and in the opinion of us all too—there are only two genuine modernists in the High Command—you and Subhasbabu. Your active co-operation is already secured by your being the Chairman of the Planning Committee and he, therefore, is very eager to see Subhasbabu again elected the President··· he recently wrote to Gandhiji about this. And if he met you now—he would in all probability seek your help in getting Subhasbabu reelected.'[১]

দেশবাসীর দারিদ্র্যমোচনকল্পে পরিকল্পিত প্রয়াস শুরু হওয়ার পিছনে এই কলা আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ আর সংস্কৃতিনায়কের পরোক্ষ ভূমিকা। ১৯৪৪ সালেই মেঘনাদ সূত্রাকারে তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন এইভাবে: '···we belive that the only way to achieve unity of thought and purpose in the political field, which is now wanting, is first to look at the problem of living for India's millions'

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সমস্যাকে দেখার দরুন মেঘনাদ চাইছিলেন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে, প্রায় যুদ্ধের সময়কার 'forced march condition' এ ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রাধান্যের ভিত্তিতে দেশের ব্যাপক শিল্পায়ন। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়া দেখার পর তাঁর ঐ চিন্তা যে আরো সুপ্রতিষ্ঠ হয় তাঁর 'My Experiences in Soviet Russia' বইটি তার সাক্ষ্য বহন করে।

'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির' সুপারিশ পুরোপুরি গ্রহণ করার পথে কিন্তু বাধা এল কংগ্রেসের নেতৃবর্গের বেশ শক্তিশালী অংশের। সে-বাধা অতিক্রম করা এমন-কি নেহরুর পক্ষেও সম্ভব হলো না—তাঁকে আপস করতে হলো পদে পদে। আর আপসহীন মনোভাবের জন্যই ১৯৩০ সালের আইন অমান্যের যুগে যে নেহরুর অনুরোধে এলাহাবাদে মেঘনাদ একদা বে-আইনী ঘোষিত

১ Ibid, pp. 29-300

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিষিদ্ধ কাগজপত্র চালাচালির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গেই মেঘনাদের বিচ্ছেদ ঘটল। স্বাধীনতার পর তাঁর স্থান হলো না জাতীয় সরকার কর্তৃক গঠিত পরিকল্পনা কমিশনে।

কিন্তু হাল ছাড়বার মানুষ ছিলেন না মেঘনাদ। ১৯৫২ সালে বামপন্থীদের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি কংগ্রেসকে পরাস্ত করে প্রবেশ করলেন লোকসভায়। সেখানে দেশের ব্যাপক শিল্পায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এবং জাতীয় পরিকল্পনা, বিশেষ করে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সমেত সমস্ত নদী উপত্যকা বিকাশ পরিকল্পনা-সংক্রান্ত সমস্যাদির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষ করেই স্মরণীয়।

আবার তাঁর পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল মানুষের অন্তহীন মিছিল বা যুক্তিসম্মত ভিত্তিতে রাজ্য সীমানার পুনর্বিন্যাসের সমস্যাও এই অশান্ত মানুষটিকে বারবার টেনে এনেছে আন্দোলনের আবর্তে। শেষের দিকের একটি ঘটনা দিয়ে শেষ করি। ১৯৫০-৫১ সালে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবল আন্দোলন চলছে। এমন সময় কলকাতায় এলেন প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরু। তাঁর কাছে ঐ দাবি পেশ করার জন্য বিশাল এক মিছিলের পথরোধ করল পুলিস। নেতাদের নির্দেশে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে বসে পড়ি রাজপথে। একেবারে সামনের সারিতে সেদিন ছিলেন আমাদের দুই নেতা—ডঃ মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু অবশেষে ছেদ টানল এই অসামান্য জীবনধারায়।

চার প্রবীণ বিপ্লবী

(উত্তর ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ও তার নেতাদের সম্পর্কে আমরা এখনও খুবই কম খবর রাখি। এখন আমাদের যখন নজর পড়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস রচনার দিকে তখন এ ধরণের মালমশলা হয়তো বিশেষ করেই কাজে লাগবে। লেখক এই প্রবন্ধে উত্তর ভারতের চারজন প্রবীণ বিপ্লবীর কথা লিখেছেন।)

মহেন্দ্রপ্রতাপের সন্ধানে দেরাদুন পৌছে দেখি তাঁর বাড়ির সদর দরজায় মস্ত এক তালা। বিষম দমে গিয়ে কি করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে ঐ বাড়িরই এক পরিচারিকা এসে হাজির। বললে, রাজা সাহেব ক'দিন হল মুসৌরি গেছেন মেয়ের কাছে। ঠিকানাও জানাল। তখুনি ঠিক করলাম পরদিন সকালে মুসৌরি ধাওয়া করব মহেন্দ্রপ্রতাপজীর খোঁজে। বয়স তাঁর জানতাম ৮৪, ৮৫-র মতো। তিনি অবশ্যই শতায়ু হবেন। তবু ভাবলাম আমার তরফে দীর্ঘসূত্রতা অসমীচীন হবে এ হেন অবস্থায়।

কিন্তু আজকের এই ২-রা অক্টোবরের সন্ধ্যায় কি করা যায়? পকেটে ছিল বিখ্যাত মারাঠি বিপ্লবী, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের একটি লেখার এই নিশানা—'ফ্রন্টিয়ার মেল', দেরাদুন, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৬১। খটকা লাগছিল অমন নামের কাগজ সত্যই বেরোয় কি না দেরাদুন থেকে। সংশয় নিরসন করলেন দেরাদুনের প্রায় আজীবন বাসিন্দা এক আত্মীয়া। তিনি জানালেন,

'ফ্রন্টিয়ার মেল' এখনো প্রকাশিত হয় এখান থেকেই, আর তার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর নাকি বিলক্ষণ আলাপ।

এমনি ঘটনাচক্রে সেদিন পরিচয় পণ্ডিত আমীরচাঁদ বম্বোয়ালের সঙ্গে। তাঁর সম্পর্কে পণ্ডিত সুন্দরলাল এক জায়গায় লিখেছেনঃ শ্রীআমীরচাঁদ বম্বোয়ালকে আমি চিনি ১৯০৭ সন থেকে যখন ২১ বছরের আমরা দুই তরুণ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে।···তিন বছর পরে আত্মগোপনকারী, পলাতক বিপ্লবী হিসেবে তাঁকে আমার এলাহাবাদের আস্তানায় লুকিয়ে রাখারও সৌভাগ্য হয়েছিল প্রায় মাসতিনেক। সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তখন ঝুলছিল তাঁর উপরে। তারপর থেকে আমাদের অন্তরঙ্গতা ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। তিনি এসেছেন অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে। যথার্থ দেশপ্রেমিক ও সর্বমানবের মুক্তিসংগ্রামী সৈনিক হিসেবে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সীমান্ত গান্ধী, খান আবদুল গফর খানের একাগ্র সহকর্মীরূপে সংগ্রাম করে চলেছেন পাখতুনিস্তানের স্বাধীনতার জন্যে। ('ফ্রন্টিয়ার মেল,' ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭)।

শালপ্রাংশু, মহাভুজ এই আশ্চর্য সুপুরুষ পাঠান জন্ম ও বংশসূত্রে পেশোয়ারের মানুষ। দেশ ভাগের আগে সেখান থেকে তিনি প্রকাশ করতেন প্রথমে 'ফ্রন্টিয়ার এডভোকেট', ও রাজাদেশে সেটি বন্ধ হওয়ার পর 'ফ্রন্টিয়ার মেল' পত্রিকা। দেশভাগের পর জন্মভূমি ছেড়ে এখন তিনি দেরাদুনের বাসিন্দা আর সেখান থেকেই বহু বছর যাবৎ প্রকাশ করছেন ঐ পত্রিকা। 'ফ্রন্টিয়ার মেল' নামের এই হল রহস্য। উদ্বাস্তুর নিরন্তর অন্তর্দাহ তাঁর ক্ষেত্রে আরো প্রকাশ পেয়েছে ঐ পত্রিকা দপ্তরের সংলগ্ন তাঁর সুন্দর বাড়িটির নামকরণেও—'পেশোয়ার ভবন'।

পণ্ডিত আমীরচাঁদের জন্ম ১৮৮৬ সনের ৮ই অগাস্ট। ওঁর মুখেই শুনলাম মহেন্দ্রপ্রতাপজী ও পণ্ডিত সুন্দরলালেরও জন্ম নাকি ঐ বছরেরই যথাক্রমে ১লা ডিসেম্বর ও ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে। অর্থাৎ পণ্ডিত আমীরচাঁদ ও পণ্ডিত সুন্দরলালের এখন ৮৬ চলছে আর মহেন্দ্র প্রতাপজীও ৮৫ পেরোবেন এই ডিসেম্বরে। এই বয়সেও তিনজনই কিন্তু বেশ কর্মক্ষম ও সক্রিয়—আমীরচাঁদজী তো তাঁর ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদনা ও নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা করে চলেছেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে।

আর এই তিন বিপ্লবীর মধ্যে যে গভীর প্রীতি ও অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক বর্তমান তা বলাই বাহুল্য।

পণ্ডিত আমীরচাঁদ ১৯০৭ সন নাগাদ যে বিপ্লবী গোষ্ঠিটির সঙ্গে যুক্ত হন সেটি হল লাহোরের 'ভারতমাতা সোসাইটি' বা 'আঞ্জুমান ই মুহিব্বান-ই-বতন'। কলকাতা, পুনা ও লাহোর ঐ সময়ে ছিল এ-দেশের বিপ্লবী তৎপরতার প্রধান কেন্দ্র। যুক্তপ্রদেশের অনেক বিপ্লবীও তখন তাঁদের ঘাঁটি গেড়েছিলেন লাহোরে। মোরাদাবাদের বিখ্যাত বিপ্লবী, সুফী অম্বাপ্রসাদ। এই সাধু চরিত্রের বিপ্লবী ১৯০৯ সনে সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গে ইরানে পালিয়ে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁকে দুর্বল ইরান সরকার ইংরেজ-বাহিনীর হাতে তুলে দেয় ও কোর্ট মার্শালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু যেদিন তাঁকে গুলি করে মারার কথা তার আগের দিন—১৯১৭ সনের জানুয়ারি মাসে ইংরেজের কয়েদখানায় তাঁর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। অনেকের ধারণা ইংরেজের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে) লাহোরে ঐ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০৭ সন নাগাদ। ঐ সমিতির সঙ্গে আরো যাঁরা যুক্ত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্দার অজিত সিং (১৯০৭ সনে লাজপৎ রায়ের সঙ্গে এঁকেও নির্বাসিত করা হয় মান্দালয়ে ও দু বছর পর ইনি সুফী অম্বাপ্রসাদের সঙ্গে পালিয়ে যান ইরানে), তাঁর দুই ভাই সর্দার কিষণ সিং (ইনি অমর শহীদ ভগৎ সিং-এর পিতা) ও সর্দার শরণ সিং, লালা আনন্দকিশোর মেহতা, লালা পিণ্ডিদাস (এঁরই বাড়িতে আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়দের পাঠানো একতাড়া বিপ্লবী ঘোষণাপত্র পাওয়ায় ১৯০৭ সনে এঁকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়), লালা কেদারনাথ সাইগল (মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় এঁর প্রথমে ৪ বছর কারাদণ্ড হয়—পরে আপীলে ইনি মুক্তি পান), বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ, কবি লালা লালচাঁদ 'ফলক', হাপুরের মৌলভি জিয়াযুল হক, বিখ্যাত বিপ্লবী ও 'গদর' দলের সম্পাদক লালা হরদয়াল, হরদয়ালের পরে যিনি ঐ দলের সম্পাদক হন সেই পণ্ডিত রামচন্দ্র ভরদ্বাজ (ইনি পেশোয়ারের লোক। ১৯১৮ সনের ২৩ এপ্রিল মার্কিন বিচারালয়ের মধ্যে 'গদর' দলের আর এক সদস্যের গুলিতে ইনি নিহত হন। হত্যাকারীকেও একজন সান্ত্রী তখনই গুলি করে মারে। সমস্ত ঘটনাটি এখনো পর্যন্ত রহস্যাবৃত ও বহুবিতর্কিত), লালা শ্যামদাস ভার্মা, মীরাটের উকিল পণ্ডিত প্যারীলাল শর্মা, এলাহাবাদের 'স্বরাজ্য' পত্রিকার (এই পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে এখনই কিছু কম বলব) সুপরিচিত প্রথম সম্পাদক, পণ্ডিত শান্তিনারায়ণ ভাটনগর, লালা গোবর্ধন

দাস, লালা হনুমন্ত সহায় (দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার একমাত্র জীবিত আসামী। এঁর সম্পর্কেও কিছু খবর এখনই পাওয়া যাবে), পণ্ডিত সুন্দরলালের মতো বহু মানুষ।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'ও এই দলের উল্লেখ রয়েছে এইভাবে : 'পাঞ্জাবের চরমপন্থী বিশিষ্ট কর্মী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায় আম্বালায় বাস করতেন।…তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'যুগান্তর' আফিসে আসেন এবং কর্মীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে লেখকের মামলার সময় পুনরায় আসেন এবং চারুচন্দ্র রায়ের (সম্ভবত চন্দননগরের—প্রবন্ধকার) সহিত পাঞ্জাবে অস্ত্রাদি আমদানি করিবার উপায় বিষয়ে পরামর্শ করেন। ইঁহারা লাল লাজপৎ রায়কে সম্মুখীন করিয়া স্বদেশী এবং জনহিতকর কর্ম করিতেন। ইঁহার সহিত বোধহয় সুফী অম্বাপ্রসাদের দলের যোগাযোগ ছিল। সর্দার অজিত সিংহের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল' (২২৩ পৃঃ)।

পণ্ডিত আমীরচাঁদেরও উল্লেখ করেছেন ডাঃ দত্ত তাঁর বইয়ে এইভাবে : 'ঐ বৈপ্লবিক দলে ছিলেন পেশোয়ারের আমীরচাঁদ এবং কবি 'ফলক'। আমীরচাঁদ গাড়ি চড়িয়া পাঠানদের এলাকায় যাইয়া বৈপ্লবিক হ্যাণ্ডবিল ও পুস্তিকা বিতরণ করিতেন। তিনি একবার জেলে নিক্ষিপ্ত হন' (ঐ, ১২১—২২ পৃঃ)।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তেও বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে 'নিরালম্ব স্বামী') যখন ১৯০৬ সনে দেশ পর্যটন কালে পাঞ্জাবে যান তখন তাঁর সঙ্গেও সর্দার অজিত সিং, সর্দার কিষণ সিং, লাল হরদয়াল প্রভৃতির যোগাযোগ হয়। পেশোয়ারের ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি) ও আম্বালার ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায়ের নামও তিনি করেছেন এই প্রসঙ্গে (২০০ পৃঃ)।

পণ্ডিত আমীরচাঁদ এদিকে যখন এই ধরণের বিপ্লবী কাজকর্মে ব্যাপৃত তখনই আবার ১৯০৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হচ্ছেন পেশোয়ারের প্রথম কংগ্রেস কমিটির যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পেশোয়ারের পণ্ডিত রামচন্দ্র ভরদ্বাজ। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন সেই পেশোয়ারের কংগ্রেস কমিটির একমাত্র জীবিত সদস্য। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংলগ্ন উপজাতি এলকায় তখন বৃটিশ সরকার যে 'আগুয়ান নীতি' চালাচ্ছিল তার স্বরূপ সম্পর্কে তখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে অবহিত ও সচেতন

রাখতেন অনেকখানি আমীরচাঁদজীই। ১৯১৯ সনের ৬-ই এপ্রিল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের আহ্বানে পেশোয়ারের অভূতপূর্ব সাড়ার পিছনেও তাঁর ভূমিকা কম ছিল না। সীমান্ত প্রদেশ থেকে তখন তিনি সরকারী আদেশে বিতাড়িত। তা সত্ত্বেও তার মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি গোপনে রাওলপিণ্ডি থেকে পেশোয়ারে এসে ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে বহু কর্মীর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাদের কাছে রাওলাট কানুনের বিরুদ্ধে হরতাল সংগঠিত করার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর সঙ্গে তিনি রাওলপিণ্ডিতে থেকে ছাপিয়ে এনেছিলেন হরতালের বহু পোস্টার। সে পোস্টারে মুড়ে দেওয়া হয় সারা শহর এবং ৬-ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় পেশোয়ারের প্রথম রাজনৈতিক হরতাল ও জনসভা।

১৯২৩ সনে পণ্ডিত আমীরচাঁদ ও হাকিম আবদুল নাদভি উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দুস্তান সেবাদলের প্রাদেশিক শাখা। এটা অবশ্য সুবিখ্যাত 'খুদাই খিদমৎগার' বাহিনী-সমেত সীমান্ত গান্ধীর আবির্ভাবের আগের কথা। ১৯৩০ সনের আন্দোলনের সময়ে সেখানে বৃটিশবাহিনীর নির্মম গুলিচালনা ও অত্যাচারের বিপক্ষে জনসাধারণের অসাধারণ নির্ভীক সংগ্রামের খবরও ভারতবর্ষের মানুষ জানতে পারে অনেকটাই আমীরচাঁদজীর গোপন আস্তানা থেকে নিয়মিত কংগ্রেস বুলেটিন প্রকাশের দরুন এবং পরে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে বিঠলভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় সেই অত্যাচারের তদন্ত করার জন্য। ঐ বছরই আইন অমান্য আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে 'ফ্রন্টিয়ার এডভোকেট' পত্রিকায় তিনিই আবার সর্বপ্রথম খান আবদুল গফর খানকে অভিহিত করেন 'সীমান্ত গান্ধী' নামে। এক বছরের মধ্যে সেই নাম এত ছড়িয়ে পড়ে যে খান আবদুল গফর খান যখন জীবনে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে এলেন করাচীতে তখন তাঁকে ঐ নামে সম্বর্দ্ধিত করলেন স্বয়ং গান্ধীজী। সেই দিন থেকে তিনি সীমান্ত গান্ধীর বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন পাখতুনিস্তানের স্বাধীনতাকল্পে—যদিও তাঁর কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি অন্ধ ভক্ত ন'ন সীমান্ত গান্ধীরও।

পণ্ডিত আমীরচাঁদ মূলত একজন বিপ্লবী সাংবাদিক। তখনকার দিনে বিপ্লবী সাংবাদিকতার যে একটি অসামান্য নির্ভীক প্রয়াসের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন তার কথা বলেই শেষ করব এই আমীরচাঁদ-প্রসঙ্গ। ১৯০০ সনে শান্তি-নারায়ণ ভাটনগরের সম্পাদনায় এলাহাবাদ থেকে প্রকাশনা শুরু হয় 'স্বরাজ্য' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকার। আগেই বলা হয়েছে শান্তিনারায়ণজী ছিলেন বিপ্লবী 'ভারতমাতা সোসাইটি'র কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। ঐ পত্রিকা

আড়াই বছরকাল মাত্র জীবিত ছিল, তারপর ১৯১০ সনের প্রেস আইনে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায়। ঐ আড়াই বছরে মোট ৭৫-টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং সেই সংখ্যাগুলিতে লেখার জন্য পরের পর আট জন সম্পাদক মোট ৯৪॥ বছর জেল খাটেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় সম্পাদক আত্মগোপন করেন ও শেষ সম্পাদক, পণ্ডিত আমীরচাঁদ আত্মগোপন করে তিন মাস পত্রিকা চালাবার পড়ে ধরা পড়েন কিন্তু প্রেস আইনে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি অব্যাহতি পান আন্দামানে নির্বাসনের হাত থেকে। দু'জন সম্পানক—শ্রীনন্দগোপাল চোপরা ও শ্রীলাধারাম কাপুর প্রত্যেকেই তিনটি করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য সম্পাদকীয় পিছু ১০ বছর হারে মোট ৩০ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এমন কি পণ্ডিত রামচরণ শর্মাকে জন-সমাবেশে 'স্বরাজ্য' পত্রিকা থেকে রচনা পড়ে শোনানোর জন্যও ৩০ বছর দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তারের আগে সপ্তম সম্পাদক শ্রীলাধারাম কাপুর (এঁর ৩০ বছর কালাপানির ব্যবস্থা হয়েছিল) তাই সঠিকভাবেই তাঁর পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন: "স্বরাজ্য" পত্রিকার জন্য সম্পাদক আবশ্যক। বেতন দু'টি করে শুকনো চাপাটি, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পিছু ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড"।

আন্দামানে সহকর্মীদের কাছে 'ফিল্ডমার্শাল লাদারাম কাপুর' নামে পরিচিত ঐ নির্ভীক সম্পাদক কিন্তু আন্দামান থেকে ফিরে ১৯৬৬ সনের ৫-ই জানুয়ারি দিল্লীতে মারা যান অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে, বিনা চিকিৎসায় এবং সম্পূর্ণ নির্বান্ধব পরিস্থিতিতে। আর যে পত্রিকা সম্পর্কে খাস রাওলট রিপোর্ট একদা মন্তব্য করেছিল: 'অধুনা একেবারে ঠাণ্ডা এই প্রদেশে (অর্থাৎ যুক্ত প্রদেশে—প্রবন্ধকার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম দৃঢ়সংকল্প ও ধারাবাহিক প্ররোচনা এল 'স্বরাজ্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠার ফলে,…' (১৩১ পৃঃ) তার বিষয়েই ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত 'History of Indian Journalism'-এ লেখা হল এই একটি মাত্র লাইন: "The Urdu 'Swarajya (1907) from Allahabad had a nationalist policy" (২০৫ পৃঃ)।

২-রা অক্টোবর সকালে মুসৌরী গিয়ে অবশেষে মহেন্দ্র-প্রতাপজীর নাগাল পাওয়া গেল। আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর সারা পৃথিবী পর্যটন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানীতে গিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের সুপ্রসিদ্ধ 'বার্লিন কমিটি'তে যোগদান, তাদেরই তরফে 'ইঙ্গ-জার্মান মিশনে'র নেতা হিসেবে সেখান থেকে সুদূর আফগানিস্তান যাত্রা, কাবুলে 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত

সরকার' প্রতিষ্ঠা ও তার নেতৃত্ব গ্রহণ, ইংরেজ সরকার কর্তৃক তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, নভেম্বর রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশে গমন ও ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—মহেন্দ্রপ্রতাপজীর জীবনের এই সব বিচিত্র কাহিনী আমাদের অনেকেরই মোটামুটি জানা। তাছাড়া তাঁর 'My life story of 55 years' নামের স্মৃতিকথা মারফৎও তাঁর অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসের উৎসুক পাঠকদের কানেও কিছুটা পৌঁছেছে। কিছুদিন তিনি সদস্যও ছিলেন আমাদের লোকসভার।

পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য তাই তাঁর এই সাক্ষাৎকারে যে নতুন কথাগুলি জানতে পারলাম শুধু তাইই এখানে বলছি। অবশ্য পুরানো প্রসঙ্গের জের হিসাবে তাঁকে প্রশ্ন করে যে খুচরো তথ্যগুলি জেনেছি সেগুলিও এরই মধ্যে পড়বে। যেমন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের 'প্রেম মহাবিদ্যালয়' প্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে তারই একটি বিভাগের 'ডিরেক্টর' হিসেবেই তিনি বিপ্লবী অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়োগ করে ছিলেন এবং কিছুদিন অবনীনাথ কাজ করেছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপজীর 'সেক্রেটারি' হিসেবেও! কাবুলে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের (যার 'প্রেসিডেন্ট' ছিলেন তিনি নিজেই) মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে তিনি বিশেষ করে নাম করলেন এই ক'জনের: মৌলানা বরকতুল্লাহ্ (প্রধানমন্ত্রী, ১৯২৭ সনে সানফ্রানসিস্কোয় এঁর মৃত্যুর পর তিনি উপস্থিত ছিলেন তাঁর শেষকৃত্যের সময়ে), মৌলানা ওবায়তুল্লাহ্ সিন্ধী (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), চম্পকরমন পিল্লাই (পররাষ্ট্রসচিব) ও মৌলানা মহম্মদ বশির (প্রতিরক্ষা মন্ত্রী)। মহেন্দ্র-প্রতাপজী জানালেন যে প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে তিনি লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন তার মধ্যে তিনিই শুধু জীবিত—তবে বরকতুল্লাহ্-র পরিচারক, ইব্রাহিমের খবর তিনি জানেন না। 'মাদাম কামা'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কি না এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে ১৯২২ ও ১৯২৭ সনে তাঁর দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল শ্রীমতী কামার সঙ্গে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে জার সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি যে দু'জন দূতকে দ্বিতীয়বার তুর্কিস্তান পাঠিয়েছিলেন এবং জার সরকার যাঁদের ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছিল তাঁরা হলেন শামশের সিং (ডাঃ মথুরা সিং-এর ছদ্মনাম) ও খুদাবক্স। এর মধ্যে শামশের সিং-এর ফাঁসী হয় কিন্তু খুদাবক্স ইংরেজের দরবারে প্রভাবশালী আত্মীয় থাকার দরুন অব্যাহতি পান মৃত্যুদণ্ড থেকে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ এ'ও জানালেন যে ১৯২৯ সনে তিনি 'বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র' সম্পর্কে প্রচারের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন বার্লিনে এবং তখন থেকে সমানে কাজ করে চলেছেন সেই উদ্দেশ্যেই।

এ-সব খুচরো খবর ছাড়া মহেন্দ্রপ্রতাপজীর মুখে এবার যে নতুন তথ্যটি পেলাম সেটি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার শেষভাগে তাঁর জাপানে উপস্থিত সংক্রান্ত। তাঁর স্মৃতিকথা শেষ হয়েছে ১৯৪১ সনে। তাই এই ঘটনা সম্ভবত আমার মতো অনেকেরই অজানা।

ব্যাপারটা জানতে পারলাম কিছুটা আকস্মিক ঘটনাচক্রে। মহেন্দ্র-প্রতাপজীর কাছে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যে দুই ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। বুঝলাম তাঁরা মহেন্দ্রপ্রতাপজীর মত জানতে চাইছেন সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন কি না, এই বিষয়ে। মনে হল তাঁদের বিশ্বাস সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন এবং খোস্‌লা কমিশনের সামনে উপস্থিত করার জন্য তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন সূত্রে। মহেন্দ্রপ্রতাপজী বেশ স্পষ্ট করেই তাঁদের জানালেন যে তাঁর ধারণা সুভাষচন্দ্র জীবিত নেই কারণ জীবিত থাকলে তাঁর প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসার কোন বাধা থাকতে পারে না এখনকার দুনিয়ায়। এই প্রসঙ্গেই জানতে পারলাম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার শেষ দিকে তিনিও জাপানে ছিলেন কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন নি এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর যে কোন ক্রমেই ভারতবর্ষে যাওয়া উচিত নয়—এই মতও তিনি সেখানে প্রকাশ করেছিলেন বেশ স্পষ্টভাবেই। আর সম্ভবত তারই ফলে জাপানী সরকারের তরফ থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল জাপান ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন চেষ্টা না করতে এবং জাপানের ভিতরেও এক জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার আগে সরকারকে সে খবর জানাতে। অর্থাৎ কথাটা স্পষ্ট করে না বললেও মহেন্দ্রপ্রতাপজী ঐ সময়ে ছিলেন জাপানী সরকারের নজরবন্দী। তারপর যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর মার্কিন দখলদারী বাহিনী যখন জাপানে পৌঁছয় তখন আবার মহেন্দ্রপ্রতাপজীকে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ জেলে পাঠায় এবং ১৯৪৬ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁকে বন্দী থাকতে হয় জাপানে। অবশেষে ১৯৪৬ সনের মাঝামাঝি তিনি মুক্তি পান ও স্বদেশে ফিরে আসেন শেষ পর্যন্ত।

মহেন্দ্রপ্রতাপজী তাঁর 'বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র' আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে ইংরেজীতে 'World Federation' এবং হিন্দীতে 'সংসার সংঘ' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করেন। এ-ছাড়া তিনি অসংখ্য পুস্তিকারও রচয়িতা এবং

তাঁর প্রকাশক এবং প্রায়ই বক্তৃতা করেন বহু সভা-সমিতিতে। কয়েকটি পুস্তিকা তিনি আমাকে উপহার দিলেন। আমি তার একটির উপরে তাঁর স্বাক্ষর চাইলে তিনি একটি কাগজে তাঁর সুন্দর হস্তলিপিতে, গোটা গোটা অক্ষরে এই কথাগুলি লিখে দিলেন: 'I am very glad that Mr. Sehanavis kindly took the trouble to call on me to know some facts about our work in the past. I wish he also takes interest in the work that I am doing today for the future.'

দিল্লীতে ফিরে ৫ই অক্টোবর পণ্ডিত সুন্দরলালকে গিয়ে ধরলাম তাঁর আরউইন রোডের আস্তানায়। তিনি খাটিয়ায় শুয়েই আমার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক যে আলাপ করলেন তার থেকে বুঝলাম যে ৮৬ বছর বয়সে জরা তাঁর শরীরকে কিছুটা জীর্ণ করলেও স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর চিন্তাকে। এখনো বেশ গুছিয়ে তিনি বললেন তাঁর এই জীবনবৃত্তান্ত:

'আমার জন্ম ১৮৮৬ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর—মীরাটের কাছাকাছি একটি জায়গায়। ১৮৯৯ সনে আমাকে শিক্ষা-লাভের জন্য পাঠানো হয় লাহোরে। সেখানে ১৯০৫ সনে আমি ডি এ. ভি কলেজ থেকে বি এ পাশ করি। ঐ লাহোরেই আমি সংস্পর্শে আসি লালা লাজপৎ রায় এবং হংসরাজ, শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দের। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সর্দার অজিত সিং। তাঁর ভাই, সর্দার কিষণ সিং-এর সঙ্গেও আমার অন্তরঙ্গতা ছিল যথেষ্ট। লাহোরে থাকার সময়ে লাজপৎ রায় ছিলেন আমার অভিভাবকস্বরূপ। ভারতের কংগ্রেসী রাজনীতিতে তিনি তিলক ও বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে উল্লিখিত হতেন চরমপন্থার প্রবক্তা হিসেবে। ১৯০৫ সনে লাজপৎ পিছনে থেকে তরুণদের গোপন কাজকর্মে সহায়তা করতেন এবং নিজেও গড়ে তুলেছিলেন একটি গুপ্ত সমিতি।

'১৯০৫ সনে আমি এলাহাবাদে এলাম আইন পড়তে। সেখানে আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ, কৈলাশনাথ কাটজু, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন এবং বয়সে আমার চাইতে ৮ বছরের বড়—রবিশঙ্কর শুক্ল।

'১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ সফর করেন লাল-বাল-পাল ত্রয়ী। তার ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তার জোয়ারে আলোড়িত হয়ে আমি প্রথম চরমপন্থী রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হই।

'ঐ ১৯০৫ সনেই আমি বারানসী কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেই এবং সান্নিধ্যে আসি গোখলে ও তিলকের। গোখলে ছিলেন আশ্চর্য সৎ ও ভালো

লোক কিন্তু তিলক নিঃসন্দেহেই মহত্তর ব্যক্তি ও নেতা। আমি গান্ধীজীর এই বিচারের সঙ্গে পুরোপুরি একমত যে "তিলক ছিলেন বিশাল সমুদ্রের মতো—তার বিশালতায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি আর গোখলে হলেন আমাদের গঙ্গার মতো—বড় আরামে সেখানে আমি অবগাহন করে শরীর মন জুড়োই"।

'১৯০৬ সনে আমি বেশ একজন নামকরা ছাত্রনেতা হয়ে দাঁড়াই এবং লাল-বাল-পাল সবাইকে এলাহাবাদে টেনে এনে তাঁদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করি। ঐ বছরই আমি কলকাতায় যাই দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে। তিলকের পরামর্শে সেবারই আমি কলকাতায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন বিপ্লবী আন্দোলনের মস্ত নেতা। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের পর আমি ঐ আন্দোলনের দিকে বিশেষ করে আকৃষ্ট হই। পরের বছরও আমাকে বেশ কয়েকবার কলকাতা ও পুনা যেতে হয় তিলকের নির্দেশে। ওদিকে আবার ১৯০৭ সনে যখন লালা লাজপৎ রায়কে গ্রেপ্তার করে মান্দালয়ে পাঠানো হয় তখন তাঁকে আমি একটি চিঠি লিখি। সেই চিঠি ও তার উত্তর পাওয়া যাবে লাজপতের 'An account of my deportation' বইয়ে। এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমি জড়িত হয়ে পড়ি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে।

'১৯০৯-১০ সনে আমাকে এলাহাবাদ ও লাহোরের মধ্যে ক্রমাগত ছুটোছুটি করতে হয় ঐ আন্দোলনের কাজে যদিও লাজপৎ রায় নির্বাসন থেকে ফিরে এলে কিছুদিনের জন্য আমি কাজ করি তাঁর সেক্রেটারি হিসেবে। আমার এলাহাবাদের বাড়িতে বোমা তৈরিও হত ঐ সময়ে। বিখ্যাত বিপ্লবী, ঝাঁসির পণ্ডিত পরমানন্দকে আমিই লাগাই বোমা তৈরির কাজে। ঐ কাজ করতে গিয়ে একবার পুড়ে গিয়েছিল তাঁর হাত। আমি রাসবিহারী বসুকে চিনতাম, তাঁর সঙ্গে দু-একবার তখন দেখাও হয়েছিল। তবে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম শচীন সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে। এলাহাবাদ থেকে সর্দার অজিত সিং ও সুফী অম্বাপ্রসাদের গোপনে ইরানে পালানোর ব্যবস্থাও করেছিলাম আমিই।

'১৯১০ সনে এল নৈরাশ্যের কাল। তিলক গেলেন জেলে, অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে। তবু আমি কিছুটা জড়িত ছিলাম ১৯১২ সনের ২৩-শে ডিসেম্বর দিল্লীর চাঁদনী চকে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা ফেলার ব্যাপারে। তবে ঘটনাটি ঘটবার ঠিক আগেই আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয় দিল্লী থেকে যদিও আমাকে পরে খানা-তল্লাসী করা হয় ঐ ব্যাপারেই। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ নাম নিয়ে আমি ঐসব কাজকর্ম থেকে দূরে সরে যাই ৬ বছরের মতো।

'১৯২৫ সনে সোলোনে থাকতে থাকতে আমি শুনি গান্ধীজীর কথা। ঐ বছরেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি আমেদাবাদে। চার ঘণ্টা কথা হয় তাঁর সঙ্গে।—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর জানতে চান বিপ্লবীদের সম্পর্কে। একটি অপ্রীতিকর কথা বারবার তিনি আমায় সেদিন বলেন: "প্রাণ নেওয়া ঠিক নয়"। অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে যে আমি ফিরে যাচ্ছি সে কথা তাঁকে জানাই। তিনি জবাব দেন "আমি জানি তোমাকে আবার আসতে হবে।"

'১৯২৬ সনে আমি তাঁর খেদা জেলার ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের কথা শুনি। আবার তাই ছুটলাম তাঁর কাছে—নাদায়াদে। বল্লভভাইরা তখন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। এবারও দুই ঘণ্টা কথা হল। আমি আবার তাঁকে জানালাম "আমি হতাশ ও বিরক্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছি"। তিনি বললেন "তুমি এসেছ স্বেচ্ছায়—কিন্তু তোমায় যেতে হবে আমার অনুমতি নিয়ে। আগে খেয়ে নাও তারপর ফের কথা বলব।"

'ফের কথা হল দু ঘণ্টা। এইবার আমার বিশ্বাস হল যে একমাত্র তাঁর পথ অনুসরণ করেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারবে। আত্মসমর্পণ করে আমি বললাম "আপনার কাজে আমাকে লাগান"। সেই থেকে আমি গান্ধীর অনুগামী। ১৯১৭ সনে তিনি আমাকে বললেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ নাম ছেড়ে ফিরে যেতে এলাহাবাদে। ১৯১৯ সনে তিলক আমায় বলেন "আমার যুগ শেষ হয়েছে। এবার গান্ধীজীকে একটা সুযোগ দাও।" কলকাতায় আমরা, প্রাক্তন বিপ্লবীরা একটা সভা করলাম গান্ধাজীর সঙ্গে। তাতে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরাও ছিলেন। সভা চলল সারা রাত, প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে। তিনিও বললেন "আমায় একটা সুযোগ দাও।" আমরা অরবিন্দের মত জানতে চাইলাম এ-ব্যাপারে। মত পাওয়া গেল সুস্পষ্ট: "যারা পারবে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে, যারা পারবে না তারা সরে দাঁড়াবে পথ থেকে"।

পণ্ডিত সুন্দরলালের মতে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদের সুসমন্বয়ের উপরে।

সুন্দরলালজীর কাছ থেকেই ঠিকানা পেয়েছিলাম দিল্লী বোমার মামলার একমাত্র জীবিত আসামী, লালা হনুমন্ত সহায়ের। ১৫ই অক্টোবর সকালে তারই সাহায্যে চাঁদনী চকের গলির মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে হাজির হলাম তাঁর বাসস্থানে। দোতলার একটি ঘর—তার সামনে এক ফালি ছাদ। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাঁর সেই ঘরে ঢুকে দেখি বৃদ্ধ বিপ্লবী দুপুরের খাওয়া

শেষ করে বাসন মাজছেন। আমরা সাহায্য করতে চাইলে শুধু বললেন 'তা হয় না—আপনারা মেহ্‌মান'। শুনলাম রান্নাও করেন তিনিই।

লালাজী বললেন তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সম্বতের (বিক্রমী) মাঘ মাসের মহাষ্টমীর দিন—আমাদের হিসেবে সম্ভবত ১৮৮১ সনের জানুয়ারি মাস নাগাদ। অর্থাৎ ৯০ পেরিয়ে তাঁর এই ৯১ বছর বয়সেও এই বিপ্লবীকে এখনো নিজে রাঁধতে, বাসন মাজতে ও ধরে নেওয়া যায় যে গৃহস্থালীর সব কাজই করতে হয়। লালাজী জানালেন তাঁর দুই ছেলে চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেন তাঁর সঙ্গে থাকেন না—এই নিতান্তই ঘরোয়া প্রশ্নটি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ হল। কিন্তু এই কি চলবে?

৯১ বছর বয়সেও লালাজী কানে শোনেন, চোখেও মোটের উপর দেখতে পান কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি। চমৎকার গুছিয়ে তিনি বললেন কিভাবে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের পথে এসেছিলেন। তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। লালাজীর পিতার বয়স তখন ১৬ বছর। তিনি কাণ্ডকারখানা দেখে কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তবু তাঁর কাছ থেকে ও মায়ের কাছেও লালাজী তাঁর বাল্য বয়সে শোনেন ইংরেজের নৃশংস অত্যাচারের কথা আর বিদ্রোহীদের বীরত্ব কাহিনী। তারপর স্কুলে এসে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান মাস্টার আমীরচাঁদকে—ঐ দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলায় অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে যাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়। তা ছাড়া লালা হরদয়ালও বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিলেন সেদিনকার ঐ তরুণের মন। (তাঁর ঘরে দেখলাম মস্ত ছবি টাঙানো লালা হরদয়ালের।)

প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ২১ বছরের যে অসামান্য তরুণ নায়কের ফাঁসী হয় সেই সর্দার কর্তার সিং-এর সঙ্গেও লালাজীর দু'বার দেখা হয়েছিল লাহোর সেনট্রাল জেলে।

১৯০৫ সনে লালাজী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বিপ্লবী কাজকর্মে জড়িত হয়ে পড়েন। কলকাতায় এসে তিনি তখন দেখা করেন অরবিন্দের সঙ্গে। ওদিকে ছিল হরদয়াল ও মাস্টার আমীরচাঁদের প্রভাব। রাসবিহারীর সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

১৯২১ সনের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বললেন, এমন অনেক কথা বলা হয় যা ঠিক নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই: বড়লাট

হাতি চড়ে যাচ্ছিলেন চাঁদনী চক দিয়ে। ঘণ্টাঘরের কাছে মহাবীরপ্রসাদ গুপ্তের দোকানের সামনে বোমা ফেলা হয়। বোমা রাসবিহারী ফেলেন নি যদিও এই ব্যাপারে তিনিই ছিলেন উদ্যোগী। কোন বাড়ির ছাদ থেকে, মেয়েদের মধ্যে থেকে মেয়ে সেজেও কেউ বোমা ফেলেন নি। বোমাটি ফেলেছিলেন বাঙলাদেশের বসন্তকুমার বিশ্বাস রাস্তা থেকেই, কোন ছদ্মবেশ ধারণ করে নয়। মামলায় তাঁর ও মাস্টার আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসী হয় আর লালা হনুমন্ত সহায়ের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আপীলে ঐ দণ্ড কমে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত হয়।

১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের যে বিরাট সম্মেলন হয় তার সামনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে লালা হনুমন্ত সহায় যে ভাষণ দেন তার এই কথাগুলি দিয়ে এই লেখা শেষ করি :

'...আমি মনে করি যে স্বাধীনতার যে সব শহীদ ভারত-মাতার দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙার জন্য একদা তাঁদের জীবনযৌবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের স্মারক নিদর্শনগুলি সংরক্ষিত করার মতো অপূর্ব এক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা একান্তই প্রয়োজন। ঐ মিউজিয়ামে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রধান নেতা ও কর্মীদের ছবিও রাখতে হবে এবং প্রতিটি স্মারকচিহ্ন ও ছবির তলায় থাকবে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। আর এই মিউজিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে রচনা করতে হবে এমন একটি সুন্দর ইতিহাস যাতে দেশের তরুণ সমাজ পরিচয় পাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবমণ্ডিত বৃত্তান্ত।'

বিচিন্তা, কার্তিক ১৩৭৮

মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের অসামান্য রূপকার

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৮৬-র নভেম্বরের শেষে, যেদিন নন্দন প্রেক্ষাগৃহে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ভারতের প্রবীণতম জীবিত বিপ্লবী বাবা পৃথ্বী সিং আজাদের হাতে তুলে দিলেন "মুক্তির সংগ্রামে ভারত" আলেখ্য গ্রন্থটি, সেদিন সবচেয়ে খুসি হয়েছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। আনুষ্ঠানিক অর্থে তিনি ছিলেন গ্রন্থটির অন্যতম সম্পাদক, তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রীর মুখবন্ধের ভাষায়, গ্রন্থটি রচনায় যাঁর "উল্লেখযোগ্য" অবদান আছে। আর যাঁরা বইটির স্বপ্ন জন্মাবার সময় থেকে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত জড়িত, তাঁরা জানেন যে এই বইটির জনক হচ্ছেন চিন্মোহন সেহানবীশই।

চিন্মোহন সেহানবীশ কৈশোরেই যোগ দেন কমিউনিষ্ট পার্টিতে, আত্ম-নিয়োগ করেন পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে। তার ইতিহাস আমার চেয়ে যোগ্যতর কেউ নিশ্চয় লিখবেন। মার্কসের অনুগামী হিসাবে তিনি ভালবাসতেন মানুষ সম্পর্কে সবকিছুতেই। এখান থেকেই ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ় হয়। ১৯৬৭তে রুশ বিপ্লবের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় তিনি আমাদের উৎসাহিত করেন ভারতের উপর সেই জন্মের যুগে রুশ বিপ্লবের প্রভাবের ইতিহাস রচনা করতে। নিজেও হাত লাগান তাতে।

ক্রমে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রধান কাজ। প্রথম তিনি রচনা করেন একটি ছোট্ট বই : "লেনিন ও ভারতবর্ষ"। ইংরেজিতেও পরে অনুবাদ হয়েছে এটি। অসামান্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইটি লেখা। মস্কো থেকে প্রকাশিত লেনিনের সমগ্র রচনাবলীর ইংরেজি সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের প্রতিটি পাতা তলিয়ে পড়েছেন তিনি। তার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, কত জায়গায়, কতবার লেনিন উল্লেখ করেছেন ভারতের। তিলকের কারাদণ্ডের পর বোম্বাই-এর শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘটের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে লেনিনের অসামান্য প্রবন্ধের (১৯০৮) কথা প্রায় সবাই জানতেন। কিন্তু চিনুদা লেখার আগে ক'জন জানতেন যে ১৯১৫তে সিঙ্গাপুরে ভারতের সেনাদের ব্যর্থ কিন্তু বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের উপরও লেনিন মন্তব্য করেছেন, অথবা ভারতীয় বিপ্লবী আবদুর রব পেশোয়ারিকে ১৯২০তে লেনিন অনুরোধ করেছিলেন ভারত থেকে বেশ কয়েকটি বই সংগ্রহ করে তাঁকে দিতে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল যুদ্ধকালে লেখা, রবীন্দ্রনাথের "ন্যাশনালিজম"!

এই সময় রুশ বিপ্লব ও ভারত এই সংক্রান্ত আকর-উপকরণ সংগ্রহের জন্য একাধিকবার সোভিয়েত গেলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। তাঁর প্রবল আগ্রহ হল সেই সমস্ত খ্যাত-অখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবীদের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা, যাঁরা ১৯১৪ থেকে ১৯১৯-২০ নানা দুর্গম পথে গিয়েছেন মুক্তি-তীর্থ সোভিয়েত দেশে। পরিচিত নামগুলি দিয়েই তিনি শুরু করলেন। বহু চেষ্টা করে লেনিনগ্রাদের পুরাণো বলশেভিকদের কাছ থেকে বের করলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নীর ঠিকানা। তাঁর কাছ থেকে পেলেন চট্টোর বহু অপ্রকাশিত রচনা, ফ্যাসীবাদের উত্থানের যুগের প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘের জন্মে তাঁর ভূমিকার কথা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চট্টো ছিলেন বার্লিনে অবস্থিত ভারত স্বাধীনতা সংঘের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, পরে কার্ল লিবেনেক্ট ও রাডেকের মারফৎ তাঁর সাম্যবাদে দীক্ষা ও পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ গঠনে উইলি মুনজেনবার্গের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এর বিপুল তথ্য খুঁজে আনলেন চিনুদা। কিন্তু মনে প্রশ্ন : শেষ পর্যন্ত কি হ'ল চট্টোর? কোথায় হারিয়ে গেলেন তিনি? বিনম্রভাবে প্রশ্ন করলেন চট্টোর বিধবা বৃদ্ধা পত্নীকে। একটু চুপ করে থেকে তিনি উত্তর দিলেন; ১৯৩৮-এ বুখানিরদের বিচারের পর, একদিন "ওরা" এসে চট্টোকে নিয়ে গেল, আর ফেরেন নি তিনি। তবে সম্প্রতি সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই প্রস্তাবটির

অনুলিপি ঃ চট্টোকে মৃত্যুর পর সসম্মানে পুনর্বাসন করা হচ্ছে একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিষ্ট হিসাবে।

চট্টোর ইতিবৃত্ত জানা গেল। তাহলে কি একই পরিণত হয়েছিল বিপ্লবী অবনী মুখার্জির—সিঙ্গাপুর জেল থেকে পালিয়ে, সমুদ্রে সাঁতরে, জেলে ডিঙ্গিতে করে যিনি এসেছিলেন সুমাত্রাতে? সেখানে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম কমিউনিষ্ট-দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয়। যুদ্ধের পর তিনি যখন বার্লিনে, সেখান থেকে মস্কোতে, "অবজার্ভার" রূপে যোগ দেন কমিষ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে একত্রে রচনা করে সে যুগের পথিকৃৎ গ্রন্থ "ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন"।

ঘটনাচক্রে কলকাতাতেই চিনুদার যোগাযোগ হয় অবনীর ছোট ভাই তপতীনাথের সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় মস্কোয় অবনীর স্ত্রী ও মেয়ের ঠিকানা। পরের বার মস্কোতে চিনুদা খুঁজে বের করলেন তাঁদের। পেলেন অবনীর বহু ছবি ও রচনা এবং চট্টোর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির বেদনাময় কাহিনা। অবনীকেও সোভিয়েতের বর্তমান নেতৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠা করেছেন সম্মানের আসনে। অবনীর ছেলে ছিল, নাম গোরা। তার কি হ'ল? চিন্মোহন জানালেন ভারতকে—স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে তরুণ গোরা বীরের মৃত্যুবরণ করেছিলেন—যা ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর আর একটি উজ্জ্বল প্রতীক।

উত্তর কলকাতার ডানপিটে ছেলে প্রমথ, দাউদ আলি দত্তের ছেলের সঙ্গে দেখা করলেন চিনুদা। বালুচিস্থান সীমান্তে ইংরেজের সঙ্গে অসম যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে দাউদ আলি দত্ত বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যান সোভিয়েত তুর্কিস্তানে, সেখান থেকে মস্কোতে। লেনিনের পরামর্শে শুরু করেন প্রাচ্য ভাষা শেখাতে—বাংলা, হিন্দি, উর্দু। তাঁর কাছেই প্রাথমিক-ভাবে বাংলা শিখেছেন সোভিয়েতের দুই প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ভেরা শেভিকভা ও বীকোভাচ।

কিন্তু শুধু এই প্রসিদ্ধ বিপ্লবীদের ইতিহাস জেনে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হলেন না চিনুদা। মনে তাঁর প্রশ্ন ঃ বিখ্যাতদের কথা তো লেখা হয়, কিন্তু অখ্যাতদের ইতিহাস থাকবে না? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হাজার হাজার মুসলিম তরুণ মুক্তির সন্ধানে চলে গিয়েছিলেন আফগানিস্তানে, ইরাণে, তুরস্কে—সেখান থেকে ১৯১৮-১৯-এ সোভিয়েত এশিয়াতে। কয়েক শত বিদ্রোহী শিখ

তরুণ, "গদর" দলের সদস্যও গিয়েছিলেন বিপ্লবের দেশ রাশিয়াতে। তাঁদের কি হ'ল ?

সোভিয়েত গবেষকদের সঙ্গে বার বার কথা বলে, তাসখন্দে গিয়ে মহাফেজখানায় বহু কাগজপত্র ঘেঁটে, শতাধিক প্রবীণ বলশেভিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রায় অসাধ্য সাধন করলেন। খুঁজে বের করলেন ৫০।৬০ জন মুসলিম ও শিখ বিপ্লবীর সন্ধান, যাঁরা গৃহযুদ্ধের যুগে লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছেন। কেউ কেউ শহীদ হয়েছেন। কেউ কেউ দেশে ফিরে গ্রেপ্তার হয়ে জড়িয়ে পড়েছেন পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলাগুলিতে (১৯২১-২৩), যেমন মিঞা আকবর শাহ, আবদুল মজিদ অথবা ফজল ইলাহি কুরবান। কিন্তু বেশ কিছু বিপ্লবী থেকে গিয়েছিলেন সোভিয়েত ভূমিতে, বিয়ে করেছিলেন রুশ, উজবেক বা তুর্কোমেনি মেয়েকে। তাঁদের মধ্যে একজন উজবেকিস্তানের সহকারি শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাঁদের কারুর কারুর ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনীর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন চিনুদা। তার বেশ কিছু বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থঃ 'রুশ বিপ্লব, ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী'তে, যার জন্য সোভিয়েতদেশ পত্রিকার নেহরু পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। এই বইটির ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হলে তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, সুতরাং বইটির ইংরেজি অনুবাদ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছাপা হোক—বারবারই এই অভিমত প্রকাশ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ভারত ইতিহাসবিদ লেনার্ড গর্ডন।

চিনুদার তৃপ্তি ছিল যে প্রায় একশত অজানা ভারতীয় প্রবাসী বিপ্লবীকে বিস্মৃতির অতল থেকে ডুবুরির মত তুলে এনে, লোকচক্ষুর সামনে তিনি উপস্থিত করতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই বলতেনঃ একটা ভগ্নাংশের টুকরো ইতিহাস আমি লিখতে পেরেছি। লেগে থেকে তোমরা যদি খোঁজ কর এরকম আরও শতাধিক ভারতীয়র কথা জানতে পারা যাবে। যাঁরা ছিলেন গরীব চাষীর বা নিম্নবিত্ত মানুষের ছেলে। শোষণহীন দেশ হয়েছে শুনে, সেই টানে সোভিয়েতে গিয়েছিলেন, বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ে ছিলেন, সমাজতন্ত্র নির্মানে হাত লাগিয়ে ছিলেন। তাঁদের অনেকেরই জোয়ান ছেলে শহীদ হয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, নাৎসী আক্রমন রুখতে গিয়ে। ভারতের মানুষ এঁদের জন্য গর্ব বোধ করতে পারে। কিন্তু কেই বা জানে এখনও এঁদের কথা ?

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে, চিনুদার প্রবল আগ্রহ হল প্রায় দুইশত বছর ব্যাপী (১৭৫৭-১৯৪৭) ভারতের বিচিত্র মুক্তি সংগ্রামের সব রুচি ধারার ইতিহাস রচনা করায়, জানা-অজানা সংগ্রামীদের কথা বিস্মৃতির গর্ভ থেকে টেনে বের করায় এবং বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের ভারতবাসীদের কাছে তা পরিবেশন করায়—সহজবোধ্য, চিত্তাকর্ষকভাবে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭, জীবনের শেষ দশবছর এই কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন তিনি।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির স্বর্ণ জয়ন্তীর সময় (১৯৭৫) বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি, দলিল ও লেখা দিয়ে কলকাতায় এক অসামান্য চিত্র-প্রদর্শনী সংগঠিত করার কাজে তিনি ছিলেন প্রধান পরিচালক। তাঁর সহায়ক ছিলেন সুনীল মুন্সী। ১৯৮০তে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের স্বর্ণ জয়ন্তীর সময়, কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে তিনি সংগঠিত করলেন ভারতে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের এক অসামান্য চিত্র ও দলিল প্রদর্শনী। বামফ্রন্টের এক তরুণ মন্ত্রীকে তিনি বল্লেন : একে স্থায়ী রূপ দিতে সাহায্য করবেন? সেই আলোচনা থেকে জন্মগ্রহণ করল একটি কর্মোদ্যোগ, চিন্মোহন সেহানবীশের তদারকিতে। তাঁর ও একদল সরকারি ও বে-সরকারি কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে দুবছর পরে জন্ম নিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুইশতর বেশী দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র, ছবি ও দলিল সহ একটি প্রেক্ষাগার, এখন যা সর্বসাধারণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে মহাজাতি সদনে।

এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে চিন্মোহন এবার হাত দিলেন বহু ছবি, দলিল, আলোকচিত্র ও টীকাসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি আলেখ্য গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে—বাংলা ও অন্য সব ভাষায়, সুলভ মূল্যে। আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে বই প্রকাশে এগিয়ে এলেন বামফ্রন্টে সরকার। ততদিনে শরীর ভেঙে গেছে চিন্মোহন সেহানবীশের। এবার তাই শুরু হল সময়ের বিরুদ্ধে দৌড় প্রতিযোগিতা। চিকিৎসকের নির্দেশে বাড়িতে আটক চিনুদা—বাড়িতে বসেই চলছে ছবি ও দলিল বাছার ও টীকা লেখার অক্লান্ত পরিশ্রম।

তারপর ডাক্তারকে অমান্য করে সরকারি স্টুডিওতে মাসের পর মাস গিয়ে আলেখ্য-গ্রন্থের যথাস্থানে ছবি বসাচ্ছেন চিনুদা, শিরোনাম দিচ্ছেন, টীকা লিখছেন, বার বার চেক-আপ করছেন—বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে যেন ইতিহাসের কোনও ভুল তথ্য পরিবেশিত না হয়, যেন নিরস্ত্র-সশস্ত্র কোনও ধারার মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি অবিচার না হয়ে যায় তাড়াহুড়োতে। স্টুডিওর সরকারী কর্মীরা ও আমাদের মত দুচার জন যাঁরা সেই সময় চিনুদার এই

অসামান্য কাজে সহায়ক হয়ে ধন্য বোধ করেছি, শুধু তারাই জানি কি অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। একাধিক দিন কাজ করতে করতে ব্ল্যাক আউট হয়ে গিয়েছে। দুদিন বাদ দিয়ে আবার কাজে ফিরে এসেছেন চিনুদা। চলে তো একদিন যেতেই হবে, কিন্তু ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ব তো পালন করতে হবে—এই ছিল তার কথা।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যেসব সাধারণ মানুষ—মজুর, চাষী, আদিবাসী, স্বল্পশিক্ষিতা মা—মাসীরা, কিশোর কিশোরী আত্মদান করেছেন, তাঁদের সংখ্যা তো লাখের কোঠা ছাপিয়ে যাবে। তাঁদের মধ্যে কিছু Typical দৃষ্টান্ত, নাম ও ঘটনাকে আলেখ্য গ্রন্থে রাখার উপর জোর দিতেন চিনুদা। সে-ইতিহাস সঠিক ও জীবন্ত করা যে কি কঠিন কাজ তা ইতিহাস-গবেষক মাত্রেই বুঝবেন। তবু এরকম শতাধিক নাম ও ঘটনাকে আলেখ্য গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন চিনুদা—১৮১৮ এর ৩নং ধারায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিনাবিচারে আটক একমাত্র মহিলা বন্দী বিধবা ননীবালা দেবী, ১৭৮৪তে শহীদ, বিদ্রোহী সাঁওতাল নেতা বাবা তিলকা মাঝি, চোয়াড় বিদ্রোহী গোবর্ধন দিকপতি, কিট্টুরের বীর রানী চানাম্মা ও তাঁর সহকারী শহীদ রায়ান্না, আন্দামানে বড়লাট মেয়োর হত্যাকারী ওয়াহাবি শহীদ শের আলি থেকে শুরু করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় পাঞ্জাবের গভর্নর বর্বর মাইকেল ও' ডায়ারের হত্যাকারী শহীদ উধম সিং, কেরালার কায়ুর গ্রামের চারজন দরিদ্র ক্ষেতমজুর কমিউনিষ্ট শহীদ, 'ভারত-ছাড়' বিদ্রোহের মৃত্যুহীন কিশোর বীর হেমু কালানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে আত্মদানকারী কমিউনিষ্ট লালমোহন ও গান্ধীবাদী শচীন মিত্র, ভিয়েৎনামের মুক্তিসংগ্রামে সৌহার্দ্য জ্ঞাপনকারী শহীদ ছাত্র বীররঞ্জন—আরও অনেকের আলোক-চিত্র বা অঙ্কিত চিত্র, নিখুঁত টীকা সহ স্থান পেয়েছে "মুক্তির সংগ্রামে ভারত" আলেখ্য গ্রন্থটিতে।

এটুকুই আমাদের সান্তনা যে ভগ্নস্বাস্থ্য চিনুদা, ১৯৮৬র নভেম্বরের শেষে, দেখে গিয়েছেন "মুক্তির সংগ্রামে ভারত" গ্রন্থের প্রকাশ। ডিসেম্বর থেকে শরীর একেবারে ভেঙে গেলে, বইটির ইংরেজি সংস্করণের শেষ পর্বের কাজে হাত লাগানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রতিদিন ফোন করে খোঁজ নিতেন বইটির ছাপা কতদূর। চেয়ারে বসে পড়তেন ছাপা ফর্মাগুলি। শেষ ফর্মা যখন যন্ত্রস্থ, তখন চোখ বুজলেন চিনুদা। ১৯৮৭র ১৫ আগষ্ট মহাজাতি সদনে জ্যোতি বসু ইংরেজি সংস্করণটি সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ

করতে গিয়ে বলেন যে, এই বইটির প্রাণপুরুষ আমার প্রয়াত বন্ধু চিন্মোহন সেহানবীশ।

চিন্মোহন সেহানবীশ চেয়ে গিয়েছেন বইটির অন্ততঃ একটি হিন্দি সংস্করণ হোক। বামফ্রন্টের সরকারের উপরই সে দায়িত্ব। চিনুদা জানতেন যে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ ও একটি দুইশত পৃষ্ঠার আলেখ্য গ্রন্থই যথেষ্ট নয়। সে কথা বইটির বাংলা সংস্করণের নিবেদনে, সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে তিনি সবিনয়ে বলেও গেছেন। তিনি জানতেন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আকর—উপকরণ রক্ষার। তাই মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি জোরের সঙ্গে অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরগুলিতে যে অমূল্য তথ্য ও দলিল রয়েছে তা যথাযথ ভাবে রক্ষা করার এবং তা সমস্ত গবেষকদের কাছে উন্মুক্ত করার জন্য।

আর প্রগতিবাদী কর্মীদের কাছে তাঁর শেষ অনুরোধ ছিল : অনেক দেরী হয়ে গেছে হাত লাগাতে। তবু যে কজন পুরানো শ্রমিক ও কৃষক মুক্তি সংগ্রামীকে এখনও পাচ্ছ, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, টেপ-রেকর্ডার নিয়ে তাঁদের কাছে যাও, যথাসম্ভব বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নাও, সেগুলি সযত্নে রক্ষা কর। আসানসোল থেকে প্রবীন শ্রমিক নেতা মিশিরজীকে নিজের বাড়িতে আনিয়ে টেপ-রেকর্ড করে ছিলেন চিনুদা, টেপ-রেকর্ড করেছিলেন চটকলের স্বরথ পাছালকে। পশ্চিমদিনাজপুরের কর্মীরা চিনুদার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ৯০ বছরের কৃষক-কর্মী, তেভাগার সংগ্রামী ক্যাঁকারু পালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে টেপ-রেকর্ড করেছেন।

চিনুদা জানলে নিশ্চয় ভীষণ খুশি হতেন যে "ভারত ছাড়" সংগ্রামে সাময়িক ভাবে স্বাধীন মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলের ১৬ জন জীবিত সংগঠকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের টেপ-রেকর্ড করেছেন সম্প্রতি যোশী—অধিকারী সমাজ বিজ্ঞান কেন্দ্রের বোম্বাইএর কর্মীরা। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সমস্ত ধারার ইতিহাস-রচনার এই অক্লান্ত রূপকারকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হলে, পশ্চিমবঙ্গে আমরা, আগামী পাঁচবছরের মধ্যে তাঁর এই অসমাপ্ত কাজটিকে বাস্তব রূপ দিতে সমবেতভাবে হাত লাগাতে পারি নাকি?

চিনুদা ও প্রগতির কাল

সিদ্ধেশ্বর সেন

হঠাৎ করেই সে-সব দিনের কথা উঠে যেতই, ইদানীং, চিনুদার কাছে গিয়ে বসলে।

এর কোনো বাঁধাবাঁধুনি ছিল না। হয়তো অন্য কোনো কাজে গেছি। দু-একটা কথায় তা সেরে, ভাল লাগত আমার, আর চিনুদারও, ফিরে যেতে সেই চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগের দিনগুলিতে।

এতকালের পরেও, তরতাজা আর রেয়াজী মন তারসপ্তকে বাঁধা হয়ে ছিল বলেই কী এখন বারে-বারে ফিরে-ফিরে চাওয়া!

তাছাড়া, আমাদের চিনুদা ছাড়া আমার গতি ছিল না, সেই একটি অবিস্মরণ যুগের নবায়মানতাকে আপন করে ধরে রাখার—চিনুদা নিজেই ছিলেন যার—সেই একটি গোটা গৌরবের সময়-পর্বের আবেগময় সত্যস্ফুরণের, যাকে আমরা বলি চল্লিশের যুগ—প্রতিভূ ও প্রতিনিধি।

তাঁর সতেজ মনে ভাঁটা পড়তে দেখেছি খুব শেষ দিকেই, যখন তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল।

নয়তো, চিনুদাকে আমার বোধ হত দেহে-মনে চিরযুবা। ঠিক যেমনটি আমি তাঁকে দেখেছি চার-দশকেরও বেশি আগে।

সেই প্রথম দর্শন, সে কেমন ছিল?

তার আগে বলে নিই, দক্ষিণে (উত্তর-কলকাতাতেও গেছি সার্কুলার রোডের ওপর ফ্ল্যাট, বহু আগে) তাঁদের ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাড়িতে অনেকদিন গিয়েছি বেশ রাত করে। কথায়-কথায় ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যেত যখন ও-বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার সময়। এমনও হয়েছে যে উমাদি বলেছেন, তাহলে, তুমিও আমাদের সঙ্গে কিছু খেয়ে নাও।

সবসময়েই দেখেছি চিনুদার কাছে নানাজনের নানান কাজে আসা-যাওয়া অবধারিত ছিল, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ধৈর্য ধরে আলাপে, তথ্য দিয়ে চাহিদা মিটিয়েছেন। এর মধ্যে তরুণ-সংগঠক, গবেষণা কর্মীরাও আছেন। যেমন শ্রদ্ধেয় প্রবীণরাও। কখনও হয়তো দেখেছি পুলিনবাবু—পুলিনবিহারী সেন বা ক্ষিতিশ রায় কোনও প্রয়োজনে কথা বলছেন বা কোনও সন্ধ্যায় হিরণকুমার সান্যাল, ওঁদের হাবুলমামা, বা চলে এসেছেন, কাছেই বলে, বিষ্ণুবাবু—কবি বিষ্ণু দে, কোনোদিনবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

বছর দুয়েক আগে সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী, থেকে একটি কর্মসূচীতে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পাই। ভাষা-অঞ্চলটি ছিল মারাঠি, গুজরাতি ও কোঙ্কনি। চিনুদা জানতেন। আমাকে বললেন, বোম্বাইকে যদি কেন্দ্র করি, তাহলে ডঃ মুলকরাজ আনন্দ, আলি সর্দার জাফরি, কাইফি আজমি—এঁদের সঙ্গে যেন অবশ্য যোগাযোগ ও দেখা করি। ফিরে এসে লিখি—'ক্রিয়েটিভিটি হ্বাট কাউন্টস'। দিল্লীর অকাদেমিতে পাঠানো হয় ও কলকাতার 'কাউন্টার-পয়েন্ট' পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। চিনুদা সেটি মনোযোগ দিয়ে পড়েন ও আমার সঙ্গে সাহিত্য ও জাতীয় সংহতির সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

এই যে চিনুদা আমাদের সংস্কৃতি আন্দোলনের, সর্বভারতীয়তায় স্তরেও, একটি মধ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন, তার সূচনাবিন্দু কী ছিল, কেমন পেয়েছিলুম আমি তাঁকে সেই প্রথম দর্শনে!

সেটা ১৯৪৫-এর শেষ বা মাঝামাঝি, তারিখ মনে নেই। তখন আমার বয়স কৈশোর বা কৈশোরত্তীর্ণতার দিকে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের 'অরণি'-তে কিছু কবিতা বেরুচ্ছে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি আমাদের পারিবারিকভাবে চিনতেন, তাঁরও চোখে পড়েছে ওই সব লেখা। আমাদের পুরোনো বাড়ি ছিল জোড়াসাঁকোয়, গিরিশ পার্কের সামনেই। আমার যিনি দাদু কেশবচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ, ডঃ দত্ত তাকে জানতেন। তাছাড়া, আমাদের বাড়ির সামনে গিরিশ পার্কে এক লাইব্রেরি—ফ্রেণ্ডস ইউনাইটেড ক্লাব আর সংস্কৃতি-বাসর বলে আমাদের এক সাংস্কৃতিক-চক্র,

ডঃ দত্ত তারও সভামুখ্য। ডঃ দত্তের মতো বিপ্লবী ও মহামনীষার স্নেহ বাল্যেই আমি পেয়ে ধন্য হয়েছিলুম। তাঁকেও আমরা ডাকতুম দাদু বলে।

তা হ'ল কি, ডঃ দত্ত একদিন আমাকে কাছে ডেকে বললেন, 'চল তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দি।' আমি তো জানতুম না, কোথায় উনি আমাকে নিয়ে যাবেন। তবু, ওঁর কথায় আমার খুব ভরসা হল। ছোট থেকেই আমার সাহিত্যে মন দেখে তাঁর একটি বইও আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন—'সাহিত্যে প্রগতি'। সেই-ই—'প্রগতি' কথাটির সঙ্গে আমার মস্ত যোগ হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্য বিচারে মার্কসীয় নিরিখ ডঃ দত্তই প্রথম আনেন।

চিনুদা আর প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের মূলে যে ডঃ দত্তের মতো ওই বিরাট ব্যক্তিত্ব—এইটে আমার কাছে খুব অর্থবহ ও স্মরণীয় হয়ে আছে। মনে রেখেছিলেন চিনুদাও।

ঘটনাটি তাহলে বলে নিই। ওই সময়েই একদিন বিকেলের দিকে ডঃ দত্তের গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের বাড়ি থেকে (স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভবন), আক্ষরিক অর্থেই তাঁর হাত ধরে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ট্রামে উঠে পৌঁছলুম যেখানে,—সেটিই সেই বিখ্যাত ৪৬নং বাড়ি। চারতলায় উঠে দেখি হলঘর, লোকে ভর্তি।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের জন্যই সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন—গানীগুণী কবি-সাহিত্যিক-জননেতা-বিশিষ্ট বিদ্বৎজনেরা। সেদিনটি ছিল ডঃ দত্তের ৬৪তম জন্মদিন। তাঁরই সম্বর্ধনা-সভা। তিনি তখন সোভিয়েত-সুহৃদ সমিতি (এফ-এস-ইউ)-এর সভাপতি, যার সম্পাদক অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সভায় শুধু ফুল-মালা, রবীন্দ্রনাথের গান, স্বদেশী গান, গণনাট্যের গান, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। মাঝখানে সদাপ্রসন্ন মুখে চেয়ারে বসে আছেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ, হাতে বেতের লাঠিটি তেমনি ধরা। কী ভাষণ হয়েছিল, তিনিও কী বলেছিলেন আজ মনে নেই। মনে আছে শুধু ভবানীবাবু, ভবানী সেনের শ্রদ্ধাঞ্জলি; বলেছিলেন, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তিনযুগের সেতু বেঁধে দিয়েছেন—স্বদেশী যুগ, বিপ্লববাদী যুগ আর আজকের কমিউনিস্ট আন্দোলন।

সভা শেষ হল। আমি তো ফরাসের এক প্রান্তে চুপ করে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনছিলুম। ডঃ দত্ত আমার কাছে এলেন। বললেন, এদিকে এসো—যেজন্যে তোমাকে এখানে নিয়ে এলুম, এসো আলাপ করিয়ে দিই।

তারপর ডাকলেন, চিনুবাবু। এগিয়ে এলেন এক সৌম্যকান্তি যুবা,

চোখে পুরু কাঁচের পাওয়ারের চশমা। চওড়া কপালের ওপর একধারে চুল এসে পড়েছে। পরণে গাঢ় রঙের প্যাণ্ট আর সাদা সার্ট, হাতা বাহু পর্যন্ত গোটানো। চেহারায় একটি সম্ভ্রান্ত বিনয়, গলার স্বর মার্জিত। বললেন, বসুন ডঃ দত্ত।

ডঃ দত্ত আমাকে দেখিয়ে বললেন, ছেলেটি কবিতা লিখছে। আপনাদের এখানে আসা-যাওয়া করতে বলেছি। আমাকে বললেন, চিনে রাখ, চিনুবাবু—চিন্মোহন সেহানবীশ। ইনিই এখানকার এক আসল খুঁটি—হাসিমুখে বলে তিনি পাশের কামরার দিকে গেলেন কথাবার্তা বলতে। সেই প্রথম পরিচয়েই চিনুদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেশ তো আসুন না। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমাকে 'আপনি' বলবেন? তাতে চিনুদাও হেসে বললেন, আচ্ছা।

সভা শেষের পরেরও একটু কাজ থেকে গেল, লক্ষ্য করলুম। সেটা ওই ফরাসটা, যাতে সকলে বসেছিলুম,—একপাশে গুটিয়ে রাখা। দেখলুম, চিনুদা আর কয়েকজন উজ্জ্বল চক্ষু তরুণ—পরে খুব আলাপ হয়েছে, তাঁরা কেউবা নামকরা কবি, নাট্যকর্মী বা সম্পাদক, সেই ফরাসটা গুটিয়ে তুলছেন। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। একটু গলা তুলে বললুম, চিনুদা, আমিও হাত লাগাই! চিনুদা একটু ঘাড় হেলিয়ে সহাস্যে সায় দিলেন।

* * *

৪৬-এর চারতলার ওই ফ্ল্যাটটা ছিল—স্নেহাংশুদা স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের নামে নেওয়া। ৪৬নং-কে ঘিরে তখন কী-ই না হয়েছে। কত মূল্যবান মুহূর্ত। আর, সবের মাঝখানে চিনুদা। কনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে মশগুল হতে দেখেছি তাঁকে—বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর জর্জদা। সেই একই গৃহচত্বরে দপ্তর পেতেছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক-শিল্পী পরে যা আবার প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, রাজ্য শান্তি সংসদ, এককালে 'পরিচয়' দপ্তরও—গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায় পর্বে। চিনুদার নিজের কথায় "নিতান্ত সুজন বলেই বোধ করি ছেচল্লিশের তেঁতুল পাতায় ঠাসাঠাসি ঠাঁই নিয়েছিল এতগুলি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।" সে কী সময়! আর, আমিও পেয়ে গেছি আমার সমবয়সী বন্ধুদের—সুকান্তকে আগেই, এবং নে ঋত্বিক, মৃণাল সেন, সমরেশ বসু, তাপস সেন, সলিল চৌধুরী, নির্মল ঘোষ, ডেভিড কোহেন—নামের তো শেষ হবে না। আর 'বুধবারের বৈঠক' কি নানা সাহিত্য-আসর, আলোচনা-সভা—যেমন আরাগঁ-গারোদি বিতর্ক

নিয়ে কি রাধারমণ মিত্রের তিনদিন ধরে প্রাক্‌-মুসলিম বৌদ্ধ যুগের বাঙলা নিয়ে বক্তৃতা,—কাকে পাইনি তখন—

তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুশোভন সরকার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, আবু সঈদ আইয়ুব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একালের বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক পর্যন্ত। তালিকা শেষ হবে না।

অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের সেই যুগ—প্রবল চল্লিশের যুগ—প্রগতি ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শিল্প-সংস্কৃতি-নাট্যের উজ্জীবিত সে আলোড়িত কাল—বাংলা কাব্যে-গানে-শিল্পে-সাহিত্যে। কবি অরুণ মিত্র তারই সূত্রপাতের দিনগুলি মনে করে 'সময় ও সাহিত্যের আরেক অধ্যায়'-এ লেখেন: "দেশ, পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের ভাবনা এই কেন্দ্রে যেন এক বৃহৎ সঙ্গ পেল।...এই বৈপ্লবিক ঘটনাকে যাঁরা সম্ভব করেছিলেন, আমি তাঁদের উদ্দীপনার পরিমণ্ডলে ছিলাম। তারপরের চলাটা কখনই সরল পথে এগোয় না।...আরম্ভের আলোটা কিন্তু নেভে না।"

সেই আরম্ভের আলো, তার বিচ্ছুরণ আমি পেয়েছি, সেটা অত্যন্ত করে জানি। আমি জানি তার সমগ্র দীপ্তি ও বিভা যা একজনের সংহত-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিময়তায় উজ্জ্বল হয়ে জাগরূক ছিল, তিনি আমাদের চিনুদা—চিন্মোহন সেহানবীশ।

তাঁর প্রয়াণের পর, অনেকটাই নিঃস্ব আমি, একটি কবিতায় সেই কাল ও কালধর্মীকে স্মরণ করি, যেটি উৎসর্গ চিনুদা-কে। 'পরিচয়' পাঠকদের জন্যে তা এখানে তুলে দিই:

প্রগতির কাল

(চিন্মোহন সেহানবীশ, অবিস্মরণীয়েষু)

মনের আশ্রয় এতকাল, এত দীর্ঘতর কাল
পা-ওঠানো পা-ফেলার গতি-যতি ছন্দে
এত চলমান যাত্রার সৌন্দর্যে
এত ধ'রে রেখে ঐতিহ্য ও সমকাল

এই উৎক্রমণের ইতিহাস
সহসা তবে ছিন্ন ?
হৃদয়ে ধরোনি উত্তাল

সময়ের বিস্তার প্রাণপণে
কালান্তরিক কর্মে ও মননে

আমরাও সাহচর্যে, জ্ঞানে
পেয়েছি সে রূপান্তরে
—আকীর্ণ

মনের আশ্রয় থেকে, মনে
জেলে-দেওয়া প্রগতির কাল।

আত্মজীবনীর গোপনপাঠ

দেবেশ রায়

সংসদীয় রাজনীতির ব্যক্তিনির্ভর প্রচারের মধ্যে এখন আমাদের বসবাস। সংসদীয় রাজনীতি নির্বাচননির্ভর। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা, লোকসভার ভোট লেগেই আছে। কাগজের খবর বলতেও ঐ একই, টিভিতে ছবি বলতেও সেই একই। এমন সর্বগ্রাসী রাজনীতির ভেতরে থেকে অনেক সময় সেই ইতিহাসবোধকেই অবাস্তব ঠেকে, যে ইতিহাসবোধ ছাড়া একজন কমিউনিস্ট ব্লক অফিসে কৃষকদের জন্যে সার বা জল চাইতে পারে না, বা, নিজের ঘরে বসে কবিতা লিখতে পারে না।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ত ইতিহাসের সেই মাধ্যম, যে মাধ্যম ছাড়া সভ্যতা বদলে দেয়া যায় না, সমাজকে বদলে দেয়া যায় না, ব্যক্তিকে বদলে দেয়া যায় না। কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যম ছাড়া সেই বদলেয় প্রয়োজন বাতলানো যায়, দুনিয়াটাকে ব্যাখ্যাও করা যায় কিন্তু তার বেশি কিছু করা যায় না।

তাই একজন কমিউনিস্টের পক্ষে আত্মজীবনী লেখা সবচেয়ে কঠিন। প্রায় অসম্ভবই। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসেবে তাকে ত সবসময়ই সমষ্টির অংশ হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। ইতিহাসের ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রক্রিয়াকে নিজের দৈনন্দিনে বোধ করার মধ্যে এক নৈর্ব্যক্তিকতাকে কর্মের অভ্যাসে নিয়ে আসতে হয়। সংসদীয় রাজনীতির পরিমণ্ডল সেই নৈর্ব্যক্তিকতার

ক্ষতি করে, অনেক সময় অবান্তর করে দেয় ইতিহাসের সেই বোধকেই। তাই, কমিউনিস্টের অলিখিত আত্মজীবনীর পাঠোদ্ধারের জন্যে আমাদের যেতে হয় তার কর্মের ইতিহাসের কাছে।

চিন্মোহন সেহানবীশ কোনো আত্মজীবনী লেখেন নি যদিও নিজ গুণেই সে-আত্মজীবনী হয়ে উঠতে পারত আমাদের বাংলার এক মানুষের পরাধীনতার অপমান থেকে কমিউনিস্টের আত্মসম্মানে পৌঁছনোর দলিল। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনীর একটা পাঠ লুকিয়ে রেখে গেছেন তাঁর শেষ-জীবনের রচনাগুলিতে। জীবনের এই শেষ তিন দশকে তিনি তাঁর ভাববার ও লিখবার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন—প্রথমত—ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীদের জীবন, দ্বিতীয়ত—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, তৃতীয়ত—রবীন্দ্রনাথ।

তিনি যে এই বিষয়গুলিকে আলাদা-আলাদা ভাবে বেছে নিয়েছিলেন, তা নয়। এই ক্রমেই ধীরে ধীরে যেন তিনি বিষয়গুলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন। বা, তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম দিয়ে নিজের যে-নিজস্ব বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন সেই আবিষ্ক্রিয়ায় এগুলি এমনই পরপর এসে গিয়েছিল।

এই নির্মাণ শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের মধ্যেই। পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারীকে পার্টি ইতিহাসের উপাদানবিন্যাসে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি এই রুশদেশে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের জীবনের খোঁজখবর নেয়ায় জড়িয়ে পড়েন। আর, তাঁর যেমন স্বভাব ছিল—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব খবর জোগাড় করতে-করতে সেই খবরগুলোই একটা আকর হয়ে ওঠে।

এই খবরগুলো জোগাড় করেছিলেন তিনি—নিজের জীবন পুনর্গঠনের আবেগ থেকে। যে-কিশোর পরাধীনতার অপমান থেকে সাবালক বয়সে পৌঁছেছিলেন কমিউনিস্টের আত্মসম্মানে—তিনি নিজের সেই জীবনকে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন সেই সব ভারতীয় বিপ্লবীর জীবনের সঙ্গে যাঁরা স্বদেশের পরাধীনতার অসম্মান ঘোচাতে একদিন গিয়েছিলেন কমিউনিস্টদের তীর্থ সোভিয়েত ইউনিয়নে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় বিপ্লবীদের এই কাহিনীর মধ্যেই তিনি লিখে রেখে গেছেন তাঁর কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের গোপন পাঠ। একজন কমিউনিস্ট এইভাবেই ব্যক্তিগতকে ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিকে বাঁধেন।

স্বদেশের স্বাধীনতার লড়াই ত তাঁকে লড়তে হয়েছে স্বদেশেরই মাটিতে। সেখানে অখণ্ড বাংলার কোটি কোটি মানুষের মাঝখানে তিনিও একজন ও একজনই মাত্র। সেই একজন ত হতে পারে ঐ কোটি-কোটি মানুষের যে-

কোনো জন। তাই রুশ দেশে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কাহিনী থেকে তিনি আসেন স্বদেশের কর্মক্ষেত্রের প্রত্যক্ষতায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি দুটি কাজ করেছিলেন—স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা স্থায়ী প্রদর্শনী তৈরি করে দিয়েছিলেন আর তাঁর সংগৃহীত সমস্ত উপকরণ দিয়ে 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' বইটি রচনা করেছিলেন। যদিও আমাদের আচরণের উদ্ভট এক সমতুল্যতায় এই দুটি জায়গাতেই তিনি আরো অনেকের সঙ্গে একজন সম্পাদকমাত্র, তার বেশি কিছু নন। রাজনৈতিক সৌজন্যে বা প্রাতিষ্ঠানিক ঔচিত্যবোধে এই দুই জায়গাতেই তিনি ছিলেন প্রধান সম্পাদক। সে-প্রাধান্য তাঁকে দেয়া হয় নি। তিনি কখনো তা চানও নি। কারণ, এই দুটি কাজের ভেতর তিনি ত রচনা করছিলেন তাঁর আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়—কী করে স্বাধীনতার আবেগ তাঁকে তাড়া করে ফিরেছিল সেই কাহিনী। ঐ প্রদর্শনী ও বইয়ে তিনি গোপন করে গেলেন তাঁর যৌবনের কাহিনী। একজন কমিউনিষ্ট এই ভাবেই ব্যক্তিগতকে নৈর্ব্যক্তিকে বাঁধেন।

শেষে রবীন্দ্রনাথ। তাও দুদিক থেকে। বিপ্লবী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে প্রভাবিত করত আর রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রভাবিত করতেন। এ কোনো লেনদেনের কাহিনী নয়। এ কোনো অজ্ঞাত তথ্যের উদ্ঘাটন নয়, যদিও সবটাই প্রায় নতুন তথ্য। আমরা যেন এক উপন্যাসের খসড়া পাঠ করি—কোন অদৃশ্য আবেগের জগতে ঘটে যায় এই বিনিময় যে নিদ্রাহীন কবির একটা গানের চরণে সংহত হয়ে যায় কারান্তরালের স্বদেশী বন্দীদের নিশাজাগরণ আর ফাঁসির মঞ্চের দিকে হেঁটে যাওয়া তরুণের গলায় বেজে ওঠে কবির লেখা গানের চরণ। এ-কাহিনীতে উদ্ঘাটিত হয়ে যায় আমাদের স্বদেশের এক অনাবিষ্কৃত আবেগের খনি। সেখানে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো তর্ক নেই, কোনো অভিযোগ নেই। একটি দেশ তার কবিকে পেয়ে গেছে তার মরণপণের উৎসবে আর এক কবি তার দেশকে পেয়ে গেছেন তার জীবনসৃষ্টির উৎসবে। কোন্ মহৎ বিনিময়ে স্বাধীনতা কর্মীদের জীবনবিসর্জন আর আমাদের কবির রচনা হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। স্বাধীনতার সেই আন্দোলন যেন একটি কবিতারচনা—অক্ষরের বদলে জীবন দিয়ে। কবিতারচনার কেই অগ্নিদহন যেন স্বাধীনতারই আর এক আন্দোলন—অক্ষরের ভেতর জীবনসঞ্চার করে। চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর পরিণত জীবনের আত্মকথা লিখছিলেন যেখানে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ রচনা রাজনীতির প্রধান উপাদান আর রাজনীতির শ্রেষ্ঠ উপাদান সংস্কৃতির প্রধান রচনা, যেখানে কবিতা আর রাজনীতি একই ভাষায় কথা বলে ওঠে। চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর বোধের পরিণতিতে পৌঁছচ্ছিলেন—তাঁর আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায়ে।

মৃত্যু একটি জীবনের সমগ্রতা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়—যদি সে-জীবনের কোনো সমগ্রতা থাকে। চিন্মোহন সেহানবীশের মৃত্যু তাঁর আত্মজীবনীর সেই নৈর্ব্যক্তিককে আমাদের সামনে মেলে ধরেছে—নিজের ব্যক্তিত্বে একজন কমিউনিস্ট যে-নৈর্ব্যক্তিককে ধারণ করতে চান।

চিনুদা'র বাড়িতে এক রাত্রি

গোলাম কুদ্দুস

কলকাতায় যখন শেষ বড় গোছের দাঙ্গা হয়, সেটা কোন বছর? মনে হচ্ছে ১৯৬৪। কী একটা কাজে গিয়েছি শ্যামবাজারে, ফিরছি সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে বাসে করে। কলাবাগান বস্তির কাছাকাছি এসে বাসটা শ্লথগতি হল। রাস্তার এক ধারে নীরব শুষ্ক-মুখ বিপুল সংখ্যক বস্তিবাসী শুধু গেঞ্জি গায়ে বা একেবারে খালি গায়ে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। উল্টো ফুটপাতে জনতার চেহারা অতটা দুঃস্থ নয়, আবহাওয়াটাও তত থমথমে নয়। কার উপর কে ঝাঁপিয়ে পড়বে? আতঙ্কিত বাসযাত্রীরা চিৎকার করতে লাগল—বাস চালাও! জোরে চালাও!

চৌরঙ্গীতে পার্ক স্ট্রিটের কাছে এসে নামলাম। পার্ক স্ট্রিট ধরে বাকি পথটা হাঁটছি। বেকবাগান, যেখানে আমি থাকি তার কাছাকাছি এসে দেখি গোটা এলাকা জুড়ে কার্ফু জারি হয়েছে। পরিচিত গলিঘুঁজি দিয়ে মিলিটারির সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এগুতে চেষ্টা করলাম। বৃথা চেষ্টা। সর্বত্র মিলিটারির সতর্ক প্রহরা। দু'একটা গুলির আওয়াজও কানে আসছে। এত রাত্রে কোথায় যাব? কোথায় গিয়ে রাত কাটাব? সর্ব প্রথম মনে পড়ল চিনুদা'র বাড়ির কথা।

এদিকের সব রুটে তখন বাস বন্ধ। অনেক ঘুরে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। চিনুদার শরৎ ব্যানার্জি স্ট্রিটের বাসার দিকে।

যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় রাত বারোটা। কেউ জেগে আছে কি? একটু দূর থেকেই লক্ষ্য করলাম ও-বাড়িতে তখনো প্রায় সব ঘরেই আলো জ্বলছে! এমনিতেই ওখানে মানুষের আনাগোনা সদাসর্বদা, আজ কলকাতার অস্বাভাবিক অবস্থায় অনেকেই হয়ত এসে জড়ো হয়েছিলেন আলাপ-আলোচনার জন্যে। আমার অনুমানই সত্য। আমাকে অত রাত্রে দেখে চিনুদা রীতিমত অবাক হয়ে বললেন, কুদ্দুস! আমার কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন, ভালোই করেছ, এই মাত্র ওরা সব গেল, এই-সব নিয়েই কথা হচ্ছিল।

তারপর গল্পগুজবে রাত প্রায় একটা! উমাদি তাড়া দিলেন। কিছু এ কটা খাওয়া হল। শোওয়ার পালা। কর্তাগিন্নী আমার জন্যে মশারী খাটাতে লেগে গেলেন। সেই দৃশ্যটা কখনো কী ভুলব?

তখন কলকাতার মানুষের একাংশ আতঙ্কে উদ্বেগে রাত জাগছে, আর আমি নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রামগ্ন হলাম।

কতক্ষণই বা ঘুমোলাম। আলো ফুটতে-না-ফুটতে চোখ খুলে গেল, যা কদাচিত আমার ভাগ্যে ঘটে। তখন ও-বাড়িতে রাত্রি জাগরণের পর সবাই সুপ্তিমগ্ন। চারিদিকে কী গভীর শান্তি ও স্তব্ধতা। গৃহবাসীদের জাগরণের জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার ছিল না। কিসের টানে সন্তর্পণে দরজা খুলে রাস্তায় পা দিলাম এবং কিসের আকর্ষণে সেই হতভাগ্য কলাবাগান বস্তির অবস্থা দেখার কৌতূহল নিয়ে অতি-ভোরের একটা বাস ধরার চেষ্টা করলাম।

গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি স্তম্ভিত। এতটা ক্ষয়ক্ষতি আমার কল্পনায় ছিল না। প্রায় গোটা বস্তি বিধ্বস্ত, জনমনুষ্যহীন রাস্তাঘাট গলিঘুঁজি। দমকল বাহিনীর চেষ্টায় আগুন নেভানো হয়েছে, কিন্তু এখানে-ওখানে তখনো ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমার চক্ষু বাষ্পাকুল হয়ে থাকবে, আমার কল্পনাপ্রবণ মন বলে উঠল, ঐ তো চিনুদা! চিনুদা যেন আমার পাশে এসে আমার হাত ধরেলেন!

পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তখন আমাকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, ভাবনা হয় না হঠাৎ না-বলে-কয়ে অন্তর্ধান করলে?

চিনুদা, আপনার চির অন্তর্ধানে আমার মনের ভাব কী হতে পারে?

সম্পাদকীয়

বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক প্রধান নায়ক চিন্মোহন সেহানবীশ-এর মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হয়ে গেল। পরিচয়-এর বর্তমান সংখ্যাটি তাঁরই স্মরণ-সংখ্যা।

এ-ধরনের সংখ্যা প্রকাশ করার পরিকল্পনা অনেক দিন ধরেই আমাদের মাথায় ছিল। সে-ইচ্ছাকে বাস্তব চেহারা দিতে গিয়ে অভাবনীয় কিছু অসুবিধের মুখে পড়ে যাই। ফলে, এই দেরি। এর জন্য পরিচয়-এর পাঠকবর্গ ও চিনুদা-র অগণিত অনুরাগীর কাছে আমরা অকুণ্ঠভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

এই কৈফিয়ৎ দেয়ার গরজ আরও তীব্র হয়ে ওঠে, যখন পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে চিনুদা-র কয়েক দশকব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মনে পড়ে। জীবনের শেষ পর্বে তিনি ছিলেন পরিচয়-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

যে-সব সাংস্কৃতিক কর্মী পরিচয়পন্থী, তাঁরা তো খুব সহজেই পত্রিকার একমুঠো ঘরটিতে চিনুদা-র উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা স্মরণ করতে পারেন। সুরসিক, মেধাবী, আশ্চর্য সংবেদনশীল এই মানুষটি প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলে গোটা পরিবেশ এক লহমায় প্রসন্ন হয়ে উঠত।

আমাদের একান্ত জবরদস্তিকে সম্মান দিতেই বেশ অসুস্থ অবস্থাতেও সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিত্বের ভার নিতে রাজি হয়েছিলেন চিনুদা। তখন তাঁর পক্ষে আর পত্রিকার দপ্তরে আসা সম্ভব ছিল না। তাই সম্পাদকমণ্ডলীর সভা নিয়মিতভাবে তাঁর পড়ার ঘরে বসত। মনে পড়ে, কিভাবে একটির পর একটি সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনায় সহায়তা করতেন তিনি। দুর্লভ লেখা জোগাড় করে দিতেন, প্রয়োজনে চিঠি লিখতেন, মূল্যবান নথিপত্রের হদিশ দিতেন, বিশেষ সংখ্যাগুলির রূপরেখা চিহ্নিত করে দিতেন। চিনুদা-কে আমরা বরাবরই এক ছোটখাট মহাফেজখানার মত ব্যবহার করতাম। সেই মানুষটি আর নেই। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের নিষ্ঠুরভাবে বুঝিয়ে দেয়, তাঁর অভাব আমাদের কতোখানি দীন ও অসহায় করে রেখে গেছে।

বর্তমান সংখ্যায় চিনুদা-র কর্মকাণ্ডের নানাদিক নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হলেও সংখ্যাটির প্রকৃত গৌরব নিহিত থাকবে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান রচনার পুনঃপ্রকাশে। এখানে প্রকাশিত চারটি রচনার মধ্যে দুটি ইতিপূর্বে পরিচয়-এ, একটি বিচিন্তা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা-র ওপর রচিত নিবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল বারোমাস পত্রিকায়। চিনুদা-র ইচ্ছে ছিল মেঘনাদ সাহা-বিষয়ক প্রবন্ধমালাকে একটি গ্রন্থের আকার দেওয়ার। মৃত্যু তাঁর সেই বাসনাকে অমীমাংসিত রেখে গেছে। এখানে ঐ প্রবন্ধগুলির কয়েকটিকে কিছুটা সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়েছে।

চিনুদা চলে যাওয়ার অল্পকাল পরেই আমরা বাংলা কবিতার প্রথম সারির প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সমর সেন-কে হারাই। বর্তমান সংখ্যাটিতে তাঁর উদ্দেশে দুটি প্রবন্ধ ক্রোড়পত্রের আকারে ছাপা হল।

যাঁরা এই সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে নানাদিক থেকে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

JEEVAN AKSHAY

A Voluntary Pension Plan

WITH UNIQUE BENEFITS

1. Guaranteed life-long pension
2. Attractive Returns
3. Absolute Security
4. Guaranteed Insurance Sum
5. Final JEEVAN AKSHAY Bonus

Life Insurance Corporation of India
ASANSOL DIVISION
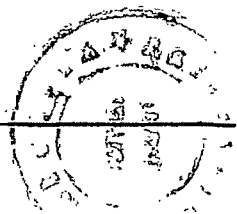
PARICHAYA MAY-JUNE 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265
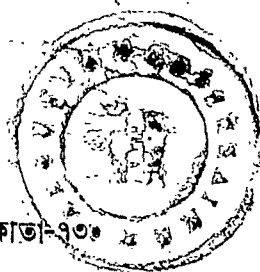
সম্পাদনা দপ্তর ॥ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা:৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩৯/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : ৮ টাকা মাত্র